*

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষ।

(প্রাচীন ভারতবর্ষ।)

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

প্রকাশক,

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা)।

সূচনা।

ইতিহাস—কর্ম্মের নিদর্শন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কর্ম্মের নিদর্শন; স্থাপত্যে কর্ম্মের নিদর্শন; আয়ুর্ব্বেদে কর্ম্মের নিদর্শন; গণিত-জ্যোতিষ-যুদ্ধবিদ্যায় কর্ম্মের নিদর্শন; উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা প্রভৃতিতেও কর্ম্মের নিদর্শন; কলাবিদ্যায় সকল বিভাগেই কর্ম্মের নিদর্শন; সাহিত্যে কর্ম্মের নিদর্শন; শাস্ত্রগ্রন্থে কর্ম্মের নিদর্শন। ইতিহাস সেই কর্ম্মের নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সুতরাং কর্ম্ম নামে যাহা কিছু অভিহিত হইতে পারে, তাহাই ইতিহাসের বিষয়ীভূত। ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি,—যাহাতে পরম্পরাগত উপদেশ আছে, তাহাই ইতিহাস; যাহাতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশ-সহ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহাই ইতিহাস। সে উপদেশ—কর্ম্মেরই উপদেশ। কোন্ কর্ম্ম দ্বারা কিরূপ ভাবে মানুষ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়াছেন, ইতিহাসে সেই কর্ম্ম-প্রণালী পরিবর্ণিত।

ইতিহাসে কর্ম্মের নিদর্শন।

সংসারে কর্ম্মের অন্ত নাই। সুতরাং ইতিহাসের বর্ণিতব্য বিষয়েরও অন্ত নাই। তবে যে কর্ম্মে ভগবান প্রীত হন, যে কর্ম্মে সংসারের হিতসাধন হয়, যে কর্ম্মে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ নিঃশ্রেয়স-মোক্ষ লাভ হয়, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম; সেই কর্ম্মের উপদেশই—সারভূত উপদেশ। যদ্দ্বারা সেই সারভূত কর্ম্মের প্রণালী অবগত হওয়া যায় এবং যাহাতে সারভূত কর্ম্মের উপদেশ পাওয়া যায়,—তাহাই ইতিহাসের লক্ষ্য। পাপীর চরিত্রের পার্শ্বে পুণ্যবানের চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত হইলে হৃদয়ে আদর্শ আপনিই প্রতিভাত হয়। অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে জ্ঞানের আলোক দেখিতে পাইলে, মানুষ জ্ঞানের পথেই প্রধাবিত হইয়া থাকে। অতীত কর্ম্মের নিদর্শন লক্ষ্য করিতে করিতে আত্ম-কর্ম্মের নিদর্শন রাখিবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায়। ইতিহাসের ইহাই উপযোগিতা। কোথায় কোন্ জন আপনার কীর্ত্তি-স্মৃতি কিরূপ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মানুষ আপনারও সেইরূপ কীর্ত্তি-স্মৃতি রাখিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ইহাই স্বাভাবিক। ইতিহাস সেই স্বাভাবিকী স্পৃহা হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়, আর তদ্দ্বারা প্রকৃতি অনুসারে মানুষ আপন আপন কর্ম্মের পথ নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারে।

কর্ম্মের পথ-নির্দ্দেশ।

সেই কর্ম্মস্পৃহা হৃদয়ে হৃদয়ে জাগাইয়া দেওয়াই পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্য। পৃথিবীর ইতিহাসের অতীত কর্ম্ম-কাহিনী যখনই স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইবে, তখনই আপনার কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য পড়িবে; আর আপনার কর্ম্মের সহিত অপরের কর্ম্মের তুলনা করিয়া আত্মকর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইবে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ-স্ফূর্ত্তির পরিচয় দেদীপ্যমান্। সেই পরিচয় পাইতে পাইতে, সেই নিদর্শন দেখিতে দেখিতে, কাহারও

কর্ম্মী হও।

প্রাণে কি তদ্রূপ পরিচয়—তদ্রূপ নিদর্শন রাখিয়া যাইবার স্পৃহা জাগরূক হইবে না? প্রাচীন ভারতের সাহিত্য অমর হইয়া আছে; আধুনিক ভারতবর্ষ কি তদ্রূপ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিবে না? প্রাচীন ভারতবর্ষ জ্ঞান বিজ্ঞানে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করিয়াছিল; আধুনিক ভারতবর্ষ কি সে পথে কিছুদূরও অগ্রসর হইতে পারিবে না? প্রাচীন ভারতবর্ষ উদ্ভিদ-বিদ্যায়, প্রাণিবিদ্যায়, জ্যোতির্ব্বিদ্যায়, পূর্ত্তবিদ্যায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল; আধুনিক ভারতবর্ষ কি তাহার কিছুমাত্র লাভ করিতে সমর্থ হইবে না? স্থাপত্যের, শিল্পচাতুর্য্যের, চতুঃষষ্টি-কলাবিদ্যার উৎকর্ষ সাধন জন্য প্রাচীন-ভারতের প্রতিষ্ঠার অবধি নাই; আধুনিক ভারতবর্ষ কি তত্তদ্বিষয়ে কোনও অধিকার লাভ করিবে না? আদর্শ সমাজ, আদর্শ ধর্ম্ম, আদর্শ সুখ,—ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় উদ্ভাসিত; সে সমাজ, সে ঐশ্বর্য্য, সে ধর্ম্ম, সে সুখ আর কি অধিগত হইতে পারে না? পৃথিবীর ইতিহাস শিক্ষা দিতেছে,—কর্ম্মী হও; ফল আপনিই অধিগত হইবে।'

ভগবৎ পাদপদ্মে প্রার্থনা—আশা পূর্ণ হউক। যে বংশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করি, সে বংশের মুখ উজ্জ্বল হউক। ভগবদনুগ্রহে "পৃথিবীর ইতিহাসের" এই তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই তৃতীয় খণ্ডও প্রকারান্তরে "পৃথিবীর ইতিহাসের" ভূমিকা মাত্র। ভূমিকা হইলেও ইহাতে যে সকল জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই আলোচনার সামগ্রী—তাহা নিশ্চয়ই স্মরণ করিবার বিষয়। পিতৃপুরুষগণের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিলে, হতাশ প্রাণে নিশ্চয়ই আশার সঞ্চার হয়।

উপসংহার। উপসংহারে বক্তব্য,—এই গ্রন্থের প্রণয়নে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন অথবা এই গ্রন্থের প্রণয়নে যাঁহাদের গ্রন্থাদির সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ আছি। মহাজনরূপে তাঁহারা পথপ্রদর্শক আছেন বলিয়াই এই অকৃতি অক্ষম জনও "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণয়নরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিয়াছে। এই গ্রন্থ প্রণয়ন পক্ষে আমার সহায়তার জন্য শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্ন্যালের নাম এই গ্রন্থের সহিত চিরসম্বন্ধযুক্ত রহিল। এই গ্রন্থের রচনায়, শৃঙ্খলা-রক্ষায় এবং প্রকাশ-পক্ষে তাঁহার যত্ন ও অধ্যবসায় অতুলনীয়। শ্রীমান্ প্রমথনাথের সহায়তা না পাইলে "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশিত হওয়া বোধ হয় সম্ভবপরই হইত না। ভগবান শ্রীমান্‌কে দীর্ঘজীবী করুন; আমার গৃহীত ব্রত সম্পন্ন হউক। ইতি—

হাওড়া,
২৫এ ভাদ্র, ১৩২৫ সাল।

নিবেদক,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

ভারতবর্ষ।

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

পরিচ্ছেদ বিষয় পৃষ্ঠা।

ভারতবর্ষ।

—:§-§:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

পৃথিবীর আদি-ধর্ম্ম।

[সকল ধর্ম্মই শ্রেয়ঃ-সাধক ;—সংসারে কিছুই নূতন নাই,—সকলেই পুরাতন মতের প্রবর্ত্তক—শ্রীকৃষ্ণ, কন্‌ফিউসিয়াস, যীশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ, গৌতম-বুদ্ধ, আব্রাহাম, জোরওয়াষ্টার প্রভৃতির উক্তিতে পুরাতন মতেরই প্রতিষ্ঠার আভাষ ;—ধর্ম্মমতের পৌর্ব্বাপর্য্য,—পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে আলোচনা,—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সম্বন্ধে অর্থাৎ জোরওয়াষ্টার, মোজেস, এজরা, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা মতের আলোচনা,—পাশ্চাত্য-মতে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব,—মাক্সমূলারের গণনায়-নির্দ্দিষ্ট সময়ের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও বৈদিক সূক্তের বিদ্যমানতার বিষয় পাশ্চাত্য-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক সমর্থিত,—শাস্ত্রানুসারে যুগাদির প্রসঙ্গ,—তাহাতে ভারতীয় ধর্ম্মের—আর্য্য-ধর্ম্মের—হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত তুলনায় পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মমতের আধুনিকত্ব।]

বর্ষার মেঘ বৃষ্টিরূপে ধরণী অভিষিক্ত করে। সেই বৃষ্টিই পুনরায় বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্প হইতে মেঘের সঞ্চার হয় ; মেঘ হইতে বৃষ্টি, হিমশীলা, তুষার প্রভৃতির উৎপত্তি। একই সামগ্রী রূপান্তরে সংসারে কত ভাবে বিরাজমান আছে! মেঘ, বাষ্প, বৃষ্টি, কুয়াসা, হিমশিলা প্রভৃতিতে তাহার যে বিশদ পরিচয় পরিদৃশ্যমান, সংসারের অসংখ্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেই ভাব—সেই দৃশ্য প্রকট নহে কি? এ সংসারে অসংখ্য ধর্ম্মমত ও অসংখ্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। অথচ, মূল তথ্য অনুসন্ধান করিলে, অনুসন্ধিৎসুগণ নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন, মূলে সকলই এক ; কেবল, বৃষ্টি, বাষ্প, মেঘ প্রভৃতির ন্যায় রূপান্তরে অবস্থিত বলিয়া সহসা একের সহিত অন্যের পার্থক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে ; সুতরাং বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, কোনও ধর্ম্মমতকেই অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না যাহারা প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা কখনই কোনও ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না।

সকল ধর্ম্মই শ্রেয়ঃ-সাধক।

সকল দেশের সকল জাতির সকল ধর্ম্ম-মতের সার-সমগ্রী, আমরা বিশ্বাস করি, অনাদি অনন্ত কাল হইতে ইহ-সংসারে প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে কখনও কোনও মত প্রচ্ছন্ন থাকে, কখনও কোনও মত স্বতঃ-প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে বীজ ও বৃক্ষের উপমা উত্থাপন করা যাইতে পারে। মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইলে, বীজ প্রচ্ছন্ন বা অদৃশ্য থাকে। আবার তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইলে, তাহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপে বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া বীজ যখন লোক-লোচনের গোচরীভূত হয়, তখন তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত এবং তাহা হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইল বলিয়া লোকে কল্পনা করিয়া লয়। একেবারে অস্তিত্ব ছিল না, এমন নহে; কিন্তু অস্তিত্ব যেদিন বিশেষ-ভাবে প্রকট হইয়া পড়িল, সেই দিনকেই মানুষ সাধারণতঃ আদি-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। ফলতঃ, সংসারে নূতন কিছুই উদ্ভূত হয় না। যাহা আছে, যাহা ছিল, চক্রনেমির বিবর্ত্তনে, তাহাই কখনও নিম্নগামী অর্থাৎ অদৃশ্য, আবার কখনও উর্দ্ধগামী অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান্।

নূতন কিছুই নাই।

পৃথিবীর কয়েকটী প্রধান ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কর্ম্ম-প্রণালীর আলোচনা করিয়া আমরা প্রোক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়া থাকি। আমাদের এই সনাতন-ধর্ম্ম,—হিন্দু-ধর্ম্মই বল, আর্য্য-ধর্ম্মই বল, বৈদিক-ধর্ম্মই বল, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মই বল, যে নামেই অভিহিত কর,—আমাদের এই সনাতন ধর্ম্ম অনাদি অনন্ত কাল এই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত আছে, ছিল এবং থাকিবে। এ বিষয়ে আমাদের মনে কখনও সংশয় উপস্থিত হয় নাই। যাঁহারা একটু সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মনেও তদ্রূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। কেবল ভারতবর্ষের কথাই বা বলি কেন, যে দেশের যে ধর্ম্মমতেরই আলোচনা করি না কেন, সকলের সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। কোনও দেশের কোনও ধর্ম্ম-প্রচারক কোনও মহাত্মাই কখনও কোনও নূতন কথা—নূতন মত প্রচার করিতেছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন নাই। যাঁহারা বলেন,—'আমার ধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম, আমার ধর্ম্মপ্রচারক নূতন কথা বলিয়া গিয়াছেন;' আমরা বলি—তাঁহারা ভ্রান্ত, তাঁহারা মহাপুরুষগণের মহাবাণী নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইয়া আছেন। কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, অন্যান্য দেশের অন্যান্য মহাজনগণের বাক্যেও সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি ভিন্ন অন্য কিছুই শুনিতে পাই না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

সকলেই পুরাতন মতের প্রবর্ত্তক।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ—'যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহধারণ করি। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য, আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।' তবেই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নূতন কিছুই প্রচার করেন নাই। যাহা ছিল, তাহারই রক্ষার জন্য, তাহারই প্রতিষ্ঠা-কামনায়, তিনি ইহ-সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিবা প্রাচ্যের, কিবা পাশ্চাত্যের, সকল দেশের সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণই এই ভাবের

কথাই কহিয়া গিয়াছেন। * চীন-দেশের আদি-ধর্ম্মপ্রচারক কনফিউসিয়াস † -প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে ডক্টর লেগি বিশেষ অনুসন্ধান-পূর্ব্বক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও ঐ মতেরই পরিপোষক। লেগি বলেন,—সেই প্রাচীন ধর্ম্মপ্রচারক স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন,—'আমি কোনও নূতন ধর্ম্ম-মতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহি; আমি কেবল প্রাচীন মত ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আমি কেবল প্রদান করিতে আসিয়াছি; আমি সৃষ্টি করিতে আসি নাই। কোনও নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি প্রাচীন মতেই বিশ্বাসবান্; আমি সেই মতেরই অনুরাগী।' ‡ ইসলাম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের জীবনচরিত আলোচনা করিলেই বা আমরা কি দেখিতে পাই? যে ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা-কল্পে তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা পরবর্ত্তিকালে এক হস্তে কোরাণ এবং অপর হস্তে তরবারি লইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদও উচ্চ-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—"আমি নূতন মত প্রচার করিতে আসি নাই; আমি পুরাতন মতেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চাই।" যাঁহারা হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছেন, 'হেরা'-পর্ব্বতে হজরত ও জেব্রিলের মিলন-প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই তাঁহাদের অন্তরে জাগরূক আছে। হেরা-পর্ব্বত-গহ্বরে অবস্থান-কালে, রমজান মাসের সপ্তবিংশ দিবসের নিশাকালে, পবিত্রাত্মা জেব্রিল হজরত মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, —"আমি ঈশ্বরের দূত রুহোল-আমিন্। তোমাকে তাঁহার সত্য-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। তিনি তোমাকেই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারক মনোনীত করিয়াছেন।" এই বলিয়া পবিত্রাত্মা জেব্রিল, হজরত মহম্মদকে ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া যান। আপনার মত সম্বন্ধে পিতৃব্য আবু-তালেবের নিকট হজরত যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে জেব্রিলের নিকট হইতে প্রাচীন ধর্ম্মমত শিক্ষালাভের কথাই প্রকাশ পাইয়াছিল। আবু তালেব জিজ্ঞাসা করেন,—"ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার ধর্ম্মমত কি? তুমি কোন্ ধর্ম্মানুসারে

* 'থিওজফিকাল সোসাইটীর' প্রাণস্বরূপিণী এইচ. পি. ব্লাভাস্কি ধর্ম্ম-জগতের অনেক সন্ধান লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি এই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"More than one great scholar has stated that there never was a religious founder, whether Aryan, Semitic or Turanian who had invented a new religion or revealed a new truth. These founders are all transmitters, but not original teachers".—H. P. Blavatsky in *Secret Doctrine*.

† আমাদের দেশে যেমন মহর্ষি মনুর মত প্রচলিত, চীন-দেশে সেইরূপ কনফিউসিয়াসের (কনফুচি কংফুচি প্রভৃতি নামেও পরিচিত) মত মান্য হয়। কনফিউসিয়াসের জন্ম-সম্বন্ধে অবশ্য মতান্তর আছে এবং ঐ নামে একাধিক মহাপুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, সাধারণতঃ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কনফিউসিয়াসের আবির্ভাব-কাল খৃষ্ট-জন্মের সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহার পিতার নাম হে; মাতার নাম—ইচেল-চিং-সাই। হে সত্তর বৎসর বয়সে চিং-সাইকে বিবাহ করেন। জন্মের তিন বৎসর পরে কনফিউসিয়াস পিতৃহীন হন। উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। একটি পুত্র-সন্তান জন্মিবার পরই তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন। লু-রাজ্যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কনফিউসিয়াস চীনের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। অসংখ্য নরনারী তাঁহার চরণতলে ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দার্শনিক মত অধুনা পৃথিবীর এক অত্যুৎকৃষ্ট সম্পৎ মধ্যে পরিগণিত।

‡ "I only hand on; I cannot create new things; I believe in the ancients and therefore I love them"—Max Muller's *Science of Religion.*

চলিতেছ?" হজরত উত্তর দেন,—'মহাত্মা ইব্রাহিম-প্রমুখ আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে ধর্ম্মমত পালন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে পথের পথিক ছিলেন, আমি সেই ধর্ম্ম পালন করিয়া সেই মতেরই অনুসরণ করিতেছি। আমি সেই পথেরই পথিক হইয়াছি। জনসাধারণ এখন সত্য-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; তাহাদিগকে সত্য-ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।" মহম্মদের উক্তিতেও—সেই ধর্ম্মের গ্লানি দূর করার ভাব, সেই দুষ্কৃতদিগের বিনাশের আভাষ! কি কারণে, কি ভাবে, এই ভাব—এই আভাষ পরিস্ফুট হইয়াছে, সে বিতর্কের স্থান ইহা নহে; এখানে আমরা কেবল দেখাইতে চাই,—পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রচারক যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই পুরাতনের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। গৌতম-বুদ্ধ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান, আজিও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ নরনারী যে ধর্ম্ম-মতের অনুসরণকারী, সে ধর্ম্ম-মতও নূতন ধর্ম্ম-মত নহে। বুদ্ধ কোনও নূতন মত আবিষ্কার করেন নাই; তিনি কোনও নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হয় না। গৌতম-বুদ্ধ জ্ঞানতঃ যে কোনও নব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন,—ইহা মনে করিতে গেলে, ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয়। অপিচ, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছিলেন—তিনি প্রাচীন ও পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন—যে ধর্ম্মমত আবহমানকাল হইতে হিন্দুজাতির মধ্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ শ্রমণ ও অন্যান্য সাধকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং পরবর্ত্তি-কালে যাহা কলুষিত হইয়া আসিয়াছিল।* শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্মমতকে সাংখ্য-মতের অনুসারী বলিয়া, কেহ বা পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রের অনুকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।† যীশুখৃষ্ট-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত, খ্রীষ্টানগণই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, পুরাতন মতের অনুসারী। যীশুখৃষ্ট কখনও নূতন ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করিতেছি বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন নাই। 'মাউণ্ট' পর্ব্বতে ধর্ম্মোপদেশ-কালে যীশুখৃষ্ট আপনাকে প্রাচীন ধর্ম্মমতের অনুসরণকারী বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"মনে করিও না, আমি কোনও প্রাচীন মত ধ্বংস করিতে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি ধ্বংস করিতে আসি নাই, পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যত দিন স্বর্গ এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব, তত দিন কেহ পুরাতন বিধি-ভ্রষ্ট হইও না। যদি কেহ সেই আদেশ ভঙ্গ করে, কিংবা

* "It would be historically wrong to suppose that Gautama Budha consciously set himself up as the founder of a new religion. On the contrary, he believed to be the last that he was proclaiming only the ancient and pure form of religion which had prevailed among the Hindus among Brahmans, Sramans and others, but which had been corrupted at a later date."—R. C. Dutt. *Civilisation in Ancient India.*

† প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডক্টর রামদাস সেন তাঁহার "বুদ্ধদেবের" গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"মিথ্যা লোক-প্রবাদ রটিয়াছে যে, বুদ্ধদেব স্বাধীন পথে অর্থাৎ নিজ-উদ্ভাবিত উপায়ে নির্ব্বাণ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি বুদ্ধদেব কিছুমাত্র নিজে উদ্ভাবন করেন নাই। তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মোক্ষ-রূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ও মুক্ত হইয়াছিলেন, সে প্রণালী সমস্তই পাতঞ্জল-সূত্রের প্রণালী।"

মনুষ্যদিগকে সেই আদেশ অমান্য করিতে শিক্ষা দেয়, স্বর্গরাজ্যে কদাচ তাহার স্থান নাই। কিন্তু যাহারা প্রাচীন মতের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন মত শিক্ষা দিবেন, তাঁহারা স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবেন।' * খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয় যাঁহারা বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—"নূতন নহে; উহা পুরাতন। পুরাতন ধর্ম্ম হইতেই খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের উদ্ভব।" † ইহুদীদিগের 'জুডাইজম' (Judaism) এবং পার্শীদিগের 'জোরওয়াষ্ট্রীয়ানিজম্' (Zoroastrianism) অতি প্রাচীন কালের প্রচলিত ধর্ম্মমত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। কিন্তু এই জুডাইজম ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক আব্রাহাম এবং জোরওয়াষ্ট্রীয়ানিজম্ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জোরওয়াষ্টার ইঁহারাও আপন-আপন ধর্ম্মমতকে অভিনব ধর্ম্মমত বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। অধিকন্তু ঐ দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে সকল ধর্ম্মমত পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাঁহারা সেই সকল মতেরই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। জুডাইজম্ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য-গ্রন্থ—'জেনিসিস' ‡ (Genesis); জোরওয়াষ্ট্রীয়ানিজম্ ধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ—'জেন্দ-আভেস্তা' §। ঐ দুই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করিলে ঐ দুই ধর্ম্মমতকে কখনই অভূতপূর্ব্ব ও অভিনব বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ¶ জর্ম্মণ-দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর স্পিগেল 'জেন্দ-আভেস্তা' গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। সেই সূত্রে তিনি 'জেনিসিস' ও 'আভেস্তার' তুলনায় সমালোচনা করেন। তাঁহার মতে,—জোরওয়াষ্টার এবং আব্রাহাম ॥ উভয়েই এক সময়ের লোক; উভয়েই এক স্থানে (আরাণ বা হারাণ নামক স্থানে) এবং এক সময়ে (বাইবেলের

---

* "Think not that I am come to destroy law or the Prophets: I am not come to destroy but to fulfil. For, verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in nowise pass from the law till all be fulfilled. Whosoever breaks one of these commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven; but whosoever shall do and teach *them*, the same shall be called great in the kingdom of heaven."—*Mathew*, V.

† "What is now called the Christian religion has existed among ancients and was not absent from the beginning of the human race, until Christ came in the flesh, from which time the true religion, which existed already, began to be called Christianity.'–August, *Religion*. 1. 13.

‡ জেনিসিস্ (Genesis) অর্থ—আদি বা পৃথিবীর সৃষ্টি। "পেণ্টাটিউক" গ্রন্থের প্রথম অংশ ঐ নামে অভিহিত। 'সৃষ্টির পুস্তক, আব্রাহম, আইজাক ও জ্যাকবের পুস্তক' প্রভৃতি নামেও তালমুদে' ইহার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে সৃষ্টি, স্বর্গ, পতন, আদম হইতে নোয়ার এবং নোয়া হইতে আব্রাহামের বংশধরগণের বিবরণ বর্ণিত আছে। কোনও মতে ঐ গ্রন্থে ২০০০ বৎসরের কথা এবং কোনও মতে ৩৬১১ বৎসরের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সেই সময়ের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির আভাষ ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়। জেনিসিস—খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ।

§ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে জেন্দ-আভেস্তা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

¶ এতদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা এই প্রসঙ্গের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে।

॥ জোরওয়াষ্টারের এবং আব্রাহামের জীবন-কথা "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৩১—৩২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। জোরওয়াষ্টার—বিভিন্ন জাতির ভাষায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রাচীন পারসিকগণের গ্রন্থে অনুকরণে কেহ কেহ জোরওয়াষ্টার নামকে 'জরথুস্ত্র' নামে উচ্চারণ করিয়

গণনা অনুসারে খ্রীষ্ট-জন্মের ১৯২০ বৎসর পূর্ব্বে) বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের ধর্ম্মমতের সাদৃশ্য, সেই সাদৃশ্যের কারণ, এবং জোরওয়াষ্টার হইতে আব্রাহামের ধর্ম্ম-মতের পরিপুষ্টি প্রভৃতির বিষয় ডক্টর স্পিগেল উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।* তদ্দ্বারা ঐ দুই ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রবর্ত্তিত মত—পুরাতন প্রাচীন মত বলিয়াই সপ্রমাণ হয়। ফলতঃ, একটু অভিনিবেশ-সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে কোনও ধর্ম্মমতকেই অভূতপূর্ব্ব ও অভিনব ধর্ম্মমত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। অপিচ, সকল ধর্ম্মের সার-সম্পৎ অনাদি অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান আছে বলিয়াই সপ্রমাণ হয়।

তবে যে এক ধর্ম্মমতকে আদি ধর্ম্ম-মত এবং অপর ধর্ম্ম-মতকে তাহার পরবর্ত্তি-কালে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহার কারণ অন্যরূপ। যখন আমরা কন্‌ফিউসিয়াস্‌কে, জোরওয়াষ্টারকে, আব্রাহামকে, যীশুখ্রীষ্টকে, মহম্মদকে অথবা দ্বাপরাবতার শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম মতের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করি, তখন কাজেই তাঁহাদের আবির্ভাব-কাল হিসাব করিয়াই ধর্ম্মমত-প্রতিষ্ঠার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। তদনুক্রমে আমরা যাহা দেখিতে পাই—আমরা যাহা বুঝিতে পারি, তাহাতে এক এক ধর্ম্মমতের বা এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়-কাল সহজেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সে হিসাবে, পৃথিবীর কয়েকটী প্রধান ধর্ম্ম-মতের বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় বা উৎপত্তি-কাল এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে,—

ধর্ম্মমতের পৌর্ব্বাপর্য্য।

(১) জোরওয়াষ্টার (স্পিগেলের গণনাক্রমে) ১৯২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে;
(২) আব্রাহাম (স্পিগেলের মতে) ১৯২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে;
(৩) গৌতম-বুদ্ধ (পাশ্চাত্য-মতে) ৫৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে;
(৪) কন্‌ফিউসিয়াস্ (পাশ্চাত্য মতে) ৫৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে;
(৫) যীশুখৃষ্ট (বর্ষ-গণনাক্রমে খৃষ্টাব্দ হিসাবেই) ১ খৃষ্টাব্দে;
(৬) হজরত মহম্মদ ৫৭০ খৃষ্টাব্দে;

এ হিসাবে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত যে আরও অনেক পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতেও সে তত্ত্ব সপ্রমাণ হয়। তবে কেহ কেহ উপরোক্ত কাল-নির্দ্দেশে আপত্তির কথা যে না উত্থাপন করিতে পারেন, তাহা নহে। ডক্টর স্পিগেলের মতে, জোরওয়াষ্টার ও আব্রাহাম সমসাময়িক। কিন্তু জোরওয়াষ্টার এবং আব্রাহাম

গিয়াছেন। গ্রীকদিগের গ্রন্থে 'জারাষ্ট্রাডেস' (Jarastrades) বা 'জোরোয়াষ্ট্রায়েস' (Joroastracs) রূপে সে নাম উচ্চারিত। বর্ত্তমান পারসিকগণ 'জরদোস্ত' রূপে ঐ নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। রোমকগণ জোরওয়াষ্টার (Zoroaster) নামের প্রবর্ত্তক। ইউরোপীয়গণ এখন শেষোক্ত উচ্চারণেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। আমরাও প্রধানতঃ সেই উচ্চারণেরই অনুসরণ করিয়াছি। আব্রাহামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে" ৫০১ ও ৫০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। তিনি ১৮২১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

* ডক্টর স্পিগেলের (Dr. Spiegel) গ্রন্থ ইংরেজী-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। তবে তাঁহার মত সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহারই মর্ম্ম এইস্থলে প্রকাশ করা হইল। *Vide Max Muller—Chips from a German Workshop.*

সম্বন্ধে ডক্টর স্পিগেলের মতই যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না। প্রথমতঃ, জোরওয়াষ্টার নামে একাধিক মহাপুরুষের আবির্ভাবের বিষয় জানিতে পারা যায়। * আরিষ্টটল, প্লিনি এবং ইউডোক্সাস নির্দ্দেশ করেন,—প্লেটোর মৃত্যুর ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জোরওয়াষ্টার বিদ্যমান ছিলেন। প্লেটোর লোকান্তর-কাল, খৃষ্ট-জন্মের ৩৩৭ বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং জোরওয়াষ্টার নামধেয় মহাপুরুষের অস্তিত্ব—স্পিগেলের নির্দ্দিষ্ট-কালের কত পূর্ব্বের, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এদিকে আবার ডাইওনিসাস লেয়ার্টিয়াসের মতে,—ট্রোজান্ (ট্রয়) যুদ্ধের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে জোরওয়াষ্টারের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। আর এক মতে আবার ট্রয়-যুদ্ধের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে জোরওয়াষ্টার বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। † ট্রয়-যুদ্ধ খৃষ্ট-জন্মের ১১৯৩ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এ গণনাক্রমে আর এক নূতন জোরওয়াষ্টারের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। ডক্টর হোগ বলেন,—রোম-দেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনি প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—'মোজেসের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জোরওয়াষ্টার বিদ্যমান ছিলেন। বাবিলন-দেশের ঐতিহাসিক বেরোসাস, তাঁহাকে 'বাবিলন-দেশের রাজা' বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণ ২২০০—২০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাবিলনে রাজত্ব করিয়াছিলেন।' পার্শীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বেরোসাস যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ২৮০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে 'জোরওয়াষ্ট্রিয়ান সাহিত্যের' অভ্যুদয় হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে বুঝিতে পারি,—ইহুদীদিগের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ মোজেসের সময় (১৩০০—১৫০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ) হইতে আরম্ভ করিয়া ৯৬০ খৃষ্টাব্দে এক অভিনব আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সাহিত্যের সেই অবস্থাকে 'তাল্মুডিক-সাহিত্য' বলা হয়। ‡ যতদিনে যেরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ঐরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, সেই ক্রম-পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিতে গেলে, ২৮০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দেই জোরওয়াষ্টারের আবির্ভাব-কাল নির্ণীত হইতে পারে। গ্রীকগণও সেই মতে বিশ্বাস করেন। § খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা সম্বন্ধেও এইরূপ মতান্তর আছে। যীশুখৃষ্টের জন্মের পরবর্ত্তিকালে খৃষ্ট-ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইলে, তুলনায় খৃষ্টধর্ম্মের আধুনিকত্ব সম্বন্ধে কোনই সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তবে কেহ কেহ বলেন, খৃষ্ট-ধর্ম্ম যীশু-খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাইবেলের মতে, মোজেস (মুসে) ঈশ্বরের নিকট হইতে ধর্ম্মমত প্রচারের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

* কত জন জোরওয়াষ্টার কোন্-কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় "পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে, ৩১শ—৩২শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† "Aristotle and Eudoxus place his era as much as 6000 years before Plato; others say about 5000 years before the Trozan war."—Dr. Haug.

‡ Talmud (from Heb. *lamud* to learn)—is the name of the fundamental code of the Jewish civil and canonical law, comprising the Mishna and the Gemara, the former as the text, and the latter as the commentary and complement.

§ Martin Haug, Ph. D,—*Essay on the Sacred Language, Writing and Religion of the Parsis.*

তিনি 'পেন্টাটিউক' * নামক ধর্ম্মগ্রন্থ হিব্রু-ভাষায় সংগ্রথিত করিয়া যান। তাঁহার সেই গ্রন্থ হিব্রু-ভাষায় 'টোরা' বা ধর্ম্মবিধি বলিয়া কথিত হয়। পাঁচ খণ্ডে সেই গ্রন্থ বিভক্ত। গ্রীকগণ গ্রীক-ভাষায় ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করেন। সেই সময় উহা 'পেন্টাটিউক' নামে অভিহিত হয়। 'ওল্ড এবং নিউ টেষ্টামেণ্ট' নামক খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের অনেক স্থলেই পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কোথাও বা তাহা মোজেসের উক্তি বলিয়া, কোথাও বা তাহা ঈশ্বরের উক্তি বলিয়া কথিত। কিন্তু বাইবেলের মতেই প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্ট-জন্মের ১৫৭১ বৎসর পূর্ব্বে মোজেস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৪৯১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তিনি ধর্ম্ম-প্রচারে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও, খৃষ্ট-জন্মের ১৪৯১ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের অভ্যুদয়ের কথা স্বীকার করা যাইতে পারে; তাহার পূর্ব্বে নহে। অন্তমতে, আবার 'পেন্টাটিউক' গ্রন্থ এজরা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া প্রচার আছে। ৪৫৮—৪৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এজরার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' গ্রন্থ তাঁহারই সঙ্কলিত; এবং মোজেসের মত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তিনি নূতন মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। এ হিসাবে এজরার সময় হইতে খৃষ্ট-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, মানিতে হয়; খৃষ্ট-ধর্ম্মকে খৃষ্ট-জন্মের মাত্র সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বের ধর্ম্মমত বলা যাইতে পারে। এইরূপ আব্রাহাম, কন্‌ফিউসিয়াস্ প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা মতান্তর আছে। ভিন্ন দেশের জটিল ইতিবৃত্তের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি অস্মদ্দেশের পুরাণেতিহাস হইতে গৌতম-বুদ্ধের আবির্ভাব-কাল নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাই, তাহাতেই বা কি প্রতিপন্ন হয়? পাশ্চাত্য-মতে খৃষ্ট-জন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে গৌতম-বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। কিন্তু অন্য মতে তাঁহার আবির্ভাব-কাল আরও বহু পূর্ব্বে বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। একটী মতের উল্লেখ করিতেছি। বিম্বিসারের রাজত্বকালে গৌতম-বুদ্ধ বিদ্যমান ছিলেন। সে হিসাবে মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের অন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বুঝা যায়। এতদনুসারে খৃষ্ট-জন্মের অন্ততঃ ছাব্বিশ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। † যীশু-খৃষ্ট এবং হজরত-মহম্মদের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, যে ধর্ম্ম-প্রচারকের আবির্ভাব-কাল যত পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, প্রাচীনত্বে কোনও ধর্ম্ম-মতই বৈদিক-ধর্ম্মের—আর্য্য-ধর্ম্মের—আমাদের সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। এ সম্বন্ধে প্রথমে আমরা কয়েকটী পাশ্চাত্য মতেরই আলোচনা করিতেছি। অধ্যাপক

* Pentateuch—(Greek *pente*, five, and *teuchos*, a book.) A name given by Greek translators to the five books ascribed to Moses, which are in Hebrew called collectively *Torah* (Law), by way of eminence, or *Chamisha Chumsle Torah* (five fifths of the Torah).

† "বিষ্ণুপুরাণের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা পরীক্ষিৎ যখন রাজ্য করেন, কলি তখন ১২০০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। যথা—'তদাপ্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।' এই সময়ের পর সপ্তর্ষি-মণ্ডল যখন পূর্ব্বাষাঢ় নক্ষত্রে গত হইবেন, নন্দ তখন সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন এবং কলিও সেই সময় হইতে প্রবল হইবে। যথা,—'প্রযাস্যন্তি যদাচৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ। তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।' সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাষাঢ়া

ম্যাক্সমুলার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—'মানব-জাতির ইতিহাসের আদিম অবস্থা-জ্ঞাপনে বেদের অপেক্ষা কোনও প্রাচীন সাহিত্য-গ্রন্থের বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায় না।' রেভারেণ্ড এল. এইচ. মিলস্ জেন্দ-আভেস্তার অনুবাদ করেন। তিনি বেদ ও জেন্দ-আভেস্তার প্রাচীনত্ব বিষয়ে আলোচনা করিয়া জেন্দ-আভেস্তার অপেক্ষা বেদের প্রাচীনত্ব মান্য করিয়াছেন। বিবিধ যুক্তির অবতারণার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জেন্দ-আভেস্তার প্রাচীনতম অংশ 'গাথা'-সমূহ প্রাচীনতম ঋকের বহু পরে রচিত হইয়াছিল।' ম্যাক্সমুলার প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে পদ্ধতিতে গণনা করিয়া ঋগ্বেদকে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্য-গ্রন্থ হইতে প্রাচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই গণনা অনুসারে ঋগ্বেদ খৃষ্ট-জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হয়। ম্যাক্সমুলার প্রথমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সেই মতই এত কাল মান্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজিকালি আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতেও এই গণনা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনায় এখন দেখিতেছেন,—ঋগ্বেদের ঋক-সমূহ খৃষ্ট-জন্মের অন্যূন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হওয়া সম্ভবপর। জ্যোতির্ব্বিদগণের তদ্রূপ সিদ্ধান্তের হেতুবাদ এই,—'সূর্য্য বৎসরে দুই দিন বিষুবরেখা অতিক্রম করেন। যে বিন্দুতে সূর্য্যের সহিত বিষুবরেখার মিলন হয়, সেই বিন্দুর নাম—অয়ন-বিন্দু বা বিষুবীয় বিন্দু (Equinoxial points)। অয়ন-বিন্দু চিরকাল একস্থানে নির্দ্দিষ্ট থাকে না। সেই বিন্দুর সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন হয়। সেই পরিবর্ত্তন বা গতি 'অয়ন-চলন' (Procession of Equinoxes) নামে অভিহিত। এই অয়ন-চলনের বা গতির পরিমাণ—বৎসরে ৫৫".২৪ মাত্র।* ঋগ্বেদের কোনও কোনও সূক্তে সেই সেই সূক্ত রচনার সময়ের আভাষ পাওয়া যায়। অয়ন চলন বিন্দুতে তৎকালে কোনও গ্রহের সমাবেশ ছিল, সূক্তের মর্ম্মে তাহা উপলব্ধি হয়। বর্ত্তমান যুগে সেই বিন্দুতে অপর এক গ্রহের সংযোগ আছে। কত কালে কি প্রকারে অধুনা-সম্বন্ধযুক্ত গ্রহ সেই বিন্দুতে আসিতে পারে, জ্যোতির্ব্বিদ্যা অনুসারে তাহা গণনা করা হইয়াছে। সে গণনায় দেখা যায়, অয়ন-চলনের গতি অনুসারে ঋগ্বেদের রচনা-কাল নির্দ্ধারণ করিলে, খ্রীষ্ট-জন্মের অন্ততঃ পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল। ম্যাক্সমুলারের লোকান্তরের পর, এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই হিসাবে তিন সহস্র বৎসর পিছাইয়া পড়িয়াছে; আরও একটু স্থির মস্তিষ্কে আলোচনা করিলে আরও অনেক দূরে পিছাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা! আমাদের শাস্ত্রানুসারে বেদ—সনাতন; বেদ অনাদিকাল বিদ্যমান। আরও, আমাদের

নক্ষত্র অতিক্রম করিতে অন্যূন ১১০০ শত বৎসর লাগিয়াছিল। পূর্ব্বের বারো শত, আর এই এগার শত, সমুদায় একত্রিত করিয়া, কলির ২০০০ শত বৎসর পর সেই নন্দরাজা হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত হয়। এই নির্ণয় সত্য হইলে, ইহাও সত্য হইবে যে, কলির ২০০০ শত বৎসর পরে, ২৪০০ শত বৎসরের মধ্যে, বুদ্ধাবতার ঘটনা হইয়াছিল। অতএব আমাদিগের পুরাণ-শাস্ত্র অনুসারেও বুদ্ধদেবের আয়ু ২৬০০ শত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইঁহার আয়ু ২৫০০ শতের অধিক হয় নাই।"—ডক্টর রামদাস সেন মহাশয়ের 'বুদ্ধদেব'।

* *Elements of Astronomy* by Parker.

শাস্ত্রানুসারে এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। একসপ্ততি সংখ্যক চতুর্যুগে এক একটী মন্বন্তর হয়। সুতরাং ৭১×৬=৪২৬ চতুর্যুগ পূর্ব্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে; বর্ত্তমান মন্বন্তরের এক্ষণে অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগ চলিতেছে। অর্থাৎ, পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মন্বন্তরের ৪২৬ চতুর্যুগ এবং বর্ত্তমান মন্বন্তরের সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ অতীত হইয়া অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর চলিয়া গিয়াছে। তার পর বর্ত্তমান কলিযুগেরও ৫০১২ বৎসর অতীতপ্রায়। বৎসর হিসাবে ধরিতে গেলে ১৯৬,০৮,৫৬,০০০ এক শত ছিয়ানব্বই কোটী আট লক্ষ ছাপান্ন হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বের কোনও ধর্ম্মমতের বা কোনও ধর্ম্মমত-প্রচারের প্রমাণ কেহ দেখাইতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। এই দূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান মন্বন্তরের সপ্তম চতুর্যুগের অর্থাৎ যে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এক্ষণে ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহারই বিষয় যদি চিন্তা করি, তাহা হইলেও, কিবা জোরওয়াষ্টার-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতি, কিবা আব্রাহাম-প্রচারিত জুডাইজম্, কিবা কনফিউসিয়াসের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত—কোনটীই প্রাচীনত্বে ভারতীয় আর্য্য-ধর্ম্মকে পরাভূত করিতে পারে না। এই পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনায় নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হয়, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মমত—ভারতের ধর্ম্ম—বৈদিক ধর্ম্ম—হিন্দু-ধর্ম্ম। পরবর্ত্তি-কালের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সমূহ সেই ধর্ম্মেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শাখা-প্রশাখা-বিশেষ। যে মহাপুরুষের ঘোষণা-বাণী যখনই শুনিয়াছি—'আমি নূতন মত স্থাপন করিতে আসি নাই, আমি পুরাতনেরই প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি;' তখনই মনে হইয়াছে, তিনি এই পুরাতনেরই—এই সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মেরই কোন-না-কোনও অঙ্গের সেবা করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমাদের এতদুক্তিতে হিন্দুধর্ম্মানুরাগী সুধিগণ অনেকেই চমকিয়া উঠিতে পারেন। হিন্দুর ধর্ম্মমতের সহিত মুসলমানের, খ্রীষ্টানের, ইহুদীর ধর্ম্ম-মতের অভিন্নতা প্রতিপাদন জন্য আমাদের প্রয়াসে অনেকের আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমরা যাহা বলিতেছি বা বলিবার চেষ্টা পাইব, তাহা সত্য—অভ্রান্ত সত্য। যিনি যে কোনও দেশের যে কোনও সম্প্রদায়ের যে কোনও ধর্ম্মমতের সারভূত সামগ্রী অনুসন্ধান করিবেন, তিনিই আমাদের এতদুক্তির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্মমতের আলোচনা করিয়া, আমরা বুঝিয়াছি—যে কোনও দেশের যে কোনও ধর্ম্মের যে কোনও সার-সিদ্ধান্ত থাকুক না কেন, ভারতীয় ধর্ম্মে—বৈদিক ধর্ম্মে—আর্য্য-ধর্ম্মে—হিন্দু-ধর্ম্মে—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে, কোন-না-কোনও আকারে তাহা অবস্থিত আছে। তবে যে এক হইতে অন্যের পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার কারণ—কোনটী বা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, কোনটী বা রূপান্তরিত হইয়া আছে, কোনটী বা বিপরীত-ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশভেদে, কালভেদে, রুচিভেদে, প্রকৃতি-ভেদে রূপান্তর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে সহজেই ইহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ভারতীয় ধর্ম্ম—বৈদিক ধর্ম্ম—আর্য্য-ধর্ম্ম—হিন্দু-ধর্ম্ম, কোন্ ধর্ম্মে কি ভাবে পরিগৃহীত ও পরিস্ফুট হইয়াছে, পরবর্ত্তী কয়েকটী পরিচ্ছেদে তাহা প্রদর্শনের চেষ্টা পাইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——:*:——

হিন্দু ও পারসিক।

[হিন্দু ও পারসিক,—উভয়ের সম্বন্ধ-তত্ত্ব,—মনুর মতে,—ম্যাক্সমুলার ও হেগের মতে,—ইরাণ ও তুরাণ শব্দের আলোচনায়,—কর্ণেল টড ও জোরন্স-জারণার মত;—জেন্দ-আভেস্তা গ্রন্থে বেদের অনুসরণ,—শব্দার্থ, বিভাগ এবং তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত,—জেন্দ-ভাষার সহিত সংস্কৃত-ভাষার অভিনব সাদৃশ্য-তত্ত্ব তৎসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত-পরম্পরা;—আর্য্য-হিন্দুগণের বর্ণ-বিভাগের ন্যায় পারসিকগণের বর্ণ-বিভাগ—ব্রাহ্মণাদি নামের পরিবর্ত্তে সেই সেই বর্ণের নাম ও কার্য্য-প্রণালী;—হিন্দুর দেবদেবীর সহিত প্রাচীন পারসিকগণের দেবদেবীর সাদৃশ্য,—তাঁহাদের বিশেষণগত মিল ও পার্থক্য;—ধর্ম্মের সার-বিষয়ে সাদৃশ্য,—কতকগুলি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ঐক্য;—বিবিধ বিষয়ক আলোচনা।]

পরবর্ত্তি-কালে যে সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে পারসিকগণের ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু প্রাচীন পারসিকগণের এবং তাঁহাদের ধর্ম্মমতের মূল তথ্য অনুসন্ধান করিতে গেলে, কোন্ আদি-স্থানে উপনীত হই? অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয় না কি,—পারসিকগণের আদি-পুরুষ যাঁহারা, তাঁহারা এই ভারতেরই অধিবাসী ছিলেন এবং 'ক্রিয়াহীন'-হেতু ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া, পারস্যে গিয়া বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে এ বিষয়ের প্রমাণ দেখিতে পাই। মনু বলেন,—

(হিন্দু ও পারসিক।)

> "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়োঃ। বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ॥
> পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কম্বোজাঃ যবনাশকাঃ। পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাখশাঃ॥"

পারস্যের প্রাচীন নাম—পারদ। সংস্কারাদি ক্রিয়া-লোপহেতু কতকগুলি ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব লাভ করে এবং কালে যবনাদি নামে অভিহিত হয়। পারসিকগণ তাঁহাদেরই অন্যতম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলেন,—'জোরওষ্ট্রিয়ানিজম্ ধর্ম্মাবলম্বী পারসিকগণ আপনাদের 'আর্য্য' নাম অনেক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দ-আভেস্তায় আর্য্য-ধর্ম্মেরই অংশ-বিশেষ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।' ম্যাক্সমুলার অন্যত্র আবার বলিয়া গিয়াছেন,—'জোরওয়াষ্ট্রিয়ান-গণ উত্তর-ভারত হইতে গমন করিয়াই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।' * অধ্যাপক হীরেণ বলেন,—'প্রকৃত কথা কহিতে গেলে, জেন্দ-ভাষা সংস্কৃত-ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। মনুসংহিতায় পারসিকগণকে হিন্দুগণেরই অংশ—ক্ষত্রিয়-বংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া উল্লেখ আছে।' † পারস্যের আর এক প্রাচীন নাম—'ইরাণ'। ইরাণ-দেশের অধিবাসিগণ—

---

* "The Zoroastrians were a colony from Northern India."—Max Muller, *Lectures on Science of Language.*

† "In point of fact the Zind is derived from the Sanskrit, and a passage in Manu makes the Persians to have descended from the Hindus of the second or warrior caste."—Prof. Heeren, *Historical Researches.*

'ঐরাণ' নামেও পরিচিত। 'ইরাণ' ও 'ঐরাণ' শব্দদ্বয়ের মূল অনুসন্ধান করিলেই বা কি দেখিতে পাই? চন্দ্রবংশে ইড়ার গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয়। তাঁহার বংশধরগণ ইড়া-বংশোদ্ভব 'ঐড়' নামে অভিহিত হন। সেই ঐড়গণের বাসস্থান বলিয়া ঐড়ান বা ইড়ান (ইরাণ) নামের উৎপত্তি হওয়াই সম্ভবপর। সূর্য্যবংশীয়গণের সহিত চন্দ্রবংশীয়গণের বিবাদের ফলে, তাঁহাদিগকে এদেশ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, 'তুরাণ' ও 'ইরাণের' যুদ্ধ—চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয়গণের যুদ্ধ। তাঁহাদের মতে, 'সুর' ও 'সুরাণ' শব্দের অপভ্রংশে 'তুর' ও 'তুরাণ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ডক্টর হোগ, জোরওয়াষ্ট্রিয়ান ধর্ম্মের বিষয় তন্ন তন্ন আলোচনা করেন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সহিত প্রাচীন পারসিকগণের ধর্ম্মের যে অনেক সাদৃশ্য ছিল, তিনি তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বেদ এবং জেন্দ-আভেস্তায় পরিবর্ণিত দেবগণের নাম, বীরগণের নাম ও উপাখ্যান, যজ্ঞবিধি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচনা করিয়া, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বেদ-বর্ণিত বিষয় জেন্দ-আভেস্তার প্রাচীন অংশে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান; তদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি,—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের শাখা-প্রশাখার পরস্পর বিবাদের ফলে, প্রাচীন কালে, এই জোরওয়াষ্ট্রিয়ানিজম্ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। * কর্ণেল টড প্রাচীন মিডিয়া-রাজ্যের অভ্যুদয় বিষয়েও এবম্বিধ অভিমতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—'অজমেধের পাঁচ পুত্র ছিল। দুই পুত্র ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পিতৃ-স্মৃতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাহাদের পদবী 'মেধ' এবং তাহাদের বাসস্থানের নাম 'মেধ-দেশ' হইয়াছিল। সেই মেধদেশ—মেদেস হইতেই ক্রমে 'মিডিয়া' নামের উৎপত্তি হয়। প্রাচীন পারসিকগণ ভারতবর্ষ হইতে আফগানিস্থান-বেলুচিস্থানের পথে হিমালয় অতিক্রম করিয়া, পারস্যে উপনীত হন। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে এতদ্বিষয়ের আভাষ পাওয়া যায়। জেন্দ-আভেস্তার অন্তর্গত 'ভেন্দিদাদ' অংশে জোরওয়াষ্টারকে সম্বোধন করিয়া অহুরমজদ্ (হরমজ্দ্) বা ঈশ্বর বলিতেছেন,—'আমি মনুষ্যদিগের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট উর্ব্বর ভূ-খণ্ড প্রদান করিয়াছি। কেহই সেরূপ ভূ-খণ্ড-প্রদানে সমর্থ নহেন। সেই ভূ-খণ্ড পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় তারাদল সমুদিত হন।' ইহার পর, অন্যত্র দেখিতে পাই,—জামসেড নামক নেতার কর্তৃত্বাধীনে ঐ জাতি সেই পূর্ব্বস্থিত উচ্চ ভূ-খণ্ড হইতে জীব-জন্তু-মনুষ্যহীন সমতল ক্ষেত্রে উপনীত হন। এইরূপ অবস্থিতি ও গতির বিষয় আলোচনা করিয়া কাউণ্ট জোর্ণস-জারণা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'যে দেশ হইতে পারসিকগণ পারস্যে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, সে দেশ প্রাচীন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ—আফগানিস্থান ও কাশ্মীর ভিন্ন অন্য দেশ হওয়া সম্ভবপর নহে।' † ঐ প্রদেশ পারস্যের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত এবং পারস্যের

---

* "In the Vedas as well as in the older portion of the Zind Avesta, there are sufficient traces to be discovered that the Zoroastrian religion arose out of a vital struggle against a form which the Brahmanical religion had assumed at a certain early period."—Dr. Haug, *Essays on the Parsees*.

† "The country from which the Persians are said to have come can no other be than the north-west part of Ancient India."—Count Bjornstjerna, *Theogony of the Hindus*.

সমতল ভূ-খণ্ডের তুলনায় অত্যুচ্চ প্রদেশ, তাহাতে সন্দেহ নাই।' ফলতঃ, কিবা মন্বাদি শাস্ত্রের আলোচনায় কিবা প্রাচ্য বা প্রতীচ্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণের গবেষণায় সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়, পারস্যের প্রাচীন অধিবাসিগণের—যাঁহাদের ধর্ম্ম প্রাচীন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়, তাঁহাদের—পূর্ব্ব-পুরুষগণ ভারতেরই আদিম অধিবাসী ছিলেন।

ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের এবং পারস্যের প্রাচীন অধিবাসিগণের ভাষায়, ভাবের, আচার-ব্যবহারের এবং ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিষয়ক আলোচনায়, ভারতীয় আর্য্য-ধর্ম্মের—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের—হিন্দু-ধর্ম্মের মৌলিকত্ব এবং তাহারই অংশ-বিশেষ লইয়া ইরাণীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারি। প্রথম,—ধর্ম্মগ্রন্থের নামে, বিভাগে ও ভাষায় সাদৃশ্য।

অনুকরণের আভাষ।

হিন্দুদিগের আদি-ধর্ম্মগ্রন্থের নাম—বেদ। বেদ শব্দের মূল—'বিদ্' ধাতু। বিদ্ ধাতুর অর্থ—'জানা'। জেন্দ-আভেস্তা নামের মূল—জেন্দ+অবস্তা। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই নাম—নানারূপে ও বিভিন্ন শব্দ-সংযোগে উচ্চারিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় উহার নাম—কেহ বলেন জেন্দ-আভেস্তা, কেহ বলেন জেন্দাভেস্তা, কেহ বলেন জেন্দ-অবস্তা। ইংরাজীতে উহা সাধারণতঃ Zend Avesta রূপে উচ্চারিত হয়। উহার মৌলিক অর্থ-নির্ণয়ে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—'জেন্দ' শব্দ 'জান' (Zan) ধাতু অর্থাৎ সংস্কৃত 'জ্ঞা' ধাতু হইতে এবং 'আভেস্তা' শব্দ 'বিদ' ধাতুরই রূপান্তরে উৎপন্ন হইয়াছে। এ বিষয়ে অবশ্য মতান্তর আছে। ম্যাক্সমূলারের মত এক প্রকার; ডক্টর হোগের মত আর এক প্রকার। ম্যাক্সমুলার বলেন,—'জেন্দ' শব্দ সংস্কৃত 'ছন্দঃ" শব্দের অপভ্রংশ। বেদের ভাষাকে পাণিনি 'ছন্দঃ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসরণেই আভেস্তার ভাষাকে পারসিকগণ "জেন্দ" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকিবে। ছন্দঃ ও জেন্দ একই ভাবাত্মক।* তাঁহার মতে, 'আভেস্তা"—'অবস্থা' শব্দের রূপান্তর। উহার দ্বারা স্থিতি বুঝায়। যাহা হউক, সাধারণতঃ এখন আভেস্তা শব্দে 'জ্ঞান' এবং জেন্দ শব্দে 'ভাষা' বা 'ব্যাখ্যা' অর্থ পরিগ্রহ হইয়া থাকে। অর্থাৎ,—জেন্দ-ভাষায় যে জ্ঞানের কথা আছে, তাহারই নাম—'জেন্দ-আভেস্তা'; অথবা, 'বৈদিক ছন্দঃ' এই নামের অনুকরণেই 'জেন্দ-আভেস্তা' নামকরণ হইয়া থাকিবে। জেন্দ-আভেস্তা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম—যশ্ন; ঐ শব্দ সংস্কৃত 'যজন্' বা 'যজ্ঞ" শব্দের রূপান্তর। বৈদিক সূক্তে দেবতাদিগের স্তব এবং যজ্ঞাহুতির যে পরিচয় পাই, যশ্নেও সেই পরিচয় বিদ্যমান। উহা দেবতার স্তব। যশ্নের প্রাচীনতম অংশের নাম—'গাথা' বা উপাসনা। গাথা পাঁচটী মাত্র। দ্বিতীয়—ভেন্দিদাদ বা বন্দিদাত। এই অংশে ধর্ম্মনীতি বিষয়ে উপদেশ আছে। অহুরমজদ্ অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত জোরওয়াষ্টারের বা জরথুস্ত্রের কথোপকথন ছলে উহা লিখিত। ভেন্দিদাদ্ শব্দে দৈত্যনাশক বা পাপনাশক অর্থ উপলব্ধি হয়। তৃতীয়,—যস্ত বা যষৎ। বিশেষ বিশেষ দেবতার উপাসনা-মন্ত্র এই অংশে বিহিত হইয়াছে। পুরোহিত এবং গৃহস্থ উভয়ে সমসময়ে বিশেষ বিশেষ কালে এই উপাসনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বেদ যখন তিন

* Prof. Mx-Muller, *Chips fram a German Workshop.*

ভাগে বিভক্ত ছিল, তখন উহা 'ত্রয়ী' নামে অভিহিত হইত। তখনকার আদর্শে জেন্দ-আভেস্তার ত্রিবিধ বিভাগ হওয়ার বিষয় মনে আসিতে পারে। পার্শীগণ আজি পর্য্যন্ত উপাসনায় জেন্দ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস—জেন্দ-ভাষায় লিখিত স্তোত্র মোহিনী-শক্তি-সম্পন্ন। সাধারণ ভাষায় সে স্তোত্র অনুবাদ করিয়া উচ্চারণ করিলে তাহাতে কোনই ফললাভ হয় না। এ বিষয়েও হিন্দুর সহিত তাঁহাদের সাদৃশ্য। আমাদের স্তোত্রাদি সংস্কৃতে উচ্চারিত হয়। সংস্কৃতে লিখিত স্তোত্রকেই হিন্দু অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভাষার এবং ভাবের সাদৃশ্য দেখিয়াও একে অন্যের অস্ফুট প্রতিকৃতি পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। শব্দ-তত্ত্বের আলোচনায় ডক্টর হোগ, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ যে সাদৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহার একটু আভাষ প্রদান করিতেছি। জেন্দ ও সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সমূহ আলোচনা করিয়া সার উইলিয়ম জোন্‌স্ দেখিয়াছেন,—জেন্দ-ভাষার দশটী শব্দের মধ্যে ছয়টী সাতটী সংস্কৃত শব্দ। এমন কি, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে প্রত্যয়াদির যোগে জেন্দ শব্দ সমভাবে সংস্কৃত শব্দের ন্যায় রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ডক্টর হোগ ভাষাগত এই সাদৃশ্যের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—'গ্রীক-ভাষার অন্তর্গত ইওলিক, আইওনিক ও ডোরিক বা আটিক ভাষার যেমন গ্রীক ভাষার সহিত সাদৃশ্য; সংস্কৃতের সহিত আভেস্তার ভাষারও সেইরূপ সাদৃশ্য আছে। ব্রাহ্মণদিগের স্তবস্তোত্র ও পারসিকদিগের স্তোত্র—উভয়ের ভাষার সাদৃশ্য-তত্ত্ব আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এক জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন দুইটী জাতির ভাষা ঐ দুইরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। আইওনিয়ান, ডোরিয়ান, ইওলিয়ান—গ্রীস-দেশের অধিবাসী। তাঁহাদের সাধারণ নাম—'হেলেন্‌স্'। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ সাদৃশ্য, প্রাচীন পারসিক এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ পরস্পর সেইরূপ সম্বন্ধ-যুক্ত বলিয়া মনে হয়। বেদে যেমন হিন্দুগণ আর্য্য বলিয়া অভিহিত, জেন্দ-আভেস্তায় পারসিকগণ সেইরূপ আর্য্য নামে পরিচিত হইয়া আছেন।' ব্যাকরণগত সাদৃশ্য বিষয়ে ডক্টর হোগ কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—সংস্কৃতের 'অস্মৈ,' 'কস্মৈ,' 'যস্মাম' প্রভৃতি রূপ, জেন্দ ভাষায় 'অহ্মৈ,' 'কহ্মৈ,' 'যৈহ্মাম' প্রভৃতি মূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছে। সংস্কৃতের শব্দ-রূপের ন্যায় জেন্দ-ভাষায় শব্দ-রূপেরও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতের 'শ্বন' শব্দ এবং জেন্দ ভাষার 'স্পন' শব্দ একার্থ-বোধক। উভয় শব্দেই 'কুক্কুর' বুঝায়। সংস্কৃত শ্বন্ শব্দের রূপে, প্রথমার একবচনে 'শ্বা'; জেন্দ-ভাষায় স্পন শব্দের প্রথমার একবচনে 'স্পা'। শ্বন্ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে 'শ্বানম', স্পন্ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে 'স্পানম্'। চতুর্থীর একবচনে উভয়ের তুল্যরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যথা,—শুনে (সংস্কৃত) ও স্থনে (জেন্দ)। জেন্দ-ভাষার 'পথন্' এবং সংস্কৃত ভাষার 'পথিন্'—উভয় শব্দ একার্থ-বোধক; রূপও প্রায় একই প্রকার। ঐ শব্দের প্রথমার একবচনে সংস্কৃতে 'পন্থা', জেন্দ ভাষায় 'পন্তা'; প্রথমার বহুবচনে সংস্কৃতে 'পন্থানঃ,' জেন্দ-ভাষায় 'পন্তানো' ইত্যাদি। অধ্যাপক বোপের সাদৃশ্য-তত্ত্ব-বোধক ব্যাকরণ এবং ইউজেন বার্ণুফের গ্রন্থাদির আলোচনায়, ম্যাক্সমূলার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণের ও অভিধানের সহিত জেন্দ-ভাষার ব্যাকরণের ও

অভিধানের যেরূপ সাদৃশ্য আছে, ইন্দো-ইউরোপীয় কোনও ভাষায় কোনও গ্রন্থের সহিত উহার তদ্রূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্য একটী বর্ণের পরিবর্ত্তন করিলে, উভয় ভাষার শব্দের অভিন্নত্ব সহজেই উপলব্ধি হয়।

১। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের 'স', জেন্দ ভাষায় 'হ'-রূপে পরিবর্ত্তিত। যেমন,—

সংস্কৃত।—অসুর, সোম, সপ্ত, মাস, সেনা, অস্মি, সন্তি, অসু, বিবস্বত।

জেন্দ।— অহুর, হোম, হপ্ত, মাহ, হেনা, অহ্মি, হন্তি, অহু, বিবহ্বত।

২। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের 'হ', জেন্দ ভাষায় 'জ' রূপে পরিবর্ত্তিত হয়; যথা,—

সংস্কৃত।—হৃদয়, হস্ত, বরাহ, হোতা, আহুতি, হিম, হ্বে, বাহু, অহি, মেধা।

জেন্দ।—জরদয়, জস্ত, বরাজ, জোতা, আজুতি, জিম, জ্বে, বাজু, অজি, মেজ্দা।

৩। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের শ্ব, জেন্দ-ভাষায় 'স্প'-রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন,—

সংস্কৃত।—বিশ্ব, অশ্ব, শ্বন্, কৃশাশ্ব।

জেন্দ।—বিস্প, অস্প, স্পন, কৃশাস্প।

৪। সংস্কৃত শ্ব বা স্ব সময় সময় জেন্দ-ভাষায় 'কিউ' রূপে উচ্চারিত হয়। যথা,—

সংস্কৃত।—শ্বসুর, স্বপ্ন, স্বাপ। } শেষোক্ত দুইটী শব্দের
জেন্দ।—কিউস্নুর, কোফ্ন, ক্বাব। } একটু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

৫। সংস্কৃত 'ত' জেন্দ ভাষায় 'থ'-রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা,—

সংস্কৃত।—মিত্র, ত্রিত, ত্রৈতান, মন্ত্র।

জেন্দ।—মিথ্র, ত্রিথ, থ্রৈতান, মন্থ্র।

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ জেন্দ ভাষায় অপরিবর্ত্তিতরূপে অবস্থিত। যথা,—
পিতর, মাতর, ভ্রাতর, দুহিতর, পশু, গো (গাউ), উক্ষণ, স্থুর (স্থোরায়া), মক্ষী, শরদ, বাত, অভ্র, যব, বৈদ্য, ঋত্বিজ, নমস্তে, মনস, যম (জিম), বরুণ, বৃত্রহন্ (বৃত্রঘ্ন), বায়ু, অর্য্যমন, অর্ম্মতি, ইষু, রথ, রথস্থ, গন্ধর্ব্ব, অথর্ব্বন, গাথা, ইষ্টি, আপানপাৎ, ছন্দঃ (জেন্দ), অবস্তা (আবেস্তা), ইন্দ্র, দেব, জন, বজ্র, জিহ্বা (হিহ্বা), অজ্ঞ, জানু, যজ্ঞ (যশ্ন), যজৎ ইত্যাদি।

উল্লিখিত তালিকায় ছন্দ, অবস্থা, যজ্ঞ প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের সামান্য পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই; নচেৎ, সকল শব্দই এক-রূপাত্মক। অর্থ-বিষয়েও দুই তিনটী শব্দ ভিন্ন সকল গুলিতেই ঐক্য দৃষ্ট হয়। যে কয়েকটী শব্দের অর্থে বিপরীত ভাব দেখিতে পাই, তাহাতে প্রাচীন পারসিকগণের সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের সম্বন্ধেরই কথাই মনে আসে। দৃষ্টান্তস্থলে তিনটী শব্দের উল্লেখ করিতেছি। যথা,—দেব, ইন্দ্র, অহুর। আমরা যে অর্থে দেব শব্দ ব্যবহার করি, পারসিকগণ ঐ শব্দে তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের অসুর বা অহুর সদ্‌গুণের আধার। আমরা দেব শব্দে যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহারা অহুর বা অসুর শব্দে তাহাই বুঝে। দেব শব্দ তাহাদের নিকট অতি হেয়-অর্থ-জ্ঞাপক। আমরা অসুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি শব্দে যে অর্থ যে ভাব উপলব্ধি করি; পারসিকগণ দেব শব্দে সেই অর্থ সেই ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে।

দেবাসুরের যুদ্ধ—অনেকে তাই মনে করেন—ভারত হইতে বিতাড়িত পারসিকগণের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের বিরোধ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তাঁহাদের মতে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ হেতু পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন। ভারতীয় আর্য্যগণ, ভারত হইতে বিতাড়িত ক্রিয়াহীন ব্যক্তিগণকে 'অসুর' নামে অভিহিত করিয়া তাঁহাদিগকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, বিতাড়িত ব্যক্তিবর্গও ভারতীয় আর্য্যগণকে সেইরূপ বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করিতেন। অসুর এবং দেব শব্দের দুই দেশের দুইরূপ বিপরীত অর্থে, এই ভাবই মনোমধ্যে আসিতে পারে। সে হিসাবে, হিন্দুদিগের দেবদেবীগণকে প্রাচীন পারসিকগণ অপকর্ম্মকারী বলিয়া মনে করিতেন; দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের নিকট 'অপকর্ম্মকারীদিগের রাজা' বলিয়া অভিহিত হইতেন। কেহ কেহ বলেন,—প্রাচীন আসিরীয়া রাজ্য 'অসুর-রাজ্যের' নামান্তর। অসুর-রাজ্য হইতে 'অসুরীয়া' বা 'আসুরীয়া' নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। পারসিকগণের গ্রন্থে ভারতবর্ষকে অর্থাৎ হিন্দুগণের রাজ্যকে 'দেবরাজ্য' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। হিন্দুগণের গ্রন্থেও সেইরূপ ভারত হইতে বিতাড়িত ক্রিয়াহীন জাতিগণের রাজাকে 'অসুর-রাজ্য' বলিয়া অভিহিত করা হইত। এ সকল অবশ্য বিচার-বিতর্কের কথা। পণ্ডিতগণ বলেন,—বৈদিক ভাষায় এবং গাথার ভাষায় অনেকটা যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রাচীন পারসিকগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনাদের ধর্ম্মকর্ম্ম বিস্মৃত হন নাই; কেবল জলবায়ু ভেদে, উচ্চারণের তারতম্যে, শব্দের অনেকটা পার্থক্য ঘটিয়াছিল; নহিলে, বাক্যে পর্য্যন্ত সাদৃশ্য বিদ্যমান। যথা,—

সংস্কৃত।	জেন্দ।
বিশ্ব দ্রুহ্বো জিনবতি।	বিস্প দ্রুক্ষ জনৈতি।
বিশ্ব দ্রুহোক নশ্যতি।	বিস্প দ্রুক্ষ নাশৈতি।
যদা শৃণোতি এতাং বাচং।	যথা হনোতি ঐষাম বাচম্।

অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন সংস্কৃতের সহিত প্রাচীন জেন্দের এই ভাবের সাদৃশ্য সর্ব্বথা পরিলক্ষিত হয়। বেদের এবং জেন্দ-আভেস্তার ছন্দ-সম্বন্ধে সাদৃশ্যের কথায় এবং জেন্দ-আভেস্তার অনুসরণকারী জনগণ আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ায়, প্রাচীন পারসিকদিগের সহিত ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের সম্বন্ধের কথা স্বতঃই মনে আসে। তাহাতে মন্বাদি-কথিত ক্রিয়াহীন পারদাদি জাতির সহিত তাঁহাদের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

প্রাচীন পারসিকগণের আচার-ব্যবহারে এবং সমাজ-বন্ধনে আর্য্যগণের অনুসরণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের বিভাগ ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বর্ণ-বিভাগ ভারতের নিজস্ব; তাহাতে কোনই সংশয় নাই। বেদে যে বর্ণ-বিভাগের কথা দেখিতে পাই, জেন্দ-আভেস্তায়ও সেইরূপ বর্ণ-বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে দেখিতে পাই,—সেই পরম পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ,

বর্ণ-বিভাগে।

বাহু-যুগলে, রাজন্য, উরুদ্বয়ে বৈশ্য এবং পদযুগলে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল; যথা,—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ॥

কেবল ঋগ্বেদে বলিয়া নহে; এই উক্তি সংহিতায়, পুরাণে, মহাভারতে—হিন্দুগণের শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান। ইরাণীয়গণের জেন্দ-আভেস্তা গ্রন্থেও ঠিক এইরূপ চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে সেই চারি বর্ণের নাম—যদিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহে; কিন্তু একই অর্থজ্ঞাপক। সেই বর্ণ-চতুষ্টয়ের নাম,—(১) অথর্ব্ব অর্থাৎ পুরোহিত, (২) রথেষ্টন অর্থাৎ যোদ্ধা, (৩) ভস্ত্রীয়োস্ত্রীয় অর্থাৎ কৃষিজীবী, (৪) হুইট্‌স অর্থাৎ শ্রমজীবী। জেন্দ-আভেস্তার প্রসিদ্ধ অনুবাদক অধ্যাপক ডারমেষ্টেটর এ বিষয় আরও বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'জেন্দ-আভেস্তার বর্ণ-বিভাগের বিষয় আলোচনা করিলে উহাকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বর্ণ-বিভাগের অনুসরণ বলিয়া স্পষ্টতঃ মনে হয়।'* জেন্দ-আভেস্তার পর পারসিকগণের অপরাপর যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল, তাহাতেও এই বর্ণ-বিভাগের প্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে। তবে সেখানে ঐ বর্ণ-চতুষ্টয়ের নাম অন্য-রূপ দৃষ্ট হয়; যথা,—হোরিস্তরণ, মুরিস্তরণ, সোরিস্তরণ প্রভৃতি। এই নাম-চতুষ্টয় আবার পহ্লবী-দিগের নিকট যথাক্রমে,—রথোরনান, রাথেস্তারাণ, বস্তারোসান ও হোৎখান নাম পরিগ্রহ করিয়া আছে। ঐ বর্ণ-বিভাগে আর এক অভিনব অনুকরণ বা সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ভারত-বর্ষে দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) উপবীত-ধারণে অধিকারী। প্রাচীন পারসিকগণেরও প্রথমোক্ত তিন বর্ণ—অথর্ব্ব, রথেষ্টন এবং ভস্ত্রীয়োস্ত্রীয় প্রকারান্তরে উপবীত গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের সেই উপবীতের নাম—'কুষ্টি'। ভেন্দিদাদে জরথস্ত্রের সহিত অহুর-মজদের যে কথোপকথন দৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রকাশ,—যাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে 'কুষ্টি' ধারণ না করে, গাথা উচ্চারণে বিরত থাকে এবং সলিলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যদি উপবীত গ্রহণ না করেন, বেদ-পাঠে বিরত থাকেন, সন্ধ্যাহ্নিকে উদাসীন হন, তাঁহাদের অপরাধের ও প্রায়শ্চিত্তের বিষয় আমাদের শাস্ত্রাদিতে যাহা লিখিত আছে;—ভেন্দিদাদের উক্ত অংশে তাহারই অনুসরণ বলিয়া মনে হয় না কি?

দেব ও অসুর।

দেবদেবীর উপাসনা সম্বন্ধেও প্রাচীন পারসিকগণকে ভারতীয় আর্য্যগণের সম্পূর্ণ অনুসারী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। পারসিকগণ প্রধানতঃ অগ্নির উপাসক। তাঁহাদের অগ্নি-পূজা আমাদের যজ্ঞাহুতিরই রূপান্তর। তাঁহাদিগকে কেবল অগ্নির উপাসকই বা বলি কেন?—সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি আর্য্য-হিন্দুগণের উপাস্য প্রায় সকল দেবতাই প্রাচীন পারসিকগণের উপাস্য দেবতা ছিলেন বলিয়া পরিচয় পাই। সেই নাম, সেই বিশেষণ—সকলই অপরিবর্ত্তিত। পার্থক্যের মধ্যে কেবল—আর্য্য-হিন্দুগণ যাঁহাদিগকে 'দেব' বলিয়া অভিহিত করিতেন, পারসিকগণের নিকট তাঁহারা

* "We find in it a description of the four classes which strikingly reminds one of the Brahmanical account of the origin of castes and which are certainly borrowed from India."—Prof. Darmestater, in his *Translation of Zend Avesta.*

'অসুর' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। এই 'অসুর' সংজ্ঞাও যে তাঁহাদের কল্পনা-প্রসূত বা তাঁহাদেরই মৌলিক, তাহাও বলিতে পারি না। 'অসুর' শব্দ অতি প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষেও দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইত। অসুর শব্দে দেবতাগণকেও বুঝাইত, আবার অসুর শব্দে দৈত্যগণকেও বুঝা যাইত। ঋগ্বেদে অসুর শব্দ অন্যূন সত্তর বার ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম অষ্টকে সাত বার, দ্বিতীয় অষ্টকে দশ বার, তৃতীয় অষ্টকে সাত বার, চতুর্থ অষ্টকে দ্বাদশ বার, পঞ্চম অষ্টকে আট বার, ষষ্ঠ অষ্টকে আট বার, সপ্তম অষ্টকে ছয় বার এবং অষ্টম অষ্টকে অষ্টাদশ বার 'অসুর' শব্দ দৃষ্ট হয়। কোন্ অষ্টকে কি সম্বন্ধে অসুর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী বিশদ তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

১। প্রথম অষ্টকে,—

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
১ম	২৪শ	১৪শ	বরুণ
„	৩৫শ	৭ম	সূর্য্যরশ্মি
„	৩৫শ	১০ম	সবিতা
„	৫৪শ	৩য়	ইন্দ্র
„	৬৪শ	২য়	মরুদ্গণ
„	১০৮ম	৬ষ্ঠ	ঋত্বিকগণ
„	১১০ম	৩য়	ত্বষ্টা

২। দ্বিতীয় অষ্টকে,—

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
১ম	১২২ম	১ম	রুদ্র
„	১২৬ম	২য়	ভাবযব্য রাজা
„	১৩১ম	১ম	স্বর্গলোক
„	১৫১ম	৪র্থ	মিত্র ও বরুণ
„	১৭৪ম	১ম	ইন্দ্র
২য়	১ম	৬ষ্ঠ	রুদ্র
„	২৭শ	১০ম	বরুণ
„	২৮শ	৭ম	বরুণ
„	৩০শ	৪র্থ	বৃকদ্বরঃ অসুর
৩য়	৩য়	৪র্থ	অগ্নি

৩। তৃতীয় অষ্টকে,—

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
৩য়	২৯শ	১৪শ	অরণি
„	৩৮শ	৪র্থ	ইন্দ্র
„	৫৩শ	৭ম	রুদ্র
„	৫৫শ	১ম-১০ম	অসুরত্ব = ক্ষমতা
„	৫৬শ	৮ম	সম্বৎসর
৪র্থ	২য়	২৫শ	অগ্নি
„	৫৩শ	১ম	সবিতা

৪। চতুর্থ অষ্টকে,—

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
৫ম	১২শ	১ম	অগ্নি
„	১৫শ	১ম	অগ্নি
„	২৭শ	১ম	ত্র্যরুণ, অগ্নি, রাজপুত্র
„	৪১শ	৩য়	রুদ্র, সূর্য্য, বায়ু
„	৪২শ	১ম	বায়ু
„	৪২শ	১১শ	রুদ্র
„	৪৯শ	২য়	সবিতা
„	৫১শ	১১শ	পূষা
„	৬৩শ	৩য়	মিত্র ও বরুণ
„	৬৩শ	৭ম	মিত্র ও বরুণ
„	৮৩শ	৬ষ্ঠ	পর্জ্জন্য
„	১২শ	৪র্থ	অসুরঘ্ন = ইন্দ্র

৫। পঞ্চম অষ্টকে,—

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
৭ম	২য়	৩য়	অগ্নি
„	৬ষ্ঠ	১ম	বৈশ্বানর
„	১৩শ	১ম	অসুরঘ্ন = ইন্দ্র
„	৩০শ	৩য়	অগ্নি
„	৩৫শ	২য়	মিত্র ও বরুণ
„	৫৬শ	২৪শ	বীর
„	৬৫শ	২য়	মিত্র ও বরুণ
„	৯৯ম	৫ম	বর্চী

৬। ষষ্ঠ অষ্টকে,—

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
৮ম	১৯শ	২৩শ	সূর্য্য
,,	২০শ	১৭শ	মেঘ বা বল
,,	২৫শ	৪র্থ	মিত্র ও বরুণ
,,	২৭শ	২০শ	দেবগণ
,,	৪২শ	১ম	বরুণ
,,	৯০শ	৬ষ্ঠ	ইন্দ্র
,,	৯৬শ	৯ম	বলবান শত্রু
,,	৯৭শ	১ম	ঐ

৭ম। সপ্তম অষ্টকে,—

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
৯ম	৭৩শ, ৭৪শ	১ম, ৭ম	সোম
,,	৯৯শ	১ম	ঐ
,,	১০শ	২য়	স্বর্গধারী দেব
,,	১১শ	৬ষ্ঠ	পুরোহিত
,,	৩১শ	৬ষ্ঠ	যজ্ঞ

৮। অষ্টম অষ্টকে,—

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
১০ম	৫৩শ	৪র্থ	বলবান শত্রু
,,	৫৫শ	৪র্থ	অসুরত্ব=ক্ষমতা
,,	৫৬শ	৬ষ্ঠ	সূর্য্য
,,	৭৪শ	২য়	প্রবল
,,	৮২শ	৫ম	দেবগণ
,,	৯২শ	৬ষ্ঠ	মেঘ
,,	৯৩শ	১৪শ	রামরাজা
,,	৯৬শ	১১শ	ইন্দ্র
,,	৯৯শ	২য়	অসুরত্ব=বল
,,	৯৯শ	১২শ	ইন্দ্র
,,	১২৪ম	৩য়	দেবগণ
,,	১২৪ম	৫ম	ঐ
,,	১৩২ম	৪র্থ	মিত্র
,,	১৩৮ম	৩য়	দেবশত্রু
,,	১৫১ম	৩য়	ঐ
,,	১৫৭ম	৪র্থ	ঐ
,,	১৭০ম	২য়	ঐ
,,	১৭৭ম	১ম	ঐ

অসুর শব্দের এবম্বিধ প্রয়োগের বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়,—ঐ শব্দ প্রথমে দেবতা ও দেবদ্বেষী—সৎ ও অসৎ—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইত। পারসিকগণ যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা 'সৎ" অর্থেই—আপনাদিগকে সৎ বলিয়া পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যেই—আপনাদের উপাস্য দেবতার বিশেষণরূপে ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ শব্দ আপনাদের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিলে, পরবর্ত্তি-কালে ভারতবর্ষে ঐ শব্দের একমাত্র 'অসৎ' অর্থই প্রচারিত হইয়া পড়ে। কারণ, আর্য্য-হিন্দুগণের দৃষ্টিতে ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণ-দর্শনে-বঞ্চিত ঐ পারদাদি জাতিকে অসৎ বলিয়াই মনে হইয়াছিল এবং তাঁহারা অসুর-শব্দ আপনাদের বিশেষণরূপে ব্যবহার করায় ঐ শব্দের অর্থ পর্য্যন্ত এ-দেশে সম্পূর্ণ-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। শব্দার্থের এরূপ পরিবর্ত্তন, সকল দেশের সকল ভাষায়ই সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হয়। বেদে ঐ শব্দ দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইলেও পুরাণাদিতে উহার 'সৎ' অর্থ সাধারণতঃ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। শব্দ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, শব্দার্থের এরূপ ব্যতিক্রম ঘটার দৃষ্টান্তাভাব নাই। যাঁহারা মনে করেন, ঋগ্বেদ ঋষিগণের রচিত এবং উহার প্রথম কয়েক মণ্ডলের পর অন্যান্য: মণ্ডল লিখিত হইয়াছিল, তাঁহারা অসুর শব্দের অর্থ এবং প্রাচীন পারসিকগণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন,—"আদিম আর্য্যগণ উপাস্যদিগকে অসুর বা দেব বলিতেন। পরে সেই আর্য্যদিগের মধ্যে একটী বিবাদ ও বিচ্ছেদ হইয়া দুইটী দল হইল এবং এক দলের লোক অন্য দলের উপাস্যদিগকে

নিন্দা করিতে লাগিল। সেই দুই দলের এক দল ভারতবর্ষে আসিলেন। তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুগণ; অন্য দলে ইরাণীয়গণ। ইরাণীয়গণ উপাস্যদিগের সাধারণ নাম 'অসুর' দিলেন এবং হিন্দুদিগের উপাস্য দেবগণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণ উপাস্যদিগের নাম 'দেব' দিলেন এবং ইরাণীয়দিগের উপাস্য অসুরদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেবল উপাস্যদিগের সাধারণ নাম ধরিয়াই পরস্পর নিন্দা চলিতে লাগিল; বরুণ, মিত্র, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, বৃত্রহন্তা, অর্য্যমা, সোম প্রভৃতি যাঁহারা প্রাচীন আর্য্যদিগের উপাস্য ছিলেন, উভয় দলই তাঁহাদের উপাসনা করিতে লাগিলেন; হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে 'দেব' বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন; ইরাণীয়গণ তাঁহাদিগকে 'অহুর' বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং কেবল দেব ও অসুর এই সাধারণ নাম লইয়া দুই দলে বিবাদ।...ঋগ্বেদের প্রারম্ভে অসুর শব্দ কেবল দেবগণের সম্বন্ধেই প্রয়োগ হইয়াছে, দানবদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় নাই। ঋগ্বেদের মধ্যে ও শেষভাগে অসুর শব্দ কখনও দেবগণের সম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়াছে, কখনও দানবগণের সম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়াছে। বোধ হয়, ইরাণীয় ও হিন্দুগণের মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদ হইবার পর উভয় জাতি উপাস্যদিগকে দেব ও অসুর এই উভয় নামেই অনেক দিন সম্বোধন করিতেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার অনেক অংশই সেই সময়ে রচিত। তাহার পর যেমন বিবাদ বাড়িতে লাগিল, ইরাণীয়গণ তখন দেবগণের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। ইরাণীয়দিগের 'অবস্থা' এবং হিন্দুগণের ঋগ্বেদের শেষভাগ এবং ব্রাহ্মণ, উপনিষদাদি এই সময়ে রচিত।" * উপরি-উদ্ধৃত অংশ সর্ব্বথা অনুমোদিত না হইলেও উহার দ্বারা এক হইতে অন্যের বিচ্ছিন্ন হওয়ার যুক্তিই সমর্থিত হইতেছে। উহা হইতে আরও একটু সূক্ষ্ম-তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে। ঋগ্বেদে অসুর শব্দ দেবদ্বেষী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিলাম। পারসিকগণ ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া যখন যজ্ঞাদির প্রক্রিয়ার বা পূজাবিধির পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন, অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণাদর্শন'-হেতু ক্রিয়াহীন হইয়া তাঁহারা যখন বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অক্ষম হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে 'অসুর' বা 'দেবশত্রু' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। হিন্দুদিগের নিকট এইরূপে অসুর অর্থাৎ দেবশত্রু নামে অভিহিত হইয়া পারসিকগণ যখন বিদেশবাসী হইলেন, তখন তাঁহারা 'অসুর' শব্দের অন্য অর্থ (যে অর্থে অসুর শব্দে সদ্‌গুণবিশিষ্ট দেবগণকে বুঝায়) পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন; অধিকন্তু 'দেব' শব্দের বিপরীত অর্থ সূচিত করিয়া দিলেন। এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, হিন্দুগণের নিকট পারসিকগণ প্রথমে অসুর নামে অভিহিত হন এবং পরিশেষে আপনাদের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য ঐ শব্দের সদ্‌গুণবোধক অর্থ প্রচার করেন। অসুর শব্দের উৎপত্তি— 'অস্' ধাতু হইতে। 'অস্' ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ করা ও দীপ্তি পাওয়া। দেব উদ্দেশে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইলে, উহাতে 'দীপ্তিমান্' অর্থ সূচিত হইত, আবার দেবদ্বেষী অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইলে উহাতে 'অনিষ্ট-ক্ষেপণশীল' (সায়ণাচার্য্যের মতে) অর্থ বুঝা যাইত। সায়ণ 'অসুর' শব্দের চতুর্ব্বিধ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন —(১) "অসুরঃ শত্রূনাং নিরসিতা"

* রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের টীকা দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ শত্রুবিনাশক; (২) "যদ্বা অসুঃ প্রাণো বলং বা তদ্বানঃ" অর্থাৎ বলবান; (৩) বৃষ্টিদাতা; এবং (৪) অনিষ্ট-ক্ষেপণশীল।" শেষোক্ত অর্থই এখন প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, পারসিকগণ অসুর (অহুর) শব্দে সদ্‌গুণের আধার অর্থাৎ আমাদের আদর্শ দেবতা এবং অহুর মজ্‌দ্ (হরমজ্‌দ্) শব্দে সদ্‌গুণের শ্রেষ্ঠ আধার অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন।

দেবগণের সাধারণ সংজ্ঞা বিষয়ে পারসিকগণের এবং হিন্দুগণের মধ্যে বিপরীত শব্দ প্রচারিত থাকিলেও উপাস্য দেবতার নাম, দুই এক স্থল ভিন্ন, উভয়ত্রই অপরিবর্তিত।

দেবগণের সাদৃশ্য।

পারসিক-দিগের কয়েকটী দেবতার নাম—ঐর্য্যামন্, মিথ্র বা মিথ্‌রা, বেরেথ্রঘ্ন (বৃত্রঘ্ন), বয, অতর, নর্য্যসংহ, যিম প্রভৃতি। পারসিকগণের প্রধান উপাস্য দেবতা—অগ্নি। অগ্নি-দেবতাকে তাঁহারা যে অগ্নি-দেবতা নামেই পূজা করিতেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা অগ্নি-দেবতাকে 'অতর' বলিতেন। তাঁহারা অগ্নিদেবতাকে নর্য্যসংহও (নর্য্যসঙ্ঘ) বলিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োদশ সূক্তে বহু নামে অগ্নি দেবতাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার উপাসনা করা হইয়াছে। অগ্নিদেবের সেই নাম—সুসমিদ্ধ, তনূনপাৎ, নরাসংস, ইলা, বর্হিঃ, দেবীদ্বার, নক্ত, উষা, দেব্যোহোতারৌ, সরস্বতী, মহী, ত্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহা। এই সকল নামের নরাসংস অর্থাৎ মানব-প্রশংসিত নামটী জেন্দ-আভেস্তায় নর্য্যসংহ নামে পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে, আবার বুঝা যায়, যিনি অহুর মজ্‌দ্, তিনিই অগ্নি, তিনিই নর্য্যসংহ। কি ভাবে অগ্নি-দেবতার স্তুতি জেন্দ আভেস্তায় লিখিত আছে, তাহার একটু বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"আমরা অহুরো মজ্‌দের পুত্র অতরকে যজ্ঞ প্রদান করি। আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি; রাজাদিগের নাভিতে যিনি বাস করেন, সেই নর্য্যসংহকে (নৈর্য্যসঙ্ঘকে) আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।" একই অগ্নি দেবতা; প্রায় একই প্রকার যজ্ঞাহুতির প্রণালী; কিন্তু দেবতার নাম রূপান্তরিত। 'পানি', 'ওয়াটার', 'জল' প্রভৃতি বিভিন্ন-সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও, ঐ সকল শব্দ দ্বারা যেমন একই সামগ্রীকে বুঝাইয়া থাকে; সেইরূপ নামের বিভিন্নতা থাকিলেও পারসিকগণের মধ্যেও অস্মদ্দেশ-প্রচলিত সেই অগ্নি-দেবতার পূজাই দেখিতে পাই। * অগ্নিদেবের স্তব ঋগ্বেদের প্রথমেই আছে, যজ্ঞে অগ্নিকেই প্রধান স্থান প্রদান করা হইয়াছে এবং অগ্নি

---

* অগ্নির আরও অনেক নাম আছে। অগ্নির নাম—যুহ্বত, সপ্তার্চি, যুহ্বাস্য, যুবা, প্রমন্থ, ভরণ্যু, উল্কা প্রভৃতি। তাঁহার যুবা নাম হইতে যবিষ্ঠ অর্থাৎ দেবগণের শ্রেষ্ঠ নামের উদ্ভব। পণ্ডিতগণ বলেন,—এই যবিষ্ঠ হইতেই হেলেনিক বা গ্রীকগণের 'হেফাইষ্টো' (Haphaistos) নামের উৎপত্তি। অগ্নির 'প্রমন্থ' নাম হইতে গ্রীকদিগের 'প্রমেথিউস' (Prometheus), ভরণ্যু হইতে 'ফোরোনিয়স' (Phoroneus), উল্কা হইতে 'ভল্কান' (Vulcan), এবং অগ্নি হইতে 'ইগ্নিস' (Ignis) ও 'ওগ্নি' (Ogni) প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। "In this name Yavishtha, we may recognise the Hellenic Hephaistos......And we have Prometheus answering to Pramantha, Phoroneus to Bharanyu, and the Latin Vulcanus to the Sanskrit Ulka."—Cox's *Mythology of the Aryan Nation.* "Agni is the God of fire; the Ignis of the Latins, the Ogni of the Sclavonians"—Muir's *Sanskrit Texts.* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই মতই রমেশচন্দ্র দত্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

পুরোহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অগ্নির প্রাধান্যের বিষয় পারসিকগণের উপাসনায়ও প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। অগ্নির ন্যায় বায়ু-দেবতার উপাসনা আর্য্য-হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পারসিকগণও সে উপাসনার অনুসরণ করিয়াছিলেন। পারসিকদিগের জেন্দ-আভেস্তায় বায়ুর নিকট বর-প্রার্থনার এবং তাঁহার বরদানের বিষয় যাহা লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—'এই বায়ুকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। এই বায়ুকে আমরা আহ্বান করি। বীর্য্যবান আথ্যকুলের উত্তরাধিকারী থ্রেতেওন (সংস্কৃত—ত্রিত বা ত্রৈতন) চতুষ্কোণ বরণ প্রদেশে (সংস্কৃত—বরুণ) একটী সুবর্ণ-সিংহাসনে যজ্ঞ প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার নিকট একটি বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, —হে উর্দ্ধবিচারী বায়ু, আমাকে এই বর দাও যে, আমি তিন মুখ তিন মস্তক যুক্ত অজি-দহককে (সংস্কৃত—অহিদহককে) পরাস্ত করিতে পারি। উর্দ্ধবিচারী বায়ু তাহাতে সৃষ্টি-কর্ত্তা অহুর-মজদের প্রার্থনা অনুসারে সেই বর দিলেন।' মিত্র ও বরুণ আর্য্য-হিন্দুগণের উপাস্য দেবতা ছিলেন। ইরাণীয়গণও সেই উপাসনার অনুকরণ করেন। জেন্দ-আভেস্তায় মিত্র ও বরুণের উপাসনা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশের অনুবাদ,— 'অহুর-মজদ্ স্পিতিমা জারাথস্ত্রকে কহিলেন,—আমি যখন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি মিথ্রকে সৃষ্টি করি, হে স্পিতিমা! আমি তাহাকে আমার ন্যায় যজ্ঞ ও উপাসনার যোগ্য করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আমরা মিথ্রকে যজ্ঞ প্রদান করি; তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি, তিনি সত্যবাদী, সভায় সভাপতি; তাঁহার সহস্র সুন্দর কর্ণ আছে; তাঁহার দশ সহস্র চক্ষু আছে; তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান আছে; তিনি বলবান। তিনি অনিদ্র, চিরজাগরুক।' বরুণ— জেন্দ-আভেস্তায় 'বরণ' নামে অভিহিত। তাঁহার বিষয়ে জেন্দ-আভেস্তায় লিখিত আছে,— আমি অহুরো মজদ্ যে উৎকৃষ্ট দেশ ও প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, চতুষ্কোণ বরণ তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশ সংখ্যক। সেই দেশের জন্য থ্রেতন (সংস্কৃত—ত্রৈতন) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অজি-দহককে হত করিয়াছিলেন।' মিত্র ও বরুণের বিষয় জেন্দ-আভেস্তায় যাহা লিখিত আছে, তাহা আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন,—"বেদে মিত্র ও বরুণকে অনেক স্থলে একত্র আহ্বান করা হইয়াছে। এমন কি, সমস্ত ঋগ্বেদের একটী সূক্তে কেবল মিত্রকে পৃথকরূপে অর্চ্চনা করা হইয়াছে। ইরাণীয়-দিগের ধর্ম্মপুস্তক 'অবস্থায়ও' দেখা যায় যে, ইরাণীয়-দিগের ঈশ্বর অহুরো মজদের সহিত অনেক স্থলেই মিত্রের নাম সংযোজিত। ইহা হইতে ইউরোপীয় কোনও কোনও পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, ইরাণীয়গণ যে প্রধান দেব অহুরো মজদকে উপাসনা করেন, সে অহুরো-মজদ্ বরুণের প্রতিরূপ। অর্থাৎ, বরুণকে প্রধান দেবতা বলিয়া ইরাণীয়গণ মানিয়া লইয়াছেন।' এ বিষয়েও আর্য্য-হিন্দুগণের অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদেও বরুণকে প্রধান দেবতা বলিয়া উল্লেখের ত্রুটি নাই। প্রথম মণ্ডলের পঞ্চবিংশ সূক্তের দশম ঋকে বরুণের সম্বন্ধে লিখিত আছে,—'যাঁহার শাসনে জগৎ চলিতেছে এবং যিনি সর্ব্বজ্ঞ, এবম্ভূত বরুণ দেব জগতের সমস্ত প্রজাবর্গ শাসন কবিবার নিমিত্ত স্বস্থানে অবস্থান করিতেছেন।' এই সাদৃশ্যের বিষয় আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন,—'ইরাণীয়দিগের

মধ্যে প্রধান দেব অহুর মজ্‌দ্‌ এই বরুণের প্রতিরূপ। এতদ্বিষয়ে তাঁহারা তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করেন। প্রথম,—বেদেও বরুণকে অসুর বলিয়া অনেক স্থলে বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়,—বরুণ যেরূপ আদিত্যদিগের মধ্যে একজন, অহুরমজদও সেইরূপ ইরাণীয়-দিগের অংশস্পন্দদিগের একজন। তৃতীয়,—বেদে সর্ব্বদাই বরুণকে মিত্রের সহিত একত্রে উপাসনা করা হয়। ইরাণীয়দিগের অবস্থায়ও অহুর-মজদের নামের সহিত সর্ব্বদা মিত্রের নাম সংযোজিত করা হয়।' কোনও কোনও পণ্ডিত নির্দ্ধারণ করেন, বেদে 'মিত্র' শব্দ তিন অর্থেই ব্যবহৃত; মিত্র শব্দে বন্ধু, সূর্য্য এবং ঈশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে। জেন্দ-আভেস্তায়ও 'মিত্র' শব্দ ঐ তিন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়। পারসিকগণের 'মিহির' শব্দকে 'মিথ্র' শব্দের রূপান্তর বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'মিহির' শব্দ আজিও 'বন্ধু' ও 'সূর্য্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের অর্য্যমন্‌, জেন্দ-আভেস্তায় ঐর্য্যমন নামে অভিহিত। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৪১শ সূক্তে আছে,—'প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্ট বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, এই সকল দেব যে যজমানকে রক্ষা করেন, সেই যজমান কখনও শত্রুদিগের দ্বারা পীড়িত হন না। এই অর্য্যমা (অর্য্যমন্‌ শব্দের রূপ) সম্বন্ধে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'অর্য্যমা অহোরাত্রবিভাগস্য কর্ত্তা সূর্য্যঃ।' তাঁহার অন্য আর এক স্থলের টীকায় দৃষ্ট হয়,—'মিত্র ও বরুণ শব্দে দিবা ও রাত্রিকে বুঝায়;' "অর্য্যমা উভয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তী দেবঃ।" অপরাপর পণ্ডিত-গণের কেহ কেহ মধ্যাহ্নের পূর্ব্ববর্ত্তী সূর্য্যকে 'অর্য্যমা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।* ঋগ্বেদেও সূর্য্যের বহু নাম দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তে ছয় জন আদিত্যের নাম এইরূপ লিখিত আছে,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, অংশ। 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' আদিত্য আট জন এইরূপ লিখিত আছে; যথা,—ধাতা, অর্যামা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্‌। পুরাণাদি শাস্ত্রে দ্বাদশ আদিত্যের নাম উল্লিখিত।† যাহা হউক, অর্য্যমা নামক দেবতা যেমন আর্য্য-হিন্দুদিগের উপাস্য ছিলেন, পারসিকগণের নিকটও তাঁহার সেইরূপ উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে; হিন্দু-দিগের মধ্যে যেরূপ, ইরাণীয়দিগের মধ্যেও সেইরূপ, অর্য্যমন্‌ প্রথমে আলোক বা সূর্য্যদেব ছিলেন। 'তিনি অনেক রোগের ঔষধি জানিতেন',—ইরাণীয়দিগের ইহাই বিশ্বাস। 'যখন পাপমতি অঙ্গ্রমৈন্যু ৯৯৯৯৯ প্রকার রোগের সৃষ্টি করিল, তখন ইরাণীয়দিগের প্রধান দেবতা অহুর-মজ্‌দ্‌ প্রতিকারের জন্য নৈরসংঘকে (সংস্কৃত—নরাসংস) দূত করিয়া অর্য্যমনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।' এ বিষয়ে জেন্দ-আভেস্তায় লিখিত আছে,—

* সূর্য্য কোন্‌ সময়ে কি নামে অভিহিত হন, পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী তাহা এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—'উষোদয়ের পরই প্রাতঃকাল। ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল, অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালেরই সূর্য্য। যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে। অর্থাৎ পূষা—ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য। পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল। ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ণ শেষ হয়। মধ্যাহ্ন-কালীন সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

† বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, ১৫শ অধ্যায়, ৯০ম শ্লোক এবং মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১২১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

'পরম কমনীয় অর্য্যমন সকল প্রকার রোগ ও মৃত্যু এবং যাতু ও পৈরিকা ও জৈমিদিগকে ধ্বংস করুন।' ডক্টর হোগ বলেন,—'হিন্দুদিগের এবং পারসিকদিগের শাস্ত্রগ্রন্থে অর্য্যমন (ঐর্য্যমন) শব্দ দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত;—(১) বন্ধু, সঙ্গী; (২) বিবাহ বিষয়ে যিনি মঙ্গল-বিধান করেন, সেই দেবতা। বিবাহের সময় ঐ দেবতার উপাসনা—হিন্দু ও পারসিক উভয় জাতির মধ্যেই প্রচলিত।' * বৃত্রহন বা বৃত্রঘ্ন সম্বন্ধেও অশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থে ইন্দ্র ও বৃত্রঘ্ন অভিন্ন। ইরাণীয়গণ ইন্দ্র নামে দ্বেষযুক্ত; কিন্তু বৃত্রঘ্ন নামে শ্রদ্ধাবান। জেন্দ-আভেস্তায় বৃত্রঘ্নের উপাসনার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, —"অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে (সংস্কৃত—বৃত্রঘ্নকে) আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। জারাথস্ত্র অহুরমজদ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে সদয়চিত্ত অহুরো মজদ্, হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পবিত্রাত্মা, স্বর্গীয় উপাস্যদিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী?' অহুরো মজদ্ উত্তর করিলেন,—"হে স্পিতিমা জারাথস্ত্র, অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী।" ইহাতে বৃত্রঘ্নের সমর-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। "ইহা হইতে বোধ হয় যে, প্রাচীন আর্য্যগণ বৃত্রঘ্নকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের মধ্যে দুইটী দল হইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন একদল বৃত্রঘ্নকে ইন্দ্র নাম দিলেন; সুতরাং অন্য দল ইন্দ্রকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন।" ইন্দ্র ও বৃত্র এবং তাঁহাদের যুদ্ধকে যাঁহারা রূপক বলিয়া মনে করেন; যাঁহারা বলেন,—'মেঘের নাম বৃত্র বা অহি; ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ উপমা ও কল্পনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন;' ইরাণীয়দিগের অবস্তা গ্রন্থে বৃত্র, অহি প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া তাঁহারা সেই রূপক-তত্ত্বই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। জেন্দ-আভেস্তায় সৌরু ও নওঙ্ঘত্যের যে নাম আছে, তাহাতেই তাঁহারা যথাক্রমে বেদের সরু বা মৃত্যুর বাণ এবং নাসত্যদ্বয় অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়ের কল্পনা করিয়া লন। শাস্ত্রোক্ত যম—জেন্দ-আভেস্তায় 'যিম' নামে অভিহিত। যম—বেদে বিবস্বনের পুত্ররূপে পরিচিত। জেন্দ-আভেস্তায় যমের পিতার নাম—বিবহ্বৎ বা বিবঙ্ঘৎ। যিম সম্বন্ধে জেন্দ-আভেস্তায় যাহা লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশ এই,—"অহুর-মজদ্ উত্তর দিলেন,—হে জারাথস্ত্র! তোমার পূর্ব্বে শোভনীয় যিম নামক মর্ত্ত্যের সহিত আমি প্রথমে কথা কহিয়াছিলাম। তাহাকেই আমি অহুরের ধর্ম্ম—জারাথস্ত্রের ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলাম। হে জারাথস্ত্র! আমি অহুর মজদ্ তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, হে বিবঙ্ঘতের পুত্র শোভনীয় যিম! তুমি আমার ধর্ম্মের বাহক ও প্রচারক হও।" যিম ও যম শব্দের আলোচনায় লিখিত হইয়াছে,—"পরে অহুরের আদেশানুসারে যিম একটী বর নামক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন। তথায় কেবল পুণ্যাত্মা লোক, উৎকৃষ্ট পশু-বৃক্ষাদি থাকে। ঋগ্বেদের যমপুরীতেও পুণ্যাত্মা লোক যাইয়া সুখে বাস করে। পারসিক প্রসিদ্ধ কবি ফেরদৌসী তাঁহার রচিত 'সাহনামায়' যিমকে 'জমশিদ' নামক একজন

* "Aryaman has in both scriptures a double meaning, (a) a 'friend,' 'associate' (b) the name of a Deity or a spirit, who seems particularly to preside over marriages on which occasions he is invoked both by Brahmans and Parsees."—Dr. Haug, *Essays*.

পদাক্রান্ত সম্রাট বলিয়া বর্ণনা করেন। এই জমশিদ যে প্রাচীন 'অবস্থার' যিম এবং অবস্থার যিম যে বেদের যম, তাহা অসামান্য ফরাসী পণ্ডিত বারুফ (Burouf) প্রথমে আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, ফেরদুসীর ঐতিহাসিক জমশিদ, ফেরোদিন, গর্শাস্প আর কেহ নহে, জেন্দ-অবস্থার যিম, থ্রেতেয়ন এবং কেরেশাস্প; এবং জেন্দ-অবস্থার এই তিন জন আদিম মনুষ্য আর কেহ নহে, ঋগ্বেদের যম, ত্রৈতন এবং কৃশাশ্ব।" এ হিসাবে, জোরওয়াষ্টার বা জারাথস্ত্রকে কেহ কেহ কোনও হিন্দু মহাপুরুষের নামান্তর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। পারসিক-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থে যে ব্যাসের সহিত জারাথস্ত্রের ধর্ম্মালোচনার কথা লিখিত আছে, তাহাতেও সেই কথাই মনে হইতে পারে। * বেদে এবং ব্রাহ্মণে এক এক স্থানে তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে। তদ্দৃষ্টে কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন,—'প্রথমে দেবতার সংখ্যা তিন ছিল; ক্রমে তেত্রিশ হইয়াছিল; পরে তেত্রিশ কোটিতে দাঁড়াইয়া যায়।' ডক্টর হোগ সিদ্ধান্ত করেন,—'জেন্দ-আভেস্তায় তেত্রিশ রাতুর উল্লেখ আছে। তেত্রিশ দেবতাই তেত্রিশ রাতু নামে এক সময়ে জেন্দ-আভেস্তায় পরিচিত হইয়াছিলেন।' এতদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তন্ন তন্ন করিয়া মিলাইয়া দেখিলে, জেন্দ-আভেস্তায় যে আর্য্য-হিন্দুগণের ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণরূপ ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। প্রাচ্যের এবং পাশ্চাত্যের যে কোনও পণ্ডিতই এই বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তিনিই এতৎসম্বন্ধে অন্যমত হইবেন না।

* আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনায় জোরওয়াষ্টার বা জারাথস্ত্র নামধেয় একাধিক মহাপুরুষের আবির্ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবীস্থান-গ্রন্থে প্রকাশ,—তের জন জারাদুস্ত্র (Zaradustra) বা জারাদুস্ত (Zaradusht) ছিলেন। 'নাম জারাদুস্ত' নামক পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে,—"ঈশ্বর জারাথুস্ত্রকে বলিতেছেন,—'ব্যাস নামক জনৈক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ হইতে পারস্যে আসিবেন। পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। তিনি আসিয়া তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন,—ঈশ্বর কেন সৃষ্ট পদার্থ-সমূহ একযোগে সৃষ্টি করেন নাই?' তুমি তাঁহাকে বলিও,—'ঈশ্বর প্রথমে শক্তিকে সৃষ্টি করেন। শক্তির সাহায্যে পরিশেষে অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি হয়।'" "নাম জারাদুস্ত' গ্রন্থের এই অংশ উপলক্ষ করিয়া 'সাসন' গ্রন্থ টিপ্পনী করিয়া গিয়াছেন,—'বালখ নগরে গুস্তাস্প রাজার সহিত ব্যাস সাক্ষাৎ করেন। রাজা, দেশের সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া আনেন। আপনার উপাসনা মন্দির হইতে জারাথুস্ত্রও সেই স্থানে উপস্থিত হন। অতঃপর ব্যাস জারাথুস্ত্রের ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন।' ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—গুস্তাস্প (Gustaspa) নামে বাকট্রিয়ায় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে, ৫৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্ম—রাজ-পরিগৃহীত ধর্ম্ম (State Religion) মধ্যে পরিগণিত হয়। রাজা গুস্তাস্প সম্ভবতঃ পুরাণোক্ত বিশ্বাশ্ব হইবে। বিশ্বাশ্ব হইতে প্রথমে বিস্তাস্প পরে গুষ্টাস্প বা গুস্তাস্প নাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। গ্রীকগণ আবার ঐ নামকে 'হিষ্টাস্পেস' (Hystaspes) করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বাহ্লীক, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণায়, বাকট্রিয়া নাম পরিগ্রহ করিয়া আছে। জনৈক পার্শী-লেখক (Dr. S. A. Khapadia—*Teachings of Zoroaster and the Philosophy of the Parsee Religion*) গুস্তাস্পকে সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ব্যাসের সহিত জোরওয়াষ্টারের ধর্ম্মালোচনা প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে কোন্ ব্যাসের সহিত কোন্ জোরওয়াষ্টারের ঐরূপ পরিচয় হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এ দেশের বহু পণ্ডিত ব্যাস নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সাসনোক্ত ঘটনা সত্য হইলে, ব্যাস-বংশীয় কোনও ব্যক্তি জোরওয়াষ্টারের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতে পারে। নচেৎ, ৫৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বেদ-ব্যাসের বিদ্যমানতা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। গুস্তাস্প রাজার রাজত্বকালে যে জোরওয়াষ্টার বিদ্যমান ছিলেন, তিনিই যে আদি-জোরওয়াষ্টার, তাহাও বলা যায় না। আদি-জোরওয়াষ্টার 'স্পিতমা জারাথস্ত্র' নামেই প্রধানতঃ পরিচিত।

সৃষ্টি-বিষয়ে বিংশ-শতাব্দীর গবেষণার ফলে যে বৈজ্ঞানিক মত আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভারতের আর্য্য-হিন্দুগণ স্মরণাতীত-কাল পূর্ব্বে তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, আধুনিক বিজ্ঞান অপেক্ষাও হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহে অধিকতর সূক্ষ্ম-তত্ত্বের আলোচনা আছে। শাস্ত্রের সৃষ্টির নানা স্তর দেখিতে পাই। তাহারই একটি স্তরের বিষয় অবগত হইয়া সম্ভবতঃ ইরাণীয়গণ সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে তদ্রূপ মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। জেন্দ-আভেস্তার মতে,—'এই পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ছয় বারে সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হইয়াছিল; দ্বিতীয় বারে জল, তৃতীয় বারে পৃথিবী, চতুর্থ বারে বৃক্ষাদি, পঞ্চম বারে প্রাণি-সমূহ এবং ষষ্ঠ বারে মনুষ্য।' সৃষ্টি-সম্বন্ধে এই মতই জেন্দ-আভেস্তায় প্রবল। পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে, অনেক স্থলেই এইরূপ সৃষ্টি-প্রকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পৌরাণিক উপাখ্যান আধুনিক বলিয়া যাঁহারা তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে প্রয়াস পান, তাঁহাদের প্রতীতির জন্য একটী বৈদিক শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক বুঝিতে পারিবেন, তাহাতেও সৃষ্টি-সম্বন্ধে এই ভাবের কথাই লিখিত আছে। যজুর্ব্বেদে সৃষ্টি-প্রকরণ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

সৃষ্টি-তত্ত্ব বিষয়ে সাদৃশ্য।

"ততো বিরাড়্জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুনঃ॥
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে॥
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষণ্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥"

মর্ম্মার্থ,—'প্রথমে নীহারিকা-সমাচ্ছন্ন জ্যোতির্ম্মণ্ডল ছিল। পরমপুরুষ কর্ত্তৃক সে মণ্ডল পরিচালিত হইত। পরিশেষে সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল হইতে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেই পরমপুরুষ কর্ত্তৃক তৎপরে তরুলতা প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ তিনি বায়ু, অরণ্য এবং জীবজন্তু সৃষ্টি করেন। তৎপরে মনুষ্যের সৃষ্টি হয়। জ্ঞানী এবং মহাপুরুষগণ সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়া, সেই পরমপূজ্য আদিপুরুষের উপাসনায় প্রাণমন সমর্পণ করেন।' পুরাণাদিতে বিস্তৃত-ভাবে যে সৃষ্টি-প্রকরণ লিখিত আছে, তাহার সহিত জেন্দ-আভেস্তার পূর্ব্বোক্ত অংশের ছত্রে ছত্রে সাদৃশ্য দেখাইতে পারা যায়। হিন্দু-শাস্ত্রে প্রলয় এবং যুগোৎপত্তির বিষয় যে ভাবে লিখিত আছে, তাহারও আভাষ পারসিকগণের শাস্ত্র-গ্রন্থে দেখিতে পাই। আমরা যাহাকে প্রলয়ের পর যুগ বিবর্ত্তন বলি, ইরাণীয়গণের গ্রন্থে তাহা "মিহ্‌চর্খ" নামে অভিহিত হয়। 'মিহ্‌চর্খ'—আমাদের মহাচক্র শব্দের রূপান্তর মাত্র। পারসিকদিগের 'সাসন' ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে,—"মিহ্‌চর্খের আদিতে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পূর্ব্বতম মিহ্‌চর্খে যে অবয়ব, কার্য্য ও জ্ঞান বিদ্যমান ছিল, নূতন মিহ্‌চর্খের সৃষ্টির সহিত পরবর্ত্তী মিহ্‌চর্খের সৃষ্টির সামঞ্জস্য অব্যাহত।' উপরোক্ত অংশের সমালোচনায় আবার দেখিতে পাই,—

মিহ্‌চর্‌খের আদিতে পরমাণু বা মূল উপাদান-সমূহ সম্মিলিত হইয়া থাকে; তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী মিহ্‌চর্‌খের অনুরূপ আকৃতি প্রকাশমান হয়। নামে এবং কার্য্যে তাহাদের ঐক্য থাকিলেও আকারগত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের কয়েকটী ঋকে ইরাণীয়গণের ধর্ম্ম-গ্রন্থের এই অংশের আভাষ পাওয়া যায়। সেই ঋক-কয়টী,—

"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যোঽজায়ত। ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসো ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥"

অর্থাৎ,—'প্রথমে সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্ম মাত্র বিরাজমান ছিলেন। তপস্যা বা অদৃষ্টবশে জল-পূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা হইতে বিধাতা সঞ্জাত হন। তিনি যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য্যের সৃষ্টি করেন। তাহাতে দিন রাত্রি প্রভৃতি যথানিয়মে চলিতে থাকে। পরে তিনি পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং লোক-সমূহ সৃষ্টি করেন।'

জন্মান্তরাদি বিষয়ে।

আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং জন্মান্তরবাদ—অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল—আর্য্য-হিন্দুগণের অনুসরণেই ইরাণীয়গণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের অংশ-বিশেষের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিতেছি। তাহা পাঠ করিলে প্রতীত হইবে, সে সকল নিশ্চয়ই হিন্দুদিগের অনুসরণ। ইরাণীয়গণের 'হোশাং' গ্রন্থে লিখিত আছে,—'পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মার নূতন দেহ-পরিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী।' * এখানে আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্যগ্‌রূপে স্বীকার করা হইতেছে। এ বিষয়ে, আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং দেহ হইতে দেহান্তর-গ্রহণ-বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। কঠোপনিষদে দেখিতে পাই,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এই একই উক্তি,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। দৃষ্টিমাত্রেই উপলব্ধি হইবে, উহার সহিত পারসিকগণের কি সাদৃশ্যই বিদ্যমান! কর্ম্মানুসারে মনুষ্য যে বিশেষ বিশেষ লোক

* "To reject the old frame and assume a new body is inevitable."—*Hashong.*
"The soul migrates from one body into another."—*Sasan*, V.

প্রাপ্ত হয়, সে কথাও ইরাণীয়দিগের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে। 'নাম নিহাকাদ' গ্রন্থে দেখিতে পাই,—'প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুসারে স্বর্গে ও নক্ষত্রলোকে স্থানলাভ করেন, এবং সর্ব্বদা বাস করিতে সমর্থ হন। যিনি পৃথিবীতে পুনরায় যাইতে অভিলাষী, কর্ম্মানুসারে তিনি রাজা, মন্ত্রী, শাসনকর্ত্তা বা ধনবান হইতে পারেন। * এইরূপে প্রত্যেকেই কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মপ্রচারক বাশাদাবাদ বলিয়া গিয়াছেন,—'নৃপতিগণও যে তাঁহাদের সুখভোগের মধ্যে সময়ে সময়ে কষ্ট, যন্ত্রণা ও পীড়ায় আক্রান্ত হন, সে কেবল তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের কুকর্ম্মের ফলভোগমাত্র।' সাসন-গ্রন্থেও এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি,—'মানুষ সৎকর্ম্মের সুফল প্রাপ্ত হয় এবং অপকর্ম্মের জন্য কষ্ট ভোগ করে। অপকর্ম্মের জন্য ঈশ্বর যদি দণ্ড-বিধান না করেন, অথবা প্রচুর শাস্তি-দানে কুণ্ঠিত হন, তিনি কখনই ন্যায়পর হইতে পারেন না।' পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের বিষয় এবং নিরীহ জীব-জন্তুকে অকারণ হত্যা করিলে তজ্জনিত পাপের বিষয় 'মিহিদাদ' ও 'সাসন' গ্রন্থদ্বয়ে, বিস্তৃত-ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। † এ সকল বিষয়েও শাস্ত্রগ্রন্থে, সংহিতায় এবং পুরাণে যাহা লিখিত আছে, পারসিকগণের ধর্ম্মগ্রন্থেও তাহাই দেখিতে পাই। স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধেও ইরাণীয়গণের ধর্ম্ম-গ্রন্থ আর্য্য-হিন্দুগণের ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনুসারী। 'সাসন' গ্রন্থে দেখিতে পাই,—'যাঁহারা পাপ হইতে মুক্ত, তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পান। অর্থাৎ, তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে—সপ্তম স্বর্গে—বাসের অধিকারী। ‡ যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পগুণ-সম্পন্ন বা অল্প-পুণ্যবান, তাঁহারা স্বর্গের নিম্ন স্তরে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা অধিকতর গুণহীন বা পুণ্যহীন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন নিকৃষ্ট যোনি লাভ করেন।' ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত আছে,—'যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সৎ লোক, যাঁহারা কার্য্যে এবং বাক্যে সম্পূর্ণরূপে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা 'গারাৎমান' নামক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এই লোকের পরবর্ত্তী লোকে যাঁহারা আশ্রয় লাভ করেন, তাঁহারা ভৌতিক পদার্থের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা যে বিশেষ স্বর্গলোকে অবস্থিতি করেন, সেখানে সুখ-শান্তি চির-বিরাজিত। কিন্তু যাঁহারা ভৌতিক পদার্থের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, সদ্গুণ-সম্পন্ন ধর্ম্ম-পরায়ণ হইলেও, তাঁহারা পুনরায় নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এবং তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে মুক্তির পথে

* "Every man finds a place in the heaven and the stars according to his knowledge and actions, and always lives there. And he who wishes to go into the world and has done deeds is born as a king, minister, ruler or a rich man." etc.

† "Those who are good men of the first or highest order and have reached perfection in speech and action go to the world of light, &c., &c.—*Sasan*, I—V. "So that he may reap the fruits of his deeds. According to the Prophet Bashadabad, those griefs, troubles and diseases, which befall kings during their enjoyments are due to the evil deeds of their previous births."—*Mihabad*, 66—69.

‡ এই স্থানকে পারসিকগণ 'গারাৎমান' (Garatman) নামে অভিহিত করেন। ইহাই তাঁহাদের সপ্তম স্বর্গ। এখানে অহুর মজদ—আমেশাস্পন্তগণের (অমেশাস্পন্তগণের) সহিত অবস্থান করেন। পবিত্রাত্মগণ এই ধামে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

অগ্রসর হন। তাঁহাদের এইরূপে দেহ হইতে দেহান্তর-গ্রহণ 'ফারাংসার' (Farhangsar) নামে অভিহিত। কুকর্ম্মের ফলে আত্মা কর্ম্মানুরূপ বাক্‌শক্তিহীন জন্তুর দেহ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন; এই অবস্থাকে 'নাংসার' (Nangsar) কহে। কখনও কখনও আত্মাকে উদ্ভিদ-দেহ ধারণ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিতে হয়। আত্মার সেই অবস্থার নাম— তাংসার (Tangsar)। কখনও বা আত্মাকে কর্ম্মানুসারে ধাতব-পদার্থের মধ্যেও আশ্রয় লইতে হয়। সেই অবস্থার নাম—'সাংসার' (Sangsar)। ইহাই নরকের ক্রম-পর্য্যায়।' এই স্বর্গ ও নরকের কল্পনা পারসিকগণ আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সপ্তম স্বর্গলাভ—'গারাৎমান' প্রাপ্তি—আমাদের মুক্তির নামান্তর মাত্র। মুক্ত আত্মা পরমপুরুষে বিলীন হন, আলোক-রশ্মি আলোকে মিশিয়া যায়, জলবিম্ব জলে বিলীন হয়; অশুর মজ্‌দের সহিত পবিত্রাত্মার মিলন-প্রসঙ্গে সেই ভাবই মনোমধ্যে জাগাইয়া দেয় না কি?

আর্য্য-হিন্দুগণের কতকগুলি আচার-ব্যবহারের সহিত প্রাচীন পারসিকগণের আচার-ব্যবহারের অভাবনীয় সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যজ্ঞ বা বলি ভিন্ন কোনও জীবজন্তু বলির বিধি নাই। অপিচ, অন্য সময়েও, হিংস্র জীবজন্তু ভিন্ন নিরীহ প্রাণী বধের নিষেধ-আদেশ আছে। পারসিকগণের ধর্ম্মগ্রন্থেও ইহার সমর্থন দেখিতে পাই। মাংসাহারের জন্য পশু-বধ—পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। 'মিহাবাদ' গ্রন্থে এ বিষয় বিশদভাবে লিখিত আছে। 'মিহাবাদ' বলিতেছেন,—'জান্দবার (Zandbar) প্রাণীকে (অর্থাৎ যে সকল প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করে না বা কাহারও কোনও ক্ষতি করে না; যেমন—ঘোড়া, গরু, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মেষ প্রভৃতি) হত্যা করিও না। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই তাহাদিগের জন্য [illegible] বিধান করিয়াছেন। তাহারা একভাবে না একভাবে অতীত কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে মাত্র। যেহেতু, ঘোটক চড়িবার জন্য, বৃষ উষ্ট্র গর্দ্দভ প্রভৃতি ভার-বহনের জন্য নিযুক্ত আছে। কোনও জান্দবার জন্তুকে নিহত করিয়া মানুষ যদি ঈশ্বরের নিকট বা রাজার নিকট ইহজীবনে দণ্ড না পায়, পরজীবনে সে নিশ্চয়ই দণ্ডভোগ করিবে। কিন্তু তুন্দবার (Tundbar) প্রাণীকে (যাহারা অন্য জন্তুকে হত্যা করে বা অন্য জন্তুর অনিষ্ট করে) হত্যা করিলে, কোনও দোষ নাই; বরং তাহা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। তুন্দবার জন্তু কর্ত্তৃক যে জান্দবার জন্তু নিহত হয়, তাহা ঈশ্বরেরই নির্দ্দেশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তুন্দবার প্রাণীকে সংহার করা যে কর্ত্তব্য, তাহার কারণ—পূর্ব্ব জন্মে তাহারা হিংস্র ও হত্যাকারী মনুষ্য ছিল, এবং তাহারা নিরীহ জন্তুর সংহার-সাধন করিয়াছিল। সেই কর্ম্মের ফলেই তাহারা তুন্দবার যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণের বিষয় হিন্দুশাস্ত্রে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। আর একটী বিষয়ে অভিনব সাদৃশ্যের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। হিন্দুগণ চিরদিন গো-জাতির প্রতি সম্মান করিয়া আসিতেছেন। পৃথিবীর অপর কোনও জাতিই হিন্দুর ন্যায় গো-জাতির সম্মান করিতে শিখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। ঋগ্বেদে, (৬ম, ২৮সূ) গো-দেবতার প্রসঙ্গে লিখিত

আচারাদি বিবিধ বিষয়ে।

আছে,—গো-গণ যেন আমাদিগের গৃহে আগমন করে; আমাদিগের কল্যাণ-বিধান করে।...হে ধেনুগণ তোমরা আমাদিগের পুষ্টিবিধান কর। তোমরা ক্ষীণ ও কুৎসিত দেহকে শ্রী-যুক্ত কর।...হে কল্যাণকর ধ্বনিসম্পন্ন ধেনুবৃন্দ! তোমরা আমাদিগের গৃহ সমৃদ্ধিসম্পন্ন কর।...হে মনুষ্যগণ! এই সমস্ত ধেনুগণই সেই ইন্দ্র—যাহাকে আমি হৃদয় ও মনের সহিত কামনা করি।' পারসিকগণের জেন্দ-আভেস্তা গ্রন্থেও গো-মাহাত্ম্য এইরূপ-ভাবেই পরিকীর্ত্তিত। জেন্দ-আভেস্তায় লিখিত আছে,—'গো-জাতিই আমাদের অভাব পূরণ করে। গো-জাতিই আমাদের জয়, গো-জাতিই আমাদের অন্ন-সংস্থান।' জেন্দ-আভেস্তার আরও অনেক স্থলে গো-জাতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের বিষয় লিখিত আছে। গো-জাতি-সংক্রান্ত আর এক বিষয়ে হিন্দুগণের সহিত ইরাণীয়গণের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! 'পঞ্চগব্য'—পবিত্রতা-সাধক বলিয়া হিন্দুর মধ্যে প্রচারিত। পারসিকগণের মধ্যে গোমূত্র ও গোময়—'নিরাং' নামে অভিহিত, পবিত্রতা-মূলক বলিয়া প্রসিদ্ধ; এবং পঞ্চগব্যের ন্যায় সমাদরে পারসিকগণ উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেদে 'গো-মেধ' যজ্ঞের বিষয় উল্লিখিত আছে। পারসিকগণের জেন্দ-আভেস্তা গ্রন্থে সেই যজ্ঞ—'গোমেজ' নামে অভিহিত। এই গোমেজ বা গোমেধ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক দিন হইতে নানা বিচার-বিতর্ক চলিয়াছে। গো-শব্দ বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থে গো শব্দে গো-জাতিকে বুঝাইয়া থাকে; অন্য অর্থে গো-শব্দে পৃথিবীকে বুঝায়। অন্য আর এক অর্থে গো শব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায়। গো-শব্দের এইরূপ বিবিধ অর্থের বিষয় আলোচনা করিয়া, পণ্ডিতগণ গো-মেধ এবং গো-পূজা সম্বন্ধে বিবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক পক্ষ বলেন,—'গো-শব্দে গো-জাতিকেই বুঝাইত; 'গো-পূজা গাভীরই পূজা; গো-মেধ যজ্ঞ গো-জাতি সংক্রান্ত।' কিন্তু অপর পক্ষ বলেন,—'গো-শব্দের তদ্রূপ অর্থ-নির্দ্দেশ ভ্রান্তিমূলক। গো-শব্দে পৃথিবীকে বুঝায়; গো-শব্দে ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায়। গো-পূজার অর্থ—পৃথিবীর পূজা; গো-মেধ অর্থে ইন্দ্রিয়-বলিদান, অথবা গো-মেধ অর্থে পৃথিবী-কর্ষণ।' জেন্দ-আভেস্তায় গোমেজ শব্দের আলোচনায় ডক্টর হোগ শেষোক্ত যুক্তিরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। গোমেজ শব্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—'জিউয়েস উরভা (Geush urva) অর্থ পৃথিবীর আত্মা; উহা সকলের জীবন এবং বৃদ্ধির হেতু-স্বরূপ। গো-আত্মা শব্দের প্রকৃত অর্থ-নির্ণয়ে উপলব্ধি হয়, গরুর সহিত পৃথিবীর তুলনা করা হইয়াছে। তাহাকে ছেদন বা কর্ত্তন অর্থাৎ বলিপ্রদান অর্থে ভূমিকর্ষণ বুঝাইয়া থাকে। অহুর মজ্দ্ এবং তাঁহার স্বর্গীয় পারিষদগণ এ সম্বন্ধে যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে ভূমিকর্ষণ অর্থই প্রতীত হয়। কারণ, তৎকালে কৃষিকার্য্য ধর্ম্মের মুখ্য পরিগণিত ছিল।' † ডক্টর হোগ আরও বলেন,—"গো শব্দে সংস্কৃতে গাভী এবং পৃথিবীকে বুঝায়। গ্রীক ভাষার 'জি' (Ge) শব্দ উহারই রূপান্তর। উহাও পৃথিবী-বোধক। দৃষ্টান্তস্থলে জিওগ্রাফি (Geography) শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জেন্দ-ভাষায়ও গো শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত।

---

† "*Geush urva* means the universal soul of earth, the cause of all life and growth. The literal meaning of the word *soul of the cow* implies a simile, for the earth is

উহাতে পৃথিবী ও গাভী বুঝায়। অর্থ সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত প্রচারিত আছে বলিয়াই মানুষ ভ্রমে পড়িয়াছে। পৃথিবীর উপাসনা করিতে গিয়া গো-জাতির উপাসনা করিতেছে।' * কোন্ অর্থ সমীচীন এবং কোন্ অর্থে গো শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল, সে তর্ক-বিতর্কের জন্য এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। আর্য্য-হিন্দুগণের সহিত ইরাণীয়গণের সাদৃশ্য তত্ত্ব আলোচনা করাই এতৎপ্রসঙ্গের উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানে কেবল সেই পরিচয়ই প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, এইরূপ সাদৃশ্য আরও বিবিধ বিষয়ে প্রদর্শিত হইতে পারে। দর্শন-সম্বন্ধে সাদৃশ্য আছে; যজ্ঞবিধি সম্বন্ধে সাদৃশ্য আছে; সোমাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। জোরওয়াষ্ট্রীয়ান-দিগের দর্শন-শাস্ত্র-মতে, কর্ম্মের তিন স্তর নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রথম,—চিন্তা, দ্বিতীয়—বাক্য, তৃতীয়—কর্ম্ম। সেই তিন স্তরকে তাঁহারা তিন নামে অভিহিত করিয়াছেন;—প্রথম 'হুমাতেম্' (Humatem), দ্বিতীয় 'হুখ্‌তেম্' (Hukhtem), তৃতীয় হ্বারস্তেম্ (Hvarshtem)। † হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্রেও এ মতের অসদ্ভাব নাই। যথা,—"যন্মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি যদ্বাচা বদতি তৎকর্ম্মণা করোতি।' সোমের উপাসনা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের প্রথম তিনটী ঋকে যাহা লিখিত আছে, জেন্দ-আভেস্তা গ্রন্থের 'হোমযস্থ' অংশে সেই মন্ত্রের উক্তিই দেখিতে পাই। পার্থক্যের মধ্যে—নামের প্রভেদ; বেদে 'সোমের' উপাসনা; হোমযস্থে 'হোমের' উপাসনা; কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি,—বেদোক্ত 'সোম' শব্দ জেন্দ-আভেস্তায় 'হোম' রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। সোমের উপাসনা প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের পূর্ব্বোক্ত সূক্তে ‡ লিখিত আছে,—'হে পবিত্র-কারক সোম! তুমি আমাদের অন্নস্থানীয় পুষ্টিকারক। তুমি আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান কর, তুমি আমাদিগকে জয়যুক্ত কর, তুমি আমাদিগের মঙ্গল-বিধান কর। হে সোম। আমাদিগকে জ্যোতিঃ বা জ্ঞান দাও, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, আমাদিগকে সৌভাগ্য দান কর, আমাদিগের মঙ্গল-বিধান কর! হে সোম! আমাদিগকে বল দাও, আমাদিগকে জ্ঞান দাও, আমাদিগের শত্রু নাশ কর, আমাদিগের মঙ্গল-বিধান কর।' জেন্দ-আভেস্তায়ও হোমের উদ্দেশে বলা হইতেছে,—'হে হোম! আমি তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি মৃত্যু দূর করিয়া আমাকে দীর্ঘজীবন দান কর। হে হোম! তুমি জ্ঞানদাতা, শক্তিদাতা, অন্নদাতা, স্বাস্থ্যদাতা; তুমিই পরিপুষ্টি

---

compared to a cow. By its cutting and dividing *ploughing* is to be understood. The meaning of the decree issued by Ahura Mazda and the heavenly council is that the soil is to be tilled; it therefore enjoins agriculture as a religious duty.'—Dr. Haug, *Essays*.

* আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবম্বিধ মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'সত্যার্থ-প্রকাশ" গ্রন্থে এতদ্বিষয়ক আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

† "These words *Humatem* (well-thought), *Hukhtem* (well-spoken), *Hvarshtem* (well done) contain the fundamental principles of Zoroastrian morality and are repeated habitually on many occasions.'

‡ "সনা চ সোম জেষি চ পবমান মহি শ্রবঃ। অথানো বস্যসস্কৃধি।
সনা জ্যোতিঃ সনা স্বর্বিশ্বা চ সোম সৌভগা। অথা নো বস্যসস্কৃধি।
সনা দক্ষ মুত ক্রতুমপ সোম মৃধো জহি। অথানো বস্যসস্কৃধি।"

ও উন্নতি-বিধায়ক। তুমি আমার প্রতি সদয় হও, আমার মঙ্গল-বিধান কর।' বেদোক্ত সোমকে যাঁহারা লতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, জেন্দ-আভেস্তায়ও তাঁহারা উহার সেই অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ফলতঃ, যে দিক দিয়াই যিনি দেখিয়াছেন, সেই দিকেই তিনি সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন। ভাষায় সাদৃশ্য, * ভাবে সাদৃশ্য আচার-ব্যবহারে সাদৃশ্য, ধর্ম্ম-কর্ম্মে সাদৃশ্য,—সাদৃশ্য কোথায় নাই? সেই সাদৃশ্য দেখিলে, সেই সাদৃশ্যের বিষয় আলোচনা করিলে এক হইতে অন্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে—একের শাখা-প্রশাখারূপে অন্যের উদ্ভব বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। জোরওয়াষ্টার যে বলিয়াছিলেন,—'তিনি নূতন কিছু প্রচার করিতে অবতীর্ণ হন নাই; তিনি পুরাতনেরই প্রতিষ্ঠার জন্য আসিয়াছিলেন'; ইরাণীয়গণের ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে, জোরওয়াষ্টার-কথিত সেই পুরাতনকে এই পুরাতন আর্য্য-ধর্ম্ম বা হিন্দু-ধর্ম্ম বলিয়াই মনে হয়। তিনি এক স্থলে আপনাকে 'মাথ্রাণ' অর্থাৎ 'মন্ত্রোচ্চারণকারী দূত' বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে মন্ত্র—কোন্ মন্ত্র;—সে দূত—কোন্ সমাচার প্রচার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? ডক্টর হোগ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন,—'জোরওয়াষ্টার বেদোক্ত ধর্ম্মেরই প্রচার কল্পে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' তিনি বলেন,—'গাথা অংশে আমরা দেখিতে পাই, জারাথস্ত্র প্রাচীন ধর্ম্মমতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সাওসন্ত এবং অথর্ব্বাদিগের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণকে অঙ্গ্রের অর্থাৎ বেদোক্ত অঙ্গিরাদিগের সম্মান করিতে বলিয়াছেন।' † আর্য্যহিন্দুগণের সহিত ইরাণীয়গণের সাদৃশ্য-তত্ত্ব যিনি যে ভাবেই আলোচনা করুন না কেন; আমরা পূর্ব্বেও যাহা বলিয়াছি, উপসংহারেও সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছি;—জোরওয়াষ্টার নূতন কিছু প্রচার করিতে আবির্ভূত হন নাই; তিনি এই পুরাতনেরই—আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই—এক অঙ্গের সেবা করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালে উভয়ের মধ্যে বিষম পার্থক্য সংঘটিত হইলেও মূলে উভয়েই এক ছিল।

---

* ভাষাগত সাদৃশ্যের বিষয় আমরা যাহা উল্লেখ করিয়াছি (২১-২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে আরও কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন,—পূর্ব্বে পারস্য-দেশে সংস্কৃতই প্রধান ভাষা ছিল। সংস্কৃত হইতে যেরূপে পালি-ভাষার উৎপত্তি হয়, সংস্কৃত হইতে জেন্দ-ভাষাও সেইরূপ-ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। ফাদার পোলো ডি সেণ্টবার্থেলমি (Father Paulo de St. Barthelemy) এ বিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিয়া ডারমেষ্টেটর বলেন,—"His conclusions 'were that in a far remote antiquity Sanskrit was spoken in Persia and India and that it gave birth to the Zend language." ডারমেষ্টেটর আরও বলেন—"In 1808 John Lydon regarded Zend as a *Prakrit* dialect parallel to *pali*. *** In the eyes of Erskipe Zend was a Sanskrit dialect imported from India by the founders of Mazdaism, but never spoken in Persia." পিটার ভন বোহলেনের (Peter von Bohlen) মত আলোচনা করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন,—'According to him Zend is a Prakrit dialect as it has been pronounced by Jones, Lyden and Erskine.'

† "In the Gathas (which are the oldest parts of the Zend Avesta), we find Zarathustra alluding to old revelation, (Yes. XL. VI. 6). and praising the wisdom of saoshyants, athervas the fire priests. &c.......In his own works, he (Zarathustra) calls himself a *mathran*, reciter of mantras, a *duta*, messenger sent by Ahura Mazd."—Haug *Essays*.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

[সৃষ্টি বিষয়ে তিনটী প্রধান মত,—অন্যান্য সকল মতই সেই তিন মতের অন্তর্ভুক্ত ;—সৃষ্টি-সম্বন্ধে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মত,—প্রাচীন পারসিকগণের 'জোরওয়াষ্ট্রিয়ানিজম' ধর্ম্মে, ইহুদীগণের 'জুডাইজম্' ধর্ম্মে, খৃষ্টানদিগের 'খৃষ্ট'-ধর্ম্মে, মুসলমানদিগের 'ইসলাম' ধর্ম্মে যে যে মত পরিব্যক্ত ;—চীনে ও মিশরে সৃষ্টি-তত্ত্ব-বিষয়ক মত,—ফিনিসীয়া ও বাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশে সৃষ্টির উপাখ্যান ;—আফ্রিকার ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য-জাতি-সমূহের মতে সৃষ্টি-তত্ত্ব ;—সৃষ্টিতত্ত্বে আমেরিকা,—আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৃষ্টি-সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচলিত ;—পলিনেশীয়ায় সৃষ্টি-সংক্রান্ত মত ;—আদিতে মনুষ্য-সৃষ্টি—ইরাণীয়গণের, ইহুদীগণের, খৃষ্টানগণের, মুসলমানগণের ধর্ম্মগ্রন্থ মতে আদি-মনুষ্য-সৃষ্টির প্রসঙ্গ ;—পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতে পৃথিবীর সৃষ্টি-বিবরণ,—আদি-দার্শনিক থেলিস ও তাঁহার মত ;—অ্যানাক্সিমান্দার ও অ্যানাক্সিমেনিস ;—"আইওনিক" দর্শন ;—পীথাগোরাস ও পীথাগোরীয় দর্শন ;—জেনোফেনস্, জেনো, হিরাক্লিটাস ;—ইলীয় দার্শনিক সম্প্রদায় ;—এম্পিডোক্লিসের মত ;—ডেমক্রিটাস ও লিউসিপ্পাস,—তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত পরমাণুবাদ ;—অনাক্সাগোরাস ও সফিষ্ট-গণ ;—প্রটোগোরাস ও জর্জ্জিয়স ;—সক্রেটিস ও তাঁহার দার্শনিক মত ;—প্লেটো ও আরিষ্টটল,—আরিষ্টটলের সংখ্যাবাদ ;—ষ্টোইক, এপিকিউরীয়, স্কেপ্টিক, নিও-প্লাটনিক প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায় ;—বেকন, ডেকার্টে, স্পিনোজা, লিবনিজ, গ্যালিলিও প্রভৃতি ;—জর্ম্মণ-দেশে দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা,—গ্রেট-ব্রিটেনে দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা ;—সকল মতেই ত্রিবিধ মতের প্রাধান্য ;—'অ্যাটমিক থিওরী' বা পরমাণুবাদ-তত্ত্ব,—রসায়ন-শাস্ত্রে ডাল্টনের মত,—'ইভলিউসন' বা ক্রমবিকাশ,—ঐ মতের আদি,—ডারউইনের গ্রন্থে এবং হেকেল প্রভৃতির গ্রন্থে ক্রমবিকাশ-মতের প্রতিষ্ঠা ;—'নেবিউলার থিওরি' বা অনবস্থাপিত জ্যোতিঃপিণ্ড হইতে সৃষ্টি-বিষয়ক মত,—লাপ্লেস, রোস, হিগিন্স্, হার্সেল প্রভৃতির গবেষণা ;—শক্তি-সংঘাতে 'ইথার' দ্বারা সৃষ্টি-রহস্য,—জড় ও চৈতন্য বিষয়ক পাশ্চাত্য মত,—ভূ-তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, খনিজ-তত্ত্ব, জ্যোতিষ-তত্ত্ব প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা বৈজ্ঞানিক মত ;—বিবিধ বিষয়ক আলোচনা।]

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৃষ্টি-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই,—কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বা কোনও জাতির কোনও মতই নূতন নহে; পরন্তু সকলের মধ্যেই আমাদের এই পুরাতন সনাতন ধর্ম্ম-মতেরই ছায়াপাত হইয়াছে। সৃষ্টি-তত্ত্ব সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ মতের আলোচনা করিলে, প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রথম,—সৃষ্টি অনন্ত; সৃষ্ট-পদার্থ একরূপে না-একরূপে অনন্ত কাল বিদ্যমান আছে ও থাকিবে; বিশ্বরূপে বিশ্বনাথের বিদ্যমানতা, এই মতেরই অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়,—আদিতে সকলই শূন্যময় ছিল; স্রষ্টার ইচ্ছাক্রমে সৃষ্ট-পদার্থ-সমূহ উৎপন্ন হইল; অর্থাৎ, অবিদ্যমান্ হইতে বিদ্যমানের সৃষ্টি। এ হিসাবে বিদ্যমান বস্তুর অবিদ্যমানতা বা ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয়,—নৈসর্গিক নিয়মে সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ; অর্থাৎ, একের

সৃষ্টি বিষয়ে ত্রিবিধ মত।

সহিত অঙ্গের সংযোগ বিয়োগে সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ হইতেছে। বলা বাহুল্য, সৃষ্টি-সম্বন্ধে পৃথিবীতে যত মত প্রচলিত আছে, সর্ব্ববিধ মতই এই তিন মতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রধান প্রধান ধর্ম্মে সৃষ্টি-তত্ত্ব।

হিন্দু-ধর্ম্ম ভিন্ন, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মে সৃষ্টি-সম্বন্ধে কি মত প্রচলিত আছে, প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। সৃষ্টি-সম্বন্ধে প্রাচীন পারসিকগণের মত পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। * তাঁহাদের জেন্দ-আভেস্তা নামক ধর্ম্ম-গ্রন্থে সৃষ্টি-বিষয়ে স্রষ্টার ইচ্ছাই প্রাধান্য লাভ করিয়া আছে। জেন্দ-আভেস্তার মতে,—অহুর-মজ্দের ইচ্ছাক্রমে পৃথিবী ও মনুষ্যাদি প্রাণি-সমূহ সৃষ্ট হইয়াছিল। তবে জেন্দ-আভেস্তার প্রাচীনতম অংশ-বিশেষে, যশ্ন—ত্রিংশ অধ্যায়ে, দুই জন সৃষ্টি-কর্ত্তার আভাষ পাওয়া যায়। সে মতে,—সৎপদার্থের বা সদ্‌গুণ-সমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন; এবং অসৎ-পদার্থের বা অসদ্‌গুণের সৃষ্টিকর্ত্তা অপর একজন। সংসারের যত কিছু সৎ-সামগ্রী, অহুরমজ্দ্ তৎসমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন; আর যত কিছু অসৎ-সামগ্রী, তৎসমুদায় অঙ্গ্রমৈন্যু (অঙ্গিরা মুনি?) সৃষ্টি করিয়াছেন। অহুর-মজ্দ্ সৎস্বরূপ; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ এবং অনন্ত আলোকের আধার। অঙ্গ্রমৈন্যু বা অসদাত্মা—সীমাবদ্ধ-জ্ঞানসম্পন্ন এবং অনন্ত অন্ধকার স্বরূপ। ইরাণীয়গণের ধর্ম্মগ্রন্থে প্রকাশ,—ঐ দুই সৃষ্টিকর্ত্তা আপন আপন স্বভাবের অনুরূপ প্রাণি-সমূহ সৃষ্টি করেন। তিন সহস্র বৎসর কাল ঐ দুই সৃষ্টি-কর্ত্তার দ্বিবিধ সৃষ্ট-প্রাণী দুইটী কল্পনা-রাজ্যে অবস্থিত ছিল। তৎপরে অসদাত্মা অঙ্গ্রমৈন্যু, সদাত্মার সৃষ্ট-প্রাণীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। সেই বিবাদের ফলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি-সর্ত্ত ধার্য্য হইয়াছিল। তাহাতে অহুর-মজ্দ্ নির্দ্দেশ করিয়া দেন,—সংসারে নয় হাজার বৎসর অঙ্গ্রমৈন্যুর প্রাধান্য থাকিবে; তন্মধ্যে মধ্যের তিন সহস্র বৎসর তিনি সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবেন। ইরাণীয়গণের ধর্ম্ম-গ্রন্থে আরও লিখিত আছে,—'পবিত্রাত্মা অহুর-মজ্দ্ একটী বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শেষোক্ত তিন সহস্র বৎসর অঙ্গ্রমৈন্যুকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলেন। সেই সময়ে অহুর মজ্দ্ কর্ত্তৃক স্বর্গীয় দূত-সমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্ট হয়। সেই সময়েই সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতিকে অহুর-মজ্দ্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার পর আপনার সৃষ্ট দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া অসদাত্মা অঙ্গ্রমৈন্যু পুনরায় অহুর-মজ্দের সৃষ্ট-পদার্থ-সমূহ ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হয়। তখন, অহুর-মজ্দের সৃষ্ট আকাশ, জল, পৃথিবী, গ্রহ-উপগ্রহ, প্রাণি-সমূহের আদিভূত বৃষ এবং সৃষ্টির আদি-মনুষ্য 'গেওমাড' বা 'কেউমার্থ' প্রভৃতির সহিত দৈত্যগণের ঘোর যুদ্ধ চলিতে থাকে। অহুর-মজ্দ্ ও অঙ্গ্রমৈন্যুর বিবাদ-প্রসঙ্গে প্রধানতঃ চারিটী ভাব মনে উদয় হইতে পারে। প্রথম—পৃথিবী তিন কালে বিভক্ত; প্রতি কালের পরিমাণ—তিন সহস্র বৎসর। দ্বিতীয়,—নির্দ্দিষ্ট-কালে অসদাত্মা অঙ্গ্রমৈন্যুর আধিপত্য-লাভ। তৃতীয়,—আদিতে কোনও পদার্থের বিদ্যমানতার অভাব। চতুর্থ,—ছয় প্রকার সৎপ্রাণীর সৃষ্টি-প্রসঙ্গ। জেন্দ আভেস্তার মতে, সৃষ্টির ছয় স্তর; তাহার ষষ্ঠ বা শেষ স্তরে মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইরাণে সৃষ্টি-তত্ত্ব।

---

* এতদ্বিষয়ে এই গ্রন্থের ৩৮শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহুদীদিগের জুডাইজম্ ধর্ম্মের, খৃষ্টানদিগের খৃষ্ট-ধর্ম্মের এবং মুসলমানদিগের ইস্লাম * ধর্ম্মের সৃষ্টি-প্রসঙ্গে ঈশ্বরের প্রধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। খৃষ্ট-ধর্ম্ম,—ইহুদীদিগের

জুডাইজম ও খৃষ্ট ধর্ম্মে সৃষ্টি-তত্ত্ব।

জুডাইজম্ ধর্ম্মের সন্ততি মধ্যে পরিগণিত। সৃষ্টি-সম্বন্ধে জুডাইজম্ ধর্ম্মে যে মত মান্য হইয়া আসিতেছে, খৃষ্টানগণও সেই মতই মান্য করিয়া থাকেন। খৃষ্টান-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ 'বাইবেল'†—ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ও নিউ টেষ্টামেণ্ট নামক দুই অংশে বিভক্ত। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট অংশ বা তদন্তর্গত গ্রন্থ-সমূহ ইহুদীগণ মান্য করেন। খৃষ্টানগণও ওল্ড টেষ্টামেণ্টের অন্তর্গত কয়েক খানি গ্রন্থ ভিন্ন সমস্তই মানিয়া থাকেন। সেই ওল্ড টেষ্টামেণ্টের একটী অংশের নাম—'জেনিসিস'। জেনিসিস অংশেই সৃষ্টি-প্রকরণ পরিবর্ণিত আছে। এ অংশ ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমভাবে আদরণীয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে পৃথিবীর ও প্রাণি-সমূহের সৃষ্টি হইল, অবিদ্যমান বা শূন্য হইতে এই বিদ্যমান বা জীবজন্তু-উদ্ভিদাদি-সমন্বিত পৃথিবীর উৎপত্তি হইল,—ইহুদীদিগের জুডাইজম্ ধর্ম্মের ইহাই প্রধান শিক্ষা। ইহুদীগণ পুরাকালে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। তখন জিহোবা তাঁহাদের সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ‡ কিন্তু কালক্রমে জিহোবা ইহুদী-গণের একমাত্র দেবতা বা পরমেশ্বর মধ্যে পরিগণিত হন। ইহুদীগণ তখন জিহোবাকেই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মান্য করেন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে (ইশিয়া খণ্ডে) এই একেশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় একটী বাক্যে এই ভাবে লিখিত আছে,—'উপরের দিকে দৃষ্টিপাত কর; যিনি এই বিশ্ব-সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।' § খৃষ্টানগণের মধ্যে আজিকালি সৃষ্টি-বিষয়ে যদিও নানা গবেষণা চলিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে বিনা-অবলম্বনে শূন্য হইতে যে এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। অপিচ, 'জেনিসিস' অংশের সৃষ্টি-প্রকরণ—কিবা ইহুদী কিবা খৃষ্টান—কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। জেনিসিস গ্রন্থে সৃষ্টি-প্রকরণ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—'জিহোবা ইলোহিম যখন পৃথিবী ও স্বর্গ সৃষ্টি করেন, পৃথিবীতে তখন তৃণশস্প বা বৃক্ষলতাদি কিছুই

* ইসলাম শব্দের মূল—ক্রিয়াবাচক 'সালাম' শব্দ। সালাম শব্দের অর্থ—সম্পূর্ণ শান্তিতে থাকা, কর্ত্তব্য পালন করা ইত্যাদি। সালাম শব্দের বিশেষ্য—ইসলাম; অর্থ—শান্তি, মুক্তি, নিরাপদ ইত্যাদি। সাধারণতঃ মুসলমানগণের বিশ্বাস, ইসলাম শব্দের অর্থ—সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ। অধুনা কেহ কেহ ইসলাম শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করেন—ধর্ম্মানুসন্ধান, সত্যপ্রিয়তা। ইসলাম সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, ৫০৩ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† বাইবেল (Bible) শব্দের ধাতুগত অর্থ—গ্রন্থ বা পুস্তক। অধুনা ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট ও নিউ টেষ্টামেণ্টের অন্তর্গত গ্রন্থ-সমূহ 'বাইবেল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহুদীগণ আপনাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থকে 'কারা' ও 'মিক্রা' নামে অভিহিত করিতেন। 'মিক্রা' শব্দের অর্থ—পাঠ, অভিভাষণ ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন, —ইহুদীগণের 'কারা' শব্দ হইতেই "কোরাণ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

‡ রাজা সলোমন আপন রাজধানীতে জিহোবার মন্দিরের পার্শ্বে অন্যান্য বহু দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেবতার অর্চ্চনার প্রথা প্রচলিত ছিল, ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়।

§ "Lift up your eyes on high and behold who hath created these things"—Isaiah, xl, 26.

ছিল না। কারণ, জিহোবা ইলোহিম তখন পৃথিবীতে বারিবিন্দুপাত করেন নাই; এবং ভূমি-কর্ষণের জন্য কোনও মনুষ্যও বিদ্যমান ছিল না। পরিশেষে যখন জল-প্রবাহ উত্থিত হইয়া ভূমিতল সিক্ত করিয়াছিল, সেই সময় জিহোবা ইলোহিম ধূলি লইয়া একটী মনুষ্য সৃষ্টি করেন, এবং তাহার নাসারন্ধ্রে জীবন-বায়ুর সঞ্চার করিয়া দেন। তাহাতে সেই মানুষ জীবনী-শক্তি লাভ করে। জিহোবা ইলোহিম পূর্ব্বদিকে ইডেন উদ্যান রচনা করিয়া আপন-সৃষ্ট মনুষ্যকে সেই উদ্যানে স্থাপন করেন।' * হিব্রু-ভাষায় লিখিত আদি জেনিসিস-গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত জিহোবা ইলোহিম শব্দে খৃষ্টানগণ 'সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া লইয়াছেন। হিব্রু-ভাষায় লিখিত ওল্ড টেষ্টামেণ্ট যখন ভাষান্তরিত হয়, তখন জিহোবা ইলোহিমের পরিবর্ত্তে 'অলমাইটী গড' বা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছিল। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের অন্য অংশে এই সৃষ্টি সম্বন্ধে আরও লিখিত আছে,—'প্রথমে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। পৃথিবী তখন আকৃতিহীন শূন্যময় ছিল। তখন সকলই জলপূর্ণ ঘোর অন্ধকারময়। ঈশ্বর আদেশ করেন,—জলরাশির মধ্যে অন্তরীক্ষের উৎপত্তি হউক। ঈশ্বর আদেশ করেন,—'স্বর্গের নিম্নস্থিত জলরাশি একত্রীভূত হউক, এবং ঋতু বর্ষ মাস দিবস বুঝা যাউক। ঈশ্বর তখন দুইটি বৃহৎ আলোকপিণ্ড সৃষ্টি করিলেন। বৃহত্তর আলোক দ্বারা দিবাভাগ ও স্বল্পতর আলোক দ্বারা রাত্রিভাগ শাসিত হইতে লাগিল। অতঃপর ঈশ্বর তারাদলের সৃষ্টি করিলেন।' † বাইবেলের মতে সৃষ্টির ক্রমপর্য্যায় নির্দ্দেশ করিতে হইলে, বলিতে হয়—ঈশ্বর প্রথমে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই বিশ্ব বলিতে স্বর্গের ও পৃথিবীর বিষয় বোধগম্য হয়। আদিতে পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা ছিল?—পৃথিবী অন্ধকারপূর্ণ ও জলময় শূন্যস্বরূপ বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পরিশেষে দেখিতে পাই,—সৃষ্টির প্রথম দিনে ঈশ্বর আলোক সৃষ্টি করেন; দ্বিতীয় দিনে অন্তরীক্ষ, তৃতীয় দিনে শুষ্ক মৃত্তিকা ও তৃণ-

* "At the time when Yahweh Elohim made earth and heaven,—earth was as yet without bushes, no herbage was as yet sprouting, because Yahweh Elohim had not caused it to rain upon the earth, and no men were there to till the ground but a stream used to go up from the earth and water all the face of the ground :—Then Yahweh Elohim formed the man of dust of the ground and blew into his nostrils breath of life, and the man became a living being. And Yahweh Elohim planted a garden in Eden eastward ; and there he put the man whom he had formed."—*Genesis* II 46—48 জেহোবা (জিহোবা) এবং ইলোহিম দুইটী শব্দে ঈশ্বরকে দুই প্রকার কার্য্যের নিয়ন্তা বলিয়া বুঝা যায়। হিব্রু-ভাষায় ইলোহিম শব্দে যে ঈশ্বরকে বুঝায়, তিনি সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কার্য্যের নিয়ন্তা। কিন্তু জেহোবা শব্দে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকেই বুঝাইয়া থাকে। জেহোবা ইলোহিম শব্দদ্বয়ে সে হিসাবে সত্যস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বরকেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

† "In the beginning God created the heaven and earth. And the Earth was without form and void : and darkness was upon the face of the deep. And God said, 'Let there be a firmanment in the midst of the water.' And the God said, 'Let the waters under the heaven be gathered together unto one place.' And God said, 'Let there be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night ; and let there be for signs and seasons, and for days and years : And God made two geat lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night ; he made the stars also."—*Old Testament.*

শস্য উদ্ভিদাদি, চতুর্থ দিনে সূর্য্য ও চন্দ্র, পঞ্চম দিনে মৎস্য ও পক্ষী, ষষ্ঠ দিনে জলচর জন্তু ও মনুষ্য। * জেনিসিসের অন্যত্র আবার (জেনিসিস, ১ম, ২৭) দেখিতে পাই,—সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর আপনা হইতে আপনার প্রতিরূপ মনুষ্য উৎপন্ন করিয়া তাহাকে পুরুষ ও স্ত্রী মূর্ত্তিতে পরিণত করেন।

ইসলাম ও বৌদ্ধধর্ম্মে সৃষ্টি-তত্ত্ব।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের † মতে নির্দ্দিষ্টকালে ঈশ্বর কর্ত্তৃক পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছিল ‡ এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে; অর্থাৎ, অবিদ্যমান্ হইতে বিদ্যমানের সৃষ্টি-প্রসঙ্গই কোরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন্ দিন্ কি ভাবে ঈশ্বর কোন্ পদার্থ সৃষ্টি করেন, মুসলমানগণের ধর্ম্মগ্রন্থে তাহা নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত আছে। ছয় দিনে সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঈশ্বর নিশ্বাস দ্বারা জীব-দেহে আত্মার সঞ্চার করেন। শরীর ও আত্মা স্বতন্ত্র। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থের মতে সৃষ্ট প্রাণীর চারি স্তর। প্রথম—'এঞ্জেল' বা স্বর্গীয় দূত; তাঁহারা অগ্নি হইতে উৎপন্ন; তাঁহারা নির্ম্মল এবং বিভিন্ন আকৃতি-ধারণে সমর্থ। তাঁহাদের পানাহারের প্রয়োজন হয় নাই; তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে না। জিব্রিল, মাইকেল আজবেল, ইস্রাফিল প্রভৃতি—স্বর্গীয় দূতগণের প্রধান-স্থানীয়। স্বর্গীয় দূতগণের পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে 'জিন' § নামক দুষ্টাত্মার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ আছে; তাহারা মরু-প্রদেশে বসতি করে; ধূমশূন্য অগ্নি হইতে তাহারা উদ্ভূত; তাহারা জন্মমৃত্যুর অধীন; তাহারা দৈত্যদানবের ন্যায় অনিষ্টকারী। সৃষ্টির তৃতীয় স্তরে—মনুষ্য। চতুর্থ বা সর্ব্বনিম্ন স্তরে—সয়তান। সয়তানগণের সৃষ্টি-সম্বন্ধে লিখিত আছে—তাহারা পূর্ব্বে এঞ্জেল বা স্বর্গীয় দূত ছিল।

---

* কোন্ দিন ঈশ্বর কোন্ সামগ্রী সৃষ্টি করেন, তৎসম্বন্ধে জেনিসিস অংশে ত্রিবিধ মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদন্তর্গত মোজেসের মতে, ঈশ্বর প্রথম দিনে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিনে জল ও অন্তরীক্ষ, তৃতীয় দিনে শুষ্ক ভূখণ্ড, তৃণ, পক্ষী ও ফলোৎপন্নকারী বৃক্ষাদি, চতুর্থ দিনে আলোক-সমূহ—সূর্য্য, চন্দ্র ও তারাদল, পঞ্চম দিনে গতিশীল প্রাণি-সমূহ—জলচর পক্ষী ও মৎস্যাদি; ষষ্ঠ দিবসে, গৃহ-পালিত পশু, হিংস্র জীব-জন্তু, সরীসৃপাদি এবং মনুষ্য। *Vide* Genesis, I, 1—26.

† "কোরাণ" শব্দের অর্থ—পাঠ। উহার অপর নাম—আল-কিতাব, অর্থাৎ গ্রন্থ। 'আল-ফার্কান' বা ভেদজ্ঞাপক নামেও উহা অভিহিত হইয়া থাকে। কোরাণের পঞ্চান্নটী ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। কথিত হয়, মহম্মদ তেইশ বৎসর যে সকল তত্ত্ব-কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যগণ কোরাণে সেই সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান। কোরাণের বিভাগাদি সম্বন্ধে "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ "There is God for you,—your lord! There is no God but He, the creator of every thing; then worship Him, for He over everything keeps guard."—The *Quoran* VI, 101, as translated by E. H. Palmer.

§ কোরাণের প্রসিদ্ধ অনুবাদক ডক্টর সেল অনুসন্ধান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, স্বর্গদূত সংক্রান্ত অভিব্যক্তিতে মহম্মদ ইহুদীদিগের মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায়। এদিকে ইহুদীগণ আবার প্রাচীন পারসিকদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহুদীগণই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 'জিন' সম্বন্ধে তিনি বলেন, ইহুদীদিগের মধ্যে সেডিম (Shedim) নামক এক শ্রেণীর দৈত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জিনগণ (Jin) তাহাদিগেরই রূপান্তর। *Vide* Dr. Sale, *The Koran*, Preliminary Discourse.

কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ পালন না করায় তাহারা স্বর্গভ্রষ্ট হয়। তাহারা সমস্ত অসৎ কার্য্যের নিয়ন্তা। স্বর্গ, পৃথিবী ও প্রাণি-সমূহের সৃষ্টি-সম্বন্ধে কোরাণের একচত্বারিংশ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। এক স্থলে,—প্রাচীনকালে ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্বর্গ ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ ছয় দিনে সৃষ্ট হয়। * অন্যত্র,—যিনি দুই দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তোমরা কি তাঁহাকে অবিশ্বাস কর? তাঁহার কি কেহ সমকক্ষ আছে? তিনিই পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর। তিনি চারি দিনে পৃথিবীর উপর উচ্চচূড় সুদৃঢ় পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; পৃথিবীকে নানা সম্পদে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন; সকলের পরিপুষ্টির উপযোগী সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন; তৎকালে সমস্তই ধূমবৎ অবস্থিত ছিল। তিনি স্বর্গকে এবং পৃথিবীকে আহ্বান করিয়া বলেন,—'তোমরা এস; ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, তোমরা আমার আদেশ পালন কর।' স্বর্গ ও পৃথিবী তখন উত্তর দেয়,—'আমরা আপনার আদেশানুবর্ত্তী হইয়াই আসিলাম।' † অন্যত্র,—তিনি দুই দিনে সাতটী স্বর্গের সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক স্বর্গেই তাঁহার মহিমার বিষয় উপলব্ধ হয়। আর এক স্থলে,—ঈশ্বর ধূলা হইতে মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া পরে তাহাতে প্রাণদান করেন, এবং স্ত্রী-পুরুষ বিভাগ করিয়া দেন। অন্যত্র আবার,—ঈশ্বর শনিবারে পৃথিবী, রবিবারে পর্ব্বত, সোমবারে বৃক্ষাদি, মঙ্গলবারে অপ্রীতিকর দ্রব্যাদি, বুধবারে আলোক, বৃহস্পতিবারে পশ্বাদি এবং শুক্রবারে বৈকালিক উপাসনাকালের পর আদম নামক প্রথম মনুষ্যকে সৃষ্টি করেন। ‡ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মত,—'এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই; বিশ্ব-সংসার অনন্তকাল বিদ্যমান আছে এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকিবে; চিরকালই বিশ্বের একরূপ আকৃতি আছে এবং একরূপ আকৃতিই থাকিবে। কর্ম্মানুসারে প্রাণি-সমূহ সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে মাত্র।' এবম্বিধ প্রধান প্রধান প্রাচীন ধর্ম্মমতের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, প্রায় সকলেই ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; কচিৎ কেহ সৃষ্টিকর্ত্তার প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। প্রথমে প্রথমোক্ত মতই প্রবল ছিল; কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গবেষণার ফলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মত প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সৃষ্টি-প্রসঙ্গ।

চীনের ও মিশরের প্রাচীনত্ব, অন্যান্য দেশের তুলনায়, অবিসম্বাদিত। সুতরাং ঐ দুই দেশের প্রাচীন ইতিহাসে সৃষ্টি-তত্ত্ব বিষয়ে কি তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত থাকিলেও প্রধানতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে পৃথিবী এবং পৃথিবীর প্রথম প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, চীনে এই মতই প্রবল হইয়া আছে। প্রাচীন চীনাদিগের সাহিত্যে চীনাদিগকে চীন-দেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহারা

সৃষ্টি-সম্বন্ধে চীন ও মিশর।

* The *Koran*, Surah, xli, 8.

† He applied himself to the heaven, which was but a smoke: and to it and to the earth He said, "Come ye, in obedience or against your will?" and they both said,—"We come obedient."—The *Koran*. Surah xli. 5.

‡ Thomas Patrick Hughes, *A Dictionary of Islam*.

যে অন্য কোনও দেশ হইতে চীনে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, চীন-দেশের প্রাচীন সাহিত্যের কোনও অংশে সে কথা লিখিত হয় নাই। * চীন-দেশে ঈশ্বর যে প্রথম মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি 'পাং-কু' নামে পরিচিত। পাং-কুর উৎপত্তির দশ লক্ষ বৎসর পরে চীন-দেশে দশটী রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রথম—দেবগণের রাজত্ব, দ্বিতীয়—উপদেবগণের রাজত্ব, তৃতীয়—নরগণের রাজত্ব, চতুর্থ—'জুচান'-গণের রাজত্ব, পঞ্চম—সুইজন বা অগ্ন্যুৎপাদকগণের রাজত্ব; ইত্যাদি। এবম্বিধ নামধেয় দশটী রাজবংশ পৌরাণিক যুগের রাজবংশ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ইতিহাসে চীনের প্রথম রাজার নাম—ফু-হিয়া। তিনি চীনের প্রথম সম্রাট বলিয়া অভিহিত। তাঁহার রাজত্ব-কাল পাশ্চাত্য মতে, ২৮৩২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৩০৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ। প্রথম মনুষ্য পাং-কুর সৃষ্টির পর ক্রমান্বয়ে চীন-দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল,—ইহাই চীনের সৃষ্টি-প্রকরণের প্রাচীন ইতিহাস। সৃষ্টি-সম্বন্ধে মিশরের প্রাচীন অধিবাসিগণের বিশ্বাস,—পৃথিবীর সমস্ত পদার্থেরই বীজ 'নুন' বা 'নু' নামক বন্যার প্রকোপে জলময় ও অ-দৃষ্ট ছিল। মিশরের কোনও কোনও প্রদেশের অধিবাসীদিগের বিশ্বাস,—সৃষ্টিকর্ত্তা 'খুণুম' প্রথমে ডিম্বাকার পৃথিবী এবং পরে মনুষ্য সৃষ্টি করেন। অন্যত্র আবার প্রচার,—শিল্পনিপুণ ঈশ্বর 'টা, হাতুড়ী দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ডিম্ব ভাঙ্গিয়া ফেলেন; সেই ডিম্বের মধ্য হইতেই পৃথিবী ও প্রাণিগণের উৎপত্তি হয়। কাহারও কাহারও মতে, 'থোথ' বা চন্দ্রদেবতার আদেশক্রমে পৃথিবী উত্থিত হন। অধিকাংশের মতে 'রা' বা রে—সূর্য্য-পৃথিব্যাদি সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা। অন্য মতে,—মিশরের প্রথম রাজার নাম—রা বা রে (সূর্য্যদেবতা)। মনুষ্যগণ তাঁহাকে সম্মান করে নাই বলিয়া বৃদ্ধ বয়সে তিনি বড়ই রুষ্ট হন। প্রথমে তিনি মনুষ্য-সমাজকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। পরিশেষে স্বর্গীয় গাভীতে আরোহণ করিয়া তিনি নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। তাঁহার সৃষ্ট সেই পৃথিবীর নামই—স্বর্গ। মিসরীয়গণের মধ্যে প্রচলিত এই সকল পৌরাণিক উপাখ্যানাদি হইতে (১) পদার্থ-সমূহের বীজের বিদ্যমানতার, (২) ভীষণ বন্যার, (৩) ডিম্বের বা ডিম্বাকার পৃথিবীর এবং (৪) একাধিক সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় পাই। উহাদের মধ্যেও 'রা' বা 'রে' (সূর্য্যদেবতা), অথবা 'থোথ' বা চন্দ্র-দেবতার ইচ্ছায় বা আদেশে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া যে কিংবদন্তী প্রচারিত আছে, তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। অব্যবস্থাপিত জড়পদার্থ-সমূহ জ্ঞান-শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল,—এ মতও প্রাচীন মিশরীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয়গণ বিশ্বাস করিতেন,—'পৃথিবী নিয়ত ধ্বংসের পথে অগ্রসর। জল ও অগ্নি দ্বারা সেই ধ্বংস-ক্রিয়া সাধিত হইতেছে। অগ্নি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং সেই ভস্ম হইতে পুনরায় পৃথিবীর উদ্ভব,—পর্য্যায়ক্রমে এই নিয়মে সৃষ্টি-ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে।'

* "Chinese literature contains no record of any kind which might justify us in assuming that the neuclus of the nation may have emigrated from some other part of the world."—Encyclopædia Britannica, Ed XI.

‡ P-An-Ku. the first human being, was followed by ten distinct periods of sovereign etc."

ফিনিসীয়া, বাবিলোনীয়া এবং গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন জনপদ-সমূহে সৃষ্টি-সম্বন্ধে বহু অভিনব মত প্রচলিত ছিল। ঐ সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাসে পৃথিবী-ধ্বংসকারী বন্যার বিবরণ, ডিম্বের উৎপত্তি এবং ডিম্ব হইতে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি প্রভৃতির বিষয় লিখিত আছে। যে জাতির অভ্যুদয়ে ফিনিসীয়া ইতিহাসে প্রতিষ্ঠান্বিত, তাঁহারা যদিও অন্য দেশ হইতে আসিয়া ফিনিসীয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে; কিন্তু ফিনিসীয়ার আদি-উৎপত্তি-সংক্রান্ত উপাখ্যান বড়ই কৌতূহলপ্রদ। ফিনিসীয়ার অধিবাসীদিগের বিশ্বাস ছিল,—'ক্রনস' নামক দেবতা ফিনিসীয়া ও তাহার অধিবাসীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত 'জেবেল-বিবলস্' প্রবর্ত্তিত মুদ্রায় ক্রনসের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। সেই মূর্ত্তিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ক্রনসের পশ্চাতে ও সম্মুখে দুই দিকে চক্ষু ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার ছয়টী পক্ষ; তন্মধ্যে কয়েকটী বিস্তারিত এবং কয়েকটী সঙ্কুচিত। প্রাচীন ফিনিসীয়দিগের মতে,—তিনিই এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রাচীন বাবিলোনিয়ার মত এই,—প্রথমে সংসার জলময় ছিল। অপস্থ ও তিয়ামাৎ (নর ও নারী) জলরূপে বিদ্যমান ছিলেন। তখন পৃথিবী, মনুষ্য, তৃণ-লতা বা বৃক্ষাদি কিছুই ছিল না। সেই সময়ে দেবতাগণ উৎপন্ন হন। সেই সকল দেবতা তিয়ামতের সন্তান-সন্ততি মধ্যে পরিগণিত। এক সময়ে তিয়ামতের সহিত দেবগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন মার্দ্দক (মেরোডাক) দেবতাগণের অধিপতি ছিলেন। তিনি তিয়ামতের সংহার-সাধন করেন। তিয়ামৎ আপনার সহায়তার জন্য যে দৈত্য-সমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মার্দ্দক তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখেন। অবশেষে মার্দ্দক কর্ত্তৃক তিয়ামতের দেহ বিখণ্ডিত হয়। সেই দেহের এক অংশে পৃথিবী এবং অপর অংশে স্বর্গ সৃষ্টি হইয়াছিল। তিয়ামৎ সাগর-রূপিণী। তাঁহার যে অর্দ্ধাংশ ঊর্দ্ধে চলিয়া যায়, বৃতি দ্বারা এবং প্রহরীর সাহায্যে মার্দ্দক তাহার (ঊর্দ্ধোত্থিত সমুদ্রজলের) নিম্নগতি রোধ করেন।* বাবিলোনীয়ার

ফিনিসীয়া ও বাবিলোনিয়া দেশে সৃষ্টির উপাখ্যান।

* "এনসাইক্লোপিডিয়া বিবলিকা" গ্রন্থে উদ্ধৃত কয়েকটী ছত্রে অপস্থ, তিয়ামৎ ও মার্দ্দকের প্রসঙ্গ এইরূপ বিবৃত আছে। নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—

"Long since when above | the heaven had not been named
when the earth beneath | (still) bore no name,
when Apsu the primæval, | the generator of them,
the originator (?) Tiamat, | who brought them both forth
their waters in one | together mingled,
when fields were (still) unformed | reeds (still) nowhere seen—
long since when of the Gods | not one had arisen
when no name had been named | no lot (been determined)
then were made | the Gods.
He smote her as a... | into two parts;
one half he took | he made it heaven's arch,
pushed bars before it | stationed watchmen,
not to let out its waters | he gave them as a charge.

—*Enclyclopædia Biblica.*

পৌরাণিক বৃত্তান্তে সৃষ্টি-সংক্রান্ত এই কয়েকটী সার তত্ত্ব উপলব্ধি হয় ;—(১) আদিতে সকলই জলময় ছিল ; (২) আদি-কালের আলোকের নাম—মার্দ্দিক ; অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনিই আলোকের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন ; (৩) জলপ্লাবনের বন্যাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা হইয়াছিল ; ইত্যাদি। বাবিলন দেশে 'কুনাইফরম' (অর্থাৎ তীরের বা অস্ত্রের অগ্রভাগ-সদৃশ শীর্ষ-যুক্ত) অক্ষরে খোদিত লিপি হইতে সৃষ্টি-প্রকরণ সম্বন্ধে ত্রিবিধ মতের বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রথম মতে,—মার্দ্দকের পরিবর্ত্তে 'বেল নিপ্পারকে' প্রধান ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তিয়ামৎ তাঁহারই নিকট পরাজিত হয় এবং তিনিই সৃষ্টি-ক্রিয়া আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় মতে প্রকাশ,—সৃষ্টির পর দেবতাগণের এবং মনুষ্যগণের রক্ষার জন্য তিয়ামতের সহিত দেবহিতৈষী প্রধান দেবতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই মতে তিয়ামৎকে 'ড্রাগণ' বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ড্রাগণের মূর্ত্তি—'আধ সর্প আধ অশ্বাকার' ; কেহ কেহ বলেন—'ড্রাগণ' পক্ষযুক্ত কুম্ভীর। উহার অগ্নিময় চক্ষু, মুকুট-শোভিত মস্তক, বিভীষণ নখযুক্ত থাবা। ড্রাগণ সর্ব্বদা অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে।' যাহা হউক, ড্রাগণ নিহত হইলে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন হয়। ড্রাগণের মস্তক ছিন্ন হওয়ার পর তিন বৎসর তিন মাস দিবা-রাত্রি পৃথিবীতে রক্তস্রোতে প্রবাহিত হইয়াছিল। তৃতীয় মতে,—প্রথমে উদ্ভিদাদি কিছুই ছিল না। সমস্তই জলময় ছিল। ক্রমশঃ সমুদ্র আপনা-আপনিই উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং তাহার মধ্য হইতে বাবিলনের প্রাচীন নগর-সমূহ ও মন্দিরাদি উদ্ভূত হয়। তবে মার্দ্দিকের প্রাধান্য সেখানে স্বীকার করা হইয়াছে। বাবিলন এবং তদন্তর্গত মন্দিরাদি উদ্ভূত হইলে মার্দ্দিক 'অনয়াকি' নামধেয় দেবগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেবগণের সৃষ্টির পর তিনি ঘাসের শিকর এবং ধূলা সৃষ্টি করেন। তাহা হইতে দেবগণের বাসোপযোগী মনোরম ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। 'অরুরু' নাম্নী দেবীর সাহায্যে তিনি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেবগণের নির্দ্দেশ অনুসারে মনুষ্যেরা ফলপূর্ণ বৃক্ষাদি উৎপন্ন করিতে সমর্থ হন।

আফ্রিকা মহাদেশের বন্য-জাতিদিগের মধ্যে সৃষ্টি-সম্বন্ধে একটী সাধারণ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এক সম্প্রদায়ের লোকের বিশ্বাস—মান্টিস-জাতীয় পতঙ্গই সৃষ্টির আদিভূত।

আফ্রিকার ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতির মত।

মান্টিস-জাতীয় পতঙ্গের মধ্যে 'কাগন' বা 'ইকাগন' পতঙ্গ পরমোপকারী দেবতা বলিয়া সম্পূজিত হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস—মান্টিসের স্ত্রী, কন্যা ও দৌহিত্র আছে। মান্টিস আপনার জামাতার পাদুকা হইতে দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের পাদুকা হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হন। চন্দ্রের বর্ণ রক্তিমাভ দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত বন্য-জাতিরা সিদ্ধান্ত করে,—মান্টিসের পাদুকায় রক্তবর্ণ ধূলা ছিল বলিয়াই চন্দ্রের ঐরূপ বর্ণ হইয়া থাকিবে। একটী বিড়ালের সহিত যুদ্ধে একবার মান্টিস পরাজিত হয়। * যাহা হউক, ঐ সকল জাতি মান্টিসকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। দক্ষিণ-আফ্রিকার হটেনটট জাতির মতে সৃষ্টিকর্ত্তার নাম—সুনি-গোয়াব। তাঁহার উপাসকগণ বলিয়া থাকেন—তিনিই অবিদ্যমান্ শূন্য হইতে এই বিদ্যমান্ বিশ্বের সৃষ্টি

* *Vide* Dr. Bleek's *Brief Account of Bushman Folklore.*

করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার জুলু জাতি প্রধানতঃ পিতৃপুরুষগণের উপাসক। তাহাদের মতে—পিতৃপুরুষগণের এক আদিপুরুষই এই সসাগরা ধরিত্রীর সৃষ্টিকর্ত্তা। জুলুরা বলে—সেই আদিপুরুষ বা সৃষ্টিকর্ত্তাই পৃথিবীর আদি-মনুষ্য। তাঁহার নাম—উনকুলুলু; তাঁহা হইতেই অন্যান্যের সৃষ্টি হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া প্রদেশের উত্তরাংশে যে সকল আদিম অধিবাসী বসতি করে, তাহারা বলে—পণ্ডজিল নামক পক্ষীই এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। সেই পক্ষীই পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য দেশের আদিম অধিবাসীদিগের বিশ্বাস—'মুরালি' অর্থাৎ অতি প্রাচীন কালের মনুষ্যগণই এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। *

আমেরিকার সৃষ্টি-প্রসঙ্গ।

আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মত-পরম্পরাই অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। কোথাও বা পক্ষী হইতে কোথাও বা বিশেষ বিশেষ জন্তু হইতে এই পৃথিবীর ও প্রাণি-সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত রহিয়াছে। উত্তর-আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি-মূলক এক অপরূপ প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সেই প্রতিমূর্ত্তি এক্ষণে পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। সেই অঙ্কিত প্রতিচিত্রে একটী কৃষ্ণবর্ণ কাক, মনুষ্যের মুখোসের উপর বসিয়া আছে। বোধ হইতেছে, যেন কাকটী তা দিয়া ডিম্ব হইতে মনুষ্য সৃষ্টি করিতেছে। এই চিত্র দর্শনে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন,—ডিম্ব হইতেই জীব-সমাকুল পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই আলাস্কা-বাসীর মত। সৃষ্টি-সম্বন্ধে আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান' জাতিদিগেরও ঐরূপ বিশ্বাস। উত্তর-পশ্চিম তীরের 'থিলিঙ্কিট ইণ্ডিয়ান' নামক অধিবাসিগণ কতকাংশে উক্ত মতের পোষকতা করিয়া থাকে। তাহাদের মতে, জেউ, জেল্‌চ অর্থাৎ দাঁড়কাক আপনিই উদ্ভূত হয়; সেই দাঁড়কাকই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা; উহা হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ দাঁড়কাক একটী বাক্স হইতে চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণকে বাহির করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে আলোক-রশ্মি আনয়ন করিয়াছিল। 'মনুষ্য-জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফ্রেডরিক রাজেল এই দাঁড়কাকের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। † উত্তর-আমেরিকার 'আল্‌গকিন্' জাতির মধ্যে সৃষ্টি-সম্বন্ধে কি মত প্রচলিত, ১৭০০ খৃষ্টাব্দে নিকোলাস পেরট তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ জাতির মতে—'মিকাবো' অর্থাৎ এক বৃহৎ খরগোস কর্ত্তৃক পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই খরগোস ভেলার সাহায্যে অন্যান্য জন্তুকে রক্ষা করিয়াছিল। ভেলার অবস্থিত জন্তুর মধ্যে তিনটীকে খরগোস-রাজ একে একে সমুদ্রের তলদেশে মাটি আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। সমুদ্রতল হইতে তাহারা অল্প বালুকাকণা লইয়া আসে। ‡ সেই বালুকা-কণা হইতে খরগোস-রাজ একটী দ্বীপের সৃষ্টি করেন। সেই দ্বীপটীই পৃথিবী। মৃতজন্তু-সমূহের অস্থি-কঙ্কাল লইয়া খরগোস-রাজ মনুষ্যের

* Maspero—*Dawn of Civilization* প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।
† Professor Friedrich Ratzel—*The History of Mankind* translated from the second German edition by A. J. Butler, M. A.
‡ Chamberlain, *Journal of American Folklore* এবং Brinton, *Myths of the New World*.

সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ জাতির মধ্যে জলপ্লাবন, প্রলয়, পুনঃ-সৃষ্টি প্রভৃতির বিষয়ও পরিবর্ণিত আছে। * ইরোকো নামক উত্তর-আমেরিকার আর এক জাতির মধ্যে সৃষ্টি-সম্বন্ধে যে মত প্রচলিত আছে, (১৫৯৩ খৃঃ—১৬৪৯ খৃঃ) ফাদার ব্রেবাফ তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সৃষ্টি-সম্বন্ধে ইরোকো জাতি কোনও জীব-জন্তুর কর্তৃক স্বীকার করে না। তাহারা বলে,—'উপরে স্বর্গ ও নিম্নে অনন্ত বারিধি ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। স্বর্গের একটী ছিদ্রের মধ্য দিয়া একদা 'আতোয়াস্ত্রিসিক' নাম্নী একটী রমণী জলমধ্যে নিপতিত হয়। সেই স্থানে একটী কচ্ছপ ছিল। কোনও একটী জলজন্তু কর্তৃক কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা রক্ষিত হইয়াছিল। রমণী আতোয়াস্ত্রিসিক স্বর্গ হইতে সেই কচ্ছপের পৃষ্ঠে পতিত হন। রমণী সেই সময় গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যা হইতে যমজ পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম—জোস্কেহা ও টাওস্কারা। জোস্কেহার সহিত বিরোধ হওয়ায় টাওস্কারা আপনার মাতাকে নিহত করে। তাহাদের মাতার কঙ্কাল হইতে উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হয়। জোস্কেহা মানুষ ও পশু সৃষ্টি করে।' মেক্সিকোর অধিবাসিগণ সৃষ্টির পাঁচটি পর্য্যায় স্বীকার করেন। প্রথম চারিটী পর্য্যায়ের নাম—স্থল, অগ্নি, বায়ু ও জল; পঞ্চমটীর নাম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের মতে, প্রথম যুগে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়; দ্বিতীয় সৃষ্টি— অগ্নি অথবা তাপ বা আলোকপুঞ্জ; তৃতীয়— বায়ব পদার্থ; চতুর্থ—জলীয় বাষ্পীয় পদার্থ। † মেক্সিকো-বাসিগণ জলপ্লাবনে বিশ্বাসবান্। ‡ ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতে পৃথিবী সংগঠিত,—মেক্সিকোবাসিগণের সৃষ্টি-প্রকরণের বিষয় আলোচনা করিলে এই আভাষও পাওয়া যায়। অধিকন্তু বুঝিতে পারি,— অন্যান্য জাতির চতুর্যুগের ন্যায় তাহাদের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া যুগ-বিভাগের ভিত্তির উপর অবস্থিত। পেরু-দেশবাসীরা তিন জন সৃষ্টি-কর্ত্তার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকে। তাঁহাদের নাম—(১) পাচাকামাক, ভূগর্ভস্থ অগ্নিদেবতা; (২) ভিরাকোচা, ইনি পৃথিবীর সৃষ্টি ও গঠন কর্ত্তা বলিয়া সম্পূজিত, এবং (৩) মাংকোকাপাক বা অদ্বিতীয় মনুষ্য, তাঁহার পত্নী ও ভগ্নী সৃষ্টিকারী ডিম্ব নামে অভিহিত। অদ্বিতীয় মনুষ্য ও ডিম্ব—পরিশেষেও সূর্য্য ও চন্দ্ররূপে প্রকাশমান্ হন। জুকাস-দিগের পুরোহিতগণ তাঁহাদিগকে রাজা ও রাণী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। স্পেন-দেশীয় পণ্ডিত লাসকাসাস বলেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত তাঁহার জনৈক উদ্ধত-স্বভাব পুত্রের বিবাদ উপস্থিত হয়। পুত্রের ইচ্ছা—পিতার সৃষ্ট-সামগ্রী-সমূহ ধ্বংস করে। সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা কুপিত হইয়া পুত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের বর্ণিত কোনও কোনও ঘটনার সহিত, মেক্সিকো-বাসীদের সৃষ্টি-তত্ত্বের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ব্রাজিলের কতকগুলি

* Brinton, *Essays of an Americanist* এবং Schoolcraft, *Myth of Hiawatha.*

† এ সম্বন্ধে ইরাণীয়গণের জেন্দ-আভেস্তার সৃষ্টি-তত্ত্বের এবং যজুর্ব্বেদের সৃষ্টি-প্রকরণের যে অনেক সাদৃশ্য আছে, তাহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে এই গ্রন্থের ৩৪শ পৃষ্ঠায় সৃষ্টি-তত্ত্ব বিষয়ে সাদৃশ্য প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

‡ Reville, *Religions of Mexico and Peru.*

জাতি বলিয়া থাকে,—'জামোয়া নামক দেবতা পৃথিবীর প্রথম মনুষ্যের পিতামহ। তাঁহা দ্বারাই সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন হয়।' উত্তর-আমেরিকার 'এস্কিমো' জাতিরা বলিয়া থাকে,—'এই পৃথিবী অনন্তকাল বিদ্যমান আছে। কোনও দিন কেহ ইহাকে সৃষ্টি করেন নাই।' * পৃথিবীর আদিম জাতি-সমূহের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থে ডেনিয়েল ব্রিণ্টন সৃষ্টি-সম্বন্ধে আমেরিকার বিভিন্ন জাতির অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—'আমেরিকার অধিকাংশ জাতি সূর্য্যদেবকে সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পরমেশ্বর বলিয়া মান্য করে। কিন্তু এস্কিমো-গণ এবং উত্তর আমেরিকার আথাবাস্কা জাতি সূর্য্যদেবের প্রাধান্য আদৌ স্বীকার করে না।' এতৎপ্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ-পণ্ডিত অধ্যাপক রাজেল একটী অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন,—'এস্কিমো প্রভৃতি জাতির বাসস্থান উত্তর-আমেরিকার ঐ সকল প্রদেশে কৃষিকার্য্যের প্রচলন নাই। চিরতুষারাবৃত পৃথিবীর ঐ অংশে মনুষ্যগণ মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। সূর্য্যের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অতি অল্প; সুতরাং তাহারা সূর্য্যের প্রাধান্য স্বীকার করে না।' এতৎপ্রসঙ্গে অধ্যাপক রাজেল আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'পৃথিবীর যে যে অংশে চাষ-আবাদ নাই, সেখানকার লোকে কদাচ সূর্য্যের উপাসনা করে না।'†

পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৃষ্টি-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। সার জর্জ্জ গ্রে পলিনেশীয়ার পৌরাণিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণের বর্ণনায় প্রকাশ,—পলিনেশীয়ার মাওয়ারী জাতির বিশ্বাস, 'রাঙ্গী' ও 'পাপা' অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবী প্রথমে একত্র সম্বদ্ধ ছিল। সহসা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্বর্গ উপরে চলিয়া যায়, পৃথিবী নিম্নে পড়িয়া থাকে।

পলিনেশীয়ায় সৃষ্টি-সংক্রান্ত মত।

মাওয়ারী-গণ বলে,—রাঙ্গী ও পাপার পুত্রের নাম তাঙ্গালোয়া (তাঙ্গারোয়া বা তারোয়া); তিনি জলদেবতা—সমুদ্রের অধিপতি; তিনি মৎস্য এবং সরীসৃপগণ সৃষ্টি করেন। পলিনেশীয়ার অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা আবার তাঙ্গালোয়াকেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করে। তাহাদের মতে তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। শ্যামোয়া দ্বীপে তাঁহার নাম—তাঙ্গালোয়া লাঙ্গী। তাঙ্গালোয়া ও লাঙ্গী উভয় শব্দেই স্বর্গকে বুঝাইয়া থাকে। মেঘ-মণ্ডলকে তাহারা তাঙ্গালোয়ার পোত বা তরণী বলিয়া বিশ্বাস করে। কখনও কখনও তাঙ্গালোয়া শম্বুকের মধ্যে বাস করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। সময় সময় তাঙ্গালোয়া আপনার অধিষ্ঠানভূত শম্বুকটীকে পরিত্যাগ করিতেন; তদ্দ্বারা পৃথিবীর অবয়ব ও প্রাণী-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। কোথাও কোথাও আবার প্রচার,—তাঙ্গালোয়া ডিম্বের মধ্যে বাস করিতেন; সময়ে সময়ে তিনি সেই ডিম্ব ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন; তদ্দ্বারা দ্বীপ-সমূহের উৎপত্তি হইত। পলিনেশীয়ায় তাঙ্গালোয়া সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন কালে তাঙ্গালোয়া এক বৃহদাকার পক্ষীর রূপে সমুদ্রের উপর বিচরণ করিতেন। সেই সময়

* Daniel G. Brinton *Religions of Primitive Peoples.*

† "Almost all Americans, except the Eskimos and the Northern Athabascas, worship the Sun. Here, as throughout the earth, Sun worship seems to have ceased where agriculture left off."—Friedrich Ratzel, *History of Mankind*, Vol II, Page 144

তিনি জলের উপর একটী ডিম্ব রক্ষা করেন। সেই ডিম্বই পৃথিবী ও স্বর্গ অথবা সূর্য্য। নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপের অধিবাসীরা তাঙ্গালোয়ার প্রাধান্য স্বীকার করে না। তাহাদের মতে 'মানি' অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা ও পরমেশ্বর। তিনি প্রথমে বায়ু ও বন্যা সৃষ্টি করেন। তাহা হইতে অন্যান্য পদার্থ উদ্ভূত হয়। দেবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পলেনিশীয়াবাসিগণ সাধারণতঃ বলিয়া থাকে, —পো হইতে দেবগণের উদ্ভব হইয়াছে। পো শব্দে অন্ধকার বুঝায়। সে হিসাবে, অন্ধকারই সকলের জন্মিতা। এমন কি, তাঙ্গালোয়া পর্য্যন্ত অন্ধকার হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। *

কয়েকটী প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম মনুষ্যের—সৃষ্টি-বিষয়ে অনেকাংশে এক মত দৃষ্ট হয়। জেন্দ-আভেস্তার মতে, প্রথম-সৃষ্ট মনুষ্যের নাম গেওমার্ড বা কেউমার্থ (Gayomard or Kayumarth)। তদনুসারে জন্তুর মধ্যে বৃষই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল। জেন্দ-আভেস্তার প্রসিদ্ধ অনুবাদক ডক্টর স্পিগেল বলেন,—'জেনিসিস্ গ্রন্থোক্ত প্রথম মনুষ্য আডাম ও ইভের † (আদম ও হবা) সৃষ্টি ও তাঁহাদের প্রলুব্ধ হওন ও পতন প্রভৃতির বিবরণের সহিত জেন্দ-আভেস্তায় বর্ণিত প্রথম মনুষ্য-সৃষ্টির প্রসঙ্গের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।' মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রথম-সৃষ্ট মনুষ্যের নাম ও কার্য্যাদি জেনিসিসের প্রথম-সৃষ্ট মনুষ্যের নাম ও কার্য্যাদির সহিত অনেকাংশেই সাদৃশ্যাত্মক। এমন কি, ঐ সকল সাদৃশ্য দেখিয়া 'গোঁড়া' খৃষ্টানগণ বলিয়া থাকেন,—'খৃষ্ট-ধর্ম্ম হইতেই পারসিকগণ এবং মুসলমানগণ ঐ সকল মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।' আডাম ও ইভের সৃষ্টি-বিবরণ 'জেনিসিস' গ্রন্থে এইরূপভাবে লিখিত আছে:—সৃষ্টির ষষ্ঠ দিবসে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর পৃথিবী হইতে ধূলা লইয়া আডামকে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির পর আডামের প্রাণদান করিয়া তিনি তাঁহাকে নানাবিধ জীবজন্তু-পরিপূর্ণ 'ইডেন' উদ্যানে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে তখন অন্য কোনও নরনারী ছিল না। আডাম একাকী সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর তাহাকে নিদ্রিত করেন এবং নিদ্রিতাবস্থায় তাহার দেহের পঞ্জর ছিন্ন করিয়া লন। আডামের সেই পঞ্জরে এক অপূর্ব্ব রমণী সৃষ্ট হয়। সেই রমণীর নাম—ইভ্। ‡ আডাম ও ইভ কিছু কাল পরম সুখে 'ইডেন' উদ্যানে বসবাস করেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সেই উদ্যানের একটী একটী বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। সেই বৃক্ষের নাম—জ্ঞানবৃক্ষ। কথিত হয়, সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে সদসৎ জ্ঞান জন্মে। ইডেন উদ্যানে আডাম ও ইভকে সুখে বসবাস করিতে দেখিয়া, এঞ্জেলদিগের বা স্বর্গীয়

আদিতে মনুষ্য-সৃষ্টি।

* Vide Gill, *Myths and Songs of the South Pacific* and Sir George Grey, *Polynesean Mythology.*

† এই প্রথম স্ত্রীর ও প্রথম পুরুষের নাম নানা দেশের নানা ভাষায় নানারূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। কেহ বলেন—'আডাম', কেহ বলেন—'আদম', কেহ বলেন—ইভ, কেহ বলেন—হবা, কেহ বলেন—হাউয়া বা হওবা; ইত্যাদি।

‡ আডাম ও ইভের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'জেনিসিসে' এইরূপ লিখিত আছে,—"And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul—*Genesis*, II—7. "And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man."—*Genesis*, II. 22.

দূতগণের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। তখন 'সামেল' নামক 'সেরাফ' বা স্বর্গীয় দূত সর্পের রূপ ধারণ করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করে এবং নানারূপ মোহন বাক্যে মুগ্ধ করিয়া ইভ্‌কে সেই জ্ঞান-বৃক্ষের ফল-ভক্ষণে প্রলুব্ধ করে। ফলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, আপনি সেই ফল ভক্ষণ করিয়া, ইভ্ তাহা আডামকে খাইতে দেয়। ফল-ভক্ষণের ফলে দুই জনের হৃদয়েই লজ্জা প্রভৃতির উদয় হয়। তখন ঈশ্বর উভয়কেই উদ্যান হইতে বিতাড়িত করেন। উদ্যান হইতে বিতাড়িত হইলে আডাম ও ইভকে ঈশ্বর চর্ম্ম-নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিতে দেন। অতঃপর আডাম ও ইভের কতকগুলি সন্তান-সন্ততি জন্মে। তন্মধ্যে তিন জনের নাম—কেন, আবেল ও সেথ। ৯৩০ বৎসর বয়সে আডামের মৃত্যু হয়। ইহুদীদিগের 'তালমুদিক' সাহিত্যে আডামের এই জন্ম-বৃত্তান্ত আর এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। তদনুসারে আডামের যখন সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন তাহার বিপুল দেহ আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার মুখের জ্যোতিঃতে সূর্য্য পর্য্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়াছিলেন। তাহার বিপুলায়তন ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া এঞ্জেল-গণ ভীত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর এঞ্জেল-দিগকে আপন প্রতাপ দেখাইবার অভিপ্রায়ে আডামকে নিদ্রাভিভূত করিয়া, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া লইয়া, তাহাকে খর্ব্ব করিয়া দিয়াছিলেন। তালমুদিক সাহিত্যের মতে, আডামের প্রথম পত্নীর নাম—লিলিথ; তাহার গর্ভে 'ডেমন' বা দৈত্য-দানব জন্মগ্রহণ করে। কিছুদিন পরে, লিলিথ আডামের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলে, ঈশ্বর ইভ্‌কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আডাম ও ইভের বিবাহের সময় এঞ্জেল-গণ উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের কেহ বাদ্য বাদন করিয়াছিলেন, কেহ বা বীণা বাজাইয়াছিলেন; সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাগণ নৃত্যামোদে মাতিয়াছিলেন। কোনও কোনও মতে, পাপাচরণের জন্য আডামের আকৃতি খর্ব্ব হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহুদীদিগের ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রথম মনুষ্য-সৃষ্টির স্থূল বিবরণ একইভাবে পরিবর্ণিত আছে। মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণে, আদমের ও ইভের জন্মের ও পতনের বিবরণ পূর্ব্বোক্ত বিবরণের সহিত প্রায় সাদৃশ্যাত্মক।* তবে কোরাণের মতে, এঞ্জেল-গণ সকলেই আদমের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন; একমাত্র এঞ্জেল ইবলিস, আদমের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই; তজ্জন্য তিনি স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। প্রতিহিংসা-বশে উত্তেজিত হইয়া ইবলিস তাঁহাদের দুই জনকে প্রলুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন করেন। ধর্ম্ম-বিশ্বাসী আদম অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া মক্কার মসজিদের সন্নিকটে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেখানে আর্চ্চ-এঞ্জেল বা সর্ব্বোচ্চপদস্থ দূত জিব্রিল তাঁহাকে বহু ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। দুই শত বৎসর পরে, আরাফাৎ পর্ব্বতে, আদম ও ইভের পুনর্ম্মিলন ঘটিয়াছিল। কি ভাবে সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়,—'মনুষ্য সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে, আল্লা স্বর্গের প্রধান দূতকে পৃথিবীতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রধান দূত অকৃতকার্য্য হইলে, দ্বিতীয় দূত পৃথিবীতে প্রেরিত হন। কিন্তু তিনিও আবশ্যকানুরূপ মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতে পারেন না। তখন তৃতীয় দূত প্রেরিত হন। তৃতীয় দূত নানা

* কোরাণের ২য়, ৭ম, ১৫শ, ১৭শ, ৩১শ ও ৫৫শ পরিচ্ছেদ-সমূহে আদমের ও ইভের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হইবে।

স্থানের নানারূপ মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া মক্কার সন্নিকটে রক্ষা করেন। চল্লিশ বৎসর সেই মৃত্তিকা তৈফ ও মক্কার মধ্যভাগে পড়িয়া থাকে। পরে সেই মৃত্তিকা মনুষ্যাকারে পরিণত হইলে, ঈশ্বরের আজ্ঞায় তাহার মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট হন; মৃত্তিকা অস্থিমাংসময় নরদেহে পরিণত হয়। সেই মনুষ্যই আদম। সৃষ্টির পরই আদম হাঁচিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক দিন নিদ্রার পর আদম দেখিতে পান,—আল্লা হবকে তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়াছেন। তখন উভয়ে পরিণয় হয়। মুসলমান-দিগের কেহ কেহ বলেন,—তাঁহাদের প্রথম পিতৃপুরুষগণ প্রথমে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নিপতিত হন। সেরেন্দ্বীপ অর্থাৎ সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপে আদম পতিত হইয়াছিলেন। ইভ পড়িয়া-ছিলেন—'আত্তডা' নামক বন্দরে; সেই বন্দর—মক্কার সন্নিকটে, লোহিত সমুদ্রের তীরে, অবস্থিত। দুই শত বৎসর পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকার পর, লঙ্কাদ্বীপেই তাঁহাদিগের পুনর্ম্মিলন হয়। সেখানে, কাহারও মতে কুড়ি বার, কাহারও মতে আট বার, ইভ্ সন্তান-সন্ততি প্রসব করিয়াছিলেন। প্রতি বারে তাঁহার যমজ পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের পরস্পর বিবাহ হইয়াছিল। কোনও কোনও ইহুদী পণ্ডিত বলেন,—কেন ও আবেল এক সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সিংহলের অধিবাসিগণ বলিয়া থাকেন,—আবেলের মৃত্যুর পর ইভ এক শত বৎসর ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের অশ্রুজলে কলম্বোর সন্নিকটস্থ পর্ব্বতে লবণাক্ত-জলপূর্ণ এক হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। আরবের অধিবাসী-দিগের কেহ কেহ বলেন,—আদমের মৃত্যুর পর মক্কার নিকটে 'আবু কোবেজ' পর্ব্বতে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল। অন্য মতে,—'নোয়া যখন পৃথিবীব্যাপী বন্যার সময় নৌকারোহণে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি আদমের মৃতদেহ আপনার নৌকায় গ্রহণ করেন। জলপ্লাবনের পর সেমের পুত্র মেল্‌চিজেডেক সেই দেহ লইয়া গিয়া জেরুজিলামে রক্ষা করিয়াছিলেন। জেরুজিলামে যেখানে আদমের কবর হয়, যীশুখৃষ্ট সেইখানেই নির্য্যাতনগ্রস্ত হইয়াছিলেন; যীশুখৃষ্টের রক্তে আদমের কবর সিক্ত হইয়াছিল।' পারসিকগণ বলেন,—'সেরেন্দ্বীপেই আদমের কবর হয়।' কোনও কোনও মতে,—'আদম একাধারে স্ত্রী-পুরুষ ছিলেন; নারীর সাহায্য ব্যতীত তিনি সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইতেন।' অন্য মতে আবার প্রকাশ,—'তাঁহার দুই দিকে মুখ; এক দিকে পুরুষের, অন্য দিকে স্ত্রীলোকের আকৃতি ছিল; সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর দেহের মাঝামাঝি চিরিয়া তাহা হইতে আদম ও ইভ স্ত্রী-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য বিধান করিয়াছিলেন।' * যাহা হউক, আদম নামধেয় মনুষ্যকেই ঈশ্বর যে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহুদীগণ, খৃষ্টানগণ এবং মুসলমান-

---

* এ বিষয়ে দুই পক্ষের দুই অভিনব মত উদ্ধৃত করিতেছি,—(1) Adam before his fall possessed in himself the principles of both sexes, and a virtue or power of producing his like without the concurrent assistance of woman; (2) He had two bodies joined together at the shoulders, and their faces looking opposite ways, like those of *Janus*. When God created Eve he had no more to do than to separate two bodies from one another.

গণ তাহাই স্বীকার করেন। ইয়াণীয়গণের নিকট সে মনুষ্য কি নামে অভিহিত এবং অন্যান্য জাতির নিকট তিনি কি নামে পরিচিত, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্থষ্টি-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণের মত।

সৃষ্টি-তত্ত্ব বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে বিবিধ মত পরিলক্ষিত হয়। গ্রীস-দেশ পাশ্চাত্য-দর্শনের আদি-ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। মিসর ও ফিনিসীয়া হইতে গ্রীসে দার্শনিক তত্ত্বালোচনার বীজ পরিব্যাপ্ত হয়—পণ্ডিতগণ যদিও একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু গ্রীস হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে দর্শন-শাস্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হয় বলিয়া গ্রীসকেই সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দর্শনের আদি ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে। গ্রীস-দেশের আদি-দার্শনিকের নাম—থেলিস। প্রাচীন গ্রীস সাত জন জ্ঞানী মনুষ্যের জন্য ইতিহাসে প্রখ্যাত। থেলিস—সেই সাত জন জ্ঞানী মনুষ্যের অন্তর্ভুক্ত। * যীশু-খৃষ্টের জন্মের ৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে, এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত আইওনিয়া প্রদেশে, মাইলেটাস নগরে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সৃষ্টি-সম্বন্ধে থেলিসের মত এই যে,—জলই সংসারের সার-সর্ব্বস্ব; জল হইতেই এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে; জলেই সংসার লয় প্রাপ্ত হইবে। থেলিসের রচিত কোনও গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। তাঁহার মত-পরম্পরা তদীয় শিষ্যগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল। তাহা হইতে নানা জনে নানারূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কেহ বলেন—ঈশ্বর কর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া থেলিস বিশ্বাস করিতেন। কেহ বলেন—বিশ্বরূপে ঈশ্বর চিরবিদ্যমান, ইহাই থেলিসের মত। কিন্তু মূলতঃ প্রচার—থেলিস একমাত্র জলকেই সৃষ্টির ও লয়ের মূলীভূত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। থেলিসের জীবনবৃত্তে অনেক কৌতূহলপ্রদ কাহিনীর উল্লেখ আছে। ডাইওজেনিস লেয়ার্টিয়াস বলেন—'শেষ জীবনে থেলিস জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনায় নিরত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, তারকারাজির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, থেলিস একটী গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যান। তাঁহার বৃদ্ধা সঙ্গিনী তাহাতে তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলেন,—'আপন পায়ের নীচে নিকটে কি রহিয়াছে, তাহা যখন অনুভব করিবার শক্তি তোমার নাই; তুমি কেমন করিয়া দূর আকাশের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইবার আশা করিতে পার?'

আদি দার্শনিক থেলিস।

থেলিসের পর আনাক্সিমান্দর অবতীর্ণ হন। তিনি থেলিসের শিষ্য ও বন্ধু বলিয়া পরিচিত। যীশু খৃষ্টের জন্মের ৬১০ বৎসর পূর্ব্বে মাইলেটাস নগরেই তাঁহার জন্ম হয়। ৫৪৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কথিত হয়, তিনিই প্রথমে মানচিত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সৃষ্টি-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—'বিশ্ব অনন্তকাল বিদ্যমান্। কেবল তাহার অংশ-বিশেষের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে মাত্র। অনন্ত হইতেই সকল বস্তুর উদ্ভব। অনন্তেই সকল বস্তু বিলীন হইবে।'

আনাক্সিমেনিস। ও আনাক্সিমেনিস।

* The names of the seven wise men, who lived between 620 and 548 B. C., are Solon, Thales, Pittacus, Bias, Chilon, Claesbulus and Periander of Corinth. বলা বাহুল্য, এ বিষয়েও মতান্তর আছে।

তাঁহার মতে,—'জগতের মূল পদার্থ—নিত্য, অসীম এবং তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না।' আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের কেহ কেহ বলেন,—'সৃষ্টির পূর্ব্বে জড়-পদার্থ-সমূহ অব্যবস্থাপিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। উত্তাপ-শৈত্যাদি শক্তি-প্রভাবে তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং সংযুক্ত হয়; তাহাতেই সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে। কোনও এক অদৃষ্ট-শক্তির প্রেরণা-বশে এই অনন্তকালস্থায়ী পৃথিবীর পরমাণু-সমূহের বিচ্ছেদ ও সংযোগ দ্বারা সৃষ্টি ও লয় ক্রিয়া সাধিত হইতেছে—আনাক্সিমান্দারের মত-পরম্পরা আলোচনা করিলে তাহারই আভাষ পাওয়া যায়। আনাক্সিমান্দারের পর আনাক্সিমেনিস আবির্ভূত হন। ইনিও পূর্ব্বোক্ত মাইলেটাস নগরে, খৃষ্ট-জন্মের ৫৫৬ বৎসর পূর্ব্বে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইনি বলেন—'বায়ুই সর্ব্ব-মূলাধার। বায়ু—গতি-শক্তিবিশিষ্ট। বায়ুদ্বারা সংযোগ-বিয়োগ সাধিত হয়। সুতরাং বায়ুই সৃষ্টির মূলীভূত।' আনাক্সিমেনিস বায়ুকেই প্রকারান্তরে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী চিরবিদ্যমান আছে; বায়ুর দ্বারা শীত ও উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং তদ্দ্বারাই পৃথিবীর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে,—ইহাই আনাক্সিমেনিসের সিদ্ধান্ত। থেলিস, আনাক্সিমান্দার ও আনাক্সিমেনিস,—এই তিন আদি-দার্শনিকের মত 'আইওনিক দর্শন' নামে অভিহিত হয়।

'আইওনিক' দার্শনিক-গণের পর 'পীথাগোরীয়' দার্শনিক-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। পীথাগোরাস—সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইতালীর সন্নিহিত স্যামজ দ্বীপে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে, তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * থেলিস, আনাক্সিমান্দার, আনাক্সিমেনিস প্রভৃতির নিকট শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া তিনি মিশরাদি নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন। দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি ভারত-বর্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে।

পীথাগোরীয় মত।

পাশ্চাত্য-দেশে তিনিই প্রথমে সংখ্যাবাদ-তত্ত্বের প্রবর্ত্তনা করেন। পদার্থের আকার আছে, পদার্থ সকল সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, এবং এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যোগ-বিয়োগে অভিনব পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে,—ইহাই পীথাগোরাসের মত। সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেন,—'বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এক অগ্নিপিণ্ড বিদ্যমান আছে। দশটী স্বর্গীয় গ্রহ বা উপগ্রহ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তদ্দ্বারা শীত উত্তাপ প্রভৃতির সঞ্চারে সৃষ্টি-কার্য্য সমাহিত হইতেছে। সামঞ্জস্যই জগতের অস্তিত্ব। সেই কেন্দ্রীভূত অগ্নিপিণ্ডই তাপ, আলোক বা প্রাণস্থানীয়। জীবাত্মা-মাত্রেই সেই অগ্নিপিণ্ডের বা তেজের অংশ-বিশেষ। সর্ব্বপ্রাণাধার সেই তেজ বা অগ্নিপিণ্ডই ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রথমে অব্যবস্থাপিত জড়পদার্থ সহ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার শক্তি-প্রভাবে তৎসমুদায় বিচ্ছিন্ন হয়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তিনি পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত আছেন।' আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ—পীথাগোরাস স্বীকার করিতেন। ঈশ্বরকে মনঃস্বরূপ বলিয়া পীথাগোরাস প্রচার করিয়া গিয়াছেন। † তিনি বলিতেন,—

* পীথাগোরাসের জন্ম-সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। কেহ বলেন,—৫৭০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন,—৫০৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন,—৫৫৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

† God, he considers, is the universal mind, diffused throughout all things, and

সংসারের সকলের মধ্যেই মনোরূপে তিনি বিদ্যমান। প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মাই তাঁহার অংশ।' পরবর্ত্তী অনেক দার্শনিক পীথাগোরাসের মত মান্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের মত 'পীথাগোরীয় মত' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

পীথাগোরাসের পর 'ইলীয়' দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মত উল্লেখযোগ্য। জেনোফেন্‌স্ হইতে এই মতের উদ্ভব হয়। এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত কলফোঁ নগরে দার্শনিক জেনোফেন্‌স্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইতালীর দক্ষিণ-স্থিত গ্রীক-অধিকৃত ইলিয়া নগরে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। তদনুসারে, তৎপ্রবর্ত্তিত দার্শনিক মত 'ইলীয় দর্শন' নামে পরিচিত। ৫৪০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইলীয় দার্শনিক-সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিপত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। জেনোফেন্‌স্ যে দার্শনিক মত প্রচার করিয়া যান, জেনো সেই মতের পরিপুষ্টি সাধন করেন। সৃষ্টি-সম্বন্ধে জেনোফেন্‌সের মত—'এই বিশ্ব যে ভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইতেছি, সেই ভাবেই চিরদিন বিদ্যমান আছে এবং থাকিবে।' ইলীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত জেনোর মত আলোচনায় আরিষ্টটল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—'জেনো চারি ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন।' তাঁহার মতে—'উত্তাপ ও আর্দ্রতা, শৈত্য ও শুষ্কতা, এই চারি ভূতে সংসার উৎপন্ন। মনুষ্য মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত; চারি ভূতের সংমিশ্রণে তাহার প্রাণ-শক্তি সঞ্চারিত।' পারমিনাইড্‌স্, মেলিসাস প্রভৃতি দার্শনিকগণ ইলীয়-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া কথিত হন।

ইলীয় দার্শনিকগণের মত।

ইলীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের পর হিরাক্লিটাসের দার্শনিক মত ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। হিষ্টাসপেসের পুত্র দারায়ুসের রাজত্ব-কালে, ৫০৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের সমসময়ে, এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত ইফেসাস নগরে, হিরাক্লিটাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জেনোফেন্‌স্ ও হিফাসাস প্রভৃতি দার্শনিকদিগের বক্তৃতা শ্রবণে এবং পীথাগোরীয় সম্প্রদায়ের মতামত আলোচনায় অভিনব মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মনুষ্যের কষ্ট দেখিলে ইঁহার বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইত। সেইজন্য ইঁহাকে সাধারণে 'কাঁদুনে দার্শনিক' বলিয়া উপহাস করিত। জীবনের শেষভাগ ইনি নির্জ্জন-বাসে অতিবাহিত করেন; সেই সময়ে শোথরোগে আক্রান্ত হইয়া ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেহ কেহ বলেন,—'নির্জ্জন অবস্থায় ইঁহাকে কুক্কুরে গ্রাস করিয়াছিল।' ইনি অসংখ্য পুস্তক লিখিয়া যান। হিরাক্লিটাসের দার্শনিক গ্রন্থে প্রকাশ—'তেজ (আগুন) হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি; আবার তেজেই বিশ্বের লয়। তেজ বা অগ্নি—সূক্ষ্ম, অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয় এবং চিরগতি-বিশিষ্ট। অগ্নিরই (তেজেরই) স্থূলতর অংশ বায়ু; বায়ু হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।' ইঁহার মতে,—'আত্মা বা প্রাণ জ্বলনশীল অথবা বায়বীয় পদার্থ।' প্রকৃতপক্ষে হিরাক্লিটাস জড়বাদী ছিলেন। দেহ, আকৃতি এবং গতি মাত্র তিনি স্বীকার করিতেন।

হিরাক্লিটাসের মত।

the self-moving principle of all things... The Deity was primarily combined with the chaotic mass of passive matter but he had the power of separating himself and since the separation he has remained distinct."

তাঁহার মতে,—'পরিবর্তনই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে; আকৃতির পরিবর্তনই মৃত্যু।' হিরাক্লিটাসের মতের প্রধান পরিপোষক—এম্পিডোকল্‌স্‌। ইনি ৪৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, সিসিলি-দ্বীপের এগ্রিজেন্টাম-নগরে, বিদ্যমান ছিলেন। বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী—এই চারি পদার্থকে তিনি মূল পদার্থ বা ভূত বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে,—এই চারি পদার্থের সংযোগ-বিয়োগেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে ঐ চারি মূল পদার্থ একরূপ মিশ্রভাবে অবস্থিত থাকে। উহারা পরস্পর ভালবাসা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। যখন পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার হইল, তখনই উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেই বিচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পৃথিব্যাদি বিভিন্ন সামগ্রীর সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে।'*

আনাক্সাগোরাসের মত।

আইওনিক দার্শনিকগণের মধ্যে আনাক্সাগোরাস বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। আইওনিয়ার অন্তর্গত ক্লেজোমিনি-নগরে, ৫০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, তাঁহার জন্ম হয়। বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি গ্রীসের এথেন্স-নগরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। বাল্যকালে তিনি আনাক্সিমেনিসের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারই পরিচর্য্যায় লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। এথেন্সে আসিয়া, থেলিসের প্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়ে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আনাক্সাগোরাস অশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। তখন, সক্রেটিস, পেরিক্লেস, ইউরিপিডিস প্রমুখ মনীষিগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি যে দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছিলেন, এথেন্সের রাজপুরুষগণের তাহা মনোমত হয় নাই। আনাক্সাগোরাস প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মতে দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইতেছে,—এই হেতুবাদে, আনাক্সাগোরাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। শিষ্য পেরিক্লেস, আপনার বাগ্মিতায় বিচারপতিকে মুগ্ধ করিয়া, আনাক্সাগোরাসের প্রাণদণ্ড রহিত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু আনাক্সাগোরাস নির্ব্বাসন-দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। হেলেস্পণ্ট দ্বীপের ল্যাম্পসাক্স নামক স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়া ৭৩ বৎসর বয়সে আনাক্সাগোরাস ইহলীলা সম্বরণ করেন। নির্ব্বাসিত হওয়ার পর আনাক্সাগোরাস গর্ব্বভরে প্রায়ই বলিতেন,—'এথেন্স-বাসীদিগকে আমি হারাই নাই; বরং এথেন্সবাসীরাই আমাকে হারাইয়াছে।' আনাক্সাগোরাসের লিখিত দার্শনিক মত-সমূহ প্রথমে বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া ছিল। ডাইওজিনিস লেয়ার্টিয়াস তাঁহার বিচ্ছিন্ন মত-পরম্পরা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে পরস্পর-বিরোধী অনেক মত দৃষ্ট হয়। সৃষ্টি-সম্বন্ধে আনাক্সাগোরাসের মত এই যে,—'আদিতে অনন্তকাল হইতে সকল পদার্থই পরমাণু-রূপে বিদ্যমান ছিল। সেই পরমাণু-সমূহ অনির্দ্দিষ্ট অত্যধিক; তৎসমুদায়কে অসংখ্য পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। সেই অসংখ্য পরমাণু-

* "In the beginning the elements were held in a sort of blended unity or sphere by the attractive force of love; when heat, previously exterior, penetrates as repelling and separating principle &c."

পুঞ্জ এক অনন্ত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া নানা আকার ধারণ করিতেছে। সেই অনন্ত শক্তির নাম—নৌস (Nous)। * নৌস—অবিমিশ্র ও সূক্ষ্ম, অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন এবং সর্ব্বজ্ঞানাধার। আপনা-আপনি অন্ধ-শক্তি দ্বারা পৃথিবীর কোনও বস্তু সৃষ্ট হয় নাই; নৌসই সকল সামগ্রীর সর্ব্ববিধ আকৃতির সংগঠক।' আনাক্সাগোরাস বিশ্বাস করিতেন,—'আকাশ স্থূল-পদার্থ-বিনির্ম্মিত খিলানের ন্যায় অবস্থিত। নক্ষত্র-সমূহ এক একটী প্রস্তর-পিণ্ড,—কোনরূপ পার্থিব আক্ষেপ-বশতঃ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। আকাশে গিয়া, ইথারের অগ্নি-সংযোগে, তাহারা প্রতিনিয়ত জ্বলিতেছে।' সূর্য্যকে তিনি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত প্রস্তর-খণ্ড বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিতেন,—'সে প্রস্তর-খণ্ড গ্রীসের পেলোপোনিসাস নগর অপেক্ষাও বৃহত্তর।' তাঁহার মতে,—'মনই সকল বস্তুর জনয়িতা; প্রথমে সকলই বিশৃঙ্খল ছিল; মন সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। মন অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন। মনই নৌস।'

পাশ্চাত্য-দেশে নিঃসম্পর্কিত পরমাণুবাদ-তত্ত্বের আদি-প্রচারকগণের মধ্যে লিউসিপ্পাস ও ডেমক্রিটাস সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের দুই জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্বে ও কোন্ ব্যক্তি পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে অনেক মতান্তর আছে। সাধারণতঃ ৪৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ডেমক্রিটাস এবং ৪৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে লিউসিপ্পাস বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। থ্রেস-প্রদেশের আব্দেরা-নগরে ডেমক্রিটাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সম্পত্তিশালী ছিলেন। ডেমক্রিটাস আপনার অপর দুই ভ্রাতাকে বিষয় সম্পত্তি প্রদান করিয়া, পিতার নিকট হইতে বিশ সহস্রাধিক স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ-পূর্ব্বক জ্ঞানার্জ্জনে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। নানা দেশ পর্য্যটনানন্তর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, আব্দেরায় তিনি বহু সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই জনসাধারণ তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডেমক্রিটাস তদ্রূপ সম্মানলাভে বীতস্পৃহ ছিলেন। মনুষ্য-জীবন প্রহসন-মাত্র—এই মনে করিয়া, মানুষের সুখে দুঃখে সর্ব্বদাই তিনি হাস্য করিতেন। জীবের দুঃখমাত্র-দর্শনে দার্শনিক হিরাক্লিটাস যেমন 'কাঁদুনে দার্শনিক' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, ডেমক্রিটাসকে সে হিসাবে 'হাসুনে দার্শনিক' বলা যাইতে পারে। ১০৯ বৎসর বয়সে ডেমক্রিটাসের মৃত্যু হয়। একমনে দার্শনিক চিন্তায় কালাতিপাত করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি আপনার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়াছিলেন এবং অন্ধ হইয়া এক মনে দার্শনিক চিন্তায় নিবিষ্ট ছিলেন। সৃষ্টি-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—'পরমাণু এবং গতি, এতদুভয়ের উপর সৃষ্টি নির্ভর করিতেছে। কোনও উচ্চ শক্তি ইচ্ছা করিয়া যে পরমাণু-সমূহকে একত্র করিতেছে, তাহা নহে; আপনা-আপনিই নৈসর্গিক নিয়মে, গতিশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, পরমাণু-সমূহ সম্মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হইতেছে; আর তাহাতেই সৃষ্টিকার্য্য সাধিত হইতেছে।' † অনেকের বিশ্বাস—ডেমক্রিটাস পাশ্চাত্য

ডেমক্রিটাস ও পরমাণুবাদ।

---

* Nous or shaping spirit is the most pure and subtle of all things and has all knowledge about all things and infinite power."

† "He assumes, as the ultimate elementary grounds of nature, an infinite multitude of indivisible corporal praticles, *Atoms*, and attribute to these a primary motion derived from no higher principle."

দেশে নিরীশ্বরবাদের প্রবর্ত্তনা করিয়া যান। কোনও কোনও মতে প্রকাশ,—'লিউসিপ্পাস এই পরমাণুবাদ-তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কর্তা; ডেমক্রিটাস এবং এপিকিউরাস তাঁহারই মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।' অন্য-মতে আবার প্রকাশ—'ফিনিসীয়া দেশের দার্শনিক মসচুস্ পাশ্চাত্য-দেশে পরমাণুবাদ-তত্ত্ব প্রথম প্রচার করেন।' যাহা হউক, লিউসিপ্পাস ও ডেমক্রিটাস এই দুই জনই এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আছেন। পরবর্ত্তি-কালে এপিকিউরাস তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আর এক নূতন পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। লিউসিপ্পাসের মত এই যে,—'বিশ্ব অনন্ত; ইহার কোনও অংশ শূন্যময়, কোনও অংশ পরমাণু-পূর্ণ। পরমাণু-সমূহ শূন্য-স্থানে বিক্ষিপ্ত হইলে পরস্পর প্রতিহত হয় এবং তাহাদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ চলিতে থাকে। তাহাতে শূন্য-সাগরে বিষম আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ফলে, এক এক জাতীয় পরমাণু পরস্পর মিলিত হয় এবং তাহাতে তাহাদের এক এক প্রকার আকৃতি গঠিত হইয়া যায়। আপনা-আপনি নিয়তিবশে এই বিক্ষেপ ও মিলন ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। ইহার সহিত কোনও দৈব-শক্তির সম্বন্ধ নাই।' * এই পরমাণু-বাদকে ইংরাজীতে 'য়্যাটমিক থিওরি' বলে।

ডেমক্রিটাস প্রভৃতির সমসময়ে 'সফিষ্ট' নামধেয় কূটতার্কিক এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। তাঁহাদের মত 'সফিজম্' নামে অভিহিত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রোট-গোরাস, প্রডিকাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্য-ভাগে এই সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহাঁরা সৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন না। ইহাঁদের যুক্তিহীন তর্কে সংসারে বহু নৈতিক অপকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের বা দেবদেবীর অনস্তিত্ব বিষয়ে শিক্ষা প্রচার করিতেন বলিয়া প্রটোগোরাসের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, ইতিহাসে এইরূপ লিখিত আছে। সৃষ্টি-সম্বন্ধে 'ওসেলাস লুকানাস' নামক গ্রীসদেশীয় আর একজন প্রাচীন দার্শনিকের মত প্রায়শঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে। প্লেটোর পূর্ব্বে, পীথাগোরাসের পরে, লুকানীয়া প্রদেশে ওসেলাস বিদ্যমান ছিলেন। বিশ্ব-তত্ত্ব-বিষয়ে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে লিখিত আছে,—'বিশ্ব সংসার অনন্তকাল হইতেই এইরূপ ভাবে বিদ্যমান আছে।' ওসেলাসের যুক্তি পরম্পরা আরিষ্টটল প্রমুখ দার্শনিকগণ অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

সফিষ্ট ও ওসেলাস।

গ্রীস-দেশীয় দার্শনিকগণের মধ্যে সক্রেটিস—প্রখ্যাত নামা। ৪৬৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এথেন্স-নগরে তাঁহার জন্ম হয়। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় সূত্রের আবশ্যকতার বিষয় তিনিই প্রথম প্রচার করেন। জ্ঞানকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়পরতাই তাঁহার মতে ধর্ম্ম। সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্বে বা অস্তিত্বে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তিনি দেশ-মান্য দেবতাগণের পূজা করিতেন না, তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়া যুবকগণ বিপথগামী হইতেছে,—এই

সক্রেটিস ও প্লেটো।

* "According to this theory, the universe which is infinite, is in part a *planum* and in part a *vacuum*. The *planum* contained innumerable corpuscles or atoms of various figures, which falling into the *vacuum* struck against each other, and hence variety of curvilinear motions, which continued, till at length atoms of similar forms met together, and bodies were produced."

হেতুবাদে, সক্রেটিস রাজদ্বারে দণ্ডিত হন। ত্রিশ দিবস কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া তিনি বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন। সক্রেটিসের শিষ্যবর্গের মধ্যে চারিটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। সেই সকল সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তাদিগের মধ্যে প্লেটোর নাম সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ। ৪২৯ খৃষ্টাব্দে এথেন্স নগরে প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উচ্চ-বংশ-সম্ভূত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি কবিতা-রচনায় যশস্বী হইয়াছিলেন। বিংশ বর্ষ বয়সে সক্রেটিসের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সেই সময় কবিতাগুলি অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করিয়া, তিনি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। আশী বৎসর বয়সে তাঁহার লোকান্তর হয়। তিনি চিরকুমার ছিলেন। সৃষ্টি-সম্বন্ধে তাঁহার মতের সার মর্ম্ম এই,—'পৃথিবী চিরদিন বিদ্যমান আছে; ইহা সেই মঙ্গলময়ের প্রতিরূপ মাত্র; ইহার অন্তর্গত ভূত-সমূহ অনন্ত-কাল হইতেই পরিবর্ত্তনশীল; পরিবর্ত্তন-প্রবাহে সৃষ্টি-ক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে।'

প্লেটোর পর আরিষ্টটল প্রতিষ্ঠান্বিত। প্লেটোর শিষ্য বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার প্রচারিত দার্শনিক-তত্ত্ব তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ৩৮৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে গ্রীসের উপনিবেশ ষ্টেজেরা নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি এথেন্সে গমন করেন। সেখানে গিয়া তিনি প্লেটোর নিকট দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সৃষ্টি-প্রকরণ সম্বন্ধে আরিষ্টটলের মত এই যে,—'কেবল স্বর্গ ও পৃথিবী বলিয়া নহে; চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুই অনন্ত-কাল হইতে পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে।' তিনি আরও বলেন,—'এই বিশ্ব এক স্বর্গীয় আত্মার প্রতিরূপ। সেই আত্মা কখনও নিশ্চেষ্ট নহেন। তিনি শক্তি ও কার্য্য স্বরূপ; বিশ্বের গতি, সৃষ্টি এবং আকৃতির মূলে সেই স্বর্গীয় আত্মার প্রভাব চির-বিদ্যমান।' আপন মনস্তত্ত্ব-গ্রন্থে সে আত্মাকে আরিষ্টটল 'নৌস' বা জ্ঞানময় আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সে আত্মা অশরীরী, অনন্তকালস্থায়ী, গতিহীন, অবিভাজ্য, সকল সামগ্রীর গতিশক্তি দাতা। এই প্রসিদ্ধ দার্শনিকের মতে,—'এই বিশ্ব আত্মার সৃষ্ট নহে; পরন্তু তাঁহা হইতে উৎপন্ন।' * তাঁহার মতে জাগতিক পদার্থ-সমূহের প্রকার—দশটী; যথা—দ্রব্য, পরিমাণ, গুণ, সম্বন্ধ, স্থান, সময়, অবস্থা, সামান্য, কার্য্য ও ভাব। † বলা বাহুল্য, এই কয়েকটী পদার্থের উপরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় নির্ভর করিতেছে।

আরিষ্টটলের মত।

প্লেটোর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে, ৩৪১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, স্যামস্ দ্বীপে এপিকিউরাস নামক আর একজন প্রতিভাশালী দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন,—'ভূত সমষ্টিতে সংগঠিত এই বিশ্ব চির-বিদ্যমান আছে। বিশ্ব অনন্ত-বিস্তৃত ও অনন্তকাল-স্থায়ী।' এপিকিউরাসের মতে বিশ্বের দুই অবস্থা;—'অস্তি ও নাস্তি।' তিনি অবয়ব ও শূন্য মাত্র স্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন,—'পরমাণু-রাশি শূন্যস্থানে অবিরত বিঘূর্ণিত হইয়া কখনও পরস্পর সম্মিলিত ও কখনও বিচ্ছিন্ন হইতেছে। সংযোগ সৃষ্টি ও বিচ্ছেদে লয়। তিনি আরও বলিতেন,—'মানুষ মৃত্যুকে কেন ভয় করে?

এপিকিউরাসের মত।

* "According to this great philosopher the universe is less a creation than an emanation of the deity."

† আরিষ্টটলের 'অরগেনন' (Organon) গ্রন্থে এইগুলি 'ক্যাটিগরি' (Category) নামে অভিহিত।

মৃত্যু তো অস্তি-নাস্তি দুই অবস্থার এক অবস্থা মাত্র। যখন আমরা বিদ্যমান অর্থাৎ জীবিত থাকি, তখন মৃত্যু থাকে না বা মৃত্যুর স্থান নাই। আবার যখন মৃত্যু থাকে, তখন আমরা থাকি না।' এপিকিউরাস আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে,—ভূত-সমূহের সংযোগেই প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইত, আর তাহাদের বিয়োগেই তাহা বিচ্ছিন্ন হইত। এপিকিউরাস সুখকেই জীবনের সার লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন। যে প্রকারেই হউক, সুখেচ্ছা পূর্ণ কর,—এপিকিউরাসের শিক্ষা হইতে তাঁহার শিষ্যগণের প্রাণে এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। এপিকিউরাস বলিতেন,—'ন্যায়-অন্যায়ের অপর কোনও অর্থ নাই। ন্যায় কার্য্যে কেহ সুখ্যাতি করে, আর তাহাতে মনে আনন্দ হয়; সেই জন্যই ন্যায়-কার্য্যের প্রতি লোকের অনুরাগ। অন্যায় কার্য্যে কতক লোকের বিরক্তির সম্ভাবনা; তাহাতে মনের সুখ নষ্ট হইতে পারে; সুতরাং লোকে অন্যায় কার্য্যে বীতস্পৃহ হয়। নচেৎ, উহাদের মধ্যে তারতম্য কিছুই নাই।' এপিকিউরাস সর্ব্বতোভাবে জড়বাদী ছিলেন। তাঁহার দার্শনিক মতে সমাজে কদাচার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি সুখ-সাধনকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার মতানুবর্ত্তিগণ ঘোর নাস্তিক ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। এপিকিউরাসের মত রোম-দেশে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। রোমে তখন গ্রীক-দর্শনেরই আলোচনা হইত। রোমে দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় সিসিরো বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হন। ১০৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর্কিনাম-নগরে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তখন ইউরোপে গ্রীক-দর্শনের প্রবল প্রতাপ।

যে ফিনিসীয়া এবং মিশর হইতে গ্রীস এককালে সহায়তা লাভ করিয়াছিল, সেই ফিনিসীয়া ও মিশর এখন গ্রীসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রীসে যে সকল মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ফিনিসীয় ও মিশরীয় দার্শনিকগণ কত পূর্ব্বে সেই সকল মতে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেও চমকিত হইতে হয়। খৃষ্ট-জন্মের ১১৭৩ বৎসর পূর্ব্বে ট্রয় যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ষ্ট্রাবো প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন,—'যে পরমাণুবাদ-তত্ত্বের আবিষ্কর্তা বলিয়া পাশ্চাত্য-দেশে ডেমক্রিটাস ও লিউসিপ্পাস প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন, সেই পরমাণুবাদ-তত্ত্ব একজন ফিনিসীয় দার্শনিক ট্রয়-যুদ্ধের বহু পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলেন।' সেই ফিনিসীয় দার্শনিকের নাম—'মসচুস্' বা 'মোচুস'। পীথাগোরাস প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মতও সিডন হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন। 'কেয়স' বা অব্যবস্থাপিত জড়-পদার্থ-পুঞ্জ-বিষয়ক সিদ্ধান্তের মূল-তত্ত্ব এবং থেলিসের জলবাদ প্রসঙ্গও ফিনিসীয়ার দার্শনিকগণের অবিদিত ছিল না। মিশরের আদি-দার্শনিক থোথ বা তাউতের এবং তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিকগণের প্রভাব গ্রীসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল,—এ কথা আজিও অনেকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ফিনিসীয়ার এবং মিশরের সৃষ্টি-তত্ত্ব রূপান্তরে গ্রীকগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন,—ইহাই পণ্ডিতগণের অভিমত।* যাহা হউক, গ্রীসের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তি-কালে

ফিনিসীয়ায় ও মিশরে।

* "Their cosmogonies were wholly Phœnician or Egyptian disguised under Grecian names'—John Robinson, L. L. D. &c., Professor of Natural Philosophy in the University of Edinburgh.

পুনরায় যখন মিশর দর্শন-শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠান্বিত হয়, মিশরে তখন 'নিও-প্লেটনিক' (নিও-প্লাটনিক) দার্শনিক মতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

২০৫ খৃষ্টাব্দে লাইকোপোলীস সহরে প্লোটিনস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'নিও-প্লেটনিক' দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে, আটাইস বৎসর বয়সে, ইনি আলেকজান্দ্রিয়া-সহরে গমন করেন। প্লেটো-প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মতের প্রতিবাদে, প্লোটিনস এবং তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত দার্শনিকগণ নূতন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহারা 'নিও-প্লেটনিক' নামে পরিচিত। সৃষ্টি-সম্বন্ধে প্লোটিনসের মত এই যে,—'পরমেশ্বর হইতেই সমস্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে; যেমন অগ্নি হইতে উত্তাপ; ইত্যাদি।' ভিন্ন ভিন্ন স্তরে কি প্রকারে আত্মার বিকাশ পাইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—'অনাবিল সূক্ষ্ম আত্মা বা জ্ঞান হইতে পৃথিবীর আত্মা বা জ্ঞান বিনিঃসৃত হয়। তাহা হইলে মনুষ্যের এবং প্রাণি-সমূহের আত্মা এবং ক্রমশঃ ভূত-সমূহ বহির্গত হয়।' প্লোটিনস ৫৪ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। তাঁহার শিষ্য পারফিরি সেই সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। ২৭০ খৃষ্টাব্দে, ৬৬ বৎসর বয়সে, প্লোটিনসের মৃত্যু হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ বলেন,—এই 'নিও-প্লেটনিক' মত প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর গ্রীস-দেশীয় দর্শন-শাস্ত্র সীমান্ত-রেখায় উপনীত হয়। তাহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় ইউরোপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

নিও-প্লেটনিক দর্শন।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। তাঁহাদের প্রচারিত দর্শনের নাম—'স্কলাষ্টিক' দর্শন। যে সময়ে ইউরোপে ধর্ম্মযাজকগণের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়, তখন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায় নানারূপ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতেন। প্রধানতঃ আরিষ্টটলের মতের অনুসরণ এবং তৎসহ নূতন নূতন কল্পনার সংমিশ্রণ—স্কলাষ্টিক-গণের কার্য্য বলিয়া উক্ত হয়। পিটার লম্বার্ড, আন্সলেম, টমাস একুইনাস এবং ডন স্কোটস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 'স্কলাষ্টিক' মতের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিপোষক মধ্যে গণ্য। খৃষ্ট-ধর্ম্ম-সংস্কারক মার্টিন লুথার তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। জর্ম্মণীর সাক্সনি-প্রদেশে, ইস্‌লেবন্ পল্লীতে, ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে, লুথার জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্ট ধর্ম্ম-জগতে তিনি যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। লুথারের ধর্ম্মসংস্কার-ব্যপদেশে 'প্রটেষ্টাণ্ট' সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। রোমের প্রধান ধর্ম্মযাজক পোপের নির্দ্দেশ অনুসারে তখন খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইত। পোপের অনুগত ধর্ম্মযাজকগণ বাইবেলের যে ব্যাখ্যা করিতেন, বিনা বিচারে লোকে সেই ব্যাখ্যাই মান্য করিত। মার্টিন-লুথার তদ্বিষয়ে প্রতিবাদী হন। ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্ম-পুস্তকের কদর্থ করিয়া লোকের মনে কুসংস্কার বাড়াইয়া দিতেছেন এবং সে কুসংস্কারের মূলোৎপাটন কর্ত্তব্য,—ইহাই তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে খৃষ্টানগণের মধ্যে দুইটী দলের সৃষ্টি হয়। যে দল পূর্ব্ব-প্রচলিত ধর্ম্মমতের প্রতিবাদ করে, সেই দল প্রতিবাদকারী বা 'প্রটেষ্টাণ্ট' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। জর্ম্মণীর সম্রাট পঞ্চম চার্লস ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে স্পিয়ার্স নগরে ধর্ম্মালোচনার

স্কলাষ্টিক দর্শন ও লুথার।

অন্ত সভা আহ্বান করিয়া পূর্ব্ব মতের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। উক্ত খৃষ্টাব্দের ১৯এ এপ্রিল জর্ম্মণীর ছয় জন অধীন নৃপতি প্রকাশ্য-ভাবে লুথারের পক্ষ অবলম্বন করেন। দেশে সংস্কারক-দলের সৃষ্টি হয়। লুথারের মতাবলম্বী প্রটেষ্টাণ্ট-গণের সহিত পূর্ব্বমতাবলম্বী রোমান-ক্যাথলিকগণের বিবাদ চলিতে থাকে। লুথার সৃষ্টি-সম্বন্ধে বাইবেলের মত মানিতেন বটে; কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে বিচার-বিতর্কের ও সংশয়-সন্দেহের পথ প্রশস্ত করিয়া যান। ইহার পর আধুনিক বিজ্ঞানের মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতে থাকে।

ষোড়শ শতাব্দীতে, প্রায় সমসময়ে, ইউরোপের তিন দেশে তিন জন মনীষি জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে বেকন (জন্ম ১৫৬১ খৃঃ), ইতালিতে গ্যালিলিও (১৫৬৪ খৃঃ) এবং ফ্রান্সে ডে'কার্টে (১৫৯৬ খৃঃ) দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হন। লর্ড বেকনই ইংলণ্ডের 'ইংলিশ ফিলজফির" প্রতিষ্ঠাতা ও ভিত্তিভূমি-নির্ম্মাতা আদি-দার্শনিক বলিয়া পরিচিত। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'নভম অর্গেনম' নামক দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে ন্যায়-শাস্ত্রে যেরূপ বিচার-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে, এই গ্রন্থে সেইরূপ বিচার-বিতর্কের ভিত্তির উপর দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ,—বেকনের দার্শনিক মতের ইহাই মূল সূত্র। তাঁহার মতে,—'ব্যাকরণের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি যোগে যেমন ধাতুর রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে।' একটী ঘণ্টায় আঘাত করা হইল। চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম—ঘণ্টা কাঁপিয়া উঠিল। ঘণ্টার চতুঃপার্শ্বের বায়ু আন্দোলিত হইল। তাহাতে অব্যবহিত দূরস্থিত বায়ুও চঞ্চল হইয়া পড়িল। এইরূপে ঘণ্টার আলোড়ন হইতে কর্ণে গিয়া ধ্বনি-রূপে তাহা পরিণত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। সেই সকল ব্যাপারে কর্ত্তা বা কর্ত্তৃত্ব কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি-রহস্যও, বেকনের উপমায়, সেইরূপ। বেকন জাগতিক অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মতে কার্য্য-কারণ-সূত্রে পরিবর্ত্তন-সংগঠন সাধিত হইতেছে। ফরাসী-দেশীয় দার্শনিক ডে'কার্টে ইহার ঠিক বিপরীত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি জগতের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই; সংশয়-সন্দেহ তুলিয়া প্রথমে তাহার নিরসনের চেষ্টা পাইয়াছেন। কিরূপে তিনি অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার একটী প্রসিদ্ধ বাক্য—'কোজিটো আর্গো সম" (Cogito, ergo sum) অর্থাৎ 'আমার চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে, সুতরাং আমি বিদ্যমান আছি," এই উক্তিতে—তাহা প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলেন,—'সৃষ্টির এবং জাগতিক পরিবর্ত্তনাদির প্রতি কার্য্যেই পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অবিসম্বাদিত।' তাঁহার মত এই,—'শরীরের দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, মন তাহার নিয়ন্তা নহে; পরমেশ্বরের দ্বারা সকল কার্য্য সাধিত হয়। এতদ্দ্বারা পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপরই সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব নির্ভর করিতেছে।" গ্যালিলিও প্রধানতঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি-কর্ত্তা। ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিকগণ সৃষ্টি-কর্ত্তার সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বে অনেক সময়েই সন্দিহান থাকেন। গ্যালিলিওর গ্রন্থাদিতেও সেই ভাব পরিস্ফুট। গ্যালিলিওর জন্মের অল্প দিন পূর্ব্বে,

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জর্ম্মণী প্রভৃতির দার্শনিক মত।

১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে, ইতালী-রাজ্যে নেপ্‌লসের সন্নিকটে নোলা-পল্লীতে, জিওরডানো ব্রুণো নামক জনৈক প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। সৃষ্টি-সম্বন্ধে আরিষ্টটল-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় যে মত প্রচার করিতেন, ব্রুণো তাহার বিপরীত মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আরিষ্টটল-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের মতে,—'পৃথিবীর গতি নাই; পৃথিবী নিশ্চল, সীমাবদ্ধ।' কিন্তু ব্রুণো ঘোষণা করেন,—'পৃথিবী ঘূর্ণিত হইতেছে; বিশ্ব অসীম এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকাল ধরিয়া পরিবর্ত্তন চলিয়াছে।' পূর্ব্বোক্ত দার্শনিকগণের প্রায় সমসময়ে হলণ্ডে স্পিনোজা (১৬৩২ খ্রীঃ) এবং জর্ম্মণীতে লেবনিজ (১৬৪৬ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্পিনোজা ঈশ্বরকে সর্ব্বকারণকারণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। লেবনিজ—জর্ম্মণ দর্শনের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কথিত হন। তিনিই জর্ম্মণীতে দর্শন-শাস্ত্রের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করেন। লেবনিজের মত,—ডে'কার্টের মত হইতে ভিন্নরূপ। তিনি বলেন,—'মনের ও শরীরের কার্য্য দুইটী স্বাধীনভাবে পরিচালিত কলের কার্য্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। সে কল পূর্ব্ব-ব্যবস্থাপিত একটি নিয়মানুসারে পরিচালিত হইতেছে। ব্যবস্থাপক—ঈশ্বরও হইতে পারেন। কিন্তু তিনি নিয়ম করিয়া দিয়া গিয়াছেন মাত্র। এখন যে তিনি কোনও কাজ করাইতেছেন, তাহা বলা যায় না; লেবনিজের পর উল্‌ফ্, কাণ্ট, ফিক্‌টে (ফিসে), হেগেল, সেলিং, হারবার্ট, শ্লেয়ার-মেসার প্রভৃতি দার্শনিকগণ লেবনিজ-প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি-ভূমির উপর জর্ম্মণ-দর্শন-শাস্ত্র-রূপ যে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ঔজ্জ্বল্যে এখন সমগ্র পৃথিবী উদ্ভাসিত। উল্‌ফ্ ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে, কাণ্ট ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে, ফিক্‌টে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে, শ্লেয়ার মেসার ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে, হেগেল ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, সেলিং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে, হারবার্ট ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উল্‌ফ্ ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতেন না। তজ্জন্য তিনি, নিরীশ্বর-বাদ প্রচার করিতেছেন বলিয়া, জর্ম্মণ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। নৈতিক উন্নতি বিষয়ে কাণ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন বটে; কিন্তু সৃষ্টি-সম্বন্ধে তিনি প্রকারান্তরে পরমাণুবাদের ও নীহারিকা-বাদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ফিক্‌টের মতে,—'অহং জ্ঞান হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। বিশ্বে ও আমিত্বে কোনই প্রভেদ নাই।" * তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—'চিন্তা করিয়া দেখিলে বিশ্বের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে বিশ্বাস করি বলিয়া বিশ্বের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়।" হেগেল, সেলিং প্রভৃতি অন্যান্য প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মতের উপরই রং ফলাইয়াছেন। জন্ লোক, বার্কলে, ডেভিড হিউম, আডাম স্মিথ, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি ইংলণ্ডের দার্শনিকগণ পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডে আপনাদের জ্ঞান-গবেষণার প্রভাব বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। একই বিষয়ে নানা জনে নানা ভাবে চিন্তা করিয়া নানা-রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এখানে তত্তদ্বিষয়ের অধিক পরিচয় প্রদানের আবশ্যক নাই।

---

* "The I, or the thinking subject, is the absolutely active principle which constructs the consciousness and produces all that exists, by position, contraposition and juxtaposition. The whole universe, in short, is the product of the 'I' or thinking subject."

ফলতঃ, দার্শনিকগণের দর্শন-তত্ত্ব আলোচনার ফলে, কোথাও বা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে; কোথাও তিনি সৃষ্টিকর্তার আসন লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—যে দেশের যে মতেরই আলোচনা করি না কেন, সৃষ্টি-সম্বন্ধে সকল মতই তিনটী মতের অন্তর্ভুক্ত; দার্শনিকগণের মধ্যেও যিনি যতই নাস্তিক্য মতের পরিপোষক হউন না কেন, সৃষ্টি-সম্বন্ধে সকলের সকল মতই সেই তিন মতের অন্তর্নিবিষ্ট;—যথা, (১) বিশ্ব অনন্ত-কাল বিদ্যমান, (২) বিশ্বে স্রষ্টার কর্তৃত্ব, (৩) বিশ্বের ক্রমবিকাশ। পাশ্চাত্য-দর্শনের আলোচনায় দেখা যায়,—সেখানে শেষোক্ত মতই যেন প্রবল হইয়া আছে। *

'য়্যাটমিক থিওরি'—পরমাণুবাদ।

পরমাণু-পুঞ্জের সমবায়ে এই জীব-জন্তু-তরু-গুল্ম-লতা-সমন্বিত পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, রসায়ন-শাস্ত্রের ভিত্তির উপর পরমাণু-বাদীদিগের এই মত প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই।

সৃষ্টি-বিষয়ে পরমাণুবাদ।

স্মরণাতীত-কাল পূর্ব্বে যে পরমাণু-বাদ-তত্ত্বের বীজ হিন্দু-দার্শনিকগণ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই এখন পল্লবিত মুকুলিত হইয়া 'য়্যাটমিক থিওরি' নামে বিশ্ব-সৃষ্টির আদি-কারণ-রূপে পরিগৃহীত হইতেছে। য়্যাটমিক থিওরির সার মর্ম্ম,—'দৃষ্টির অগোচর অবিভাজ্য পরমাণু-সমূহ কতকগুলি সাধারণ নিয়মের অধীন। সেই নিয়মবশে পরমাণু-সমূহের মিলন সংঘটিত হওয়ায়, ভূত-সমূহের উৎপত্তি হয়; এবং সেই ভূত-সমূহের সমবায়েই বিশ্বের উৎপত্তি।' জল, বায়ু, তেজ, মৃত্তিকা ও ব্যোম এই পঞ্চ-ভূতকে অনেকেই অবিভাজ্য মৌলিক পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু পরমাণু-বাদ-তত্ত্বের বিশ্লেষণে নির্দ্দিষ্ট হয়—'ঐ পঞ্চভূতও মৌলিক পদার্থ নহে; উহারা একাধিক অপর পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন।' অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকগণ সেই মূল পদার্থ নির্দ্ধারণ করেন। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহারা দেখাইয়া দেন,—অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন (অর্থাৎ অম্লজান ও উদজান) † বাষ্পের সংযোগে জলের উৎপত্তি হয়। যে প্রকার জলই হউক না কেন, সকল প্রকার জলের মধ্যেই এক ভাগ হাইড্রোজেন এবং ৭.৯৮ ভাগ অক্সিজেন বিদ্যমান আছে। পরিদৃশ্যমান্ পদার্থ-সমূহকে বৈজ্ঞানিকগণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন;—যথা মৌলিক পদার্থ ও মিশ্র পদার্থ।

* স্থূলভাবে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মত জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ইংরাজী পুস্তকগুলি পাঠ করা আবশ্যক;—(1) *The History of Philosophy from Thales to Comte*, in two parts, by George Henry Lewes; (2) *The Biographical History of Philosophy* by the same author; (3) Ueberweg's *History of Philosophy*; (4) *Lives of the Ancient Philosophers* by M. De La Motte Fenelom.

† আমরা অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন প্রভৃতি বৈদেশিক শব্দই পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিলাম। কারণ, ঐ সকল শব্দের যাহা পরিভাষা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখনও মতবিরোধ চলিয়াছে। বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থে অক্সিজেন শব্দ 'অম্লজান' এবং হাইড্রোজেন শব্দ 'জলজান' বা 'উদজান' নামে পরিচিত আছে। কিন্তু ঐ পরিভাষা আজিও সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। প্রাণধারণে অক্সিজেন প্রয়োজন, সেই জন্য ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উহাকে 'প্রাণপ্রদ বায়ু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় উহার নামকরণ করিয়াছেন—'দহন-বায়ু'। এইরূপ নানা বিতণ্ডা চলিয়াছে। সুতরাং আমরা বৈদেশিক নাম একেবারে পরিহার করিতে পারিলাম না।

মৌলিক পদার্থ কতগুলি, আজিও তাহা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে তাহাদের সংখ্যা এখন সাধারণতঃ আটাত্তরটী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মিশ্র পদার্থের সংখ্যা-নির্দ্ধারণ—কল্পনার অতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল পদার্থের মধ্যে কতকগুলি ধাতব এবং কতকগুলি ধাতব নহে। সকল মূল পদার্থ যে পৃথিবীতে সমভাবে বিদ্যমান আছে, তাহাও নহে। বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার ফলে প্রকাশ,—'ভূপঞ্জর (পৃথিবীর উপরিভাগ) যে যে পদার্থে সংগঠিত, সেই সকল পদার্থের মধ্যে নয় হাজার সাতানব্বইটী পদার্থ নয়টী মূল পদার্থের সংযোগে সমুদ্ভূত হইয়াছে।' সেই নয়টী মূল পদার্থ ভিন্ন আরও ত্রিশটী সাধারণ মূল-পদার্থের নাম—বৈজ্ঞানিকগণ এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত, আরও কতকগুলি মূল পদার্থ আছে; কিন্তু তাহা সচরাচর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় না। পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত পদার্থ-সমূহ (ভূপঞ্জর) যে নয়টী মূল পদার্থে সংগঠিত, সেই নয়টী মূল পদার্থের নাম ও পরিমাণ—অক্সিজেন ৪৮০ অংশ, সিলিকন ২৯০ অংশ, য়্যালুমিনাম ৮০ অংশ, লৌহ (আয়রণ) ৬০ অংশ, ক্যালসিয়াম ৩০ অংশ, ম্যাগনেসিয়াম ২০ অংশ, সোডিয়াম ২০ অংশ, পটাশিয়াম ১৫ অংশ, হাইড্রোজেন (উদজান) ২ অংশ, অন্যান্য ভূত ৩ অংশ। পৃথিবীর উপরিভাগস্থিত নানা-স্থানের পর্ব্বত ও পর্ব্বত-গঠনোপযোগী পদার্থের উপকরণ হইতে প্রধানতঃ উল্লিখিত মৌলিক পদার্থ-সমূহের বিভাগ ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত মৌলিক পদার্থ-সমূহের সকলগুলিই মৌলিক-পদার্থ-পদবাচ্য কিনা, তাহাও সন্দেহের বিষয়। পরমাণুবাদীদিগের মত,—ঐ মৌলিক পদার্থ-সমূহও য়্যাটম্ বা পরমাণুর সমবায়ে সংগঠিত। য়্যাটম বা পরমাণু যে কি এবং তাহার আকৃতি যে কত সূক্ষ্ম, এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। * এখনও কেবল কল্পনার উপরই গবেষণা চলিয়াছে। পরমাণুবাদিগণ বলেন,—'য়্যাটম বা পরমাণু অবিভাজ্য ও নিত্য।' সে হিসাবে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যেও য়্যাটম বা পরমাণুর অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে।

জন ডাল্টন পাশ্চাত্য-দেশের পরমাণুবাদ-তত্ত্বকে বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের কাম্বারল্যাণ্ড কাউন্টির অন্তর্গত ইগ্‌লসফিল্ড পল্লীতে ডাল্টন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গণিত ও রসায়ন বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 'নিউ সিষ্টেম অব কেমিকেল ফিলজফি' গ্রন্থে তিনি পরমাণুবাদ-তত্ত্বের অভিনব মত প্রচার করিয়া যান। রসায়ন-গ্রন্থে আজিও তাঁহার সেই মত সমাদৃত হইতেছে। ডাল্টনের মতে,—'প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের মধ্যে অতি-ক্ষুদ্র পরমাণুর সমাবেশ আছে। এক জাতীয় পদার্থের পরমাণু-সমূহ একই প্রকার সাদৃশ্যাত্মক; ভিন্ন জাতীয় পদার্থের পরমাণু-

ডাল্টনের মত।

* সার উইলিয়ম টমসন, (Sir William Thomson) য়্যাটম বা পরমাণুর একটী আকৃতি-পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—'এক ইঞ্চি পরিমিত একটী বস্তুকে ২৫ সহস্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিলে যে পরমাণু-কণা পাওয়া যায়, য়্যাটম তদপেক্ষা বৃহত্তর হইতে পারে না; আবার এক ইঞ্চি পরিমিত একটী দ্রব্যকে পাঁচ শত কোটী অংশে বিভক্ত করিলে যে পরমাণু-কণা পাওয়া যায়, য়্যাটমের আকৃতি তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতরও নহে।'

সমূহের সহিত তৎসমুদায়ের পার্থক্য আছে। রসায়ন-বিজ্ঞানে আমরা প্রত্যক্ষ করি,—এক পদার্থের সহিত অপর এক পদার্থের সংমিশ্রণে এক অভিনব পদার্থের উৎপত্তি হয়। পরমাণুবাদ-তত্ত্বের স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে,—'রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেমন দুই বা ততোঽধিক পদার্থের সমবায়ে এক অভিনব বস্তুর উৎপত্তি হয়, বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর সংযোগে সেইরূপ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে।' কিন্তু একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—পরমাণু-সমূহ পরস্পর মিলিত হইবে কেন? যাঁহারা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-কার্য্যে বিশ্বাসবান্, তাঁহারা বলেন,—'সৃষ্টিকর্তাই পরমাণুপুঞ্জের মিলন-সাধন করিয়া দেন। যাঁহারা সৃষ্টিকর্তার সে প্রধান্য স্বীকার করেন না, তাঁহাদের কেহ বলেন,—'উত্তাপের দ্বারা, কেহ বলেন—'বায়ু দ্বারা পরমাণু-সকল সঞ্চালিত হইয়া আবশ্যকানুরূপ মিলিত হয়। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতের মত,—'বিশ্বের সকল পদার্থই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। তদ্দ্বারা ক্ষুদ্রতর পদার্থ বৃহত্তর পদার্থের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। এই নৈসর্গিক নিয়মের বশে পরমাণু-সমূহ পরিচালিত হইয়া থাকে; আর তাহা হইতেই যৌগিক পদার্থ-সমূহের উৎপত্তি হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার জনষ্টন ষ্টোনি বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে 'ইলেক্ট্রন' নামধেয় যে কল্পিত সামগ্রীর প্রভাব উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে এই পরমাণুবাদেরই সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম বা উচ্চ স্তর বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইলেক্ট্রন-সম্বন্ধে ডাঃ ষ্টোনির মত,—'ইলেক্ট্রন সকল পদার্থের আদি। এমন কি, পরমাণুও ইলেক্ট্রন হইতে উৎপন্ন। ইলেক্ট্রন ছাড়া কোনও পদার্থই নাই। ইলেক্ট্রন—গতিশক্তি-বিশিষ্ট; ইলেক্ট্রন—বিদ্যুতের আদি ও বিদ্যুতের জনয়িতা। বৈজ্ঞানিকগণ হাইড্রোজেনের পরমাণু-পরিমাণ যেরূপ নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, ইলেক্ট্রনকে তাহার দুই সহস্র অংশের এক অংশ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের 'সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রেল' গির্জ্জার উপরিভাগস্থিত গম্বুজের সহিত একটী ছোট আলপিনের অগ্রভাগের যে অনুপাত, হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর সহিত ইলেক্ট্রনের সেই অনুপাত।'

'ইভলিউশন থিওরী'—বিবর্ত্তবাদ।

ইংরাজীতে যাহাকে 'ইভলিউশন থিওরি' বলে, তাহা ক্রমবিকাশ-বাদ, বিবর্ত্ত-বাদ, অভিব্যক্তি-বাদ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্ত-বাদকে পরমাণু-বাদের একটী স্তর বলিলেও বলা যাইতে পারে। ডারউইন এই মতের প্রধান পরিপোষক ছিলেন বলিয়া, এই মত 'ডারউইনিজম' নামেও পরিচিত। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী, ইংলণ্ডের স্রুস্‌বেরী-সহরে চার্লস ডারউইন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ ইরাসমাস ডারউইন একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও দার্শনিক ছিলেন; তাঁহার পিতা রবার্ট ডারউইনও সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কারে চার্লস ডারউইন সারাজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী গবেষণার ফলে প্রথমে 'ওরিজিন অব স্পিসিজ' *

ডারউইন ও 'ডারউইনিজম'।

* *Vide*, Charles Darwin, *Origin of Species, by means of Natural Selection or the Preservation of forvoured races in the strugg'e for life.*

গ্রন্থ বিরচিত হয়। সেই গ্রন্থে তিনি প্রকাশ করেন,—'যে সকল প্রাণী এবং উদ্ভিদাদি এই সংসারে অধুনা বিদ্যমান রহিয়াছে, পূর্ব্বে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল না। অন্য জাতীয় উদ্ভিদের বা প্রাণীর ক্রমোৎকর্ষে বর্ত্তমান উদ্ভিদ-রাজি ও প্রাণী-সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। সংসারে প্রকৃতি-রাজ্যে, ভীষণ জীবন-সংগ্রাম চলিয়াছে। সেই সংগ্রামে যে জয়লাভ করিতে পারিতেছে, সেই রহিয়া যাইতেছে; আর যে পরাভূত হইতেছে, সংসার হইতে তাহার অস্তিত্ব চিরতরে লোপ পাইতেছে। পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণী বিদ্যমান ছিল, যাহাদের অস্তিত্ব এখন আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না; পৃথিবীতে এমন অনেক বৃক্ষ-লতা ছিল, এখন আর যাহাদিগকে খুঁজিয়া পাই না। এদিকে আবার এমন অনেক নূতন প্রাণীর এবং নূতন তরু-গুল্ম-লতা-উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছে, পূর্ব্বে যাহাদের অস্তিত্বের কোনই আভাষ পাওয়া যায় নাই। উৎকর্ষের দিকেই সাধারণতঃ চেষ্টা চলিয়াছে। তাহাতে একজাতীয় উদ্ভিদ অন্য জাতীয় উদ্ভিদে পরিণত হইতেছে এক জাতীয় জীব অন্য জাতীয় জীবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে এবং প্রাণীর মধ্যে নিয়ত যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে ডারউইন বিবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, নানা কারণে উদ্ভিদের ও প্রাণি-গণের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তিনি দেখাইয়াছেন,—গৃহপালিত জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের পরিবর্ত্তন প্রক্রিয়া; তিনি দেখাইয়াছেন,—প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত ও বর্দ্ধিত জীবজন্তু-উদ্ভিদাদির পরিবর্ত্তন-প্রক্রিয়া; তিনি দেখাইয়াছেন,—প্রাণিগণের ও উদ্ভিদাদির মধ্যে আত্মরক্ষার যে চির-সংগ্রাম চলিতেছে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের পরিবর্ত্তন-প্রক্রিয়া; তিনি দেখাইয়াছেন,—সমজাতীয় বা বিভিন্ন জাতীয় জীবজন্তুর বা উদ্ভিদাদির মিলন-জনিত পরিবর্ত্তন প্রক্রিয়া। জীবন-সংগ্রামের মধ্যে উদ্ভিদের ও প্রাণি-সমূহের কিরূপে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন,—'পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণী ও প্রত্যেক উদ্ভিদ আত্ম-রক্ষার জন্য চেষ্টা পাইতেছে। তজ্জন্য একজাতীয় উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে পরস্পর যেরূপ সংঘর্ষ চলিয়াছে, ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যেও সেইরূপ সংঘর্ষ চলিয়াছে। সেই সংঘর্ষের ফলে, কতকগুলি আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতেছে, কতকগুলি পরিপুষ্টি-লাভ করিতেছে, এবং অপর কতকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে অথবা হীনগতি লাভ করিতেছে। প্রত্যেক প্রাণীর বা উদ্ভিদের উৎপত্তির ও সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-সংগ্রামের সূচনা হয়। পৃথিবীতে এক জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ এক এক সময়ে এতই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, তাহাদিগের সকলগুলি জীবিত থাকিলে পৃথিবীতে কখনই তাহাদের স্থান-সঙ্কুলান হয় না; এমন কি, যেরূপ অসংখ্য পরিমাণে এক এক প্রকারের জীব বা উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করে, তাহাতে তাহাদের সকলগুলি বাঁচিয়া থাকিলে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট জীবে বা উদ্ভিদেই পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যায়। সংসারে যে নিয়মে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহাতে জাত-মনুষ্য সকলগুলি জীবিত থাকিলে, পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর জন-সংখ্যা দ্বিগুণ হইতে পারে এবং কয়েক সহস্র বৎসরের মধ্যেই মনুষ্যের বংশধরগণের পৃথিবীতে আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। সকল প্রাণীর অপেক্ষা হস্তীর সন্তান সন্ততি অল্প হয়।

ত্রিশ বৎসর বয়সে তাহারা প্রথম সন্তান প্রসব করে। নব্বই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের সন্তান-সন্ততি হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ দীর্ঘকালের মধ্যেও ছয়টীর অধিক হস্তিশাবক জন্মগ্রহণ করিবার বিষয় জানা যায় নাই। এত কম সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াও হস্তিশাবকগণ সকলগুলি যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে পাঁচ-শতাব্দীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এক জোড়া হস্তী হইতে উৎপন্ন এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ হস্তী এক সময়ে জীবিত রহিয়াছে। এক এক প্রকার মৎস্যের ও এক এক প্রকার পক্ষীর কত ডিম্ব উৎপন্ন হয়। তাহাদের সকল শাবকগুলি জীবিত থাকিলে, পৃথিবীতে স্থান হইত কি? যেমন জীবজন্তু-সম্বন্ধে, তেমনি উদ্ভিদাদি বিষয়ে। বহুসংখ্যক এক-জাতীয় উদ্ভিদের বা প্রাণীর মধ্যে যেমন কয়েকটি মাত্র আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন-জাতীয় প্রাণীর বা উদ্ভিদের মধ্যেও পরস্পর-দ্বন্দ্বে বিশেষ বিশেষ প্রাণী বা উদ্ভিদ রক্ষা প্রাপ্ত হয়। একটী উদ্যানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনায়াসেই প্রত্যক্ষীভূত হইবে,—বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় ক্ষুদ্র বৃক্ষ কিরূপভাবে জর্জ্জরীভূত হইয়া আসিতেছে, অথবা এক-জাতীয় বৃক্ষের প্রভাবে অন্য জাতীয় বৃক্ষ কিরূপভাবে লোপপ্রাপ্ত হইতেছে। একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, এই দ্বন্দ্বে তাহাদের অবয়বাদির কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহাও বুঝা যাইবে। বিজাতীয় জীব-জন্তুর বা উদ্ভিদাদির সমবায়ে কিরূপ অভিনব জীবজন্তু বা উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হয়, তাহা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। সযত্ন-পালিত উদ্ভিদাদির ও প্রাণীর সহিত স্বভাবজ বা উপেক্ষিত উদ্ভিদের ও প্রাণীর পার্থক্য লক্ষিত হয়। এইরূপে নানা কারণে ধীরে ধীরে এক হইতে অন্যের উদ্ভব হইয়া থাকে।' ইহাই ক্রমবিকাশ-বাদীদিগের সিদ্ধান্ত। এই ক্রম-বিকাশ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা-কল্পে ডারউইন সারাজীবন গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং নানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ডারউইনের পূর্ব্বেও ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল বটে; কিন্তু তিনি ক্রমবিকাশ-বাদকে যুক্তি-তর্কের এক নূতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রম-বিকাশ-বাদ প্রতিষ্ঠায় ইংলণ্ডে তিনিই প্রথম ও প্রধান; আর সেইজন্য তিনিই অধিকতর প্রতিষ্ঠান্বিত। ক্রমবিকাশ-বাদের আলোচনায়, বানর হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে—এই মতের প্রতিষ্ঠা-কল্পে, ডারউইন বিশেষভাবে মস্তিষ্ক-চালনা করিয়াছিলেন। কতকটা সেই জন্যই, 'ডারউইনিজম' বা ডারউইনের মত অধুনা সর্ব্বজনবিদিত হইয়া পড়িয়াছে।

ডারউইনের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-দেশে ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের যাঁহারা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বনেট, বাফন, লামার্ক, ডি-ক্যাণ্ডোল, কুভেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহারাই পাশ্চাত্য-দেশে ক্রমবিকাশ-বাদের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ জেনেভা নগরে 'চার্লস বনেট' জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দর্শন-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে তিনি স্পষ্টতঃ লিখিয়া গিয়াছেন,—'ক্রমবিকাশ ও পরিবর্দ্ধন একই ভাবাত্মক। প্রাণশক্তিসম্পন্ন অবয়বের পরিপুষ্টি—তাহার পরিবর্দ্ধন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। জলের মধ্যে শুষ্ক 'জিলেটিন' (শিরিশের ন্যায় পদার্থ) ডুবাইয়া রাখিলে তাহা সম্প্রসারিত হয়। আবার জল হইতে তুলিয়া উহাকে শুষ্ক করিলে উহা সঙ্কুচিত হয়। প্রাণীর

ডারউইনের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ।

ও উদ্ভিদাদির পরিবর্দ্ধন ও মৃত্যু সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে। প্রাণি-জগতে কিছুই নূতন সৃষ্ট হয় না। যাহাদের বীজ আদি হইতে বিদ্যমান আছে, পরিবর্দ্ধনে তৎ-সমুদায়ই বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিছুরই মৃত্যু নাই। আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহা জীবিত প্রাণীর সঙ্কোচন অর্থাৎ বীজ-অবস্থা-প্রাপ্তি মাত্র।' * ফরাসী-দেশের প্রসিদ্ধ প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বাফনের উক্তিতেও এক হইতে অন্যের উৎপত্তি-বিষয়ক এইরূপ আভাষই পাওয়া যায়। বার্গাণ্ডির অন্তর্গত মণ্টবার্ড নগরে, ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর, বাফন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন,—'এক জাতীয় জীব বা উদ্ভিদ হইতে যেমন সেই জাতীয় জীবের বা উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়; এক জাতীয়ের সহিত অপর জাতীয়ের সংমিশ্রণে সেইরূপ এক অভিনব জাতীয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে।' ডি-ক্যাণ্ডোল এতৎসম্বন্ধে আরও একটু অধিক অগ্রসর হন। ডি-ক্যাণ্ডোল ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে জেনেভা-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। উদ্ভিদ-বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এক জাতীয় উদ্ভিদ বা প্রাণী হইতে অন্য জাতীয় উদ্ভিদের বা প্রাণীর উৎপত্তির বিষয় তিনি স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাণি-সমূহ ক্রমোন্নতির পথে দিন দিন কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে,—ফরাসী দেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কুভেয়ার তাহার আলোচনা করেন। প্রাণি-বিদ্যা ও শারীর-বিদ্যাকে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৩এ আগষ্ট মম্পেলগার্ড সহরে তাঁহার জন্ম হয়। তখন ঐ সহর জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাহা হউক, বনেট, বাফন, ডি-ক্যাণ্ডোল বা কুভেয়ার ক্রমবিকাশ-বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার গ্রন্থ-পত্রে আভাষমাত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লামার্ক ঐ পথে এক নূতন আলোক-রশ্মি বিকীরণ করেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট, ফরাসী-রাজ্যের বারেণ্টিন পল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। উদ্ভিদের ও প্রাণি-সমূহের পরিবর্ত্তন-বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে বাফন যে মতের আভাষ দিয়া গিয়াছিলেন, লামার্ক সেই মতের উৎকর্ষ-সাধন করিয়া যান। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলেন,—'কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী, এমন কি মনুষ্য পর্য্যন্ত, সকলই নিম্ন-স্তরের উদ্ভিদ ও প্রাণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।' সর্ব্বনিম্ন স্তরের উদ্ভিদ বা প্রাণী, লামার্কের মতে, আপনা-আপনিই সমুদ্ভূত হয়; এবং তাঁহাদের ক্রমবিকাশে উচ্চ-স্তরের উদ্ভিদ ও প্রাণী উৎপন্ন হইয়া থাকে। লামার্কের পর জিওফ্রি সেণ্ট-হিলারে ঐ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পারিস-সহরে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার মত এই যে,—'সে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বে হইয়াছিল বটে; কিন্তু এখন আর তাহা হয় না।' ইতিমধ্যে, ১৮৪৪

* "The growth of an organic being is simply a process of enlargement. As a particle of dry gelatine may be swelled up by the intussusception of water; its death is a shrinkage, such as the swelled jelly may undergo on desiccation. Nothing really new is produced in the living world but the germ which develop have existed since the beginning of things; and nothing really dies, but, when what we call death takes place, the living thing shrinks back into its germ state."

খৃষ্টাব্দে, 'সৃষ্টির প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিদর্শন' সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। সে গ্রন্থকার আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে ডারউইনের অনুসন্ধানের পথ যে অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডারউইনের 'ওরিজিন অব স্পিসিজ' অর্থাৎ 'বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের আদিতত্ত্ব' বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সে গ্রন্থে তিনি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, পূর্ব্বেই তাহার আভাষ প্রদান করা হইয়াছে।

ডারউইনের গ্রন্থ প্রকাশের পর, তাঁহার মত-সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন-আলোচনা উপস্থিত হয়। তখন প্রকারান্তরে যাঁহারা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, অথবা

হেকেল ও হাক্সলি প্রভৃতির গবেষণা।

যাঁহাদের সাহায্যে তিনি আপন মত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আলফ্রেড রাসেল, ওয়ালেস, অধ্যাপক হাক্সলি এবং হেকেল বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা প্রায় সকলেই ডারউইনের সমসাময়িক। কেহ বা ডারউইনের 'মনুষ্য-জাতির উৎপত্তি' বিষয়ক গ্রন্থ * প্রকাশের পূর্ব্বে এবং কেহ বা তাহার পরে আপন আপন গবেষণা প্রকাশ করিয়া যান। ডারউইনের গ্রন্থ-প্রকাশের পরে ওয়ালেস যে তাঁহারই অনুসরণে আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থের নামকরণে ও ভূমিকাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। † তবে মানব-জাতির উৎপত্তি বিষয়ে অধ্যাপক হেকেল যে গ্রন্থ রচনা করেন, সে গ্রন্থ যে ডারউইনের 'মানব-জাতির উৎপত্তি' বিষয়ক গ্রন্থের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ডারউইনই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সে গ্রন্থে হেকেল অশেষ গবেষণার পরিচয় দেন। ডারউইন আপনার গ্রন্থের ভূমিকায় হেকেলের সেই গবেষণা-বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন,—'আমার প্রবন্ধ যদি লেখা শেষ না হইত, তাহা হইলে অধ্যাপক হেকেলের গ্রন্থ-প্রকাশের পর আমার গ্রন্থ-প্রকাশের কোনই আবশ্যকতা হইত না।' বলা বাহুল্য, হেকেল জর্ম্মণ-ভাষায় সেই গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন; এখন ইংরাজীতে সে গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। কোনও নীচ-জাতীয় প্রাণীর ক্রমবিকাশেই যে মানব-জাতির উৎপত্তি,—'মানবজাতির ক্রমবিকাশ' নামক গ্রন্থে হেকেল চিত্র ও যুক্তি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন,—স্তন্যপায়ী অন্যান্য জন্তুর অবয়বের গঠন-প্রণালীর সহিত মনুষ্যের অবয়বের গঠন-প্রণালীর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। তিনি দেখাইয়াছেন—'অন্যান্য প্রাণীর ভ্রূণ যেরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়, মানব-ভ্রূণও ঠিক সেইরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।' তিনি আরও দেখাইয়াছেন,—'শেষ অবস্থায় অর্থাৎ মনুষ্যাকারে পরিণত হইবার সমসময়েও মনুষ্যের ভ্রূণের সহিত উচ্চ-স্তরের স্তন্যপায়ী জীবের ভ্রূণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকে; আবার মনুষ্যের ভ্রূণের আদিম অবস্থার সহিত যে-কোনও প্রাণীর

* *The Descent of Man and Selection in relation to sex* by Charles Darwin, M. A., F. R. S., etc.

† ওয়ালেসের গ্রন্থের নাম—*Darwinism*, An Exposition of the Theory of Natural Selection with some of its application, by Alfred Russel Wallace, L. L. D.

ভ্রূণের সাদৃশ্য অবিসম্বাদিত।' স্থূলতঃ, তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—'প্রথমাবস্থায় মনুষ্যের ভ্রূণ-সকল স্তন্যপায়ী যে-কোনও প্রাণীর ভ্রূণের সহিত এবং শেষাবস্থায় কেবল উচ্চ-স্তরের প্রাণীর ভ্রূণের সহিত অভিন্ন বলিয়া বুঝা যাইতে পারে।' * ভ্রূণ অবস্থা হইতে মানবে পরিণতি পর্য্যন্ত তিনি মনুষ্য-দেহের ক্রম বিকাশের ছাব্বিশটী স্তর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সেই স্তর-সমূহের আলোচনায় তিনি আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে,—'পুচ্ছ-হীন বানর বা বন-মানুষের সহিত মানুষের সেই সকল স্তরের কোনই পার্থক্য নাই।' ডারউইনও এই মতেরই প্রতিষ্ঠাতা। অধ্যাপক হাক্সলি এ সম্বন্ধে আর একটু কৌতুকপ্রদ কাহিনী কহিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—'উচ্চ-স্তরের পুচ্ছহীন বানরের বা বনমানুষের সহিত নিম্ন-স্তরের কুক্কুরের যত অসাদৃশ্য, মানুষের সহিত বনমানুষের বা বানরের ততটা অসাদৃশ্য নাই।' † যাহা হউক, ক্রমবিকাশ-বাদীদিগের মতে,—'ভ্রূণের মধ্যে মানুষ যেমন নানা আকারে পরিণত হয়, জন্মগ্রহণ করিয়াও মানুষ যেমন বাল্য-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব-বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে, নিম্ন-স্তরের প্রাণি-পর্য্যায়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিবর্ত্তনে সেইরূপ ভাবেই মানুষের উদ্ভব হইয়াছে।' তাঁহাদের আর এক যুক্তি,—'যে অঙ্গ যেরূপ ব্যবহারে আসে, সেই অঙ্গ সেইরূপ পরিপুষ্টি লাভ করে; এবং যে অঙ্গ যতটা অব্যবহার্য্য থাকে, সে অঙ্গ সেই পরিমাণ হীন-দশা প্রাপ্ত হইয়া আসে।' বানরের লাঙ্গুল এবং মনুষ্যের লাঙ্গুলহীনতা, তাঁহাদের মতে, সেই ব্যবহার-অব্যবহারের পরিণতি মাত্র। ক্রমবিকাশ-বাদিগণের মতে, সংসারে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই; দৈনন্দিন ক্রমবিকাশের ফলে সংসারে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ক্রিয়া সাধিত হইতেছে।

'নেবিউলার থিওরি'—নীহারিকাবাদ।

নেবিউলার থিওরি।

ক্রমবিকাশ-বাদীরা প্রাণি-সমূহের ও উদ্ভিদাদির উৎপত্তির মূলে বিশেষ বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; এবং তৎসমুদায়ের সংযোগ-বিয়োগে পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনে যে অভিনব পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে ভিত্তির উপর আপনাদের কল্পনা-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই ভিত্তি কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সকলের মূলীভূত ও আদিভূত সামগ্রী কোথায় ছিল, এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক তাহারই অনুসন্ধানে বিনিবিষ্ট। সেই বৈজ্ঞানিকগণ 'নেবিউলা' বা নীহারিকা নামধেয় এক কল্পিত সামগ্রীকে পৃথিব্যাদি গ্রহ-নক্ষত্র

---

* হেকেলের গ্রন্থের যে ইংরাজি অনুবাদ হইয়াছে, সেই গ্রন্থের নাম—*The Evolution of Man*—A popular exposition of the principal pionts of human ontogeny and philogeny from the German of Ernest Haeckel, ch. XII.

† এ বিষয়ে হাক্সলির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়াই ডারউইন বলিয়া গিয়াছেন,—"I will conclude with a quotation from Huxley, who after asking, does man originate in a different way from a dog, bird, frog or fish ? says, 'the reply is not doubtful for a moment ; without question, the mode of origin, and the early stages of the development of man, are identical with those of the animal immediately below him in scale ; without a doubt in these respects he is far nearer to apes than the apes are to the dogs."—*The Descent of Man.*

সকলেরই আদিভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের সেই মত 'নেবিউলার থিওরি' নামে পরিচিত। 'নেবিউলার থিওরি' রূপ কল্পিত সামগ্রী বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি প্রসঙ্গতঃ তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। এই মতের প্রতিষ্ঠাতৃগণ বলেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই কুয়াসা, বাষ্প বা মেঘরূপ নীহারিকায় (নেবিউলায়) সমাচ্ছন্ন ছিল। সেই নীহারিকা-সমূহ সচঞ্চল ও চাকচিক্যসম্পন্ন। যদি কেহ কুয়াসা বা মেঘের প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি সঞ্চালন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহাদের গতি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। নেবিউলা ও কুয়াসা বা মেঘ যে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে কুয়াসা বা মেঘের সহিত যে উহার তুলনা করা হইল, তাহার উদ্দেশ্য—নেবিউলার আকৃতি-প্রকৃতি বিষয়ে একটু আভাষ দেওয়া মাত্র। যাহা হউক, স্বাভাবিক ঘূর্ণন বা গতির বশে নীহারিকা-সমূহ ক্রমশঃ পিণ্ড-রূপে পরিণত হয়। সে পিণ্ড প্রথমে বৃহত্তম হইয়াছিল, অন্যান্য পিণ্ডগুলি তখন তাহাকেই বেষ্টন করিয়া বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। এইরূপে পিণ্ডের পর পিণ্ড—বিশ্বে অসংখ্য পিণ্ডের উৎপত্তি হয়। এই যে সূর্য্য-চন্দ্র-পৃথিবী-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি অধুনা মানবের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে, এ সকলই নীহারিকা-সমূহের সংযোগে সংগঠিত।' কিরূপ-ভাবে এই সংযোগ সাধিত হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহার নানা প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন,—নীহারিকা-সমূহের স্বাতন্ত্র্য-সাধনের পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয়। কখনও কখনও কতকগুলি নীহারিকা ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন গুচ্ছের ন্যায় বিরাজমান থাকে; কখনও বা কতকগুলি একস্থানে পিণ্ডাকারে পুঞ্জীকৃত হইয়া অবস্থিতি করে। এ হিসাবে, সৃষ্টির আদিতে সূর্য্য-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র কিছুই ছিল না; নীহারিকাপুঞ্জের সমবায়ে ঐ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে।

কতকগুলি নীহারিকা গোলাকৃতি;—কেন্দ্রস্থল হইতে ঘনীভূত হইয়া আসিয়া তৎসমুদায় ক্রমশঃ বিরাট গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে। অন্য কতকগুলি নীহারিকা এখনও সম্পূর্ণরূপ ঘনীভূত হয় নাই;—একটী নক্ষত্রের চতুঃপার্শ্বে ঘোর কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকিলে যেরূপ হয়, সেগুলি সেইভাবেই অবস্থিত আছে। অপর কতকগুলি নীহারিকা ঘনীভূত হইতে হইতে কেন্দ্রাভিমুখে চলিয়াছে।

নীহারিকার প্রকৃতি-পরিচয়।

নীহারিকার এইরূপ বিভিন্ন অবস্থা বিষয়ে—নীহারিকা দ্বারা ক্রমশঃ যে এক একটী গ্রহ-উপগ্রহের আকৃতি সংগঠিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে—ফরাসী-দেশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ লাপলেস পাশ্চাত্য-দেশে প্রথমে আপন মত ব্যক্ত করেন। তৎপরে ক্রমশঃ তাঁহার মতের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া আসিয়াছে। নীহারিকা হইতে কিরূপে পর্য্যায়-ক্রমে গ্রহাদির উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে মত এই যে,—'প্রথমে নীহারিকাগুলি তরলভাবে অবস্থিত ছিল। তখন উহার সকল অংশেই সমভাবে গাঢ়ত্ব লক্ষিত হইত। ইহাই নীহারিকার প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় উহার কেন্দ্রভাগ ঘনীভূত হইয়া আসে। তৃতীয় বা শেষ অবস্থায় নীহারিকা-সমূহ গ্রহ-নক্ষত্রাদির রূপ পরিগ্রহ করিয়া সৌর-জগতে আপন-আপন কক্ষপথে বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। পৃথিবী—ঐ সমুদায় গ্রহেরই অন্তর্ভুক্ত।' এখন দূরবীক্ষণ

যন্ত্র সাহায্যে নীহারিকা সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে; দেখা যাইতেছে,—নীহারিকা হইতে উদ্ভূত বহু নক্ষত্র এখনও পুঞ্জাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, আর তৎসমুদায় হইতে বিনিঃসৃত আলোক-রশ্মি-সমূহ একত্রীভূত হওয়ায় তাহাদিগকে একটী পিণ্ড বলিয়া মনে হইতেছে। নেবিউলা বা নীহারিকা—অধুনা তারকা-সদৃশ পদার্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। নীহারিকার সংখ্যাবিষয়ে লাপলেস কখনও কিছু নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন কি না, প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ১৭৭১খৃষ্টাব্দে, পারিস-সহরের চার্লস মেসিয়ার ১০৩টী নেবিউলার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে, ২০ বৎসরের গবেষণার ফলে, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ সার উইলিয়ম হার্সেল নীহারিকা-সংক্রান্ত বহু তত্ত্ব প্রকাশ করেন। প্রথমে তিনি ২৫০০ সংখ্যক নেবিউলার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। পরিশেষে, ১৮২৫ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, অনুসন্ধান করিয়া তিনি ৩৯৩৬টী নীহারিকা আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে এক উত্তমাশা অন্তরীপ হইতেই তিনি ১৭০০টী নীহারিকা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আর্ল রোস নেবিউলা পরীক্ষা করেন। তাঁহার গবেষণার ফলে নেবিউলার সংখ্যাধিক্য প্রতিপন্ন হয়। উহার অল্প দিন পরেই জ্যোতির্ব্বিদ পেরিন, বিদ্যমান নেবিউলার সংখ্যা-পরিমাণ পাঁচ লক্ষের অধিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতঃপর নেবিউলার অষ্টবিধ রূপ স্থির হয়;—(১) বিভিন্ন আকৃতি-সম্পন্ন নেবিউলা; রাশিচক্রের অন্তর্গত নীহারিকা-সমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; (২) বলয়াকার বা মণ্ডলাকৃতি নেবিউলা; (৩) ডাম্বেলের ন্যায় একত্র-সম্বদ্ধ দুই দিকে দুইটী গোলাকার নেবিউলা; (৪) গ্রহ-সম্পর্কীয় নেবিউলা; উহাদের আকৃতি পেচকের ন্যায়; (৫) বৃত্তাভাষ বা এলিপ্‌স্‌ আকৃতি-বিশিষ্ট নেবিউলা; (৬) বক্রাকৃতি সম্পন্ন নেবিউলা; (৭) নীহারিকার তারকাবলী; (৮) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নীহারিকাংশ-সমূহ। এই সমস্ত নীহারিকার মধ্যে প্রথমোক্ত নীহারিকার সীমারেখা নির্দ্দেশ করা যায় না। তাহাদের আকৃতি দধির ন্যায় তরল। তাহাদিগকে ধূমের মালা বলিলেও বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়োক্ত নীহারিকার আকৃতি বলয়-সদৃশ; তাহার মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত অন্ধকারপূর্ণ ও গাঢ়।

সৌর-জগতের সৃষ্টি ও গঠন সম্বন্ধে 'নেবিউলার থিওরি' প্রযুক্ত হইলেও এখনও গণিত-শাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

সৌর-জগতোৎপত্তি প্রক্রিয়া।

সৌর-জগতে গ্রহাদির মধ্যে স্থানে স্থানে অভিনব সাদৃশ্য বিদ্যমান। কতকগুলি একজাতীয় পদার্থের সমবায়ে উহারা যে উৎপন্ন হইয়াছে, সাদৃশ্য দেখিয়া স্বতঃই তাহা মনে হয়। সৌর-জগতের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এখনও অনেক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। ধূমকেতু-সমূহ সৌর-জগতে উৎপন্ন হইয়াছে, কি অন্য কোনও শূন্য স্থান লইতে সৌর-জগতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে,—এ বিষয় এখনও বিবেচনাধীন। তবে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া গ্রহ-সমূহ যে একই পথে একই দিকে বিঘূর্ণিত হইতেছে, এ তথ্য পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন। এখন অন্যূন পাঁচ শত সংখ্যক গ্রহ-উপগ্রহ ঐ নিয়মের অধীন বলা যাইতে পারে। সমস্ত বৃহৎ এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র গ্রহ প্রায় একই সমতল ক্ষেত্রে আপনা-আপন কক্ষ-বৃত্তে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে। পাঁচ শত গ্রহ-উপগ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একই দিকে বিঘূর্ণিত হইতেছে,—ইহা এখন আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। ঐ সকল গ্রহ-উপগ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া, একই দিকে একইভাবে কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নেবিউলার থিওরি দ্বারা তাহার কারণ-পরম্পরা বিবৃত করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। লাপ্‌লেস অনুমান করেন—'অধুনা গ্রহ-উপগ্রহাদিতে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, আদিতে সেই স্থান নীহারিকা-সমাচ্ছন্ন ছিল। এই সুবৃহৎ নীহারিকা-সমাচ্ছন্ন ক্ষেত্রের কেন্দ্রভাগে সূর্য্যের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আদিভূত নীহারিকা যে অংশ অধিকতর ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল, উহাই ক্রমশঃ সূর্য্য-রূপে প্রকাশমান হয়। সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম নীহারিকার বিঘূর্ণনের ন্যায় সূর্য্য প্রথম হইতেই আপনার কক্ষপথে বিঘূর্ণিত হইতেছিল। বিচ্ছিন্ন অংশ-সমূহের গতির সাহায্য ব্যতীত সংযুক্ত-অংশের স্বাধীন-গতির বিষয় এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে। শৈত্য-হেতু প্রথমে নীহারিকা-সমূহের সংযোগে সূর্য্যের উৎপত্তি হয়। তাপ-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে পদার্থ-মাত্রই শৈত্য-বশে কেন্দ্রাভিমুখে ঘনীভূত হইতে থাকে; আবার গতি-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে বুঝিতে পারি,—যে পদার্থ যতই সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে, সে পদার্থ ততই অধিক বেগে বিঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। সেই বিঘূর্ণনের ফলে, কেন্দ্রাপসারিণী গতি ঘনীভূত পদার্থের বহিরংশের প্রতি অধিক শক্তি প্রয়োগ করিবে; আর তাহাতে সেই ঘনীভূত পদার্থের বাহিরের অংশ তাহার চারিদিকে বলয়ের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিবে। অতঃপর বলয়ের অন্তর্গত ঘনীভূত অংশ একই নিয়মে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে এবং তাহাতে আবার আর এক নূতন বলয়ের সৃষ্টি হইবে। এইরূপে বহু বলয়ের সৃষ্টি হইয়া কেন্দ্রস্থিত ঘনীভূত নীহারিকার চতুঃপার্শ্বে তৎসমুদায় একই দিকে বিঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। অবশেষে বলয়া-কারে যে নেবিউলা-রাশি বিদ্যমান থাকিবে, তাহার উপাদান-সমূহ ক্রমশঃ শীতল ও সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে। তখন তাহা বাষ্পীয় অবস্থা হইতে জলীয় অবস্থায় পরিণত হইবে। বলয়াংশ যদি অপেক্ষাকৃত সমভাবে ঘনীভূত হয়, তাহা হইলে তাহাতে ছোট ছোট অসংখ্য গ্রহের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর। জুপিটার এবং মার্স প্রভৃতির কক্ষ-বৃত্তের মধ্য-পথে আমরা যে সকল গ্রহ-উপগ্রহাদি দেখিতে পাই, উক্তরূপ প্রক্রিয়া-বশে তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ নীহারিকা-বলয় সর্ব্বত্র সমান আকৃতি-বিশিষ্ট নহে সুতরাং উহার একাংশ অপেক্ষা অপরাংশ সহজেই ঘনীভূত হইতে পারে। সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হইলে বলয়ের উপাদান-সমূহ একটী পিণ্ডাকারে পরিণত হয় এবং তদ্দ্বারা একটি গ্রহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তখন সেই গ্রহের চতুঃপার্শ্বে আবার যে নূতন বলয় উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যেও পূর্ব্বরূপ প্রক্রিয়া-বশে ঐ গ্রহের উপগ্রহ-সমূহ উদ্ভূত হইতে পারে। সূর্য্যের পার্শ্বে বলয়ের সৃষ্টি হইয়া তাহার মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর, সৃষ্ট গ্রহ-সমূহের পার্শ্বেও সেইরূপভাবে উপগ্রহ-সমূহ উৎপন্ন হইতে পারে। কি কারণে গ্রহ-সমূহ সমভাবে একই দিকে বিঘূর্ণিত হয়, এই যুক্তি দ্বারা আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আর এই যুক্তির সাহায্যেই আমরা গ্রহগণের কক্ষ-পথের পরস্পর নৈকট্যের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। নীহারিকা হইতে

গ্রহাদির সৃষ্টি-সংক্রান্ত মত পূর্ব্বে উক্তবিধ যুক্তি দ্বারাই সমর্থিত হইত। কিন্তু এখন দূরবীক্ষণ সাহায্যে বক্রাকৃতি নেবিউলাও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অপিচ, অচঞ্চল নক্ষত্র-পুঞ্জের পরই তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে। সুতরাং আজিকালি পূর্ব্ব-মত কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—'ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত নীহারিকা হইতে প্রথমে বক্রভাবাপন্ন নেবিউলার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ সূর্য্য ও গ্রহাদির সৃষ্টি হইয়াছে।' কক্ষপথে গ্রহ-গণের বিঘূর্ণন—'নেবিউলার থিওরি" দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যখন প্রথম গ্রহের উৎপত্তি হয়, সমগ্র নীহারিকার সহিত সেই গ্রহটিও বিঘূর্ণিত হইয়াছিল। পরিশেষে সেই গ্রহ যতই সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার বিঘূর্ণনের গতিও তত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নীহারিকা হইতে পৃথিবী কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল, সে তত্ত্ব যদিও এখন দুরধিগম্য কিন্তু সূর্য্যের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া নেবিউলা হইতে উহার উৎপত্তির বিষয় বৈজ্ঞানিকগণ অনেকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অধুনা সূর্য্য হইতে প্রতিদিন যে পরিমাণ তাপ নির্গত হয়, নেবিউলার থিওরির পরিপোষণ পক্ষে তাহা একটী বিশিষ্ট যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সূর্য্য হইতে প্রতিদিন কি পরিমাণ তাপ বিনির্গত হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সেই তাপের দুই শত কোটি অংশের এক অংশ মাত্র আমরা পৃথিবীতে পাইয়া থাকি। সুতরাং অধিকাংশ উত্তাপই যে ব্যোমপথে বিনষ্ট হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক, কোথা হইতে সূর্য্যের সেই উত্তাপ সরবরাহ হয়? প্রথমে, সূর্য্যকে জ্বলন্ত লৌহের ন্যায় প্রগাঢ় তাপ বিশিষ্ট পদার্থ বলিয়া মনে করা যাউক; আর মনে করা যাউক,—জ্বলন্ত লৌহ হইতে যেরূপ উত্তাপ নির্গত হয়, সূর্য্য হইতেও সেইরূপ উত্তাপ বিনির্গত হইতেছে। কিন্তু এরূপ মনে করার একটি সমস্যার কথা আছে। জ্বলন্ত লৌহ হইতে নিঃশেষরূপে তাপ বিনির্গত হইলে, ক্রমশঃ লৌহ শীতল হইয়া আসে। কিন্তু সূর্য্য যে দিন দিন শীতলতা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কারণ, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের যে উত্তাপ ছিল, এখন যে সে উত্তাপ কিছু হ্রাস পাইয়াছে, তাহা অনুভব করা সহজ-সাধ্য নহে। আরও সূর্য্য যদি কোনও জ্বলন্ত পদার্থের ন্যায় কেবলই উত্তাপ নিঃসরণ করিত, তাহা হইলে সূর্য্যের উত্তাপ যে কতক পরিমাণে হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপ-হ্রাস-বষয় উপলব্ধি করা বড়ই সুকঠিন। সুতরাং সূর্য্য যে কেবলমাত্র জ্বলন্ত পদার্থ, তাহা স্বীকার করা যায় না। পরন্তু সূর্য্যের উত্তাপ-সরবরাহের অন্য কোনও আদি-কারণ আছে বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্থলে অনুমান করা যাউক,—অগ্নি-উৎপাদনের উপযোগী কোনও রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সূর্য্যের উত্তাপ উৎপন্ন হইতেছে। সূর্য্য হইতে প্রত্যহ যে পরিমাণ উত্তাপ বিনির্গত হয়, তাহাতে সেই দৈনিক উত্তাপ-সঞ্চারের জন্য সূর্য্যের উপরিভাগের প্রতি বর্গফুটে প্রায় ৫৬০ মণ (২০ টন) করিয়া পাথুরিয়া কয়লা পুড়াইতে হয়। যদি মনে করি—সূর্য্যই সেই পাথুরিয়া কয়লার পিণ্ডরূপে

নীহারিকা ও সূর্য্য।

বিদ্যমান; আর যদি মনে করি—সূর্য্য সমভাবে কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া প্রত্যহ সম-পরিমাণ উত্তাপ প্রদান করিতেছে; তাহা হইলে কয়েক সহস্র বৎসরের মধ্যে সূর্য্য নিশ্চয়ই ভস্মাবশেষে পরিণত হইবে; তখন আর পৃথিবীতে আলোক-রশ্মি-প্রদানে সূর্য্যের কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। এ হিসাবে, সূর্য্যে যে কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীতে তাপ-সরবরাহ হইতেছে, তাহাও মনে করা যায় না। তবে কোথা হইতে সূর্য্য প্রয়োজনানুরূপ উত্তাপ প্রাপ্ত হয়? সাধারণ-দৃষ্টিতে সূর্য্যের উত্তাপ-প্রাপ্তির একটী মাত্র কারণ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সে কারণ—সূর্য্যের উপর উল্কা-পতন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়—নক্ষত্র-পতনে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। সূর্য্যের উপর উল্কাপাত হইলেও সূর্য্য সেইরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু উল্কা-সমূহ হইতে সূর্য্যের আবশ্যকানুরূপ উত্তাপ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর কিনা, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। প্রতি বৎসর যদি চন্দ্রের পরিমাণে উল্কা-পিণ্ড-সমূহ সূর্য্যের মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে সূর্য্য-বিনিঃসৃত উত্তাপের পূরণ হইতে পারে। কিন্তু তত অধিক পরিমাণ উল্কাপাতের কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না; সুতরাং সূর্য্যের উত্তাপ-সরবরাহ সম্বন্ধে এ যুক্তিও পরিহার্য্য। তবে সূর্য্যের উত্তাপ কোথা হইতে আসে? বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করেন,—'প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যই একটী সুবৃহৎ জ্বলনশীল পিণ্ড। আর তাহা হইতে অবিরত উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। দুই কারণে উহার শৈত্য নিবারিত হইয়া থাকে। এক কারণ—সূর্য্যের আকৃতি অতি প্রকাণ্ড; দ্বিতীয় কারণ—তাপ-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে শৈত্য বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। এক দিকের শক্তি হ্রাস হইলে, অন্য দিকের শক্তি বৃদ্ধি পায়; নদীর এক কূল ভাঙ্গিলে, অন্য কূলে চড়া বাঁধে,—এ বিষয় সকলেই অবগত আছেন। সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস ও তাহার পূরণ সম্বন্ধে এই যুক্তিই সকল তর্কের মীমাংসা করিতে পারে। তবে সূর্য্যের যে পরিমাণ উত্তাপ বিনির্গত হইতেছে, সর্ব্বপ্রকারে সে পরিমাণ উত্তাপ সঞ্চিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং শৈত্য-বশে সূর্য্য দিন দিন সঙ্কুচিত হইতেছে বলিয়াই অনুমান করা যায়। তবে সে সঙ্কোচের পরিমাণ যে অতি অল্প, তাহা বলাই বাহুল্য। সে হিসাবে, সূর্য্যের উত্তাপ যে কত অল্প পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাও নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন।' তবে বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, প্রতি শতাব্দীতে সূর্য্যের ব্যাস দশ মিনিট পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে। যে পরিমাণে সূর্য্যের ব্যাস হ্রাস-প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করেন, সে হিসাবে আদিতে—স্মরণাতীতকাল পূর্ব্বে সূর্য্যের আকৃতি যে কত বৃহৎ ছিল, তাহা ধারণা করা সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারে,—এমন এক সময় ছিল, যখন বুধ-গ্রহের কক্ষপথ পর্য্যন্ত সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহা হইলে আরও মনে করা যাইতে পারে,—তাহারও কিছুদিন পূর্ব্বে নেপচুন গ্রহের স্থান সূর্য্যই অধিকার করিয়া ছিলেন; তাহা হইলে আরও মনে করা যাইতে পারে,—সূর্য্যের উপাদান-সমূহ বিস্তৃত, সুতরাং এখনকার অপেক্ষা অধিকতর তারল্য-সম্পন্ন ছিল। আর তাহা হইলেই বুঝা যায়,—আদিভূত নীহারিকা হইতে কি প্রকারে সৌর-জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

অগণিত নক্ষত্র-রাজির মধ্যে সূর্য্যকে যদি একটী নক্ষত্র মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই বা সৃষ্টি-বিষয়ে কি বুঝিতে পারি? সৌর-জগতের সৃষ্টি-বিষয়ে লাপলেস যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তদনুরূপ অন্য কোনও জগৎ নেবিউলা হইতে উৎপন্ন হইতেছে কিনা? সার উইলিয়ম হার্সেলের যুক্তি-পরম্পরা এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পরিদৃশ্যমান্ নীহারিকা-সমূহ।

নীহারিকা হইতে যে নক্ষত্র-পুঞ্জ উৎপন্ন হইতেছে, তিনি সূক্ষ্ম-দর্শনের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'ব্যোমপথে এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যে সকল স্থান বিক্ষিপ্ত নীহারিকা দ্বারা পরিপূর্ণ। কেবলমাত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সে সকল নীহারিকা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যাইতে পারে। ব্যোমপথে কোথাও নীহারিকার সামান্য চিহ্ন-মাত্র অতি সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়; কোথাও বা সহজ দৃষ্টিতেই নীহারিকার অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়; কোথাও আবার নীহারিকা-সমূহ নক্ষত্রের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন। নীহারিকা হইতে নক্ষত্রের উৎপত্তি অতি স্বাভাবিক। নীহারিকা হইতে উৎপন্ন নক্ষত্র-সমূহ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সাধারণ নক্ষত্রে পরিণত হয়। তরল নীহারিকা অবস্থা হইতে পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র বা নক্ষত্র-পুঞ্জের কিরূপ উদ্ভব হয়, তাহা প্রদর্শন করা অসম্ভব নহে। যদিও প্রথম স্তরের সহিত শেষ স্তরের সাদৃশ্য অতি অল্প বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু পর পর স্তর-পর্য্যায় অবেক্ষণ করিলে, তাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য-তত্ত্ব অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়।' উদ্যানে নানা জাতীয় তরু-লতা আছে। কিন্তু একটী বৃক্ষের অঙ্কুর হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করিলে, তাহার স্তরগত পার্থক্যের বিষয় যেরূপ উপলব্ধি হয়, নেবিউলার আদি ও পরিণতির স্তর-পর্য্যায় লক্ষ্য করিলেও সেইরূপ সাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। *

ইথারে সৃষ্টি-রহস্য—জড় ও চৈতন্য।

সৃষ্টি-কার্য্য যে প্রকারেই সম্পন্ন হউক না কেন, সৃষ্টি-ক্রিয়ার মূলে কোনও এক অব্যক্ত শক্তির প্রভাব সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। পরমাণুবাদিগণ বলেন—'পরমাণু-পুঞ্জের সংযোগ-বিয়োগে উৎপত্তি-বিলয় সাধিত হইতেছে।' কিন্তু সেই সংযোগ-বিয়োগ কাহার দ্বারা কি প্রকারে সাধিত হয়? নীহারিকাবাদী-দিগের মতে,—'নীহারিকা-সমূহের সংযোগ-বিয়োগে গ্রহাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে।' কিন্তু সেই সংযোগ-বিয়োগই বা কি প্রকারে কাহার দ্বারা সংসাধিত হয়? সকলেরই মূলে শক্তি-সঙ্ঘাতের আভাষ রহিয়া গিয়াছে। বিঘূর্ণন বল, সম্মিলন বল, সংঘর্ষ বল,—একটী শক্তির সঞ্চার ভিন্ন কিছুই সম্ভবপর নহে। সেই শক্তি কি? নানা জনে নানা ভাষায় সে শক্তির নানারূপ নামকরণ করিয়া গিয়াছেন। 'ফোর্স', 'এনার্জি', 'গ্রাভিটেশন' প্রভৃতি—সেই শক্তির নামান্তর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে স্যর আইজাক নিউটন পাশ্চাত্য-

ইথার দ্বারা সৃষ্টি।

* 'নেবিউলার থিওরি' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য,—(১) Sir William Herschel, *Philosophical Translations*; (২) Sir John Herschel, *Outlines of Astronomy*; (৩) Professor S. Newcomb, *Popular Astronomy*, প্রভৃতি।

দেশে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। পদার্থ-মাত্রই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাঁহার গবেষণায় ইহা প্রতিপন্ন হয়। তখন তিনি সন্ধান করিতে আরম্ভ করেন,—'সে শক্তি বা সে সামগ্রী কি—যদ্দ্বারা সংসারের প্রত্যেক সামগ্রী পরিচালিত হয়?' নিউটন সে শক্তিকে ঈশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন,—সে শক্তির নাম—'ইথার'। ইথারের রূপ নাই, অথচ ইথার সর্ব্বব্যাপী। ইথার শূন্যময় অথচ স্পন্দনশীল। ইথারে আলোক ও উত্তাপ আছে;—ইথার সর্ব্বপ্রকার গতির মূলীভূত। ইথার অগ্নির আদি; ইথার দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার সংযোগ-বিয়োগ সাধিত হয়; ইথার দ্বারাই সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে।' দার্শনিকগণের দর্শন-তত্ত্বের আলোচনায় দেখিয়াছি, কেহ কেহ বলিয়াছেন,—'অগ্নিই সর্ব্বমূলাধার; অগ্নি হইতেই গতি, অগ্নি হইতেই বাষ্প, অগ্নি হইতেই জল এবং অগ্নি দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।' কিন্তু 'যে দিন ইথারের প্রাধান্য বিঘোষিত হইল সেই দিন হইতে প্রচারিত হইতে লাগিল—'ইথার অগ্নির আদি অবস্থা; ইথার হইতেই অগ্নি উৎপন্ন হয়।' ইথার-বাদীদিগের বর্ণনা হইতেই ইথারের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকটন করা যাইতেছে;—'অগ্নির আদি-স্বরূপ ইথার সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও স্থিতি স্থাপক। বিশ্বের সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোত-ভাবে উহা বিস্তৃত। বৈদ্যুতিক পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই শক্তিশালী কর্ত্তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। অমানুষিক জ্ঞান দ্বারা ইহাকে পরিচালিত ও সংযত না করিতে পারিলে, ইহার ক্রিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। অত্যধিক চঞ্চল ও গতিশক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া পরিদৃশ্যমান্ সকল পদার্থের উপরই ইথারের ক্রিয়া চলিয়াছে এবং তদ্দ্বারা সকল পদার্থই প্রাণশক্তিবিশিষ্ট হইয়া আছে। সমস্ত পদার্থের উৎপাদনে এবং তাহাদের ধ্বংস-সাধনে ইথার সর্ব্বতোভাবে সমর্থ। এতদ্দ্বারাই প্রকৃতি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির চির-পরিবর্দ্ধন ও চির-সঙ্কোচন ইথার দ্বারাই সাধিত হইয়া আসিতেছে। ইথার হইতেই পদার্থ-সমূহের আকৃতি সংগঠন এবং ইথারেই তাহাদের বিলয়। ইহা এতই দ্রুত-গতিবিশিষ্ট, এতই সূক্ষ্ম, এত সহজে সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবেশক্ষম এবং ইহার ক্রিয়া এতই কার্য্যকরী যে, ইহাকে পৃথিবীর উদ্ভিদ-মাত্রের ও প্রাণি-সমূহের প্রাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইথারের স্পন্দনে আলোক ও উত্তাপ বিনির্গত হয়। পদার্থের পরমাণু-সমূহের মধ্যে ইথার বিদ্যমান আছে। ইথারের দ্বারা তৎসমুদায় বিচালিত, বিঘূর্ণিত ও সম্মিলিত হয়। সংসার ইথার-সমুদ্রে ভাসমান রহিয়াছে; ইথারের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হইতেছে। আলোক বা উত্তাপের ক্রিয়া কাহারও অপ্রত্যক্ষ নাই। কিন্তু দেখা গিয়াছে—দুইটি পদার্থের সংঘর্ষে উত্তাপ, আলোক বা অগ্নি উৎপন্ন হয়। ঘর্ষণে ইথারের স্পন্দন হয়; আর তাহাতেই অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে।'—ইহাই ইথার-বাদের স্থূল সিদ্ধান্ত। ইথারের প্রসঙ্গে জড় ও চৈতন্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। যাঁহারা দ্বৈতবাদী, তাঁহারা সৃষ্টির মূলে জড় ও চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করেন। তাঁহারা বলেন,—জড়ের সহিত চৈতন্যের সংযোগ হওয়ায় জীবাদির উদ্ভব হয়।' কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ চৈতন্য ও জড়ের অভেদ-ভাব উপলব্ধি করেন। তাঁহাদের মধ্যে নানা বিভাগ আছে। কেহ জড়কে, কেহ চৈতন্যকে এবং কেহ জড় ও চৈতন্য উভয়কে জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এক হইতে

সকলের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মানিয়া লন। তদনুসারে অদ্বৈতবাদিগণ যথাক্রমে জড়াদ্বৈতবাদী, জড়চৈতন্যাদ্বৈতবাদী, চৈতন্যাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। ক্রমবিকাশ-বাদীদিগকে জড়াদ্বৈতবাদী বলিলেও বলা যাইতে পারে। কারণ, তাঁহারা বলেন, —'জড়ের সংযোগেই চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে।' ইথারের যে পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাহাতে ইথারকে জড় ও চৈতন্যের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম মিলন বলিলেও বলা যায়। জড় পদার্থের মধ্যেও যে চেতনা-শক্তি আছে এবং স্থিতির মধ্যেও যে গতি আছে, বিজ্ঞান-প্রভাবে এখন তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সে মতে,—'নিরবচ্ছিন্ন জড়-পদার্থের অস্তিত্ব নাই; জড়-পদার্থ-মাত্রই চৈতন্য-সংযুক্ত। তবে সকল পদার্থে সমভাবে সে চৈতন্যের বিকাশ নাই; তাই সর্ব্বথা তাহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না।' * কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্তে এমনও প্রতিপন্ন হইতেছে,—'জড় বলিয়া কোনও পদার্থই নাই। সকলেরই মূলে ইথারের শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।'

ভূ-তত্ত্বালোচনায়।

ভূ-তত্ত্ব, প্রাণি-তত্ত্ব, খনিজ-তত্ত্ব, প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে, সৃষ্টি-সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন-কালে পাশ্চাত্য-দেশে ভূতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার পরিচয় অতি অল্পই প্রাপ্ত হই। রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পূর্ব্বে ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও কোনও পণ্ডিত মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা সমাদৃত হয় নাই। দার্শনিক পীথাগোরাস পৃথিবীর পরিবর্ত্তনাদি বিষয়ে বলিয়াছিলেন,—'ভূ-গর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাতে এবং সমুদ্র দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসায়, পৃথিবী বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে।' খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পীথাগোরাস এই মত ব্যক্ত করিয়া যান। কিন্তু খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে ষ্ট্রাবো উহার বিপরীত মত প্রচার করেন। তিনি বলেন,—'সমুদ্র হ্রাস-প্রাপ্ত হয় নাই; শৈত্য ও আর্দ্রতা বশতঃ পৃথিবী দিন দিন সঙ্কুচিত হইতেছে এবং তাহার দ্বারাই পরিবর্ত্তনাদি সাধিত হইয়া আসিতেছে।' যাহা হউক, পীথাগোরাস ও ষ্ট্রাবো ভূ-পঞ্জরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু তাঁহারা ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবিসেনা ও ওমার প্রভৃতি আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ ভূ-তত্ত্ব-বিষয়ে গ্রীসের ও রোমের পণ্ডিতগণের মত সমালোচনা করেন। কিন্তু তাঁহারাও যে কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ভূ-তত্ত্ব-বিষয়ে ইউরোপের বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কচালনা করিয়াছিলেন। তখন ভূগর্ভে স্তরে স্তরে যে সকল জীবজন্তু-উদ্ভিদাদির প্রস্তরময় অস্থি ও কঙ্কালাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছিল, তৎপ্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন, নানা জনে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করেন। কেহ বলিলেন,—'ভূ-পঞ্জরের স্তরে স্তরে অবস্থিত অস্থি-

ভূ-তত্ত্বাদিতে সৃষ্টি-প্রসঙ্গ।

---

* ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় এ বিষয়ে এক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য-জগতকে পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত 'রেসপন্স ইন দি লিভিং এণ্ড নন্‌লিভিং' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে। *Vide* Dr. J. C. Bose's *Response in the Living and Nonliving.*

কঙ্কালাদি আপনা-আপনি সঞ্চিত হইয়াছে।' কেহ বলিলেন,—'পূর্ব্বে যে সকল জীবজন্তু-উদ্ভিদাদি পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল, ঐগুলি তাহাদেরই দেহাবশেষ।' তদুপলক্ষে 'নোয়া' ও জলপ্লাবনের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়। সেই জলপ্লাবনে যে সকল জীবজন্তু-উদ্ভিদাদি প্রোথিত হইয়াছিল, ভূ-পৃষ্ঠের স্তর-পর্য্যায়ে তাহাদেরই দেহাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। সর্ব্বপ্রথম ফরাসী-দেশীয় পণ্ডিত ডে'কার্টে একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছিলেন,—'উপরিভাগে শৈত্যের সঞ্চার-হেতু অন্যান্য গ্রহাদির ন্যায় পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই পৃথিবীর প্রাণভূত নিত্য-জলনশীল তেজ বা অগ্নি এখনও ইহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।' অর্থাৎ—তেজোময় তরল পদার্থ শৈত্যবশে সঙ্কুচিত হইয়া পৃথিব্যাদির সৃষ্টি হইয়াছিল,—ডে'কার্টের মতের আলোচনায় সেই আভাষই পাওয়া যায়। আগ্নেয়-গিরির উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—'ভূগর্ভে এক প্রকার বাষ্পের সঞ্চার হয়। সেই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তৈলাকার ধারণ করে। পৃথিবীর বিষম বিঘূর্ণনে সেই তৈল-পদার্থ গহ্বরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। তখন উহা পুনরায় বাষ্প বা ধূমাকারে পরিণত হইয়া থাকে। সময় সময় অগ্নিকণা-সংযোগে সেই ধূম বা বাষ্প জলিয়া উঠে এবং চতুঃপার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা-প্রাচীরে সজোরে আঘাত করে। তাহাতে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। সেই জলন্ত ধূম বা বাষ্প গন্ধকাদির সহিত মিলিত হইয়া, পৃথিবী ভেদ করিয়া পর্ব্বত মধ্য দিয়া, নির্গত হয়। তাহাতে আগ্নেয়-গিরির ও আগ্নেয়-গহ্বরের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-দার্শনিক লেবনিজের মত অনেকটা ডে'কার্টের মতেরই অনুরূপ। ১৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'প্রটোজিয়া' (Protogea) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—'পৃথিবী প্রথমে জলনশীল বাষ্পাকারে অবস্থিত ছিল। সেই বাষ্প ক্রমশঃ দ্রবীভূত হইয়া সমতল-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কালক্রমে শৈত্যবশে তাহা জমাট বাঁধিয়া আসে। তাহাতে পৃথিবীর উপরিভাগে কঠিন বন্ধুর প্রস্তরময় ভূ-পৃষ্ঠ সংগঠিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের যে স্তরে গ্রেনাইট প্রস্তর প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আদি-স্তর। পৃথিবীর উপরিভাগ দিন দিন কাঠিন্য প্রাপ্ত হইতেছে,—ভূপঞ্জরের অবস্থাদির বিষয় আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। ভূ-গহ্বর-সমূহ পূর্ব্বে জল ও বায়ু-দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; এখন তৎসমুদায় কঠিন পদার্থে আবৃত হইতেছে। তাহাতে গহ্বর-সমূহের উপরিভাগে অধিত্যকাদির সৃষ্টি করিতেছে; আর তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীরবৎ অবস্থিত ভূ-পৃষ্ঠ পর্ব্বত-মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। ভূগর্ভোত্থিত গলিত পদার্থ-সমূহ ভূ-পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হওয়ায়, পৃথিবীর উপরিভাগে প্রচুর পরিমাণে জলরাশি উত্থিত হইতেছে; আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠের নানাস্থানে 'পলি' পড়িয়া যাইতেছে। তাহাতে ক্রমশঃ পলিযুক্ত নূতন নূতন ভূমি-খণ্ডের উৎপত্তি হইতেছে। বহুকালব্যাপী এবম্বিধ পরিবর্ত্তনের ফলে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে।' ভূ-পৃষ্ঠের স্তর-পর্য্যায়ে বিদ্যমান অস্থি-কঙ্কালাবশেষ প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া লেবনিজ বলিয়াছেন,—'অধুনা পৃথিবীতে যে সকল জীবজন্তু-উদ্ভিদাদি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাদের সহিত ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত প্রাণী ও উদ্ভিদাদির ধ্বংসাবশেষের কোনই সাদৃশ্য

দেখা যায় না। পৃথিবীতে মনুষ্যের অনাবিষ্কৃত অনেক স্থান আছে; সেখানে হয় তো ঐ সকল ধ্বংসাবশেষের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন প্রাণীর বা উদ্ভিদের বিদ্যমানতা সম্ভবপর।' ফলতঃ, পরিবর্ত্তন-প্রবাহের মধ্য দিয়া সংসার এক এক সময় এক এক স্তরে উপনীত হইয়াছে,—ইহাই লেবনিজের সিদ্ধান্ত। পৃথিবীর অভ্যন্তরে, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তপ্ত স্থানে, প্রভূত পরিমাণে কার্য্যকরী শক্তি সঞ্চিত আছে,—লেবনিজ ইহা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু আগ্নেয়-গিরির উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—'গন্ধক, পাথুরে কয়লা ও আলকাতরা প্রভৃতি জ্বলনশীল পদার্থ-সমূহ একত্র সংমিশ্রিত হইয়া অগ্নিরূপে নির্গত হয়। তাহাতেই আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি হইয়া থাকে।' গ্রহাদির উৎপত্তি-সম্বন্ধে ডে'কার্টে ও লেবনিজ যে মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বাফন সেই মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে ভূ-স্তরে অবস্থিত জীব ও উদ্ভিদাদির ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে তাঁহার মত, জল-প্লাবন-বাদীদিগের মতেরই অনুরূপ। তিনি বলেন,—'পৃথিবীব্যাপী জলপ্লাবনে জীবজন্তু-উদ্ভিদাদি বিনষ্ট হইলে তাহাদের কঙ্কালাদি ভূ-স্তরে সঞ্চিত হইয়াছিল। তৎসমুদায়ই আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি।' আমরা এখন যে পৃথিবীতে অবস্থিত, বাফন সেই পৃথিবী-সৃষ্টির ছয়টী কাল নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে,—জ্বলনশীল দ্রবীভূত অবস্থায় পৃথিবীর ২৯৩৬ বৎসর কাটিয়া যায়। স্পর্শযোগ্য শৈত্যের সঞ্চার হইতে ৩৫,০০০ পঁয়ত্রিশ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রাণিগণের বাসোপযোগী হইতে পৃথিবীর ৫৫,০০০ পঞ্চান্ন হাজার হইতে ৬০,০০০ ষাট হাজার বৎসর কাটিয়া যায়। সে হিসাবে, বর্ত্তমান সময়ের ১৫,০০০ পনের হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছিল।' পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাফন বলিয়া গিয়াছেন,—'যে শৈত্যে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই শৈত্য-বশেই—শৈত্যাধিক্যহেতুই—পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। শীতলতা প্রাপ্ত হইতে হইতে পৃথিবী বরফের বা হিমশিলার অপেক্ষাও শীতল হইয়া আসিবে। আর সে অবস্থায় এই বৈচিত্র্যপূর্ণ তরুগুল্মলতা বা প্রাণিপর্য্যায় সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে! সৃষ্টি হইতে ১,৩২,০০০ এক লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসরের মধ্যে এইরূপে শৈত্যবশে পৃথিবীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।' প্রথম আগ্নেয়-গিরির উৎপত্তি সম্বন্ধে বাফন গণনা করিয়া বলিয়াছেন,—'পৃথিবী-সৃষ্টির ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার বৎসর পরে প্রথম আগ্নেয়-গিরির উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ, বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হওয়ার পর অগ্নি-সংযোগে তাহাদের জ্বলন ভিন্ন অগ্ন্যুদগম সম্ভবপর নহে।' ইহার পর, জেম্‌স্ হাটন (১৭২৬ খৃঃ—১৭৯৭ খৃঃ), জন প্লেফেয়ার (১৮০২ খৃঃ), লামার্ক (১৭৪৪ খৃঃ—২৮২৯ খৃঃ), কুভেয়ার (১৭৬৯ খৃঃ—১৮৩৩ খৃঃ) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। হাটন বলেন,—'ভূ-স্তর পর্য্যালোচনা করিলে পৃথিবীর আদি বা অন্ত বিষয়ে কোনই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; পৃথিবী কোনও দিন সৃষ্ট হইয়াছিল কিনা, অথবা কোনও সময় পৃথিবী ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে কিনা, তাহার কিছুই স্থির নিশ্চয় নাই। পৃথিবী একই ভাবে অবস্থিত আছে, পরিবর্ত্তনে পূর্ব্ব অবস্থাই পুনঃপুনঃ প্রাপ্ত হইতেছে।' প্লেফেয়ার, হাটনের মতেরই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'ইলাষ্ট্রেশনস অব হাটোনিয়ান থিওরি' অর্থাৎ হাটনের মতের ব্যাখ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে প্লেফেয়ার প্রতিপন্ন

করিয়াছেন,—'ভূ-পৃষ্ঠ কখনও জলমগ্ন হয়, কখনও জাগিয়া উঠে। অভ্যন্তরে এক শক্তির ক্রিয়া চলিয়াছে। সেই শক্তির দ্বারা জলমধ্য হইতে ভূ-খণ্ড উত্থিত হয়, পর্ব্বতাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার সেই শক্তির প্রভাবেই সকল সামগ্রী জলমধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়।' * ভূ-মধ্যস্থিত উত্তাপকেই হাটন সেই শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লামার্ক বলেন,—'পৃথিবীর সৃষ্টি-কার্য্যে চন্দ্রের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয়, তাহাতে এক দিকে ক্ষয় ও অপর দিকে সঞ্চয় হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা মহাদেশের পূর্ব্ব-সীমানা ক্ষয়-প্রাপ্ত এবং পশ্চিম সীমানা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারাই সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হয়।' কুভেয়ার ক্রমবিকাশ স্বীকার করিতেন বটে; কিন্তু তাঁহার মত ডারউইন প্রভৃতির মতের বিপরীত-ভাবাত্মক। তিনি বলেন,—'মনুষ্যেতর অন্য কোনও প্রাণী হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হয় নাই; মনুষ্যই দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। এক জাতীয় জীব হইতে অন্য জাতীয় জীবের উৎপত্তি সম্ভবপর হইলে, উভয়ের মধ্য-জাতীয় জীবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হইত। কিন্তু তাহার প্রমাণাভাব।' যাহা হউক, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনায় পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আদিতত্ত্ব নির্ণয় পক্ষে যে কত মতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ভূ-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে এবং আজিও বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে।

কত দিনে কি ভাবে কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া মনুষ্যাদি প্রাণি-সমন্বিত এই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, ভূ-তত্ত্ববিদ্গণ আজিও নিঃসংশয়ে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। আর্কিয়লজিষ্ট-গণ প্রাচীন-কালের দ্রব্যাদির ধ্বংসাবশেষের আলোচনায় প্রত্ন-তত্ত্বের উদ্ধার-সাধনে প্রয়াস পান। পরিদৃশ্যমান্ পরিচয়-চিহ্ন ভিন্ন তাঁহারা অতীতের আলোচনায় মস্তিষ্কের চালনা করেন না।

ভূ-স্তরের আলোচনায়।

কিন্তু 'জিওলজিষ্ট' বা ভূ-তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থারই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। মনুষ্যের অস্তিত্বের বা ক্রিয়ার কোনও নিদর্শনের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহারা ভূ-স্তরের গঠনাদি হইতে তাহার ক্রমোৎপত্তি-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস পান। সেই ভূ-তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ পৃথিবীর উৎপত্তি-বিষয়ে নানা স্তরের বা কালের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের হিসাবে পৃথিবীর আদি অবস্থার নাম—'আর্কিয়ান' বা 'ইওজোয়িক'। সেই অবস্থায় কাচবৎ কঠিন প্রস্তর মাত্র বিদ্যমান ছিল। তখন জীবজন্তু-উদ্ভিদাদি কিছুরই উৎপত্তি হয় নাই। দ্বিতীয় অবস্থার নাম—'প্যালিওজোয়িক' অবস্থা। এই অবস্থা আবার পাঁচ পর্য্যায়ে বা স্তরে বিভক্ত। যথাক্রমে সেই পাঁচ পর্য্যায়ের নাম,—(১) ক্যাম্ব্রিয়ান, (২) সিলুরিয়ান, (৩) ডেভনিয়ান, (৪) কার্ব্বোনিফেরাস এবং (৫) পার্মিয়ান। 'ক্যাম্ব্রিয়ান' ও 'সিলুরিয়ান' অবস্থায় সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে; জলজ উদ্ভিদ ও শৈবালাদি দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় কোনও কোনও কীটের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। 'ডেভিনিয়ান' অবস্থায় পীতবর্ণ বালুকা এবং 'কার্ব্বনিফেরাস' অবস্থায় অঙ্গার উৎপন্ন হইয়াছে। জলচর জীব, উদ্ভিদ, মক্ষিকা, পতঙ্গ, মৎস্য, শম্বুক প্রভৃতি এই অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। ডেভিনিয়ান স্তরের মৃত্তিকা—পূর্ব্বোল্লিখিত জীব-

* *Vide* John Playfair, *Illustrations of Huttonian Theory.*

জন্তুর, প্রধানতঃ সমুদ্র-বিহারী জীবজন্তুর, মেদ-মিশ্রিত। 'পার্মিয়ান' পর্য্যায়ে নানারূপ পক্ষী, পতঙ্গ, কুম্ভীর, সরীসৃপ প্রভৃতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় অবস্থার নাম—'মেসোজোয়িক'। এই অবস্থার তিন পর্য্যায়;—(১) ট্রিয়াসিক, জুরাসিক এবং ক্রেটাসিয়ান বা চা-খড়ি স্তর। ইওজোয়িক, প্যালিওজোয়িক, মেসোজোয়িক, এই তিন অবস্থারও সংসারে মনুষ্যের উৎপত্তি হয় নাই। তবে এখন নানাবিধ জীবজন্তু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই সময়ে স্তন্যপায়ী জন্তু এবং সরীসৃপ-জাতীয় প্রকাণ্ড জীবের পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থ অবস্থার নাম—'কেনোজোয়িক'। এই অবস্থারও চারি বিভাগ বা স্তর-পর্য্যায়—(১) ইওসিন (২) ওলিগোসিন, (৩) মিওসিন এবং (৪) প্লিওসিন। 'ইওসিন' স্তর-পর্য্যায়ে নদ-নদীর সৃষ্টি হইয়াছে; স্তন্যপায়ী জীবজন্তু বৃদ্ধি পাইয়াছে; পশুর ও মানুষের মধ্যবর্ত্তী জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। 'ওলিগোসিন' পর্য্যায়ে আরও কিছু উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'মিওসিন' পর্য্যায়ে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে; এবং মনুষ্য বিবিধ বর্ণ ও আকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া দাঁড়াইতেছে।* প্লিওসিন পর্য্যায়ে মনুষ্য কথঞ্চিৎ সভ্যভাবাপন্ন হইতেছে এবং সংসারে নানা জীবজন্তু ও বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে। চতুর্থ অবস্থার নাম—'কোয়ার্টার্নারি।' ইহা প্রধানতঃ দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত,—(১) প্লিষ্টোসিন বা গ্লেসিয়াল এবং (২) পোষ্ট-গ্লেসিয়াল বা আধুনিক। 'প্লিষ্টোসিন' অবস্থায় মানুষ সভ্য সমুন্নত হইয়াছিল। তখন বরফে পৃথিবীর অংশ-বিশেষ পরিব্যাপ্ত হওয়ায় মনুষ্যকে স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তিলক প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে এই প্লিষ্টোসিন স্তর-পর্য্যায়ে আর্য্যগণ উত্তর-মেরু পরিত্যাগ করিয়া মধ্য-এসিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পোষ্ট গ্লেসিয়াল বা বর্ত্তমান কালকে পণ্ডিতগণ নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন;—'পেলিওলিথিক' বা প্রাচীন প্রস্তর-যুগ, 'নিওলিথিক' বা নূতন প্রস্তর-যুগ তাহাদের অন্যতম। কিন্তু সে সকল দূর অতীতের কথা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণতঃ অধুনা 'ষ্টোন এজ', 'ব্রোঞ্জ এজ', 'আয়রণ এজ' অর্থাৎ প্রস্তর, ব্রোঞ্জ ও লৌহ যুগের প্রসঙ্গই ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় উক্ত হইয়া থাকে। সে মতে,—অসভ্য-অবস্থায় মানুষ অস্ত্রের ব্যবহার জানিত না। প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা অস্ত্রের কার্য্য সম্পন্ন করিত। তাহাই 'ষ্টোন এজ' বা প্রস্তর যুগ। ক্রমশঃ সভ্য হইয়া মানুষ ব্রোঞ্জের ও লৌহাদির ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে।

* মনুষ্যের বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা এই যে,—শীত, উত্তাপ, জল-বায়ু প্রভৃতির বিভিন্নতা-হেতু মনুষ্যের বর্ণের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ,—শীত-প্রধান দেশের মনুষ্য শ্বেতবর্ণ এবং গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের মনুষ্য কৃষ্ণবর্ণ হয়,—এইরূপ অনেকের ধারণা। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—সন্তানের বর্ণ 'প্রধানতঃ জনক-জননীর বর্ণের অনুরূপ হইয়া থাকে। তাঁহাদের এক জন কৃষ্ণবর্ণ এবং এক জন শ্বেতবর্ণ হইলে, সন্তান মিশ্রবর্ণ হওয়া সম্ভব। জনক-জননীর মানসিক অবস্থা অনুসারেও সন্তানের বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটিতে পারে।' ডারউইন প্রথমোক্ত মতের প্রধান পরিপোষক। তাঁহার ওরিজিন অব স্পিশিজ' গ্রন্থের 'সেকস্যুয়াল সিলেকশন' (*Sexual Selection*) বা দাম্পত্য-নির্ব্বাচন নামক অংশে ডারউইন এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। জীবতত্ত্ববিৎ পুল্টন তৎপ্রণীত 'কলার অব এনিমেলস্' (*Colour of Animals*) নামক গ্রন্থে বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিগণের বর্ণের বিষয় অনুসন্ধান করিলেও সাধারণ ধারণা দূর হইতে পারে। উত্তর-মেরুর অধিবাসী গ্রীণলণ্ডের এস্কিমোগণ কৃষ্ণবর্ণ, কামস্কাট্কার ও ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীরা পাশুটে পিঙ্গল বর্ণ। এদিকে আফ্রিকার শাহারা প্রদেশের 'তুয়েগ' জাতি শ্বেত-বর্ণ এবং সেই প্রদেশের কাফ্রিরা কৃষ্ণবর্ণ। অতি প্রাচীন কাল হইতেই মিশরে বিবিধ বর্ণের মনুষ্যগণ বাস করিতেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে 'এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' হইতে

মানুষের সেই দুই অবস্থাকে যথাক্রমে 'ব্রোঞ্জ এজ' ও 'আয়রণ এজ' বলা হয়। যাহা হউক, ভূতত্ত্ববিদ্গণ যে ভাবে পৃথিবীর সৃষ্টির স্তর-পর্য্যায় নির্দ্দেশ করেন, ইংরাজী নামানুসরণেই তাহার একটী ধারাবাহিক পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা,—

প্রথম,—আর্কিয়ান বা ইওজোয়িক, (Archæan or Eozoic)	আদিভূত কাচবৎ প্রস্তর। (Fundamental Gneiss.)
দ্বিতীয়,—প্রাইমারী বা প্যালিওজোয়িক (Primary or Palæozoic)	ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian) সিলুরিয়ান (Silurian) ডেভনিয়ান (Devonian) কার্ব্বোনিফেরাস (Carboniferous) পার্মিয়ান (Permian)
তৃতীয়,—সেকেণ্ডারি বা মেসোজোয়িক (Secondary or Mesozoic)	ট্রিয়াসিক (Triassic) জুরাসিক (Jurassic) ক্রেটাসিয়স (Cretaceon)
চতুর্থ,—টার্টিয়ারি বা কেইনোজোয়িক। (Tartiary or Cainozoic)	ইওসিন (Eocene) ওলিগোসিন (Oligocene) মিওসিন (Miocene) প্লিওসিন (Pliocene)
পঞ্চম,—পোষ্ট-টার্টিয়ারি বা কোয়াটার্নারি। (Post Tartiary or Quartenary)	প্লিষ্টোসিন (Pleistocene or Glacial) রিসেণ্ট (Recent or Post-Glacail)

ভূতত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন,—'ইওসিন অবস্থায় সমগ্র ভারতবর্ষ জলমগ্ন ছিল। এমন কি, হিমালয়ের উচ্চতার এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত তৎকালে সমুদ্র-তরঙ্গে প্রতিহত হইত। মিওসিন স্তরের প্রথম পর্য্যায়ে যে মনুষ্য-সৃষ্টির চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা বড়ই অস্পষ্ট। ঐ স্তরের

কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—"The coloured race portraits of ancient Egypt remain to prove the permanence of complexion during a lapse of a hundred generations distinguishing coarsely but clearly the types of the red-brown Egyptian, the yellow-brown Canaanite, the comparatively fair Libyan and the Negro. These broad distinctions have the same kind of value as the popular term describing white, yellow, brown, and black races." শীত বা উত্তাপ বশে বর্ণের অল্প অল্প বিভিন্নতা ঘটে বটে; কিন্তু তাহা বর্ণ-বৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ নহে। তাহা হইলে গ্রীষ্মপ্রধান-দেশের কাক শীতপ্রধান দেশে শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু এক জাতীয় মনুষ্য,—এমন কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতি, এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হইলেও অন্য জাতীয় মনুষ্যাদির বর্ণ প্রাপ্ত হয় না। এক জাতির সহিত অন্য জাতির সংমিশ্রণে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়; তাহাতে বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। আমেরিকার ও আফ্রিকার মুলেটো, মেষ্টিকো, কাম্বো এবং এতদ্দেশের ইউরেশীয়ানদিগের বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিষয় অনুসন্ধান করিলে এ তত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। ফিগুইয়ার প্রণীত 'হিউম্যান রেস' (Figuier—*The Human Race*) গ্রন্থে বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিষয় যাহা আলোচিত হইয়াছে, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা দ্রষ্টব্য।

উপরের পর্য্যায়ে মানবীয় অস্তিত্বের বিশিষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন-কালে এবং নদীর গর্ত্তে যে বালুকারাশি দৃষ্ট হয়, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাতে ইওসিন-কালের চিহ্ন দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সেরূপ সিদ্ধান্ত যে কতদূর সমীচীন, তাহা বলা যায় না। কারণ, 'ইওসিন' অবস্থা কত পূর্ব্বের অবস্থা এবং সে অবস্থার পরিচয়-চিহ্ন এত নিকটবর্ত্তী স্তরে সঞ্চিত থাকা সম্ভবপর কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, এই সকল বিষয়ের আলোচনায়, কত পরিবর্ত্তনের পর কিরূপভাবে পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতেও অশেষ আয়াস স্বীকার আবশ্যক হয়। মার্কিনের প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ ডক্টর ক্রল তৎপ্রণীত 'ক্লাইমেট এণ্ড টাইম্' এবং 'ক্লাইমেট এণ্ড কস্মোলজি' * গ্রন্থে গ্লেসিয়াল এবং পোষ্ট-গ্লেসিয়াল কালের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন,—'প্লেষ্টোসিন কালের গ্লেসিয়াল বা তুষার-সমাচ্ছন্ন অবস্থা—বর্ত্তমান সময়ের ২,৪০,০০০ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। পোষ্ট-গ্লেসিয়াল অর্থাৎ তুষার-পাতের পরবর্ত্তী অবস্থার আরম্ভ— ৮০,০০০ আশী হাজার বৎসরের পূর্ব্বে। ডাক্তার ক্রলের এই সময়-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যে অনেক বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অধ্যাপক গিকি যদিও ক্রলের গণনা-পদ্ধতিকে সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই; কিন্তু তিনি ক্রলের মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। † খৃষ্ট-জন্মের চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে,— এবম্বিধ মতের যাঁহারা সমর্থনকারী, ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের এই সকল গবেষণার ফলে তাঁহাদের মত নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে। আমাদের শাস্ত্রবর্ণিত যুগ-তত্ত্ব ও প্রলয়-তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দিহান, কিছুকাল পরে তাঁহাদের সে সন্দেহও আপনা-আপনিই দূরীভূত হইবে। ভূ-পৃষ্ঠের এক-একটী স্তর সংগঠিত হইতে, ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণই বলিয়া থাকেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হয়। ভূ-পৃষ্ঠে কত স্তর আছে, এখনও তাহা সঠিক নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কোনও কোনও পণ্ডিত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—'অন্যূন লক্ষ্য স্তরে ভূ-পৃষ্ঠ গঠিত হইয়াছে।' তাহা হইলে, বুঝিয়া দেখুন, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে কত কোটী বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

বিবিধ আলোচনা।

সৃষ্টি-সম্বন্ধে আরও কত কথাই আসিতে পারে। একটু স্থিরচিত্তে গম্ভীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়,—আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় আরও কত পৃথিবী আছে, আমাদের চন্দ্রের ন্যায় আরও কত চন্দ্র আছে, আমাদের এই পরি; দৃশ্যমান্ সূর্য্যের ন্যায় আরও কত সূর্য্য থাকা সম্ভবপর। ঐ যে নভোমণ্ডলে কত অগণিত নক্ষত্র-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, উহারও যে পৃথিব্যাদির ন্যায় বিশালাকার, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। নিউজিল্যাণ্ডের জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ (প্রফেসর এ, জে, বিকার্টন) ইংলণ্ডের 'রয়েল:ইনষ্টিটিউশন' সমিতির

সৌরজগতের কথা।

---

* Dr. Croll's *Climate and Time* and *Climae and Cosmology*.

† Prof. Geikie, *Taragments of Earthlore*.

অধিবেশনে একটি তারার উৎপত্তি-বিষয়ক অদ্ভুত ব্যাপার বর্ণন করেন। তিনি সেই তারাটীকে 'নোভা পার্সে' (Nova Persei) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'বিগত তিন শত বৎসরের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল তারা সৌর-জগতে আবির্ভূত হয় নাই। সেই তারার ঔজ্জ্বল্য এই পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষাও দশ সহস্র গুণ অধিক। শৈত্যবশে সঙ্কুচিত দুইটী সূর্য্যের সংঘর্ষে এক ঘণ্টার মধ্যে ঐ নূতন তারার উৎপত্তি হইয়াছে।' পৃথিব্যাদি যে আটটী গ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আপন-আপন কক্ষ-পথে ভ্রাম্যমাণ, তাহাদের এক-একটীর আকৃতির এবং সূর্য্য হইতে তাহাদের দূরত্বের বিষয় অনুধাবন করিলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়।' জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সূর্য্যের ব্যাস—মোটামুটি দুই হাজার সেকেণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। গড়ে পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব সাড়ে নয় কোটী-মাইল ধরিলে, প্রতি সেকেণ্ডের পরিমাণ ৪৬০ চারি শত ষাট মাইল দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে সূর্য্যের ব্যাস—৯২,০০০ বিরানব্বই হাজার মাইল হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, উত্তাপ-হ্রাস-হেতু সূর্য্য একটু একটু সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। সেই হ্রাস-প্রাপ্তির পরিমাণ—তিন হাজার বৎসরে এক সেকেণ্ড বা ৪৬০ চারি শত ষাট মাইল মাত্র; অর্থাৎ, বৎসরে ৮০০ আট শত ফিট। সূর্য্যের বিশাল দেহের তুলনায় সে সঙ্কোচনের পরিমাণ কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিন হাজার বৎসর অতীত হইলেও সে হ্রাস-পরিমাণ অনুমান করা দুঃসাধ্য—সূর্য্যের এমনই বিরাট্ আকার! সূর্য্যের বিরাট্ আকারের তুলনায় অন্যান্য গ্রহাদির আকার ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহারা এক একটী কম নহেন। পৃথিবীর ব্যাস-পরিমাণ—প্রায় আট হাজার মাইল (৭৯২৬ মাইল); উহার পরিধি—প্রায় ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার মাইল। চন্দ্রের ব্যাস—২১৫৩ দুই হাজার এক শত তিপ্পান্ন মাইল; উহার মোট আয়তন—পৃথিবীর আয়তনের উনপঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। বুধ (Mercury) গ্রহ একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র বিশেষ। কিন্তু উহা হইতে অতি শুভ্র উজ্জ্বল আলোক নির্গত হয়। তবে সূর্য্যের অতি নিকটে অবস্থিত বলিয়া উহা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। বুধ গ্রহের ব্যাস—৩১৪০ তিন হাজার এক শত চল্লিশ মাইল। শুক্র (Venus)—সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন নক্ষত্র। বুধ-গ্রহ অপেক্ষা যদিও এই গ্রহ অধিকতর দোদুল্যমান; কিন্তু ইহা কখনও দৃষ্টির অগোচর হয় না। শুক্রগ্রহের ব্যাস—৭৭০০ সাত হাজার সাত শত মাইল। এই গ্রহের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের অনেকটা নিকটে অবস্থিত। মঙ্গল (Mars) গ্রহও পৃথিবীর নিকটে অবস্থিত বটে; কিন্তু পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব শুক্র-গ্রহের দূরত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। মঙ্গল গ্রহের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের অর্দ্ধেক। ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহা দেখিতে—কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ; সুতরাং ইহাকে অতি সহজেই চিনিতে পারা যায়। বৃহস্পতি (Jupiter)—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ। ইহার ব্যাস—পৃথিবীর ব্যাসের এগার গুণ এবং ইহার আয়তন—পৃথিবীর আয়তনের ১২৮১ গুণ অধিক। ইহা দেখিতে অনেকাংশে মঙ্গল গ্রহের অনুরূপ। শনি (Saturn)—প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে, সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত। ইহার ব্যাস—পৃথিবীর ব্যাসের দশ গুণ এবং ইহার আকৃতি—পৃথিবীর আকৃতির ৯৯৫ গুণ অধিক। এই গ্রহকে বেষ্টন করিয়া দুই স্তরে

বলয়াকারে রশ্মি-রাশি বিনির্গত হইতেছে। শনি-গ্রহের ইহাই বিশেষত্ব। ইউরেনাস (Uranus) গ্রহ অন্যান্ত ছয়টী গ্রহের তুলনায় সূর্য্য হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন এই গ্রহ দৃষ্টিগোচর হয় না। ইউরেনাসের ব্যাস—৩৫,১১২ পঁয়ত্রিশ হাজার এক শত বার মাইল। আয়তনে এই গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা সাড়ে ছয় গুণ বড়। এই গ্রহের উপরিভাগ স্বচ্ছ বলিয়া অনুমিত হয়। নেপচুন (Neptune) গ্রহ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আবিষ্কৃত হয়। কেহ কেহ এই গ্রহকে অচঞ্চল বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। নেপচুন গ্রহের ব্যাস ৩২,৯০০ বত্রিশ হাজার নয় শত মাইল। এই গ্রহ সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত। কোন্ গ্রহ সূর্য্যের কত দূরে অবস্থিতি করিতেছে, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গণনায় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূর্য্য হইতে আটটী গ্রহের দূরত্ব;—

বুধ—সূর্য্য হইতে ৩,৭০,০০,০০০ তিন কোটী সত্তর লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।
শুক্র—সূর্য্য হইতে ৬,৮০,০০,০০০ ছয় কোটী আশী লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।
পৃথিবী—সূর্য্য হইতে ৯,৫৯,০০,০০০ নয় কোটী উনষাট লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।
মঙ্গল—সূর্য্য হইতে ১৪,২০,০০,০০০ চৌদ্দ কোটী কুড়ি লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।
বৃহস্পতি—সূর্য্য হইতে ৪৮,৫০,০০,০০০ আটচল্লিশ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।
শনি—সূর্য্য হইতে ৮৯,০০,০০,০০০ উননব্বই কোটী মাইল দূরে অবস্থিত।
ইউরেনাস—সূর্য্য হইতে ১৮০,০০,০০,০০০ এক শত আশী কোটি মাইল দূরে অবস্থিত।
নেপচুন—হইতে ২৭৯,২০,০০,০০০ দুই শত উনআশী কোটি কুড়ি লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।

এই দূরত্বের হিসাব-গণনায় তারতম্য দৃষ্ট হয়। অধুনা কেহ কেহ বুধের দূরত্ব তিন কোটী ষাট লক্ষ মাইল, পৃথিবীর দূরত্ব নয় কোটি উনত্রিশ লক্ষ মাইল, প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত আটটি গ্রহ ভিন্ন 'সেরাস' প্রভৃতি আরও কয়েকটি গ্রহের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীর ন্যায় কত পৃথিবী যে সৃষ্ট হইয়াছে ও বিদ্যমান রহিয়াছে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিতে তাহা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই। বিজ্ঞানের আলোচনার সহিত নিত্য নূতন গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইতেছে এবং গ্রহ-উপগ্রহের আকার ও গতি প্রভৃতি বিষয়ে সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে। সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া যেমন গ্রহ-সমূহ বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেইরূপ গ্রহ-সমূহকে বেষ্টন করিয়া উপগ্রহ ও নক্ষত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। মঙ্গল হইতে বৃহস্পতির কক্ষের মধ্যপথে ফ্লোরা, ভেষ্টা, জুনো, সেরাস, পালাস, পলিহাম্‌নিয়া প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সকল গ্রহও পরিমাণে ও আকৃতিতে এক একটি কম নহে। নক্ষত্র অগণিত। সিরিয়স, ওরিয়ন, রিগেল, ভেগা প্রভৃতি নক্ষত্রের বিষয় আলোচনায় বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়। সেই সকল নক্ষত্রের এক-একটি পৃথিবী অপেক্ষাও বহু গুণে বড়। নেপচুনের সীমানায় পরবর্ত্তী স্থানে কোনও গ্রহের আবিষ্কার আজিও হয় নাই। সুতরাং নেপচুনই যদি সূর্য্যমণ্ডলের সীমা হয়, তাহা হইলে সৌর-জগতের ব্যাস পাঁচ শত বাহাত্তর কোটি মাইল এবং উহার পরিধি সতের শত কোটি মাইল দাঁড়াইতে পারে।' এ সকল বিষয় কল্পনায়ও ধারণা করা সম্ভবপর নহে। নেপচুনের সীমা-রেখার পরেও আরও কত গ্রহ কত পৃথিবী পরিভ্রাম্যমাণ, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—∽•∽—

শাস্ত্র-গ্রন্থে সৃষ্টি-তত্ত্ব।

[শাস্ত্র-গ্রন্থে সৃষ্টি-তত্ত্ব,—সর্ব্ববিধ তত্ত্বের আভাষ;—অবিদ্যমান্ হইতেই বিদ্যমানের উৎপত্তি,—ঋগ্বেদের আভাষ 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' গ্রন্থে পরিদৃশ্যমান;—সৃষ্টি-রূপে স্রষ্টার বিদ্যমানতা,—ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে এবং তাহার অর্থে স্রষ্টার সর্ব্বব্যাপকত্ব ভাব,—আরিষ্টটলে তদ্ভাবের আভাষ;—সংহিতা-মতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া,—সংহিতোক্ত নরনারী সৃষ্টির প্রসঙ্গের সহিত 'জেনিসিসের' নরনারী-সৃষ্টির সামঞ্জস্য; ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতিতে স্রষ্টার অভিব্যক্তি ও সৃষ্টি-প্রসঙ্গ,—সৃষ্ট-পদার্থের সহিত স্রষ্টার ওতঃপ্রোত বিদ্যমানতা;—সর্ব্বভাবেই এক ভাব,—পরমাণুবাদ, বিবর্ত্তবাদ, নীহারিকাবাদ প্রভৃতি সৃষ্টির এক একটী স্তর-বিশেষ;—শাস্ত্রে নীহারিকাবাদ বা 'নেবিউলা থিওরি';—শাস্ত্রে বিবর্ত্ত-বাদ বা 'ইভলিসন থিওরি';—শাস্ত্রে পরমাণুবাদ বা 'য়্যাটমিক থিওরি';—সৌর-জগৎ তত্ত্ব;—সৃষ্টি-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিবিধ প্রসঙ্গ,—তাহার সহিত বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতের ঐক্য-বিধান।]

সৃষ্টি-সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন ধর্ম্মের এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণের মত পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এক্ষণে অস্মদ্দেশে

শাস্ত্র-গ্রন্থে সৃষ্টি-তত্ত্ব।

আমাদিগের বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে তত্তদ্বিষয়ে কি মত ব্যক্ত হইয়াছে, আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। একটু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে,—সকল দেশের সকল মতেরই মূল বা বীজ আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থে নিহিত রহিয়াছে। স্রষ্টার সৃষ্টি-কর্তৃত্বে যাঁহারা বিশ্বাসবান্, শাস্ত্র-গ্রন্থাদির আলোচনায় তাঁহাদের সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইবে; আবার যাঁহারা ক্রমবিকাশ-বাদ, পরমাণুবাদ বা নীহারিকা-বাদ প্রভৃতির পক্ষপাতী, তাঁহারাও তত্তৎ সামগ্রী দর্শন-পুরাণে দেখিতে পাইবেন। একে একে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। কোথায় কি ভাবে কোন্ তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনিই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

আমাদের প্রায় সকল শাস্ত্র-গ্রন্থেই সৃষ্টি-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের বহু স্থানে, সামবেদে, যজুর্ব্বেদে, অথর্ব্ববেদে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে, দর্শনে এবং প্রত্যেক

অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমানোৎপত্তি।

পুরাণে ও তন্ত্রে সৃষ্টির বিষয় পরিবর্ণিত রহিয়াছে। ঋগ্বেদের শতাধিক সূক্তে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার আভাষ পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন, অবিদ্যমান্ হইতে বিদ্যমান্ বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে; ঋগ্বেদের সূক্তে তাঁহারা তদ্বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা বিষয়েও যেখানে যে কোনও বর্ণনা আছে, এক ঋগ্বেদেই তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান্। আমরা নিম্নে ঋগ্বেদ হইতে কয়েকটী সূক্ত উদ্ধৃত

করিতেছি। স্থিরচিত্তে তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে, সকল সমস্যার নিরসন হইবে। ঋগ্বেদে, দশম মণ্ডলের ১২৯শ সূক্তে, বিশ্ব-সৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা,—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥ ১ম ঋক॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥ ২য় ঋক॥
তমাসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং॥ ৩য় ঋক॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিন্দন্হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ৪র্থ ঋক॥"

অর্থাৎ,—'তখন সৎ বা অসৎ কিছুই বিদ্যমান ছিল না। পৃথিবী ছিল না, আকাশ ছিল না,—কিছুই ছিল না। আবরণ করিবার কিছু ছিল না; কাহারও কোথাও স্থান ছিল না; গভীর গহন জলই কি তখন ছিল? ১॥ তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, রাত্রি ছিল না, দিবা ছিল না, দিবারাত্রির ভেদাভেদ ছিল না। একমাত্র তাঁহারই নিশ্বাস-প্রশ্বাস রূপ বায়ু প্রবহমান ছিল; আর একমাত্র তিনিই (পরমাত্মা) বিদ্যমান ছিলেন। ২॥ তখন অন্ধকারের উপর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছিল। কিছুরই চিহ্ন-মাত্র ছিল না। সকলই জলময় ছিল। তুচ্ছ অর্থাৎ অবিদ্যমানেই তিনি (পরমাত্মা) সমাচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই একের আবির্ভাব হয়। ৩॥ প্রথমে মনের উপর কামের প্রভাব হয়! তাহাই উৎপত্তির প্রথম কারণ। এইরূপে অসৎ বা অবিদ্যমান হইতে সতের অর্থাৎ বিদ্যমানের উৎপত্তি হইয়াছিল। ৪।' এই সূক্তে সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থার বিষয় যাহা বিবৃত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন অংশের বর্ণনায় ইহারই আভাষ পাওয়া যায় না কি? বাইবেলে যে অবিদ্যমান্ বা শূন্য হইতে (Out of Nothing) বিশ্বের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, ঋগ্বেদের উল্লিখিত সূক্তে এবং আরও কয়েকটী ঋকে তাহা দেখিতে পাই। দশম মণ্ডলের দ্বিসপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে, 'অবিদ্যমান্ হইতে বিদ্যমান্ উৎপন্ন হইল' স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১৯০ম সূক্তের তিনটী ঋকে, সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধিতে, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া যেরূপ পরিবর্ণিত, তাহাতেও ঐ ভাব পরিস্ফুট,—

"ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত। তত সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥"

অর্থাৎ,—'মহাপ্রলয়ের সময় একমাত্র পরব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন; আর সমস্তই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। সৃষ্টির প্রারম্ভে তপস্ বা অদৃষ্টের বশে জলপূর্ণ অর্ণব উৎপন্ন হয়। সেই অর্ণব হইতে জগৎ-সৃষ্টি সমর্থ বিধাতা সঞ্জাত হন। তিনি যথাক্রমে সূর্য্যকে ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেন। তাহাতে দিবারাত্রি বৎসর প্রভৃতি বিহিত হয়। সেই বিধাতা একে একে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন।' পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' হইতে

পৃথিবীর ও স্বর্গের সৃষ্টি বিষয়ে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে; ঋগ্বেদের এই অংশের সহিত তাহার কিরূপ সাদৃশ্য বিদ্যমান্, সহজেই অনুভূত হইবে। *

বৈদিক সূক্ত-সমূহ আলোচনা করিলে স্রষ্টার ও সৃষ্টি-কার্য্যের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। সূক্তে কোথাও দেখিতে পাই—স্রষ্টাই সৃষ্ট-পদার্থ-রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। সূক্তে কোথাও দেখিতে পাই,—তাঁহা হইতেই সংসার উৎপন্ন হইতেছে। সূক্তে আবার কোথাও দেখিতে পাই—তিনিই স্রষ্টারূপে সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 'পুরুষ সূক্তে' স্রষ্টার সৃষ্ট-পদার্থ-রূপে বিদ্যমানতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেদীপ্যমান। সংসার সেই পরম পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-রূপে অবস্থিত, সে সূক্তে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। ঋগ্বেদের সেই পুরুষ সূক্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পরম পুরুষ সৃষ্ট-পদার্থের সহিত কি ভাবে অবস্থিত, সেই সূক্তে বুঝা যাইবে ;

সৃষ্টি-রূপে স্রষ্টার বিদ্যমানতা।

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং ॥ †
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোহস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততো বিষঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ।
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসংতো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং। পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরূপাদা উচ্যেতে ॥
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥
চন্দ্রমা মনসোজাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথ লোকা অকল্পয়ন্ ॥
সপ্তাস্যাসন্ পরিধিয়স্ত্রিঃ সপ্তসমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুং ॥
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সংতি দেবাঃ ॥"

পুরুষ সূক্তের এই ঋকগুলি অথর্ব্ব-বেদেও দেখিতে পাই। তবে অথর্ব্ব-বেদে ইহার কোনও কোনও অংশ সামান্য পরিবর্ত্তিত; ঋকগুলির ক্রম-পর্য্যায়ও বিভিন্ন রূপ ;

* এই গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' অংশের দ্বিতীয় টীকা দ্রষ্টব্য।

† "বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং"—এই শব্দের অর্থে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন—'তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন।" 'বিশ্বকোষ' অভিধানে লিখিত হইয়াছে,—'তিনি সকল দিক হইতে এই ভূমি ব্যাপিয়া দশাঙ্গুল স্থান জুড়িয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন।' সাধারণ পাঠকগণ প্রায় সকলেই এই দুই মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রোক্ত স্থলে উহাতে 'দশদিক' বুঝাইতেছে বলিয়াই মনে হয়। শঙ্করাচার্য্য 'দশাঙ্গুল' শব্দে 'অপার অনন্ত' অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে দশদিক-ব্যাপকত্বই সূচিত হয়।

অথর্ব্ব-বেদের প্রথম ঋকে 'সহস্র শীর্ষা' পরিবর্ত্তে 'সহস্র বাহুঃ' লিখিত আছে। ঋগ্বেদের [illegible]ক্তের দ্বিতীয় ঋকটী অথর্ব্ব-বেদের চতুর্থ ঋক মধ্যে পরিগণিত। পরন্তু তাহার দুই একটী শব্দ অনুরূপ। যথা, ঋকের শেষাংশ,—"উতামৃতত্বস্যেশ্বরো যদন্যেনাভবৎ সহ।" শেষ ঋকটীতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়। যথা, অথর্ব্ববেদে,—"মূর্দ্ধো দেবস্য বৃহতো অংশব সপ্ত সপ্ততীঃ। রাজ্ঞো সোমস্যাজায়ন্ত জাতস্য পুরুষাদধি॥" উভয়ের মধ্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইলেও সৃষ্টি-সংক্রান্ত মূল অর্থে বিশেষ ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ঋগ্বেদোক্ত পুরুষ-সূক্তের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে সৃষ্টি-বিষয়ে স্রষ্টার সৃষ্টি-কর্তৃত্বের অনেকটা আভাষ পাওয়া যাইবে;—'পুরুষ সহস্র-মস্তক-যুক্ত এবং সহস্র অক্ষি ও সহস্র-পদ-বিশিষ্ট। তিনি বিশ্ব-চরাচর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ও দশ দিকে বিরাজমান্। ১॥ যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা উৎপন্ন হইবে, সকলই সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বের অধিকারী, তিনি অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট। ২॥ সেই পুরুষের মহিমার অন্ত নাই। তাঁহার এক পদে ভূতসমষ্টি-পূর্ণ এই পৃথিবী এবং অপর তিন পদে অমরগণ পরিপূরিত স্বর্গ। ৩॥ পুরুষের তিন পাদ বা অংশ দ্যুলোকে বা উর্দ্ধে এবং এক পাদ নিম্নে বা পৃথিবীতে। ৪॥ তিনি চেতন অচেতন সকল সামগ্রীতেই পরিব্যাপ্ত। তাঁহা হইতেই বিরাট্ জন্মগ্রহণ করেন। বিরাট্ হইতে আবার পুরুষ উৎপন্ন হন। ৫॥ তিনি জন্মমাত্র অগ্রপশ্চাতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন; সেই পুরুষকেই হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তখন বসন্ত ঘৃত হইয়াছিল, গ্রীষ্ম যজ্ঞকাষ্ঠ এবং শরৎ হবি হইয়াছিল। ৬॥ সেই অগ্রজাত পুরুষই যজ্ঞের বলিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন; তদ্দ্বারাই দেবতারা, সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ৭॥ সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে জল এবং খেচর ও ভূচর, আরণ্য ও গ্রাম্য পশু উৎপন্ন হইল। ৮॥ সেই যজ্ঞ হইতে ঋক, সাম উৎপন্ন হইল; ছন্দ সকল আবির্ভূত হইল; যজু উৎপন্ন হইল। ৯॥ তাহা হইতে অশ্ব উৎপন্ন হইল এবং দুইপাটী দন্তযুক্ত পশুগণ জন্মগ্রহণ করিল। তাহা হইতেই গো-গণ জন্মগ্রহণ করিল, তাহা হইতেই ছাগ ও মেষ উৎপন্ন হইল। ১০॥ সেই পুরুষ বিভক্ত হইলে কত ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার মুখ বাহু, উরু, পদ হইতেই বা কি কি হইয়াছিল? ১১॥ তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়। ১২॥ তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু বা জীবের প্রাণবায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৩॥ তাঁহার নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, মস্তক হইতে স্বর্গ, চরণদ্বয় হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিকসকল ও লোক-সমূহ উৎপন্ন হয়। ১৪॥ সেই পুরুষকে পশুরূপে বন্ধন করিয়া দেবতারা যখন যজ্ঞ করেন, তখন তাঁহাতেই সপ্ত সমিধ, সপ্ত বেদী ও ত্রিসপ্ত (একুশ) সংখ্যক যজ্ঞ-কাষ্ঠ নির্ম্মিত হয়। ১৫॥ দেবতারা যজ্ঞ দ্বারাই যজ্ঞ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ইহাই প্রথম ধর্ম্মসাধন। যে স্বর্গলোকে দেবতা ও সাধ্যগণ অবস্থিত, এই যজ্ঞ দ্বারাই মহিমান্বিত দেবগণ সেই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। ১৬॥' পুরুষ সূক্তের যে ব্যাখ্যা অধুনা প্রচলিত, তাহারই মর্ম্মানুসরণে আমরা পুরুষ-সূক্তের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম। পাঠকগণ উহার মধ্যে সৃষ্টির স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে

পারিবেন। আমাদের মনে হয়,—পুরুষ সূক্তের আধুনিক ব্যাখ্যায় মূল অর্থের বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। নচেৎ, অল্প প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়,—পুরুষ সূক্তে কি সার তথ্য নিহিত আছে। তিনি বিশ্ব, তাঁহা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, তিনিই যজ্ঞ, তিনিই যজ্ঞাগ্নি, তিনিই সমিধ, তিনিই বলি, তিনিই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ত্রিভুবন, তিনিই সূর্য্য, তিনিই চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র, তিনিই সমস্ত,—পুরুষ সূক্তে এই ভাব পরিব্যক্ত নহে কি? স্রষ্টা হইতে সৃষ্টি বা জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি অর্থাৎ সৃষ্টিরূপেই স্রষ্টার বিদ্যমানতা,—পুরুষ-সূক্তের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে, স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারে। এ ভাব অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কচিৎ পরিস্ফুট দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য-দেশের দুই একজন দার্শনিক * যদিও এই ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র ভিন্ন অন্য দেশের অন্য কোনও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এ মত এমন পরিস্ফুট আছে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বেদ-পুরাণাদি সকল শাস্ত্র-গ্রন্থেই সৃষ্টির প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। সংহিতা-শাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতা সকলেরই মান্য। মহর্ষি মনু আপন সংহিতার প্রথমেই সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থার এবং সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। সৃষ্টি-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য মহর্ষিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি মনু বলেন,—'এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব-সংসার এক-কালে প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল। তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহে; কোনও লক্ষণার দ্বারাও অনুমেয় নয়; তখন তর্কের ও জ্ঞানের অতীত হইয়া ইহা সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল।' মনুসংহিতার মতে সংসারের সেই আদি-অবস্থার বর্ণনা;—

সংহিতা-মতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

"স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া এই বিশ্ব-সংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া সেই তমোভূত অবস্থার ধ্বংসক হইয়া প্রকাশিত হন। তিনি মনোমাত্রগ্রাহ্য, সূক্ষ্মতম, অব্যক্ত, সনাতন, সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য পুরুষ স্বয়ংই প্রথমে শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা-সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া চিন্তামাত্রে প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করিলেন। † অর্পিত বীজ সুবর্ণবর্ণোপম সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটী অণ্ডে পরিণত হইল। এ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্মপরিগ্রহণ করিলেন। নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাগ্রে প্রসূত বলিয়া অপত্য-প্রত্যয়ে জলকে 'নারা' বলে এবং 'নারা' ব্রহ্মারূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া তাঁহাকে 'নারায়ণ' বলে। যিনি আদি-কারণ, অব্যক্ত, নিত্য এবং সদসদাত্মক, তৎকর্ত্তৃক উৎপাদিত ঐ প্রথম পুরুষকে লোকে

* আরিষ্টটল এবম্বিধ মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তদ্বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদের ৬২শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† এই শক্তি-বীজ-সংযুক্ত জলের বিষয় এই পরিচ্ছেদে, শাস্ত্রে নীহারিকা-বাদ অংশের আলোচনায়, দৃষ্ট হইবে

'ব্রহ্মা' বলিয়া থাকে। ভগবান ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মমানের সংবৎসর কাল বাস করিয়া পরিশেষে আত্মগত ধ্যান-বলে উহাকে দ্বিধা করিলেন। তিনি সেই দুই খণ্ডের উর্দ্ধ খণ্ডে স্বর্গাদি লোক এবং অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি নির্ম্মাণ করিলেন এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক ও সমুদ্রাক্ষ, শাশ্বত সলিল-স্থান স্থাপিত করিলেন। ব্রহ্মা পরমাত্ম-স্বরূপ সদসদাত্মক মনের উদ্ধার করিলেন। মনস্ফুরণের পূর্ব্বে অহং-অভিমানী, সর্ব্বকর্ম্মপ্রবর্ত্তক, অহঙ্কার-তত্ত্ব প্রস্ফুরিত করিয়াছিলেন। অহঙ্কার-তত্ত্বের পূর্ব্বে (আত্মার অভিব্যক্তি) মহত্তত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছিল। এ সমুদায়ই সত্ত্বরজস্তমোগুণময়। তিনি ক্রমে বিষয়-গ্রহণক্ষম ইন্দ্রিয়-সমূহকে সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে অনন্ত কার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই ছয়টী সূক্ষ্ম অবয়বকে তদীয় বিকার—ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের সহিত যোজনা করিয়া তিনি দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি সমুদায় জীবের সৃষ্টি করিলেন। প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মের মূর্ত্তি-সম্পাদক এই ছয়টী সূক্ষ্ম অবয়ব বক্ষ্যমাণ পঞ্চভূতাদিকে কার্য্যরূপে আশ্রয় করে বলিয়া মনীষিগণ তদীয় মূর্ত্তিকে শরীর বলিয়া থাকেন। আকাশাদি মহাভূত সকল অবকাশাদি স্ব স্ব কর্ম্মের সহিত পঞ্চতন্মাত্ররূপে অবস্থিত ব্রহ্ম হইতে এবং সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি-হেতু মন ও ইচ্ছা-দ্বেষাদি স্বকীয় সূক্ষ্ম অবয়বের সহিত অহঙ্কার-রূপে অবস্থিত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হন। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী অনন্তকার্য্যক্ষম পুরুষ-তুল্য পদার্থের সূক্ষ্ম মাত্রা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—অবিনাশী কারণ হইতে এইরূপে অস্থির কার্য্য সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশাদি ভূত-সকলের মধ্যে পর পর প্রত্যেকে পূর্ব্ব-পূর্ব্বের গুণ গ্রহণ করে। যে যত সংখ্যায় গণিত, তাহার তত গুণ। প্রথম ভূত আকাশের একটী গুণ—শব্দ। দ্বিতীয় ভূত বায়ুর দুইটী গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। তৃতীয় ভূত অগ্নির তিনটী গুণ—শব্দ,স্পর্শ এবং রূপ। চতুর্থ ভূত জলের চারিটি গুণ,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। পঞ্চম ভূত পৃথিবীর পাঁচটী গুণ,—শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা বেদানুক্রমে সকলের পৃথক পৃথক নাম, পৃথক পৃথক কর্ম্ম ও পৃথক পৃথক বৃত্তি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেই প্রভু কর্ম্মাঙ্গভূত দেবগণ, প্রাণধারী ইন্দ্রাদি দেবগণ, সাধ্যনামক সূক্ষ্ম দেব-সমূহ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি সনাতন যজ্ঞ সকল সৃষ্টি করিলেন। তিনি অগ্নি হইতে, বায়ু হইতে, সূর্য্য হইতে, যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের জন্য যথাক্রমে ঋক, যজু ও সাম সংজ্ঞক তিন বেদ দোহন করিলেন। কাল, কালের বিশেষ বিশেষ বিভাগ সকল, নক্ষত্রসমূহ, গ্রহগণ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, সমভূমি, বিষমভূমি, তপস্যা, বাক্য, চিত্তের পরিতোষ, কাম এবং ক্রোধ—এই সকল পদার্থ তিনি প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে উৎপাদন করিলেন। কর্ম্ম-সকলকে বিভাগ করিবার জন্য তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিভাগ করিলেন এবং এই সকল প্রজাদিগকে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবে নিযুক্ত করিলেন। সূক্ষ্ম ও পরিণামী পঞ্চতন্মাত্রের সহিত এই সমুদায় সৃষ্টি আনু-পূর্ব্বীক্রমে—সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতর ক্রমে,—তিনি সৃষ্টি করিলেন। প্রভু পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, সে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিলেও স্বতঃই সেই কর্ম্মের আচরণ করিতে লাগিল। অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য এবং মিথ্যা যাহার যে গুণ তিনি সৃষ্টিকালে বিধান করিলেন, সৃষ্ট্যুত্তর কালেও তাহাতে সেই

গুণ স্বয়ং প্রবেশ করিতে লাগিল। ঋতু-সমাগমে ঋতুচিহ্ন-সমূহ যেমন আপনা-আপনিই দেখা দেয়, প্রাক্তন কর্ম্মফল-সমূহও তদ্রূপ যথাকালে আপনা-আপনিই দেহধারিগণ সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি লোক-সকলের সমৃদ্ধি-কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রভু আপনার দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন এবং সেই নারীর গর্ভে বিরাট্‌কে উৎপাদন করিলেন।' * সৃষ্টি বিষয়ে মনুসংহিতার যে মত পরিব্যক্ত, পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণের অনেকেই সেই মতের পোষণ করিতেন। † অধিকন্তু বাইবেলের কয়েকটী অংশে মনুসংহিতার এ সৃষ্টি-বিবরণের কিয়দংশের ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়াও বুঝা যায়। আদমের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ঈশ্বর ইভকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;—'জেনিসিসে' আমরা তাহা দেখিতে পাইয়াছি। ‡ বিশেষতঃ, 'জেনিসিসে' আরও লিখিত আছে,—"So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them." (Genesis. I. 27) অর্থাৎ, 'ঈশ্বর আপনার প্রতিকৃতির অনুরূপ মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আপনার প্রতিকৃতিতে মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নর ও নারীতে পরিবর্ত্তিত করেন। এতদ্বিবরণও মনুসংহিতার মনুষ্য-সৃষ্টির বিবরণের অনুসারী নহে কি? মনুষ্য-সৃষ্টি-সংক্রান্ত মনুসংহিতার শ্লোকটী এবং কুল্লূক ভট্ট কৃত টীকা উদ্ধৃত করিতেছি। মিলাইয়া দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন,—তাহাতে মনুষ্য-সৃষ্টির ইতিহাস যাহা আছে, জেনিসিসেও তাহাই রূপান্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুসংহিতার সেই শ্লোকটী,—

'দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবত।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥'

—মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়, ৩২শ শ্লোক।

এতৎসম্বন্ধে কুল্লূকভট্টের টীকা,—"স ব্রহ্মা নিজ দেহং দ্বিখণ্ডং কৃত্বা অর্দ্ধেন স্ত্রী তস্যাং মৈথুন-ধর্ম্মেন বিরাট্‌-সঞ্জং পুরুষং নির্ম্মিতবান্। শ্রুতিশ্চ ততো বিরাড়জায়তেতি।"

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৃষ্টি-প্রসঙ্গ যেরূপভাবে উত্থাপিত হইয়াছে, তাহারও একটু আভাষ দেওয়া যাউক। শতপথব্রাহ্মণে (৬।১।১) লিখিত আছে,—

উপনিষদাদিতে ব্রহ্মা ও সৃষ্টি।

"'পুরুষ প্রজাপতি প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া জলমধ্যে আপনি অণ্ডরূপে প্রবিষ্ট হন। সেই অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্যই তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিকারী ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হন।' এতদংশের ভাবার্থ-গ্রহণ দুরূহ বটে; তবে তাঁহা হইতেই যে বিশ্ব-চরাচরের উৎপত্তি এবং তিনি যে সকলের মধ্যেই আছেন, তাহারই আভাষ পাওয়া

* মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম হইতে দ্বাত্রিংশ শ্লোক, "বঙ্গবাসী" সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

† আমাদের দর্শন-শাস্ত্রে এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য-দর্শনের সহিত তৎসমুদায়ের সম্বন্ধের আলোচনায় এ সকল বিষয় উল্লেখ করা যাইবে।

‡ পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদের ৫৩শ পৃষ্ঠার ৩য় টীকা দ্রষ্টব্য।

যায়। অথর্ব্ব সংহিতার (১১.৪) লিখিত আছে,—'প্রাণ হইতেই অর্থাৎ প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হয়। পরমেশ্বর স্বয়ংই প্রথম-সৃষ্ট রূপে আবির্ভূত হন।' তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।২৩) লিখিত আছে,—'প্রজাপতি পৃথিব্যাদির সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। স্বয়ং উৎপন্ন হন, আবার উৎপন্ন পদার্থে আপনি প্রবেশ করেন।' বাজসনেয়ী সংহিতায় (৩৪.১—৬) সৃষ্টি-সম্বন্ধে দেখিতে পাই,—'মনেই সকলের অবস্থিতি; মনই সকলের আধারভূত। মনই মনুষ্যের মধ্যে চিরস্থায়ী নিত্য-আলোক-রশ্মিরূপে অবস্থিত।' যিনি প্রজাপতি, স্বয়ম্ভূ, ব্রহ্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত, এখানে তিনি মানস বা মন বলিয়া পরিচিত। ফলতঃ, যে নামেই পরিচিত হউন, স্রষ্টা যে সকলের মধ্যেই ওতঃপ্রোত বিরাজমান, উল্লিখিত অংশ হইতে তাহাই উপলব্ধি হয়। অতঃপর উপনিষদে সৃষ্টি-প্রসঙ্গে ব্রহ্ম কি ভাবে অবস্থিত, দেখা যাউক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১.৪.৭) দেখিতে পাই,—"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামায়-মিদং রূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদংরূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি।" অর্থাৎ,—'এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এক সময়ে অপ্রকাশ ছিল। অবশেষে নামে ও রূপে ইহা প্রকাশমান হয়। নখাগ্র পরিমাণ আত্মা তখন ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হন। ক্ষুরধানে অর্থাৎ খাপের মধ্যে যেমন ক্ষুর থাকে, বিশ্বম্ভর সেইরূপ বিশ্বম্ভরকুলায়ে অদৃশ্যভাবে প্রবিষ্ট ছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৬।২।১—৩) লিখিত আছে,—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত॥...তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত তস্মাদ্ যত্র ক চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে।" অর্থাৎ,—'আদিতে একমাত্র তিনিই বিদ্যমান ছিলেন। তখন তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তাঁহার বহু হইবার অভিলাষ হয়। তিনি ইচ্ছা করেন,—তিনি বহু হইবেন, আপনাকে বহুত্বে পরিণত করিবেন। তদনুসারে তিনি তেজ বা অগ্নির সৃষ্টি করেন। তেজ হইতে জল এবং জল হইতে অন্ন বা পৃথিবী উৎপন্ন হয়।' মুণ্ডকোপনিষদে (২।১.১) উক্ত হইয়াছে,—"তদেতৎ সত্যম্—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ, প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥" অর্থাৎ—তিনিই সত্য। সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ রাশি নির্গত হইয়া অগ্নির রূপাদির প্রভাব বিস্তার করে, আবার তাহারা অগ্নিতেই লয়প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে জীব-সমূহ উৎপন্ন হইয়া আবার তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়।' অর্থাৎ,—জীবাদি-সমন্বিত বিশ্ব তাঁহারই অভিব্যক্তিবিশেষ; তিনি পরোক্ষ হইয়াও তাহাতেই প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে (২।৬) আছে,—"সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনু প্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।" অর্থাৎ—'ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব; বহুরূপে প্রকাশমান

হইব। অতঃপর তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই তপস্যার ফলে পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব সৃষ্ট হয়। বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তিনি স্বয়ং তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সর্ব্বরূপে আবির্ভূত হন।' ঐতরেয় উপনিষদে (১।১—২, ১।৩.১১) ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,—"ওঁ। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি॥ ১॥ স ইমাঁল্লোকানসৃজতাম্ভো মরীচীর্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তরিক্ষং মরীচয়ঃ পৃথিবী মরো যা অধস্তাৎ তা আপঃ। ২॥ * * * স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি॥ ১১॥" অর্থাৎ,—'সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন; তিনি ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তিনি সঙ্কল্প করেন,—আমি জগৎ সৃষ্টি করিব। তদনুসারে তিনি ভূর্লোক, দ্যুলোক, রসাতল, সমুদ্র, আকাশ, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। * * * তিনি ভাবিয়া দেখেন,—আমা হইতে পৃথক হইয়া বিশ্ব কিরূপে অবস্থিতি করিবে। তখন তিনি চিন্তা করেন,—কি করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিবেন। এইরূপ চিন্তার পর তিনি শীর্ষ বিদীর্ণ করিয়া সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন।' ফলতঃ, আত্মা, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা, যে নামেই অভিহিত করি না কেন, সৃষ্ট-পদার্থের মধ্যে তিনি স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছেন।

পরমাণুবাদ—বিবর্ত্তবাদ—নীহারিকা-বাদ।

হিন্দু-দর্শনে সৃষ্টি-সম্বন্ধে কতমতে কি ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, সে আভাষ যথাস্থানে প্রদান করিয়াছি। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র—'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। তাহাতে বুঝা যায়, সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে বিকার-বশে সৃষ্টি-ক্রিয়া কিরূপে সাধিত হয়, সাঙ্খ্য-দর্শনে তাহা দেখিতে পাই। বৈশেষিকের সৃষ্টি-তত্ত্ব, ন্যায় মতে সৃষ্টি-তত্ত্ব, বৌদ্ধ-মতে সৃষ্টি-তত্ত্ব, তন্ত্র-মতে সৃষ্টি-তত্ত্ব, সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে বিবৃত করা হইয়াছে।* সেই সকল বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, পাশ্চাত্য সকল মতই তাহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রতীত হইবে। সেই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে, আধুনিক পরমাণু-বাদের কথাও পাওয়া যাইবে, বিবর্ত্তবাদের পরিচয়ও দৃষ্ট হইবে, নীহারিকাবাদ-তত্ত্বও অবগত হওয়া যাইবে। আবার একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, একই সামগ্রী বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া আছে বলিয়াও উপলব্ধি হইবে। শেষোক্ত বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, শাস্ত্রের কয়েকটী বাক্য প্রথমে স্মরণ করার আবশ্যক হয়। বেদ, উপনিষৎ, তন্ত্র, পুরাণ, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই,—'যিনি সৃষ্টি

সর্ব্বত্রাবেই এক ভাব।

---

* সৃষ্টি-সম্বন্ধে পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১১০—১১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সাঙ্খ্যমতে সৃষ্টি-তত্ত্ব উক্ত খণ্ডের ৯১—৯২ পৃষ্ঠায়, বৈশেষিক মতে সৃষ্টি-তত্ত্ব ৯৯—১০০ পৃষ্ঠায়, ন্যায়-মতে সৃষ্টি-তত্ত্ব ১০৬ পৃষ্ঠায়, বেদান্ত-মতে সৃষ্টি-তত্ত্ব ১২৮—১২৯ পৃষ্ঠায়, বৌদ্ধ-মতে সৃষ্টি-তত্ত্ব ১০৬ পৃষ্ঠায়, তন্ত্র-মতে সৃষ্টি-তত্ত্ব ২১২ পৃষ্ঠায়, দর্শনাদির তুলনায় সৃষ্টি-তত্ত্ব ১৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

করিতেছেন, তিনি আবার তাহা হইতে বিনির্গত হইতেছেন; অর্থাৎ, স্রষ্টা ও সৃষ্ট-পদার্থ এমনই ভাবে অবস্থিত যে, পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না, তাহা বুঝা যায় না; পরন্তু পার্থক্য থাকিলেও তাহা ধ্যান-ধারণার অতীত। বেদের পুরুষ-সূক্তে দেখিলাম,—

"তস্মাদ্বিরাড়্ জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ॥"

অর্থাৎ,—'তাঁহা হইতে যে বিরাট্ পুরুষ জন্মিলেন, সেই বিরাট্ পুরুষেই তিনি আবার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।' ইহাতে, একই তাঁহার অবস্থান্তর ঘটিল ভিন্ন আর কিছুই ঘটিল বলিয়া বুঝা যায় না। বেদের অনুসরণে মহর্ষি মনুও ঐ একই ভাব ব্যক্ত করিয়া গেলেন। যথা,—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥"

মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়, ৮ম ও ৯ম শ্লোক।

যে অণ্ড তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইল, সেই অণ্ডেই তিনি প্রবিষ্ট হইলেন।' এখানেও সেই স্রষ্টা ও সৃষ্ট-পদার্থের অভেদ-ভাব। পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণকে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টি-সম্বন্ধে ঐ কথাই লিখিত আছে। যথা,—

"তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধন্তু জলবুদ্বুদবৎ সমম্।
ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহৎ তদুদকেশয়ম্॥
প্রাকৃতংব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ সংস্থানমুত্তমম্॥
তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, প্রথম অধ্যায়, ৫১শ-৫২শ শ্লোক।

অর্থাৎ,—'ব্রহ্মরূপ বিষ্ণুর উত্তম-সংস্থানভূত জলবুদ্বুদবৎ বর্ত্তুলাকার উদকেশয় ঐ বৃহৎ প্রাকৃত অণ্ড ভূতগণের সাহায্যে ক্রমে বিবৃদ্ধ হইল। অব্যক্তরূপ জগৎপতি বিষ্ণু, ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মা-স্বরূপ ঐ অণ্ডে ব্যবস্থিত হইলেন।' শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহ হইতে এরূপ শত শত অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে অতি সুন্দর উপমায় এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মহাদেব সৃষ্টি-প্রসঙ্গে পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—

"প্রকৃত্যা জায়তে সর্ব্বং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্তু বুদ্বুদং দেবী যথা তোয়ে বিলীয়তে॥"

অর্থাৎ,—'জল হইতে যেমন বুদ্বুদ্ উৎপন্ন হইয়া আবার জলেই তাহা লয়প্রাপ্ত হয়; প্রকৃতি হইতে সেইরূপ সংসারের উৎপত্তি হইতেছে, আবার প্রকৃতিতেই তাহা লয় পাইতেছে। বীজ ও বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, স্রষ্টা ও সৃষ্ট-বস্তুর সেই সম্বন্ধ। বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, ভূ-তত্ত্ব, প্রাণি-তত্ত্ব প্রভৃতি, সৃষ্টির এক একটী অবস্থার—বীজ হইতে বৃক্ষের অথবা বৃক্ষ হইতে বীজের পরিণতি-কালের বিশেষ বিশেষ স্তরের—আলোচনা করিয়া গিয়াছেন

মাত্র। স্থূল-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, তাহাদের একের সহিত অন্যের পার্থক্য অনুভূত হয় বা দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, পার্থক্যের বা দ্বন্দ্বের কারণ দূরীভূত হইয়া আসে। একই বিষয় শাস্ত্রের নানা স্থানে নানারূপে ব্যাখ্যাত ও বর্ণিত হইয়াছে দেখিয়া যাঁহারা শাস্ত্র-তত্ত্বের সামঞ্জস্য-সাধনে সংশয়ান্বিত হন, এই বিষয়টী বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের সে সংশয় দূরীভূত হইতে পারে। এ হিসাবে, সৃষ্টির যে নানা অবস্থা পরিকল্পিত হয়, তন্মধ্যে পরমাণু-বাদ একটী স্তর, বিবর্ত্ত-বাদ একটী স্তর এবং নীহারিকা-বাদ আর একটী স্তর-পর্য্যায় মাত্র।

'অপ্'-প্রসঙ্গ—নীহারিকা বাদ।

নীহারিকা-বাদীদিগের নীহারিকা-বাদের মূল-তত্ত্ব আর্য্য-হিন্দুগণ অনেক দিন হইতেই অবগত ছিলেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে এ বিষয়ে প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দ্বিসপ্ততিতম সূক্ত, প্রথম মণ্ডলের পঞ্চত্রিংশ সূক্ত, চতুর্থ মণ্ডলের ষট্পঞ্চাশৎ সূক্ত, প্রথম মণ্ডলের ঊনচত্বারিংশতাধিক শততম সূক্ত প্রভৃতি আলোচনা করিলে এবং সংহিতা-পুরাণাদির সহিত তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিলে, এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। সুতরাং, আমরা প্রথমে আবশ্যকানুরূপ কয়েকটী ঋক উদ্ধৃত করিতেছি। দশম মণ্ডলের দ্বিসপ্ততিতম সূক্তের কয়েকটি ঋক,—

শাস্ত্রে নীহারিকা-বাদ।

"দেবানাং নু বয়ং জাতা প্রবোচাম বিপন্যয়া। উক্‌থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে॥
ব্রহ্মণস্পতিরেতা সংকর্ম্মার ইবাধমৎ। দেবানাং পূর্ব্বে যুগেঽসতঃ সদজায়ত॥
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত। তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি॥
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত। অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতি পরি॥
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব। তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ॥
যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত। অত্রা বো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরপায়ত॥
যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্বত। অত্রা সমুদ্র আগূড়্‌হমা সূর্য্যমজভর্ত্তন॥
অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্বস্পরি। দেবাঁ উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্ত্তণ্ডমাস্যৎ॥
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরূপ প্রৈৎ পূর্ব্যাং যুগং। প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎ পুনর্মার্ত্তণ্ডমাভরৎ॥"

—ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৭২শ সূক্ত, ১ম—৯ম ঋক।

এই কয়েকটী ঋকের মর্ম্মার্থ;—বৃহস্পতি ঋষি বলিতেছেন,—আমরা দেবগণ যেরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি। ভবিষ্যৎ কালে এই স্তুতিগানে দেবগণ প্রত্যক্ষীভূত হইবেন। দেব-সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান্ হইতে সৎ অর্থাৎ বিদ্যমানের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মকার কর্তৃক ভস্ত্রা বা যাঁতা পরিচালিত হইলে, যেমন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-সমূহ নির্গত হয়; ব্রহ্মণস্পতি কর্তৃক সেইরূপ ব্যোম আলোড়িত হওয়ায় দেব বা গ্রহাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উৎপত্তি হইয়াছিল। দেবগণের জন্মের পূর্ব্বে এইরূপে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়। পরে উত্তানপদ বা শক্তি দ্বারা দিক-সমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল। শক্তি বা তেজ হইতে জল (বা জলের আদিভূত সামগ্রী) এবং সেই জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়, যে তেজ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইলেন, সেই তেজ হইতে পরস্পর-আকর্ষণ-বিশিষ্ট ও পরস্পর-

বন্ধন-বিশিষ্ট দেব বা জ্যোতিষ্ক সমূহ জন্মগ্রহণ করিলেন। দেব বা গ্রহগণ অন্তরীক্ষ রূপ সলিলে গতি-বিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তীব্র ঘূর্ণনে রেণুবৎ নক্ষত্র-সকল বহির্গত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষ রূপ মহাসমুদ্রে গ্রহগণ যেরূপে পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া রহিলেন, সূর্য্যও তাঁহাদের আকর্ষণে তদ্রূপ আকৃষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অদিতির অর্থাৎ তেজের আট পুত্রের বা জ্যোতিষ্কের মধ্যে মার্ত্তণ্ড প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইলেন; অন্য সকলে দূরে দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে দিবারাত্রি-বিভাগের জন্য মার্ত্তণ্ড রহিলেন; অন্যান্য সকলে দূরে সরিয়া গেলেন।' * দশম মণ্ডলের উক্ত দ্বি-সপ্ততি-তম সূক্তের আমরা যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিলাম, সে ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নানা মতান্তর ঘটিতে পারে। একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ঐ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকের অনুবাদে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়া গিয়াছেন,—"দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই হেতুতে প্রচুর ধূলির উদয় হইল।" এ অনুবাদে ঋকের অর্থোপলব্ধি হওয়া দুরূহ। 'জলমধ্যে' 'ধূলির উদয়' এই দুইটী শব্দের রূপক বা তাৎপর্য্যার্থ তিনি বিবৃত করেন নাই। তবে তিনি সপ্তম ঋকের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 'জল-মধ্যে' শব্দে কি বুঝাইতেছে, তাহার আভাষ পাওয়া যায়। সপ্তম ঋকের অনুবাদে তিনি লিখিয়াছেন,—"মেঘ-সমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন। এই 'সমুদ্র তুল্য আকাশ' মধ্যে সূর্য্য নিগূঢ় ছিলেন; দেবতারা সেই সূর্য্যকে প্রকাশ করিলেন।" পূর্ব্ব ঋকের ব্যাখ্যায় 'জলমধ্যে' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল; সপ্তম ঋকের ব্যাখ্যায় 'সমুদ্র-তুল্য আকাশ মধ্যে' বাক্য পাওয়া গেল। তবেই বুঝা যাইতেছে,—সে সলিল, সলিল নহে; উহা সমুদ্রতুল্য নীহারিকা-পরিব্যাপ্ত অন্তরীক্ষ। এই সলিল বা জলের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ না হওয়ায় অনেক স্থলে মূল বিষয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেদে, উপনিষদে, পুরাণে,

---

* এই সূক্তে 'অদিতি', 'দক্ষ', 'উত্তানপদ', 'দেব' প্রভৃতি শব্দে যথাক্রমে 'পৃথিবী', 'জল', 'শক্তি' বা 'তেজ' এবং 'গ্রহ-নক্ষত্র' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিলাম। ঋগ্বেদে একই শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। কোন্ স্থানের কোন্ অর্থ প্রকৃত, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে অর্থোৎপত্তি বিষয়ে গোল বাধিয়া যায়। ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দ কত অর্থে ব্যবহৃত, আমরা এই খণ্ডের ২৬শ-২৭শ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। 'অদিতি', 'দক্ষ' প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও সেইরূপ নানা অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য সূক্তের চতুর্থ ঋকে লিখিত আছে,—"অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতি পরি।" ইহার অর্থ-নির্ণয় সহজসাধ্য নহে। ঐ অংশের নিরুক্তে যাস্ক লিখিয়াছেন,—"আদিত্যো দক্ষ ইত্যাহুরাদিত্যমধ্যে চ স্তুতোঽদিতির্দাক্ষায়ণী। অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরীতি চ তৎ কথমুপপদ্যেত। সমানজন্মানৌ স্যাতামিত্যপি বা দেবধর্ম্মেণেতরেতরজন্মানৌ স্যাতামিতরেতরপ্রকৃতী। অগ্নিরপ্যদিতিরুচ্যতে। তস্যৈষা ভবতি।" যাস্ক সংশয়াম্বিত হইয়া দেবধর্ম্মানুসারে তাঁহাদের জন্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরিশেষে অদিতিকে অগ্নি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উপমায় যায়া দক্ষ ও অদিতির উৎপত্তির তাৎপর্য্যাবধারণ হইতে পারে। যেমন—বৃক্ষ হইতে বীজ ও বীজ হইতে বৃক্ষ। অর্থাৎ অদিতি ও দক্ষ উভয়েই আদি অবস্থা। আদি অবস্থায় কোন্ পদার্থ হইতে কোন্ পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যেমন, কেহ বলিয়াছেন—জল আদি, কেহ বলিয়াছেন—অগ্নি আদি, কেহ বলিয়াছেন—বায়ু আদি। ইত্যাদি।

সংহিতায় অনেক স্থলে 'অপ্' শব্দের প্রয়োগ আছে। পৃথিবী এবং দেবতা বা গ্রহাদি 'অপ্' হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন,—বহু স্থানে এতদুক্তি দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে, যথা,—

"বিশ্বা হি বো নমস্যানি বন্দ্যা নামানি দেবা উত যজ্ঞিয়ানি বঃ।
যে স্থ জাতা অদিতেরদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হবং॥"

দশম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক।

অনুবাদক অর্থ করিলেন,—"হে দেবতাগণ! তোমাদিগের সকল নামই নমস্কার করিবার যোগ্য, বন্দনীয় এবং যজ্ঞে উচ্চারণ-যোগ্য। যাঁহারা অদিতির গর্ভে জন্মিয়াছেন, কিংবা জলে কিংবা পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলে আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন।" এখানে 'অপ্' শব্দে 'জল' অর্থ পরিগৃহীত হইল। কিন্তু আর এক স্থলে (প্রথম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্যধিক শততম সূক্তের একাদশ ঋকে) অনুবাদক 'অপ্' শব্দে 'জল' অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'অন্তরীক্ষ' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। সেই ঋক ও তাহার অনুবাদ; যথা,—

"যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশস্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বং॥"

অনুবাদ,—"যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ, তাঁহারা নিজ মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন।" যদিও এই অনুবাদের অর্থানুভূতি দুঃসাধ্য, তথাপি 'অপ্' শব্দে অন্তরীক্ষ অর্থ গৃহীত হইয়াছে, বুঝা যায়। এখন, 'অপ' কি, তাহাই বিচার্য। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান যাহাকে 'নীহারিকা' বলিতেছেন, তাঁহাদের মতে যাহা 'ইথার' নামে অভিহিত হইতেছে, আমরা বলি—ঐ সকল স্থলে তাহাই সংস্কৃত ভাষায় 'অপ্' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। নীহারিকা ও ইথার—জলের বা তেজের পূর্ব্বাবস্থা। প্রোক্ত 'অপ্'—সেই অবস্থা। বিশ্ব সর্ব্বপ্রথমে 'অপ্' পূর্ণ ছিল; 'অপ্' হইতে অগ্নি বল, জল বল, গ্রহ-নক্ষত্রাদি যাহা কিছু বল,—সকলই উৎপন্ন হয়, শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। "আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্ (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২১ম সূক্ত, সপ্তম ঋক)। অনুবাদক অর্থ করিতেছেন—'ভূরি প্রমাণ জল সমস্ত বিশ্ব-ভুবন আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। তাহা গর্ভধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল।' অন্যত্র—"যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম।" (ঋগ্বেদ, ১০।১২১।৮) অনুবাদক অর্থ করিয়াছেন,—'যখন জলগণ বলধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তখন যিনি নিজ মহিমা দ্বারা সেই জলের উপরে সর্ব্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি।' এই দুই স্থলেই 'অপ্' শব্দে 'জল' অর্থ নিষ্পন্ন হওয়ায় সেই সমস্যাই রহিয়া গেল। এইরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নবম সূক্ত 'অপ্' সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও অনুবাদে তাহা 'জল' সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। যাহা হউক, আরও দেখা যাউক, 'অপ' শব্দ কোথায় কি ভাবে ব্যবহৃত। অথর্ব্ব-বেদেও (৪।২।৬) 'অপ্' হইতে বিশ্বের উৎপত্তি-তত্ত্ব দৃষ্ট হয়। যথা,—"আপোহগ্রে বিশ্বমাবন্ গর্ভং দধানা।" শতপথ ব্রাহ্মণে,—"আপো হ বৈ ইদমগ্রে" (১১।১।৬); "সোঽহপোঽসৃজত বাচ এব লোকাদ্বাগেবাস্য সাঽসৃজত সা ইদং সর্ব্বমাপ্নোদ্ যদিদং কিঞ্চ। যদাপ্নোৎ তস্মাদাপঃ যদবৃণৎ তস্মাদ্বাঃ।" (১১।৯)। অর্থাৎ,—সৃষ্টির আদিতে কেবল 'অপ্' ছিল। তাঁহার বাক

হইতে 'অপ্' সৃষ্ট হয়। সেই 'অপ্' দ্বারা বিশ্ব সমাচ্ছন্ন ছিল। তদ্দ্বারা বিশ্ব সমাচ্ছন্ন ছিল বলিয়াই তাহার নাম 'অপ্'। আবার তৎকর্তৃক জগৎ আচ্ছন্ন বলিয়াই তাহার নাম—'ভা' বা 'দীপ্তি'। এস্থলে 'অপের' মধ্যে জ্যোতির বা দীপ্তির পরিচয় পাওয়া গেল। নীহারিকার যে বর্ণনা পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সহিত এই জ্যোতিষ্মান্ সর্ব্বব্যাপী 'অপের' সাদৃশ্য দেখা যায় না কি? জল ও অগ্নির আদি অবস্থা—'অপ্'; আর সৃষ্টি-প্রসঙ্গে সেই অর্থেই উহা ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিলে কোনই তর্ক উঠিতে পারে না। যে 'অপ্' দ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ছিল, সে 'অপ্' জলের আদি অবস্থা। আধুনিক পণ্ডিতগণ 'অপের' অর্থ 'জল' নিষ্পন্ন করিয়া সংশয় ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছেন বটে; কিন্তু পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ অনেকেই এবম্বিধ অর্থ-নিষ্পত্তি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। মনু বলিয়াছেন,—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥"

কুল্লূক ভট্ট এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"স পরমাত্মা নানাবিধাঃ প্রজাঃ সিসৃক্ষুরভিধ্যায় আপো জায়ন্তামিত্যভিধ্যানমাত্রেণ অপ এব সসর্জ্জ।...আদৌ স্বকার্য্যাভূমিব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাক্ অপাং সৃষ্টিশ্চেয়ং মহদহঙ্কার তন্মাত্রক্রমেণ বোদ্ধব্যা, মহাভূতাদি বাক্যমিতি পুরাভিধানাৎ অনন্তরমপি মহদাদিসৃষ্টেরপেক্ষ্যমাণত্বাৎ। তাস্বপ্সু বীজং শক্তিরূপং আরোপিতবান্।" কুল্লূক ভট্ট টীকায় 'অপ্' শব্দ পরিবর্তন বা পরিবর্জ্জন করেন নাই; কিন্তু বঙ্গানুবাদে পণ্ডিতগণ 'জল' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, অধুনা 'জল' বলিতে যে সামগ্রীকে বুঝিয়া থাকি; আদিভূত 'অপ্' তাহা হইতে কিছু স্বতন্ত্র সামগ্রী ছিল বলিয়াই উপলব্ধি হয়। বুঝিতে পারি,—প্রাচীনগণ প্রোক্ত স্থলে যাহাকে 'অপ্' বলিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য-মতে তাহাই 'নেবিউলা' বা নীহারিকা সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দ্বিসপ্ততিতম সূক্তের আলোচনা উপলক্ষে যে 'সলিল' শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহাও ঐ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ঊনত্রিংশত্যধিক শততম সূক্তে "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস" প্রভৃতি বাক্যে একমাত্র তাঁহারই নিশ্বাস-প্রশ্বাস-রূপ বায়ু প্রবহমান ছিল, আর একমাত্র তিনিই পরমাত্মা বিদ্যমান ছিলেন,—এইরূপ দেখিয়াছি। যদি নীহারিকা বলিতে চাও, সেই বায়ুই নীহারিকা। ভাষাভেদে কালভেদে কেবল নামের ভেদ; নচেৎ, কল্পিত বা বাক্ত সামগ্রী উভয়ই এক।

শাস্ত্র তত্ত্বের আলোচনায় আরও উপলব্ধি হয়,—অপ্ বা সলিল বা নীহারিকা যে নামেই অভিহিত করা যাউক, তৎসমাচ্ছন্ন ব্যোম বা আকাশ ব্রহ্মণস্পতি কর্তৃক আলোড়িত হওয়ায়, তাহা হইতে কর্ম্মকারের ভস্ত্রা-বিনিঃসৃত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন, সেই জ্যোতিষ্ক-সমূহ যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বিঘূর্ণিত হইয়াছিল, একটী অপরটীকে বেষ্টন করিয়া সঞ্চালিত হইতেছিল,—তদ্বিষয়ে কি তথ্য অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, দেখা যাউক। এ বিষয়ে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্ ও

গ্রহাদির অবস্থান।

তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে,—রথচক্রের কীল বা খুঁটির ন্যায় সূর্য্য অবস্থিত থাকিয়া গ্রহগণকে আকর্ষণ দ্বারা স্ব স্ব স্থানে বিঘূর্ণিত করাইতেছেন—বুঝা যাইবে। ঋগ্বেদের সেই ঋকটী ও তাহার বঙ্গানুবাদ; যথা—

"তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্।
আণিং ন রথ্যমমৃতাধিতস্থুরিহ ব্রবীতু য উ তচ্চিকেতৎ॥"

অর্থাৎ,—"স্বর্গাদি তিন দ্যুলোক আছে, তাহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় দ্যুলোক সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, আর তৃতীয় দ্যুলোক যমলোকে প্রেত-পুরুষ সকলকে ধারণ করে। চন্দ্র-নক্ষত্রাদি সমুদায় জ্যোতিঃ-পদার্থ সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; যেমন অক্ষ-ছিদ্রে নিবেশিত কীলবিশেষ আশ্রয় করিয়া রথ স্থিতি করে। যে মনুষ্য সূর্য্যকে জানে, সে এ বিষয় বলুক অর্থাৎ সূর্য্যের মহিমা কেহই বর্ণন করিতে পারে না।" এই ঋকে যে 'আণি' শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ,—"রথাঙ্গকিঃ অক্ষাছিদ্রপ্রান্তঃ কীলবিশেষ আণিরিত্যুচ্যতে।" নীহারিকা-বাদের আলোচনায় দেখিতে পাই,—সূর্য্য অচঞ্চল নহেন; ঋগ্বেদের পূর্ব্বোক্ত সূক্তের (প্রথম মণ্ডলের পঞ্চত্রিংশ সূক্তের) নবম ঋকে তাহাও পরিব্যক্ত আছে। যথা—

"হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষণিরুভে দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীয়তে।
অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্য্যমভি কৃষ্ণেন রজসা দ্যামৃণোতি॥"

অর্থাৎ,—'বহুদূর-দর্শনক্ষম হিরণ্যপাণি সবিতা দেব দ্যুলোক ভূলোক উভয়ের মধ্যে গমন করেন, রোগাদির বাধা নিরাকরণ করেন; সূর্য্যকে ভ্রমণ করান এবং অন্ধকার-নিবারক আলোক দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আকাশকে ব্যাপ্ত করেন।' সূর্য্যের সহিত পৃথিব্যাদি গ্রহগণ সকলেই যে সর্ব্বথা সম্বন্ধযুক্ত, প্রথম মণ্ডলের ষষ্ঠাধিক শততম সূক্তের চতুর্থ ঋকে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের সেই ঋকটী এই,—

"অয়ং দেবানামপসামপস্তমো যো জজান রোদসী বিশ্বশম্ভুবা।
বি যো মমে রজসী সুক্রতূয়য়াজরেভিঃ স্কম্ভনেভিঃ সমানৃচে॥"

'তিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি পৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়া প্রাণিগণের সুখ বিধান করিয়াছেন। তিনি পৃথিব্যাদি গ্রহদিগকে দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া সকলেরই মধ্যে গতির বিধান করিয়া দিয়াছেন।' এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই না কি,—সেই নীহারিকা, সেই বিক্ষোভ, সেই সূর্য্যের ও গ্রহগণের উৎপত্তি, সেই আকর্ষণ সেই বিঘূর্ণন,—সকল তত্ত্বই শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে? সূর্য্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, গ্রহগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে—এই সৌরকেন্দ্রিক মত—বেদে, পুরাণে, সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান্। নেবিউলাই বল, নীহারিকাই বল, অপই বল,—যে নামেই অভিহিত কর, কোনও এক আদি-অবস্থা হইতে নক্ষত্র-সমূহ যে উদ্ভূত হইয়াছে, অস্মদ্দেশের জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। বৃহৎসংহিতার 'কেতুচার' অধ্যায়ে "তারাপুঞ্জনিকাশা" শব্দে নীহারিকার কথাই মনে আসে না কি? বৃহৎসংহিতা হইতে এতৎসংক্রান্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"তারাপুঞ্জনিকাশা গণকা নাম প্রজাপতেরষ্টৌ। দ্বে চ শতে চতুরধিকে চতুরস্রা ব্রহ্মসন্তানাঃ॥"

নীহারিকা নানা আকারে অবস্থিত, নীহারিকা নানা দিকে নানা ভাবে বিরাজমান, এবং তাহাদের সংখ্যা-নির্ণয় বিষয়ে আবহমান কাল হইতে মতান্তর চলিয়াছে। বৃহৎসংহিতার অন্তর্গত আদিত্যাচার, রাহুচার, ভৌমাচার, বুধচার, বৃহস্পতিচার, শুক্রচার, কেতুচার প্রভৃতি অধ্যায় পাঠ করিলে এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ফলতঃ, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, 'নেবিউলার থিওরির' অনেক তত্ত্বই যে শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিবর্ত্তবাদ—'ইভলিউশন থিওরি'।

এক হইতে অন্যের উৎপত্তি অর্থাৎ একের বিকারে অন্যের উদ্ভব—ইহাই বিবর্ত্তবাদ বা 'ইভলিউশন থিওরি'। শাস্ত্র-গ্রন্থে এ তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিবর্ণিত আছে। ক্রম-বিকাশ যে সৃষ্টির একটা স্তর, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নীহারিকা-বাদ-তত্ত্বের আলোচনায় ঋগ্বেদের যে সকল সূক্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেও এক হইতে অন্যের উৎপত্তির প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। ক্রম-বিকাশ ভিন্ন তাহাকেই বা আর কি বলিতে পারি? দশম মণ্ডলের দ্বিসপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকে অবিদ্যমান্ হইতে (অর্থাৎ সৃষ্টির আদিভূত নীহারিকা, ইথার, অপ্, সলিল বা যে অবস্থাই বলা যাউক) যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি উৎপন্ন হওয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায়। উহা কি? উহাও এক প্রকার বিবর্ত্তন বা ক্রম-বিকাশ। এই ভাবের বিবর্ত্তন বা ক্রম-বিকাশের বিষয় অনুসন্ধান করিতে অধিক আয়াসের আবশ্যক হয় না। বেদের, উপনিষদের, দর্শনের ও পুরাণের অনেক স্থলেই এতদ্বিষয় বিশদভাবে পরিবর্ণিত আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দ্বিসপ্ততিতম সূক্তে যাহা দেখিয়াছি, (এই গ্রন্থের ১০১ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তৈত্তিরীয় উপনিষদে তদনুরূপ উক্তিই দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয়োপনিষদের 'ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে' দৃষ্ট হয়,—

শাস্ত্রে বিবর্ত্ত-বাদ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেবশিরঃ। অয়ংদক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা।"

অর্থাৎ—'সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ ইত্যাদি ক্রমে উৎপন্ন হয়।' একের বিকারে অন্যের উৎপত্তির আভাষ এখানেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাংখ্য-দর্শনে এই বিবর্ত্তবাদ-তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বিশদীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে যে বিকৃতি ঘটে, তাহাই সৃষ্টি। দৃষ্টান্তস্থলে সাংখ্যকারগণ বলেন,—'তিল হইতে যেমন তৈল হয়, দুগ্ধ হইতে যেমন দধি, মাখন, ছানা, ঘৃত, ক্ষীর প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি হইতে সেইরূপ সংসার উৎপন্ন হইয়াছে।' প্রকৃতি হইতে এই স্থূল বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে

'সাংখ্য প্রবচনের' দুই একটী সূত্র উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ম্, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল ভূতানি।" অর্থাৎ,—সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল ভূত উৎপন্ন হয়। সাংখ্যকারিকায় (তৃতীয় সূত্রে আছে),—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতি পুরুষঃ॥"

অর্থাৎ,—'মূল প্রকৃতি, মহদাদি সাত প্রকার প্রকৃতি-বিকৃতি ও ষোল প্রকার বিকার এবং প্রকৃতি-বিকৃতির অতীত পুরুষ,—ইহা হইতে সৃষ্টি।' প্রকৃতি হইতেই সকল উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রকৃতিই সকল উৎপন্ন করেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রকৃতি হইয়াছে,—'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' সাংখ্য-প্রসঙ্গে "প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ" প্রভৃতি বাক্যে তাহাই বুঝা যায়। 'সাংখ্য-প্রবচনে' প্রকৃতিকে 'মূলে মূলাভাবাদমূলং' অর্থাৎ প্রকৃতিই মূল বা আদি-কারণ, প্রকৃতির মূল আর কিছুই নাই,—এইরূপ লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-ভিক্ষু "প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রম্"—প্রকৃতিকে মূল-কারণের সংজ্ঞা-মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতির ভাব, অবস্থা ও প্রকৃতি বিষয়ে 'সাংখ্যকারিকা' হইতে আরও তিনটী সূত্র উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে বিষয়টী বিশদ হইয়া আসিবে। যথা,—

"সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ।
মহদাদি তচ্চ কার্য্যং প্রকৃতিস্বরূপং বিরূপঞ্চ॥ ৮॥
ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥ ১১॥
প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদগণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥" ২২॥

অর্থাৎ,—'প্রকৃতির কার্য্য সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে মূল প্রকৃতি সূক্ষ্ম চক্ষুর অগোচর বলিয়া প্রতীত হয় এবং মহদাদি কার্য্য-সমূহ প্রকৃতির স্বরূপ ও বিরূপ অবস্থা বলিয়া বুঝা যায়। মূল বা প্রধান প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণাত্মিকা। অবিবেকী বিষয়, সামান্য অচেতন এবং প্রসব-ধর্ম্মী অর্থাৎ স্বরূপ-বিরূপ সমুৎপাদক। পুরুষ বা আত্মা তাহার বিপরীত-ভাবাপন্ন। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে ষোড়শ গণ অর্থাৎ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) এবং পঞ্চ তন্মাত্র (অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) এবং সেই ষোড়শ গণের শেষোক্ত পাঁচ গণ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) হইতে পঞ্চ ভূত (অর্থাৎ তেজ, জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ) উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই মূল তত্ত্ব। তার পর পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয়ে আর আর স্থূল সামগ্রী যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই ক্রমবিকাশ।' সাংখ্যের এই প্রকৃতি-তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া পুরাণে যে সৃষ্টি-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিবর্ত্ত-বাদ বা ক্রমবিকাশ-বাদ বিশেষ পরিস্ফুট। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে

দশম অধ্যায়ে সৃষ্টি-সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"এ বিশ্ব একণে যাহা, পূর্ব্বেও তাহাই ছিল, পরেও তাহাই হইবে। * এই বিশ্বের সৃষ্টি নয় প্রকার। তদ্ভিন্ন প্রাকৃত এবং বৈকৃত এই উভয়াত্মক যে সৃষ্টি আছে, তাহা দশম।.........যে নয় প্রকার সৃষ্টির কথা বলিলাম, তাহা এই;—মহত্তের সৃষ্টি প্রথম। আত্ম-স্বরূপ ভগবানের সকাশ হইতে যে গুণ-সমূহের বৈষম্য হয়, তাহাকে মহৎ বলে। অহঙ্কার সৃষ্টি—দ্বিতীয়; যাহাতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, তাহার নাম—অহঙ্কার। পঞ্চ-তন্মাত্র-রূপ ভূত-সূক্ষ্মের উদ্ভব—তৃতীয়; ইহা দ্রব্য শক্তিমান্, ইহাই মহাভূতের উৎপাদক। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি—চতুর্থ। বৈকারিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের এবং মনের সৃষ্টি—পঞ্চম সৃষ্টি। পঞ্চ-বৃত্তি-স্বরূপা অবিদ্যার সৃষ্টি—ষষ্ঠ। ইহাতেই জীবগণের অবুদ্ধি অর্থাৎ আবরণ-বিক্ষেপ হইয়া থাকে। উল্লিখিত ছয় প্রকার সৃষ্টিকে প্রাকৃত সৃষ্টি বলা যায়।" নয় প্রকার সৃষ্টির মধ্যে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রাকৃত সৃষ্টি ভিন্ন অবশিষ্ট তিন প্রকার সৃষ্টির নাম—বৈকারিক সৃষ্টি। বৈকারিক সৃষ্টির মধ্যে আবার নানা স্তর আছে। "স্থাবর সৃষ্টি—সপ্তম সৃষ্টি। ইহা অন্যান্য প্রকার সৃষ্টির প্রথমে হইয়াছিল; এজন্য ইহাকে মুখ্য সৃষ্টি বলে। ঐ স্থাবর বহুবিধ। তন্মধ্যে প্রথম বনস্পতি, দ্বিতীয় ওষধি, তৃতীয় লতা, চতুর্থ ত্বক্‌সার, পঞ্চম বিরুধ, ষষ্ঠ বৃক্ষ। ঐ সকল স্থাবরের লক্ষণ এই,—তাহারা আহারার্থ ঊর্দ্ধে সঞ্চরণশীল এবং তাহাদের অব্যক্ত চৈতন্য আছে। † তাহাদের কেবল অন্তরে স্পর্শ-জ্ঞান আছে। অবান্তর বিপরিণামাদি ভেদে তাহাদের বিবিধ ভেদ হইয়া থাকে। তির্য্যগ্‌যোনিদিগের সৃষ্টি—অষ্টম। ইহা অষ্টাবিংশতি প্রকার। ইহারা ভবিষ্যৎ জ্ঞান-শূন্য, বহুল তমোগুণ-বিশিষ্ট, দীর্ঘানুসন্ধান-শূন্য, কেবল আহারাদি কার্য্যে তৎপর। তাহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা কেবল অভিলষিত বস্তু জানিতে পারে। অষ্টাবিংশতি তির্য্যগ্‌-যোনি এই,—গো, ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসার, শূকর, রুরু (মৃগবিশেষ), মেষ ও উষ্ট্র। এই নয় প্রকার পশুর পায়ে দুইটী করিয়া খুর আছে; এই জন্য ইহাদিগকে দ্বিশফ কহে। আর গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর, শরভ এবং চমরী, এই সকল পশু একশফ; কারণ, ইহাদের পদে একখানি খুর আছে। কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক, শল্লক, সিংহ, কপি, গজ, কচ্ছপ, গোধা—এই

* পূর্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি, সভ্য-অসভ্য অনেক জাতি পৃথিবীর এবং সৃষ্টি প্রবাহের চির-বিদ্যমানতার মত পোষণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধগণ পৃথিবীর অনন্তকাল বিদ্যমানতার বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (এই খণ্ডের ৪৬৭ পৃষ্ঠা)। এখানে সেই বিষয় স্পষ্ট করিয়া উক্ত হয় নাই কি? শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমাদের উক্তির সার্থকতা আপনিই প্রতিপন্ন হইবে। শ্লোকটী এই,—"যথেদানীং তথাগ্রে চ পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্।"

† জড়-পদার্থ ও উদ্ভিদাদির চেতনা-শক্তি আছে, এই তথ্য প্রকাশ করিয়া ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য-দেশেও তাঁহার জয়-নিনাদ শুনা যাইতেছে। কিন্তু এ তত্ত্ব স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অবগত ছিল এবং শাস্ত্রাদিতে ইহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটী—"উৎস্রোতসস্তমঃপ্রায়া অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন—"তেষাং স্থাবরাণাং লক্ষণমাহ। উৎ ঊর্দ্ধং স্রোত আহারসঞ্চারো যেষাম্। তমঃপ্রায়া অব্যক্তচৈতন্যাঃ। অন্তঃস্পর্শাঃ স্পর্শমাত্রজ্ঞানাঃ [illegible] বহিঃ বিশেষিণঃ [illegible]।"

দ্বাদশ প্রকার জন্তু পঞ্চনখ। আর মকরাদি জলচর এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক্ প্রভৃতি জন্তু খেচর। অনন্তর মনুষ্যদিগের সৃষ্টি নবম।" * এই সৃষ্টির স্তর-পর্য্যায় আলোচনা করিলে প্রাকৃত সৃষ্টির ছয়টী স্তর দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইবে বটে; কিন্তু শেষোক্ত তিনটী স্তরে ক্রমবিকাশ-বাদ পূর্ণ প্রকটিত। সপ্তম সৃষ্টি—স্থাবর, ওষধি, লতা, ত্বক্‌সার, বিরুধ, বৃক্ষ। বর্ণনায় দেখিলাম—ইহারা অব্যক্ত-চৈতন্য-সম্পন্ন। অর্থাৎ, ইহাদের মধ্যে অব্যক্ত চৈতন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার পর দেখিলাম,—অষ্টম সৃষ্টি তির্য্যগ্‌যোনি। যথা,—গো, ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসার প্রভৃতি। ইহাদের ভবিষ্যৎ-জ্ঞান নাই; অর্থাৎ,—ইহারা ব্যক্ত চৈতন্য-সম্পন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের স্ফুরণ হয় নাই। অতঃপর, নবম সৃষ্টিতে মনুষ্য; মনুষ্য ব্যক্ত-চৈতন্য-সম্পন্ন, অপিচ ভবিষ্যৎ-জ্ঞান-বিশিষ্ট। তবেই দেখা গেল,—স্থাবরের মধ্য দিয়া যে অব্যক্ত জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল, তির্য্যকে তাহার ক্রমবিকাশে ব্যক্ত জ্ঞান এবং মনুষ্যে তাহার অত্যধিক পরিপুষ্টি লক্ষিত হইল। ইহাই ক্রমবিকাশ-বাদ নহে কি?

দশাবতার-প্রসঙ্গে।

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি দশ অবতারকে কেহ কেহ ক্রম-বিকাশ-বাদের স্তর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—'উচ্চ হইতে উচ্চতর সৃষ্টির দৃষ্টান্ত, ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিশদ আর কি হইতে পারে! প্রথমে জলচর জীব মীন, দ্বিতীয়ে উভচর জীব কূর্ম্ম, তৃতীয়ে লোমযুক্ত বৃহৎ-বপু পশু-শরীরধারী বরাহ, চতুর্থে অর্দ্ধ-পশু ও অর্দ্ধ-নরাকৃতি—আধসিংহ আধ-নরাকার—নারসিংহ, পঞ্চমে অপরিস্ফুট মনুষ্য—খর্ব্বাকৃতি বামন, ষষ্ঠে বলবীর্য্য সম্পন্ন নরদেহধারী পরশুরাম, সপ্তমে বহুবুদ্ধিধারী কৃষক বলরাম,—ক্রম-বিকাশের চরম দৃষ্টান্ত নহে কি?' অবতার তত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অন্যরূপ হইলেও, পাশ্চাত্য মতাবলম্বিগণের তর্ক-জাল ছিন্ন করিবার জন্য ক্রমবিকাশ-বাদ প্রসঙ্গে এ সকল দৃষ্টান্ত উত্থাপিত হয়। আর এ সকলের সহিত তুলনা করিলে, ডারউইন-প্রমুখ বিবর্ত্তনবাদিগণ যে কোনই নূতন কথা বলেন নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। 'ডিসেণ্ট অব ম্যান্' গ্রন্থে ডারউইন লিখিয়া গিয়াছেন,—'প্রথম মৎস্যবৎ জীব, পরে সরীসৃপ-জাতীয় উভচর জীব, তৎপরে স্তন্যপায়ী 'মার্সুপিয়াল' জন্তু, তৎপরে 'কোয়াড্রুমানা' বা বানরাদি জাতীয় জন্তু, তৎপরে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে।' অর্থাৎ,—তাঁহার মতে, প্রথম মৎস্যবৎ প্রাণী উৎপন্ন হয়; তাহার ক্রমবিকাশে সরীসৃপ-জাতীয় উভচর জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া শূকরবৎ স্তন্যপায়ী পশু, তাহার ক্রমোন্নতিতে বানরাদি জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। তাহারই পরিণতিতে বা ক্রমোৎকর্ষে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। যে জন্তু হইতে মানবের উদ্ভব হইয়াছে, ডারউইনের মতে, সে জন্তু লোমশ, চতুষ্পদ ও লাঙ্গুল-বিশিষ্ট। তাহাদের কর্ণ

---

* এই সৃষ্টি-পর্য্যায়ের অনুধাবন করিলে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্দ্দিষ্ট স্তরসমূহে যে প্রাণি-পর্য্যায়ের আবির্ভাবের বিষয় জানিতে পারা যায়, এতদ্বিবরণের সহিত তদ্বিবরণের সাদৃশ্যের কথা মনে হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে, সাদৃশ্য বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ভূতত্ত্ব-নির্দ্দিষ্ট মেসোজোয়িক এবং কেইনোজোয়িক কালের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্য্যায়ের যে সৃষ্টি-স্তরের পরিচয় পাই, মিলাইয়া দেখিলে এতদুভয়ে অনেকাংশের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ৮৫০-৮৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোণাকৃতি এবং তাহারা প্রাচীন মহাদেশের বৃক্ষাদিতে বিচরণ করিত।* দশাবতারের বর্ণনায় ক্রম-বিকাশের যে ভাব পরিব্যক্ত হয়, ডারউইনের মত তাহারই অনুসারী নহে কি? ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আপন-আপন মত-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে তাহার সকল বিষয়ের সাদৃশ্য-প্রদর্শন সম্ভবপর নহে। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ মাত্র করিয়াই নিবৃত্ত হইলাম।

পরমাণু-বাদ—'র‍্যাটমিক থিওরি'।

পরমাণু-সমূহের সংযোগে এই জীব-জন্তু-উদ্ভিদাদি-পরিপূর্ণ পৃথিবী যে সংগঠিত হইয়াছে, হিন্দু-শাস্ত্রে যে কত কাল হইতে তাহার আলোচনা চলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সাংখ্য-দর্শন এবং বৈশেষিক-দর্শন এতদ্বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। সৃষ্টির মূলে যে 'তন্মাত্র' সে 'তন্মাত্র' কি? সেই 'তন্মাত্রকে' পরমাণু বলা যায় না কি? সাংখ্য-দর্শনের আলোচনায় অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত তন্মাত্রকেই পরমাণু বলিয়া অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।† ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম—এই পঞ্চ-ভূতের প্রত্যেক ভূত—যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহাই তন্মাত্র। তন্মাত্র—সূক্ষ্মাবস্থা। "ইমান্যেব সূক্ষ্মভূতানি তন্মাত্রাণ্যপঞ্চীকৃতানি চোচ্যন্তে। এতেভ্যঃ সূক্ষ্মশরীরাণি স্থূলভূতানি চোৎপদ্যন্তে।" ক্ষিত্যপ্‌তেজাদি পঞ্চভূত—পঞ্চ-তন্মাত্র বা পরমাণু হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, সাংখ্য-দর্শনানুসারে পৃথিব্যাদির স্বরূপ-তত্ত্ব আলোচনা করিলেও তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। 'পঞ্চ-তন্মাত্র আকাশাদি পঞ্চ-ভূতের কারণ। তন্মধ্যে আকাশের একমাত্র কারণ—শব্দ-তন্মাত্র; বায়ুর সামান্য কারণ শব্দ-তন্মাত্র এবং অসাধারণ কারণ—স্পর্শ-তন্মাত্র; তেজের সামান্য কারণ—শব্দ-স্পর্শ-তন্মাত্র এবং অসাধারণ কারণ—রূপ-তন্মাত্র; জলের সামান্য কারণ—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-তন্মাত্র এবং অসাধারণ কারণ রস-তন্মাত্র। পৃথিবীর সামান্য কারণ—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-তন্মাত্র এবং অসাধারণ কারণ—গন্ধ-তন্মাত্র।' ইহা যে পরমাণু-বাদেরই কথা, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।‡ ন্যায়-দর্শন এবং বৈশেষিক দর্শন সৎ বা পরমাণুর মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তবে, সাংখ্যের সহিত তাহাদের পার্থক্য।

শাস্ত্রে পরমাণু-বাদ।

---

* ডারউইনের 'ডিসেণ্ট অব ম্যান' গ্রন্থ হইতে এতৎসংক্রান্ত কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—"We then learn that man is descended from a hairy quadruped furnished with a tail and pointed ears, probably arboreal in its habits and an inhabitant of the old world * * * This quadrumana with all the higher mammals are probably derived from an ancient *marsupial animal* and this through a long line of diversified forms either from some *reptile-like* or some *amphibian-like creature* and this again from some *fish-like animal*"—*Vide*, Darwin, *Descent of Man*, Vol. II.

† রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর অনুবাদক কোলব্রুক লিখিয়া গিয়াছেন,—"Five subtile particles, rudiments or *atoms* denominated *tanmatra*."

‡ এ বিষয়ে কোলব্রুক যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারও কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে বিষয়টী স্পষ্ট বুঝা যাইবে। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের বিশেষ সাদৃশ্যের বিষয় কোলব্রুকের ভাষায় উপলব্ধি করুন; যথা,—Five elements, produced from the five elementary particles or rudiments. 1st, A diffused, etherial fluid (*akasa*), occupying space:

এই যে, তাঁহারা বলিয়াছেন,—'সৎ হইতেই অসতের উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ—বিদ্যমান্ পরমাণু হইতে অবিদ্যমান্ বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে।' কিন্তু সাঙ্খ্যকারদিগের মত,—'সৃষ্টিও সৎ; সৃষ্টির মূলও সৎ। পরমাণুও সৎ, পরমাণু-গঠিত ভূত-সমূহও সৎ।' যাহা হউক, মূল পরমাণু বিষয়ে এ সম্বন্ধে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৈশেষিক-দর্শন পরমাণু-বাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, বৈশেষিকের অখণ্ডনীয় মত আজিও পাশ্চাত্য জগৎ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। বৈশেষিক-দর্শনের কয়েকটী মাত্র সূত্রের আলোচনা করিলে কণাদের পরমাণু বাদ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। কণাদের মতে ছয়টী বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়স মুক্তি লাভ হয়। সেই ছয়টী বিষয়—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য। এ সম্বন্ধে বৈশেষিকের সূত্র,—"ধর্ম্ম-বিশেষ প্রসূতাত্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।" পদার্থ-সমূহকে উল্লিখিত ছয় প্রকারে বিভক্ত করিয়া কণাদ তদন্তর্গত এক একটী প্রকারের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দ্রব্য-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি।" অর্থাৎ—গুণ পদার্থ কি কি, কর্ম্ম-পদার্থ কি কি এবং সামান্য-বিশেষ-সমবায় বলিতেই বা কি কি বুঝা যায়, মহর্ষি কণাদ পর পর সূত্রে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বৈশেষিক-দর্শনে দ্রব্য-সম্বন্ধে যাহা আলোচনা আছে, টীকাকারগণ ও ব্যাখ্যাকারগণ তদ্বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে পরমাণু-বাদের মূল্য তথ্য বিশেষরূপ উপলব্ধি হইতে পারিবে। টীকা প্রভৃতির অনুসরণে দ্রব্য-বিষয়ক সূত্রের যে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"দ্রব্য বলিলে ক্ষিতি জল প্রভৃতি নয়টী বস্তু বুঝিবে। দ্রব্য এই নয়টীর অধিকও নহে, ন্যূনও নহে। আত্মা শব্দের অর্থ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা অসংখ্য; পরমাত্মা এক,—পরমাত্মাই ঈশ্বর। আত্মত্ব—জীব ও ঈশ্বর উভয়ের ধর্ম্ম; সেই এক ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া আত্মাকে এক বলিয়া ধরা হইয়াছে। ক্ষিতির পক্ষেও এই কথা; ক্ষিতি অর্থে মৃত্তিকা। মৃত্তিকা তো আর একটী নহে? খণ্ড খণ্ড, স্থূল, বৃহৎ, ঘট, পট—কত

বৈশেষিক দর্শনের আলোচনায়।

it has the property of audibleness, being the vehicle of sound, derived from the sonorous rudiment or etherial atom. 2nd. Air, which is endowed with the properties of audibleness and tangibility, being sensible to hearing and touch; derived from the tangible rudiment of ærial atom. 3rd. Fire, which is invested with properties of audibleness, tangibility and colour; sensible to hearing, touch and sight; derived from the colouring rudiment of igneous atom. 4th. Water, which possesses the properties of audibleness, tangibility, colour and savour; being sensible to hearing, touch, sight and test: derived from savoury rudiment or aqueous atom. 5th. Earth, which unites the properties of audibleness, tangibility, colour, savour and odour; being sensible to hearing, touch, sight, test and smell: derived from the odorous rudiment or terrene atom."—Colebrooke's *Trans. Royal Asiatic Society*, Vol. I.

মৃত্তিকা; কিন্তু তাহার ধর্ম্ম ক্ষিতিত্ব;—ক্ষিতিত্ব এক। সেই এক ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াই ক্ষিতিকেও এক বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাকেই জাতির একত্বে ঐক্য বলে। আধুনিক বিজ্ঞানে জল—যোগজ বলিয়া কথিত;—হাইড্রোজান ও অক্সিজান নামক বাষ্পদ্বয় মিলিত হইয়া জল উৎপাদন করে। সুতরাং এই যোগজ জলকে অতিরিক্ত দ্রব্য বলিতে হইলে, ক্ষিতি প্রভৃতির যোগজ বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম ইত্যাদিকেও ক্ষিতির অন্তর্গত না বলিয়া অতিরিক্ত পদার্থ বলিতে হয়। সুতরাং হাইড্রোজান ও অক্সিজান প্রভৃতিকে মূল পদার্থ বলা উচিত। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য—পৃথিবী জল, বায়ু ও তেজের পরমাণু মূল পদার্থ; যাহা স্থূল, তাহা মূল নহে; পরমাণু দুইটি মিলিত হইলে দ্ব্যণুক হয়; দ্ব্যণুক পর্য্যন্ত অণু সূক্ষ্ম। তিন দ্ব্যণুকের মিলনে ত্রসরেণুর উৎপত্তি হয়। ত্রসরেণু দৃশ্য বা স্থূলের আদ্য অবস্থা। সেই জলীয় দ্ব্যণুকোৎপাদক পরমাণুর মিলন বা ত্রসরেণুর উৎপাদক দ্ব্যণুকের মিলন এক এক প্রকার তেজ ও বায়ুর সাহায্যে হইয়া থাকে। হাইড্রোজান ও অক্সিজান এতদুভয়ের মধ্যে একটিতে জলীয় পরমাণু বা জলীয় দ্ব্যণুকের অসম্মিলিত সমষ্টি এবং একটিতে তেজের সূক্ষ্মাংশ বা বায়ু নিহিত আছে। উভয়ের সম্মিলনে পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক ও দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। অথবা দুটীতেই জলীয় পরমাণু বা দ্ব্যণুকের অসম্মিলিত সমষ্টি আছে; অথবা দুটীতেই তেজের সূক্ষ্মাংশের ও বায়ুর সমাবেশ আছে। পরন্তু একটীর তেজ ও বায়ুর সাহায্যে অপরটীর পরমাণু সম্মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক হয়। দ্ব্যণুক হইলে দ্ব্যণুকের মিলনে ত্রসরেণু হয়; তাহাই ক্রমে স্থূল জল বা দৃশ্য জল সৃষ্টি করে। কিন্তু যাহা জলীয় পরমাণু—যাহার জন্য জলকে মূল দ্রব্য বলা হইয়াছে, তাহা যোগজ নহে; যোগজ পদার্থ পরম সূক্ষ্ম হয় না; অন্ততঃ দুটী অবয়ব তাহাতে থাকিবেই। যাহার অংশ বা অবয়ব বিভাগ নাই, সেই পরম অণু জল যোগজ নহে, ইহা অনুভব করিবে। মৃত্তিকাকে চূর্ণ করিয়া চারিদিকে উড়াইয়া দিলে, তাহার সূক্ষ্ম অংশ সকল ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরম সূক্ষ্ম পরমাণুতে পরিণত হয়। তখন তাহা লোক-লোচনের অগোচর হইয়া অনন্ত পথে অনন্ত বায়ু-স্রোতে ভাসিতে থাকে। তাহাই আবার উপযুক্ত সলিল, তাপ ও বায়ু যোগে সম্মিলিত হইয়া বৃক্ষ-তৃণ ইত্যাদির দীর্ঘ ক্ষীণ দেহ পোষণের উপযোগী হয়। স্থূল জলেরও সংস্কার এবং উৎপত্তি এই রীতিক্রমেই হয় জানিবে। আর হাইড্রোজান এবং অক্সিজান প্রভৃতি মূল পদার্থ বলিয়া যাহা উল্লিখিত, তাহা বস্তুতঃ মূল নহে। ঐ সমস্ত পদার্থ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুরই একের আধিক্যে অপরের ন্যূন ভাবের সমাবেশ মাত্র। অর্থাৎ, অধিক ন্যূন-ভাবে সম্মিলিত ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ুই হাইড্রোজান প্রভৃতি নানা রূপে প্রতিভাত হয়। কেহ কেহ বলেন, যেমন নানা বর্ণের বিবিধ সূত্রে নির্ম্মিত একখানি গালিচা দেখিয়া কেহ বলিলেন, এই গালিচা নির্ম্মাণের উপযোগী সূত্র পাঁচ প্রকার যথা—রক্ত, নীল, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ। অপরে বলিলেন,—তিন প্রকার; যথা—কার্পাস সূত্র, উর্ণা সূত্র এবং শণ সূত্র। এই দুই জন দুই পথে গমন করিলেও এই দুই জনের সিদ্ধান্তই সত্য। সেইরূপ ঋষিগণ যে ভাবে জগতের উপাদান স্থির করিয়াছেন, সে ভাবে তাহাই সত্য; এবং আধুনিক বিজ্ঞানে যে ভাবে জগতের উপাদান স্থিরীকৃত

হইয়াছে, সেইভাবে তাহাই সত্য।' ৭ 'সদকারণবৎ নিত্যম্। তস্য কার্য্যম্ লিঙ্গম্।'—প্রভৃতি সূত্রের ব্যাখ্যায়ও পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—"পৃথিবী প্রভৃতি ভূত সমূহের যাহা পরম অণু, অবিভাজ্য অংশ, তাহা নিত্য। তদপেক্ষা বৃহৎ হইলে, তাহা অনিত্য। পৃথিবীর রূপাদি গুণ-সমষ্টি অগ্নি-সংযোগে পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং অনিত্য। কিন্তু পরমাণু পরিবর্ত্তনশীল নহে; সুতরাং নিত্য। কার্য্যই তাহার অনুমাপক। এই নিত্য সৎ-পদার্থ দৃশ্য নহে। কার্য্য দ্বারা তাহা অনুমান করিতে হয়। এই যে বৃহৎ পৃথিবী, ইহা বৃহৎ অবয়ব-সমূহ হইতে উৎপন্ন। সেই বৃহৎ অবয়ব আবার স্থূল মৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন। সেই মৃৎপিণ্ড পবনবেগে সতত পরিচালিত পরমাণুর ক্রম-সম্মিলনে উৎপন্ন। এই সম্মিলন কর্ত্তা ঈশ্বর। আমাদের সম্মুখে, ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে, নিরন্তর পরমাণু-সমূহ বিচ্ছিন্ন-ভাবে ঘুরিতেছে; কিন্তু কৈ, তাহারা মিলিয়া তো আমাদের দৃষ্টি রোধ করিতেছে না বা বৃহৎ মৃৎপিণ্ড হইয়া আমাদের মস্তকে নিপতিত হইতেছে না? ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরমাণু-সম্মিলন-বিষয়ক প্রযত্ন ফলোন্মুখ হইলে, তবে তাহারা মিলিত হইয়া বৃহৎ হয়; নতুবা হয় না। সুতরাং এই বৃহৎ পৃথিবী রূপ কার্য্য দ্বারা আমরা নিত্য-পরমাণুর ও ঈশ্বরের অনুমান করিতেছি।" * পরমাণুবাদী পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সকল সময় ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিলেও পরমাণুবাদ বিষয়ে তাঁহারা যে কণাদের অনুসারী, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। সূক্ষ্মভাবে বৈশেষিক দর্শন আলোচনা করিলে অনেক অভিনব তথ্য অবগত হওয়া যায়। আলোক এবং উত্তাপের মধ্যে যে পরমাণুর সংযোগ আছে, পরমাণু-সংঘর্ষে ব্যোমপথে যে স্পন্দনের উৎপত্তি হয় এবং সেই স্পন্দনের ফলে বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, বৈশেষিক দর্শনে সে সকল তত্ত্বও বিবৃত আছে।

কোলব্রুক, ম্যাক্সমূলার ও ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কণাদের পরমাণু-বাদ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পরমাণু-বাদ-সংক্রান্ত মতের মৌলিকত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিপন্ন হয়। বৈশেষিক-দর্শনের আলোচনায়, কণাদের অনুসরণে জল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতির সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়া, পরিশেষে কোলব্রুক বলিয়াছেন,—'কণাদের মতে পার্থিব পদার্থ-মাত্রেরই মূলে পরমাণু ও তাহাদের সমবায় দৃষ্ট হয়। পরমাণুর নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদের বিদ্যমানতা এবং সমবায়-তথ্য কণাদ নিম্নলিখিত মতে ব্যক্ত করিয়াছেন,—'সূর্য্য-রশ্মির মধ্যে যে অণু-বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে তাহা ক্ষুদ্রতম। সেই রশ্মি-কণার অস্তিত্ব এবং কার্য্যকারিতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হয়, তদপেক্ষা কোনও ক্ষুদ্র বস্তুর সমবায়ে উহার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই যে ক্ষুদ্র সামগ্রী, তাহারও যখন অস্তিত্ব ও কার্য্যকারিতা উপলব্ধি হয়, তখন তাহাও তদপেক্ষা কোনও সূক্ষ্মতর সামগ্রীর সমবায়ে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, যাহাদের সমবায়ে কোনও পদার্থ সংগঠিত হয়, তাহাদের কোনরূপ আকৃতি থাকিলেই

পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণের মত।

* 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদিত 'বৈশেষিক দর্শন' দ্রষ্টব্য।

কার্য্যকারিতা থাকিবে; এবং কোনও সামগ্রীর কার্য্যকারিতা ও আকৃতি থাকিলেই তাহা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর সামগ্রীর সমবায়ে গঠিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এইরূপে যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশে উপনীত হওয়া যায় অর্থাৎ যাহা আর বিভাগ করা যায় না এবং অন্য কোনও সামগ্রীর সমবায়ে উৎপন্ন নহে, তাহাই পরমাণু। পরমাণু অবিভাজ্য ও নিত্য। দুইটী পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক, তিনটী পরমাণুর যোগে ত্র্যণুক প্রভৃতির উৎপত্তি হইলে, তাহা দৃষ্টি-গোচর হয়।' * অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তৎপ্রণীত 'ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' নামক ভারতীয় দর্শন-সংক্রান্ত গ্রন্থে কণাদের পরমাণু-বাদ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া, তাহার সহিত প্রাচীন গ্রীক-দার্শনিকগণের মতের সামঞ্জস্য দেখিয়া, ঐ মতের উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে প্রথমে সংশয়ান্বিত হইয়াছেন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'পরমাণু-বাদে' কণাদের মৌলিকত্ব অবিসম্বাদিত।' তবে, কণাদের মতের অনুসরণে 'এপিকিউরিয়ান' দার্শনিক-গণ যে আপন-আপন মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই; পরন্তু তিনি দুই ভাবে দুই দিকের মৌলিকত্বের বিষয় প্রচার করিয়া গিয়াছেন। † অধ্যাপক ম্যাক্ডোনেল কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে ঐরূপ সংশয়ের ভাব আদৌ প্রকাশ করেন নাই। ভারতবর্ষ হইতেই যে দার্শনিক মত-সমূহ ইউরোপে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল, তিনি মুক্তকণ্ঠে সেই কথাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ম্যাকডোনেল বলিয়াছেন,—'দার্শনিক-সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই,—প্রাচীন গ্রীসের এবং ভারতের দার্শনিকগণের মতের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। প্রধান প্রধান ইলীয় দার্শনিকগণের মতে,—ঈশ্বর ও বিশ্ব অভিন্ন। পরিদৃশ্যমান্ বহুত্ব অবাস্তব। অনুভূতি ও সত্বা উভয়ই এক। ভারতবর্ষের উপনিষৎ-সমূহে এবং বেদান্তে যে দার্শনিক মত-সমূহ পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই পূর্ব্বোক্ত মত-সমূহের উৎপত্তির হেতু। দার্শনিক এম্পিডোকলসের মতে—'যাহা ছিল না, তাহার উৎপত্তি অসম্ভব; এবং যাহা আছে, তাহার কখনও ধ্বংস নাই।' অর্থাৎ,—সৎ হইতে সতের উৎপত্তি এবং সতের ধ্বংস নাই,—এবম্বিধ সাংখ্য-মতের সহিত তাঁহার মত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। গ্রীস-দেশে কিংবদন্তী আছে,—থেলিস, এম্পিডোক্লস্, আনাক্সাগোরাস, ডেমক্রিটাস এবং অন্যান্য দার্শনিকগণ দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য প্রাচ্য-দেশে গমন করিয়াছিলেন।

---

* দ্ব্যণুক ত্র্যণুক প্রভৃতি বিষয়ে কণাদের মত কোলব্রুক নিম্নলিখিত-ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন,—"Material substances are by Kanad considered to be primarily atoms; and secondarily aggregates. He maintains the eternity of atoms; their existence and aggregation are explained as follows:—The mote which we see in the sunbeam is the smallest perceptible quantity. Being a substance and an effect, it must be composed of what is less than itself; and this likewise is a substance and an effect; for, the component part of a substance that has magnitude must be an effect. This again must be composed of what is smaller; and that smaller thing is atom. It is simple and uncomposed; or else the series would be endless etc."—*Vide* Colebrooke, *Translations, Royal Asiatic Society.*

† *Vide*, Professor Max Muller, *Indian Philosophy*,

ভারতীয় দার্শনিক-গণের চিন্তাস্রোত যে পারসিক-গণের মধ্য দিয়া দিয়া গ্রীসে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বোক্ত দার্শনিকগণের ভারতাগমন-বিষয়ে সত্য তথ্য যাহাই হউক, ভারতের দর্শনের এবং বিজ্ঞানের উপর পীথাগোরাস যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। অধুনা পীথাগোরাসের মত বলিয়া যাহা অভিহিত হয়, সেই সকল ধর্ম্ম-বিষয়ক, দার্শনিক ও গণিত-সংক্রান্ত মত খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল;—সেই সকল মতের সহিত পীথাগোরাসের মতের সাদৃশ্য অত্যধিক। আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ-বাদ, পঞ্চভূত-তত্ত্ব পীথাগোরাস-প্রবর্ত্তিত জ্যামিতির উপপাদ্য, পীথাগোরীয় সম্প্রদায়ের দর্শনের মধ্যে ধর্ম্মের ভাব এবং তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরের সহিত জীবের সান্নিধ্য-লাভ-কল্পনা প্রভৃতি ভারতবর্ষে প্রচলিত দার্শনিক-মত-সমূহের সম্পূর্ণ অনুসারী। পীথাগোরাস পুনর্জন্ম বিষয়ে যে মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-দেশে সে মত আর কেহই প্রকাশ করেন নাই। বিদেশ হইতে ঐ মত গ্রীসে গিয়াছিল বলিয়া গ্রীকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। মিশর হইতে ঐ মত তাঁহাদের প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে; কারণ, প্রাচীন মিশরেও প্রাচীন কালে পুনর্জন্ম-বাদ প্রচারিত ছিল না।" *

সৌরজগৎ-প্রসঙ্গ।

সৌর-জগৎ-তত্ত্বের আলোচনায় অধুনা পাশ্চাত্য-দেশ বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত। তাঁহাদের গবেষণার ফলে নিত্য নূতন গ্রহ-নক্ষত্রাদি আবিষ্কৃত হইতেছে এবং তাঁহারা নানা নূতন তথ্য প্রচার করিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণ সৌর-জগৎ তত্ত্বে যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান রহিয়াছে! সৌর-জগৎ সম্বন্ধে ভারতীয় মনীষিগণ যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এবং বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ-উপপুরাণাদিতে তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। হিন্দুর দৈনন্দিন কর্ম্মে, নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপে সৌরজগতের সহিত তাঁহাদের নিত্য-সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতি অনুসারে পূজা-পদ্ধতির ব্যবস্থা—এদেশে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান আলোচনার চরমোৎকর্ষের ফল। গ্রহগণ কিরূপে পরিচালিত হন, সৌর-জগতের কোথায় কি ভাবে কোন্ গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রাদি অবস্থিত রহিয়াছে, তদ্বিষয়ের অভিজ্ঞতার নিদর্শন কোথায় নাই? প্রতি হিন্দুর নিত্য-ব্যবহার্য্য দৈনিক পঞ্জিকায় গ্রহাদির অবস্থানের এবং গতিবিধির কি প্রকট পরিচয়ই দেখিতে পাই! তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় এবং অনেক বিষয় পুরাণেতিহাসে রূপকের অন্তর্নিবিষ্ট থাকায়, তৎসম্বন্ধে এখন আমাদিগকে অনভিজ্ঞ হইতে হইয়াছে এবং অন্য দেশ তদ্বিষয়ে অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া যশস্বী হইতেছেন। কিন্তু সেগুলি আর্য্য-হিন্দুগণেরও যে পরিচিত না ছিল, তাহা নহে। কেবল নামের বিভিন্নতায় এখন একের সহিত অন্যের সামঞ্জস্য-সাধন কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। দুই একটা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। 'ইউরেনাস' ও 'নেপচুন'

সৌরজগৎ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা।

* *Vide*, Prof. Macdonell's *History of Sanskrit Literature*.

এই দুইটীর কোনও পরিচয় আর্য্য হিন্দুগণ কি পান নাই? ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে 'ইউরেনাস' এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'নেপচুন' আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইউরেনাসকে 'বরুণ' এবং নেপচুনকে 'ইন্দ্র' গ্রহ বলিয়া হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। যদি তর্কের হিসাবে ইন্দ্র ও বরুণ নামক গ্রহদ্বয়কে নেপচুন ও ইউরেনাস না বলা হয়, তাহা হইলে বরুণ ও ইন্দ্র নামক গ্রহদ্বয় এবং অন্যান্য অনেক গ্রহ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর মাত্র অতীত হইল, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন,—'একাধিক সূর্য্য এ বিশ্বে বিরাজমান আছেন।' শাস্ত্র গ্রন্থে কত কাল হইতে একাধিক সূর্য্যের পরিচয় আছে! পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন,—সিরিয়স, ওরিয়ন, ভেগা, পোলারিস্‌, ক্যাপেলা প্রভৃতি এক একটী নক্ষত্র সূর্য্যের ন্যায় বিরাট্‌ আকার-বিশিষ্ট। ঐ সকল নক্ষত্রের ও উহাদের প্রকৃতির বিষয় হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যে সর্ব্বপ্রকারে অবগত ছিলেন, 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত' প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থের আলোচনায় তাহা প্রতীত হয়। সিরিয়সের আয়তন—পরিদৃশ্যমান্‌ সূর্য্যের আয়তন অপেক্ষা দ্বিসহস্রাধিক গুণ বৃহৎ। সে হিসাবে, দুই শত ষাট কোটী পৃথিবী ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতে পারে। এই নক্ষত্রকে আর্য্য-হিন্দুগণ 'মৃগব্যাধ' বা 'লুব্ধক' বলিয়া জানিতেন। এই নক্ষত্র সম্বন্ধে 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে ও তাহার টীকায় এইরূপ লিখিত আছে; যথা,—

"অশীতিভাগৈর্যাম্যায়ামগস্ত্যো মিথুনান্তগঃ। বিংশে চ মিথুনস্যাংশে মৃগব্যাধো ব্যবস্থিতঃ।"

টীকা—"মৃগব্যাধো লুব্ধকো মিথুনরাশের্বিংশতিভাগে স্থিতঃ।" সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মতে,—মৃগব্যাধের অবস্থানের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদিগের নির্দ্দেশিত সিরিয়সের অবস্থানের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অনুভূত হয়। হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নির্দ্দিষ্ট অভিজিৎ নক্ষত্রের সহিত ভেগার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহা একটী শ্যামল জ্যোতিঃ-পিণ্ড বলিয়া অভিহিত। বহু নক্ষত্রের সম্মিলনে ঐ নক্ষত্র-পুঞ্জ সংগঠিত হওয়ায় জনৈক পণ্ডিত উহাকে 'শতদল' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূর্য্য-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে (অষ্টম অধ্যায়ে) অভিজিতের পরিচয় এইরূপভাবে লিখিত আছে; যথা,—

"মনোঽথ রসা সেনা বৈশ্যাপ্যার্দ্ধভোগগম। আপাস্ত্রৈবাভিজিৎ প্রান্তে বৈশ্বান্তে শ্রবণস্থিতিঃ।"

দিঙ্‌নিরূপক 'পোলারিস' নক্ষত্র আর হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের পরিদৃষ্ট 'ধ্রুব' নক্ষত্র অভিন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। ইউরোপীয়গণের ক্যাপেলা নক্ষত্র 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত' বর্ণিত 'ব্রহ্মহৃদয়' নক্ষত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। সূর্য্য-সিদ্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে ধ্রুব-নক্ষত্রের এবং অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্রের অবস্থিতির বিবরণ এইরূপভাবে লিখিত আছে; যথা,—

"মেরোরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে। নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে।
বিক্ষেপো দাক্ষণে ভাগৈঃ খার্ণ বৈঃ খাদপক্রমাৎ। হুতভুগ্‌ব্রহ্মহৃদয়ৌ বৃষে দ্বাবিংশভাগগৌ।
অষ্টাত্রিংশতা চৈব বিক্ষিপ্তা উত্তরেণ তৌ। গোলং বধ্বা পরীক্ষেত বিক্ষেপঃ ধ্রুবকং স্ফুটম।"

এই সকল নক্ষত্র পৃথিবী হইতে কত দূরে অবস্থিত, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ভেগা বা অভিজিৎ নক্ষত্র পৃথিবী হইতে এক কোটী তেইশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয় শত নব্বই কোটী মাইল দূরে অবস্থিত। গণনাঙ্কে এ দূরত্ব নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। অঙ্কপাত করিলে ১,২৩,৯৩,৯৯০,০০০,০০,০০০ দাঁড়ায়। কোথায় পৃথিবী, আর কোথায়

সেই নক্ষত্র! সিরিয়স বা মৃগব্যাধ নক্ষত্র—অভিজিৎ অপেক্ষাও পৃথিবী হইতে দূরে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্ব—এক কোটী সাতাইশ লক্ষ ছয়চল্লিশ হাজার দুই শত পঞ্চাশ কোটী মাইল। অঙ্কে লিখিতে গেলে,—১, ২৭, ৪৬, ২৫০, ০০, ০০, ০০০ মাইল। পোলারিস বা ধ্রুব-নক্ষত্রের দূরত্ব আরও অধিক। দুই কোটী পঁচাশী লক্ষ তেত্রিশ হাজার ষাট কোটী (২, ৮৫, ৩৩, ০৬০, ০০, ০০, ০০০) মাইল। ক্যাপেলা বা ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্রের দূরত্ব,—চারি কোটী পনের লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয় শত আশী কোটি (৪, ১৫, ৬৬, ৬৮০, ০০, ০০, ০০০) মাইল। এ দূরত্বের ধারণা কল্পনায়ও আনা যায় না। ঐ সকল নক্ষত্রের এক একটী—সূর্য্য-বিশেষ; উহাদের প্রত্যেকটীর আবার গ্রহ-উপগ্রহও আছে। পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া যে সকল গ্রহ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় তিন শত। পৃথিব্যাদি আটটী গ্রহ প্রধান হইলেও সূর্য্যের অন্যূন দুই শত চল্লিশটী গ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন উপগ্রহ-সমূহও আছে; যথা—পৃথিবীর উপগ্রহ একটী, মঙ্গলের দুইটী, বৃহস্পতির চারিটী, শনির আটটী, ইউরেনাসের চারিটি, নেপচুনের একটী ইত্যাদি। এইগুলির এখন পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অপরিচিত অদৃশ্য গ্রহ-উপগ্রহ আরও যে কত আছে, তাহা কে বলিতে পারে?

নক্ষত্রের উৎপত্তি।

পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে রূপকে গ্রহ-নক্ষত্রাদির উৎপত্তির ও সংস্থানের বিষয় পরিবর্ণিত আছে। তাহাতে কোনটীকে কোনটীর সন্তান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, কোনটী কোনটীর স্ত্রী বলিয়া পরিচিত। এ বিষয়ে সকল স্থলে পাশ্চাত্ত্যের সহিত প্রাচ্যের মিল দেখিতে পাই না। পুরাণাদি শাস্ত্রে বুধকে চন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মঙ্গল গ্রহের ধ্যানে তাঁহাকে পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানা যায়। * মঙ্গলকে বা বুধকে গ্রহ বলিয়া মনে করিলে, পাশ্চাত্য-মতের সহিত এ মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সুকঠিন। সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে বলিতে হয়,—এখন যাহাদিগকে মঙ্গল ও বুধ বলা হইতেছে, পূর্ব্বে তাহাদের ঐরূপ নাম ছিল না, অথবা অবস্থিতি অন্যরূপ ছিল। চন্দ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাই। কোনও মতে চন্দ্রকে গ্রহ, কোনও মতে চন্দ্রকে উপগ্রহ বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য-মতে, চন্দ্র—পৃথিবীর উপগ্রহ মধ্যে পরিগণিত। অনেকে বলেন,—এই মত প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ অবগত ছিলেন না। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। চন্দ্র যে পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, পুরাণাদিতে, এমন কি ঋগ্বেদে পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে ঋগ্বেদের (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত) একটী ঋক,—

"মা মামিমং তব সন্তমত্র ইরস্যা দ্রুগ্ধো ভিয়সা নি গারীৎ।
ত্বং মিত্রো অসি সত্যরাধাস্তৌ মেহাবতং বরুণশ্চ রাজা॥"

এখানে চন্দ্রকে পৃথিবীর পুত্র অর্থাৎ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তার পর পুরাণাদি গ্রন্থে এক এক গ্রহের মধ্যে যে ব্যবধানের বিষয় লিখিত আছে, আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত ব্যবধানের সহিত তাহার অনেক বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাই। সেইরূপ

* মঙ্গলের ধ্যান; যথা,—

"ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং। কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥"

বৈসাদৃশ্য-বোধের দুইটী কারণ—প্রথমতঃ প্রাচ্য পরিমাপ যোজনাদির পরিমাণ কোন্ সময়ে কিরূপ ধরা হইত, স্থান ভেদে দূরত্বের কিরূপ ভেদাভেদ নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। দ্বিতীয়তঃ, গ্রহচক্র নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল। হয় তো এমন এক সময় ছিল, যখন পুরাণাদির বর্ণিত স্থানেই গ্রহাদি বিচরণ করিতে; অথবা ইংরাজী যে সকল নামের যে অনুবাদ হইতেছে, তাহা ঠিক নহে। পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—শনি গ্রহের সীমানার পরে 'ইউরেনাস' গ্রহ এবং ইউরেনাসের সীমানার পরে 'নেপচুন' গ্রহ যে বিদ্যমান ছিল, হিন্দুরা তাহা অবগত ছিলেন না; ঐ দুই গ্রহ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। কিন্তু শনি-গ্রহের পরবর্ত্তী মণ্ডলে যে অন্যান্য গ্রহাদি অবস্থান করিতেন এবং হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যে তদ্বিষয় অবগত ছিলেন, তাহার নানা নিদর্শন—নানা প্রমাণ দেখিতে পাই। শনি হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন অন্তরে সপ্তর্ষি-মণ্ডল এবং সপ্তর্ষি-মণ্ডল হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন অন্তরে ধ্রুবলোক অবস্থিত, পুরাণাদির বর্ণনায় তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।* ধ্রুবলোকে ধ্রুব-নক্ষত্র কেন্দ্রস্থানীয়; তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ক্রতু, পুলস্ত, পুলহ, অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, মরীচি সপ্তর্ষি পরিভ্রাম্যমান। সে হিসাবে, সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া যেমন পৃথিব্যাদি সপ্ত গ্রহ অবস্থিত, ধ্রুবকে বেষ্টন করিয়াও সেইরূপ বশিষ্ঠাদি সপ্তগ্রহ বিদ্যমান। তাই ধ্রুবলোক এক স্বতন্ত্র লোক বলিয়া অভিহিত হয়। পুরাণাদি শাস্ত্রে যুধিষ্ঠিরাদির কাল-নির্ণয়ে সপ্তর্ষি-মণ্ডলের নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সপ্তর্ষি-মণ্ডল সকল সময় যে এক স্থানে অবস্থিত নহেন, পুরাণাদির আলোচনাতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। † সপ্তর্ষিমণ্ডলকে অধুনা 'উর্ষা মেজর' (Ursa Major) বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। উর্ষা মেজরই পুরাণ-বর্ণিত সপ্তর্ষি-মণ্ডল কি না, তাহা বলা যায় না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সপ্তর্ষি-মণ্ডল যে এক সময়ে নেপচুনের নিকটবর্ত্তী ছিল, শাস্ত্রাদি হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। অথবা, অধুনা-কল্পিত উর্ষা-মেজর পুরাণ-বর্ণিত সপ্তর্ষি-মণ্ডল নহে। নেপচুন বা তদপেক্ষা অধিকতর দূরবর্ত্তী কোনও মণ্ডল—সপ্তর্ষি-মণ্ডল হইতে পারে। বৃহৎ-সংহিতার মতে,—'ধ্রুব-নক্ষত্র সপ্তর্ষির কেন্দ্র-স্থানীয়। সপ্তর্ষিগণ উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অরুন্ধতীর সহিত উদিত হন। পূর্ব্বভাগে ভগবান মরীচি, পশ্চিম-দিকে বশিষ্ঠ, তৎপরে অঙ্গিরা, তদনন্তর অত্রি, তন্নিকটবর্ত্তী পুলস্ত, পুলহ ও ক্রতু যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত। অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া আছেন।" বৃহৎ-সংহিতার এই বর্ণনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীধরস্বামী কৃত টীকার বর্ণিত সপ্তর্ষির অবস্থানের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তদনুসারে, আকাশ-মণ্ডলের উত্তরাংশে ধ্রুব-নক্ষত্রের পার্শ্ববর্ত্তি-স্থানে পূর্ব্বাগ্র শকটাকার সপ্তর্ষি-মণ্ডল অবস্থিত। ধ্রুবের পূর্ব্বদিকে, অন্যান্য অপেক্ষা উন্নত অংশে, মরীচি বিরাজমান। তাহার নিম্নভাগে ছোট ও বড় দুইটী নক্ষত্র—বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী। তৎপরে ঈষদুন্নত রেখার মূল-

---

* এতদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ, সপ্তম অধ্যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম অংশ, দ্বাবিংশ অধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

† শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকা, এবং বৃহৎ-সংহিতার সপ্তর্ষিচা'র অধ্যায় প্রভৃতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই সপ্তর্ষি-মণ্ডলের অবস্থানের এই তারতম্য অনুভূত হইবে।

স্থানীয় অঙ্গিরা তৎপরে ঈশানে অত্রি, দক্ষিণে পুলস্ত্য। পুলস্ত্যের পশ্চিমে পুলহ, তাহার উপরে ক্রতু। এ বিষয়ে আমরা বৃহৎ-সংহিতার শ্লোকের এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীধর স্বামীর টীকার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। তাহাতে দুই সময়ে সপ্তর্ষি-মণ্ডল দুই ভাবে অবস্থিত ছিল, বুঝা যায়। সেই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে অধুনা 'উর্সা মেজর' বলা হইয়া থাকে।

সময় সময় পৃথিবীতে যে ধূমকেতু পরিদৃষ্ট হয়, সেই ধূমকেতুর সংখ্যা,—আর্য্য-ঋষিগণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন,—এক সহস্রের কম নহে। সেই সকল ধূমকেতুর আকার, বর্ণ ও উৎপত্তির পরিচয় 'বৃহৎ-সংহিতায়' পরিবর্ণিত আছে। তদ্বিবরণ বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। সেই সহস্র ধূমকেতুর সকল বিবরণ আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। কয়েকটী কেতুর বর্ণনা 'বৃহৎ-সংহিতা' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'হার, মণি বা স্বর্ণের ন্যায় রূপধারী এবং শিখা-বিশিষ্ট যে কেতুসকল পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হয়, তাহারা রবিজ অর্থাৎ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন কেতু। ইহারা 'কিরণ' নামে অভিহিত হয় এবং ইহাদের সংখ্যা পঞ্চ-বিংশতি। এই কেতু উদিত হইলে রাজাদিগের বিরোধ হয়। শুক পক্ষী, অগ্নি, বন্ধুজীব পুষ্প, লাক্ষা বা রক্তের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট যে কেতু-সকল অগ্নিকোণে দৃষ্ট হয়; ইহারা অনলোৎপন্ন ও পঞ্চবিংশতি সংখ্যক। এই কেতুর উদয় হইলে অগ্নিভয় হয়। যে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক কেতু পঞ্চশিখ রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া দক্ষিণদিকে অবলোকিত হয়, তাহারা যমোৎপন্ন। ইহারা উদিত হইলে মড়ক হয়। দর্পণ-বৃত্তের ন্যায় আকারধারী, শিখাশূন্য, কিরণান্বিত অথচ সজল তৈলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট যে দ্বাবিংশতি-সংখ্যক কেতু ঈশান দিকে দৃষ্ট হয়, তাহারা পৃথিবী-জাত। এই কেতু উদিত হইলে ক্ষুধা জন্য ভয় হয়। চন্দ্রকিরণ, রজত, হেম, কুমুদ বা কুন্দ-পুষ্পের সবর্ণ যে তিনটি কেতু আছে, তাহারা চন্দ্রজ ও উত্তর দিকে দৃষ্ট হয়। এই কেতুর উদয় হইলে দুর্ভিক্ষ হয়।' এইরূপ বুধ, শুক্র, শনৈশ্চর প্রভৃতি গ্রহ হইতে যে সকল কেতু উৎপন্ন হয়, তাহাদের বর্ণের ও ফলাফলের বিষয় 'বৃহৎ-সংহিতায়' লিখিত আছে। অধুনা 'নেবিউলার থিওরির' পরিপোষকগণ নেবিউলার যে নানা আকৃতি লক্ষ্য করেন, ঐ সকল কেতুর বর্ণনা পাঠ করিলে তাহাদেরই কথা মনে আসে। কত কালের কত ভূয়োদর্শনের ফলে এবম্বিধ সহস্রাধিক কেতুর অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহা কল্পনায়ও ধারণা করা যায় না। অধুনিক বিজ্ঞানে পৃথিবী ভিন্ন অন্যান্য গ্রহে প্রাণীর ও উদ্ভিদাদির অস্তিত্বের বিষয় সপ্রমাণ হইতেছে। চন্দ্রের যে ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে, তাহাতে চন্দ্রলোকে পর্ব্বত নদী প্রভৃতির বিদ্যমানতার বিষয় সপ্রমাণ হয়। মঙ্গল গ্রহে আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় মৃত্তিকা, জল, হিমশিলা, মেঘ, কুয়াসা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাতে জীবজন্তুর বসতি আছে বলিয়াও প্রতিপন্ন হয়। লকিয়ার, হার্শেল প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গ্রন্থে এ সকল বিষয়ের আলোচনা আছে। এ সম্বন্ধেও আর্য্য-হিন্দুগণই যে পথ-প্রদর্শক, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, ধ্রুবলোক, ইন্দ্রলোক, যমলোক, নক্ষত্রলোক প্রভৃতি বিভিন্ন লোকে কর্ম্মানুসারে জীব বাস

ধূমকেতু ও নেবিউলা।

করিতে সমর্থ হয়, শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, সৌরজগৎ-তত্ত্বে আর্য্যগণ যে কতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়।

স্বষ্টি-সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ।

স্বষ্টি-সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন দার্শনিকগণের মতামতের আলোচনায় আমরা কত অভিনব তথ্যই অবগত হইয়াছি। অনেক স্থলে একই বিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন মতও দেখিতে পাইয়াছি। কেবল সাধারণ মনুষ্যের সিদ্ধান্ত বলিয়া নহে; শাস্ত্র-বর্ণিত বহু মতও পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। অবিদ্যমান্ হইতে বিদ্যমানের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে সৎ হইতে অসতের উৎপত্তির বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; * আবার "নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ" ‡ প্রভৃতি সাঙ্খ্য-সূত্রে এবং "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ‡ প্রভৃতি ভগবদুক্তিতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়াছি। বৌদ্ধ-দর্শনের মতে, অভাব অর্থাৎ অসৎ—উৎপত্তি অর্থাৎ সতের মূল। দৃষ্টান্ত—বীজ ধ্বংস না হইলে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু সাংখ্য-মত—এ মতের বিপরীত। সাঙ্খ্যকারগণ বলেন—'অভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইলে, বীজের সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও আপনা-আপনিই অঙ্কুর উৎপন্ন হইত। কিন্তু তাহা হয় না; বীজকে নির্ভর করিয়াই অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে।' এইরূপ, বেদান্ত বলেন,—'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। সাংখ্যকারগণ তাহা স্বীকার করেন না। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শন সত্য হইতে অসত্যের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে,—'পরমাণু সত্য; কিন্তু পরিদৃশ্যমান বিশ্ব অনিত্য।' কিন্তু সাঙ্খ্যমতে তাহার প্রতিবাদ হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যকারগণ বলেন,—'কার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ। কারণও সৎ কার্য্যও সৎ। কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ সৎ; কার্য্যে তখন কারণ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। অনুদ্ভূত বলিয়া কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। যেমনই হউক, পরন্তু তাহা কখনই অসৎ নহে। যাহা অসৎ, তাহা চিরদিনই অসৎ। অসৎকে কেহ সৎ করিতে পারে না—ঘোড়া পিটাইয়া গাধা করা যায় না। যদি বল, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য বর্ত্তমান থাকে ত তাহার আবার উৎপত্তি কি? তদুত্তরে বলা যায়—প্রথম অভিব্যক্তই উৎপত্তি, যেমন ধান্যের অভ্যন্তরে তণ্ডুল বর্ত্তমান থাকে, তার পর অবঘাত করিলে ধান্য হইতে তণ্ডুল বাহির হয়; ইহাই তণ্ডুলের উৎপত্তি। সেইরূপ কার্য্য-মাত্রেরই উৎপত্তি জানিবে। কার্য্য যে উৎপত্তির পূর্ব্বে বর্ত্তমান, এ বিষয়ে দ্বিতীয় যুক্তি এই,—যথা, কার্য্যের সহিত কারণের একটা সম্বন্ধ, কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান—ইহা মানিতে হয়; নতুবা, মৃত্তিকা হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি, বস্ত্র হইতে ঘটের উৎপত্তি না হয় কেন? কার্য্যের সহিত কারণের চিরন্তন সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, এ আপত্তি খাটে না; কেন-না, যে কারণ যে কার্য্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেই কারণ সেই কার্য্যের উৎপাদক

বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য সাধন।

* এই খণ্ডের ৯২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† সাঙ্খ্য-সূত্র, প্রথম অধ্যায়, ৭৮শ সূত্র।

‡ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোক।

হয়, সম্বন্ধ-শূন্য কার্য্যের উৎপাদক হয় না, এই নিয়ম। মৃত্তিকা—ঘটের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, বস্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। অতএব মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়, বস্ত্রের হয় না। তবেই বুঝা গেল, ঘট যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ হয়, তাহা হইলে সৎ মৃত্তিকার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।" * একই বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে এইরূপ বিচার-বিতর্ক! সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে, এইরূপ সৃষ্টি-কর্ত্তার সৃষ্টি-কর্তৃত্ব বিষয়েও পরস্পর-বিরোধী মত নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহা হইতে অর্থাৎ ঈশ্বর বা পরমেশ্বর যে নামেই অভিহিত কর—তাঁহা হইতে, এই বিশ্ব উৎপন্ন, শাস্ত্র-গ্রন্থে এ মত পুনঃপুনঃ পরিব্যক্ত হইয়াছে। † একের বিকারে অপরের উদ্ভব হয়,—শাস্ত্রগ্রন্থে এ মতেরও অসদ্ভাব দেখিতে পাই না। ‡ অন্যত্র আবার দেখিতে পাই,—তিনিই সৃষ্টি-কর্ত্তা-রূপে সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন! তাঁহার সৃষ্টি-কর্তৃত্ব বিষয়ে পূর্ব্বেও শাস্ত্রোক্তি প্রদর্শন করি-; এখানেও ঋগ্বেদের (দশম মণ্ডল, ২২১শ সূক্ত) কয়েকটি ঋক উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥
যঃ প্রাণতো নিমেষতো মহিত্বৈকইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃস্তভিতং যেন নাকঃ।
যোঽন্তরীক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥
যং ক্রন্দসী অবসাতস্তভানে অভ্যৈক্ষেতং মনসারেজমানে।
যত্রাধিসূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥
আপোহ যদ্ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানাঃ জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্ ॥ ৭ ॥
যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্ দক্ষং দধানাঃ জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্।
যো দেবানামধিদেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥
মানো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মাজজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্ ॥ ৯ ॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরিতা বভূব।
যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়োরয়ীণাম্ ॥ ১০ ॥

* সাংখ্য-দর্শন ব্যাখ্যা—'বঙ্গবাসী' সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

† এই খণ্ডের ৯০শ পৃষ্ঠায় এবং ৯৯ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

‡ এই পরিচ্ছেদের ৯৬শ, ১০০শ ও ১০৬ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয় দৃষ্ট হইবে।

প্রথমে একমাত্র হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ঈশ্বর বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই সকল পদার্থের সৃষ্টি-কর্ত্তা; তিনিই পৃথিবী এবং স্বর্গের ধারণকর্ত্তা বা রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহারই উদ্দেশ্যে আহুতি বা পূজা প্রদান করি। তিনিই জ্ঞানদাতা, বলবিধানকর্ত্তা, সমগ্র বিশ্ব তাঁহার উপাসনা করিতেছে। দেবতাগণ তাঁহার আদেশ অনুসারে পরিচালিত হইতেছেন। তাঁহার আশ্রয়েই অমরত্ব লাভ হয়, তাঁহার আশ্রয়েই মৃত্যু। তাঁহারই উদ্দেশ্যে আমরা যজ্ঞাহুতি প্রদান করি। তিনি চেতন-অচেতন পৃথিবীর অধীশ্বর, তিনিই সৃষ্টি-কর্ত্তা, তিনি দ্বিপদ-চতুষ্পদ সকলেরই প্রভু। তাঁহাকেই আমরা আহুতি ও পূজা প্রদান করি। তুষার-ধবল হিমগিরি এবং বিশাল সমুদ্রের জলরাশি তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করে; তাঁহার বাহু দিক্কোণে প্রসারিত। তাঁহাকেই আমরা যজ্ঞাহুতি ও পূজা প্রদান করি। তিনি গ্রহদিগকে পরিচালিত করিতেছেন; পৃথিবী তৎকর্ত্তৃক স্বস্থানে পরিরক্ষিত হইতেছে; তিনি আকাশ এবং স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার প্রভাব বিদ্যমান। তিনি ভিন্ন আর কাহাকে পূজা প্রদান করিব? পৃথিবী ও স্বর্গ যাঁহা কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং যাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিত; যাঁহা কর্ত্তৃক সূর্য্য কিরণ-দান করিতেছেন; তাহাকেই আমরা পূজা ও যজ্ঞাদি প্রদান করি। বিশ্ব যখন 'অপ্' পরিপূর্ণ ছিল ও তাহার গর্ভে বিশ্ব অবস্থিত ছিল; তখন যিনি (পরমেশ্বর) তাহার প্রাণস্বরূপ বিরাজমান ছিলেন, তাঁহাকেই আমরা যজ্ঞাহুতি ও পূজা প্রদান করি। অপ্ হইতে যখন তেজ, শক্তি ও বিশ্বের উৎপত্তি হইল, যিনি তখন সর্ব্বদেবের অধীশ্বর একমাত্র সর্ব্বদেব রূপে বিরাজমান ছিলেন, তাঁহাকেই আমরা যজ্ঞাহুতি ও পূজা প্রদান করি। যিনি ন্যায় ও সত্য স্বরূপ, পৃথিবীর ও স্বর্গের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং অপ্ বা আদিভূত নীহারিকার মধ্যে প্রাণরূপে বিরাজমান এবং যিনি আমাদের মঙ্গল-বিধান করেন, তাঁহাকেই আমরা পূজা ও যজ্ঞাহুতি প্রদান করি। হে প্রজাপতি! তুমিই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি ভিন্ন কেহই বিশ্বকে আয়ত্তে রাখিতে পারে না। আমাদের প্রার্থনা তুমি পূরণ কর। পৃথিবীর মঙ্গল বিধান হউক।' ইহাতে সৃষ্টি বিষয়ে একমাত্র ঈশ্বরের প্রাধান্যই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সৃষ্টি-কর্ত্তা ঈশ্বর কোথাও আবার বহুরূপে ও বহু নামে পরিচিত এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে তাঁহার বিশেষ বিশেষ নাম রূপ পরিকল্পিত। ফলে, তিনি কোথাও এক, কোথাও তেত্রিশ, কোথাও তেত্রিশ কোটি, কোথাও অসংখ্য। তার পর, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কেহ জলকে, কেহ বায়ুকে, কেহ অগ্নিকে যেমন সৃষ্টির আদি-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতেও সেইরূপ বিভিন্ন মত বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত আছে, দেখিতে পাই। উপরে যে সূক্ত এবং তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই প্রকাশ,—অপ্ হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়। অপ্ শব্দে যাঁহারা 'জল' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা জল হইতে অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অগ্নি-দেবতার ও বায়ু-দেবতার মাহাত্ম্য-তত্ত্ব আলোচনা করিলে তাঁহাদের একজন হইতে অপরের উৎপত্তির বিষয় বেশ বুঝা যায়। বৈকারিক সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় শাস্ত্রের অনেক স্থলেই উল্লেখ আছে! অণ্ডের বিষয়, পক্ষীর প্রসঙ্গ—প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় দেশের

সৃষ্টি-প্রসঙ্গে অনেক স্থলেই উক্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতেও তদ্রূপ শব্দ প্রয়োগের অসদ্ভাব নাই। যদিও স্থান-বিশেষে পক্ষী শব্দের বা অণ্ড শব্দের অর্থ অন্যরূপ; কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে সে অর্থ উপলব্ধি হওয়া সুকঠিন। অণ্ডের ও পক্ষীর প্রসঙ্গ যে সকল স্থানে উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে অন্যান্য দেশ অণ্ডের ও পক্ষীর সাধারণ অর্থের অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। * কিন্তু যাউক সে সকল কথা। এখন, পরস্পর-বিরোধী মত কেন ব্যক্ত হয়, দেখা যাউক—তৎসম্বন্ধে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। এ বিষয় বুঝাইতে হইলে, অনেক কথার অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু এখানে সে সুযোগ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উপলক্ষ করিয়া বিষয়টি বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি। কোথাও দেখিতে পাই,—ঈশ্বর নিরাকার; কোথাও দেখিতে পাই,—তাঁহার অসংখ্য আকার। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে দুইটীর মধ্যে কি বিষম পার্থক্যই উপলব্ধি হয়! কিন্তু আবার একটু স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই—ঐ দুই উক্তির মধ্যে কোনই বিরুদ্ধ-ভাব নাই। যাহা নিরাকার, তাহাই অসংখ্যাকার। নিরাকার শব্দের দুই রূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। এক অর্থ—যাঁহার একেবারে আকার নাই; দ্বিতীয় অর্থ—যাঁহার নির্দ্দিষ্ট আকার নাই অর্থাৎ আকার অনির্দ্দিষ্ট—আকারের সংখ্যা-পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায় না। শেষোক্ত অর্থে নিরাকারও যাহা—অসংখ্যাকারও তাহাই। সে অর্থে, নিরাকার ও অসংখ্যাকার উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। এত অসংখ্য আকার যে, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। নিরাকার শব্দ ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে, এই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। আর নিরাকার শব্দের এই অর্থ পরিগ্রহ করিলে শাস্ত্রোক্তিতে কোথাও বিরোধ ঘটিতে পারে না। আকার নাই অর্থ ধরিলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, সেই ভাবই আসিতে পারে। মানুষ অসংখ্য আকারের ধারণা করিতে পারে না। তাই আকার অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টাকার নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সৃষ্টির আদিতে কেহ যে জলের, কেহ যে অগ্নির, কেহ যে বায়ুর প্রাধান্য মান্য করিয়াছেন, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই যে আদি অবস্থা, সে যে সকলেরই এক! ত্রিকোণ স্ফাটিক-মধ্যে সূর্য্যালোক বিবিধ বর্ণ প্রকাশ করে। তাহা দেখিয়া নানাজনে সূর্য্য-রশ্মির নানা বর্ণ কল্পনা করেন। কিন্তু মূল রশ্মি একই বর্ণাত্মক। সেইরূপ এক মূল সামগ্রীর বিভিন্ন রূপের যিনি যে রূপ দেখিয়াছেন, তিনি সেই রূপেরই মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। সাধারণ মনুষ্যের দৃষ্টিতে একই সামগ্রী নানারূপে প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের রচনায় সেরূপ দৃষ্টি-বিভ্রমাত্মক বিষয়ের অবতারণার কারণ কি? এস্থলেও সেই অধিকারি-ভেদের কথার উল্লেখ করিতে হয়। যাহার যেমন জ্ঞান-বুদ্ধি, যে ব্যক্তি যে পথ দিয়া গমন করিলে স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারে, তাহারই উপযোগিতা অনুসারে শাস্ত্রে বিষয়-বিশেষের অবতারণা হইয়া থাকে।

* ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে, ১১৪শ সূক্তে, পক্ষীর বিষয় দ্রষ্টব্য। অণ্ডের এবং অণ্ড হইতে বিশ্বের উৎপত্তির বিষয় অনেক স্থলেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রলয়-তত্ত্ব।

[প্রলয়-সম্বন্ধে নানা মত,—ইরাণীয়দিগের,—ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের,—মুসলমানদিগের ;—সকল দেশের সকল মত শাস্ত্র-মতের অন্তর্নিহিত ;—জলপ্লাবনের কথা,—মিশরে ও গ্রীসে,—কালডিয়া ও চীন প্রভৃতি দেশে ;—হিন্দু-শাস্ত্রে জলপ্লাবনাদি ;—জলপ্লাবন-সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক ;—জলপ্লাবন-সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদগণের মতামত ;—মৃত্যুর পর ;—ইরাণীয়গণের মত ;—ইহুদীদিগের মত ,—খৃষ্টানদিগের মত ;—মুসলমান-দিগের মত ;—স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি ;—হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল মত পরিব্যক্ত আছে, তাহার আভাষ ;—অন্যান্য দেশে তাহার ছায়াপাত-প্রসঙ্গ,—একের সহিত অন্যের সাদৃশ্য ;—আমাদিগের শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রলয়-প্রসঙ্গ,—লয়ে আত্মায় আত্ম-সম্মিলন,—নির্ব্বাণ, মুক্তি প্রভৃতি।]

প্রলয়-সম্বন্ধে নানা মত।

সৃষ্টির সহিত প্রলয়ের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। যেথানে সৃষ্টি, সেথানেই লয়। জন্মিলেই মরিতে হয়। আবার ধ্বংসের পরই উদ্ভব হইয়া থাকে। যেটী যায়, ঠিক সেইটী আসে কি না,—স্থূল-দৃষ্টিতে যদিও তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না ; কিন্তু চক্রনেমির চক্রবিবর্ত্তনবৎ সেই সামগ্রীর পুনরভ্যুদয়ের বিষয় উপলব্ধি করিয়া থাকি। অবস্থান্তর-প্রাপ্তিই—লয় বা প্রলয়। সৃষ্টিও অবস্থান্তর-প্রাপ্তি ;—অর্থাৎ, একের লয়ে অন্যের উৎপত্তি! সুতরাং ভাবিয়া দেখিলে সৃষ্টিও নাই, লয়ও নাই ;—সকলই অবস্থান্তর-প্রাপ্তি। বেদান্ত-মতে সৃষ্টি ও প্রলয়কে তাই অনুলোম-বিলোম ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। * কিন্তু বেদান্তের সেই উচ্চভাব সাধারণের সহজ-জ্ঞানের অতীত ; সুতরাং সাধারণতঃ যেরূপভাবে প্রলয়-তত্ত্বের আলোচনা হইয়া থাকে,—বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রলয়-কাহিনী যেরূপভাবে প্রচারিত ও প্রচলিত আছে, প্রথমতঃ আমরা তাহারই আভাষ-প্রদানের চেষ্টা পাইতেছি। এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব, এই মনুষ্যাদি-প্রাণি-পরিপূর্ণ সংসার, প্রায় সকলেই বলেন, এক দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইরাণীয়-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে, ইহুদী-গণের ধর্ম্মশাস্ত্রে, খৃষ্টান-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে, মুসলমান-গণের ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং আমাদিগেরও ধর্ম্মশাস্ত্রের কোনও কোনও অংশে, প্রলয়ের—শেষের সে দিনের—কি বিকট বিভীষণ চিত্রই অঙ্কিত হইয়া আছে! কেহ বলিয়াছেন,—'পৃথিবী তুষার-সমাচ্ছন্ন হইয়া ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে। এই বৃক্ষ-লতাদি-পরিপূরিত অসংখ্য-প্রাণি-পর্য্যায়-সমন্বিত পৃথিবী সে দিন বরফে জমাট বাঁধিয়া যাইবে।' কেহ বলিয়াছেন,—'সে দিন কোটী সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পৃথিবী দগ্ধীভূত হইবে ; ভীষণ অনল উৎপন্ন হইয়া এই প্রাণি-সমাকুল ধরিত্রীকে অগস্ত ধাতু-নিঃস্রাবের ন্যায় তরল পদার্থে পরিণত করিয়া ফেলিবে।' কেহ আবার বলিয়াছেন,—'বিশ্ব জলে জলময় হইবে। আর সেই বিশ্বব্যাপী জলে—মনুষ্য ও পশু-পক্ষী-

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, "বেদান্ত দর্শন" প্রসঙ্গে ১২৯শ—১৩০শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপাদি প্রাণিপুঞ্জ কে কোথায় ভাসিয়া যাইবে! তখন জল ভিন্ন অন্য কিছুর চিহ্ন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।' পৃথিবীর ধ্বংস-সম্বন্ধে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ নানা মত প্রচলিত আছে।

জল-প্লাবনাদি।

ইরাণীয়গণের জেন্দ-আভেস্তা গ্রন্থের ভেন্দিদাদ-অংশে, * অহুর-মজদ্ পৃথিবীর ধ্বংস-সম্বন্ধে যিমকে বলিতেছেন,—'বিবঙ্ঘতের † পুত্র যিম! এই জীবজন্তু-সমাকুল পৃথিবীতে ভীষণ শৈত্য উপস্থিত হইবে। তাহা হইতে সর্ব্ববিধ্বংসী তীব্র তুষার উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। সেই তুষার পৃথিবীর পৃষ্ঠে সর্ব্বত্র বিতস্তি (চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি) পরিমাণ পুরু হইয়া বিদ্যমান থাকিবে। পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমভাবে তুষারাবৃত হইবে। যে সকল প্রাণী অরণ্যে বাস করে, যাহারা পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত থাকে, অথবা যাহারা অধিত্যকা-প্রদেশে আবাস-গৃহে অবস্থিত করে, এই সর্ব্বব্যাপী তুষার-সম্পাতে সেই ত্রিবিধ প্রাণীই মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইবে। যে সকল চারণ-ক্ষেত্র তৃণশস্পে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যেখানে স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে এবং যেখানে আজিও ক্ষুদ্র-বৃহৎ পশ্বাদি বিচরণ করিতেছে, সেই সকল স্থান হইতে, সেই ভীষণ শৈত্যাধিক্যের পূর্ব্বে, মনুষ্যের, কুক্কুরের, পক্ষীর, মেষের, বৃষের, জ্বলন্ত অগ্নির বীজ সংগ্রহ করিয়া আন এবং তৎসমুদায় রক্ষার জন্য 'ভর' ‡ প্রস্তুত করিয়া রাখ।' পৃথিবীর ধ্বংস-সম্বন্ধে

ইরাণীয়দিগের মত।

---

* 'জেন্দ আভেস্তার' ভেন্দিদাদ্-অংশের দ্বিতীয় ফারগাদে (*Vendidad* Fergard II.) এতদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক ডারমেষ্টেটর উক্ত অংশের যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—"And Ahura Mazda spake unto Yima saying, 'O fair Yima, son of Vivanghat! Upon the material world the fatal winters are going to fall, that shall bring the fierce, foul frost; upon the material world the fatal winters are going to fall that shall make snow-flakes fall thick, even an *aredvi* deep on the highest tops of mountains and all the three sorts of beasts shall perish, those that live in the wilderness, and those that live on the tops of mountains, and those that live in the bosom of the dale under the shelter of stables. Before that winter, those fields would bear plenty of grass for cattle: now with floods that stream, with snows that melt, it will seem a happy land in the world, the land wherein footprints even of sheep may still be seen. Therefore make thee a Vara, long as a riding ground on every side of the square, and thither bring the seeds of sheep and oxen, of men, of dogs, of birds and of red blazing fires." ডক্টর স্পিগেল এই অংশের যে অনুবাদ করিয়াছেন, ডারমেষ্টেটরের অনুবাদের সহিত তাহার সামান্য পার্থক্য অনুভূত হয়। 'অ'রেদ্বি' (*Aredvi*) শব্দে স্পিগেল 'প্রচুর পরিমাণ' (in great abundance) অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ডারমেষ্টেটর টীকা-টিপ্পনীর অনুসরণে বলিয়াছেন,—যেখানে সামান্য তুষার-সম্পাত হইবে, সেখানেও এক বিতস্তি বা চতুর্দ্দশ অঙ্গুলির কম পুরু তুষারপাত হইবে না, 'আরেদ্বি' শব্দে তাহাই বুঝায়।

† ডারমেষ্টেটর লিখিয়াছেন—বিবঙ্ঘত (Vivanghat). স্পিগেল লিখিয়াছেন—বিবাঙ্হাও (Vivanhao)। ঐ শব্দ যে সংস্কৃত বিবস্বন্ শব্দের রূপান্তর, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যম—বিবস্বনের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত যম—জেন্দ-আভেস্তায় 'যিম' নাম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই (এই খণ্ডের ৩২-৩৩ পৃষ্ঠায়) প্রদর্শন করিয়াছি।

‡ 'ভর' শব্দ অনুবাদকগণ 'স্থান', 'ঘোড়দৌড়ের মাঠ' (Riding ground, Race ground) ইত্যাদি রূপে অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ শব্দে 'উচ্চ স্থান' অর্থ সূচিত হইতে পারে। জলপ্লাবন-বিষয়ক বর্ণনার সহিত

জেন্দ-আভেস্তায় এই বিবরণ দেখিতে পাইলাম। বাইবেলে এতদ্বিষয়ে দ্বিবিধ মত দৃষ্ট হয়। ওল্ড-টেষ্টামেণ্টের অন্তর্গত 'জেনিসিসে' এক মত পরিব্যক্ত, 'ইশিয়া' অংশে আর এক মত প্রচারিত। জেনিসিসে জলপ্লাবনে পৃথিবী ধ্বংস হইবার কথা লিখিত আছে; কিন্তু ইশিয়াতে জলপ্লাবনের কথা রহিয়াছে, অপিচ প্রখর সূর্য্যোত্তাপে অগ্নিবর্ষণে পৃথিবী ভস্মীভূত হইবে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জেনিসিসে লিখিত আছে, ঈশ্বর নোয়াকে বলিতেছেন—'আর সাত দিন পরে আমি চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি পৃথিবীতে অবিরাম বারি বর্ষণ করাইব। যে কোনও প্রাণী আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; পৃথিবীতে কাহারও চিহ্ন-মাত্র রাখিব না।* সেই বৃষ্টির জল—পনের (ঘন পরিমাণ) হাত উচ্চ হইয়া থাকিবে; তাহাতে পর্ব্বতাদি ডুবিয়া যাইবে। দেড় শত দিবস পৃথিবী ঐরূপভাবে জলমগ্ন থাকিবে।' ইহার পর ঈশ্বর, নোয়াকে নৌকা প্রস্তুত করিয়া সকল প্রাণীর ও সকল সামগ্রীর বীজ তাহাতে রক্ষা করিতে উপদেশ দেন। পরমেশ্বরের আদেশ অনুসারে নোয়া নৌকা প্রস্তুত করেন। পরমেশ্বরের আদেশ-অনুসারে সেই নৌকায় পবিত্র জীবজন্তুদিগের প্রত্যেকের সাতটী পুরুষ ও সাতটী স্ত্রী এবং অপবিত্র জন্তুদিগের প্রত্যেকের দুইটী পুরুষ ও দুইটী স্ত্রী গৃহীত হয়। নোয়া, নোয়ার স্ত্রী এবং সেম, হাম, জাফেট নামক তাঁহার পুত্রত্রয় ও তাহাদের স্ত্রীগণ সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া ছিলেন। নানা জাতীয় পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই নৌকায় রক্ষিত হইয়াছিল। নোয়ার নৌকায় রক্ষিত মনুষ্যাদি হইতে পুনরায় সংসারে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষ-লতাদির উদ্ভব হয়। জেন্দ-আভেস্তায় বর্ণিত প্রলয় ভবিষ্যৎকালে সংঘটিত হইবে বলিয়া লিখিত আছে। 'জেনিসিসের ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। তবে পণ্ডিতগণ উভয় গ্রন্থের বর্ণিত ব্যাপারকে অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই কালেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন,—জেন্দ-আভেস্তার ভেন্দিদাদ্ অংশে বর্ণিত তুষার-পাত ব্যাপার পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়া গিয়াছে এবং সেই দুর্দ্দৈব-বশে আর্য্যগণ উত্তর-মেরু পরিত্যাগ করিয়া মধ্য-এসিয়ায় আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন।' কেহ আবার বলেন,—'ঐ ঘটনা পূর্ব্বেও সংঘটিত হইয়াছে, পুনঃ-প্রলয়-কালে পুনরায় সংঘটিত হইবে।' ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে সে কথা বলেন না বটে; † পুনরায় যে জল-প্লাবন হইয়া পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং বীজরূপে সকল সামগ্রী রক্ষিত হইবে,—এ কথা

ইহুদী ও খৃষ্টান দিগের মত।

ইহার সাদৃশ্যের বিষয় অনুভূত হয়। 'ভর' শব্দে নৌকাও বুঝাইয়া থাকে। অধ্যাপক ডারমেষ্টের উহাকে নোয়ার আর্ক বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে,—"The Vara of Yima came to be nothing more than a sort of Noa's Ark."—*Vide* Prof. Darmestator, *Zend Avesta*

* "And the Lord said unto Noah...For yet seven days, and, I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights and every living thing that I have made will I destroy from off the face of the ground."—*Genesis*. Ch. VII. 4.

† ধ্বংসের পর চির-সুখাবাস সম্বন্ধে খৃষ্টানদিগের মধ্যে এক মত প্রচলিত আছে। এই পরিচ্ছেদের শেষ অংশে তদ্বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সেই সুখ-শান্তিময় দিনে সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী সময়ে স্বয়ং যীশুখৃষ্ট রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং পবিত্রাত্মগণের সহিত রাজ-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।—*Vide Revelation XX*. 1-5.

তাঁহারা স্বীকার করেন না সত্য; কিন্তু আভাষে পৌর্ব্বাপর্য্যের ভাব মনে আসিতে পারে! জেনিসিস—খৃষ্টান ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ই মান্য করিয়া থাকেন। সুতরাং পৃথিবীর ধ্বংস সম্বন্ধে জেনিসিসে যাহা লিখিত আছে, তাহা উভয় সম্প্রদায়েরই অভিমত বলিয়া পরিগৃহীত হয়। ইশিয়ার মত জেনিসিসের মত হইতে একটু স্বতন্ত্র। ইশিয়ায় প্রকাশ,—সেই ভীষণ সংহার-ক্রিয়ার দিনে অত্যুচ্চ পর্ব্বত-সমূহ জলস্রোতে ভাসমান এবং মনুষ্যের আবাস-গৃহ-সমূহ ভূতলশায়ী হইবে! অধিকন্তু সেদিন চন্দ্র-রশ্মিতে সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রখর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবে। সূর্য্যের কিরণ বৃদ্ধি পাইবে; সূর্য্যের এক দিনের তেজ সাত দিনের তেজের সমান হইবে। অর্থাৎ, যেন সপ্ত-সূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।' * ফলতঃ, ইশিয়ায় দেখিতে পাই,—'যুগপৎ জলপ্লাবনে এবং অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবী ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।' জল-প্লাবনের পর ঈশ্বরের অনুগ্রহে কিরূপে পুনঃ-সৃষ্টি সম্পন্ন হইবে, জেনিসিসের অষ্টম অধ্যায়ে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। মুসলমানগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে জল প্লাবনের কথা এবং প্রখর-সূর্য্যোত্তাপে, পৃথিবীর ধ্বংস হওয়ার বিষয়, উভয়ই দৃষ্ট হয়। তবে প্রধানতঃ প্রখর সূর্য্যরশ্মি বা অগ্নি-বর্ষণে সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার কথাই সর্ব্বত্র মান্য হইয়া থাকে। মুসলমানগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের † মতে সৃষ্টি-ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভীষণ ঢক্কা-নিনাদ শ্রুত হইবে। সেই ঢক্কা-নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ও স্বর্গ কাঁপিয়া উঠিবে। যাঁহারা পুণ্যবান, কেবল সেই কয়েক জনকে ঈশ্বর অভয় দান করিবেন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই আতঙ্কে মুহ্যমান হইয়া পড়িবে। ঢক্কা-নিনাদের প্রথম শব্দ উত্থিত হইবামাত্র পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিবে, ঘর-বাড়ী—এমন কি পর্ব্বতাদি পর্য্যন্ত—সে কম্পনে ভূতলশায়ী হইবে; স্বর্গ গলিয়া যাইবে; সূর্য্য-অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে; নক্ষত্র-সমূহ কক্ষচ্যুত হইয়া নিপতিত হইতে থাকিবে; সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া শুকাইয়া যাইবে। (মতান্তরে) সূর্য্য-চন্দ্র নক্ষত্রসমূহ পৃথিবীর মধ্যে নিপতিত হইবে এবং তাহাতে সমুদ্র জ্বলিয়া উঠিবে। কোরাণের বর্ণনায় প্রকাশ—,—'সেই দিনের ভীষণতায় জননী স্তন্যপায়ী শিশুকে পরিত্যাগ করিবে। কেহই আপন আপন মূল্যবান প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। জীব-জন্তু-প্রাণি-সমূহ আপন-আপন স্বভাবসিদ্ধ হিংস্র-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, অন্যান্য নিরীহ প্রাণীর সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিবে এবং পরিশেষে প্রজ্বলিত অনলে প্রাণ-বিসর্জ্জনে বাধ্য হইয়া সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" এই সকল

মুসলমানদিগের মত।

* "And there shall be upon every lofty mountain and upon every high hill, rivers and streams of waters in the day of the great slaughter when towers fall. Moreover the light of the moon shall be as the light of the sun and the light of the sun shall be sevenfold as the light of seven days."—*Isaiah*. XXX, 25-26.

† কোরাণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শেষের সে দিনের ভীষণতার বিষয় ও ঐ দিনের আগমনের পূর্ব্বের লক্ষণ-সমূহ বর্ণিত আছে। কোরাণের উনচত্বারিংশ অধ্যায়ে; যথা,—"The trumpet shall be sounded and whoever are in heaven and whoever are on the earth shall expire, except those whom God shall please to exempt from the common fate.—*Vide*. Dr. Sale, *Koran Surah*. XXXIX. কোরাণের ২২শ অধ্যায়ে এবং ৫০শ অধ্যায়ে মাতার সন্তান-ত্যাগের ও সকলের আত্মীয়-স্বজনে পরিত্যাগের বর্ণনা বিবৃত আছে। প্রথম ঢক্কানিনাদের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপভাবে পৃথিবী ও স্বর্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। কোরাণের ৬৯শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই,—চারিটি প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানতঃ তিন প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংসের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; যথা,—ইরাণীয়-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থে তুষার-সম্পাতে, ইহুদী ও খৃষ্টান-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থে জলপ্লাবনে এবং মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে ভীষণ অনল-প্রবাহে, ইত্যাদি।

হিন্দু-শাস্ত্রে জল-প্লাবনাদি।

ইহুদী এবং খৃষ্টানদিগের বর্ণিত জল-প্লাবনের বিষয় আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থের নানা স্থানে উল্লিখিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে, মৎস্য-পুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে এবং মহাভারতে জলপ্লাবনের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। * মহর্ষি মনু জীবজন্তু ও উদ্ভিদাদির বীজ লইয়া সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছিলেন, ঐ সকল গ্রন্থে তাহা পরিবর্ণিত আছে। বাহুল্য-ভয়ে সে সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম না। কারণ, তদ্বিবরণ এই গ্রন্থের অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তবে সূর্য্য-রশ্মি বা অগ্নি সংযোগ পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার বিষয় কিরূপ-ভাবে কোথায় পরিবর্ণিত আছে, তাহার একটু আভাষ প্রদান করিতেছি। কূর্ম্ম-পুরাণের 'উপরিভাগ' অংশের ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে সেই ভীষণ প্রলয়ের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়; যথা,—'চতুর্যুগ সহস্রের পর প্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত প্রজাকে আত্মগত করিবার নিমিত্ত প্রজাপতি অভিলাষ করেন। তদনন্তর শতবর্ষব্যাপিনী সর্ব্বভূতক্ষয়করী সর্ব্বভূতভয়ঙ্করী ঘোর প্রবল অনাবৃষ্টি হয়। তদনন্তর পৃথিবীর মধ্যে যে সকল প্রাণী দুর্ব্বল, তাহাদেরই প্রথমতঃ প্রলয় হইয়া থাকে ও তাহারা মৃত্তিকাত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সপ্ত-রশ্মি প্রকাশ করতঃ দিবাকর উদগত হইয়া থাকেন। ঐ রশ্মি-জাল দ্বারা সূর্য্য জলকে পান (বাষ্পাকারে পরিণত করতঃ আকর্ষণ) করেন। তৎকালে তাঁহার রশ্মি কেহই সহ্য করিতে পারে না। ঐ জল পান দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া সপ্ত-রশ্মি সপ্ত সূর্য্যাকারে পরিণত হয়। তদনন্তর ঐ সপ্ত-রশ্মি চতুর্দ্দিকস্থ জল শোষণ করিয়া বহ্নির ন্যায়, লোক চতুষ্টয়কে (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ও মহর্লোক) দগ্ধ করিতে থাকে। সেই সপ্ত-ভাস্কর স্ব স্ব রশ্মি দ্বারা ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে ব্যাপ্ত এবং প্রলয়-কালীন অগ্নির সহিত মিশ্রিত হইয়া অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। সেই সপ্তসূর্য্য বারিশোষণ করতঃ প্রদীপ্ত ও বহু-সহস্র রশ্মিযুক্ত হইয়া আকাশমণ্ডল আবরণ-পূর্ব্বক পৃথিবীকে দহন করিতে থাকে। তদনন্তর পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র ও দ্বীপের সহিত বর্ত্তমানা বসুন্ধরা সেই সকল সূর্য্যের প্রতাপে দহ্যমানা হইয়া নীরস হইয়া যায়। সর্ব্বত্র-পরিব্যাপ্ত ঐ প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মি-সমূহ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ব সমস্তই আবৃত করিয়া ফেলে। সূর্য্যানলে প্রসৃষ্ট ও পরস্পর-সংসৃষ্ট পদার্থ সকল একত্ব প্রাপ্ত হইয়া এক-জ্বালা-বিশিষ্ট হয়। অনন্তর উহা সর্ব্বলোকনাশক অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া তেজ দ্বারা এই সমস্ত চতুর্লোক শীঘ্র দহন করিতে থাকে।...ঐ অগ্নি-দ্বারা লোকচতুষ্টয় সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত হইলে ঐ তেজ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগৎ তখন উত্তপ্ত লৌহ-গোলকের ন্যায় একত্র মিলিতরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল।' ‡ ইহার পর প্রলয়-কালীন বারিবর্ষণ, বিশ্বের

* শতপথ ব্রাহ্মণ, প্রথম কাণ্ড, অষ্টম ব্রাহ্মণ, ১০ম অধ্যায়; মৎস্য-পুরাণ, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়; মহাভারত, বনপর্ব্ব, সপ্তাশীত্যধিক শততমাধ্যায়; "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ডের ৮২ ও ১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে প্রথমে লেবনিজ এই ভাবের কথাই বলিয়াছেন। পৃথিবী প্রথমে যে

একার্ণবত্ব এবং বীজরূপে সংসারের অবস্থিতি প্রভৃতির বিষয় পরিবর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ, সপ্ত-সূর্য্যের অগ্নিবর্ষী তেজে পৃথিবীর ভস্মীভূত হওন এবং প্রলয়-কালীন জলপ্লাবনে পৃথিবীর ধ্বংস-সাধন, দুই বিষয়ই প্রোক্ত অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বেরও দুইটী অধ্যায়ে এই দুই বিষয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ে বৈবস্বত মনুর ও মৎস্যাবতার প্রসঙ্গে জলপ্লাবন, মনু, তাঁহার নৌকা ও সৃষ্টির বীজ-রক্ষার বিষয় বর্ণিত আছে। আবার অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়-নারায়ণ সংবাদে সপ্ত-সূর্য্যের খরকরতাপে সংহারের ভীষণ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সে বর্ণনার কিয়দংশ,—'সেই সহস্র চতুর্যুগের অবসানে লোকের আয়ুঃক্ষয় সময়ে বহু বৎসর কাল অনাবৃষ্টি হইবে।... তাহাতে ভূয়িষ্ঠ প্রাণিবর্গ অল্পসার ও ক্ষুধিত হইয়া পৃথিবীতে সংহার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তদনন্তর সপ্ত-সূর্য্য উদিত হইয়া সরিৎ ও সরিৎ-পতির সমস্ত সলিল শোষণ করিতে থাকিল। শুষ্ক বা আর্দ্র যে কিছু তৃণকাষ্ঠ সকলই ভস্মীভূত দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে বায়ুর সহিত সংবর্ত্তক বহ্নি আদিত্য কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-শোষিত পৃথিবী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।...সেই অগ্নি অধঃস্থলে, নাগলোকে ও পৃথিবীতলে যে কিছু বস্তু ছিল, তৎসমুদায় ক্ষণমধ্যে দগ্ধ করতঃ বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। সহস্র যোজন এই জগৎ সেই অশুভ বায়ু সহ সংবর্ত্ত-বহ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া গেল। সেই প্রদীপ্ত বিভু বহ্নিদেব—অসুর, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণের সহিত সমুদায় জগৎ একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।' মৎস্য-পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়েও এই একই প্রকার উক্তি দৃষ্ট হয়। সেখানে মৎস্য কহিতেছেন,—'অদ্য হইতে মহীমণ্ডলে এক শত বৎসর পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হইবে। অনাবৃষ্টির ফলে অচিরেই ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। অনন্তর দিবাকরের সুদারুণ সপ্ত-রশ্মি প্রতপ্ত অঙ্গার-রাশি বর্ষণ করতঃ ক্রমশঃ প্রাণিগণের সংহার-সাধন করিবে। যুগ-ক্ষয়ের উপক্রম বাড়বানল বিকৃত হইবে। ইত্যাদি।' এইরূপে সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার পর বিধি-নিয়োজিত মেঘমণ্ডলী ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ কাল (মতান্তরে অজস্র) জলধারায় বিশ্বমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন। সেই জলে বীজরূপে সৃষ্টি অবস্থিত থাকে। পরিশেষে স্রষ্টার ইচ্ছা অনুসারে তৎসমুদায়ের পুনরুৎপত্তি সাধিত হয়। মৎস্যপুরাণের ও কূর্ম্মপুরাণের এবং মহাভারতের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার সহিত ইহুদী-দিগের, খৃষ্টানগণের ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ-বর্ণিত প্রলয়াদির কতদূর সাদৃশ্য আছে, সহজেই প্রতীত হইতে পারে। সেখানেও সূর্য্য সপ্তগুণ কিরণসম্পন্ন, এখানেও সপ্ত সূর্য্য প্রদীপ্ত। স্থূলভাবে সকল বিষয় বিবৃত হইল; পুঙ্খানুপুঙ্খ মিলাইয়া দেখিলে, একের সহিত অন্যের অপরাপর সাদৃশ্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। এখন, হিমানীতে পৃথিবী ধ্বংস-সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে কি আভাষ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। হিমানীতে তুষার-সম্পাতে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার যে বিবরণ জেন্দ-আভেস্তায় দেখিতে পাই, তাহা শতপথব্রাহ্মণেরই বর্ণনার অনুসরণ বলিয়া বুঝা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে 'ঔঘ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঔঘ বা ভীষণ বন্যায় প্রলয় সংসাধিত হইয়াছিল, ইহাই স্থূলতঃ উপলব্ধি হয়। কিন্তু প্রলয়

জ্বলন্ত ধাতু-নিঃস্রাবের ন্যায় অবস্থিত ছিল (Earth was originally in a molten state from heat). লেবনিজের উক্তিতেই তাহা বুঝা যায়।

যে হিমানী, তুষার বা বরফ পতনে সংসাধিত হয়, পাণিনির ব্যাকরণে 'প্রালেয়' শব্দের উৎপত্তি-তত্ত্বে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে, শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার 'আর্কটিক হোম ইনি দি বেদস্' অর্থাৎ 'বেদবর্ণিত উত্তর-মেরুবাস' বিষয়ক গ্রন্থে তুষার-পাত-জনিত প্রলয়-সম্বন্ধে, বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'ওঘ শব্দে যে বন্যা বুঝায়, সে বন্যায় হিমপ্রধান-প্রদেশে তুষারপাত হইয়াছিল; তাই হিমপ্রধান-দেশবাসী ইরাণীয়গণের জেন্দ-আভেস্তা-গ্রন্থে তাহা তুষারপাত বলিয়া এবং অন্য দেশে বন্যা বলিয়া পরিচিত আছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও তুষার-যুগের বর্ণনায় এইরূপ কথাই কহিয়া থাকেন।' * তাঁহার গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য,—'তুষার-যুগ বা গ্লেসিয়াল এপক (Glacial Epoch)। সেই যুগে আত্যন্তিক শীতে উত্তর-মেরু বিধ্বস্ত সুতরাং বাসের অযোগ্য হয়। ফলে, আর্য্যগণ উত্তর-মেরু পরিত্যাগ করিয়া মধ্য-এসিয়ার দিকে অগ্রসর হন। ইহা হইতে তুষার-পাত-জনিত প্রলয়ের প্রসঙ্গই সূচিত হয় না কি?

জল-প্লাবন সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্র-গ্রন্থে এবং বাইবেলাদিতে যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, † প্রাচীন জাতিদিগের অনেকেরই মধ্যে সেইরূপ কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। প্রাচীন মিশরে

মিশরে ও গ্রীসে।

জল-প্লাবনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিশরীয়গণ বলেন,—সেই জল-প্লাবনে 'ওসিরিস' (Osiris) রক্ষা পাইয়াছিলেন। কেবল নামের পরিবর্ত্তন! নচেৎ, বাইবেলের বর্ণিত জল-প্লাবনে নোয়া যেমন পুত্রকলত্র-সহ নৌকারোহণে রক্ষা পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, ওসিরিসও সেইরূপ পুত্রকলত্রাদি-সহ নৌকারোহণে জল-প্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন,—মিশরে প্রচারিত আছে। ওসিরিস যখন 'আর্ক' বা নৌকায় আরোহণ করেন, তখন পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। কিছুকাল পরে আলোকের উদয় হয়। আলোকের সঙ্গে সঙ্গে ভূ-খণ্ড জাগিয়া উঠে। তখন সমস্ত জীবজন্তু-উদ্ভিদাদির বীজসহ তিনি ভূতলে অবতরণ করেন। কিংবদন্তী এই,—'বহিত্র হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমে তিনি দ্রাক্ষালতা রোপণ করেন। তার পর মনুষ্যদিগকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেন। ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে মনুষ্য-সমাজে তিনিই প্রথম শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন।' ‡ গ্রীসের ইতিহাসের জলপ্লাবনের বর্ণনায় দেখিতে পাই,—'পৃথিবীতে পাপাচারের বৃদ্ধি দেখিয়া, জিয়াস (Zeus) বড়ই রুষ্ট হন এবং বন্যার দ্বারা গ্রীস-দেশকে প্লাবিত করেন। অবিরাম ভীষণ বর্ষণ আরম্ভ হয়। অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ ভিন্ন সকলই জলমগ্ন হইয়া যায়। সেই সময় একটী আর্ক বা সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া 'ডিউকেলিয়ন' (Deukalion)

---

* এতদ্বিষয়ে তিলকের সিদ্ধান্ত,—"Nevertheless it seems that the Indian story of deluge refers to the same catastrophe as is described in the Avesta and not to any local deluge of water and rain. For the Shataptha Brahmana mentions only a flood (*aughah*) the word *praleya*, which Panini (VII, 3,2) derived from *pralaya* (deluge) signifies 'snow', 'frost' or 'ice, in the later Sanscrit literature. This indicates that the connection of ice with the deluge was not originally unknown to the Indians, though in later time it seems to have been entirely overlooked"—*The Arctic Home in the Vedas.*

† আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থে এবং বাইবেলাদিতে জল-প্লাবনের বিষয় যাহা লিখিত আছে, এই পরিচ্ছেদের ১২৮শ পৃষ্ঠায় তাহা দ্রষ্টব্য।

‡ *Vide*, Dr. Bryant's *Egyptian Mythology.*

সস্ত্রীক রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা 'প্রমেথিউস' (Prometheus) তাঁহাকে জলপ্লাবন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। পিতাই পুত্রকে তরণী নির্ম্মাণ করিতে উপদেশ দেন। নয় দিন কাল জলের উপর সেই তরণী, ভাসমান ছিল। অবশেষে 'পারনাসাস' পর্ব্বতের শিখর-দেশে ডিউকেলিয়ন অবতরণ করেন। এই সময় 'জিউস' তাঁহার নিকট হারমেস্‌কে (Harmes) পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ডিউকেলিয়ন তখন সেই নির্জ্জন স্থানে মনুষ্যগণকে এবং সহচরদিগকে পাঠাইয়া দিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে জিউস,—ডিউকেলিয়ন ও তাঁহার স্ত্রী পীঢ়া (Pyrrha) উভয়কে শূন্যের দিকে প্রস্তর-খণ্ড-সমূহ নিক্ষেপ করিতে বলেন। পীঢ়া যে সকল প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ করে, তাহাতে নারীজাতির সৃষ্টি হয়। ডিউকেলিয়ন-নিক্ষিপ্ত প্রস্তর হইতে পুরুষগণ উৎপন্ন হন। এই হইতে গ্রীসে প্রস্তর-যুগের লোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ডিউকেলিয়ন আর্ক হইতে অবতরণ করিয়া জিউস, ফিক্সিয়স (Zeus Phyxios) অর্থাৎ পরিত্রাণ-কর্ত্তা ঈশ্বরের পূজা করিয়াছিলেন। গ্রীসের ঐতিহাসিক যুগে গ্রীসে এই জলপ্লাবনের বিষয় সকলেই—এমন কি অরিষ্টটল পর্য্যন্ত—বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন।' * কেহ কেহ আবার বলেন,—'গ্রীসে এবং মিশরে জল প্লাবনের সময় যিনি নৌকার সাহায্যে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম—'পারসিউস' (Perseus)। পারসিউস—জ্যোতির্ব্বিৎ, ঐতিহাসিক এবং বিজ্ঞানবিৎ বলিয়া পরিচিত। তাঁহার জন্ম-বৃত্তান্ত বিশেষ কৌতুকপ্রদ। স্বর্ণ-বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্ম হয়। সেই সময় তিনি নৌকার উপর পতিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। মিশরে ও গ্রীসে—উভয় দেশেই তিনি সম্পূজিত হইয়া থাকেন।

প্রাচীন কাল্‌ডীয় জাতির মধ্যে জল প্লাবনের যে বিবরণ প্রচারিত আছে, তাহাতে জানা যায়, ইসুথ্রাস রাজার রাজত্ব-কালে কাল্‌ডিয়ায় জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল। ওয়ানো নামক দেবতা সেই রাজাকে জল-প্লাবনের বিষয়ে ভবিষ্য-বাণী করেন। ওয়োনা দেবতার আকার—ঊর্দ্ধভাগ মনুষ্যের ন্যায়, অধোভাগ মীন-সদৃশ। সেই দেবতার উপদেশে এক বৃহৎ অর্ণবপোত প্রস্তুত করিয়া রাজা সপরিবারে আত্ম-রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন চীন-দেশেও এই জল-প্লাবনের ইতিহাস প্রচারিত আছে। সেই ভীষণ জল-প্লাবনে, মহাত্মা 'পয়ানুস্থ' সপরিবারে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সিরীয়া-দেশে জল-প্লাবনের বিষয় প্রচারিত আছে। একটি গুহা দেখাইয়া প্রাচীন সিরীয়া-বাসিগণ বলিতেন,—'এই গুহার মধ্য দিয়া জল-প্লাবনের পর জল নিঃসরণ হইয়াছিল।' আমেরিকার মেক্সিকো ও ব্রাজিল প্রভৃতি দেশেও জল-প্লাবনের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। মেক্সিকো-বাসিগণ বলেন,—'তিতিকাকা' হ্রদ হইতে 'ভিরাকোচা' তাঁহাদের দেশে আগমন করেন। তিনি 'তিয়াগোয়ানকো' নামক গিরিশৃঙ্গে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে অনেক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। তিয়াগোয়ানাকো হইতে ভিরাকোচা 'কুচ্‌কো' নামক স্থানে গমন করেন। তাঁহা হইতে ক্রমশঃ মনুষ্য-সমাজ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। কিউবা-দ্বীপে জল-প্লাবন এবং নৌকা-সাহায্যে কয়েক জনের রক্ষার বিষয় প্রচারিত

কাল্‌ডিয়া ও চীন প্রভৃতি দেশে।

---

* *Vide*, Groate's *History of Greece.*

আছে। পেরু-দেশের বিবরণে প্রকাশ—'পৃথিবীতে ছয়টী মাত্র মনুষ্য সেই জল-প্লাবনে রক্ষা পাইয়াছিল।' ব্রাজিলের বিবরণ বিশেষ কৌতুকপ্রদ। এম থেবেট তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'কেরেবি-জাতীয় 'সুম' সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র,—'টামেণ্ডোনের' ও 'আরিকোণ্ট'। সেই দুই পুত্রের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব ছিল না। দুই ভ্রাতা দুইরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন ছিল। টামেণ্ডোনের শান্তিপ্রিয় ছিল; কিন্তু আরিকোণ্ট যুদ্ধ-বিগ্রহ ভালবাসিত। এই হেতু উভয়ে উভয়কে ঘৃণা করিত। উভয়ে প্রায়ই বিবাদ-বিসম্বাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত। এক দিন আপনার বল-বিক্রম দেখাইবার জন্য আরিকোণ্ট আপনার সহোদরের আবাস-ভবনের দ্বারদেশ লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রত্যাগ করে। ঐই ঘটনায় গ্রামকে গ্রাম একেবারে আকাশে উঠিয়া যায়। টামেণ্ডোনের তখন ভূমির উপর সজোরে আঘাত করে। সেই আঘাতে ভূ-গর্ভ হইতে অবিরাম জলস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই জল আকাশে মেঘমণ্ডল পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠে এবং তাহাতে পৃথিবী পরিপ্লাবিত হয়। টামেণ্ডোনের ও আরিকোণ্ট দুই ভাই তখন মিলিত হয় এবং পরিবারাদি সঙ্গে লইয়া এক অত্যুচ্চ পাহাড়ে আরোহণ করে। কিছুকাল পরে জল কমিয়া আসিলে, তাহারা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়াছিল। অবশেষে দুই ভাইয়ের দুই বংশে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়।' এইরূপ, পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাচীন জাতির মধ্যেই কোনও-না-কোনও আকারে জল-প্লাবনের কাহিনী প্রচারিত আছে। একটু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক মিলাইয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়,—একই কাহিনী নানা স্থানে নানা ভাবে পল্লবিত হইয়া প্রচারিত রহিয়াছে।

জল-প্লাবনের বিষয় নানা দেশে নানা ভাবে প্রচারিত থাকিলেও, পণ্ডিতগণ তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা অভিনব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য,—

জলপ্লাবন সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক।

বাইবেলের বর্ণিত মোজেস-কথিত জল-প্লাবনের বিষয় লইয়াই সেই বিচার-বিতর্ক। বিচার-কালে কেহ বলিয়াছেন,—এরূপ পৃথিবী-ব্যাপী জল-প্লাবন অসম্ভব। কেহ বা, কিরূপে উহা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার প্রমাণ-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছেন। ডক্টর বার্ণেট প্রথমোক্ত সংশয় উত্থাপন করিয়া বলেন,—'পৃথিবী যে পরিমাণ জলে আবৃত হইয়াছিল বলিয়া মোজেস প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সমুদ্রের সমস্ত জল একত্রীভূত হইলেও তত অধিক পরিমাণ জল হয় না। যদি সমস্ত সমুদ্র শুকাইয়া বাষ্পে পরিণত হয় এবং সমস্ত মেঘ জল হইয়া একযোগে পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহা হইলেও জল-প্লাবনের বর্ণিত জলের অনেক অভাব থাকে।' এইরূপ সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ডক্টর বার্ণেট এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে ডে'কার্টের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। ডে'কার্টের মত এই যে,—'জল-প্লাবনের পূর্ব্বে পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার ও সমতল ছিল। তখন উহার উপরে পর্ব্বত বা অধিত্যকা উপত্যকাদির উদ্ভব হয় নাই।' পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন,—'পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন নানা পদার্থের সমবায়ে পৃথিবী প্রথমে ঘন ফুটন্ত উত্তপ্ত তরল পদার্থ রূপে অবস্থিত ছিল। সেই ফুটন্ত উত্তপ্ত তরল অবস্থা ক্রমে শৈত্য

প্রাপ্ত হয়। তাহাতে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে, ধীরে ধীরে স্তর-পর্য্যায় গঠিত হইয়া আসে।' ডে'কার্টের উক্ত মত অনুসরণ করিয়া ডক্টর বার্ণেট সিদ্ধান্ত করেন,—'পৃথিবী তখন সমুদ্র-জলের উপর শম্বুকের খোলার ন্যায় অবস্থিত ছিল। প্রলয়ের জল-বৃদ্ধিতে সেই খোলা ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইবা-মাত্র তাহা জলে নিমগ্ন হয়।' কিন্তু অপর পক্ষ এ মত মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন,—'মোজেসের উক্তিতে শম্বুকের খোলার ন্যায় সমতল পৃথিবীর বর্ণনা দৃষ্ট হয় না।' মোজেস বলিয়া গিয়াছেন,—'জল-প্লাবনের সময় পৃথিবীর উপর উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ-সমূহ বিদ্যমান ছিল।' মিঃ হুইষ্টন, তৎপ্রণীত 'নিউ থিওরি অব আর্থ' * নামক গ্রন্থে জল-প্লাবনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া, আর এক মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'জলপ্লাবন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী ধূমকেতু পৃথিবীর অতি সন্নিকটে উপনীত হইয়াছিল। পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যস্থলে, পৃথিবীর অতি নিকটে যখন সেই ধূমকেতু উপনীত হয়, সেই সময় তাহার প্রবল আকর্ষণে সমুদ্রের জলরাশি স্ফীত হইয়া বন্যার সৃষ্টি করে। ধূমকেতু যত নিকটবর্ত্তী হয়, সমুদ্র-জল ততই স্ফীত হইয়া উঠে। সমুদ্র-জল যতই স্ফীত হয়, পৃথিবীও জলরাশিতে সেই পরিমাণ মগ্ন হইয়া পড়ে।' হুইষ্টন আরও বলেন,—'মোজেসের উক্তিতে প্রকাশ, গভীর গহ্বর হইতে যেন জলোচ্ছ্বাস বহির্গত হইয়াছিল; জলরাশি স্ফীত হইলে, পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতেই জল উত্থিত হইতেছে বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং পৃথিবীর সন্নিকটে ধূমকেতুর আগমনে যে ঐরূপ জল-প্লাবন ঘটিয়াছিল, তাহা অবিসম্বাদিত। আবার সেই ধূমকেতু পৃথিবীর নিকটে আসায় পৃথিবীর অনেক জল বাষ্প হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। সেই বাষ্প জলরূপে পরিণত হওয়ায় মুষলধারে বারিবর্ষণ হইয়াছিল। আর মোজেস তাহাতেই বলিয়াছিলেন,—প্লাবনের সময় স্বর্গের গবাক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং তাহাতে চল্লিশ দিন অবিরত বৃষ্টি হয়।' * বিশেষ বিশেষ কালে ধূমকেতু যে পৃথিবীর নিকট দিয়া গমন করে এবং তাহার ফলে জলপ্লাবনাদি সংঘটিত হয়, হুইষ্টন তদ্বিষয় প্রতিপন্ন করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা পাইয়াছেন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর সন্নিকটে যে ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, সেই ধূমকেতুকেই জল-প্লাবন কালের ধূমকেতু বলিয়া তাঁহার ধারণা হয়। ফরাসী-দেশীয় পণ্ডিত এম ডি বোমণ্ট বলেন,—'পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ-বশতঃ সহসা দক্ষিণ-আমেরিকার অন্তর্গত এণ্ডিস-গিরিশ্রেণীর কর্ডিলেরা-শৃঙ্গ উত্থিত হয়। জল বিশুষ্ক হইয়া পনের-বিশ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতের উদ্ভব হওয়ায় এক স্থানের জল অন্য স্থানে গিয়া সঞ্চিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাহাতে, এক দিকের জল অন্য দিকে পরিচালিত হওয়ায়, শেষোক্ত দিক প্লাবিত হইয়াছিল। এইরূপ কোনও ঘটনায়, আদি-কালের বিদ্যমান পৃথিবীতে জল-প্লাবন হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।' যাঁহারা বলেন,—'সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিতে পারে, এত জল পৃথিবীতে নাই'; তাঁহাদের এরূপ ধারণাকে কেহ কেহ ভ্রম-ধারণা বলিয়া মনে করেন প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে তাঁহারা বলেন,—'যত জল আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, বাস্তবপক্ষে পৃথিবী-ব্যাপী জল-প্লাবনে তত জলের

* *Vide*, Mr. Whiston, *New Theory of the Earth.*

আবশ্যক নাই। দশ ঘন মাইল। (দশ মাইল দীর্ঘ, দশ মাইল প্রস্থ ও দশ মাইল উচ্চ) পরিমিত জলে দুই শত ছাপ্পান্ন বর্গ মাইল সমতল ভূমি প্লাবিত হইতে পারে। সে স্থলে জলের উচ্চতা সর্ব্বত্র চারি মাইল থাকে। পৃথিবী সমতল-ক্ষেত্র নহে; উচ্চ পর্ব্বতাদিতে অনেক স্থল আবৃত আছে। সেরূপ বন্ধুর ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ জলে অধিকতর বর্গ মাইল স্থান আবৃত হওয়া সম্ভবপর। ভূ-পৃষ্ঠের পরিমাণ—উনিশ কোটী পঁচানব্বই লক্ষ বার হাজার পাঁচ শত পঁচানব্বই বর্গ মাইল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তৎপরিমিত স্থানের সর্ব্বত্র চারি মাইল গভীর জলে প্লাবিত করিতে হইলে, কত জলের আবশ্যক? চারি কোটী আটানব্বই লক্ষ আটাত্তর হাজার এক শত আটচল্লিশ বর্গ মাইল স্থানে যদি ষোল মাইল গভীর জল রাখা যায়, তদ্দ্বারা সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। পৃথিবীর ঘন-পরিমাণের বিষয় বিবেচনা করিলে, পৃথিবী হইতে ঐরূপ পরিমাণ জল সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব নহে।' কেহ কেহ বলেন,—'বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় পৃথিবীর উপরিভাগের জল স্ফীত ও তদ্দ্বারা পৃথিবী পরিপ্লাবিত হওয়া সম্ভবপর।' কেহ কেহ আবার বলেন,—'জলপ্লাবন কথনই সমস্ত পৃথিবীতে হয় নাই; পৃথিবীর এক এক অংশ, এক এক সময়ে প্লাবিত হইয়াছিল মাত্র।'

ভূ-তত্ত্ববিদ্গণের মত।

জর্ম্মণ-দেশীয় প্রসিদ্ধ ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভ'সিয়াস বলেন,—'নোয়ার বিদ্যমান-কালে পৃথিবীর অতি অল্প স্থানেই—এক ক্ষুদ্রতম অংশে মাত্র—লোকের বসতি ছিল। তথন সিরীয়া ও মেসোপোটেমিয়ার সীমানার বাহিরে মনুষ্যের বসতি হয় নাই। জলপ্লাবনে পৃথিবীর সেই অংশ মাত্র প্লাবিত হইয়াছিল। এই অল্প স্থানে জলপ্লাবন উপস্থিত হইলেও তাহাকে যে বিশ্ব-বিধ্বংসী জলপ্লাবন বলে, তাহার কারণ—মনুষ্যের বাসস্থলীর সমস্ত অংশই সেই প্লাবনে প্লাবিত হয়।' অধ্যাপক লায়েল ঐ যুক্তিরই সমর্থন করেন। তিনি বলেন,—'ঐরূপ জলপ্লাবন দুই কারণে সংঘটিত হইতে পারে। প্রথম,—পৃথিবীর উপরিভাগে যে সকল স্থান সমুদ্রের সমতা অপেক্ষা উচ্চ, সেথানে যদি কোনও সুবৃহৎ হ্রদ থাকে, তদ্দ্বারা ঐরূপ জলপ্লাবন সম্ভবপর। দ্বিতীয়তঃ,—কোনও শুষ্ক বিস্তীর্ণ ভূমি-খণ্ড যদি সমুদ্রের সমতা অপেক্ষা নিম্ন হয়, আর কোনও নৈসর্গিক কারণে সমুদ্রের ও তাহার মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়, তাহা হইলে জল-প্লাবন হইতে পারে।' দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লায়েল বলেন,—'উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বোত্তর সীমানায় 'সুপিরিয়র' হ্রদ অবস্থিত। সমুদ্র হইতে ঐ হ্রদের উচ্চতা—ছয় শত ফিট। হঠাৎ ভূ-কম্পনে যদি ঐ হ্রদের দক্ষিণ পার্শ্ব বা বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে যুক্ত-রাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশ জলে প্লাবিত হইবে; তাহা হইলে, মিশিসিপি-নদীর দুই পার্শ্বে যে জনস্থলী বিদ্যমান, কোটী কোটী অধিবাসী সহ সেই জনস্থলী সুপিরিয়র হ্রদের জলে ভাসিয়া যাইবে। অন্য পক্ষে, এসিয়া মহাদেশের যে অংশ সমুদ্রের উপরিভাগ বা সমতা অপেক্ষা নিম্ন, সেই অংশের সমুদ্রের দিকের বাঁধ বা উচ্চ ভূমিখণ্ড যদি কোনও কারণে বসিয়া যায়, তাহা হইলে সে অংশে জলপ্লাবন অবশ্যম্ভাবী। পশ্চিম-এসিয়ার নিম্নভূমির পরিমাণ—চুয়ান্ন হাজার বর্গ মাইল। ঐ অংশে বহু লোকের বসতি। ঐ

প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন অংশ কাস্পিয়ান সাগরকে বেষ্টন করিয়া আছে। সেই সকল স্থান কৃষ্ণসাগরের সমতা অপেক্ষা তিন শত ফিট নিম্নে অবস্থিত। কোনও কারণে কৃষ্ণ-সাগরের দিকের প্রাকৃতিক বাঁধ যদি ভাঙ্গিয়া যায়, আর কৃষ্ণ-সাগরের জল যদি ঐ অংশে প্রবেশ করে, তাহা হইলে ঐ অংশে তিন শত ফিট উচ্চ পর্ব্বত থাকিলেও তাহা ডুবিয়া যাইতে পারে। এতদপেক্ষাও বিস্তৃত কোনও নিম্নভূমি পুরাকালে এসিয়ায় বিদ্যমান ছিল বলিয়া যদি মনে করা যায়, তাহা হইলে কত উচ্চতর পর্ব্বত ঐরূপ জল-প্লাবনে নিমগ্ন হওয়া সম্ভবপর, সহজেই প্রতীত হয়।' জলপ্লাবনে বা তুষার-পাতে পৃথিবী যে এক সময়ে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ভূ-স্তরস্থিত জীবজন্তুর কঙ্কালাদি দৃষ্টে ভূতত্ত্ববিদ্গণ তদ্বিষয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। ভূ-তত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—'প্রুশিয়া, ডেনমার্ক এবং ইউরোপের বিভিন্ন অংশে অধুনা যে কঙ্করময় ও সারমাটি-পূর্ণ ক্ষেত্র দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় কোথা হইতে আসিল? কোনও নদী বা জলস্রোতের দ্বারা তৎসমুদায় যে সঞ্চিত হইতেছে, তাহার কোনও নিদর্শন পাই না। সাইবেরিয়ায়, বেরিং-প্রণালীতে, টাস্কেনির অন্তর্গত আর্ণো উপত্যকায় এবং জর্ম্মণীর ও ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সকল অস্থি-কঙ্কালাবশেষ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই বা কোথা হইতে আসিল? জর্ম্মণীর উত্তরাংশে এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে বালুকা-রাশির মধ্যে যে সকল নুড়ি প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় প্লিষ্টোসিন যুগের প্রস্তর বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে। যে পর্ব্বতে ঐ সকল নুড়ি প্রস্তর খণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহা শত শত মাইল দূরে অবস্থিত। সেই সকল নুড়ি প্রস্তরই বা কোথা হইতে আসিল?' ডক্টর বাক্ল্যাণ্ড বলেন,—'ইংলণ্ডের নানা স্থানে হস্তী, গণ্ডার, তরক্ষু ও অন্যান্য প্রাণীর অস্থি-কঙ্কাল দৃষ্ট হয়। স্কটলণ্ডের ও আয়র্লণ্ডের কোনও কোনও স্থানেও ঐরূপ অস্থি-কঙ্কালাদি দেখা যায়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ব্রান্সউইক সহরের নিকটবর্ত্তী থিড-পল্লীতে অনেক গজদন্ত ও হাড় পাওয়া গিয়াছিল। সেই সকল গজদন্তের কতকগুলির দৈর্ঘ্য—চৌদ্দ পনের ফিটেরও উপর। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর্ণো-উপত্যকায় প্রায় শতাধিক সিন্ধু ঘোটকের কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ফ্লোরেন্স সহরের যাদুঘরে নানাবিধ জন্তুর কঙ্কালের সহিত সেই সকল কঙ্কাল রক্ষিত রহিয়াছে। রুশিয়ার ও সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত প্রদেশে গণ্ডার, হস্তী ও ঘোটক প্রভৃতির কঙ্কালাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এসিয়া-মহাদেশের অন্তর্গত রুশ-রাজ্যে ডন-নদীর কিনারা হইতে চুচিস-অন্তরীপের সীমানা পর্য্যন্ত যে সকল নদী-প্রবাহ বিদ্যমান, তাহার প্রায় সকল নদীর তীরেই হস্তীর এবং অন্যান্য জন্তুর অস্থি-কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রদেশে ঐ সকল জন্তু অধুনা আদৌ দৃষ্ট হয় না। ঐ সকল জন্তুর কঙ্কালাদি ঐ সকল স্থানে কোথা হইতে আসিল? পালাস বলেন,—তুষার-পাতে এক সময়ে ঐ সকল জন্তুর ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল; জলপ্লাবনে তাহাদের কঙ্কাল অন্য দেশ হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। রুশিয়ার পূর্ব্বোক্ত প্রদেশের অধিবাসীরা ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত গজদন্ত প্রভৃতি আহরণ করিয়া বিক্রয় করে। সেই সকল গজদন্ত কোথা হইতে আসিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। জল-প্লাবনের বন্যায় তৎসমুদায় ভাসিয়া আসিয়াছে বলিয়াই সাধারণতঃ প্রতীত হয়। মেক্সিকো-দেশে এবং কুইটো-প্রদেশে হামবোল্ট পূর্ব্বোক্ত

প্রকারের জীবজন্তুর কঙ্কাল দর্শন করিয়াছিলেন।' এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ডক্টর বাক্ল্যাণ্ড বলিয়াছেন,—পৃথিবী-ব্যাপী জলপ্লাবন হওয়ার বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। সেই জলপ্লাবনে ঐ সকল জীবজন্তু নিহত হয় এবং তাহাদের অস্থি-কঙ্কালাদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র—এক স্থানে হইতে অন্য স্থানে—ভাসিয়া যায়।' পাশ্চাত্য ভূ-তত্ত্ববিদ্গণের গ্রন্থে যে ডিলিউভিয়ম (Diluvium) এবং এলিউভিয়ম (Alluvium) শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়, তদ্দ্বারা যথাক্রমে জলপ্লাবনের সময়ে সঞ্চিত দ্রব্যাদির স্তর এবং জল-প্লাবনের পরবর্ত্তি-কালের অর্থাৎ অধুনা-সঞ্জাত স্তর বুঝাইয়া থাকে। এই প্রকার বিবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্গণ সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন,—'এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে পৃথিবী-ব্যাপী জলপ্লাবনের বিষয়ই প্রতিপন্ন হয়। সেই জলপ্লাবন পৃথিবীব্যাপী বলিয়া স্বীকার না করিলে, আর সেই জলপ্লাবনই শেষ-জলপ্লাবন বলিয়া মানিয়া না লইলে, ভূস্তরে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির অস্তিত্বের কারণ নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন হয়।'

মৃত্যুর পর।

প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। পৃথিবীতে সৃষ্টির সারভূত যে মনুষ্য, তাহার নানা অবস্থান্তরের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর মনুষ্য কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে কোথায় কোন্ ধর্ম্মে কোন্ সম্প্রদায়ের মধ্যে কি মত প্রচলিত আছে, দেখা যাউক। কেহ বলেন,—মৃত্যুই মনুষ্যের শেষ। কেহ বলেন,—মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে। কেহ বলেন,—মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্যের বিচার হয়; বিচারে কর্ম্মানুসারে আত্মা সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কেহ বলেন,—কর্ম্মানুসারে পুনর্জন্ম সংঘটিত হয়। কেহ বলেন—ইহ-সংসারেই কর্ম্মাকর্ম্মের ফল-ভোগ হইয়া থাকে। মূলে এই দুই মত। কিন্তু শাখা-প্রশাখায় পল্লবে-মুকুলে নানা-ভাবে প্রলয় ও পুনর্জন্ম তত্ত্ব পরিশোভিত হইয়া আছে। সৃষ্টি-সম্বন্ধে যেমন চিন্তার শেষ নাই এবং আজিও যেমন মানুষের চিন্তা কোনও অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই; প্রলয় বা ধ্বংসের মূল তথ্য অনুসন্ধানেও মানুষের মন সেইরূপ সর্ব্বকালে সমভাবে আলোড়িত হইয়া রহিয়াছে।

মৃত্যুর পর।

মৃত্যুর পর দণ্ড ও পুরস্কার আছে, ইরাণীয়গণ বিশ্বাস করেন। মৃত্যুর পর মনুষ্য কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে জেন্দ-আভেস্তার ভেন্দিদাদ-অংশে ও বুন্দেহেশ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে;—মৃত্যুর পর মানব-দেহ দানবে অধিকার করে। তখন আত্মা অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। তৃতীয় দিবসে আত্মার জ্ঞান সঞ্চার হয়। সেই রাত্রে আত্মাকে বিভীষণ 'চিনাভাদ' বা 'চিনাভার' সেতু * পার হইতে হয়। যে ব্যক্তি জীবিত-কালে পাপ কর্ম্ম করিয়াছে, সেতু পার হইবার সময় যে নরকার্ণবে নিপতিত হয়; আর যে ব্যক্তি চিরজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানে সৎকার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছে, সে ব্যক্তি অনায়াসে সেতু উত্তীর্ণ হইতে পারে। 'যাজদ্গণ' (ইজাদ)

ইরাণীয়-গণের মত।

* "Pul Chinavad or Chinavar, that is the *straight bridge* leading directly to the other world."

সৎকর্ম্মকারীদিগকে সঙ্গে করিয়া চির-শান্তিময় স্থানে লইয়া যান। সৎকর্ম্মকারিগণ সেখানে অহুর-মজদ্ ও অংশস্পন্দ-গণের সহিত মিলিত হন। স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাসীন হইয়া 'হুরান্-ই-বেহিস্ত' * নাম্নী পরীগণের সহবাসে সর্ব্বপ্রকার আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। ইরাণীয়-গণের স্বর্গের নাম—'গারো-ডে-মান'। পারস্য-ভাষায় উহা 'গারাৎমান' নামে অভিহিত। যাহারা পাপাচারী, সেতু হইতে তাহারা 'দুযথ' নামক দুঃখার্ণবে নিপতিত হইয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। তথায় 'দেবগণ' (হিন্দু-মতে দৈত্য-গণ) তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করে। কোন্ পাপাচারী কত দিন দুঃখার্ণবে কিরূপ-ভাবে যন্ত্রণা ভোগ করিবে, অহুর-মজ্দ্ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। উপাসনা দ্বারা এবং বন্ধু-বান্ধবের মধ্যস্থতায় কাহারও কাহারও দুঃখভোগের কাল-পরিমাণ কখনও কখনও হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির অবসানে পৃথিবী ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে, একজন অবতারের † আবির্ভাব হইবে। তিনি অত্যাচার-অবিচার হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবেন; তখন পৃথিবীতে অনন্ত-সুখের রাজত্ব—অহুর-মজ্দের স্বর্গরাজ্য—সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার পর বিশ্বব্যাপী পুনরুত্থানে বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজন পুনরায় মিলিত হইতে পারিবেন। সেই আনন্দের সম্মিলন সঙ্ঘটিত হইলে সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য ঘটিবে। যাহারা অধর্ম্মাচারী, তাহারা তখন ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিবে। তখন 'অহ্রিমান' উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে; 'চিনাভাদ' মনস্তাপে বিক্ষোভিত হইবে। অবশেষে একটী জ্বলন্ত ধূমকেতু পৃথিবীতে নিপতিত হইয়া পৃথিবীকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। গলিত ধাতু-নিঃস্রাবের ন্যায় পর্ব্বত-সমূহ অগ্ন্যুত্তাপে গলিয়া যাইব। সৎ-অসৎ সকল মনুষ্যই সেই উত্তপ্ত বন্যাস্রোত মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া পবিত্রীকৃত হইয়া আসিবে। সে বিক্ষোভে 'অহ্রিমান' পরিবর্ত্তিত এবং 'দুযথ' পবিত্র হইবে। এইরূপে পাপের ধ্বংস-সাধনে মনুষ্য চির-আনন্দ লাভ করিবে।

ইহুদীদিগের জুডাইজম্ ধর্ম্ম-মতে মৃতুর পর বিচারের একটী শেষ দিন নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই দিনে মৃত ব্যক্তিগণের (বা তাহাদের আত্মার) পুনরভ্যুত্থান ঘটিবে। সেই দিন পাপ-পুণ্যের বিচার হইবে। কে পাপী, কে পুণ্যবান্,—নির্দ্দিষ্ট একটী সেতু পার হইবার সময়ই তাহা স্থির হইয়া যাইবে।

ইহুদী-দিগের মত।

ইহুদী-গণের ধর্ম্মগ্রন্থে, পরীক্ষার দিনের সেতুর বিষয় উল্লিখিত আছে; তুলাদণ্ডে পাপ-পুণ্যের বিচারের কথা আছে; আর 'মেশিয়া' বা অবতারের আবির্ভাবের কথা আছে; পরিশেষে চিরশান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইয়াছে। ইহুদী-গণের ধর্ম্মগ্রন্থ 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টে' প্রকাশ,—সূত্রবৎ সূক্ষ্ম সেতুর উপর দিয়া মনুষ্যকে শেষ দিনে

---

* হুরাণ-ই-বেহিস্ত (*Hooran-i-Behisht*) নাম্নী স্বর্গীয় পরীদিগের রূপের বর্ণনায় তাহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পারসিক মেগি-গণের স্বর্গের অপর নাম—'বিহিস্থ' এবং 'মিনু'। উহার অর্থ—শ্বেত-প্রস্তর বা কাচবৎ শুভ্র। সেখানে নিত্য-আনন্দ বিরাজিত।

† এই অবতারের নাম বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়! 'সা-হিরিস্তাণীর' মতে,—ঐ অবতারের নাম—"উসিজার বেকা"। পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণের কেহ বলেন, ঐ অবতারের নাম,—'সোসিওচ', কেহ বলেন—'ওস্‌চেদার বামী', কেহ বলেন—'ওস্‌দেদার মা', কেহ বলেন—'পাশোতাল',। পারসিক-গণের ধর্ম্মগ্রন্থে এই অবতার প্রধানতঃ 'সওসন্ত' নামে অভিহিত হন।

গমন করিতে হইবে। নিম্নে ভীষণ নরক; পাপাত্মগণ সেই সেতু হইতে নরকার্ণবে নিপতিত হইবে।' ইহুদীগণের নিকট পৌত্তলিকগণই প্রধানতঃ পাপাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়। পৌত্তলিক-গণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও যে সে-সেতু পার হইতে হইবে, তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে সেরূপ কোনও উক্তি নাই। * তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ-মতে,—মনুষ্যের পাপ-পুণ্য দুই খানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে; শেষ বিচারের দিন সেই দুই খানি গ্রন্থ তুলাদণ্ডের দুই দিকে রাখিয়া প্রতি জনের পাপ ও পুণ্যের পরিমাপ করা হইবে। সেই পরিমাপে, পাপের ভার গুরু হইলে, পাপাত্মা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে; পুণ্যের ভাগ বেশী হইলে, পুণ্যাত্মা স্বর্গ লাভ করিবেন। ইহুদী দিগের স্বর্গের নাম—'ইডেন'। ঐ স্বর্গ বহুমূল্য প্রস্তরে সুগঠিত। স্বর্গের তিনটী দ্বার। সেখানে চারিটী নদী প্রবহমানা; তাহার একটী নদীতে দুগ্ধ, একটিতে মদ্য, একটিতে মধু এবং অপরটিতে সুগন্ধ-নির্য্যাস। পুণ্যাত্ম-গণের বাসস্থানকে ইহুদী-গণ অত্যুৎকৃষ্ট উদ্যান-রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সে উদ্যান বহু সুমিষ্ট সুস্বাদু ফলে এবং সুগন্ধ সুদৃশ্য পুষ্পে পরিপূর্ণ। সেই উদ্যান হইতে পুণ্যাত্ম-গণ ক্রমশঃ সপ্তম স্বর্গের অর্থাৎ পর পর উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানের অধিকার লাভ করেন। মৃত্যুর পর পুনরভ্যুত্থানের বিষয়, অনেকে বলেন, জুডাইজম্ ধর্ম্মের আদিগ্রন্থ-সমূহে উল্লিখিত হয় নাই, হিব্রু-ভাষায় লিখিত আদিভূত ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সমূহে উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। 'পেণ্টাটিউক' গ্রন্থের 'সাম' বা নীতি-সমূহে এবং প্রাচীন ভবিষ্যদুক্তিতে পুনরুত্থানের উল্লেখ নাই। 'ইশিয়া', 'ইজিকেল', 'ডেনিয়েল' ও 'জব' প্রভৃতি অংশে পুনরুত্থানের বিষয় পরিবর্ণিত আছে। † ঐ সকল অংশের কোনও স্থলে লিখিত আছে,—শুষ্ক অস্থি-খণ্ড পুনর্জীবিত হইয়া আপন কর্ম্মাকর্ম্মের ফলভোগ করিবে; কোনও স্থলে আবার দেখিতে পাই,—যাহারা পৃথিবীর অভ্যন্তরে কবরে ধূলি-রাশির মধ্যে নিদ্রিত হইয়া আছে, তাহারা জাগরিত হইবে। পুনরুত্থিত-গণের মধ্যে কেহ বা চিরসুখের জীবন লাভ করিবে, কেহ আবার অপমানিত ও ঘৃণিত হইয়া চির-নির্য্যাতন ভোগ করিবে। বাইবেলের 'জব' গ্রন্থে প্রকাশ,—যেমন শরীর ছিল, সেই শরীরেই অভ্যুত্থান ঘটিবে। ইহুদী গণ বলেন,—নরদেহ কবরিত হইলে দেহের অন্যান্য অংশ ধূলায় পরিণত হয় বটে; কিন্তু 'লুজ' নামক অস্থি বরাবর অবিকৃত থাকে। বিচারের পূর্ব্বে, পুনরুত্থানের সময়, পৃথিবীতে ভয়ানক শিশিরপাত আরম্ভ হয়। সেই নিহারে সিক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত অস্থি অঙ্কুরিত অর্থাৎ নরদেহ-প্রাপ্ত হয়।

খৃষ্ট-ধর্ম্মে—'নিউ-টেষ্টামেণ্ট' ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহে—প্রলয় ও পুনরভ্যুত্থান তত্ত্ব বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ,—'আপন পাপ-কর্ম্ম দ্বারাই মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সকল মানুষই অল্পাধিক পাপে রত; সুতরাং সকলেই মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুর পর আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিতি করে; আত্মার সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইয়া দেহ বিকার-প্রাপ্ত ও ধূলায় পরিণত হয়। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা পুণ্যবান, দেহ-ত্যাগের পরই তাঁহাদের আত্মা স্বর্গে গমন করে।

খৃষ্টান-দিগের মত।

---

* *Vide, Midras, Yalkut Reubeni, &c.*

† *Vide*, Isaiah. XXVI. 19; Daniel, XII, 2; Job, XIX, 25-27.

পাপীর আত্মা শেষ-বিচারে দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়। শেষ এক দিন সকলেরই বিচার হইবে। সেই দিন পরিত্রাত্মা যীশু-খৃষ্ট স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিবেন; স্বর্গীয় বেশে সুসজ্জিত এবং স্বর্গীত দূত ও প্রিয় পারিষদ্-সমূহে পরিবৃত হইয়া সে দিন তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট হইবেন। মৃত ব্যক্তিগণ সে দিন কবর হইতে উত্থিত হইবে; বিচারপতি প্রভু তাহাদের বিচার আরম্ভ করিবেন। পাপাত্ম-গণের প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইবে; স্বর্গীয় দূতগণ পাপিগণকে দণ্ডদানে প্রস্তুত হইবেন। পাপীদিগকে চির-প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে;—তাহারা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকিবে। সে বিচারে অতি অল্প ব্যক্তিই পুণ্যবান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবেন। পুণ্যবানদিগকে অত্যুজ্জ্বল আলোকমালা-শোভিত প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইবে। সেখানে তাঁহারা চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় আহারাদি প্রাপ্ত হইবেন এবং সর্ব্ব-প্রকার সুখে সুখী থাকিবেন। তাঁহাদের সেই আনন্দোৎসবে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, অবতারগণ এবং স্বয়ং যীশু-খৃষ্ট তাঁহাদের সহিত যোগদান করিবেন।' নিউ-টেষ্টামেণ্টের অন্তর্গত ম্যাথু, লুক, রিভিলেশন, কোরিন্থিয়ান্স, রোমান্স, থেসালোনিয়ান্স প্রভৃতি অংশে প্রলয় ও পুনরুত্থানের যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, তাহার মর্ম্ম মাত্র এস্থলে প্রদত্ত হইল। *

মুসলমান-গণ আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁহারাও বলেন,—একদিন মৃতের পুনরুত্থান হইবে। সেই দিন সকলেই আপন-আপন পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করিবে। কাহারও কাহারও মতে,—বিচারের দিন একমাত্র আত্মাই বিচারার্থ উপস্থিত হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ বিশ্বাস—সেই দিন দেহ ও আত্মা পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইয়া বিচারপতির নিকট উপনীত হইবে। যে দেহ পচিয়া বিকার-প্রাপ্ত হইয়া ধূলায় মিশিয়া যায়, তাহার পুনরুত্থান কিরূপে সম্ভবপর? এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হয়,—স্বয়ং হজরৎ মহম্মদ সে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। সকল শরীর বিকার-প্রাপ্ত হইলেও 'আল্-আজব' † অর্থাৎ মানুষের মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ কখনও ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় না। সেই অংশ বীজ-স্বরূপ বিদ্যমান থাকে। পুনরুত্থানের সময় অন্যান্য অংশ আপনিই আসিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হয়। যে দিন শেষ বিচারের দিন, তাহার পূর্ব্বে চল্লিশ-দিন-ব্যাপী ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হইবে। সেই বৃষ্টিতে পৃথিবীর উপরিভাগে বার হাত পর্য্যন্ত জল জমিয়া যাইবে। সেই জলে মেরুদণ্ডের অস্থি অভিষিক্ত হইয়া তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায় নর-দেহ উদ্গত হইবে। শেষ দিন অর্থাৎ পুনরভ্যুত্থানের দিন আগমনের পূর্ব্বে কতকগুলি নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে এবং কয়েকটি অভিনব ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেই সময়ে সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হইবেন। ‡ সেই সময়ে কয়েক দিন মস্তকের কয়েক

মুসলমান-দিগের মত।

---

* *Vide*, Mathew—VIII. 11-22, X. 23-28 &c.; Luke—XIII. 23-28, 35, XVI. 22-31; Revelation—XX. 12-13; Corinthians—I. 15; Romans—XIV. 9, 10, 13; Thessalonians, I. 5-10 &c.

† "The bone called the *Al Ajab* which we name the *Os Coccygis* or rump-bone."

‡ হুইষ্টনের 'নিউ থিওরি অব আর্থ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সূর্য্য একবার পশ্চিম দিকে উদিত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

গজ উপরে সূর্য্য অবস্থান করিয়া প্রখর কিরণ বর্ষণ করিবেন। তখন 'দাজল' নামক এক ভীষণ জন্তু আবির্ভূত হইয়া আরবী ভাষায় ইস্লাম-ধর্ম্মের সত্য-তথ্য প্রচার করিবে। সে সময়ে তিন বার ভীষণ ডঙ্কা-নিনাদ শ্রুত হইবে। প্রথম ডঙ্কা-নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ ও পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিবে এবং সপ্ত-সূর্য্যের উদয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্য সমস্ত গলিয়া যাইবে। দ্বিতীয় বার ডঙ্কা-নিনাদ হইলে স্বর্গের এবং পৃথিবীর সকল প্রাণী মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইবে। নিমিষের মধ্যে এই ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে। একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন—কিবা স্বর্গে, কিবা মর্ত্ত্যে, কিবা নরকে—কোথাও কেহ জীবিত থাকিবে না। যিনি মৃত্যু-বিধাতা 'এঞ্জেল' বা দূত, তিনিও সে মরণে নিষ্কৃতি পাইবেন না। সেইরূপে সংহার-কার্য্য সাধিত হইলে তাহার চল্লিশ বর্ষ (মতান্তরে চল্লিশ দিন) পরে তৃতীয় বার ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে। ইস্রাফিল সেই ডঙ্কা বাজাইবেন। এই ডঙ্কা-বাদনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি, জেব্রিল (গেব্রিল) ও মাইকেল—নবজীবন লাভ করিবেন। জেরুজিলামের যে পর্ব্বতে মন্দির ছিল, সেই পর্ব্বতের উপর তাঁহারা তিন জনে দণ্ডায়মান হইবেন। ঈশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে ইস্রাফিল সমস্ত নরনারীর শুষ্ক ও গলিত অস্থি এবং শরীরের অন্যান্য অংশ-সমূহকে, এমন কি চুলগুলিকে পর্য্যন্ত, বিচারার্থ উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিবেন।* আপনার মুখের উপর ডঙ্কা ধারণ করিয়া তিনি সকল নরনারীর আত্মা-সমূহকে ডঙ্কা-মধ্যে ডাকিয়া আনিবেন। আত্মা-সমূহ নিকটে আসিলে তাহাদিগকে তিনি সেই জয়-ডঙ্কার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। পরিশেষে, ঈশ্বরের আদেশ-ক্রমে জয়-ডঙ্কায় শেষ বার আঘাত করিলে, আত্মাগুলি মক্ষিকার ন্যায় ইতস্ততঃ উড়িয়া যাইবে; আর তাহাতে স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত অংশ পরিপূর্ণ হইবে। ইহার পর সেই সকল আত্মা আপন আপন দেহে প্রবেশ করিবে। এইরূপে যাঁহারা পুনরায় আপন আপন দেহ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে হজরৎ মহম্মদের পুনরাবির্ভাব ঘটিবে। বিচারার্থ প্রাণি-সমূহের পুনরভ্যুত্থানের পূর্ব্বে পৃথিবীতে চল্লিশ বর্ষ বা চল্লিশ দিন ব্যাপিয়া ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হইবে। ঈশ্বরের সিংহাসনের নিম্ন হইতে সেই জল পৃথিবীতে আসিবে। সেই জলকে 'জীবনরূপী জল' বলিয়া থাকে। সেই জলের গুণে কবর হইতে মৃতদেহ-সমূহ উত্থিত হইবে। মাতৃগর্ভ হইতে যেরূপে মনুষ্যের উৎপত্তি হয়, সাধারণ বৃষ্টির জলে যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয়, মৃতের পুনরুত্থানের সময় যেন সেইরূপ প্রক্রিয়া সাধিত হইবে। এইরূপে দেহ গঠিত হইলে, ঈশ্বর সেই দেহের মধ্যে প্রশ্বাস-বায়ু সঞ্চালিত করিবেন। বিচারের দিবস পর্য্যন্ত তাহারা নিদ্রিত থাকিবে। বিচারের পূর্ব্বে ঘণ্টাধ্বনি হইলেই তাহারা বিচারার্থ উত্থিত হইবে। বিচার-কালের পরিমাণ-সম্বন্ধে কোরাণে দুই মত দৃষ্ট হয়। এক স্থলে লিখিত আছে,—'বিচার-কালের পরিমাণ সহস্র বৎসর'; অপর স্থলে লিখিত আছে—'পঞ্চাশ সহস্র বৎসর'। এই দুই বিভিন্ন মত দৃষ্টে ব্যাখ্যাকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে কাল-পরিমাণ—'ঈশ্বরেই পরিজ্ঞাত।' পুনরুত্থানের সময় 'এঞ্জেল' বা দূতগণ,

* কোরাণের ৮১শ অধ্যায়ের অংশ-বিশেষের অর্থে কেহ কেহ বলেন—পশ্বাদি প্রাণিও বিচারার্থ উত্থিত হইবে। কিন্তু অন্য মতে পশ্বাদির পুনরুত্থানের বিষয় উত্থাপিত হয় নাই।

উপদেবতাগণ, মনুষ্য এবং জীবজন্তু সকলেই বিচারার্থ পুনর্জীবিত হইবে। পুনর্জীবন লাভ করিলে, পুণ্যাত্মগণ সম্মান-সহকারে এবং পাপিগণ ঘৃণিত ও অপমানিত হইয়া বিচারপতির নিকট আগমন করিবে। মনুষ্যদিগকে কিরূপভাবে (উলঙ্গ অবস্থায় বা বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়া) বিচারপতির নিকট উপস্থিত করা হইবে, তদ্বিষয়ে মুসলমানদিগের মধ্যে দুই মত প্রচলিত আছে এক মতে প্রকাশ,—'মাতৃগর্ভ হইতে যে অবস্থায় তাহারা উৎপন্ন হইয়াছিল (অর্থাৎ—নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও অসংস্কৃত অবস্থায়), সেই অবস্থায় তাহারা ঈশ্বর-সমীপে উপনীত হইবে।' অন্য মতে আবার দেখিতে পাই,—'যে ব্যক্তি যেরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, সেইরূপ বেশ-ভূষাতেই সে পুনরুত্থিত হইয়া বিচারার্থ প্রস্তুত থাকিবে।' * নগ্ন-দেহে উলঙ্গ অবস্থায় নরনারীকে বিচারার্থ ঈশ্বরের সমীপে উপস্থিত করা হইবে শুনিয়া, হজরৎ মহম্মদের পত্নী আয়েসা পতির নিকট বলিয়াছিলেন,—'স্ত্রী-পুরুষকে নগ্নাবস্থায় একত্র বিচার-ক্ষেত্রে আনয়ন করা শীলতাবিরুদ্ধ। সে অবস্থায় এক জনের অপরকে দর্শন করা অশ্লীলতা-ব্যঞ্জক।' কিন্তু হজরৎ তাহাতে উত্তর দেন,—'সে বিষম দিনে, বিষয়ের গুরুত্ব বিধায়, কাহারও মনে কোনও বিপরীত ভাবের উদয় হওয়া সম্ভবপর নহে।' বিচারের দিন নানা শ্রেণীর লোক নানারূপ অবস্থায় (কর্ম্মানুসারে, কেহ ঘোটকে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ পদব্রজে, কেহ বা মাটীতে মুখ ঘষিতে ঘষিতে—এইরূপ নানা ভাবে) বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত হইবে। ঈশ্বর কোথায় বসিয়া বিচার করিবেন, তদ্বিষয়ে নানা মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন,—হজরৎ বলিয়া গিয়াছেন,—'সিরীয়া-প্রদেশে বিচার-ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।' কেহ আবার বলেন,—'এক শ্বেত সমতল ক্ষেত্রে বিচার হইবে; সেখানে অট্টালিকার ও মনুষ্যাদির কোনই চিহ্ন নাই।' আল্-গাজিলি অনুমান করেন,—'একটী দ্বিতীয় পৃথিবীতে এই বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। সেই পৃথিবী রৌপ্য-নির্ম্মিত।' অন্য মতে,—'সে পৃথিবীর সহিত এ পৃথিবীর কোনই সম্বন্ধ নাই; সে এক নূতন পৃথিবী।' কোরাণে লিখিত আছে—'সে দিন এই পৃথিবী এক নূতন পৃথিবীতে পরিণত হইবে। প্রত্যেকের পাপ-পুণ্যের পরিচয়পূর্ণ এক এক খানি পুস্তক লিখিত থাকে। পরীক্ষার দিন সেই পুস্তক বিচারার্থীদিগের হস্তে প্রদান করা হইবে। পুণ্যবান ব্যক্তিগণ দক্ষিণ হস্তে সেই পুস্তক গ্রহণ করিয়া আনন্দের সহিত পাঠ করিবেন। পাপী ব্যক্তিগণের বাম-হস্ত পিঠের সহিত এবং দক্ষিণ হস্ত গলার সহিত বাঁধা থাকিবে। তাহাদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহাদের বামহস্তে বলপূর্ব্বক সেই পুস্তক দেওয়া হইবে। বিচারের জন্য বিচার-ক্ষেত্রে তুলা-দণ্ড থাকিবে। যে পুস্তকে পাপ-পুণ্যের কথা লিখিত আছে, সেই পুস্তক তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা হইবে। যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে দণ্ড-ভোগ করিবে; যাহার পুণ্যের ভাগ অধিক, সে রক্ষা পাইবে।' সেই বিচারের পর, পুণ্য-

* ইহুদী-দিগেরও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে প্রকাশ—'মৃত্যুর সময় যাহার পরিধানে যেরূপ বস্ত্র থাকিবে, পুনরুত্থানের সময়েও সে ব্যক্তি সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া উত্থিত হইবে ইহুদী-গণ বলেন,—"If the wheat which is sown naked rise clothed, it is no wonder the pious who are buried in their clothes should rise with them.—*Gemar Sanhedr*. f 90.

বানের জন্য স্বর্গভোগ এবং পাপীর জন্য নরকভোগ বিহিত হইবে। স্বর্গ-গামীরা দক্ষিণের পথে যাইবেন। পাপিগণ বামপথে পরিচালিত হইবে ; তাহারা অগ্নিময় নরক-কুণ্ডে পড়িবে। পুণ্যবান ও পাপী উভয়কেই 'আল্-সিরাৎ' নামক একটী সেতু পার হইতে হইবে। সেই সেতু চুলের অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং তরবারির অগ্রভাগ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ-ধার-সম্পন্ন। নিম্নে বিস্তৃত ভীষণ অগ্নিময় নরক-কুণ্ড। উপরে ক্ষুরধার সূক্ষ্ম সেতু বিরাজমান। * হজরৎ মহম্মদের সাহায্যে একমাত্র ধর্ম্মবিশ্বাসী মুসলমান-গণই সেই সেতু পার হইয়া নিমেষ-মধ্যে স্বর্গধামে গমন করিতে পারেন। অপরে অর্থাৎ পাপিগণ সেতু পার হইবার সময়ই নরককুণ্ডে নিপতিত হইবে। মুসলমানদিগের মতে,—নরকেরও সাতটী স্তর, স্বর্গেরও সাতটী স্তর। কর্ম্মানুসারে এক এক শ্রেণীর লোক এক এক স্তরে স্থান প্রাপ্ত হয়। নরকের প্রথম স্তরের নাম—'জাহান্নাম'। এই নরকে একেশ্বর-বাদী অথচ পাপাত্মা মুসলমানগণ আশ্রয়-প্রাপ্ত হয়। এই নরক-ভোগের পর তাহাদের উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় নরকের নাম—'লাধা'। ইহুদী-গণ এই নরকে নিক্ষিপ্ত হয় ; তৃতীয় নরক—'হোতামা'। এই নরক খৃষ্টান-গণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। চতুর্থ নরকের নাম—'আল্-সৈর'। ইহা সেবীয়-গণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। পঞ্চম নরক—'সাকা'। 'মেগিয়ান' বা অগ্নি-পূজক পারসিকগণ এই নরকে নিক্ষিপ্ত হন। ষষ্ঠ নরকের নাম—'আল্-জাহিম।' পৌত্তলিকগণের জন্য এই নরক নির্দ্দিষ্ট। সপ্তম নরক—সর্ব্বাপেক্ষা কদর্য্য ভীষণ-স্থান। তাহার নাম—'আল্-হায়াইৎ।' কপটাচারী ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাহারা মুখে আপনাদিগকে এক ধর্ম্মের অনুসরণকারী বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু কার্য্যতঃ কোনও ধর্ম্মই মান্য করে না, তাহারা এই নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। নরকের প্রতি প্রকোষ্ঠে উনিশ জন করিয়া 'এঞ্জেল' প্রহরী বিদ্যমান। স্তরে স্তরে পাপী-দিগের দণ্ড-বিধানের ভীষণতা বৃদ্ধি পায়। স্বর্গ ও নরকের মধ্যে একটী প্রাচীর আছে। সেই প্রাচীরের নাম—'আল্-আরাফ্।' মুসলমান-দিগের স্বর্গের যে সাত স্তর, তাহার সর্ব্বোচ্চ স্তরে ঈশ্বরের আসন। সেই আসনের নিম্নে সর্ব্বাপেক্ষা সুখময়-স্থান বিদ্যমান। সেখানে সুখের অন্ত নাই। মনোহর উদ্যান, উৎস, নদী প্রভৃতি সেখানে বিরাজমান। সেখানকার ধূলায় সূক্ষ্ম ময়দা অথবা মৃগনাভি অথবা জাফ্‌রাণ আছে। সেখানকার নদীর কোনটীতে পরিশ্রুত জল, কোনটীতে দুগ্ধ, কোনটীতে মধু, কোনটীতে সুগন্ধ নির্য্যাস বহিয়া যাইতেছে। সেখানকার প্রস্তর সমূহ মুক্তা, প্রবাল ও মরকতময় ; সেখানকার অট্টালিকার প্রাচীর-সমূহ স্বর্ণে বা রৌপ্যে বিনির্ম্মিত। সেখানকার বৃক্ষের কাণ্ড-সমূহ সুবর্ণময়। সেখানে হজরৎ মহম্মদের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে 'তুবা' নামক এক বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষ সর্ব্ব-সুখের আধার। স্বর্গবাসী সকলের ভবনেই সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। যিনি যে ফলের আশা করিবেন, সেই বৃক্ষে তিনি সেই ফলই প্রাপ্ত হইবেন। 'আল্ কাওথার' নাম্নী যে নদী সেখানে প্রবহমানা, সেরূপ সুগন্ধ ও সুস্বাদু জলপূর্ণ নদী দ্বিতীয় নাই। তাহার জল পান করিলে আর কখনও তৃষ্ণা পায় না। সকল সুখের সারভূত সুখের পরিচয়-স্বরূপ বর্ণিত আছে,—'সেখানে

* মুসলমানদিগের 'মোতাজালাইট' সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ এতাদৃশ সূক্ষ্ম সেতুকে উপকথা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানগণ উহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান নহেন।

অনুপম রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না পরীগণ স্বর্গবাসী-দিগের মনোরঞ্জনের জন্য নিযুক্ত আছে। তাহাদের সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু। তজ্জন্য তাহারা 'হুর-অল-ঐন' নামে পরিচিত। মর্ত্ত্যের নারীগণ মৃত্তিকায় নির্ম্মিত; কিন্তু সেই সুন্দরী পরীগণ মৃগনাভির দ্বারা গঠিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত আছে। এই সুখময় স্বর্গের নাম—'আল্ জান্নাৎ'। 'জান্নাৎ' শব্দে উদ্যান বুঝায়। ভিন্ন ভিন্ন জান্নাৎকে স্বর্গের ভিন্ন ভিন্ন স্তর বলা যাইতে পারে। যেমন—'জান্নাৎ আল্ ফার্দ্দিজ' অর্থাৎ স্বর্গের উদ্যান, 'জান্নাৎ আডের্ন' অর্থাৎ ইডেন উদ্যান, 'জান্নাৎ আল্ মওয়া' অর্থাৎ বাসের উদ্যান, 'জান্নাৎ আল্ নইম' অর্থাৎ সুখের উদ্যান, ইত্যাদি। পুণ্যের তারতম্যানুসারে মানুষ এক এক 'জান্নাতে' বা স্বর্গোদ্যানে বাসের অধিকারী হয়। স্বর্গের অতি নিম্নতম অংশেও মানুষের সুখের অন্ত নাই। সেই সুখ পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ যাহাতে পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারেন, তজ্জন্য ঈশ্বর তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক শত মনুষ্যের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

মৃতের পুনরুত্থান।

প্রলয়ে মনুষ্যাদি বিনষ্ট হওয়ার পর বিচারার্থ তাহাদের পুনরুত্থানের বিষয় বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত আছে। ইরাণীয়-গণ, ইহুদী গণ, খৃষ্টান-গণ, মুসলমান-গণ সকলেই পুনরুত্থানের বিষয় স্বীকার করেন। তাঁহাদের সকলের মধ্যে যে একই মত প্রচারিত আছে, তাহা নহে; তবে স্থূলতঃ তৎসম্বন্ধে পরস্পরের সাদৃশ্যের অসদ্ভাব নাই। পুনরুত্থানকে খৃষ্টানগণ 'রিসারেক্সন' (Resurrection) বলেন। বাইবেলের মতে,—'এই রিসারেক্সনে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া সমস্ত নরনারী বিচারার্থ ঈশ্বরের সমীপে উপনীত হয়।' ওল্ড-টেষ্টামেণ্টের এবং নিউ টেষ্টামেণ্টের বিভিন্ন অংশে পুনরুত্থানের বিষয় লিখিত আছে। ইশিয়ার ষড়বিংশ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়,—'তোমার মৃত দেহ পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে। আমার মৃত দেহও পুনরায় জাগিয়া উঠিবে। যে কেহ ধূলার শরীর ধূলায় মিশাইয়া আছ, উঠ—ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন কর।' * ডেনিয়েলের দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—'যাহারা ধূলার সহিত মিশিয়া চির-নিদ্রায় নিদ্রিত, তাহারা পুনরায় জাগিয়া উঠিবে। তন্মধ্যে কেহ বা অমর জীবন লাভ করিবে, কেহ বা চিরকাল অবজ্ঞাত হইয়া থাকিবে।' † জবের উনবিংশ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়,—'যদিও আমার দেহ বিধ্বংস হইবে, তথাপি আমি পুনরায় রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করিয়া আমার ঈশ্বরকে দর্শন করিব।' ‡ এতদ্ভিন্ন ওল্ড-টেষ্টামেণ্টের অন্তর্গত 'হোশিয়া', 'ইজিকেল' প্রভৃতিতেও মৃতের পুনরুত্থানের বিষয় দেখিতে পাইবেন। নিউ-টেষ্টামেণ্টের 'ম্যাথু', 'কোরিন্থিয়ান্স' ও 'রিভিলেশন' প্রভৃতি গ্রন্থেও পুনরুত্থানের বিষয় বিবৃত আছে। প্রথম কোরিন্থিয়ান্সের পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই—'যাহারা চির-নিদ্রায় নিদ্রিত, তাহাদের মধ্যে যীশু-খৃষ্টই প্রথমে নিদ্রা হইতে নবজীবন লাভ করিবেন।

---

* "Thy dead shall live; my dead bodies shall arise. Awake and sing, ye that dwell in the dust."—*Isaiah*, XXVI. 19.

† "And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake some to the everlasting life and some to shame and everlasting contempt."—*Daniel*, XII. 2

‡ "And after my skin hath been destroyed, yet from my flesh I shall see God"—*Job*, XIX 26

যে সকল মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, পুনরুত্থানের সময় তাহারা সকলেই পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে।' * রিভিলেশন অংশের প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—'মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রথমে যীশুখৃষ্ট জীবন লাভ করিবেন।' ইহুদী ও খৃষ্টান-গণের গ্রন্থে এতদ্বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। মুসলমান-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণে এই পুনরুত্থানের বিষয় যাহা লিখিত আছে, পূর্ব্বেই তাহার কতক আভাষ প্রদান করিয়াছি। কোরাণের সপ্তদশ, একোনপঞ্চাশৎ, পঞ্চসপ্ততিতম, চতুরশীতিতম প্রভৃতি অধ্যায়-সমূহে পুনরুত্থানের বিষয় স্বীকার করা হইয়াছে; ত্রয়োবিংশ ও পঞ্চাশৎ অধ্যায়-দ্বয়ে পুনরুত্থানের বর্ণনা দৃষ্ট হয়; পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ে পুনরুত্থানের পূর্ব্বের অবস্থা-পরম্পরা পরিবর্ণিত আছে। পুনরভ্যুত্থান যে কখন হইবে, একমাত্র ঈশ্বরই তাহা পরিজ্ঞাত আছেন—এতদুক্তি কোরাণের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। কোরাণের সপ্তদশ ও পঞ্চাশৎ অধ্যায়-দ্বয়ে এতদ্বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। সপ্তদশ অধ্যায়ে, যথা—প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'আমাদের দেহ ধূলায় এবং কঙ্কালে পরিণত হইলে, আমরা কি পুনরায় নূতন প্রাণিরূপে উৎপন্ন হইতে পারি?' উত্তর—'তোমরা প্রস্তর হও, লৌহ হও কিংবা কোনও অস্বাভাবিক জীবজন্তুতেই পরিণত হও, তোমরা পুনরায় পূর্ব্ব-জীবন লাভ করিবে।' এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'কে আমাদিগকে সেই পুনর্জ্জীবন দান করিবেন?' উত্তর—'যিনি প্রথমে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' প্রশ্ন—'কখন ইহা সংঘটিত হইবে?' উত্তর—'মনে কর, সে দিন অতি নিকটবর্ত্তী। সে দিনে ঈশ্বরের আহ্বানে তুমি কবর হইতে উত্থিত হইবে এবং তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিবে।' † পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে,—'স্বর্গের অমৃত-ধারায় বারি বর্ষণে যেমন উদ্যানের বৃক্ষ-লতাদি অঙ্কুরিত হয়, মাঠে তৃণ-শস্যাদি জন্মে, খর্জ্জুর-বৃক্ষ-সকল খর্জ্জুর-স্তবক-সমূহে সজ্জিত হয়, কবর হইতেও সেই দিনে সেইরূপ মনুষ্য-সকল পুনরুত্থিত হইবে। যে ভাবে, পর পর যেরূপ পদ্ধতিতে, মৃতের পুনরুত্থান হওয়ার বিষয় মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচারিত আছে, আমরা পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। ‡ ইহুদী-দিগের, খৃষ্টান-দিগের, মুসলমান-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থে পরিবর্ণিত পুনরুত্থানের বিষয় আলোচনা করিয়া ডক্টর হোগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—'এই সকলের মূলে অন্যের প্রভাব বিদ্যমান আছে।' অনুসন্ধানের ফলে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন,—'এই রিসারেক্সান বা পুনরুত্থানের মূল জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মে। জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্ম হইতেই এ মত অন্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। § তিনি যত দূর অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যুক্তিই প্রবল বটে। কারণ জেন্দ-অভেস্তার 'জামিয়দ যস্ত' অংশে †† এই পুনরুত্থান-তত্ত্ব রূপান্তরে অবস্থিত

---

* "But now is Christ risen from the dead, *and* become the first-fruits of them that slept. For since by man *came* death, by man *came* also the resurrection of the dead."—*1 Corinthians*. XV. 20. 21.

† *Vide* Dr. Sale, *Koran, Surah* XVII.

‡ এই পরিচ্ছেদের ১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ ডক্টর হোগ বলেন,—"The Resurrection of the dead is a genuine Zoroastrian doctrine."—*Vide* Dr. Haug's *Essays*. এ কথা লিখিবার পূর্ব্বে বোধ হয় তিনি হিন্দু-শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করেন নাই।

†† *Zend Avesta—Zamyed Yasht*, XXIX. 89—90.

রহিয়াছে দেখিতে পাই। সেখানে লিখিত আছে,—'সওসন্ত নামক অবতার-গণের একজন আপন সহচরগণের সহিত উত্থিত হইবেন। মৃত ব্যক্তিগণ যখন পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে, তাহারা যাহাতে অক্ষয়, অমর, অবিকৃত ও সর্ব্বশক্তিমান হয়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। সেই ব্যবস্থার পর সকলেরই জীবন চিরস্থায়ী হইবে;—বিশ্বে চিরসুখ বিরাজ করিবে; জনগণ সদনুষ্ঠানে রত থাকিবে; দুষ্কর্ম্মকারিগণ সংসার হইতে অপসারিত হইবে।' কিন্তু জেন্দ-আভেস্তারও পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্র-গ্রন্থে—আমাদের সনাতন বেদে—এতদ্বিষয়ের কোনও আভাষ পাওয়া যায় না কি? একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বেদেও এ মত পরিবর্ণিত আছে, দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন, এতদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে। সেই ঋকে প্রকাশ,—মৃত ব্যক্তির অগ্নি-সৎকার শেষ হইয়াছে; তাহার পর তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে—'যখন ইনি পুনর্ব্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন।' উদ্ধৃত-চিহ্নান্তর্গত অংশে ঋকের যে অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া "পুনর্ব্বার সজীবত্ব-প্রাপ্ত" হওয়ার বিষয় লিখিত আছে। সজীবত্ব-প্রাপ্ত হইলে দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন, অর্থাৎ বিচারার্থ প্রস্তুত থাকিবেন,—এই অর্থই উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বোক্ত সূক্তের পঞ্চম ঋকেও পুনরুত্থানের বিষয় অবগত হওয়া যায়। সেই ঋকের কিয়দংশ —"ইহার (মৃতের) যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা জীবন-প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হউক। হে জাতবেদা। সে পুনর্ব্বার শরীর লাভ করুক।" ইহুদী-গণ বলিয়াছেন,—শরীরের 'লুজ' নামক অংশ মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে এবং তাহা হইতে নরদেহ উত্থিত হয়। মুসলমান-গণ বলিয়াছেন,—মৃত্যুর পর 'আল্ আজব' নামক অস্থি হইতে নূতন মানুষ গজাইয়া উঠে। উপরি-উদ্ধৃত ঋগ্বেদাংশ দেখিয়া কি মনে হইতে পারে? মনে হইতে পারে না কি—ঋকোক্ত "ইহার যাহা অবশিষ্ট" ইত্যাদি বাক্যের অনুসরণই ইহুদী দিগের ও মুসলমান-দিগের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে! আমাদের পুরাণাদির শাস্ত্র-গ্রন্থে যম, যমদূত, বিচার, স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার সহিত এই অংশের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দেখিলে, ঋগ্বেদোক্ত ঐ অংশকে 'রিসারেক্সনের' মূল বলিয়া প্রতীত হইবে। এই পুনরুত্থান প্রসঙ্গে জোরওয়াষ্ট্রিয়ানাদি বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতে বুঝিতে পারিলাম,—পুনরভ্যুত্থানে সর্ব্বপ্রথমে একজন অবতারের বা মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে। ইরাণীয়-গণ সেই অবতারকে 'সওসন্ত' নামে অভিহিত করিলেন; খৃষ্টান-গণ বলিলেন,—'তিনি যীশু-খৃষ্ট', মুসলমান-গণ বলিলেন—'তিনি মহম্মদ।' এতৎপ্রসঙ্গে আর একটী বিষয় দেখিতে পাইলাম। বিচারের পর—কর্ম্মফল-ভোগান্তে চির-সুখাবাস-লাভ। ইরাণীয়-গণ, ইহুদী-গণ, খৃষ্টান-গণ, মুসলমান-গণ সকলেই এ সম্বন্ধে প্রায় একমত। এই পাপপূর্ণ পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অবতারের অনুগ্রহে তাহার উদ্ধার সাধন হইবে এবং তাহা নিষ্পাপ চিরসুখময় স্থানে পরিণত হইবে,—সর্ব্বত্রই এই ভাব উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু এই সকল মতও সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের অনুস্মৃতি বলিয়া মনে করিতে পারি না কি? কলি-কলুষময় সংসার নাশপ্রাপ্ত হইলে যুগান্তে যে নূতন যুগের আবির্ভাব হইবে, তখনকার সেই সত্য-যুগের সুখময় চিত্র

কল্পনা-নেত্রে দর্শন করিলে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সকল ভবিষ্য-দৃশ্য তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। কলির অবসানে সত্য-যুগে নূতন অবতারের আবির্ভাব, পুণ্যের প্রাধান্য, সুখের আধিক্য প্রভৃতির বিষয় আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। সে সকলের সহিত পূর্ব্বোক্ত অবস্থার সামঞ্জস্য-সাধন করা যাইতে পারে।

শাস্ত্র-গ্রন্থে স্বর্গ ও নরক।

স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্র-গ্রন্থে কি মত পরিব্যক্ত হইয়াছে, এই-বার তাহা আলোচনা করা যাউক। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির সর্ব্বত্রই এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে এতৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথার উল্লেখ করিতেছি। ঋগ্বেদে এ সকল বিষয়ে কি উক্তি দৃষ্ট হয়, প্রথমে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখি। পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের চতুর্থ ঋকে লিখিত আছে,—'মানুষ যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গ-লাভের অধিকারী হয়।' ঐ মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থ ঋকে উক্ত হইয়াছে,—'মিত্র দেবতা স্তবকারীকে স্বর্গের পথ প্রদর্শন করেন।' অর্থাৎ,—ভগবদারাধনায় স্বর্গলাভ হয়। পঞ্চম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে মিত্র ও বরুণ দেবতার আহ্বানে রাতহব্য ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন,—'তোমাদিগের অনুগ্রহে আমরা যেন স্বর্গধাম প্রাপ্ত হই।' এইরূপ ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রথম সূক্তে অগ্নি-দেবতাকে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দীপ্তিমান্ অগ্নিদেব! তুমি মনুষ্য-দিগকে স্বর্গে লইয়া যাও।' ঐ মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশ সূক্তের সপ্তম ঋকে ইন্দ্র দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! তুমি আমাদিগকে সেই সুখময় ভয়শূন্য আলোকে অর্থাৎ স্বর্গলোকে লইয়া যাও।' * ঐ মণ্ডলের একপঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বাদশ ঋকে স্বর্গকে দীপ্তি-মান গৃহ (সদ্মানং দিব্যং) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে. এবং ঋজিশ্বা ঋষি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় এক ব্যক্তির স্বর্গ-লাভের কামনায় দেবগণকে হব্য প্রদান করিতেছেন। সপ্তম মণ্ডলের চতুঃসপ্ততিতম সূক্তের প্রথম ঋকে বশিষ্ঠ ঋষি অশ্বিদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'এই স্বর্গেচ্ছুগণ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।' অর্থাৎ—দেবতার আরাধনায় স্বর্গ-লাভের আভাষ এই ঋকে পাওয়া যাইতেছে। ঐ মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম সূক্তের পঞ্চম ঋকে বরুণের সহস্র-দ্বার-বিশিষ্ট গৃহে অর্থাৎ স্বর্গে যাইবার প্রার্থনা করা হইতেছে। এতদ্দ্বারা স্বর্গ নভোমণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া বুঝা যায়। অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ ঋকে কুরঙ্গ নামক সৌভাগ্যবান্ রাজার স্বর্গ-প্রাপ্তি-হেতু যজ্ঞের ও দানের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। এই ঋক হইতে প্রতিপন্ন হয়—দান ও যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গ-লাভ করিতে পারা যায়। নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশাধিক শততম সূক্তের সপ্তম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত ঋক-পঞ্চকে স্বর্গের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। সেখানে কশ্যপ ঋষি সোম-দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—"যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে, হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল। ৭॥ যে স্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদ-নদী আছে, তথায়

* স্বর্গ যে সুখময় জ্যোতির্ম্ময় অভয়প্রদ স্থান, এই ঋকে তাহাই বুঝা গেল। উইলসন ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"A blessed state of happiness, life and safety."

আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ৮॥ সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভোমণ্ডলের ঊর্দ্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্ব্বদা আলোকময়, তথায় আমাকে অমর কর। ৯॥ যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্ন-নামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ১০॥ যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ১১॥* এই সূক্তে স্বর্গকে চির-সুখময় অমরত্ব-লাভের স্থান বলিয়া বুঝা যাইতেছে। পুণ্যকার্য্য দ্বারা স্বর্গলাভের বা পরলোকে সুখ-প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ-ত্যধিক শততম সূক্তের পঞ্চম ঋকে এবং চতুঃষষ্ট্যধিক শততম সূক্তের ত্রিংশৎ ঋকে উক্ত হইয়াছে। প্রথমোক্ত ঋকে 'পুণ্য-বলে পরলোকে সুখ-লাভের কথা' এবং শেষোক্ত ঋকে 'দেহ ধ্বংস হইলেও জীবাত্মার অমরত্ব' লাভের ভাব উপলব্ধি হয়। দশম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তের প্রথম ও অষ্টম ঋকে এবং পঞ্চদশ সূক্তের দশম ঋকে, পিতৃ-লোকদিগের সহিত পুণ্যাত্মগণ কিরূপ-ভাবে স্বর্গে বাস করেন, তাহার বর্ণনা দেখিতে পাই। সেই দুই ঋকের মর্ম্ম,—'হে অন্তঃকরণ! তুমি বিবস্বনের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর। তিনি সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান; তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। তাঁহার নিকটই সকল লোক গমন করেন। (১০।১৪।১) সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদিগের সঙ্গে মিলিত হও; যমের সহিত ও তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত (নামক গৃহে) প্রবেশ করিয়া উজ্জ্বল দেহ ধারণ কর। (২০।১৪।৮) যে সকল সাধুশীল পিতৃলোক দেবতা-দিগের সঙ্গে একত্র হইয়া হোমের দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে আরোহণ করেন; হে অগ্নি! সেই সমস্ত দেবারাধনাকারী যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত এস।' (১০।১৫।১০) ঐ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের তৃতীয় ঋকে অগ্নিদেবতার আরাধনায় দমন ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে জাতবেদা ও বহ্নি! তোমার যে মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আছে, তাহাদিগের দ্বারা এই মৃত ব্যক্তিদিগকে পুণ্য-বান লোকদিগের ভবনে বহন করিয়া লইয়া যাও।' এই ঋকে মৃত্যুর পর পরলোক-গমনের বিষয় দেখিতে পাই। উক্ত মণ্ডলের ষট্‌পঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকে লিখিত আছে,—'যেরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলে, তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও।' অর্থাৎ,—কর্ম্মানুসারে উত্তম স্বর্গ-লাভের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ঐ সূক্তের অন্য ঋকে লিখিত আছে,—'আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়া-কলাপ করিয়াছেন।' ইহাতে দেবত্ব-প্রাপ্তি-রূপ স্বর্গধামে অবস্থিতির বিষয় উপলব্ধি হয়। এইরূপ দেবত্ব-প্রাপ্তির কথা উক্ত মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের দশম ঋকেও দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিসপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয় ঋকে দেবলোকে যাইবার পথের বিষয় লিখিত আছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া দেখিলে বেদের আরও বহু স্থলে কর্ম্মানুসারে স্বর্গাদি লাভের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কর্ম্মানুসারে

স্বর্গাদি লাভের বিষয় বেদে যাহা বীজরূপে অবস্থিত, সংহিতা-পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহা শাখা-পল্লবাদি-বিশিষ্ট বিশাল মহীরুহে পরিণত। কর্ম্ম যেরূপ অনন্ত, তাহার ফলাফল-ভোগও সেইরূপ অনন্ত। সেই ফলাফল ভোগ অনুসারেই স্বর্গ ও নরক এবং স্বর্গ ও নরকের অসংখ্য স্তর-পর্য্যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—যে যে পরিমাণ সৎকর্ম্ম করিবে, সে তদনুরূপ স্বর্গে স্থান পাইবে এবং যে যেরূপ অপকর্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ নরকে নিপতিত হইবে। শাস্ত্র-মতে,—স্বর্গাপবর্গ লাভ কর্ম্মানুসারে সাধিত হয়; উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম-গ্রহণও কর্ম্মের ফলে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। যে কোনও শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোচনা করিলেই স্বর্গাপবর্গ-লাভের এবং পুনর্জ্জন্মাদি-গ্রহণের বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়। মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহার কয়েক পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে স্থূলভাবে বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম হইবে। মনুসংহিতার সেই অংশের মর্ম্ম,—"জীব যদি অধিকাংশ ধর্ম্ম এবং অল্প অধর্ম্ম করেন, তবে পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা শরীরী হইয়া তিনি পরলোকে সুখভোগ করিয়া থাকেন। আর যদি তাহার অধর্ম্ম অধিক এবং ধর্ম্মের ভাগ অল্প থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ ভূতাংশ দ্বারা তাহার দেহ গঠিত না হইয়া যাহাতে সে যম-যাতনা ভোগ করে, এইরূপ একটী দেহ গঠিত হয়। জীব যমকৃত যাতনা ভোগ করিয়া নিষ্পাপ হইলে পর, নিজ কর্ম্মানুসারে আবার ভাগ-মত পঞ্চভূতাত্মক মানবাদি দেহ ধারণ করে।" ইহার পর কোন্ কার্য্যের ফলে জীব কোন্ দেহ ধারণ করে, মনু তদ্বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। পরিশেষে বলিয়াছেন,—'বিষয়াত্মারা যে পরিমাণে যে বিষয়ে অত্যন্ত প্রসক্ত হয়, সেই পরিমাণে পরলোকে তাহাদের সেই ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হইয়া তাহাদিগকে যাতনা দেয়। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি সেই সকল পাপ-কর্ম্মের বারম্বার অভ্যাসে ইহলোকেও সেই সকল যাতনা প্রাপ্ত হয় এবং ঘোর-তমিস্রাদি নরকে অসিপত্র বনাদি ও বন্ধন-ছেদনাদি নরকে যাতনা অনুভব করে। বিবিধ পীড়ন, কাকোলুক-কর্তৃক ভক্ষণ, তপ্ত-বালুকাদির উপর গমন এবং কুম্ভীপাকাদি ভয়ানক নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। দুঃখ-প্রায় অপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিত্য দুঃখ ভোগ করে এবং শীতাতপ-জনিত নানাপ্রকার ভয়ানক পীড়া প্রাপ্ত হয়। বারম্বার গর্ভাবাস, দারুণ-যন্ত্রণাময় জন্মগ্রহণ, বন্ধনাদি নানাপ্রকার কষ্ট এবং পরের দাসত্বাদি প্রাপ্ত হয়।...সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক—অন্তঃকরণে যে ভাবের যে কর্ম্ম আচরিত হয়, সেই ভাবের উৎকর্ষ হওয়াতে পরকালে সেইরূপ শরীর দ্বারা ঐ সকল কর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে হয়।' ফলতঃ, ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, যমলোক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন লোক-প্রাপ্তি এবং অম্বরীষ, রৌরব, প্রভৃতি অন্ধতামিস্র নরক-বাস—কর্ম্মাকর্ম্মের তারতম্যানুসারেই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে শাস্ত্রে অসংখ্য মত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটী মাত্র মতের পরিচয় আমরা এখানে প্রদান করিতেছি। যথা,—'লোক—চতুর্দ্দশ-সংখ্যক। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, এই সাতটি উপর্য্যুপরি বর্ত্তমান ঊর্দ্ধতন লোক। অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল,—এই সাতটি অধঃ-অধো বর্ত্তমান অধস্তন লোক। তন্মধ্যে অবীচি অর্থাৎ নিম্নতন স্থান হইতে মেরু-

পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভূর্লোক অর্থাৎ পৃথিবী-লোক। পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধ ধ্রুব পর্য্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি-বিভূষিত দৃষ্টিগোচর অবকাশ-ময় স্থানের নাম—ভুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ-লোক। তদূর্দ্ধে মহেন্দ্র-লোক বা স্বর্গলোক। তদূর্দ্ধে মহর্লোক, মহর্লোকের ঊর্দ্ধে জনলোক। তদূর্দ্ধে তপোলোক ও তদূর্দ্ধে সত্যলোক অবস্থিত। শেষোক্ত পাঁচটি লোকের সাধারণ নাম—স্বর্লোক বা স্বর্গলোক। তন্মধ্যে জনলোকাদি লোকত্রয় আবার প্রজাপতি-লোক বা ব্রহ্ম-লোক এই আখ্যাতেও আখ্যাত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অবীচি অর্থাৎ নরক-স্থান পৃথিবীরই অন্তর্গত। ঐ অবীচি—নিম্নতম নরকেরই নামান্তর। উহার উপরিভাগে ঊর্দ্ধোর্দ্ধ-ভাবে মৃত্তিকা-স্থান, জলস্থান, অগ্নিস্থান, বায়ুস্থান, আকাশ-স্থান প্রভৃতি নামে আরও ছয়টি নরক আছে। উহারাই শাস্ত্রে যথাক্রমে—অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মহাতলাদি সপ্ত-পাতাল-লোক আবার ঐ সকল নরকেরই নিম্নভাগে ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধে-ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই সকল লোকও দৃশ্য-পৃথিবী-মণ্ডলেরই অন্তর্গত। পাতালের পরই পৃথিবী-লোক। সমস্ত লোকই জীবগণের আবাস-ভূমি। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রাপ্ত হয়েন। তন্মধ্যে পৃথিবী—কর্ম্মভূমি; স্বর্গ ও পাতাল—ভোগভূমি; নরক সকল—দণ্ড-ভোগের স্থান।...স্বর্লোকবাসী লোকের আবার মহর্লোকাদি-লাভের সম্ভাবনাও আছে। তাঁহারা যদি স্বর্লোকে থাকিয়া কেবল ভোগরত না হইয়া, উহারই মধ্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের ঊর্দ্ধগতি হইয়া থাকে।' * নচেৎ, কর্ম্মানুসারে স্বর্গাদি ভোগ করিয়া আবার তাঁহারা জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া পড়েন। কর্ম্মানুসারে স্বর্গ ও নরক ভোগ সম্বন্ধে প্রায় সকল শাস্ত্রেই এক মত দৃষ্ট হয়।

সাদৃশ্য-তত্ত্ব।

কতকগুলি বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কি অভিনব সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল সাদৃশ্য দেখিয়া একে অন্যের ছায়াপাত ঘটিয়াছে বলিয়া স্বতঃই মনে হইতে পারে। জল-প্লাবনে, অগ্নি-বর্ষণে বা তুষার-সম্পাতে পৃথিবীর ধ্বংস-সাধন সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঐকমত্য দৃষ্ট হয়, তদ্বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। † প্রলয়ে মনুষ্যাদি বিনষ্ট হওয়ার পর বিচারার্থ তাহাদিগের পুনরুত্থানের বিষয়েও যে সাদৃশ্য দেখিতে পাই, তাহাও পূর্ব্বেই উক্ত

তুলাদণ্ডের বিচার।

---

* "বেদান্ত-দর্শন—গোবিন্দ-ভাষ্য-বিবৃতি-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। পদ্মপুরাণ, ভূ-খণ্ড, ৯৯ম অধ্যায়ে; অগ্নিপুরাণ ৩৭০ম অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ, ১০৫ম অধ্যায়; গরুড়-পুরাণ, উত্তর-খণ্ড, ৩য় অধ্যায়; নৃসিংহ-পুরাণ, ৩০শ অধ্যায়; ব্রহ্মপুরাণ ২১শ, ২২শ ও ২৩শ অধ্যায় প্রভৃতিতে স্বর্গ ও নরকের বিষয় বর্ণিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, প্রকৃতি-খণ্ড, ২৭শ ও ২৮শ অধ্যায়ে নরক-কুণ্ডের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৪৮শ অধ্যায়ে, স্বর্গ-খণ্ড, ৩৪শ অধ্যায়ে এবং বরাহ-পুরাণ প্রভৃতিতে এতদ্বিষয় দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, ২৪শ অধ্যায়ে অতলাদি লোকের এবং ২৬শ অধ্যায়ে নরকাদির বর্ণনা আছে। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে, পঞ্চম অধ্যায়ে, সপ্ত পাতাল, ষষ্ঠ অধ্যায়ে নরক এবং সপ্তম অধ্যায়ে সপ্ত-লোকের সংস্থান প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

† এই পরিচ্ছেদের ১২৫ হইতে ১২৯শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। * কর্ম্মফল, স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি সম্বন্ধেও একের সহিত অন্যের কি সাদৃশ্য আছে, পূর্ব্ব-বর্ণিত অংশে তাহাও প্রতীত হইবে। † এস্থলে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান, তাহার আভাষ প্রদান করিবার প্রয়াস পাইতেছি। তুলাদণ্ডে পাপ-পুণ্যের পরিমাপের বিষয় প্রায় সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে; আর পাপ-পুণ্যের বিষয় পুস্তকে লিখিত থাকে এবং বিচারের দিন সেই পুস্তক উপস্থিত করা হয়, তৎসম্বন্ধেও প্রায় মতান্তর নাই। জেন্দ-আভেস্তার অনুবাদক ডারমেষ্টেটর লিখিয়াছেন,—'মিথরা এবং স্রাওশ এই দুই জনের সহিত মিলিত হইয়া রাশ্মি-রাজিস্তা মৃত-ব্যক্তিগণের বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তিনি সর্ব্ব-সত্যময় সত্য-স্বরূপ। তিনি তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন; সেই তুলাদণ্ডে মৃত্যুর পর মৃত-ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের পরিমাপ করা হয়।' এতদুক্তির প্রমাণ-স্বরূপ তিনি জেন্দ-আভেস্তার 'রোসন যস্ট' অংশ হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম—'তাঁহার (সত্য-স্বরূপ বিচার-কর্ত্তা রাশ্মি রাজিস্তার) পরিমাপে কদাচ অন্যায় হইবার সম্ভাবনা নাই। ধার্ম্মিকই হউন—আর দেশের শাসন-কর্ত্তাই হউন, সকলেরই সম্বন্ধে তিনি সমভাবে তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার তুলাদণ্ড এক চুল বিচলিত হইবার নহে। তিনি কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না।' ‡ 'পার্শিয়ান মেগি' বা অগ্নিপূজক পারসিকগণ বলেন,—'মিহির ও সরুশ নামক দুই জন এঞ্জেল বা স্বর্গীয় দূত বিচারের দিন তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া থাকিবেন এবং তাহাতে পাপ-পুণ্য তুলিতে হইবে।' ইহুদী-দিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ-সমূহে লিখিত আছে,—'বিচারের দিন পাপ-পুণ্যের পরিচয়-সম্বলিত পুস্তক উপস্থিত করা হইবে এবং তুলাদণ্ডে তাহা পরিমাপ করা হইবে। খৃষ্টান-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থেও এতদ্বিষয় পুনঃ-পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বাইবেলের এক্সোডাস, ডেনিয়েল, রিভিলেসন প্রভৃতি গ্রন্থে এ সকল কথা বিশেষ-ভাবে লিখিত আছে। †† ইহুদী-দিগের মিদ্রাস, জাল্‌কুৎ-সেমুনি প্রভৃতি গ্রন্থে পাপ-পুণ্যের পরিচয়-সম্বলিত পুস্তকের বিষয় এবং গেমার সান্‌হেদর প্রভৃতি গ্রন্থে তুলাদণ্ডে তাহা ওজনের বিষয় দেখিতে পাইবেন। § মুসলমানগণের ধর্ম্মগ্রন্থেও দেখিতে পাই,—'বিচারের দিন জিব্রিল তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া থাকিবেন এবং পাপ-পুণ্যের পরিচয়-পূর্ণ পুস্তক ওজন করা হইবে।' কোরাণের সপ্তম এবং ত্রয়োবিংশ অধ্যায় প্রভৃতিতে এতদ্বিবরণ পরিবর্ণিত আছে। ** আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থেও এতদুক্তির অসম্ভাব নাই। গরুড়-পুরাণ, উত্তর-খণ্ড, সপ্তদশ অধ্যায়ে ও ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে এতদ্বিবরণ পরিবর্ণিত

---

* এই পরিচ্ছেদের ১৪৩শ পৃষ্ঠায় মৃতের পুনরুত্থান প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

† কর্ম্মফল, স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে ইরাণীদিগের মত ১৩৭ পৃষ্ঠায়, ইহুদীদিগের মত ১৩৮ পৃষ্ঠায়, খৃষ্টান-দিগের মত ১৩৯ পৃষ্ঠায় ও মুসলমানদিগের মত ১৪২ পৃষ্ঠায় এবং হিন্দু-শাস্ত্রের মত ১৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ *Zend Avesta*, Part II. *Koshan Yasht.*

†† Vide, *Exodus*, xxii. 32-33; *Revelation*, xx. 12 etc, *Daniel*, v. 27 and vii 10.

§ *Midrash*, *Yalkut Shemuni*, f 153 C 3 and *Gemar Sanhedr*, f. 91. etc.

** *Vide*, Dr. Sale's *Koran*, Preliminary Discourse, p. 71-74.

আছে। যথা,—কর্ম্মাকর্ম্মের বিবরণ-সম্বলিত পুস্তক সম্বন্ধে,—"যৎকর্ম্ম কুরুতে কশ্চিৎ তৎ সর্ব্বং বিলিখত্যসৌ।" অর্থাৎ, যে মনুষ্য যে কর্ম্ম করে, তিনি (চিত্রগুপ্ত) তাহা লিখিয়া রাখেন। তাঁহার লিখন-অনুসারে যমরাজ বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তুলাদণ্ডে পাপ-পুণ্যের বিচার হয়।

স্বর্গ ও নরকের বিভাগ সম্বন্ধে প্রায় সকল ধর্ম্মেই সাদৃশ্য দেখিতে পাই। মুসলমানেরাও বলেন,—স্বর্গের ও নরকের সাতটী করিয়া স্তর আছে। খৃষ্টান-দিগের মধ্যেও সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল। ইহুদী এবং পারসিক-গণের ধর্ম্মগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে সেই আভাষই পাওয়া যায়। ডক্টর সেল 'কোরাণের' অনুবাদ করিয়া তাহার যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি এতদ্বিষয় বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—'নরক এবং নরকার্ণবে নিপতিত পাপী-দিগের অবস্থা সম্বন্ধে মহম্মদ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অনেকাংশে ইহুদী-দিগের এবং কতকাংশে মেগিয়ান-দিগের (অর্থাৎ অগ্নিপূজক পারসিক-দিগের) অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও ঐ সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে; কিন্তু উভয়ত্রই নরকের সাতটী বিভাগের একই পরিচয় দৃষ্ট হয়।' মুসলমান-গণের বর্ণিত নরকে ভীষণ অনলে এবং অত্যধিক শীতে পাপিগণ যন্ত্রণা ভোগ করে। পাপের তারতম্যানুসারে এক এক বিভাগে এক এক শ্রেণীর পাপীকে রক্ষা করা হয় এবং সেখানে পাপের গুরুত্ব অনুসারে কাহাকেও অগ্নিময় বিনামা পরাইয়া কষ্ট দেওয়া হয়, কাহাকেও বা উত্তপ্ত লৌহ-কটাহে নিক্ষিপ্ত করিয়া সিদ্ধ করা হয়। সেই সকল নরকের কর্তৃত্ব-ভার কতকগুলি (কোনও কোনও মতে উনিশ জন) 'এঞ্জেলের' উপর ন্যস্ত আছে। আপন-আপন পাপ-কার্য্যের প্রতিফল-স্বরূপ পাপিগণ উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতেছেন কিনা, এঞ্জেল-গণ তদ্বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করেন। ইহুদী-দিগের শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রকাশ,—'নরকের সাতটি স্তরে সাত জন প্রহরী আছে। যাহারা নরকে নিপতিত হইয়াও ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, প্রহরিগণ তাহাদের দণ্ড-হ্রাসের চেষ্টা পান। পাপ-কর্ম্মের তারতম্যানুসারে পাপিগণ কঠোর হইতে কঠোরতর দণ্ড প্রাপ্ত হয় কি না, তাহাও তাঁহারা লক্ষ্য করেন। অসহ্য শৈত্যে ও অসহ্য উত্তাপে—উভয় প্রকারেই পাপীদিগকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়। সেই যন্ত্রণার ফলে তাহাদের মুখ-শ্রী কৃষ্ণবর্ণ ও বিকৃত হইয়া যায়।' মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বিগণ পাপকর্ম্ম করিয়া পাপের ফলভোগের পর স্বর্গলাভের অধিকারী হইতে পারে। ইহুদী-দিগেরও সেই মত। পূর্ব্বোক্ত স্থলে মহম্মদ মধ্যস্থ হইয়া তদ্রূপ পাপীদিগের উদ্ধার-সাধন করেন। শেষোক্ত স্থলে আব্রাহাম বা কোনও অবতার মধ্যস্থ হন। পারসিক মেগিয়ান-গণ সাতটি নরকের একজন মাত্র এঞ্জেলের বা প্রহরীর কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। সেই প্রহরীর নাম—'ভানান্দ জেজাদ'। পাপিগণ উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা এবং কাহারও প্রতি কম বা বেশী দণ্ড দেওয়া হইয়াছে কিনা, তিনি তাহাই পরিদর্শন করেন। একমাত্র শৈত্যাধিক্যে পাপিগণের কষ্ট পাওয়ার বিষয়—পারসিক-গণের ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত। অগ্নি তাঁহাদের দেবতা। পাপীর দেহ অগ্নিদেব স্পর্শ করিলে তিনি অপবিত্র হইতে পারেন। এই জন্য অগ্ন্যুত্তাপে

স্বর্গ-নরকাদি বিষয়ে।

পাপিগণের কষ্ট পাওয়ার বিষয় তাঁহারা স্বীকার করেন না। সর্প-দংশনে, অত্যধিক পিপাসায় ও ক্ষুধায় কষ্ট দিয়া এবং দেহে অস্ত্র বা সূচী-বেধ দ্বারা পাপীদিগের দণ্ডদানের বিষয়ও পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে। বেলগ্রেড সহরের প্রধান রাব্বি (ধর্ম্মযাজক-বিশেষ) ডক্টর কোহাট ইহুদী-দিগের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি জর্ম্মণ-ভাষায় একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। জুডাইজম্ ও খৃষ্ট-ধর্ম্মে পারসিক-ধর্ম্ম হইতে কি কি অংশ গৃহীত হইয়াছে,—সেই গ্রন্থে তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'পারসিক-গণ পরবর্ত্তি-কালে যে সপ্ত-স্বর্গের বিষয় মাগু করিয়া গিয়াছেন, ইহুদী-দিগের 'তালমুদে' সেইরূপ সপ্ত স্বর্গের বিষয় বিবৃত আছে। বাইবেলেও সেই সপ্ত-স্বর্গের পরিচয় পাই। বাইবেলোক্ত সাতটি স্বর্গের ছয়টির নাম—তালমুদোক্ত ছয়টি স্বর্গের নামের সহিত অভিন্ন।' * স্বর্গে 'এঞ্জেল' বা স্বর্গীয় দূতগণ ঈশ্বরের গুণগান করেন,—এ বিষয় পারসিক-গণের জেন্দ-আভেস্তায় এবং খৃষ্টান-গণের 'ইশিয়া' ও 'রিভিলেশন' প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। † খৃষ্টান-দিগের 'ইডেন' নামক স্বর্গ মূল্যবান প্রস্তরে বিনির্ম্মিত বলিয়া কথিত আছে। পারসিক-গণের 'বুন্দেহেশ' গ্রন্থেও স্বর্গের বর্ণনায় সেই ভাব পরিস্ফুট। উক্ত গ্রন্থের একত্রিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—'স্বর্গধাম বহুমূল্য প্রস্তরে সংগঠিত হওয়ায় সর্ব্বদা চাকচিক্য-সম্পন্ন রহিয়াছে।' অন্যত্র আবার দেখিতে পাই,—'হীরক-খণ্ডের ন্যায় তাহা সমুজ্জ্বল।' জেন্দ-ভাষার 'আসমান' শব্দের আলোচনায়ও পণ্ডিতগণ স্বর্গকে বহুমূল্য-প্রস্তর-নির্ম্মিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কারণ, 'আসমান' শব্দে স্বর্গ এবং প্রস্তর উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। স্বর্গের ও নরকের মধ্যে একটি প্রাচীর বা ব্যবধান আছে,—এ কথা প্রায় সকল ধর্ম্মেই দেখিতে পাই। মুসলমান-গণের মতে সেই প্রাচীর বা ব্যবধানের নাম—'আল্ অর্ফ'; অথবা বহুবচনে 'আল্ আরাফ।' ধাতু—গত অর্থে ঐ শব্দে কেবল 'ব্যবধান' বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ উহার অর্থ—'উচ্চ প্রাচীর' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খৃষ্টানগণ ঐ ব্যবধানকে প্রাচীর বলেন না। তাঁহারা বলেন,—'স্বর্গ ও নরকের মধ্যে একটি উপসাগর আছে।' ‡ এতদ্বিষয়ে ইহুদীদিগের মত—খৃষ্টান-দিগের মত হইতে স্বতন্ত্র বটে; কিন্তু মুসলমান-দিগের সহিত অনেক অংশে সাদৃশ্য-সম্পন্ন। ইহুদী-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকাশ,—'একটি সূক্ষ্ম প্রাচীরে স্বর্গ ও নরককে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।' § স্বর্গ সর্ব্বপ্রকার সুখের আধার এবং নরক সর্ব্বপ্রকার দুঃখের স্থান বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে স্বর্গের একটি সুখ-সামগ্রীর প্রসঙ্গে সুন্দরীর বা পরীর উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই সুন্দরী বা পরীগণের বর্ণনায় পারসিক-গণ বলিয়াছেন,—তাহাদের নাম 'হুরাণ-ই-বেহিস্ত'; মুসলমান-গণ বলিয়াছেন—

* "As we meet with them in the later Parsee system so too in the *Talmud*, (Chapter xii. b) we have names of the seven heavens six of which correspond to the Biblical names."—*Vide*, Dr. A. Kohut, *The Part taken by the Parsee Religion in the Formation of Christianity and Judaism.*

† *Vide*, *Yasna*. xxviii, xxiv. and *Isaiah*. vi.

‡ *St. Luke*. xvi 26.

§ *Midrash*. *Yalkut Semuni*. II. f.

'হর-উল্-ঐন।' কেহ কেহ বলেন,—স্বর্গে পরীর বিদ্যমানতার কথা প্রথমে পারসিক-গণ প্রচার করিয়া যান; মহম্মদ তাহারই অনুসরণ করেন। স্বর্গে যাইবার পথে যে এক সেতু আছে, মুসলমান-গণ, খৃষ্টান-গণ, ইহুদী-গণ সকলেই স্বীকার করেন। সেতুর নাম ও আকারাদির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। * এ সকল বিষয় আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতেও এক স্থলে না এক স্থলে পরিবর্ণিত আছে। শাস্ত্র-মতে নরক—অসংখ্য। স্বর্গ-বাসে যে সকল প্রকার সুখের বিষয় এবং নরক-প্রাপ্তিতে যে সকল প্রকার কষ্টের বিষয় যে দেশের যে কোনও ধর্ম্ম-গ্রন্থে যাহা কিছু লিখিত আছে, আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে তাহার সকল বিষয়ই কোন-না-কোনও স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রে বহু স্বর্গ ও বহু নরকের বিষয় লিখিত থাকিলেও সাধারণতঃ সপ্ত-স্বর্গ ও সপ্ত-নরকের প্রাধান্যই দৃষ্ট হয়। তাহারই অনুসরণে ইরাণীয় প্রভৃতি প্রাচীন-জাতিগণের মধ্যে সপ্ত-স্বর্গের ও সপ্ত-নরকের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বর্গে নদী প্রবহমানা,—ইহুদী-গণের, খৃষ্টান-গণের, মুসলমান গণের, পারসিক-গণের, সকলেরই ধর্ম্ম-গ্রন্থে লিখিত আছে। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশাধিক শততম সূক্তের অষ্টম ঋকেও তাহা দেখিতে পাইবেন। পুরাণাদিতেও তদ্রূপ বর্ণনার অসদ্ভাব নাই। স্বর্গের আনন্দাদির বিষয় অন্যান্য ধর্ম্মে যাহা লিখিত আছে, তৎসমুদায়ও ঋগ্বেদের পূর্ব্বোক্ত সূক্তে এবং পুরাণাদি বর্ণিত স্বর্গধামের বর্ণনায় দেখিতে পাইবেন। † স্বর্গের পথে নদী বা উপসাগরের বিষয় হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বৈতরণীর অনুসরণ বলিয়া মনে হয়। স্বর্গে অপ্সরাগণ নৃত্য গীতাদি করে, স্বর্গগামী পুরুষগণ বরাঙ্গনা-সমাকীর্ণ হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকেন এবং গীতবাদ্য-নির্ঘোষে প্রতিবুদ্ধ হন,—পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে এ সকল উক্তিও দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মৎস্য-পুরাণের পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়ের "গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং মধ্যে স্বর্গে ক্রীড়তি মানবঃ" এবং "বরাঙ্গনাসমাকীর্ণৈর্মোদতে শুভলক্ষণৈঃ" প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। স্বর্গধাম রত্নখচিত,—সে পরিচয়ও প্রোক্ত স্থলেই দৃষ্ট হইবে। মহাভারতের নানা স্থানে কর্ম্মানুসারে স্বর্গাপবর্গ-লাভের তারতম্যের বর্ণনা আছে। অনুশাসন-পর্ব্বের ষড়ধিক শততম ও সপ্তাধিক শততম অধ্যায়-দ্বয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ভীষ্ম স্বর্গ ও পুণ্যলাভ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বর্গে অপ্সরোগণ স্বর্গগামীকে প্রমোদিত করেন, স্বর্গে মনুষ্যের অভিলষিত সকল সামগ্রীই বিদ্যমান আছে,—এ সকল উক্তি সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তুলাদণ্ডে পুণ্যের তারতম্য নির্ণীত হইয়া থাকে; 'সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং একমাত্র সত্য—তুলাদণ্ড দ্বারা বিধৃত হইয়াছিল, কিন্তু সহস্র অশ্বমেধ হইতে এক মাত্র সত্যই বিশিষ্ট হইল';—অনুশাসন-পর্ব্বের পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ে ভীষ্মের উক্তিতে তাহা দেখিতে পাই। স্বর্গ আলোক-ময়, জ্যোতির্ম্ময় এবং সর্ব্বসুখ-প্রদ স্থান,—এরূপ বর্ণনা পুরাণে ও মহাভারতে সর্ব্বত্রই আছে এবং ঋগ্বেদের সূক্তেও

---

* এই পরিচ্ছেদের ১৩৬, ১৩৭ ও ১৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† এই পরিচ্ছেদের ১৩৮ পৃষ্ঠার ও ১৪২ পৃষ্ঠার বর্ণিত অংশের সহিত ১৪৬ পৃষ্ঠার বর্ণনা মিলাইয়া দেখুন; স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে সাদৃশ্যের বিষয় উপলব্ধি হইবে।

দেখিয়াছি। * ফলতঃ, স্বর্গ ও নরকের সুখ-দুঃখ সৌন্দর্য্য-বিভীষিকা প্রভৃতির বিষয় যেখানে যাহা দেখিতে পাই, তাহার সকলই আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থের কোথাও-না-কোথাও এক ভাবে না এক ভাবে বর্ণিত আছে।

লয়—মুক্তি।

শাস্ত্র-মতে প্রলয় চতুর্ব্বিধ। সেই চতুর্ব্বিধ প্রলয়ের নাম—নিত্য প্রলয়, প্রাকৃত প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয় এবং আত্যন্তিক প্রলয়। † 'এই জগতে প্রতিদিন সুষুপ্তি-কালে যে এই সমস্ত ভূতের লয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে মুনিগণ নিত্য প্রলয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহদহঙ্কারাদি স্থূল ভূত পর্য্যন্তের যে প্রলয় হয়, অর্থাৎ বিদেহ-কৈবল্যে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্তের যে প্রকৃতিতে লয় হয়, তাহার নাম—প্রাকৃত প্রলয়। কল্পান্তে ব্রহ্মার নিদ্রাগম নিমিত্ত ভূ, ভুব, স্ব এই লোকত্রয়ের যে প্রলয় হইয়া থাকে, মনীষিগণ তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলেন। তত্ত্বজ্ঞান-লাভে পরমাত্মায় যে লয়, তাহারই নাম—আত্যন্তিক প্রলয়।' এইরূপ-ভাবে প্রলয় পূর্ব্বাপর হইয়া আসিতেছে এবং প্রলয়ের পর পুনঃ-সৃষ্টি সাধিত হইতেছে। এ মতে, মহাপ্রলয়েও বীজরূপে সংসার অবস্থিত থাকে; প্রলয়—অবস্থান্তর-প্রাপ্তি মাত্র। এই অবস্থান্তর-প্রাপ্তি সম্বন্ধেই যত কিছু বাদানুবাদ। সকল দেশের সকল সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক এই সম্বন্ধে আলোড়িত হইয়া আছে। সকল দেশের সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থ এই অনুসন্ধানে নিয়োজিত আছেন। এ সম্বন্ধে যে দেশে যত প্রকার মত প্রচলিত থাকুক না কেন, আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থে সকল মতেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে। যে পথে অগ্রসর হইলে যে ভাবে লয় বা অবস্থান্তর সঙ্ঘটিত হইবে, শাস্ত্রকারগণ তন্ন তন্ন করিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ কর্ম্মানুসারে লয় বা অবস্থান্তর-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। 'কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম কৃত হয়, সেই কার্য্য-গতি অনুসারেই লোকের উত্তম, মধ্যম বা অধম গতি লাভ হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক—অন্তঃকরণের যে ভাবে যে কর্ম্ম আচরিত হয়, সেই ভাবের উৎকর্ষ হওয়াতে পরকালে সেইরূপ শরীর দ্বারা ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়।' ‡ ইহাতে বুঝা যায়,—কর্ম্মের ঘোরে পড়িয়া, জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া, জীবকে ক্রমাগত উচ্চ-নীচ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে। কর্ম্মানুসারে স্বর্গলাভ করিলেও, কর্ম্মফল শেষ হইলে পুনরায় সংসারে আসিবার সম্ভাবনা থাকে,—পুনরায় উচ্চ-নীচ যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া সুখ-দুঃখের ভাগী হইতে হয়। এ ভাবে সম্পূর্ণ লয় নাই। এরূপ গতাগতি-ক্রমে একেবারে দুঃখ-নিবৃত্তির সম্ভাবনাও অতি অল্প। এই পৌর্ব্বাপর্য্য উপলব্ধি করিয়া আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির বা সম্পূর্ণ লয়ের

হিন্দু-শাস্ত্রে লয়-তত্ত্ব।

---

* এই পরিচ্ছেদের ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের প্রথম হইতে পঞ্চম অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩১শ অধ্যায়ে, কূর্ম্ম-পুরাণ, ৪২শ—৪৩শ অধ্যায় প্রভৃতি স্থানে এই চতুর্ব্বিধ প্রলয়ের বিশদ বিবরণ বর্ণিত আছে।

‡ "শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্। কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥"
"যাদৃশেন তু ভাবেন যদ্যৎ কর্ম্ম নিষেবতে। তাদৃশেন শরীরেণ তত্তৎফলমুপাশ্নুতে॥"
—মনুসংহিতা, দ্বাদশ অধ্যায়, ৩য় ও ৮১শ শ্লোক।

সম্ভাবনা আছে কি না, তৎসম্বন্ধে সংসার আবহমান কাল অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। যে দেশে যে দার্শনিকই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে দেশে যে বৈজ্ঞানিকেরই অভ্যুদয় হইয়াছে, যে দেশে যে সাহিত্যিকই আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই দৃষ্টি সেই পথে প্রধাবিত;—সংসারের দুঃখ দূর হইয়া কিসে সংসারীর সুখ-সাধন হয়, প্রকারান্তরে সকলেই তাহা খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। সেই পথে অগ্রসর করিবার জন্য সহায়তা-কল্পে শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহ উজ্জ্বল আলোক-প্রভা বিস্তার করিয়া আছেন। সেই আলোক-প্রভার অনুসরণে অগ্রসর হইলে, সুখ-দুঃখের অতীত এক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। সেই অবস্থাই প্রকৃত লয়। সেই অবস্থায় অনন্ত সুখ। সেই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে, আর সাংসারিক সুখ-দুঃখের বা জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না। সে অবস্থার নিকট সংসারের সুখ তুচ্ছ, স্বর্গ তুচ্ছ, দেবত্ব তুচ্ছ,—সে অবস্থাকে কেহ বলিয়াছেন,—'নিঃশ্রেয়স', কেহ বলিয়াছেন,—'মোক্ষ', কেহ বলিয়াছেন—'নির্ব্বাণ', কেহ বলিয়াছেন—'কৈবল্য', কেহ বলিয়াছেন—'আত্মায় আত্ম-সম্মিলন', কেহ বলিয়াছেন—'সোঽহং ভাব'। খুঁজিতে খুঁজিতে সাধক শেষে সেই অবস্থায় উপনীত হন।

লয়ের সেই অবস্থায় উপনীত হইবার তিনটি পথ সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেই তিনটী পথের নাম—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম। কেহ বলিয়াছেন,—জ্ঞান দ্বারা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়; কেহ বলিয়াছেন—'ভক্তির দ্বারা'; কেহ বলিয়াছেন,—'কর্ম্মের দ্বারা।' যাঁহারা অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন,—'জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, তিনই এক। এক পথে অগ্রসর হইতে হইতে অন্য পথ আপনিই অধিগত হয়।' যাঁহারা ভক্তিকেই সর্ব্বমূলাধার বলিয়া সংকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা বলেন,—'ভক্তি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—স্বরূপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও আরোপ-সিদ্ধা। আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি প্রকৃত ভক্তি নয়; কিন্তু ভগবানে সমর্পিত হওয়ায় ভক্তিরূপে পরিণত। কর্ম্ম স্বয়ং ভক্তি নহে; কিন্তু কর্ম্মই আবার ভগবানে সমর্পিত হইলে আরোপ-সিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে।' এ সম্বন্ধে ভক্তিবাদিগণ বলেন,—'লবণাকরে যাহা নিপতিত হয়, তাহার পরিণতি লবণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সূর্য্যকান্ত মণির স্বতঃসিদ্ধ দাহিকা শক্তি নাই সত্য; কিন্তু সূর্য্য-রশ্মি-সম্বন্ধ লাভ করিলে তাহাতে দাহিকা-শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে,—সূর্য্যের শক্তিতে সেও শক্তি-সম্পন্ন হয়। কর্ম্মও তদ্রূপ ভগবানে সমর্পিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ-শক্তি লাভ করে।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে নিষ্কাম-কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানে কর্ম্মের দ্বারাই মুক্ত অবস্থায় উপনীত হইবার প্রাধান্যের ভাব মনে আসিতে পারে। দর্শন-শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"আত্মকর্ম্মসু মোক্ষব্যাখ্যাত।" অর্থাৎ—আত্মকর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়। আত্মকর্ম্ম বলিলে ভগবৎ-কর্ম্ম বা ভগবানের উদ্দেশে নিয়োজিত নিষ্কাম কর্ম্মকে বুঝাইয়া থাকে। দর্শন-শাস্ত্রের টীকাকারগণের মতে, আত্মকর্ম্মের অর্থ—'শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি। শাস্ত্রালোচনায় শাস্ত্র-সম্মত আত্মার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়ার নাম—শ্রবণ। বিচারাদি দ্বারা শ্রবণের সার্থকতা-প্রতিপাদনই—মনন। নিদিধ্যাসন অর্থ—তন্ময়ত্ব বা সমাধি।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম।

সেই অবস্থায় প্রহ্লাদ ভগবানের যে স্তব করিয়াছিলেন, সেই স্তবে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব এবং তাঁহাতে প্রহ্লাদের লয়-প্রাপ্তির বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। প্রহ্লাদ প্রার্থনা করেন,—

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম। নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ। রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥
দেবা যক্ষাসুরাঃ সিদ্ধা নাগ গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। পিশাচা রাক্ষসাশ্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা॥
পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিকা সরীসৃপাঃ। ভূমিরাপো নভো বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্তথারসঃ॥
রূপং গন্ধো মনোবুদ্ধিরাত্মা কালস্তথা গুণাঃ। এতেষাং পরমার্থশ্চ সর্ব্বমেতৎ ত্বমচ্যুত॥
বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে। প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম বেদোদিতং ভবান্॥
সমস্তকর্ম্মভোক্তা চ কর্ম্মোপকরণানি চ। ত্বমেব বিষ্ণো সর্ব্বাণি সর্ব্বকর্ম্মফলঞ্চ যৎ॥
ময্যন্যত্র তথাশেষভূতেষু ভুবনেষু চ। তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্য্যগুণসংসূচিকা প্রভো॥
ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজ্বিনঃ। হব্যকব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃক্॥

রূপং মহৎ তে স্থিতমত্র বিশ্বং ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপানি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদাস্তেষন্তরাত্মাখ্যমতীব সূক্ষ্মম্॥
তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদিবিশেষণানামগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়॥

সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব। গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥
যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা। জ্ঞানিজ্ঞান পরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে চেশ্বরীং পরাম্॥
ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা। ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ॥
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে। নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে॥
যস্যাবতাররূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ। অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
যোঽন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভম্। তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্তে পরমেশ্বরম্॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ। ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্। আধারভূতঃ সর্ব্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃপুনঃ। যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥
সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ। মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ। ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বলোকাত্মন্! তোমাকে নমস্কার! হে তীক্ষ্ণচক্রধারী! তোমাকে নমস্কার। হে গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেব! তোমাকে নমস্কার। হে জগৎহিতকারী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ! তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। তুমি ব্রহ্মারূপে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণুরূপে পালনকর্ত্তা, রুদ্ররূপে সংহারকর্ত্তা; হে ত্রিমূর্ত্তি! তোমাকে নমস্কার। দেব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, পিপীলিকা, সরীসৃপ, ভূমি, জল, আকাশ, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, কাল, গুণ, হে অচ্যুত! তুমি এ সকলেরই পরম কারণ,—সকল পদার্থ ই তোমার স্বরূপ। তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তুমি সত্য ও অসত্য, তুমি বিষ ও অমৃত, তুমি বর্ত্তমান ও অতীত;—তুমি সমুদায় বেদোক্ত কর্ম্মের স্বরূপ। হে বিষ্ণু! তুমি সমস্ত কর্ম্মের ফলভোক্তা, সমস্ত কর্ম্মের উপকরণ, এবং সমস্ত কর্ম্মের ফল-স্বরূপ। প্রভো! তুমি

আমাকে, অন্য সকলকে, বিশ্ব-সংসারকে এবং অশেষ ভূত-সমূহকে আপন ঐশ্বর্য্য-গুণ দ্বারা ব্যাপিয়া আছ। যোগিগণ তোমাকে ধ্যান করেন, যাজকগণ তোমার আরাধনা করেন;—তুমি দেব ও পিতৃরূপে হব্যকব্য গ্রহণ কর। হে ঈশ্বর! এই বিশ্ব তোমারই মহৎ-রূপ; এই জগৎ তোমার তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ। নানাপ্রকার জরায়ুজ জীবজন্তু তদপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং তাহাদের অন্তরাত্মা তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। এই সমুদায়ই তোমার রূপ-ভেদ। সূক্ষ্মের পর যে সূক্ষ্ম, যাহা বিশেষণাদির অগোচর, তাহাই তোমার রূপ। তোমার সেই পুরুষোত্তম নামক অচিন্ত্য রূপকে নমস্কার করি। হে সর্ব্ব-ভূতের আত্মা-স্বরূপ! সর্ব্ব-ভূতের মধ্যে তোমার যে ত্রিগুণাশ্রিতা জড়শক্তি আছে, হে সুরেশ্বর! হে বাসুদেব! তোমার সেই নিত্য-শক্তিকে নমস্কার করি। বাক্যমনের অগোচর, বিশেষণের অতীত, জ্ঞানিগণের জ্ঞানের বিষয়ীভূত তোমার সেই পরা ঈশ্বরী শক্তিকে বন্দনা করি। কোনও পদার্থ হইতে যিনি স্বতন্ত্র নহেন, অথচ সকল পদার্থ হইতে যিনি স্বতন্ত্র, সেই ভগবান বাসুদেবকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, অস্তিত্ব-মাত্রে যিনি উপলব্ধ হন, সেই মহাত্মনকে নমস্কার করি। যাঁহার পরম সূক্ষ্ম রূপ নেত্রগোচর না হওয়ায়, দেবতারা যাঁহার অবতার-রূপকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি অশেষ জগতের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া সকলের শুভাশুভ অবলোকন করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি। এই জগৎ যাঁহা হইতে অভিন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। সেই সকলের ধ্যেয় জগতের আদি অব্যয় পুরুষ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহা হইতে সমুদায় উৎপন্ন, যিনি সকলের আধার-ভূত, যিনি বিশ্বে ওতঃপ্রোতঃ-ভাবে অবস্থিত, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহাতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চরাচর সমুদায় অবস্থিত, যাঁহা হইতে তৎসমুদায় উৎপন্ন, যিনি সর্ব্ব-স্বরূপ এবং যিনি সকলের আশ্রয়-ভূত, সেই বিষ্ণুকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। তিনি সর্ব্বগামী এবং সর্ব্বরূপে অবস্থিত; সুতরাং তিনি আমাতেও অবস্থিত। অতএব তিনিই আমি। আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, আমাতেই সমস্ত অবস্থিত আছে এবং আমাতেই সমস্ত লয়-প্রাপ্ত হইবে। পরমাত্মাতেই আমার আশ্রয়; আমিই অক্ষয় অব্যয় নিত্য। আমি ব্রহ্ম; আমি সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলাম, মহাপ্রলয়ের পরও বিদ্যমান থাকিব।" এই যে লয়;—সাধক হিন্দু এই লয়েরই কল্পনা করেন। পূর্ব্বেও যাহা ছিলেন, পরেও তাহা থাকিবেন; সেই সৎ-অবস্থা-প্রাপ্তিই হিন্দুর লয়। লয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক হইয়া যায়; লয়ে আত্মায় আত্ম-লীন হয়। সাধক-ভক্তগণ এই ভাবেই তন্ময়ত্ব-প্রাপ্ত হন। এই ভাবেই লয় সংঘটিত হয়।

বৌদ্ধমতে লয়।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রসঙ্গেও অনেকে লয়ের পূর্ব্বোক্ত ভাব উপলব্ধি করেন। কুম্ভকারের কুলাল-চক্র একবার পরিচালিত হইলে কিছুক্ষণ যেমন তাহার বেগ অব্যাহত থাকে, এবং পুনঃ-সঞ্চালিত না লইলে আপনা-আপনিই যেমন তাহা স্থিরভাব ধারণ করে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি বিষয়েও পাণ্ডিতগণ সেই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—বুদ্ধের নির্ব্বাণ সেই প্রশান্ত অবস্থা; তখন পূর্ণ-বিবেকের উদয়ে কাম-ক্রোধাদি রিপু সকল বশীভূত

সে অবস্থায় ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সমস্তই লোপপ্রাপ্ত হয়। নূতন বন্ধনে আর আবদ্ধ হইতে হয় না। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম হইতে যে জীবন-ভোগের সম্ভাবনা, তখন আর তাহাও থাকে না। অদৃষ্টও লোপ পায়। সুখের প্রতি আসক্তি বা দুঃখের প্রতি বৈরাগ্য অর্থাৎ অহং-জ্ঞান থাকে না। তখন আত্মার আত্মজ্ঞান সাক্ষাৎকার ঘটে; আর তাহাতে সর্ব্ব-দুঃখের নাশ বা মোক্ষ-লাভ হয়। আত্মসাক্ষাৎকারে যোগ-প্রভাবে জীব অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল অদৃষ্টের ফল ভোগ করিয়া লয়। এইরূপে সর্ব্বকালের সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইয়া গেলে, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হেতু সুখদুঃখ-ভোগ বা জন্মাজন্মের প্রয়োজন হয় না। তখন আত্মায় আত্মা লীন হয়।' "জ্ঞানান্মুক্তি"—সাঙ্খ্যকারগণ বলেন, পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদাভেদ-জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তি হয়। এ বিষয়ে সাঙ্খ্য-কারিকার তিনটী কারিকা,—

"দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য ॥ ১ ॥
সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃতশরীরঃ ॥ ২ ॥
প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি ॥ ৩ ॥"

'আমি প্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছি, এই বিবেচনায় এক ব্যক্তি অর্থাৎ পুরুষ বিরত হন; এবং পুরুষ আমাকে দর্শন করিয়াছেন, এই বলিয়া এক ব্যক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি বিরত হন; এই জন্য পুরুষের ভোক্তৃতা-যোগ্যত্ব এবং প্রকৃতির ভোগ্যতা-যোগ্যত্ব থাকিলেও সৃষ্টি-প্রয়োজক অর্থাৎ অবিদ্যা-সহকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে না (সেই জন্য সৃষ্টি হয় না)। অর্থাৎ—বিবেক-সাক্ষাৎকার হইলে প্রকৃতি-পুরুষের সন্নিধানরূপ সংযোগও থাকে না, সে অদৃষ্টও আর থাকে না; সুতরাং সৃষ্টি হয় না। ১ ॥ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উদয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম (ভোগাদির কারণ) হয় না। তখন কুলালব্যাপার না থাকিলেও বেগরূপ সংস্কারে কুলাল-চক্র-ভ্রমণের ন্যায় প্রারব্ধ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার-বলেই কিছুদিন শরীর ধারণ করিয়া থাকা ঘটে। অর্থাৎ—ভেদজ্ঞান না থাকিলে অনাগতাবস্থ পুরুষার্থ অদৃষ্ট থাকে না, সুতরাং তখন শরীর-ধারণ কিরূপে সম্ভবপর? এই প্রশ্নের উত্তর এখানে বলা হইতেছে,—যেমন কুম্ভকার একবার ঘুরাইয়া দিলে কুম্ভকার-চক্র বেগবশে অনেকক্ষণ চলে, সেইরূপ প্রারব্ধ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ক্ষয়োন্মুখ অবিদ্যার কণামাত্রই সংস্কার-রূপে থাকিয়া শরীর ধারণ করাইয়া দেয়। তাহাতে নূতন সংস্কার অর্থাৎ অবিদ্যা বাসনা উৎপন্ন হয় না। এইরূপ শরীর-ধারণের অবস্থাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। ২॥ কৃতার্থতা হেতু প্রকৃতির নিবৃত্তি এবং শরীরপাত হইলে, পুরুষের আত্যন্তিক এবং ঐকান্তিক, এই দুই প্রকার কৈবল্য অর্থাৎ দুঃখোচ্ছেদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ,—প্রকৃতির কার্য্য, ভোগাদি অবশিষ্ট না থাকিলেই কৃতার্থতা হইল। তাহার পর আর প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ থাকে না। তখন প্রারব্ধ ও ধর্ম্মাধর্ম্মেরও ভোগাধীন ক্ষয় হয়। তখন শরীরপাত হইয়া থাকে। তাহা হইলেই বিদেহ-কৈবল্য বা নির্ব্বাণ-মুক্তি হয়। এই নির্ব্বাণ-মুক্তির স্বরূপ —বিশেষ প্রকার দুঃখ-নিবৃত্তি। সে নিবৃত্তির পর পুনরায় আর দুঃখ সহ না। ৩॥' উদ্ধৃত

কারিকা ও তাহার ব্যাখ্যায় বুঝিতে পারা গেল,—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে যদিও কিছুদিন পূর্ব্ব-কর্ম্মফল ভোগের সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু পরিশেষে মোক্ষ-লাভ বা লয় অবশ্যম্ভাবী। তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইলে, নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয়ের সম্ভাবনা থাকে না; সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্ট বা পূর্ব্বতন কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসে। এইরূপে কর্ম্ম-ক্ষয় সাধিত হইলে, সংসারে আর পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না; তখন ব্রহ্মেই আত্মা লয়-প্রাপ্ত হয়। সাঙ্খ্য-কারিকার অন্য একটি কারিকায় এই ভাব, অর্থাৎ কর্ম্মের শেষ হইলেই নিবৃত্তি, আরও একটু পরিস্ফুট দেখিতে পাই। সেই কারিকা,—

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মনাং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতি॥"

অর্থাৎ—'যেমন নর্ত্তকী রঙ্গ-সভায় নৃত্য দর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই-রূপ প্রকৃতি পুরুষের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিরত হইয়া থাকেন।' শাস্ত্র বলেন,—মনই মনুষ্যগণের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। মন যখন বিষয়া-সক্ত হয়, তখন বন্ধনের এবং যখন বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। জ্ঞানী মুনিজন বিষয় হইতে মনকে সমাহিত করিয়া, মুক্তির জন্য ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা করিবেন; যেমন চুম্বক প্রস্তর দ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মও এই ভাবে চিন্তিত হইলে স্বভাবতঃই যোগীকে আত্মভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। মনের এই প্রকার গতি আপনারই যত্ন সাপেক্ষ। ব্রহ্মে সেই মনোগতি-সংযোগের নামই যোগ। যাহার যোগ এতাদৃশ ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত, সেই ব্যক্তিকেই যোগী ও মুমুক্ষু বলা যায়। প্রথমতঃ যোগী যখন যোগযুক্ত হন, তখন তাঁহাদিগকে 'যুঞ্জান' বলা গিয়া থাকে। ক্রমশঃ সমাধি-সম্পন্ন হইলে তাঁহার ব্রহ্ম-জ্ঞান হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত যুঞ্জান যোগীর মন যদি বিঘ্ন-দোষে দূষিত না হয়, তাহা হইলে অভ্যাস-বশে জন্মান্তরে তাঁহার মুক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সমাধি-সম্পন্ন যোগী সেই জন্মেই মুক্তি পাইয়া থাকেন; যেহেতু, যোগাগ্নির দ্বারা তাঁহার সমস্ত অদৃষ্ট অচিরেই দগ্ধ হইয়া যায়।' *

সেই মুক্তিই মুক্তি, সেই মুক্তিই লয়,—যে মুক্তির বা যে লয়ের পর আত্মায় ও পরমাত্মায় কোনই পার্থক্য থাকে না। ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদ ভীষণ পরীক্ষা-পারাবারে উত্তীর্ণ হইয়া এই লয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপুর পীড়নে একই ভাবে বিষ্ণুর উপাসনা করিতে করিতে, তাঁহা হইতে আপনাকে অভিন্ন ভাবিতে ভাবিতে, প্রহ্লাদ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। পিতা হিরণ্যকশিপু যখন ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া বলেন,—'হে দৈত্যগণ! অগ্নি প্রহ্লাদকে দগ্ধ করিতে পারিল না, শস্ত্র-সমূহ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইল না, সর্পদংশন, সংশোষক, বায়ু, বিষ, কৃত্যা, মায়া, দিগ্‌গজ-সমূহ দ্বারা কিংবা উচ্চ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও দুষ্টচিত্ত প্রহ্লাদ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইল না। অতএব পর্ব্বত-চাপে এই দুরন্তকে সমুদ্র-জলে ডুবাইয়া মার। তাহা হইলে এ দুর্ম্মতির বিনাশ-সাধন হইতে পারে।' দৈত্যরাজের এবম্বিধ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রহ্লাদকে আক্রমণ পূর্ব্বক দৈত্যগণ বিশাল শিলাখণ্ডে প্রহ্লাদের দেহ আবৃত করিয়া প্রহ্লাদকে সমুদ্র-জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

প্রহ্লাদাদির মুক্তি।

* বিষ্ণুপুরাণ, ষষ্ঠ অংশ, সপ্তম অধ্যায়, ২৮ম—৩৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এবং ইন্দ্রিয় সকল সংযত, তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভাসিত আত্মা তখন মুক্তির জন্য প্রস্তুত। অবশেষে পঞ্চ-ভূতের সহিত আত্মার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়; প্রকৃতির কার্য্য শেষ হইয়া যাওয়ায় প্রকৃতি নিবৃত্ত হন! পঞ্চভূত হইতে আত্মা পৃথক হইয়া পরম্পর অনন্তকাল স্বাধীন-ভাবে অবস্থিতি করেন। সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে, আত্মোৎকর্ষ সাধনের ফলে, এই নির্ব্বাণ লাভ হয়। 'ধম্মপদ'-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—যিনি সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, যিনি সুখ-দুঃখাদিতে অভিভূত নহেন, যাঁহার কর্ম্মের শেষ হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাঁহার আর সংসার-যন্ত্রণা-ভোগের আশঙ্কা নাই। রাজহংস জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, জলাশয়ের সহিত তাহার আর কোনও সম্বন্ধ থাকে না। যাঁহাদের হৃদয়ে বিবেকের উদয় হইয়াছে, তাঁহারাও সেইরূপ নির্লিপ্ত-ভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয়ে যাঁহার চিত্ত সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাঁহার চিন্তায় শান্তি, বাক্যে শান্তি, কার্য্যে শান্তি;—তিনি শান্তিস্বরূপ হইয়াছেন। সাধারণতঃ বিশ্বাস,—মৃত্যু বা শরীর ধ্বংস হইলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মতে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—নির্ব্বাণ অর্থ মৃত্যু নহে; মানসিক পাপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই নির্ব্বাণ। জীবন-রক্ষার এবং সুখ-সাধনের অনন্ত তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষকে জন্মজন্ম জরামৃত্যুর অধীন হইতে হইতেছে। সেই তৃষ্ণার নিবৃত্তির নামই নির্ব্বাণ। গৌতম যাহাকে নির্ব্বাণ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন, সে নির্ব্বাণ ইহজীবনেই অধিগত হইতে পারে। এই জীবনেই তিনি সে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। সে নির্ব্বাণ—মনের নিষ্পাপ প্রশান্ত অবস্থা; সে নির্ব্বাণ—রিপুর দমন ও লালসার নিবৃত্তি; সে নির্ব্বাণ—পূর্ণ শান্তি, সততা ও তত্ত্ব জ্ঞান লাভ; আত্মোৎকর্ষ-সাধনের ফলে মানুষ ইহজীবনেই সে নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হয়। গৌতম-বুদ্ধের জীবন-চরিত লেখক রিজ ডেভিড এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—'মৃত্যু বৌদ্ধদিগের স্বর্গ নহে। মৃত্যুর সহিত তাঁহাদের স্বর্গের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই পৃথিবীতে যাঁহারা পুণ্যজীবন যাপন করিতে পারেন তাঁহারাই এই নির্ব্বাণের অধিকারী হন। এই পৃথিবীতে পবিত্র জীবন যাপন করিয়া যাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করিলেন, ভবিষ্যতে বা স্বর্গধামে তাঁহারা সুখ-শান্তির অধিকারী হইবেন কিনা—বৌদ্ধগণের মধ্যে সময় সময় সংশয়-প্রশ্ন উঠে। মহানুভব গৌতমের নিকটও সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করিয়া তাহার কোনও উত্তর দেন নাই। মলুক্যপুত্ত গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'দেব, যিনি পূর্ণ বুদ্ধ, মৃত্যুর পর তিনি কি পুনর্জ্জীবন লাভ করিবেন?' গৌতম-বুদ্ধ তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—'এস মলুক্যপুত্ত! আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর। এই পৃথিবী অনন্তকাল স্থায়ী কি না, আমি তোমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিব।' মলুক্যপুত্ত কহেন,—'আপনি তো আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না?' গৌতম উত্তর দেন,—'হে মলুক্যপুত্ত! এ বিষয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইও না। যদি কোনও ব্যক্তি বিষাক্ত তীর দ্বারা বিদ্ধ হয়; আর সে যদি চিকিৎসককে বলে—কে আমার শরীরে এই তীর বিদ্ধ করিল,—সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কি শূদ্র, তাহা না জানিতে পারিলে, আমার ক্ষত-স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিতে দিব না; মনে কর

দেখি, সে ব্যক্তির কি পরিণাম হইবে? সেই ক্ষতই তাহার আয়ুঃ-শেষ করিবে না কি? সেইরূপ মৃত্যুর পর কি ঘটিবে জানিতে না পারায়, যে ব্যক্তি তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভে এবং পবিত্র-জীবন-যাপনে প্রয়াস না পায়, তাহারও সেই দশা ঘটিবে। মলুক্যপুত্ত! তাই বলি, যে তত্ত্ব আজিও প্রকাশ হয় নাই, তাহা অপ্রকাশই থাকুক! যে তত্ত্বের উদ্ধার করিয়াছি, সেই তত্ত্বই পরিজ্ঞাত হও।' কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ, শাকেত ও শ্রাবস্তী নামক তাঁহার রাজ-ধানী-দ্বয়ের মধ্যে পরিভ্রমণ-কালে, ক্ষেমা নাম্নী সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বিনীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ক্ষেমা—জ্ঞান-গৌরবশালিনী বলিয়া প্রসিদ্ধা ছিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ সেই সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—'আপনি কি বলিতে পারেন, যিনি পূর্ণ-স্বরূপ, মৃত্যুর পরও কি তিনি বিদ্যমান থাকেন?' সন্ন্যাসিনী উত্তর দেন,—হে রাজন্! যিনি পূর্ণ-স্বরূপ, তিনি মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন কি না, তাহা তিনি বলিয়া যান নাই।' রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন,—'তবে কি মৃত্যুর পর সেই পূর্ণ-স্বরূপ বিদ্যমান থাকেন না?' ক্ষেমা আবার উত্তর দেন,—'মহারাজ! যিনি পূর্ণ-স্বরূপ, মৃত্যুর পর তিনি বিদ্যমান থাকেন কি না, তিনি সে কথাও বলিয়া যান নাই।' এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীত হয়, নির্ব্বাণের পর কোনরূপ অস্তিত্বের বিষয় গৌতম-বুদ্ধ স্বীকার করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তরে গৌতমের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তাঁহার মতে,—সম্পূর্ণরূপ আত্মোৎকর্ষ-সাধন করিতে পারিলে, ইহজীবনের ও ভবিষ্য-জীবনের সকল যন্ত্রণার অবসান হয়। সেই আত্মোৎকর্ষ-সাধনের ফলে সম্পূর্ণরূপ নিষ্পাপ হইয়া, মানুষ এই জীবনেই যে পবিত্র শান্তি লাভ করে, গৌতমের উপদেশ-সমূহের আলোচনা করিলে বুঝা যায়;—তাহাই নির্ব্বাণ। সে নির্ব্বাণের পর আর জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না। যিনি এ জীবনে নির্ব্বাণ লাভ করিতে না পারেন, ভবিষ্যতে তাঁহাকে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। গৌতম আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না বটে; কিন্তু আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ-তত্ত্ব প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে পুনর্জ্জন্ম হইবে?—বৌদ্ধগণ এ বিষয়ে কর্ম্মের প্রাধান্য মাত্র মান্য করেন। তাঁহারা বলেন,—'কর্ম্মের নাশ নাই। কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। যখন কোনও প্রাণী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, তাহার সেই কর্ম্মের দ্বারা নূতন প্রাণীর সৃষ্টি হইয়া থাকে।' সুতরাং ধর্ম্মবিশ্বাসী বৌদ্ধগণ যদিও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য যে তাঁহাকে এই জীবনে উপনীত হইতে হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করেন। একটি দীপ-শিখা হইতে যেমন অপর একটি দীপ-শিখা প্রজ্বালিত হয়, কর্ম্মফলে মনুষ্যের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বৌদ্ধ-গ্রন্থকারগণ সাধারণতঃ সেই উপমার উল্লেখ করেন। যদি কোনও নিরীহ ব্যক্তি কোনরূপ কষ্ট প্রাপ্ত হয়, সে মনকে প্রবোধ দিয়া বলে,—'আমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি; আমার অনুশোচনার বিষয় কি আছে? যদি আত্মাই না থাকিবে, তাহা হইলে যে মরিয়া আছে, তাহার কর্ম্মের ফলভোগ অপরে করিবে কেন?' বৌদ্ধগণ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—'যখন মনুষ্যের মৃত্যু হয়, দেহ পরমাণুতে মিশিয়া যায়, তাহার কার্য্য, চিন্তা, বাক্য অর্থাৎ তাহার কর্ম্ম—লয়প্রাপ্ত হয় না।'

তর্কস্থলে যাহাই বলা যাউক, প্রকারান্তরে এথানে সেই আত্মার দেহান্তর-গ্রহণের কথাই মনে জাগিয়া উঠে। যাহা হউক, বৌদ্ধদিগের এই কর্ম্মবাদের সহিত আধুনিক দার্শনিকগণ একটা সামঞ্জস্য-সাধনের প্রয়াস পান। তাঁহারা বলেন,—'পুত্রকে পিতৃ-পিতামহের পাপ-পুণ্যের ফলভাগী হইতে হয়। যে জাতি যেরূপ বীজ বপন করিয়া যায়, তাহার উত্তরাধিকারিগণ সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

বোধিজ্ঞান-লাভের পর বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-লাভ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায়,—'অহঙ্কারই পাপের ও সংসারের মূল। তাহার অভাবে পুণ্যের উদয়, পাপ-জীবনের বা সংসারের মৃত্যু এবং ধর্ম্ম-জীবনের বা মনুষ্যোত্তর জ্ঞানের লাভ। ইহাই চরম। এই অবস্থা আসিলেই দুঃখের অবসান, মুক্তি-লাভ, শান্তির উদয়, নির্ব্বাণ-রূপ পরম তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। অনন্ত জ্ঞান ও সত্ত্ব দর্শন হয়। সত্ত্ব তথন প্রকৃতিস্থ অমর। ইহাই অমরত্ব। আর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, জীবন নাই, জরা নাই, বন্ধ-মোক্ষ নাই। সত্ত্ব, অচ্যুত রাজ্যে বিচরণ, পরমানন্দ-প্রাপ্ত ও অমর হয়।' * এই নির্ব্বাণ-তত্ত্ব বুদ্ধদেব কিরূপে সরল উপমা দ্বারা শিষ্যগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল করাইবার প্রয়াস পাইতেন, এক দিনের একটী ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। 'এক দিন বুদ্ধদেব নব-দীক্ষিত শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া গয়ার নিকটবর্ত্তী গন্ধহস্তী পর্ব্বতে বসিয়া আছেন; এমন সময়ে অদূরে এক প্রজ্বলিত দাবানল তাঁহাদের নয়নগোচর হইল।' সেই দাবানলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গৌতম কহিলেন,—'ঐ দেখ, কেমন বেগে দাবানল জ্বলিতেছে। যতদিন নরনারী বাসনা, তৃষ্ণা ও অবিদ্যার অধীন থাকে; ততদিন তাহাদের চিত্ত ঐরূপ প্রজ্বলিত থাকে। মানুষ যতই সুন্দর দৃশ্য দেখে, অনুভব করে, ততই তাহাদের অন্তরে সুখস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। যেমন যেমন সুখস্পৃহা বাড়ে, তেমনই তেমনই তাহাদের দুঃখমূল দৃঢ় ও ঘনীভূত হয়। বিষয় জ্ঞান যতই বাড়িবে, তাহারা ততই বৈকারিক দুঃখ-সুখে লিপ্ত হইবে। তাহাতেই তাহারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, শোক ও মোহ প্রভৃতি তাপে তাপ্যমান হয়। কিন্তু যাঁহারা বোধি-মার্গে পদার্পণ করেন, তাঁহারা আত্ম-নিগ্রহের দ্বারা বাসনা ও অহং বিজ্ঞানরূপ বহ্নিকে প্রজ্বলিত হইতে দেন না। তাঁহারা সমুদায় অন্তরিন্দ্রিয়দিগের সংযত করিয়া ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়েন। অন্তর পরিশুদ্ধ হইলে, তথন আর এই সকল বিষয় (রূপ, রসাদি) অন্তরকে উত্তেজিত করিতে পারে না। বহ্নি যেমন ইন্ধন না পাইলে আপনা-আপনিই নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ জীবের তৃষ্ণা-বহ্নি বিষয়েন্ধন অভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে।' বৌদ্ধ-গণ বলেন,—'নির্ব্বাণং পরমং সুখং।' আর তাঁহারা বলেন,—"সম্যক্ দৃষ্টিঃ সম্যক্ সঙ্কল্পঃ সম্যক্ বাক্ সম্যক্ কর্ম্মান্তঃ। সম্যগনাজীবঃ সম্যক্ ব্যায়ামঃ সম্যক্ স্মৃতিঃ সম্যক্ সমাধিঃ।" —নির্ব্বাণের এই আটটী অঙ্গ। অর্থাৎ,—'সত্য-দর্শন বা ভ্রমত্যাগ, সাধু সঙ্কল্প বা শুভ ইচ্ছা,

বুদ্ধ-কথিত নির্ব্বাণ।

---

* বুদ্ধের এতদুক্তির সহিত হিন্দু-যোগিগণের নির্ব্বীজ সমাধির ফল আত্ম-বিবেকের সাদৃশ্য প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে এবং শেষোক্ত অংশ সম্বন্ধে "বুদ্ধদেব" গ্রন্থে ডক্টর রামদাস সেনের গবেষণা দ্রষ্টব্য।

সত্য বাক্য, সদ্ব্যবহার বা কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগ, সম্যক্ ব্যায়াম (ধ্যান ও যোগাদি), সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি—প্রভৃতি দ্বারা নির্ব্বাণ অধিগত হয়। বুদ্ধের নির্ব্বাণ-মুক্তিকে পতঞ্জলি-প্রদর্শিত যোগ-পন্থার অনুসারী বলা যাইতে পারে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"অবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিঃ।' চিত্তের অশুদ্ধতা নষ্ট হইলে, প্রথমে জ্ঞান-শক্তি উদ্দীপিত হইবে। অনন্তর তাহা সেই সেই ধ্যানের বা সমাধির উপযুক্ত হইবে। বস্তুতঃ, চিত্তের কামাদি দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত না হইলে, কায়িক বাচিক মানসিক কর্ম্ম-সংস্কার নিঃশক্তি না হইলে, সেই চিত্ত ভাব্য পদার্থে স্থির লগ্ন হইতে পারে না। শাক্য-মুনিও প্রথমে চিত্তকে কামাদি মুক্ত করিয়াছিলেন এবং অকুশল ধর্ম্ম-সকল ক্ষীণ করিয়াছিলেন। পতঞ্জলি উপদেশ করিয়াছেন,—'বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।' অর্থাৎ, যোগিগণের প্রথমে সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিতা নামক সংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয়। শাক্য-মুনিরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। (সবিতর্কং সবিচারং বিবেকজং প্রীতিসুখং প্রথমং ধ্যানং উপসম্পদ্য বিহরতি স্ম।) পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—'স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যে বার্থমাত্র নির্ভাষা নির্বিতর্কা এবং এতয়ৈব নির্বিচারা চ সূক্ষ্ম বিষয়া ব্যাখ্যাতা।' তাহারই পরে ভাব্য-বস্তুর নামাদি বিস্মরণ হওয়ায় চিত্তের তন্মাত্রাকারতা দৃঢ় হওয়ায় নির্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার সমাপত্তি হইয়া থাকে। ভগবান শাক্য-মুনিরও তাহাই হইয়াছিল। (আত্মপ্রসাদাৎ চেতস একোতিভাবাৎ অবিতর্কমবিচারং সমাধিজং প্রীতিসুখং দ্বিতীয়াং ধ্যানমিত্যাদি।) পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—'তা এব সজীবঃ সমাধিঃ,' 'নির্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ,' 'ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা।' অর্থাৎ,—ঐ সকল সমাধি সবীজ অর্থাৎ সপ্রতীক। নির্বিচার সমাধি হইলে আত্ম-প্রসাদ উপস্থিত হয়। তখন পূর্ব্বপ্রতীক লুপ্ত হইয়া যায়। এই সময়ে ঋতম্ভরা নামক এক প্রকার প্রজ্ঞালোক উদিত হয়। এই ঘটনা ভগবান শাক্য মুনিরও হইয়াছিল। (উপেক্ষকঃ স্মৃতিমান্ সুখবিহারী নিষ্প্রতীকং তৃতীয়ং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম।) ভগবান পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন,—'তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ববৃত্তিনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ।' অর্থাৎ,—তৎপরে সম্প্রজ্ঞাতাঙ্গ সে বৃত্তিটীও লুপ্ত হয়। সুতরাং তখন সর্ব্ব-বৃত্তির নিরোধ হেতু প্রকৃত নির্বীজ বা নিষ্প্রতীক সমাধি জন্মে। চিত্ত তখন নিরালম্ব অর্থাৎ স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় ও অভাব-প্রাপ্তের ন্যায় (না থাকার মত) হয়। তৎকারণে তখন সুখ-দুঃখ উপেক্ষা, স্মৃতি-সংস্কার সমস্তই তিরোহিত হয়। ইহাই সর্ব্বযোগের শেষ প্রান্ত;—ইহাই যোগীর পরম প্রার্থনীয়। এই পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলেই মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে। মহাযোগী শাক্য-সিংহ এক্ষণে এই চরম প্রান্তে আসিয়াছেন। তাঁহার চিরসম্ভৃত আশা আজ এই প্রান্তে আসিয়া পূর্ণ হইয়াছে। (স সুখস্য চ প্রহানাৎ দুঃখস্যচ প্রহানাৎ পূর্ব্বমেব চ সৌমনস্য দৌর্ম্মনস্যয়োরস্তংগমাৎ অদুঃখা সুখং উপেক্ষা স্মৃতিবিশুদ্ধং চতুর্থধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম।)" পতঞ্জলির 'যোগ-সূত্রের' সহিত 'ললিত-বিস্তর'-বর্ণিত বুদ্ধদেবের সমাধি-লাভের বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে, শেষোক্তে—প্রথমোক্তের অনুসরণের বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি হইতে পারে। তবে পতঞ্জলি-কথিত যোগ-ক্রিয়ার সহিত বুদ্ধদেবের সমাধির যে পার্থক্য কিছুই নাই, তাহা নহে। "মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

যোগিদিগের ভাব্য দ্বিবিধ,—এক ঈশ্বর, অপর তত্ত্ব। তত্ত্ব আবার দুই প্রকার। এক জড়তত্ত্ব, অপর অজড়-তত্ত্ব অর্থাৎ চেতন-তত্ত্ব। চেতন ও আত্মা তুল্য কথা। ভূত, ভৌতিক, ইন্দ্রিয়, ইহাদের কার্য্য-কারণ-ভাব, এ সকল জড়-তত্ত্ব মধ্যে গণ্য। এই সমস্তই যোগীদিগের ভাব্য অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। এই সকলের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যোগীরা সমাধি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মহাযোগী শাক্য-সিংহ ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তত কষ্ট করেন নাই। তিনি চিজ্জড়ের সংযোগ-বিনাশার্থ চিৎ-তত্ত্ব ও জড়-তত্ত্ব ভাবিয়াছিলেন। এই কথা এই জন্য বলি, তিনি নির্ব্বাণ-জ্ঞান-লাভের পর চিজ্জড়-তত্ত্ব ভিন্ন ঈশ্বরের কথা কিছুমাত্র বলেন নাই। নিয়ম এই যে,—যে যে বিষয়ে সমাধি প্রয়োগ করে, সে সেই বিষয়ই জানিতে পারে। জানিয়া কৃতার্থ হয়। বৌদ্ধ-দর্শনের মতে অবিদ্যা না থাকিলে অর্থাৎ অহং মম না থাকিলে সংস্কার হইবে না। সংস্কার অভাবে বিজ্ঞানাভাব হইবে এবং জন্ম না হইলে জরা-মরণ-শোক-পরিবেদনা (ক্রন্দনাদি পরিতাপ) দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য-অপায় ও আয়াস, এ সকল কিছুই ভোগ করিতে হয় না।* যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, কামনার নিবৃত্তিই প্রথম প্রয়োজন। কামনার নিবৃত্তি হইলে জন্ম নিবৃত্তি হয়। জন্মের নিবৃত্তি হইলেই জরা-মরণ-শোক-তাপের অবসান হইয়া আসে।

মৃত্যুর পর জীব কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়,—চীনের ও মিশরের প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিতেও তাহার বিবিধ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। 'মৃত ব্যক্তির প্রসঙ্গ' সংক্রান্ত ধর্ম্ম-গ্রন্থে, এ সম্বন্ধে প্রাচীন মিশরীয়-দিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ব্যক্ত আছে। মৃত্যুর পর আত্মা কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, সাধুগণ স্বর্গধাম লাভ করেন এবং আত্মা পরমাত্মায় লীন হইতে পারে,—প্রাচীন মিশরীয়-দিগের ধর্ম্মমত আলোচনা করিলে, এ বিষয় উপলব্ধি হয়। 'মৃত-ব্যক্তির প্রসঙ্গ' সংক্রান্ত পুস্তক 'বুক-অব-দি-ডেড' নামে ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থের সপ্তদশ, একবিংশ ও ষড়বিংশ অধ্যায়-ত্রয়ে মৃতব্যক্তির স্বর্গাদি-লাভ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম এই ;—মৃত্যুর পর পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের অনুচর-বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, *—'হে ঈশ্বরের পারিষদগণ! তোমাদের বাহু প্রসারিত করিয়া আমাকে গ্রহণ কর। আমি যেন তোমাদের মধ্যে স্থান-লাভ করি। হে জ্যোতিঃ-স্বরূপ ওসিরিস! সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ। আমি করযোড়ে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনার পবিত্র আত্মায় আমাকে আশ্রয় দান করুন। আমার স্বর্গ-দ্বার উন্মুক্ত করিতে দেন। মাম্ফিসে আমার প্রতি যেরূপ আদেশ হইয়াছিল, আমি সে-আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি। আমার

মিশরে ও চীনে পরলোক-তত্ত্ব।

* "O Ye, who make the escort of the God! stretch to me your arms; for, I, become one of you, *** Hail to thee, O Osiris, Lord of Light! dwelling in the mighty abode in the absolute darkness. I come to Thee, a purified soul. My two hands are around thee. * * * I open heaven; I do what was commanded in Mamphis. I am in possesssion of my arms. I am in possession of my legs and all at the will of my self. My soul is not imprisoned in my body at the gates of Amenti"—*Vide* the *Book of the Dead.*

হৃদয়ে এখন জ্ঞান-সঞ্চার হইয়াছে। এখন আমার হৃদয় আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন! এখন আমার বাহুদ্বয় আমার বশে আসিয়াছে; এখন আমার পদদ্বয় আমার বশীভূত;—এখন সকলই আমার আজ্ঞাধীন। আমেণ্টির দ্বারদেশে এখন আর আমার আত্মা দেহের মধ্যে আবদ্ধ নাই।' ঐ গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে;—'এই মৃত ব্যক্তি নিম্নতম স্বর্গে দেবগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। দেবগণ কখনই ইহাঁকে পরিত্যাগ করিবেন না। ইনি স্বর্গীয় স্রোতস্বিনীর জল পান করিবেন। ইহাঁর আত্মা আর আবদ্ধ থাকিবে না। কারণ, ইহাঁর আত্মা মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে। নারকীয় কীটে ইহাঁকে আর ভক্ষণ করিবে না।' * উপরি-উদ্ধৃত অংশদ্বয় পাঠ করিলে স্বর্গ ও নরকের বিষয় অবগত হওয়া যায়। স্বর্গে স্বচ্ছ-জলপূর্ণ স্রোতস্বিনী প্রভৃতির অস্তিত্বের বিষয় এবং নরক কৃমি-কীট-পূর্ণ ভীষণতাময় বলিয়া প্রতীত হয়। অধিকন্তু স্বর্গের উচ্চ নীচ স্তরের আভাষ এবং পরিশেষে লয় বা মুক্তির ভাব মানস-পটে প্রতিভাত হইতে পারে। মৃতের পুনরুত্থানের বিষয়ও মিশরীয়গণ স্বীকার করিতেন। প্রাচীন মিশরের 'মামী' (Mummy) অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির দেহ-রক্ষা করার বিষয় সর্ব্বজনবিদিত। কতকাল হইতে মিশরে মৃতদেহ-সমূহ রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, ইতিহাসে তাহা বিশদভাবে লিখিত আছে। † ঐরূপভাবে মৃতদেহ রক্ষা করিবার কি উদ্দেশ্য ছিল?

---

* "The defunct shall be deified among the Gods in the lower divine region; he shall never be rejected. He shall drink of the current of the celestial river. His soul shall not be imprisoned, since it is a soul that brings salvation to those near it. The worms shall not devour it."—*Vide*, The *Books of the Dead*,

† প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—খৃষ্টজন্মের অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশর-দেশে মৃতদেহ-রক্ষার (embalming the mummy) প্রথা প্রচলিত ছিল। হেরোডোটাস ও ডিওডোরাস মৃতদেহ-রক্ষার এই পদ্ধতির বিষয় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। হেরোডোটাস যখন মিশরে যান, তখন তিন প্রকার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। প্রথম প্রকারের প্রথায় মৃত-দেহের প্রতি প্রায় ৭২৫ পাউণ্ড (পাউণ্ড=১৫৲ পনের টাকা) ব্যয় পড়িত। প্রথমে মৃতের নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে এক প্রকার গুঁড়া ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। তার পর মৃতের উদরে এক প্রকার মদ্য (পাম ওয়াইন Palm wine) প্রবেশ করাইয়া রজন, দারুচিনি প্রভৃতিতে উদর পরিপূর্ণ করা হইত। ইহার পর সত্তর দিন সেই মৃতদেহকে সোডার বা ক্ষারের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইত। সেই সময় মৃতদেহ রেশমী বস্ত্রে আবৃত থাকিত। সেই বস্ত্র মৃতের গাত্রে আঠা দ্বারা আঁটিয়া দেওয়া হইত। সেই অবস্থায় মৃতদেহকে একটী কাঠের বাক্সের মধ্যে দাঁড় করাইয়া ঘরের দেয়ালের সঙ্গে বা কবরে রাখার পদ্ধতি ছিল। এইরূপ-ভাবে মৃত দেহ রক্ষা করা কেবল ধনবান-গণের সাধ্যায়ত্ত। দ্বিতীয় প্রকারের প্রথায় প্রথমে মস্তিষ্ক বাহির করিয়া নাড়ীভুঁড়ির ভিতর সিডারের তৈল প্রবেশ করান হইত। তার পর, সত্তর দিন সোডার ক্ষারের মধ্যে মৃতদেহ ডুবান থাকিত। এতদ্দ্বারা নাড়ীভুঁড়ি প্রভৃতি শরীরের কোমল অংশ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া কেবল অস্থি ও চর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট রহিত। এ প্রথায়ও প্রায় ২৪৩ পাউণ্ড ব্যয় পড়িত। তৃতীয় প্রথা—দরিদ্রদিগের জন্য বিহিত ছিল। তদনুসারে মৃতদেহকে মির (myrrh) নামধেয় আরব-দেশীয় এক প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাসে ধৌত করিয়া সত্তর দিন লবণের মধ্যে প্রোথিত রাখা হইত এ প্রথায় ব্যয় অল্পই পড়িত। এরূপে মৃতদেহ রক্ষার উপযোগী হইলে, লোকে কিছু দিন সেই দেহ আপনার গৃহে রাখিয়া দিত কোনও প্রকার উৎসব-আমোদের বা ভোজের আয়োজন হইলে, অভ্যাগত-গণকে তাহা দেখাইবার ব্যবস্থা ছিল নদীর জলে জলমগ্ন হইয়া কেহ প্রাণত্যাগ করিলে, অথবা কুম্ভীরাদি কর্ত্তৃক হত হইলে, নিকটস্থ স্থানের অধিবাসীরা যদি সেই দেহের সন্ধান পাইতেন, তাহা হইলে তাহারই রক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইথিওপীয়ায়ও এই প্রকারে মৃতদেহ-রক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। পারসিক-গণের মধ্যে মোমের দ্বারা আবৃত করিয়া, আসিরীয়-গণের মধ্যে মধুর মধ্যে ডুবাইয়া মৃতদেহ রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ইহুদী-গণ আপনাদের রাজার মৃতদেহ মসলার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। যীশু-খৃষ্টের দেহ সেইরূপ মসলার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের দেহ মোম ও মধুর মধ্যে ভিজাইয়া রাখা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে মৃতদেহ-রক্ষার প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও রূপান্তরে মৃতদেহ রক্ষার প্রথা বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।

মিশর-বাসিগণ বিশ্বাস করিতেন,—যুগ-বিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে, তিন সহস্র হইতে দশ সহস্র বৎসর পরে, মৃত-ব্যক্তির আত্মা পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিবে। পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ বলেন, 'এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই মিশরে মৃতদেহ রক্ষা করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।' প্রাচীন মিশরীয়-গণ বিশ্বাস করিতেন,—'মৃত ব্যক্তিগণ এক দিন পুনর্জ্জীবন লাভ করিবেন। সকলেই যে সে দিন নবজীবন প্রাপ্ত হইবেন, তাহা নহে; কেবল পুণ্যাত্ম-গণই নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য-দেবের সহিত মিলিত হইবেন। মনুষ্যের আত্মা সূর্য্যের ন্যায় অমর। সূর্য্যের সহিত মিলিত হইলে, তাঁহাদিগকে আর শরীর ধারণ করিতে হয় না।' মৃত ব্যক্তিগণের বিচারের বিষয়ও মিশর-বাসীরা স্বীকার করেন। বিয়াল্লিশ জন সহকারীর সাহায্যে ওসিরিস্ মৃত ব্যক্তি-গণের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন; বিচারের পর পুণ্যাত্ম-গণকে আর রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করিতে হইবে না; তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় ওসিরিসের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণানন্দ ভোগ করিবেন। পুণ্যাত্ম-গণকে ওসিরিস সুস্বাদু আহার্য্যাদি প্রদান করেন। 'ভবিষ্য-জীবনের ইতিবৃত্ত' বিষয়ক গ্রন্থে আল্জের মিশরীয়দিগের পারলৌকিক তত্ত্ব যাহা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং 'প্রাচ্যের প্রাচীন ইতিহাস' গ্রন্থে লেনরমাণ্ট তদ্বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন,—এতৎপ্রসঙ্গে তাহারই মর্ম্ম মাত্র আমরা উল্লেখ করিলাম।* রলিন্সন বলেন,—'পৃথিবীর যে কোনও জাতির পারলৌকিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি; বুঝিয়াছি—তাঁহারা সকলেই মিশরের অনুসরণকারী।' † সে মতে,—'অসভ্যজাতিরা মৃত্যুকেই জীবনের শেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। মিশর সভ্যতার আদি স্থান। মিশরেই পারলৌকিক তত্ত্বের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়।' কিন্তু বলা বাহুল্য, এ মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কারণ, ভারতীয় সভ্যতার অনেক পরবর্ত্তি-কালে মিশর-রাজ্যে সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি।‡ যাহা হউক, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকেই বলেন,—ইজরেলাইট্স্ বা ইহুদী-গণ বহু দিন মিশরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তাঁহাদের মনে ভবিষ্যতের (মৃত্যুর পরের) সুখ-দুঃখের ভাব জাগরিত হয়। নচেৎ, মোজেসের নীতির মধ্যে ঐ সকল কথা কিছুই ছিল না। মোজেস প্রথমে কেবল ঐহিক পুরস্কার ও দণ্ডভোগের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।§ এখন অতি অল্প লোকই মোজেসের সেই মত মান্য করিয়া থাকেন। জুডাইজম্ ধর্ম্মে অতি অল্প কাল মাত্র পুনরুত্থানের মত প্রবেশ করিয়াছে। মূল হিব্রু গ্রন্থে এ মত দৃষ্ট হয় না। ডেনিয়েল এবং ইজিকিল গ্রন্থ-দ্বয়েই এ মতের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ আবার বলেন,—'জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্ম হইতেই ঐ ভাব ইহুদী-গণের ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।' †† কর্ম্মানুসারে স্বর্গ-নরক-লাভের এবং

---

* *Vide* Lenormant *Ancient History of the East.*

† *Vede* Rawlinson's *History 6f Ancient Fgypt.* Vol. II.

‡ 'পৃথিবীর ইতিহাস', প্রথম খণ্ডের ৭ম, ৮ম ও ৩৭৮শ পৃষ্ঠায় এবং ২য় খণ্ডের ২৭শ-২৮শ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ এই পরিচ্ছেদের ১০৮ম পৃষ্ঠায়ও এতদ্বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। *Vide*, Alger's *History of the Doctrine of a Future Life*, and Wilman's *History of Christianity.*

†† আলজারের গ্রন্থের 'জুডাইজম ধর্ম্মের উপর পারসিক ধর্ম্মের প্রভাব' বিষয়ক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। *Vide*, Alger's *History of the Doctrine of a Future Life.*

আত্মার অবিনশ্বরত্বের বিষয় চীনাগণও বিশ্বাস করেন। স্বর্গগত পিতৃ-পিতামহের উদ্দেশ্যে অভিবাদন, চীনদেশে আবহমনকাল প্রচলিত আছে। পরলোকগত পিতৃ-পুরুষগণের প্রতি চীনাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধার বিষয় আলোচনা করিলে, তৎসমুদায় হিন্দুদিগের অনুসরণ বলিয়া বুঝা যায়। পরলোক সম্বন্ধে চীন-দেশে যে মত প্রচলিত আছে, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের 'প্রাচ্য-দেশের পবিত্র গ্রন্থ-সমূহ' নামক গ্রন্থের অংশ-বিশেষে তাহার একটী পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪০১ হইতে ১৩১৪ অব্দের মধ্যে পানকরং নামে চীনে এক জন রাজা ছিলেন। তিনি আপনার প্রজাদিগকে যে উপদেশ দেন, প্রোক্ত গ্রন্থে ম্যাক্সমূলার তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম,—'হে প্রজাবর্গ! তোমাদিগের প্রতিপালন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনই আমার উদ্দেশ্য। আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ এক্ষণে অধ্যাত্ম-রাজ্যের অধীশ্বর। এখন কেবল তাঁহাদের কথাই আমার স্মৃতিপটে উদয় হইতেছে। আমার রাজ্য-শাসনে যদি কোনরূপ ভ্রম-প্রমাদ ঘটে এবং আমি যদি অধিক কাল মর্ত্ত্যলোকে বাস করি, আমার এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সেই স্বর্গীয় নৃপতিগণ আমার দণ্ড-বিধান করিবেন। আমি প্রজাদিগের প্রতি যদি কোনরূপ অত্যাচার করি, তাঁহারা আমার দণ্ড-বিধান করিয়া বলিবেন,—আমার প্রজাদিগের প্রতি কেন তুমি অত্যাচার করিয়াছ? যেমন আমার সম্বন্ধে, তেমনি তোমাদের সম্বন্ধে, সেই স্বর্গীয় পিতৃ-পুরুষগণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। হে আমার অসংখ্য প্রজাপুঞ্জ! তোমরা যদি আমার সহিত একমত না হও, সকলে একমত হইয়া আমার মতের অনুসরণ না কর, তোমাদের জীবন চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা না পাও, আমার সেই স্বর্গীয় পিতৃ-পুরুষগণ তোমাদের সেই অপরাধের জন্য তোমাদের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিবেন। তোমাদিগকেও আহ্বান করিয়া বলিবেন,—কেন তোমরা আমাদের বংশধরের মতানুবর্ত্তী হইতেছ না? জানিও, ইহাতে তোমাদের সকল পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। রোষ-পরবশ হইয়া পিতৃ-পুরুষগণ যখন তোমাদিগের দণ্ড-বিধান করিবেন, তখন তোমরা কোনমতে রক্ষা পাইবে না। তোমাদেরও পিতৃ-পিতামহ পূর্ব্বপুরুষগণ তখন তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহারা মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে কদাচ তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন না' * স্বর্গে পিতৃপুরুষগণ বাস করেন, সৎকর্ম্মে মৃত্যু-যন্ত্রণার ভয় থাকে না, অপকর্ম্মে মৃত্যু-যন্ত্রণার আশঙ্কা আছে,—উপরি-উদ্ধৃত অংশে তাহাই প্রতীত হয়। 'সু-কিং' গ্রন্থ—চীন-দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। কন্‌ফিউসিয়াস ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া যান। আমাদের পুরাণের আদর্শে ঐ গ্রন্থে ধর্ম্ম ও নীতি সংক্রান্ত বহু বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মৃত্যুর পর জীব কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ঐ গ্রন্থের নানা স্থানে তাহার উল্লেখ আছে। তবে কন্‌ফিউসিয়াস মৃত্যুর পরবর্ত্তী কালের অবস্থার বিষয় যে কিছু বলিয়া গিয়াছেন,—এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব মলুক্যপুত্তকে যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, † কন্‌ফিউসিয়াসও আপনার শিষ্যকে সেইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন বলিয়া প্রচারিত আছে। কন্‌ফিউসিয়াস বলিয়াছিলেন,—

* *Vide*, Max Muller, *Sacred Books of the East*, III.

† এই পরিচ্ছেদের ১৬০ম—১৬১ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

'বর্ত্তমান জীবনের বিষয়ই আমরা অবগত নহি, মৃত্যুর পর কি হইবে, কে বলিতে পারে?' তবে কনফিউসিয়াস-প্রবর্ত্তিত দর্শন-শাস্ত্রে লয়-তত্ত্বের বা আত্মার আত্ম-সম্মিলন ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। কন্‌ফিউসিয়াস মৃত্যু স্বীকার করিতেন না। তাঁহার দর্শন-শস্ত্রানুসারে দেহাংশ-পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। অশরীরী আত্মা সংসারের মঙ্গল-সাধন করিবেন,—এ আভাষও তাঁহার মতাদির আলোচনায় অবগত হই।

শাস্ত্রে লয়-তত্ত্ব।

লয় তত্ত্ব যে ভাবেই আলোচনা করি না কেন, নির্ব্বাণ—মোক্ষ—কৈবল্য—নিঃশ্রেয়স—যে নামেই অভিহিত করি না কেন, পরমাত্মায় আত্মলীন হওয়ার নামই প্রকৃত লয়। ঋগ্বেদের সূক্তের মধ্যেও (১০ম মণ্ডল, ৫৩শ সূক্ত) এই লয়-তত্ত্ব বীজরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশ্বদেবগণের নিকট প্রার্থনায় বৃহদুকৃথ ঋষি যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, সেই মন্ত্রে এই লয়-তত্ত্ব কি সুন্দর পরিস্ফুট! ঋষি বলিতেছেন,—'হে বিশ্বদেব! এই (অগ্নি) তোমার এক অংশ, আর এই (বায়ু) তোমার এক অংশ। আর তোমার তৃতীয় জ্যোতির্ম্ময় (আত্মা) স্বরূপ অংশ। এই তিন অংশ দ্বারা তুমি (অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য মধ্যে) প্রবেশ কর।...তুমি স্থানভ্রষ্ট না হইয়া জ্যোতিঃধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত এবং আকাশের সূর্য্যের সহিত তোমার আত্মাকে মিলাইয়া দাও।...যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দীপ্তি পাইয়া থাকেন, তাঁহারা উঁহাদের সহিত একীভূত হইয়া আছেন, তাঁহারা দেবতাদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।' দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের তৃতীয় ঋকের মর্ম্মার্থেও এই ভাব উপলব্ধি হয়। ঋষি মৃত-ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন,—'হে মৃত! তোমার চক্ষু বা জ্যোতির্ম্ময় অংশ সূর্য্যে বা তেজে মিলিত হউক। তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ুতে মিশিয়া যাউক। আর জলীয় অংশ জলে যাউক। তোমার ঔদ্ভিজ্যাংশ উদ্ভিদে মিশিয়া যাউক। তোমার আত্মা তোমার কর্ম্মফল অনুসারে স্বর্গে, নরকে ও পৃথিবীতে আশ্রয় লউক।' ঋকের বঙ্গানুবাদ যদিও বিশদ নহে, তথাপি সূক্ত-দুইটীতে লয়-তত্ত্বের আভাস পাওয়া যাইবে। কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ এবং কর্ম্মশেষ হইলে স্বর্গ বা লয় প্রাপ্তি শেষোক্ত ঋকে স্পষ্টতঃ প্রকাশমান। যাহা হউক, এই দুই সূক্তের অনুসরণে নানা জনের মনে নানা ভাবের উদয় হইতে পারে। যাঁহারা বলেন,—বিশ্বরূপে বিশ্বেশ্বর অবস্থিত; তাঁহারা বুঁঝিবেন,—বিশ্বের অণু-পরমাণুতে আপন অণু-পরমাণু মিশাইয়া দেওয়াই লয়। যাঁহারা বলেন,—বিশ্ব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র; তাঁহারা বুঝিবেন,—লয়ে তাঁহাদের পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়, আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়। আর যাঁহারা জড়বাদী, তাঁহারা বুঝিবেন,—লয়ে জড়-দেহ জড়ে মিশাইয়া যায়। ফলতঃ, যে ভাবে যে মতেরই আলোচনা করি না কেন, আত্মার আত্ম-সম্মিলন হওয়াই শ্রেষ্ঠ মোক্ষ, আর আত্ম-জ্ঞানেই সেই মোক্ষ সাধিত হয়। মনুসংহিতা মতে, মোক্ষ ছয় প্রকার। কিন্তু—

"সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতেহ্যমৃতং ততঃ॥"

—— * ——

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—‡ * ‡—

ঈশ্বর।

[তাঁহার অনন্তত্ব,—নামরূপ ধারণার অতীত;—নাম-রূপ লইয়া বৃথা দ্বন্দ্ব;—বিভিন্ন ধর্ম্মে ঈশ্বর;—একেশ্বর ও একাধিক ঈশ্বর;—সদাত্মা ও অসদাত্মা.—সয়তানের সহিত দ্বন্দ্ব,—ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুর-বধের তাৎপর্য্য;—হিন্দু-শাস্ত্রে ঈশ্বর,—সকল দেশের সকল ভাবই পরিব্যক্ত;—সকল ধর্ম্মের সার-শিক্ষা—পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য-তত্ত্ব;—তদ্বিষয়ে বিবিধ বক্তব্য।]

অনন্ত নাম-রূপ।

শক্তি অনন্ত, কার্য্য অনন্ত, মহিমা অনন্ত, রূপ অনন্ত, নাম অনন্ত। তিনি এক হইয়াও বহু, বহু হইয়াও এক। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, তিনি স্থূল, তিনি সূক্ষ্ম, তিনি ব্যক্ত, তিনি অব্যক্ত, তিনি নিরবয়ব, তিনি সাবয়ব, তিনি নিরঞ্জন, তিনি গুণাঞ্জন, তিনি গুণাধার, তিনি নির্গুণাধার, তিনি মূর্ত্ত, তিনি অমূর্ত্ত, তিনি মহামূর্ত্ত, তিনি সূক্ষ্মমূর্ত্ত, তিনি স্ফুট, তিনি অস্ফুট, তিনি করালরূপ, তিনি সৌম্যরূপ, তিনি আত্মস্বরূপ, তিনি বিদ্যাবিদ্যালয়, তিনি অচ্যুত, তিনি সদসদ্-স্বরূপসদ্ভাব, তিনি সদসদ্ভাবভাবন, তিনি নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাত্মন, তিনি নিষ্প্রপঞ্চ, তিনি অমলাশ্রিতা, তিনি এক, তিনি অনেক, তিনি আদি-কারণ, তিনি বাসুদেব, তিনি স্থূল, তিনি সূক্ষ্ম, তিনি প্রকট, তিনি প্রকাশ, তিনি সর্ব্বভূত অথচ সর্ব্বভূত নহেন, তিনি বিশ্ব, তিনি বিশ্বের হেতুভূত অথচ হেতুভূত নহেন। * বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করা যায় না; ভাষায় তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করা যায় না। সংসার অনন্তকাল তাঁহার অনুসন্ধানে ফিরিয়াছে, অনন্ত-কাল অনন্তরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতেছে; আবার অনন্ত চেষ্টায় অনন্ত-কালেও তাঁহার অনন্তত্ব ধারণা করিতে পারিতেছে না। সাধক তাই গাহিয়াছেন,—

"কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমায়ত, সাগর-লহর-সমানা॥"

সমুদ্র-তরঙ্গে লহর-মালার ন্যায় সংসার তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সেই উৎপত্তি ও লয়ের সঙ্গে সঙ্গে কত চতুরানন ব্রহ্মা আবির্ভূত ও তিরোহিত হইলেন; কিন্তু তোমার আদি-অন্ত নির্ণয় করিতে পারিলেন না। স্বয়ং বিধাতাই যখন সে

---

* শাস্ত্রে একটী স্তবে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব যাহা প্রকটিত হইয়াছে। তাহারই মর্ম্ম মাত্র আমরা উপরে প্রকাশ করিয়াছি। ভক্ত ডাকিতেছেন,—

"ওঁ নমঃ পরমার্থার্থ স্থূল সূক্ষ্মাক্ষরাক্ষর। ব্যক্তাব্যক্ত কালাতীত সকলেশ নিরঞ্জন॥
গুণাঞ্জন গুণাধার নির্গুণাত্মন্ গুণস্থির। মূর্ত্তামূর্ত্ত মহামূর্ত্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তে স্ফুটাস্ফুট॥
করালসৌম্যরূপাত্মন্ বিদ্যাবিদ্যালয়াচ্যুত। সদসদ্রূপসদ্ভাব সদসদ্ভাবভাবন॥
নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাত্মন্ নিষ্প্রপঞ্চামলাশ্রিত। একানেক নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদিকারণ॥
যঃ স্থূল সূক্ষ্মঃ প্রকট প্রকাশো যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্বহেতোর্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়॥"

তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ, তখন তৃণাদপিতৃণতুচ্ছ মানুষ তাঁহার কি পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে? সাধক সত্যই বলিয়াছেন,—

"কোটী কলপ ধরি, বিহি যদি বর্ণয়ে, তবহুঁ না পাওয়েত পার। ১॥
আকাশ পত্র'পরি, সিন্ধুসি পাত্র করি, কলপ কলপ জগ জনে জনে লিখ;
এক বরণে তুয়া, জগত ভরল হে, তাক না পাওয়ে দিখ। ২॥
বারিবিন্দু অত, ধরণী-ধূলি যত, কো যদি গণইতে পারে;—
সো তব তত্ত্বক অন্ত না পাওয়ে, সিন্ধু পার এ অপার।
অযুত নয়ন ধরি, আদি অন্ত হেরি, হোয় হোয়ব জন দেখ;
বিশ্ব অশেষ কণ্ঠ, তাহে অনিপুণ, বিশ্ব-বাণী করি এক ॥ ৪ ॥
জগতে যত, অন্তরে আছয়ে, চিন্তা জ্ঞান করি এক;
সো যদি ধ্যান-সমাধি আলাপয়ে, হিম অচলে তৃণ-রেখ ॥ ৫ ॥
অন্ত নাহি তব, অন্ত নাহি তব, অনন্ত দেখ তু অদেখ;
......তু বিনে তোহে জানিতে নাহি এক ॥ ৬ ॥"

'স্বয়ং বিধাতা যদি কোটী কল্প ধরিয়া তোমার মহিমার কীর্ত্তন করেন, তবু তাহার শেষ হয় না। আকাশকে যদি লিখন-পত্র করিয়া লওয়া হয়, মহাসমুদ্রকে যদি কালীর পাত্র করিয়া লওয়া হয়, তোমার নামের একটী বর্ণে জগৎ ভরিয়া যায়, তবুও তাহার পূরণ হয় না। জগতে যত বারিবিন্দু আছে, এই ধরণীতে যত ধূলিকণা আছে, এ সকলের যদি গণনা করা সম্ভব হয়; তবু তোমার অনন্ত-তত্ত্বের কিছুতেই অন্ত পাওয়া যায় না। মহাসমুদ্রও যদি পার হওয়া সম্ভবপর হয়; কিন্তু তোমার সে অন্ত অপার। জগতে যত লোক জন্মিয়াছে ও জন্মিবে, তাহাদের প্রত্যেকেরই যদি অযুত অযুত নয়ন হয়, এবং তাহারা জীবনের আদি অন্ত ধরিয়া যদি তোমাকে দর্শন করে, তবুও তোমার আদি অন্ত কেহই দেখিতে পায় না। এই বিশ্ব-সংসারে যত কিছু শব্দ বা বাক্য আছে, এই বিশ্ব-সংসারের সমস্ত প্রাণি-কণ্ঠ যদি তাহাতেও তোমার বর্ণনা করে, তবুও তোমার বর্ণনায় কেহ সমর্থ হয় না। এইরূপ, জগতে যত অন্তর আছে, তাহাদের সকলের চিন্তা ও জ্ঞান একত্র করিয়া যদি তোমার ধ্যান-সমাধিতে নিয়োগ করা হয়, তবুও তোমার বর্ণনা হয় এইরূপ—'যেমন, হিম অচলে তৃণ-রেখ।' অর্থাৎ, এত করিয়াও হিমাচল-পৃষ্ঠে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ-রেখার ন্যায় মাত্র তোমার বর্ণনা করা যায়। তোমার অন্ত কিছুতেই পাওয়া যায় না। অনন্তের যদি অন্ত পাওয়া সম্ভব হয়; তবু তোমার অন্ত কিছুতেই পাওয়া যায় না। তবে তুমি দয়া করিয়া নিজে যদি কাহাকেও জানাইয়া দাও, সেই তোমায় জানিতে পারে।' সে তত্ত্ব এত দুরধিগম্য। তিনি স্বয়ং না জানাইলে সে তত্ত্ব কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। ভাষার ছটায় বর্ণনার ঘটায় সে তত্ত্ব কে বিবৃত করিতে পারে? যাঁহারা একটু নিকটে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, যাঁহারা একটু স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন,—'তিনি ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার অন্য উপায় নাই।'

সকলই তাঁহার নাম-রূপ। যিনি তাঁহাকে যে নামে ডাকিতে পারেন, যিনি তাঁহাকে যে রূপে দেখিতে চাহেন; তিনি তাঁহার নিকট সেই নামে সেই রূপে প্রকাশমান আছেন। তিনি সর্ব্বময়, সর্ব্ব-স্বরূপ; তাঁহার নাম, রূপ, উপাধি লইয়া সংসার বৃথা রিতণ্ডায় কেন আত্মহারা? কেহ বলিতেছেন,—তিনি আছেন; কেহ বলিতেছেন,—তিনি নাই; কেহ বলিতেছেন,—তিনি ব্রহ্ম; কেহ বলিতেছেন,—তিনি ব্রহ্মা; কেহ বলিতেছেন,—তিনি গড; কেহ বলিতেছেন,—তিনি ঈশ্বর; কেহ বলিতেছেন,—তিনি হর্-মজদ্; কেহ বলিতেছেন,—তিনি জিহোবা; কেহ বলিতেছেন,—তিনি জিহোবা-এলোহিম; কেহ বলিতেছেন,—তিনি অগ্নি; কেহ বলিতেছেন,—তিনি বায়ু; কেহ বলিতেছেন,—তিনি ইন্দ্র; কেহ বলিতেছেন,—তিনি কৃষ্ণ; কেহ বলিতেছেন,—তিনি খৃষ্ট; কেহ বলিতেছেন,—তিনি রাম; কেহ বলিতেছেন,—তিনি রহিম। এই লইয়াই সংসারে আবাহমান্-কাল দ্বন্দ্ব চলিয়াছে।

নাম-রূপ লইয়া দ্বন্দ্ব।

"এ সংসারে নাম নিয়ে দ্বন্দ্ব অবিরাম্।
কেহ হরি, কেহ কৃষ্ণ, কেহ কহে রাম॥
আল্লা খোদা কেহ কয়, কেহ 'গড' দয়াময়,
যীশু নামে কেহ যাচে ত্রাণ ও বিরাম;
নামে কিবা আসে যায়, বিচারি না দেখে তায়,
কেবা তিনি কিবা রূপ কোথা পরিণাম।
জল, অম্বু, 'ওয়াটার্, নীর, তোয়, পানি আর,
দেশে-ভেদে ভাষাভেদে ধরে নানা নাম॥
নিদারুণ পিপাসায়, বারি বিনা প্রাণ যায়,
জল অম্বু কোনও নামে নাহিক আরাম।
বিনা সেই বস্তু পান—জল যার নাম।"

বস্তু-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্য অতি অল্প জনেরই মন প্রধাবিত হয়। বাহ্য-বিতর্ক লইয়াই সংসার বিব্রত। সংসারে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। সত্য ধর্ম্ম-তথ্য প্রচারের জন্য অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন। সত্য-তথ্য প্রচারের জন্য সংসারে অসংখ্য অবতারেরও আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, চিরদিন পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিরোধই রহিয়া গিয়াছে! সকলেই বলিয়াছেন,—সত্য এক; সকলেই দেখাইয়াছেন,—সত্য অভিন্ন; সকলেই বলিয়াছেন,—সত্য-প্রচারেই অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষার ফলে কেন বিরুদ্ধ মত—বিরুদ্ধ ভাব প্রচারিত হইল? ইহাই আশ্চর্য্য! বিরুদ্ধ-ভাবের মধ্যেও যে একত্ব আছে,—পথ বিভিন্ন হইলেও সেই একের অনুসন্ধানে সকলেই যে ফিরিতেছেন, এবং সেই একেই যে সকলে গিয়া মিলিত হইবার আশা করেন;—বুঝিয়াও মানুষ সকল সময় তাহা বুঝিতে পারেন না; পরন্তু বিভ্রম-গ্রস্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার ভাব প্রকাশ করেন! ইহাই আশ্চর্য্য! পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সমূহ ঈশ্বরকে, যিনি যে নামেই অভিহিত করুন, কি চক্ষে দর্শন

করেন,—তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে পরস্পরের মত-বিরোধের মধ্যেও এক অপূর্ব্ব সাম্যভাব পরিলক্ষিত হইবে,—পরস্পরের দ্বন্দ্বের মধ্যেও এক অভিনব শান্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আমরা যাঁহাকে ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম প্রভৃতি নামে অভিহিত করি, ইরাণীয়-গণের নিকট 'অহুর-মজদ্' (অর্-মজদ্, ঔর্-মজ্‌দ্, হর-মজ্‌দ্ ইত্যাদি) নামে, ইহুদী-গণের নিকট 'এলোহিম' 'জিহোবা' প্রভৃতি শব্দে, খৃষ্টান-দিগের নিকট 'লর্ড', 'গড' প্রভৃতি আখ্যায়, মুসলমান-গণের নিকট 'আল্লা,' 'খোদা' প্রভৃতি নামে, তিনি অভিহিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা যে নামেই তাঁহাকে সম্বোধন করুন, তাঁহার মহিমার বিষয় সকলের ধর্ম্মশাস্ত্রেই প্রায় একই প্রকারে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তিনি যে সকল বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই একমত দৃষ্ট হয়। বিশেষণ দেখিয়া বস্তু-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, সকল দেশের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই যে একই বস্তুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। সকলেই বলিয়াছেন,—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; সকলেই বলিয়াছেন,—তিনি সৃষ্টি-কর্ত্তা; সকলেই বলিয়াছেন,—তিনি করুণার অনন্ত প্রস্রবণ। জেন্দ-আভেস্তায় অহুর-মজ্‌দের যে গুণ-বিশেষণ দেখিতে পাই, ইহুদী-গণের ওল্ড-টেষ্টামেণ্টে (ইশিয়া, ডিউটারনমি প্রভৃতি গ্রন্থে) জিহোবারও সেই গুণ-বিশেষণ দৃষ্ট হয়। আবার নিউ-টেষ্টামেণ্টের বিভিন্ন অংশে ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব যেরূপ-ভাবে পরিকীর্ত্তিত, কোরাণের সুরায় সুরায় সেই উক্তিই প্রতিধ্বনিত। অহুর-মজ্‌দের গুণ-বিশেষণ বিষয়ে জেন্দ-আভেস্তার 'যশ্ন' অংশে (৪৩ম অধ্যায়ে) লিখিত আছে,—'হে হর-মজ্‌দ্! তুমি পরম পবিত্র। তুমি জগতের প্রভু। তুমি স্বর্গীয়। তুমি স্বর্গ-মর্ত্ত্য উভয়েরই মিত্র। তুমিই পবিত্র প্রাণি-গণকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমিই সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রগণকে সৃষ্টি করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতেছ। তুমিই পৃথিবীকে ও গ্রহ-নক্ষত্র-দিগকে পরিচালিত করিতেছ। তুমিই বাতাসকে এবং মেঘকে গতি-শক্তি প্রদান করিয়াছ। তুমিই সদন্তঃকরণের সৃষ্টিকর্ত্তা; তুমিই সৎকার্য্যের নিয়ন্তা; আলোক, আঁধার, নিদ্রা, জাগরণ, উষা, মধ্যাহ্ন, রাত্রি—তুমি সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা।' জেন্দ-আভেস্তার 'বহ্‌রম যস্থ' অংশে অহুরো-মজদ্‌কে জগতের 'সৃষ্টিকর্ত্তা ও পবিত্রাত্মা' বলিয়া জারাথস্ত্র অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ, আরও ভিন্ন ভিন্ন স্থলে তিনি আলোকময়, সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। ইহুদী-গণ যে 'এলোহিম' ও 'জিহোবা' শব্দ ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রয়োগ করেন, ঐ শব্দ-দ্বয়ের প্রথমটীর অর্থ—একমাত্র সত্য-স্বরূপ ঈশ্বর, দ্বিতীয়টীর অর্থ—অক্ষয় অব্যয় ঈশ্বর। * এলোহিম শব্দের সহিত যখন বহুবচনান্ত ক্রিয়াপদ সংযুক্ত হয়, তখন এলোহিম শব্দে দেব-দেবীকেও বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু একবচনান্ত ক্রিয়া-পদের সহিত 'এলোহিম' শব্দ ব্যবহার করিলে, বিশেষতঃ 'জিহোবা' শব্দের সহিত 'এলোহিম' শব্দ সংযুক্ত হইলে অর্থাৎ 'জিহোবা-এলোহিম' শব্দদ্বয় একত্র উচ্চারিত

বিভিন্ন ধর্ম্মে ঈশ্বর।

---

* *Elohim* denotes the *one true* god; *Jehovah* means the *eternal* one.

হইলে, উহার দ্বারা অক্ষয় অনন্ত একমাত্র ঈশ্বর বুঝাইয়া থাকে। 'তালমুদ' গ্রন্থে 'এলোহিম' শব্দ—সর্ব্বশক্তিমান্ ন্যায়পর ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রযুক্ত এবং 'জিহোবা' শব্দ করুণাময় ও সহৃদয় অর্থে ব্যবহৃত। ঈশ্বর বুঝাইতে খৃষ্টান-দিগের মধ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়;—ইংরাজীতে গড, লাটিনে ডিয়স: (Deus), গ্রীকে থিয়স, (Theos) ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই প্রায় একমত দৃষ্ট হয়; শক্তি, জ্ঞান, সততা, প্রেম, ন্যায়পরতা, অনন্তত্ব প্রভৃতি বিবিধ গুণ তাঁহাতে আরোপিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন-ভাষাভাষী হইলেও খৃষ্টান-গণ সকলেই বাইবেলের মতের অনুসারী; সুতরাং ঈশ্বরের গুণ-বর্ণনে তাঁহারা প্রায়ই একমত। বাইবেলে দেখিতে পাই,—'ঈশ্বরের বাক্য-মাত্রে সৃষ্টি হইল। তাঁহার আদেশ-মাত্রেই বিশ্ব স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তাঁহার আদেশে সূর্য্য পরিচালিত হন; তাঁহার ইঙ্গিতে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে।' * এ সকল অপেক্ষা শক্তির পরিচয় আর কি হইতে পারে? যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মে সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইতেছে এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদি আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতেছে;—এই বিচিত্র ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই ঈশ্বরের জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বাইবেলের 'সাম্‌স্' অংশে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে,—'হে প্রভু! বিচিত্র তোমার সৃষ্টি-ক্রিয়া! তোমার জ্ঞান-প্রভাবেই এ বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। তোমার জ্ঞান-প্রভাবেই পৃথিবী ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ।' তাঁহার করুণার বিষয় এবং তাঁহার প্রেমের বিষয় বাইবেলের 'সেণ্ট জন' অংশে এবং 'সাম্‌স্' অংশের নানা স্থানে পরিবর্ণিত আছে। 'তিনিই প্রেম-স্বরূপ (God is Love)'—সেণ্ট-জনের এ উক্তি সর্ব্বজন-বিদিত। ঈশ্বরের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে রোমান্স, রিভিলেশন প্রভৃতি অংশে এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে ম্যাথু, জন প্রভৃতিতে বহুল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অক্ষরত্বের বিষয় এক্সোডাস ডিউটারনমি, ম্যাথু প্রভৃতিতে এবং সততার বিষয় ইশিয়া, রোমান্স, কোরিন্থিয়ান্স প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে। † মুসলমান-গণ ঈশ্বর বুঝাইতে 'আল্লা' শব্দ ব্যবহার করেন। উহা আরবী শব্দ। 'আল্' এবং 'ইল-আ' (অর্থাৎ উপাসনার যোগ্য) হইতে 'আল্লা' শব্দের উৎপত্তি। তিনি দয়ার আধার, তিনি পৃথিবীকে এবং স্বর্গকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দিন-রাত্রি পরিবর্ত্তন, বায়ু-প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, প্রভৃতি সকলই তাঁহার কার্য্য। কোরাণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার মাহাত্ম্য-তত্ত্ব পরিকীর্ত্তিত আছে। কোরাণের দ্বিতীয় সুরায় তাঁহার কার্য্য-পরম্পরা পরিবর্ণিত রহিয়াছে; তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্বের,—তাঁহার সর্ব্বত্র বিদ্যমান-তার বিষয় কোরাণের অষ্ট-পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে, তাঁহার সর্ব্ব-শক্তিমত্তার পরিচয় দ্বিতীয় এবং সপ্ত-পঞ্চাশৎ অধ্যায়-দ্বয়ে বিবৃত আছে। চত্বারিংশ অধ্যায়ে ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ,

---

* ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমানত্ব বিষয়ে *Isaiah* xi 12; *Job* ix. 4 etc. xxvi, 6; এবং *Psalms*, XXIII, 69, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

† Romans II. 5-6; Revelation. XIX. 27; Mathew v. 45-48; John I. 5 etc; Exodus, III, 14-17; Deuteronomy VII, 8-II; Mathew, III. 6; Isaiah, XLVI. 9-10; Romans. III, 3-5; II Corinthians, I, 18-20,

পাপীর ত্রাণকর্ত্তা, অনুতপ্তের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কোরাণের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বের বিষয় এবং পঞ্চ-পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে তাঁহার অনন্ত দয়ার বিষয় বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ যে দেশের যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতামত আলোচনা করি না কেন, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই আপন-আপন ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বগুণাকর অজর অক্ষর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

একেশ্বর ও একাধিক ঈশ্বর।

যেখানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপিত, সেখানেই অদ্বৈত-বাদের ও দ্বৈত-বাদের—একেশ্বরের বা একাধিক ঈশ্বরের বিদ্যমানতা বিষয়ে বিচার-বিতর্ক চলিয়াছে। ঈশ্বর-সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ আলোচনার মধ্যেই দ্বৈতাদ্বৈত ভাব যেন মিশিয়া রহিয়াছে। অধুনা পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ প্রায় সকলেই একেশ্বর-বাদের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রযত্নপর। যাঁহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থে একেশ্বর-বাদ সম্বন্ধে যে সকল উক্তি লিপিবদ্ধ আছে, অধুনা সেই সকল বিষয়ই বিশেষ-ভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। একেশ্বর-বাদের প্রতিষ্ঠা-কল্পে ইহুদী-গণও তাঁহাদের ওল্ড-টেষ্টামেণ্টের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ করিতে পারেন। ডিউটারনমির চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে;—'মোজেস তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে বলিতেছেন,—সেই প্রভুই ঈশ্বর। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নাই। জানিয়া রাখ—স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে সেই ঈশ্বরই একমাত্র প্রভু; তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই। * ষষ্ঠ অধ্যায়ে,—'হে ইসরাইল! আমাদের জিহোবাই একমাত্র ঈশ্বর।' † এক্সোডাস এবং ইশিয়া প্রভৃতিতেও এই ভাবের উক্তি দৃষ্ট হয়। নিউ টেষ্টামেণ্টের সেণ্ট জন অংশের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এবং প্রথম কোরিন্থিয়ান্সের অষ্টম অধ্যায়ে একেশ্বর-বাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রথমোক্ত অধ্যায়ে যীশু-খৃষ্ট ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে পিতঃ! আপনার কৃপায় আমি যাহাদিগকে অনন্ত জীবন প্রদান করিতে সমর্থ হইব, তাহারা যেন জানে যে, আপনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। আপনিই একমাত্র সত্য অদ্বিতীয় ঈশ্বর।' ‡ শেষোক্ত অধ্যায়ে সেণ্ট পল বলিতেছেন—'সকল মূর্ত্তিই অপ্রকৃত। সেই এক ঈশ্বরই সত্য; তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নাই।' § মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণের অন্যূন শতাধিক স্থানে একেশ্বর-বাদের কথা আছে। দ্বিতীয় সুরায় হজরত মহম্মদ বলিতেছেন,—'তোমার ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর। তিনি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই। তিনি অসীম করুণার আধার।...তিনিই একমাত্র ঈশ্বর। তিনি চৈতন্যস্বরূপ;—তিনি অনন্ত।' কোরাণের একাদশ সুরায়—'তিনিই একমাত্র ঈশ্বর। তিনিই অনন্ত।' ষষ্ঠ সুরায়—'সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কোনও ঈশ্বর নাই।' এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ অনাবশ্যক। একেশ্বর-বাদ সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি-সমূহ দৃষ্ট

* "Know therefore that the Lord he is God in heaven above and upon the earth beneath; there is none else"—*Deuteronomy*, IV. 35.

† "Hear, O Israel, Jehovah our God is one Jehovah, i. e. the Lord our God is one Lord"—*Deuteronomy*, VI. 4.

‡ "This is life eternal, that they might know thee, the only true God"—*St. John* XVII 3.

§ "An idol is nothing in the world; and that there is no other God but one"—*I, Corinthians*, VIII 4.

হইলেও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রকারান্তরে যে স্বীকার করা হয় নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মে অহুর-মজ্দকেই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে বটে; কিন্তু যখন সদাত্মার সহিত অসদাত্মার বিবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তখনই একেশ্বর-বাদের বিনাশ-সাধন হয় নাই কি? যদিও স্পেন্তামৈন্যু বা সদাত্মাকে এবং অঙ্গ্রমৈন্যু * বা অসদাত্মাকে অহুর-মজ্দের বিভূতিরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে; কিন্তু দুই জনের তখন দুই প্রকার কার্য্যের বিষয় জানিতে পারি। সদাত্মা-রূপে অহুর-মজ্দ্ সৎ-সামগ্রীর বা সদ্গুণের সৃষ্টি করিতেছেন এবং অসদাত্মা-রূপে অঙ্গ্রমৈন্যু সমস্ত অসৎ সামগ্রীর ও অসৎ কার্য্যের সৃষ্টি করিতেছেন। দুই জনেই সৃষ্টি-কর্ত্তা—এক জন পুণ্যের, আর এক জন পাপের। দুই জনের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব; এক জন শান্তির বা পুণ্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রযত্নপর; অন্য জন অশান্তির বা পাপের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর। ইহাতে দ্বৈতবাদ বা বহুবাদ আসিল না কি? এতদ্ভিন্ন উভয়ের সহকারি-রূপে দেবগণ ও দানব-গণ বিদ্যমান থাকিয়া সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা লাভ করিতেছেন। এইরূপে মূলে এক অহুর-মজ্দের প্রতিষ্ঠা হইলেও, নানা অবয়বে তিনি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। যেমন ইরাণীয়-গণের মধ্যে, তেমনই ইহুদী ও খৃষ্টান-গণের মধ্যেও এই ভাব দেখিতে পাই। সয়তান বা ডেভিল—অঙ্গ্রমৈন্যুরই অন্য রূপ নহেকি? ওল্ড-টেষ্টামেণ্ট এবং নিউ-টেষ্টামেণ্ট উভয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে সয়তানের প্রভাবের বিষয় অবগত হওয়া যায়। কোন্ অজ্ঞাত অতীতকাল হইতে সয়তান আপন পাপ-রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছে এবং প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের সদনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করিতেছে, 'বাইবেল'-পাঠক তাহা অবগত আছেন। পেণ্টাটিউক গ্রন্থের আদিভূতঅংশেও এ পরিচয় বিদ্যমান আছে। ওল্ড-টেষ্টামেণ্টের 'লেভিটিকাস' গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে 'সেরিম' (Seirim) শব্দ দৃষ্ট হয়। অনুবাদকগণ উহার অর্থ 'ডেভিল' নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যেখানে সেরিম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেখানে বলা হইয়াছে,—'আর যেন তাহাদিগকে পূজা দেওয়া না হয়।' ইহাতে বুঝা যায়,—অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঈশ্বরের পার্শ্বে সয়তানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; এবং পরবর্ত্তি-কালে সে প্রাধান্য অস্বীকার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টান-গণ ও ইহুদী-গণ অনেকেই আজিকালি তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—'এই সয়তানের কল্পনা তাঁহাদের ধর্ম্মে অন্য ধর্ম্মের প্রভাব-বশতঃ ক্রমশঃ প্রবেশ-লাভ করিয়াছে।' যাহা যউক, যখনই এ প্রভাব বিস্তৃত হউক, বর্ত্তমানে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দুই শক্তির—সৎ ও অসতের—প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ই মনে আসে। খৃষ্টান-দিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে (রিভিলেশনের দ্বাদশ অধ্যায়ে) স্বর্গে দুই দলের বিরোধের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এক দলে মাইকেল এবং তাঁহার পারিষদ স্বর্গীয় দূতগণ এবং অন্য দলে ডেভিল ও তাহার পারিষদ-গণ যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত। সেই

* অঙ্গ্রমৈন্যু—পাপাত্মা—পাপের প্রশ্রয়দাতা। অঙ্গ্রমৈন্যু নামের অপভ্রংশে তিনি 'আরিম্যান' নামেও অভিহিত হন। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ। স্পেন্তামৈন্যু শ্বেতবর্ণ, পবিত্রাত্মা। তিনি অহুর-মজ্দের প্রতিরূপ বলিয়া প্রধানতঃ পরিচিত।

যুদ্ধকালে ডেভিল বা সয়তান ড্রাগণ বা সর্পের আকার পরিগ্রহ করিয়া আছে। সদাত্ম-গণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপারিষদ ডেভিল ঈশ্বর কর্ত্তৃক পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টান-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—'এ সকল কথা যদি যীশু খৃষ্ট বলিয়া থাকেন, তাহা রূপক বলিয়া বুঝিতে হইবে।' রূপক কি প্রকৃত কথা, সে বিচারের আবশ্যক নাই। তাঁহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থে যাহা উল্লিখিত আছে, আমরা এস্থলে তাহারই মাত্র পরিচয় দিতেছি। মুসলমান-গণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র কোরাণেও সয়তানের বিষয় লিখিত আছে। সেই সয়তানের নাম—'ইব্‌লিস।' ইবলিসের আকৃতি-প্রকৃতিও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সমূহের ধর্ম্ম-গ্রন্থোল্লিখিত সয়তানের আকৃতি-প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন।

কিবা একেশ্বর-বাদ, কিবা একাধিক শক্তির কল্পনা—উভয় সম্বন্ধেই একে অন্যের অনু-সরণের বিষয় অনেক স্থলেই আলোচিত হইয়া থাকে। অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,—

সদাত্মা ও অসদাত্মা।

ঈশ্বরের নাম সম্বন্ধেও পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অনু-সরণকারী। জেন্দ-আভেস্তার 'হরমজদ্ যস্থ' অংশে অহুর-মজ্‌দের বিংশতি নামের উল্লেখ আছে। তাঁহার একটী নাম—'অস্মি'। অপর একটী নাম—'অস্মি যাদ্ অস্মি।' কেহ কেহ বলেন,—এক্সোডাসে লিখিত মোজেস-কথিত 'এয়ে আস্‌র্ এয়ে' শেষোক্তিরই অনুসরণ। জেন্দ-আভেস্তার 'অস্মি যাদ্ অস্মি' বাক্যে যে অর্থ সূচিত হয়, মোজেসের উক্তিরও সেই অর্থ। উভয় বাক্যেই বুঝাইতেছে,—'আমি সেই আমি অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর'। ডাক্তার স্পিগেল জিহোবা শব্দের এবং অসুর শব্দের মূল অনুসন্ধান করিয়া শেষোক্ত হইতে প্রথমোক্তের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ এলোহিম ও আল্লা শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিয়া, মূল ধাতুর বিষয় আলোচনা করিয়া, কেহ কেহ বলিয়াছেন,—'এলোহিম শব্দ হইতেই আল্লা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।' অহুর-মজদের সকল নামই আবার সংস্কৃত-মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অসুর হইতে অহুর শব্দের উৎপত্তির বিষয় পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। 'অস্মি যাদ্ অস্মি' নামে অহুর-মজদের পরিচয়ের মূলও—'অস্মি যদ্ অস্মি।' অসদাত্মার সর্পরূপ পরিগ্রহের বিষয় প্রায় সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচারিত আছে। সর্পরূপী সয়তানের কল্পনা, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন, জোরওয়াষ্ট্রিয়ান ধর্ম্মের অনুসরণ মাত্র। জেন্দ-আভেস্তায় অসদাত্মাকে 'অজিদহক' বলিয়াও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অজিদহক শব্দে তীব্র-বিষোদগীরণকারী সর্প বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ শব্দের অপভ্রংশে পারস্য-ভাষায় অজ্‌দহ শব্দের উৎপত্তি; তাহার অর্থ—প্রকাণ্ড সর্প বা ড্রাগণ। বাইবেলোক্ত সয়তান বা ডেভিল হত্যাকারী এবং মিথ্যার জনয়িতা; জেন্দ-আভেস্তার অঙ্গ্রমৈন্যুও সেই একই প্রকৃতিসম্পন্ন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে একেশ্বর-বাদের ভাব কোথাও পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নহে, প্রতিপন্ন হইতে পারে। জেন্দ-আভেস্তার অনুবাদক ডারমেষ্টটর, ডক্টর হোগ এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, যাঁহারাই এ বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, সকলেই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। সর্পরূপী সয়তানের বিষয় মুসলমানগণের ধর্ম্মগ্রন্থেও লিখিত আছে। বাইবেলোক্ত আদম ও ইভ সর্পরূপী 'সামেল' নামক সেরাফের প্রলোভনে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল-ভক্ষণে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিল।' সংসারে

এই সেয়াকের * প্রভুত্বের বিষয় বিবিধ প্রকারেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কোরাণেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোরাণের সয়তানের নাম—ইব্‌লিস্। ইব্‌লিস্ প্রথমে এঞ্জেল ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করিয়া আদমের প্রাধান্য স্বীকার করিতে অসম্মত হয়। ইব্‌লিসের দাম্ভিকতায় ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হন এবং তাহাকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করেন। অধিকন্তু তিনি বলেন—'যে কেহ তোমার ন্যায় অবাধ্য আছে, তাহাদের সকলকেই নরকে নিপতিত হইতে হইবে।' ইহার পর ঈশ্বর আদমকে বলেন,—'তুমি তোমার পত্নীর সহিত এই স্বর্গধামে বাস কর। যে কোনও বৃক্ষের ফল তুমি ভক্ষণ করিও; কিন্তু এই বৃক্ষের (একটী নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ দেখাইয়া) ফল কদাচ খাইও না। এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে, তোমারও পতন অবশ্যম্ভাবী।' কিছুকাল পরে ইব্‌লিস্ বা সয়তান আদমকে ও তাহার স্ত্রীকে সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে প্রলুব্ধ করে। সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ মাত্র তাহাদের হৃদয়ে লজ্জার উদয় হয়; সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূতলে আগমন করে। ঈশ্বরের অভিসম্পাতে ইবলিস সর্পরূপে পরিণত হইয়াছিল, এরূপ উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। † ইবলিসের পতনাদির বিবরণ কোরাণের দ্বিতীয়, সপ্তম, ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ-সমূহে বিবৃত হইয়াছে।

যাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ ধর্ম্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—'এই সয়তানের কল্পনাও হিন্দু-শাস্ত্রের অনুস্মৃতি। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের যে দ্বন্দ্বের বিষয় লিখিত আছে, ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্র-বধের যে বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা হইতেই ঐ সয়তানের উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে।' পণ্ডিতগণ বলেন—'ঋগ্বেদের ঋক-সমূহের দুই প্রকার অর্থ আছে। যাস্কের নিরুক্তে আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নামে সেই দুই অর্থের প্রকার-ভেদ করা হইয়াছে। আধিদৈবিক অর্থে ইন্দ্র শব্দে সূর্য্য বুঝায়। বৃত্র—বৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ—আবরণ। সে হিসাবে, বৃত্র অর্থে—সূর্য্যের আবরক মেঘ বুঝাইয়া থাকে। সূর্য্য-রশ্মি-সম্পাতে উত্তাপে পৃথিবী নবজীবন লাভ করে; তাহাতে বৃক্ষলতা এবং জীবজন্তু সমূহ জীবন-প্রাপ্ত হয়। বৃত্র অর্থাৎ মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া পৃথিবীতে তাঁহার রশ্মির ও উত্তাপের গতিরোধ করে; তাহাতে সময় সময় পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইরূপে এ সংসারে সেই আলোকের আধার ইন্দ্রের বা সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের জনয়িতা বৃত্রের বা মেঘের অবিরত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। যখন বৃত্র জয়লাভ করে, সূর্য্য অদৃশ্য হইয়া পড়েন; পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এই ভাবে ক্রমাগত সূর্য্য-রশ্মি বা উত্তাপ বাধা প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর বহু তরুলতা, এমন কি—প্রাণী পর্য্যন্ত, গতজীবন হয়। এ বিষয় সকলেই অবগত আছেন। যাহা হউক, অবশেষে ইন্দ্রই জয়লাভ করেন; বৃত্র

বৃত্রাসুর-বধের তাৎপর্য্য।

* এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫০শ ও ৫৪শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† বারনাবাসের প্রচারিত সংবাদ হইতে ইবলিসের সর্পাকার-ধারণের বিবরণ এবং মাইকেল কর্ত্তৃক তাহার পদচ্ছেদন প্রভৃতির কাহিনী উক্টর সেল উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'ঐ দুরাত্মা অতি ঘৃণিত অবস্থায় জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।'

নিহত অর্থাৎ মেঘ জলরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। তখন পুনরায় ইন্দ্রের গৌরব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়। শত্রু বিধ্বস্ত হওয়ায় তাঁহার জ্যোতিঃ বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। বৃত্রাসুর-বধের—ইহাই আধিদৈবিক অর্থ।* আধ্যাত্মিক অর্থে ইন্দ্র শব্দে ঈশ্বরকে বুঝায়। তিনি আলোকদাতা, তিনি জীবনদাতা, তিনি সকল জ্ঞানের, সকল ধর্ম্মের, সকল সত্যের আধারস্থল। সঙ্ক্ষেপতঃ, তিনি সৎস্বরূপ। সে অর্থে বৃত্র তাঁহার বিরুদ্ধ-প্রকৃতিসম্পন্ন; বৃত্র মূর্ত্তিমান অন্ধকার ও কুকর্ম্ম। পরিদৃশ্যমান্ সংসারে আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ চির-সংগ্রাম চলিয়াছে, নৈতিক জগতেও সেইরূপ সতের ও অসতের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। সূর্য্য যেমন পরিদৃশ্যমান্ পৃথিবীকে আলোক-রশ্মিতে পুলকিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই সৎ, পবিত্র, আধ্যাত্মিক আলোকের আকর ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন। সূর্য্যদেব যেমন সময় সময় মেঘ মধ্যে লুকায়িত হন এবং তাহাতে পৃথিবী যেমন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে; সেইরূপ, জ্ঞান-সূর্য্য কখনও কুপ্রবৃত্তি-রূপ মেঘ দ্বারা আবৃত হন এবং তাহাতে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য কু-প্রবৃত্তি তখন বৃত্রের সৈন্য-সামন্ত-রূপে আবির্ভূত হইয়া হৃদয়-দুর্গ আক্রমণ করে,—ঈশ্বরের মহিমায় হৃদয়ে যে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য তাহারা প্রয়াস পায়। ইহাই ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের যুদ্ধ। ইন্দ্রের এবং বৃত্রের সৈন্যগণ যখন এইরূপ-ভাবে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ আবির্ভূত হয়; আত্মা তখন কখনও কখনও সেই চতুর ধূর্ত্ত সর্প-প্রকৃতি-সম্পন্ন বৃত্রের বশতাপন্ন হইতে প্রলুব্ধ হন। ফলে, হৃদয়ের নৈতিক রাজ্যে অরাজকতা বা যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তখন ইন্দ্রের সমস্ত ক্ষমতা অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও সদ্ভাব হৃদয় হইতে অপসৃত হয়;—কু-প্রবৃত্তি-

* ইন্দ্র এবং বৃত্র সম্বন্ধে নানা মত প্রচারিত আছে। পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক অর্থই যে সকলে স্বীকার করেন, তাহা নহে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের টীকায় রমানাথ সরস্বতী লিখিয়া গিয়াছেন,—"এই সূক্তে ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বধ বর্ণিত হইয়াছে। বৃত্র একজন আসিরীয়া-দেশীয় দলপতি। পারস্য-গ্রন্থ আভেস্তাতে লিখিত আছে যে, বৃত্রাসুর বাবুনগরের (Babylon) সমস্ত আর্য্যভূমি (Ariana) একেবারে জনশূন্য করিবার নিমিত্ত উপজাপ করিয়া অর্দ্বিশূর নাম্নী দেবীকে জয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। বৃত্র তথাপি নিজ কুচক্রে নিরত থাকে এবং অবশেষে ইন্দ্র-দেব কর্ত্তৃক সবংশে নিপাতিত হয়। যদ্যপি এইরূপ কোনও তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা অবশ্যই আর্য্য-জাতি এবং সেমিতিক জাতির মধ্যে ঘটিয়া থাকিবে; যেহেতু, ইন্দ্র আর্য্যদিগের রক্ষক এবং বৃত্রাসুর সেমিতিক-দিগের দলপতি। এই ঘোর যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য ইন্দ্র-দেবকে 'বেরেত্রঘ্ন' উপাধিতে জেন্দাবেস্তায় উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। জেন্দাবেস্তান্তর্গত বহ্রাম যস্‌ৎ সমস্তই বেরেত্রঘ্ন ইন্দ্রের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে বৃত্রকে 'অহিদাহক' (বেদের দাসঃ অহিঃ) বলা হইয়াছে।...বৃত্রাসুর আর্য্যকুলের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং তাঁহার বধের পর যেন আর্য্যগণ নূতন সূর্য্য, নূতন প্রাতঃকাল এবং নূতন আকাশ দেখিতে পাইলেন। বৃত্রাসুরের উৎপাতে আর্য্যগণ যেন বিপদের তিমিরে আবৃত ছিলেন।... পারস্যের রাজা সাইরস (Cyrus) যেমন টাইগ্রীস নদীর প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া ব্যাবিলন নগর জয় করেন বৃত্রাসুরও বোধ হয়, সেই প্রকার করিয়া আর্য্যভূমি জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। জেন্দাবেস্তাতেও ইহাই লিখিত আছে। তৎকালে ইতিহাসের জন্ম হয় নাই। সুতরাং তথ্য নির্ণয় দুঃসাধ্য। কিন্তু ঋগ্বেদ ও আবেস্তার ঐক্য-দর্শনে বোধ হয় ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের যুদ্ধ অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে।"

সমূহ' তখন হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। হৃদয় তখন আর ইন্দ্রের পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। তখন গভীর অন্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; পাপের ও দৈন্যের অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া আত্মা সদসৎ বিচারে অসমর্থ হয়। এইরূপে বৃত্রের পাপ-প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আত্মা আপনার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিলে, অবশেষে ইন্দ্র বা ঈশ্বর সেই পতিতের উদ্ধার-সাধন করেন। সৎ ও অসতের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চিরদিনই চলিয়াছে। ইহা হইতেই বৃত্রাসুর-বধের এবং এতদনুসরণে সয়তানাদির উপাখ্যান প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। ঋগ্বেদে বৃত্রের নাম 'অহি' বলিয়াও উল্লিখিত আছে। অহি শব্দের অর্থ—সর্প। সেই অহি শব্দ হইতেই জেন্দ-আভেস্তার 'অজি' এবং 'অহিদাহক' হইতেই জেন্দ আভেস্তার 'অজিদহকের' উৎপত্তি। অঙ্গ্রমৈন্যু বা অসদাত্মা জেন্দ-আভেস্তায় সর্প-প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বেদোক্ত বৃত্রের ছায়া প্রথমে জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মে এবং তাহা হইতে পর্য্যায়ক্রমে ইহুদীগণের, খৃষ্টানগণের এবং মুসলমানগণের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার পূর্ব্বোক্ত অনুসৃতির বিষয় স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন,—'আভেস্তা-গ্রন্থে প্রধান অসদাত্মাকে সর্প বা অজিদহক বলা হইয়াছে বলিয়া জেনিসিসের তৃতীয় অধ্যায়োল্লিখিত সর্পরূপী সয়তানের প্রসঙ্গ তাহার অনুসরণ বলিয়া মনে হইতে পারে না। জেনিসিসে সর্পের যেরূপ ধূর্ত্ততা ও উত্তেজনা-পূর্ণ প্রকৃতির বিষয় অঙ্কিত হইয়াছে, বেদে বা জেন্দ-আভেস্তায় অসদাত্মার সেরূপ ভীষণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।' * কিন্তু ম্যাক্সমুলারের এ যুক্তি প্রামাণ্য নহে। কারণ, পুত্র যে সর্ব্বাংশেই পিতার আকৃতি-প্রকৃতি-সম্পন্ন হইবে, তাহার কোনও নিয়ম নাই। যাহা হউক, পরিশেষে প্রকারান্তরে ম্যাক্সমুলারকে একে অন্যের অনুসরণের কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—'জেনিসিসের পরবর্ত্তী গ্রন্থ-সমূহে (প্রথম ক্রনিকেল্‌স্‌, একবিংশ অধ্যায়ে ইসরাইলকে হত্যা করিবার জন্য সয়তান ডেভিডকে উত্তেজিত করিতেছে; এবং দ্বিতীয় স্যামুয়েলের চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে এইরূপ ক্রোধোত্তেজনার বিষয় বর্ণিত আছে। সেখানে ইস্‌মাইল এবং জুডার প্রতি প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং নিউ-টেষ্টামেণ্টের যে সকল অংশে অসদাত্মার ক্ষমতার বিষয় বিবৃত আছে, তন্মধ্যে পারসিক-গণের প্রভাবের বিষয় স্বীকার করিতে পারি।' † আবার এতদ্বিষয়ে জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মের অনুসরণ স্বীকার করিতে

---

* *Vide* Prof. Max Muller, *Chips from a German Workshop.*

† ঋগ্বেদের অনুবাদকগণ বৃত্র ও অহি সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন,— মেঘেরই নাম বৃত্র ও অহি। 'বৃ' ধাতু হইতে 'বৃত্র' আবরণার্থে এবং 'হন' ধাতু হইতে অহি হননার্থে; এক অর্থে 'সূর্য্যরশ্মি আবরণ' অপর অর্থে 'সূর্য্যরশ্মি হনন' বা অপহরণ। বৃত্র ও অহি যেমন জেন্দ-আভেস্তায় রূপান্তরে পরিগৃহীত হইয়াছে, গ্রীসেও উহাতে সেই ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সাদৃশ্য-প্রদর্শনে ঋগ্বেদের টীকায় লিখিয়াছেন,—"Ahi reappears in the Greek Echies-Echidna the dragon which crushes its victim with its coil—Cox's *Introduction to Mythology and Folklore* p. 34. note. But besides Kerberos (ঋগ্বেদে যমের কুকুর সার্ব্বা বা সারমেয়) there is another dog conquered by Hercules, and he (like Kerberos) is born of Typhoon and Echidna (ঋগ্বেদে অহি). The second dog is known by the name of Orthros the exact copy, I believe, of the Vedic Vritra. That the Vedic Vritra should re-

হইলে, দ্বৈত-বাদের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনও সম্ভাবনা দেখি না। জেন্দ-আভেস্তার অঙ্গ্রমৈন্যুর যে প্রভাবের বিষয় পরিকীর্ত্তিত আছে, তাহা বড় অল্প নহে। ভেন্দিদাদের প্রথম ফারগার্দে অহুর-মজ্দের এবং অঙ্গ্রমৈন্যুর প্রতিযোগিতার পূর্ণ-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেখানে দেখিতে পাই,—ইরাণীয়-গণের সর্ব্ব-প্রধান ঈশ্বর অহুর-মজ্দ্ ষোলটী ভূ-ভাগ সৃষ্টি করিলেন, আর তাঁহার প্রতিযোগী অঙ্গ্রমৈন্যু সে সকলের ধ্বংস-সাধনে অগ্রসর হইলেন। অঙ্গ্রমৈন্যু কর্ত্তৃক দুর্দ্দৈব এবং মহামারী প্রভৃতি সৃষ্টি হইল এবং তাহারা অহুর-মজ্দের সৃষ্ট ভূভাগকে ধ্বংসমুখে নিপাতিত করিতে লাগিল। অহুর মজ্দের সৃষ্টিও ষোড়শ প্রকারের, অঙ্গ্রমৈন্যুর সৃষ্টিও ষোড়শ প্রকারের। একজন সৎ-পদার্থ-সমূহ সৃষ্টি করিতেছেন, অপর জন তৎসমুদায়ের বিলোপ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া অসৎ পদার্থ-সমূহের সৃষ্টি করিতেছেন। ভেন্দিদাদের প্রথম ফারগার্দ অহুর মজ্দের ও অঙ্গ্রমৈন্যুর দ্বন্দ্ব-ব্যাপারেই পরিপূর্ণ। সে ব্যাপারে উভয়ের প্রাধান্যের বিষয় মনে করিতে গেলে দ্বৈত-বাদের চিত্রই প্রকট হইয়া পড়ে। অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থেও সয়তান ও ঈশ্বরের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ দ্বৈতভাবমূলক।* এতদ্ভিন্ন 'এঞ্জেল' বা স্বর্গীয় দূতাদির বিষয় আলোচনা করিলেও তাহার মধ্যে হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীগণের ছায়াপাত অনুভূত হয়। হিন্দু-ধর্ম্মের যে সকল বিষয় একেশ্বর-বাদের অন্তরায় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত স্থলেও সে অন্তরায়ের অসদ্ভাব দেখিতে পাই না।

হিন্দু-শাস্ত্রে ঈশ্বর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—নাম অনন্ত, রূপ অনন্ত। শাস্ত্রে তাই তিনি কথনও ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত; তিনি কথনও ব্রহ্ম, কথনও পরব্রহ্ম, কথনও আত্মা, কথনও পরমাত্মা, কথনও হরি, কথনও শিব, কথনও ইন্দ্র, কথনও হিরণ্যগর্ভ, কথনও বিরাট, কথনও বিষ্ণু, কথনও বায়ু, কথনও অগ্নি, কথনও বরুণ,—তাঁহার নাম-রূপের অন্ত নাই। কালী, তারা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রীও তাঁহার নাম। যেমন নাম অসংখ্য, তেমনি তাঁহার রূপও অসংখ্য। যাঁহার যেরূপ জ্ঞান ও অধিকার, তিনি সেইরূপ-ভাবেই তাঁহাকে ভাবিয়া থাকেন।† তাই আবহমান কাল হইতে হিন্দুর মধ্যে একেশ্বর-বাদও আছে, আবার একাধিক ঈশ্বরের উপাসনাও প্রচলিত। তাই, হিন্দুর মধ্যে দ্বৈত-ভাব, অদ্বৈত-ভাব, দ্বৈতাদ্বৈত ভাব, বিশুদ্ধাদ্বৈত ভাব প্রভৃতি কত ভাবেরই পরিচয় পাওয়া

---

appear in Greece in the shape of a dog need not surprise us. Thus we discover in Hercules the victim of Orthros a real Vritrahan.—Max Mulier's *Chips from a German Workshop*. Vol. II. pp. 184, 185."

* এতদ্বিষয়ের অন্যান্য বক্তব্য এই পরিচ্ছেদের পরবর্ত্তী অংশে দ্রষ্টব্য।

† এক এক সম্প্রদায়ের নিকট ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কি নামে পরিচিত, 'কুসুমাঞ্জলি'-প্রণেতা তাহার একটী পরিচয় দিয়াছেন; যথা,—'শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ইত্যৌপনিষদাঃ। ১। আদিবিদ্বানসিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ। ২। ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টো নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়প্রদ্যোতকোঽনুগ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলাঃ। ৩। লোক-বেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ। ৪। শিব ইতি শৈবাঃ। ৫। পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ। ৬। পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ। ৭। যজ্ঞপুরুষ ইতি যাজ্ঞিকাঃ। ৮। সর্ব্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ। ৯। নিরা-বরণ ইতি দিগম্বরাঃ। ১০। উপাস্যত্বেনদেশিত ইতি মীমাংসকাঃ। ১১। লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ। ১২। যাবদুক্তোপপন্ন ইতি নৈয়ায়িকাঃ। ১৩। বিশ্বকর্ম্মেতি শিল্পিনঃ। ১৪।

যায়। যাঁহারা বলেন,—একেশ্বর-বাদ হিন্দু-দিগের মধ্যে অধুনা প্রচলিত হইয়াছে, যাঁহারা বলেন,—হিন্দুদের মধ্যে পূর্ব্বে কেবল পাথর-পুতুল পূজাই প্রচলিত ছিল, অথবা প্রকৃতির এক একটা শক্তিকেই ঈশ্বর বলিয়া হিন্দুরা পূজা করিত, হিন্দুরা একেশ্বরের বিষয় চিন্তা করিতেই সমর্থ ছিল না; তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। কারণ, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অনাদি-অনন্ত কালের শাস্ত্র-গ্রন্থে এ তত্ত্ব বিশদীকৃত আছে। কেবল একেশ্বর-বাদ বলিয়া নহে; সকল দেশের সকল তত্ত্বই হিন্দু শাস্ত্রে নিহিত আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে আজি পর্য্যন্ত এমন কোনও নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই, হিন্দুগণ যাহা অবিদিত ছিলেন।

শাস্ত্রে একেশ্বর-বাদ।

ঋগ্বেদের শতাধিক স্থানে একেশ্বর-বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের চতুঃ-ষষ্ট্যধিক শততম সূক্তের ষষ্ঠ ঋকের শেষার্দ্ধে "বি যঃ তস্তম্ভ ষট্ ইমা রজাংসি অজস্য রূপে কিমপি স্বিৎ একং" অংশে ঈশ্বরকে অজ বা জন্ম-রহিত বলা হইয়াছে এবং তিনি বিশ্ব-সংসার স্তম্ভন করিয়াছেন বুঝা যাইতেছে। আদিত্য সম্বন্ধে এই সূক্ত প্রযুক্ত হইলেও এই ঋকে জগতের এক সৃষ্টিকর্ত্তার বিষয় পাশ্চাত্য-শিক্ষিত পণ্ডিতগণের মনেও উদয় হইয়া থাকে। ঐ সূক্তেরই ষট্‌চত্বারিংশ ঋকে প্রকাশ,—'এই আদিত্যকে মেধাবিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি সকলের রক্ষা-কর্ত্তা, সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনি এক হইলেও বহু বলিয়া অভিহিত হন। ইহাকে অগ্নি যম ও মাতরিশ্বা বলে।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুৎমান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি প্রভৃতি যে অভিন্ন, পরন্তু ঈশ্বরেরই নামান্তর, এ ঋকে তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের দ্বিতীয়, সপ্তম, নবম ও ত্রয়োদশ ঋকের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিলেও এক ঈশ্বরের মাহাত্ম্য-তত্ত্বই পরিকীর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া বুঝা যায়। সেখানে ইন্দ্র নামে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—তিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করিতেছেন। তিনি প্রকুপিত পর্ব্বত-সমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন। তিনি প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন। তিনি সূর্য্যকে এবং উষাকে উৎপাদিত করিয়াছেন। দ্যাব্যা পৃথিবী তাঁহাকে নমস্কার করে।' ইত্যাদি। ইন্দ্র-দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে এতদুক্তি-সমূহ প্রযুক্ত হইলেও এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অনুভাবনা এতন্মধ্যে স্বতঃই অনুভূত হয়। তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশৎ সূক্তের নয়টী ঋকে সর্ব্বশক্তিমান্ একেশ্বরের ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। উক্ত সূক্তের বিভিন্ন ঋকে বিশ্বদেবের উপাসনা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—'তিনি পৃথিবীকে পোষণ করেন, ধারণ করেন (৪ঋ), উত্তাপ রূপে শস্য উৎপাদন করেন (৫ঋ), সূর্য্যরূপে পশ্চিম দিকে অস্ত গিয়া পূর্ব্ব দিকে উদয় হন (৬ঋ), তিনি সকলের মূলীভূত হইয়া আকাশে ও পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন (৭ঋ), তাঁহারই নির্দেশে দিবা ও রাত্রি আসিতেছে ও যাইতেছে (১১ঋ), আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টিরূপে রসদান করিতেছে (১২ঋ), তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি মনুষ্য ও পশু-পক্ষীকে সৃষ্টি করিতেছেন (১৯ঋ-২০ঋ), ইত্যাদি।' পঞ্চম

মণ্ডলের পঞ্চাশীতিতম সূক্তে তিনি বরুণ নামে অভিহিত। কিন্তু তাঁহার শক্তি ও গুণের বিষয়ে লিখিত আছে,—'তিনি সূর্য্য দ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ লন (৫ঋ,) তিনি নদী সকলকে মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন (৬ঋ), তিনি মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ খণ্ডন করেন (৭ঋ-৮ঋ)। দ্বাদশ মণ্ডলের একাশীতিতম সূক্তে তিনি বিশ্বকর্ম্মা নামে অভিহিত এবং তিনি বিনা-অবলম্বনে শূন্য হইতে বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছেন বলিয়া পরিচিত। ঐ সূক্তের তৃতীয় ঋকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে,—'সেই এক প্রভু; তাঁহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ। তিনি দুই হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ-সঞ্চালন পূর্ব্বক দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা করেন।' উক্ত দশম মণ্ডলের চতুর্দ্দশাধিক শততম সূক্তের পঞ্চম ঋকে প্রকাশ,—'পক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা একই আছেন। বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাঁহাকে কল্পনা-পূর্ব্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন।' যথা,—"সুপর্ণ বিপ্রা কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।" একেশ্বর-বাদের কথা ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? দশম মণ্ডলের একবিংশাধিক শততম সূক্ত এবং তাহার বঙ্গানুবাদ আমরা পূর্ব্বেই (এই গ্রন্থের ১২১ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রকাশ করিয়াছি। সেই সূক্তে প্রকাশ,—'তিনিই সৃষ্টি-কর্ত্তা, তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর ধারণ-কর্ত্তা, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্, তিনিই সর্ব্বব্যাপী।' উক্ত মণ্ডলের একোননবতিতম সূক্তে অদিতির প্রভাবের বিষয় যাহা পরিবর্ণিত আছে, তাহাতে তিনি অদিতি নামেই পরিচিত। ঐ সূক্তের দশম ঋকে বলা হইতেছে,—

"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষং অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥"

অর্থাৎ,—'অদিতিই আকাশ, অদিতিই অন্তরীক্ষ, অদিতিই মাতা, অদিতিই পিতা, অদিতিই পুত্র, অদিতিই গন্ধর্ব্বাদি লোক-সমূহ, অদিতিই জন্ম ও জন্ম-কারণ।' একেশ্বর-বাদের ভাব উহার অপেক্ষা আর কোনরূপে বিশদ করিয়া প্রকাশ করা যায় না।* বাজসনেয় সংহিতায় এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতেও অদিতি সম্বন্ধে ঐ উক্তিই দৃষ্ট হয়। সামবেদ-সংহিতায় ঈশ্বরের অনন্তত্বের, জ্ঞানদাতৃত্বের এবং প্রভাবের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; সেখানে ইন্দ্র বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—

"যদ্দ্যাব ইন্দ্র তে শত ৺ শতং ভূমী রুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিং সহস্র ৺ সূর্য্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী॥"
"ইন্দ্র ক্রতুন্ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি॥"

অর্থাৎ,—'শত পৃথিবীর এবং শত দ্যুলোকের পরিমাণ করিলেও, হে ইন্দ্র! তোমার পরিমাণ হয় না। সহস্র সহস্র সূর্য্যে এবং পৃথিবীতে তোমাকে ব্যাপিতে পারে না। পিতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে জ্ঞান দান কর। তোমার অনুকম্পায় জীব যেন তোমার জ্যোতিঃ-সমুদ্রে মিশিতে পারে।' অথর্ব্ব সংহিতায় ঈশ্বর কাল নামে অভিহিত। উক্ত সংহিতার উনবিংশ কাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তে প্রকাশ,—'কাল অজর, অমর; কালেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়,

* রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই সকল বিষয় আলোচিত আছে।

কালেই সূর্য্য কিরণ দান করেন; সকলেই কালের অধীন। কালই মন, কালই প্রাণ। যথা,—

"কালো ভূমিমসৃজত কালে তপসি সূর্য্যঃ। কালেহবিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বিপশ্যতি॥"

যজুর্ব্বেদে (৩২।১) তিনি অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা, শুক্র, ব্রহ্ম, আপ্ এবং প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। নাম-বিশেষণ বিভিন্ন হইলেও তিনি এক। যথা,—

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমা। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥"

উপনিষদে কখনও তিনি পুরুষ নামে, কখনও আত্মা নামে পরিচিত এবং তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই বলিয়া উল্লিখিত। যথা,—কাঠোপনিষদে (৩।১০।১১),—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পর॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"

'স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে সূক্ষ্ম রূপাদি শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ,—মহৎ হইতে অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে পরম পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পরম পুরুষ বা পরমাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই। তিনিই সমস্তের পর্য্যবসান্ এবং সকলেরই পরা গতি।' তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কঠোপনিষদের অন্যত্র (২।১৮) আবার উক্ত হইয়াছে,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

'তাঁহার জন্ম নাই, বিনাশ নাই। কোনও কারণান্তর-সহায়ে তিনি উৎপন্ন নহেন এবং তিনিও কাহারও কারণ নহেন। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত অর্থাৎ ক্ষয়-বর্জ্জিত এবং পুরাণ পুরুষ। শরীরের ধ্বংসে তাঁহার ধ্বংস হয় না।' মুণ্ডকোপনিষদে তিনি পুরুষ নামে অভিহিত। তাঁহা হইতে অগ্নি, বায়ু, অন্তরীক্ষ, জল ও পৃথিবী জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মারূপে বিদ্যমান আছেন। যথা,—দ্বিতীয় মুণ্ডকে, প্রথম খণ্ডের তৃতীয় শ্লোকে,—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রেবাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃপ্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥"

অর্থাৎ,—প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়-সকল, আকাশ, বায়ু, জল, বিশ্বধারিণী পৃথিবী, সকলই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্বর্গলোক সেই পুরুষের মস্তক-স্বরূপ; চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার চক্ষু-স্বরূপ, দিক্-সকল শ্রবণেন্দ্রিয়-স্থানীয়, প্রসিদ্ধ বেদ-সমূহ তাঁহার বাক্য-স্বরূপ, বায়ু তাঁহার প্রাণ, সমস্ত বিশ্ব তাঁহার অন্তঃকরণ। পৃথিবী তাঁহার পদস্বরূপ, তিনি সমস্ত ভূতে অন্তরাত্মা-স্বরূপ।' তিনিই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অক্ষর, ইন্দ্র, কালাগ্নি, চন্দ্রমা,—কৈবল্যোপনিষদে (১।১৮) তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। সেস্থলে দেখিতে পাই,—

"স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।

স এব বিষ্ণু স প্রাণঃ স কালাগ্নি স চন্দ্রমাঃ॥"

দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে পাতঞ্জল-দর্শনে, ন্যায়-দর্শনে ও বেদান্ত-দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব সহজ-বোধ্য ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। পতঞ্জলি-সূত্রে,—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ।" অর্থাৎ,—যিনি ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশ্রয় প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত, তিনিই

ঈশ্বর। 'তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজম্''—অর্থাৎ, 'তাঁহাতে অত্যধিক জ্ঞান থাকায়, তিনি নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্বের আধার।' "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" অর্থাৎ, 'তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সকলেরই গুরু; কাল দ্বারা তাঁহার পরিচয় নির্ণয় করা যায় না।' ন্যায়-দর্শন বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরঃ কারণঃ পুরুষকর্ম্মফল্যদর্শনাৎ।"—তিনিই সকল কারণের কারণ; যেহেতু, মনুষ্য-কৃত কার্য্যের ফলাভাব ঘটিয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি সূত্রই ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। অন্যান্য দর্শনে যে ভাবে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে, পূর্ব্বেই আমরা তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছি। * সেই পরম পুরুষের স্বরূপ-তত্ত্ব মহর্ষি মনু তদীয় সংহিতার উপসংহারে এইরূপ-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি। রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাৎ তৎপুরুষং পরম্॥"

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"

অর্থাৎ,—'সকলের শাস্তা, অণু হইতেও অণু, প্রকাশ-স্বরূপ, স্বপ্নধীগম্য সেই পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে। সেই পরমপুরুষকে কেহ অগ্নি বলেন, কেহ বা প্রজাপতি মনু বলিয়া উপাসনা করেন, কেহ বা ইন্দ্র (ইন্দ্রিয়) রূপে, কেহ বা প্রাণ-রূপে এবং অপর কেহ বা সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম-রূপে উপাসনা করেন।' একেশ্বর-বাদ-তত্ত্ব কোথায় নাই? পুরাণ-সমূহেই কি একেশ্বর-বাদের অসদ্ভাব আছে? যে কোনও পুরাণ অনুসন্ধান করুন, একেশ্বর-বাদের প্রসঙ্গ দেখিতে পাইবেন। গরুড়-পুরাণের, পূর্ব্ব-খণ্ডে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে, রুদ্রের এবং হরির উক্তিতে একেশ্বর-বাদ পূর্ণ প্রকটিত। 'তিনিই সৃষ্টি-কর্ত্তা, তিনিই পালন-কর্ত্তা, আবার তিনিই সর্ব্বরূপে বিরাজমান্। অগ্নি তাঁহার মুখ, স্বর্গ তাঁহার মস্তক, আকাশ তাঁহার চরণ, চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নয়নদ্বয়।' বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর স্তবে প্রহ্লাদ তাঁহাকে যে বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহাতে একেশ্বর-বাদের উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই। † শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং" উপনিষদের এই উক্তিই দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্যের সোঽহং ভাব একেশ্বর-বাদেরই প্রতিধ্বনি নহে কি? ফলতঃ, কিবা বেদ, কিবা ব্রাহ্মণ, কিবা উপনিষৎ কিবা দর্শন, কিবা স্মৃতি, কিবা পুরাণ, কিবা তন্ত্র, সকল শাস্ত্র হইতেই একেশ্বর-বাদের বিষয় প্রমাণ করা যাইতে পারে।

হিন্দু-শাস্ত্রে যেমন অদ্বৈত-বাদের কথা আছে, তেমনি দ্বৈতবাদের কথাও আছে। হিন্দু যেমন এক ঈশ্বরের উপাসনা করেন, হিন্দু তেমনি বহু ঈশ্বরের উপাসনাও করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই বহু ঈশ্বরের উপাসনার মূল তাৎপর্য্য কি, তাহা না বুঝিয়া অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ হিন্দুকে পৌত্তলিক বলিয়া বিদ্রূপ করেন। সকলেরই লক্ষ্য—আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে মিশিতে হইবে। কত দিক দিয়া কত স্রোতস্বিনী তদুদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইতেছে। যিনি যে নদীতে ভাসমান হইবেন, তিনি সেই নদী বাহিয়াই সমুদ্রে উপনীত হইতে পারিবেন। আবার জল যদি সমুদ্রের স্বরূপ হয়, তবে নদীর জল কি সমুদ্রের স্বরূপ নহে? একই পরমাত্মা; তিনি সর্ব্বঘটে সর্ব্বরূপে

দ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য।

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ডে, দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায়, এ বিষয় বিশদীকৃত হইয়াছে।

† এই খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ১৫৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিদ্যমান—একই পরমাত্মা। বেদও তাহাই বলিয়াছেন, উপনিষদও তাহাই বলিয়াছেন, দর্শনও তাহাই বলিয়াছেন, পুরাণ-তন্ত্রাদিতেও তাহারই প্রতিধ্বনি আছে। বেদবাণী বলিয়াছেন,—"সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি;" (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১১৪ম সূক্ত, ৫ম ঋক।)। অর্থাৎ—পক্ষী একই আছেন। বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ কল্পনা-পূর্ব্বক তাঁহার অনেক প্রকার বর্ণনা করেন।' একই ঈশ্বর নানা নাম-রূপে পরি-কল্পিত হন, ইহা বুঝিয়াও শাস্ত্রকারগণ কেন নানা নাম-রূপের উপাসনার উপদেশ দেন? এ প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রেই আছে। যথা,—'ব্রহ্ম দুই প্রকার—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। তাঁহাকে পর ও অপর বলা যায়। এ জগতে তিন প্রকার ভাবনা হইয়া থাকে,—(১) ব্রহ্ম ভাবনা, (২) কর্ম্ম ভাবনা, (৩) ব্রহ্ম ও কর্ম্ম উভয় ভাবনা। যাহার যেমন বোধ ও অধিকার, তাহার সেইরূপ ভাবনা হইয়া থাকে। ভেদ-জ্ঞানের হেতু কর্ম্ম-সমূহ যখন অক্ষীণ অবস্থায় থাকে, তখন জীবগণের বিশ্বে ও পরমাত্মায় ভেদ-জ্ঞান হইয়া থাকে। যে জ্ঞানে সমস্ত ভেদ বিলয়-প্রাপ্ত হয়, যাহা সত্তামাত্র বাক্যের অগোচর এবং যাহা কেবল আত্মাই জানিতে পারে, সেই জ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান। রূপহীন বিষ্ণুর সেই নিত্য ও পরমরূপ এবং তাহা সমস্ত বিশ্বরূপ হইতে বিভিন্ন রূপ। প্রথমতঃ, যোগী ব্যক্তি সেই পরমরূপ চিন্তা করিতে সমর্থ হন না বলিয়াই পরমাত্মার বিশ্বগোচর স্থূল রূপই চিন্তা করিবেন। হিরণ্যগর্ভ, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বায়ু, বসু, রুদ্র, ভাস্কর, নক্ষত্র, গ্রহ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং দৈত্য প্রভৃতি সমস্ত দেবযোনি,—শৈল, সমুদ্র, নদী ও বৃক্ষ প্রভৃতি অশেষ ভূত-নিবহ ও তাহাদের কারণ-সমূহ এবং প্রধানাদি বিশেষ পর্য্যন্ত একপাদ, দ্বিপাদ, বহুপাদ, অথবা অপাদ চেতন অথবা অচেতন স্বরূপ এই সমস্তই,—ভাবনাত্রিতয়াত্মক পরমাত্মার মূর্ত্ত রূপ। ব্রহ্মের দ্বিতীয় রূপ—সৎ ও অমূর্ত্ত।' তবেই বুঝা যায়, কি উদ্দেশ্যে কি ভাবে নানা দেবদেবীর এবং বৃহৎ ক্ষুদ্র নানা সামগ্রীর উপাসনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। * শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"এতাস্তশেষ-রূপস্ত তস্য রূপাণি পার্থিব। যতস্তচ্ছক্তিযোগেন ব্যাপ্তানি নভসা যথা॥" অর্থাৎ,—'এই সমস্তই সেই অশেষরূপ ভগবানের রূপ। যেহেতু, এ সমস্তই আকাশের ন্যায় তাঁহার শক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে।' মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তাঁহার বিরাট্ বিশ্বরূপ ধারণার অতীত বলিয়া তাঁহার প্রতিমাদি পূজার ব্যবস্থা হয়। সাধক যখন তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"অর্চ্চদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্রাভিন্নেন চক্ষুষা॥"

অর্থাৎ,—'আমি তো সর্ব্বভূতেই অবস্থিত। তবে পুরুষ যে পর্য্যন্ত আমাকে আপনার হৃদয় মধ্যে জানিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাদির পূজা করিবে।...আমাকে

* গুণভেদে ব্রহ্মের মূর্ত্তিভেদ বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের ৪৩শ অধ্যায়. শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে ১২৭শ অধ্যায়, সগুণ কৃষ্ণের নববিধ রূপ-সম্বন্ধে ১২৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। বিষ্ণু-পুরাণ, প্রথম অংশ, ২১শ অধ্যায়ে তাঁহার চতুর্ব্বিধ রূপের কথা, গরুড়-পুরাণে ৪৪শ অধ্যায়ে মূর্ত্তামূর্ত্ত ধ্যান-বিবরণ এবং কূর্ম্মপুরাণ, ৩য় অধ্যায়ে ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বভূতাত্মা এবং সকল ভূতে অবস্থিত জানিয়া, দান, মান, মৈত্রী ও সমদর্শিতা দ্বারা সকলকে অর্চ্চনা করা, পুরুষ-মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।' মানুষের ধ্যান-ধারণার শক্তি অনুসারে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-স্বরূপ পরমেশ্বরের নানা নাম-রূপ গৃহীত হইয়া থাকে।

একের ও বহুর উপাসনা আবহমান-কালই প্রচলিত আছে। যে দেশে যখনই যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে, সকলের মধ্যেই এই একের ও বহুর উপাসনার ছায়াপাত ঘটিয়াছে। ঋগ্বেদে অগ্নি-দেবতার, বায়ু-দেবতার, বরুণ-দেবতার ও ইন্দ্র-দেবতার উপাসনা-মূলক স্তোত্রাদি আছে। যিনি যেরূপ অনুভূতি লইয়া সেই স্তোত্র উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিকট সেই সেই দেবতা এক বা ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হন। যদি একটু সন্ধান করিয়া দেখি, দেখিতে পাইব,—সকল নামই প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দ্র শব্দে কখনও সূর্য্যকে বুঝাইয়াছে, কখনও সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে বুঝাইয়াছে, কখনও সুরপতি বৃত্রঘ্নকে বুঝাইয়াছে। এইরূপে বরুণ সম্বন্ধে, সূর্য্য সম্বন্ধে, অগ্নি সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা যাইতে পারে। অগ্নি—কখনও সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, কখনও বা ঈশ্বরের অংশ বা বিভূতি। পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণের মতের আলোচনায় দেখিতে পাইয়াছি, কেহ বলিয়াছেন—অগ্নি হইতে, কেহ বলিয়াছেন—বায়ু হইতে, কেহ বলিয়াছেন—জল হইতে, পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল দার্শনিক অগ্নিকে, বায়ুকে বা জলকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন কিনা, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে। কিন্তু তাঁহাদের নির্দ্দেশ ক্রমে অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশে দেবতার আসন প্রাপ্ত ও পূজার্হ হইয়াছেন, তাহা স্বতঃই মনে আসিতে পারে। প্রাচীন গ্রীসে ও মিশরে নানা দেব-দেবীর উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সেই সকল দেব-দেবীর উপাসনার প্রভাবই দার্শনিক-মত-সমূহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, অথবা দার্শনিক-মত-সমূহ হইতেই কোনও কোনও দেবদেবীর উপাসনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এমনও বলা যাইতে পারে। কল্পনার বা বিতর্কের কথা পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দুই একটী তথ্যের অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। অগ্নি-দেবের উপাসনা বেদে বিহিত আছে। ইরাণীয়-গণের অগ্নিপূজা সর্ব্বজন-বিদিত। আর সে অগ্নি-পূজায় তাঁহারা যে হিন্দুদিগেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনমতে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অগ্নি যে ঈশ্বরের রূপ,—ইহুদী-গণের এবং খৃষ্টান-গণের ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও তাহা উক্ত হইয়াছে। ওল্ড-টেষ্টামেন্টের 'এক্সোডাস' অংশে লিখিত আছে,—'ঈশ্বর মোজেসকে বলিতেছেন, দেখ, ঘন-মেঘের মধ্যে আমি তোমাদের সম্মুখে আসিয়াছি; কেন-না, তাহা হইলে, আমি যাহা বলিব, সকলে শুনিতে পাইবে এবং তোমাকে চিরদিনের জন্য বিশ্বাস করিবে। তখন মোজেস জনসাধারণের বক্তব্য ঈশ্বরকে জানাইলেন। তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত আরম্ভ হইল, সিনাই পর্ব্বতে ঘনমেঘ সঞ্চিত হইয়া আসিল, গভীর নাদে ডঙ্কা-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইতে লাগিল, শিবিরস্থিত সমস্ত লোক সে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সিনাই পর্ব্বত তখন সম্পূর্ণরূপে ধূমে আচ্ছন্ন হইল। ঈশ্বর অগ্নিরূপে সেখানে অবতরণ করিলেন। কর্ম্মকারের ভস্ত্রা হইতে যেরূপ ধূম নির্গত হয়, তখন পর্ব্বত

একের ও বহুর উপাসনা।

হইতে সেই ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে পর্ব্বত ঘন ঘন কাঁপিতে আরম্ভ করিল। * অন্যত্র,—'ইসরাইলের অধিবাসিগণ দেখিল,—পর্ব্বতের শিখর-দেশে যেন সর্ব্বগ্রাসী অগ্নিরূপে প্রভুর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।' ডিউটারনমি গ্রন্থেও ঈশ্বরকে অনন্ত অগ্নি-রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। † জেন্দ-আভেস্তায় অহুর মজ্দের ঠিক এই বর্ণনাই দৃষ্ট হয়। তিনি অনন্ত-অনল-রূপে আবির্ভূত হইলেন—চতুস্ত্রিংশৎ যশ্নে তাহা লিখিত আছে। ইহুদী-দিগের মধ্যে এবং পরবর্ত্তি-কালে খৃষ্টানদিগের মধ্যে অগ্নিতে আহুতি-প্রদানের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সেই উপলক্ষে যে উৎসব হইত, তাহাকে 'পেণ্টিকষ্ট' ‡ (Pentecost) বলিত। ঈশ্বরকে অগ্নিজিহ্ব মনে করিয়া অগ্নি মধ্যে মেষশাবক, গম প্রভৃতি উৎসর্গ করা হইত। এখনও কোনও কোনও স্থানে এ প্রথার প্রচলন আছে। অগ্নিজিহ্ব মনে করিয়া ঈশ্বরের নিকট বলি-প্রদানের বিষয় এবং সিনাই পর্ব্বতে মোজেসের নিকট অগ্নি-রূপী ঈশ্বরের উক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া, থিওজফিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়া এইচ পি ব্লাভাস্কি পরস্পরের সাদৃশ্যের আলোচনায় বলিয়াছেন,—"যে সকল খৃষ্টান ঈশ্বরকে 'জীবন্ত অগ্নি' বলিয়া তাঁহার নিকট বলিপ্রদান করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে অগ্নিপূজক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?" § ফলতঃ, অগ্নির উপাসনা প্রকারান্তরে যে সকলের মধ্যেই প্রচলিত, তাহা নানারূপেই প্রতিপন্ন হয়। হিন্দু-শাস্ত্রে ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হন। ইহুদী-গণের, পারসিক-গণের এবং মুসলমান-গণের ধর্ম্মমতেও তিন জন বিশিষ্ট স্বর্গীয় দূতের উপর ঐ তিন কার্য্যের ভার অর্পিত আছে। পারসিক-গণের মতে—গেব্রিল, দেহে প্রাণ বা আত্মা দান করেন। গেব্রিল তাঁহাদের নিকট সরুশ বা রেভান বক্স নামেও অভিহিত। শেষোক্ত শব্দের অর্থ জীবনদাতা। মোরদাদ মৃত্যুর অধিপতি। বেশ্তার মনুষ্যদিগের রক্ষাকর্ত্তা ও পালন-কর্ত্তা; তিনি মনুষ্যদিগের খাদ্য-সরবরাহ করেন। ইহুদী গণের মধ্যেও ঐরূপ তিন কর্ত্তার তিন নাম দেখিতে পাই। গেব্রিল প্রাণ-দাতা, মাইকেল রক্ষাকর্ত্তা এবং ডুমা সংহারকর্ত্তা। মুসলমান-গণের গেব্রিল ও মাইকেল যথাক্রমে প্রথমোক্ত দুই কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহাদের মতে, আজ্রেল শরীর হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। যে হিসাবে আজ্রেলকেই সংহার-কর্ত্তা বলা হইয়া থাকে।

---

* "And Mount Sinai was altogether in a smoke, because the Lord descended upon it in fire"—*Exodus*, XIX. "And the appearance of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the Mount in the eyes of the children of Israel."—*Exodus*, XIX. 16-18.

† "For the Lord thy God is a devouring fire"—*Deuteronomy*, IV 24.

‡ এই উৎসব এক সপ্তাহ ধরিয়া চলিত। হিব্রুগণ, উহাকে 'সপ্তাহ-ব্যাপী উৎসব' (Feast of Weeks) বলিতেন। নূতন গম উৎপন্ন হইলে, সেই গম অগ্রে এই উৎসবে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তদ্ভিন্ন সেই বর্ষে জাত সাতটী মেষশাবক, দুইটী ভেড়া, একটী গো-বৎস সেই সময়ে অগ্নিতে আহুতি রূপে প্রদান করা হইত। দুইটী মেষ-শাবককে শান্তি-কামনায় এবং একটী ছাগকে পাপ-মুক্তির উদ্দেশ্যে অগ্নিতে তাঁহারা আহুতি দিতেন। দাসত্ব-মুক্ত হইয়া মিশর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পঞ্চাশ দিবস পরে সিনাই পর্ব্বতে ঈশ্বর মোজেসকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। সেই শুভ দিন স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বৎসরের উৎপন্ন প্রথম শস্য আহুতি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

§ *Vide*, H. P. Blavatsky, *Secret Doctrine*, Vol. I.

হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং সংহারকর্ত্তা শিব প্রভৃতির ছায়া পূর্ব্বোক্ত এঞ্জেল-গণের মধ্যে দেখিতে পাই না কি? জেন্দ-আভেস্তায় সাত জন অংশস্পন্দ (আমেস্পেন্তা) ঈশ্বরের বিবিধ শক্তির পরিচালনা করেন। বাইবেলের 'রিভিলেশন' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়েও সেইরূপ সাত জন 'এঞ্জেলের' পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায়। যে যে গুণের অধিকারী বলিয়া অংশস্পন্দ-দিগকে অভিহিত করা হইয়াছে, হিন্দু-শাস্ত্রে তত্তদ্‌গুণের অধিষ্ঠাতা দেব-দেবীর অসম্ভাব নাই। * এইরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একের সহিত অন্যের সাদৃশ্য প্রায় সর্ব্বত্র সকল বিষয়েই বিদ্যমান রহিয়াছে।

খৃষ্ট-ধর্ম্মান্তর্গত 'ট্রিনিটি' (Trinity) অর্থাৎ তিনের উপাসনা—একেশ্বর-বাদের বিপরীত-ভাবাত্মক নহে কি? অধুনা এই তত্ত্বকে খৃষ্টানগণ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে করেন বটে; কিন্তু বাইবেলের নানা স্থানে এ বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে 'ট্রিনিটি' শব্দে তিনের উপাসনার বিষয়ই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেই তিন,—পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা। † কাহাকেও খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়,—'সেই সর্ব্বমঙ্গলময় ঈশ্বর বলিয়াছেন, যাও, সকল দেশের সকল জাতিকে তাঁহার বিষয় শিক্ষা দাও এবং সেই স্বর্গীয় পিতার, তাঁহার পুত্রের ও তাঁহার পবিত্র আত্মার নামে সকলকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত কর।' ইশিয়া গ্রন্থের দুইটী অধ্যায়ে (৪৮।১৬ এবং ৩৪।১৬) যথাক্রমে লিখিত আছে,—'সেই প্রভু ঈশ্বর এবং তাঁহার আত্মা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; প্রভুর অনুমোদিত গ্রন্থে অনুসন্ধান কর এবং পড়িয়া দেখ; আমার মুখ হইতে তাঁহার আদেশ-বাণী বহির্গত হইয়াছে এবং তাঁহার আত্মা তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।' উদ্ধৃত অংশে প্রভু ঈশ্বর এবং আত্মার পার্থক্য বুঝা যাইতেছে; শেষোক্ত অংশে স্বর্গীয় তিন জনের বিষয় জানা যাইতেছে; যথা,—'বক্তা, প্রভু এবং প্রভুর আত্মা। 'ম্যাথু' গ্রন্থে (২৮.১৯) স্পষ্টতঃ লিখিত আছে, যীশু-খৃষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতেছেন,—'তোমরা যাও এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এই তিন নাম-গ্রহণে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য সকল জাতিকে উপদেশ দাও।' ‡ দ্বিতীয় 'কোরিন্থিয়ান্সে' (১৩।১৪) উক্ত হইয়াছে,—'প্রভু যীশু-খৃষ্টের দয়া, ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সম্মিলন তোমরা সকলেই লাভ করিতে পার।' এ সকল প্রমাণ-সত্ত্বে, তিনের প্রাধান্য—তিনের উপাসনার বিষয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। খৃষ্টান-গণ ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না; তবে কেহ কেহ বলেন,—'ঐ তিনে এক সত্য অনন্ত ঈশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে। তিনি

ট্রিনিটি, ত্রিমূর্ত্তি ও ত্রি-রত্ন।

---

* সাত জন অংশস্পন্দের নাম—'বহুমনঃ' অর্থাৎ সৎ অন্তঃকরণ, 'আশাবহিষ্ঠ' অর্থাৎ সততা, 'ক্ষত্রবৈর' অর্থাৎ ইহলৌকিক সুখের আধার, 'স্পেন্তা-আর্মৈতি' অর্থাৎ ভক্তি-প্রীতি, 'হৌরবাতাদ' অর্থাৎ স্বাস্থ্য, 'আমেতাৎ' অর্থাৎ অমরত্ব।

† "It (Trinity) daclares that there are three persons in the Godhead, or divine nature—the Father, the Son and the Holy Ghost.

‡ "Go, ye, therefore, and teach all nations, baptising them in the name of the Father, and of the Son and of the Holy Ghost."—*Mathew* III, 19. "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all"—*II. Corinthians*, XIII. 14.

বস্তুতঃ এক; যদিও ব্যক্তিগত গুণ-বিশেষণে তাঁহাকে তিন রূপে প্রকাশ করা হয়; তথাপি তাঁহার বিভূতি এবং শক্তি ও গৌরব সর্ব্বত্রই সমান।' রোমান-ক্যাথলিক-গণ বলেন,—'ঈশ্বরের পিতৃত্ব, পুত্রত্ব এবং আত্মত্ব—তিনই এক। তিনেই এক, একেই তিন।' এ বিষয়ে যতই বাদানুবাদ থাকুক, এই 'ট্রিনিটি'-তত্ত্বে তিনের উপাসনার বিষয় আপনিই মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকে। খৃষ্ট-ধর্ম্মে এইরূপে তিনের উপাসনার বিষয় আমরাই যে কল্পনা করিয়া লইতেছি, তাহা নহে; খৃষ্টান-গণ অনেকেই ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং একেশ্বর-বাদী বলিয়া পরিচিত হইলেও আজি পর্য্যন্ত অনেক খৃষ্টান এই তিনের উপাসনার বিষয় ভুলিতে পারেন নাই। খৃষ্টান-দিগের কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ট্রিনিটির' তিন জন উপাস্য যথাক্রমে ঈশ্বর, যীশু-খৃষ্ট এবং মেরী বলিয়াও পরিচিত আছেন। কোরাণের চতুর্থ ও পঞ্চম সুরায় হজরত মহম্মদ একেশ্বর উপাসনার প্রাধান্য কীর্ত্তন করিবার সময় বলিয়া গিয়াছেন,—'তিন ঈশ্বর আছেন, এ কথা বলিও না। মেরীর পুত্র যীশু খৃষ্ট ঈশ্বরের দূত মাত্র; তিনি কেবল ঈশ্বরের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।···যাহারা মেরীর পুত্র যীশু-খৃষ্টকে ঈশ্বর বলে, তাহারা অধর্ম্ম-পরায়ণ।' * এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, মুসলমান-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময় খৃষ্টান-গণ ঈশ্বর-রূপে তিনের উপাসনা করিতেন; আর হজরত মহম্মদ সেরূপ কার্য্যকে অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 'গোঁড়া' খৃষ্টান-গণ বিশ্বাস করেন,—'পিতৃত্ব, পুত্রত্ব ও আত্মত্ব—ঈশ্বরের এই তিন রূপ। পিতৃত্ব—সার বা মূল, পুত্রত্ব তাঁহার জ্ঞান এবং আত্মত্ব তাঁহার জীবন। একের উপাসনাতেই সেই তিনের উপাসনা সাধিত হয়।' আমাদিগের শাস্ত্র-গ্রন্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপাসনার আদেশ আছে; তাঁহারা যে তিনেই এক এবং একেই তিন, শাস্ত্র-গ্রন্থে ইহাও পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টানদিগের মধ্যে যদিও প্রকার-ভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তিনের উপাসনার প্রভাব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের উপাসনা হইতেই যে অন্যত্র বিস্তৃত হইয়াছে, আমরা নিঃসন্দেহে মনে করিতে পারি না কি? বৌদ্ধ-ধর্ম্মেও এই তিনের প্রভাবের বিষয় পরিলক্ষিত হয়। সেখানে এই তিনের নাম—ত্রিরত্ন। খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় খৃষ্টান-গণ যেমন পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার বিষয় মান্য করেন; বৌদ্ধগণও অভিষেকের সময় বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ নামক ত্রিরত্নের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। ত্রিরত্নের অর্থ সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। কেহ বলেন,—ত্রিরত্ন শব্দে সর্প, সূর্য্য এবং বৃক্ষ বুঝায়; কেহ বলেন,—বুদ্ধ শব্দে ঈশ্বর, ধর্ম্ম শব্দে বিধি এবং সঙ্ঘ শব্দে সম্মিলন বুঝাইয়া থাকে। শেষোক্ত মতাবলম্বীদিগের ব্যাখ্যা অনুসারে বুঝিতে পারা যায়,—ধর্ম্ম শব্দে তাঁহারা বুদ্ধ-কথিত পাঁচটী প্রধান নীতি বুঝিয়া থাকেন। সেই নীতি-পঞ্চক—(১) কাহারও জীবনহানি করিতে নাই, (২) চুরি করিতে নাই, (৩) পরদার-গ্রহণ করিতে নাই, (৪) মিথ্যা কথা কহিতে নাই, (৫) মদ্য, অহিফেন বা অন্য কোনও প্রকার মাদক-দ্রব্য সেবন করিতে নাই। সঙ্ঘ এবং বুদ্ধ শব্দ-দ্বয়েরও এইরূপ নানা

---

* "Say not, there are three Gods"—*Koran*, Surah. IV. "They are surely infidels who say, verily, God is Christ, the son of Mary"—Dr. Sale, *Koran*, Surah. V.

অর্থ করা হয়। যাহা হউক, বিচার দ্বারা যে অর্থই নিষ্পন্ন করা যাউক, অভিষেকের সময় এই তিনের প্রাধান্য মান্য করিবার বিষয় শিক্ষা দেওয়ায় উহার দ্বারা অদ্বৈত-ভাবের অন্তরায় ঘটিয়া থাকে, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। তার পর খৃষ্ট-ধর্ম্মে ট্রিনিটির বা তিনের প্রাধান্যের ভাব বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ত্রিরত্নের অনুসরণ বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। খৃষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। ইহুদী-দিগের মধ্যে 'এসিন' (Essenes) নামক একটী সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁহারা আপনাদের উপাসনাদি ক্রিয়া-কর্ম্মে বৌদ্ধগণের অনুসরণ করিতেন। 'ব্যাপ্‌টিজম্' অর্থাৎ খৃষ্ট-ধর্ম্মের দীক্ষা-গ্রহণ-সংক্রান্ত আচারাদি 'এসিন'-গণের নিকট হইতে জন (দি ব্যাপটিষ্ট) শিক্ষা করিয়াছিলেন। যুবক ধর্ম্ম-প্রচারক যীশু-খৃষ্ট যখন গ্যালিলিতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে-ছিলেন, জনের সুনাম তখন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত। যীশু খৃষ্ট অনেক দিন পর্য্যন্ত জনের সহিত একত্র বাস করেন। সেই সময় যীশু-খৃষ্ট জনের নিকট হইতে বহু নীতি এবং দীক্ষা-সংক্রান্ত রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কারণে বৌদ্ধ-গণের 'অভিষেকের' সহিত খ্রীষ্টানগণের 'ব্যাপটিজ্‌মের' বহু সাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে। ফলতঃ, ভারতবর্ষের হিন্দু-জাতির প্রভাব অন্যত্র রূপান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল বিষয়ের আলোচনায় তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

সকল ধর্ম্মের সার-শিক্ষা।

সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরই সার-শিক্ষা এক। সত্যের সমাদর সম্বন্ধে—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান—সকলেই একমত। মিথ্যাকে সকল সম্প্রদায়ই ঘৃণা করিয়া থাকেন। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে যে দশটী আদেশের বিষয় প্রচারিত আছে, সকল দেশের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সেই দশ আদেশ কোন-না-কোনও আকারে বিদ্যমান আছে। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম মতে ঈশ্বর বলিয়াছেন'—(১) পিতা-মাতাকে সম্মান করিও; (২) কাহাকেও হত্যা করিও না; (৩) পরদার-গ্রহণ করিও না; (৪) চুরি করিও না; (৫) প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না; (৬) প্রতিবাসীর গৃহ, স্ত্রী, পশ্বাদি, চাকর-চাকরাণী বা অন্য কোনও সামগ্রীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি সঞ্চালন করিও না; (৭) আমি ভিন্ন তোমাদের দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই; (৮) বৃথা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিও না; (৯) প্রতিমা পূজা করিও না; (১০) পবিত্র কার্য্যের জন্য একটী দিন নির্দ্দিষ্ট রাখিও।' মোজেসকে ঈশ্বর এই দশ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্সোডাসে * এবং বাইবেলের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এই দশ আদেশের বিষয় যাহা লিখিত আছে, পৃথিবীর কোন্ ধর্ম্মে এ সকল নীতি দেখিতে পাই না? বুদ্ধদেবোক্ত 'দশ-শীল' এবং 'পঞ্চ-শীল' প্রভৃতিতেও এই সকল কথাই লিখিত আছে। তদুক্ত পঞ্চ-শীল বা পঞ্চাদেশ সাধারণ লোকের সম্বন্ধে এবং দশ-শীল বা দশাদেশ ভিক্ষুদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত। সেই পঞ্চ-শীল যথা,—(১) কোনও জীবিত প্রাণীকে হত্যা করিও না; (২) যাহা দেওয়া হয় নাই, তাহা লইও না; (৩) মিথ্যা কথা কহিও না; (৪) মাদক-দ্রব্য সেবন করিও না; (৫) পরদার গ্রহণ করিও না। সাধারণের জন্য এই পঞ্চ-শীল বা পঞ্চাদেশ বিহিত

* *Exodus*, Ch. xx. 3—17.

ছিল। এতদ্ভিন্ন ভিক্ষুদিগের জন্য বুদ্ধদেব অপর পাঁচটী শীল বা আজ্ঞা প্রচার করেন। সেই পাঁচটী শীল,—"(১) দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে আহার করিবে; (২) নাট্য, ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি বিষয়ে বিরত থাকিবে; (৩) অলঙ্কারাদি ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিও না; (৪) সুখসেব্য কোমল শয্যায় শয়ন করিও না; (৫) মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য কি অন্য কোনও ধাতু গ্রহণ করিও না।" পিতা মাতার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনের বিষয় যদিও পঞ্চ-শীলের মধ্যে উল্লেখ নাই; কিন্তু অন্যত্র সে আদেশ বুদ্ধদেব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 'চুল্লবগ্‌গ্' সূক্তে পিতা-পুত্রের, স্বামী-স্ত্রীর, শিক্ষক-ছাত্রের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে। সেখানে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে,—'প্রত্যেক পুত্র পিতামাতার প্রতি যথা-কর্ত্তব্য পালন করিয়া, তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সম্মানার্হ জীবিকা গ্রহণ করিবে। যে সকল গৃহস্থ পিতামাতার প্রতি ভক্তি করে, তাহারা স্বয়ম্ভু-পদ প্রাপ্ত হয়।' সূত্র-পিটকের অন্তর্গত 'অঙ্গুত্তর-নিকায়' অংশে বুদ্ধদেবের উক্তিতে পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের 'সমচিত্তবগ্‌গ' নামক অধ্যায়ে বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—'হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে দুইটী ঋণ অপরিশোধনীয়;—পিতার ঋণ এবং মাতার ঋণ। সন্তান-পালনে পিতামাতা যাহা করিয়াছেন, সন্তান যতই যাহা করুন না কেন, তাঁহাদের সে ঋণ কিছুতেই পরিশোধ হইতে পারে না।' * এবম্বিধ উক্তি—কোন্ দেশের কোন্ ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নাই? পিতামাতার প্রতি কিরূপ-ভাবে ভক্তি করা উচিত, হিন্দু-শাস্ত্রে তাহার শ্রেষ্ঠ-উপদেশ দেখিতে পাই। "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥" পিতৃমাতৃ ভক্তি সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কি হইতে পারে? যাঁহাদের নিকট পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপ; পিতৃ প্রীতিতে সকল দেবতা তৃপ্ত হন বলিয়া যাঁহাদের শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন,—পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি সংক্রান্ত অন্য সকল আদর্শই তাঁহাদের নিকট পরিম্লান নহে কি? ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে, গণপতি খণ্ডের চত্বারিংশ অধ্যায়ে, লিখিত আছে,—'মান্যঃ পূজ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বেষাং জনকো ভবেৎ।" এতদুক্তিতে পিতা-মাতা উভয়েই মান্য ও পূজ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। উক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেই প্রকৃতিখণ্ডে, একোনপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—'যাঁহারা ভক্তিহীন হইয়া পিতামাতাকে পালন করেন, তাঁহাদের নরকবাস হইয়া থাকে।' সকল শাস্ত্রেই এ সকল বিষয় লিখিত রহিয়াছে। সুতরাং এতদ্বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মিথ্যা-কথনে,

---

* বৌদ্ধ-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিপিটক তিন ভাগে বিভক্ত;—সূত্র-পিটক, বিনয়-পিটক ও অভিধর্ম্ম-পিটক। চুল্লবগ্‌গ—বিনয়-পিটকের অন্তর্গত; অঙ্গুত্তর-নিকায়—সূত্র-পিটকের অন্তর্ভুক্ত। পিটক মাত্রই বুদ্ধদেবের উক্তি। অঙ্গুত্তর-নিকায় গ্রন্থ ইংলণ্ডের ভাষাবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি ডক্টর রিচার্ড মরিস (Dr. Richard Morris, M.A., L.L.D) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রোমান অক্ষরে প্রকাশ করেন। ৩৮৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মনন্দী কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ চীনা-ভাষায় অনুবাদিত হয়। চীনা-দিগের ভাষায় উহা 'একত্তরাগম' নামে অভিহিত। বঙ্গ-ভাষায় এই গ্রন্থের প্রথম পরিচয় দিয়াছেন,—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম-এ, পি-এইচ-ডি, মহাশয়।

পরদার-গ্রহণে ও চৌর-কার্য্যে কি পাপ হয় এবং তজ্জন্য কি দণ্ড ভোগ করিতে হয়, যে কোনও সংহিতায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাইবেন। শাস্ত্রে যে দশবিধ পাতকের কথা লিখিত আছে, তাহার মধ্যেই এ সকল বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। শাস্ত্রোক্ত দশবিধ পাতক,—"কায়বাঙ্মনঃ কৃতানি দশবিধ পাপানি যথা—অদত্তানামুপাদানং হিংসাচৈবাবিধানতঃ। পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্। পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ। অসংবদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্। পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্। বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্।" এই দশবিধ পাতকের মধ্যেই যীশুখ্রীষ্টের দশাজ্ঞার বা বুদ্ধদেবের দশবিধ শীলের মূল তথ্য অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় কি না, অনায়াসেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনেকে মনে করেন, 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম',—এই নীতি বুদ্ধ-দেবই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কত পূর্ব্বে আমাদের সনাতন শাস্ত্র-গ্রন্থে 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। আমাদের স্মৃতি-শাস্ত্রে অহিংসা পরম ধর্ম্মের বিষয়ে পুনঃপুনঃ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এ বিষয়ের একটী চরম দৃষ্টান্ত—মনুসংহিতা (৩য় অ, ৬৮ম ৭১ম শ্লোক) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। মনু বলিয়াছেন,—"গৃহস্থের পাঁচটী সূনা অর্থাৎ প্রাণি-বধস্থান আছে;—যথা চুল্লী (উনন), পেষণী (যাঁতা বা শিল-নোড়া), উপস্কর (ঝাঁটা), কণ্ডনী (উদূখল-মুসল) এবং উদকুম্ভ বা জলাধার সকল। এই পাঁচটীকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে প্রাণিহিংসা হয়। সেই চুল্লী প্রভৃতি বধস্থান দ্বারা যে পাপ উৎপন্ন হয়, সেই পাপ-সমুদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মহর্ষিগণ গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনের নাম ব্রহ্ম-যজ্ঞ, অন্নাদি বা উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃ-যজ্ঞ, হোমের নাম দৈব-যজ্ঞ, পশুপক্ষ্যাদিকে অন্নাদি প্রদানরূপ বলির নাম ভূত-যজ্ঞ এবং অতিথি-সেবার নাম মনুষ্য যজ্ঞ বলে। শক্তি থাকিতে যে গৃহস্থ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ এক দিনও পরিত্যাগ করিবেন, তিনি পঞ্চ-সূনা পাপে লিপ্ত হইবেন।" অহিংসা পরম ধর্ম্ম বিষয়ে ইহার অধিক শিক্ষা আর কি হইতে পারে? হিন্দু-শাস্ত্র মতে কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট চিন্তা করার নাম—হিংসা। শাস্ত্র পুনঃপুনঃ হিংসা-কার্য্যে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্রেও অহিংসার উপযোগিতার বিষয় উল্লিখিত আছে। পাতঞ্জল দর্শন বলিয়াছেন,—"অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ।" যোগে যে পঞ্চ-ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, তাহা,—অহিংসা, সত্যপালন, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহ। অর্থাৎ,—অহিংসাদি পরিত্যাগ না করিলে, যোগাঙ্গ পঞ্চ যম অধিগত হয় না। মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়ে এবং পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ে বৃহস্পতি এবং ভীষ্ম যথাক্রমে যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ দিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা বিশেষরূপে উল্লেখ করিতে পারি। শেষোক্ত অধ্যায়ে ভীষ্ম বলিয়াছেন,—'অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অহিংসাই পরম তপস্যা, অহিংসাই পরম সত্য, যাহা হইতে সত্য প্রবৃত্ত হয়।' অন্তরের বিশুদ্ধতা-সাধন যে মোক্ষ-লাভের মূল, সকল দেশের সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রই এ কথা একবাক্যে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই

উপদেশ আছে,—'অন্তর বিশুদ্ধ কর।' কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রে না এ উপদেশ দেখিতে পাই? আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থে ধর্ম্মের যে সকল লক্ষণের বিষয় লিখিত আছে, তাহার মধ্যে সকল ধর্ম্মের সকল ভাবই পরিস্ফুট। মনু (মনু-সংহিতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৯২ম শ্লোক) বলিয়াছেন,— "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥" 'ধৃতি (ধৈর্য্য অর্থাৎ প্রলোভনাদিতে মনের চঞ্চলতা না হওয়া), ক্ষমা (শক্তি সত্ত্বে অপকারীর প্রত্যপকার না করা), দম (বিষয়-সংসর্গেও মনের অবিকার, মনঃসংযম), অস্তেয় (পরধনহরণ না করা), শৌচ (বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধি করা), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-গণকে প্রতিনিবৃত্ত করা), ধী (প্রতিপক্ষ সংশয়াদি সম্যক নিরাকরণ পূর্ব্বক জ্ঞানলাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যায় সত্যবাক্যে ও কার্য্যে সত্যের অনুসরণ করা), সত্য এবং অক্রোধ (ক্রোধ না করা)—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। এই দশ গুণের অধিকারী হইলেই মানুষ ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে।' ধর্ম্মের এই দশবিধ লক্ষণের অনুসরণে বুদ্ধদেবের দশ-শীল এবং যীশু-খ্রীষ্টের দশ-আজ্ঞা প্রচারিত হওয়ার ভাব মনে আসিতে পারে না কি? শাস্ত্র-গ্রন্থে ধর্ম্মের আরও কতকগুলি লক্ষণ লিখিত আছে। পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ডে, ধর্ম্মের দশবিধ অঙ্গের বিষয় উক্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ডে, পিতামাতার পূজা—'মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্'—ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত আছে। "অহিংসা লক্ষণোধর্ম্মো হিংসা চাধর্ম্মলক্ষণম্"—শাস্ত্রের নানা স্থানেই এতদুক্তি দৃষ্ট হয়।* যে সকল উপদেশ হিন্দু-শাস্ত্রের সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান, বৌদ্ধগণও পুনঃপুনঃ সেই সকল উপদেশ দিয়াছেন; খ্রীষ্টান-গণের ও মুসলমান-গণের ধর্ম্মশাস্ত্রেও সেই উপদেশ দেখিতে পাই। সংসারে যত কিছু নীতি-বাক্য প্রচলিত আছে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই তাহার উপদেশ দিয়া থাকেন। এ সকল বিষয় সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং এ বিষয়ে, একের সহিত অন্যের সাদৃশ্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

সাদৃশ্য-বিষয়ে বিবিধ বক্তব্য।

বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও কত প্রকারের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঈশ্বরের উপাসনার প্রথা আছে। প্রার্থনার বাক্যাদি, অঙ্গ-ভঙ্গী, প্রার্থনার পূর্ব্বে বা পরে দানাদি এবং উপবাস প্রভৃতি পদ্ধতি প্রায় সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই কোন-না-কোনও প্রকারে প্রচলিত রহিয়াছে। ইহুদী-দিগের, খৃষ্টান-দিগের, মুসলমান-দিগের পদ্ধতি-সমূহে ঐ সকল বিষয়ের কিরূপ সাদৃশ্য আছে, কোরাণের ভূমিকায় ডক্টর সেল তাহা বিশেষ-রূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ 'ধর্ম্মের আদি' সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।† তাঁহাদের গ্রন্থের অনেক সাহায্যই এই সকল বিষয়ের আলোচনায় গৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরের উপাসনার সময় জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মাবলম্বিগণ অঙ্গ-সঞ্চালনাদি সম্বন্ধে নিম্নরূপ নিয়ম প্রতিপালন করেন।

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস," দ্বিতীয় খণ্ড, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়' শীর্ষক পরিচ্ছেদের ৪৪৬ম-৪৪৭ম পৃষ্ঠায় এ সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

† Vide, *The Fountain Head of Religion* by Ganga Prosad. M. A., M. R. A. S.

প্রার্থনার সময় একজন বিজ্ঞ এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান হন। অন্যান্য সকলে তাঁহার পশ্চাতে শ্রেণিবদ্ধ-রূপে দাঁড়াইয়া থাকেন। প্রথমে তাঁহারা যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিয়া একবার মস্তক নত করেন, পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন; পুনরায় সরলভাবে দণ্ডায়মান হন। এইরূপ-ভাবে মস্তক অবনত করায়, দণ্ডায়মান হওয়ায় এবং অঙ্গ-সঞ্চালনাদির প্রথা মুসলমান-দিগের মধ্যেও আছে, খৃষ্টান-দিগের মধ্যেও আছে, ইহুদীদিগের মধ্যেও আছে। হিন্দুর মধ্যেও এবংবিধ প্রথার অসদ্ভাব নাই। মুসলমানগণ কাবার (মক্কার) দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ইহুদী-গণ জেরুজিলামের দিকে মুখ ফিরাইয়া উপাসনা করেন। বেদীর অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া উপাসনার প্রথা অনেকের মধ্যেই প্রচলিত আছে। হিন্দু-গণ প্রধানতঃ পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া পূজা-উপাসনা জপ-হোমাদি করিয়া থাকেন। ফলতঃ, কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রার্থনার প্রথা প্রায় সকলের মধ্যেই প্রচলিত আছে। উপাসনার পূর্ব্বে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি প্রক্ষালনের প্রথা পারসিক, ইহুদী, মুসলমান—সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। জল অভাবে ধূলা-বালি দ্বারাও তাঁহারা সময় সময় ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপবাসের সময় পানাহার-ত্যাগ এবং স্ত্রী-সংসর্গ-বর্জ্জন পূর্ব্বোক্ত প্রায় সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। তীর্থ-যাত্রায় বা তীর্থস্থান-দর্শনে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐকান্তিক অনুরাগ দেখিতে পাই। মক্কা, জেরুজিলাম প্রভৃতি তীর্থস্থানে কত সময় কত যাত্রীর সমাবেশ হয়, কে না তাহা অবগত আছেন? দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, কুসীদ-গ্রহণ—মুসলমান-ধর্ম্মে, খৃষ্ট-ধর্ম্মে, জোরওয়াষ্ট্রীয়ান-ধর্ম্মে, ইহুদী-দিগের ধর্ম্মে—প্রায় সকল ধর্ম্মেই নিষিদ্ধ আছে। হিন্দু-ধর্ম্মেও সেরূপ নিষেধের অসদ্ভাব নাই। নিতান্ত বিপদের সময় দ্বিজাতিগণ কুসীদ গ্রহণ করিতে পারেন বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ পিতৃলোকের, দেবলোকের ও ব্রাহ্মণগণের সেবায় ব্যয় করিতে হইবে। শাস্ত্র-বিহিত নিয়মের অতিরিক্ত কুসীদ গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয়। কুসীদ-গ্রহণ-সংক্রান্ত বিধি ও তাহার লঙ্ঘন-জনিত পাপাদির বিষয় বৃহস্পতি-সংহিতায় এবং মনুসংহিতায় লিখিত আছে। সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে বিশেষ উপাসনার প্রথা অনেকেরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহুদী-গণ শনিবারকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন; খৃষ্টান-গণের নিকট রবিবার, মুসলমান-গণের নিকট শুক্রবার বিশেষ উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট। তিথি-নক্ষত্রাদি অনুসারে হিন্দু-শাস্ত্রে বিবিধ উপাসনার দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সাপ্তাহিক উপাসনা তাহারই অনুসরণ বলিয়া মনে হইতে পারে। কোরাণের একটী প্রধান সূত্র—'লা-এলা-ইল্লিল্লা', অর্থাৎ,—সেই ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। জোরওয়াষ্টিয়ান ধর্ম্মেও ঐরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়;—'নেস্তেযাদ্ মগর যাজ্দান।' হিন্দু-শাস্ত্রেও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাণী বিঘোষিত রহিয়াছে। কোরাণের প্রতি অধ্যায়ের (নবম অধ্যায় ভিন্ন) প্রারম্ভে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে;—'বিস্মিল্লা উর্ রহমন্ এ রহিম'; অর্থাৎ—'পরম-দয়াবান্ ঈশ্বরের নামে' ইত্যাদি। জোরওয়াষ্ট্রীয়ান-গণের গ্রন্থ-মধ্যেও ঐরূপ একটী বাক্য দৃষ্ট হয়। সে বাক্য,—'বানাম যাজ্দ্ বাক্সিশ গার দাদর।' অর্থ উভয়েরই এক।

হিন্দুদিগের মধ্যেও এতদ্বিষয় পরিদৃষ্ট হয়। পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রারম্ভে "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্" প্রভৃতি উক্তি আছে। মঙ্গলাচরণ করিয়া হিন্দু-গণের গ্রন্থারম্ভের অনুসরণেই বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথার প্রবর্ত্তনা হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ দেখিতে গেলে আরও কত বিষয়েই একের সহিত অন্যের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ফলতঃ, একই ভাব, একই পদ্ধতি—রূপান্তরে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রবর্ত্তিত হইতেছে; পরস্পরের সাদৃশ্য-তত্ত্বের আলোচনায় তাহাই প্রতীত হইয়া থাকে। আবার, সেই একের আদি যে এই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, তাহাও নানারূপেই প্রতিপন্ন হয়।

পাশ্চাত্য-মতে হিন্দু-ধর্ম্মের মৌলিকত্ব।

যাঁহারা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের মৌলিকত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'থিওজফিকাল সোসাইটীর' প্রাণ-স্থানীয়া বিবি এনি বেসান্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ শাস্ত্র-তত্ত্ব তুলনায় সমালোচনা করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—'ভারতবর্ষই সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান। বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের মিলন ভারতবর্ষেই প্রথম সংসাধিত হইয়াছে। সেই ধর্ম্মই হিন্দু-ধর্ম্ম। ভবিষ্যতেও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দানে ভারতবর্ষই জগতের মাতৃ-স্থান অধিকার করিবে।' * অতি প্রাচীন-কালে হিন্দুগণের প্রভাব পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, ধর্ম্মের বীজ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল; তার পর, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। প্রধানতঃ এই দুই সময়েই, ভারতের ধর্ম্ম পৃথিবীর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ভারতীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা প্রতীত হয়। সেই আলোচনায় কাউণ্ট জোরণস্-জারণা একে একে দেখাইয়াছেন,—'সকল দেশের প্রাচীন জাতিই ধর্ম্ম-বিষয়ে ভারতবর্ষের নিকট ঋণী।' তিনি বলিয়াছেন,—'বাবিলনের ও কোলচিসের অধিবাসীরা ধর্ম্ম ও সভ্যতা ভারতবর্ষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরামের সামারিটান-গণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। প্যালেস্তাইনের এসিনগণকেও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-মতাবলম্বী বলিয়া বুঝা যায়। যদিও তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে মোজেস-প্রবর্ত্তিত বিধি-বিধান মান্য করিতেন, কিন্তু অপ্রকাশ্যভাবে তাঁহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুশাসনই মানিয়া চলিতেন। নষ্টিক † সম্প্রদায়ভুক্ত এসিয়ার অধিবাসিগণ খৃষ্ট-ধর্ম্মের লৌকিক আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিলেও, প্রকৃত-পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের শাস্ত্র-বাক্য অনুসারে, বুদ্ধদেবই যীশুখৃষ্ট রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—ইহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন।... প্রাচীন ব্রিটেনের ড্রুইড-গণও বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন। জন্মান্তর-গ্রহণ, আত্মার আদি-সত্ত্বা এবং বিশ্বের লয় প্রভৃতি তত্ত্ব তাঁহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শিক্ষা হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারা ত্রি-মূর্ত্তির বা তিনের (অর্থাৎ—সৃষ্টি-কর্ত্তার, পালন-কর্ত্তার ও

* "India is the mother of religion. In her are combined science and religion in perfect harmony and that is the Hindu religion, and it is India that shall again be the spiritual mother of the world."—Mrs. Annie Besant, *Lectures*.

† "Gnostics are one of a sect that arose in the first ages of Christianity who pretended to be the only men who had a true knowledge of Christiau religion and professed a system of doctriues based partiy on Christianity, partly on Greek and Oriental philosophy."

ধ্বংস-কর্ত্তার) প্রভাবের বিষয় স্বীকার করিতেন। ড্রুইড-গণ পবিত্র পুরোহিত সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব একমাত্র তাঁহাদেরই অধিগত ছিল,—ইহাই সাধারণতঃ প্রচারিত হইত।...বৌদ্ধ-গণ আজি পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের পদ-চিহ্ন পূজা করেন। সেই পদ-চিহ্নের নাম—প্রভাত। পর্ব্বত-গাত্রে সেই পদ-চিহ্ন খোদিত। নানা স্থানের যাত্রিগণ পদচিহ্নাঙ্কিত পর্ব্বতে গিয়া বুদ্ধদেবের উপাসনা করিতেন। এখনও পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন দেখিয়া বৌদ্ধ-গণ যেরূপ ভক্তি ও আনন্দ প্রকাশ করেন, মোজেস প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মোপদেশের মধ্যে রামধনুর প্রতি সেইরূপ সম্মান-প্রদর্শনের বিষয় লিখিত আছে। মোজেসের মতে,—রামধনু-দর্শনে জলপ্লাবনের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। প্রাচ্য-দেশের ছয়টী স্থানে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বোক্তরূপ পদ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মক্কানগরে ঐরূপ ছয়টি পদ-চিহ্ন আছে। ইসলাম-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মক্কা যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের তীর্থস্থান ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়।...নীল-নদীর উভয় তীরে, মিশর-দেশে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। হারমেজ-লিখিত মিশরীয়-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থে হারমেজের সহিত পোদ্, বোধ বা বুদ্ধের কথোপকথন-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নীতিই প্রচারিত রহিয়াছে। সেই গ্রন্থে আত্মার আদি সত্ত্বা, জন্মান্তর-গ্রহণ, মুক্তি প্রভৃতি বিষয় লিখিত আছে।... স্কান্দেনেভিয়ার অধিবাসিগণের 'এদ'—বেদের অনুকৃতি। বেদোক্ত বহু তত্ত্ব তন্মধ্যে স্থান পাইয়াছে। প্রজাপতির নামানুসারে হিন্দু-গণ পতঙ্গ-প্রজাপতির প্রতি শ্রদ্ধাবান। মিশর-বাসীরাও ঐ জাতীয় পতঙ্গের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্কান্দেনেভিয়াতেও পূর্ব্বোক্ত পতঙ্গের পবিত্রতার বিষয় প্রচারিত আছে। সেখানে ঐ পতঙ্গ 'থর' দেবতা নামে পরিচিত। এদ-গ্রন্থের মিদগার্দ নামক সর্প—বিষ্ণুর অনন্ত-নাগের অনুকৃতি ; উভয়েই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। দেব-সেনাপতি স্কন্দের নামানুসারে স্কান্দেনেভিয়ার নামকরণ হওয়া সম্ভবপর। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া মনে হয়, মহাভারতের রচনার পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে হিন্দুগণ স্কান্দেনেভিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।' প্রাচীন মিশরে ভারতবর্ষের হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাব যে পূর্ণরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল, জোরণস্ জারণা তাহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'একেশ্বরের ও বহু ঈশ্বরের উপাসনা উভয়ত্রই প্রচলিত ছিল। একে তিন এবং তিনে এক—ত্রিমূর্ত্তি-তত্ত্ব উভয় দেশেই অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতির ন্যায় জাতিভেদ, প্রাচীন মিশরেও বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে গঙ্গার উভয়-তীরে যেরূপ শিবমন্দির-সমূহ দৃষ্ট হয়, মিশরে নীল-নদীর উভয় তীরে তাহার অনুসরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতে যেমন শিবমন্দিরে লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাই, মিশরে আমন-দেবের মন্দিরে সেইরূপ 'ফালস' বা লিঙ্গমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। উভয় দেশেই পদ্ম-পুষ্পের দ্বারা সূর্য্যের প্রতিকৃতিতে এবং আত্মার অবিনশ্বরত্ব-জ্ঞাপক চিহ্নে সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ভারতবাসীর বিশ্বাস,—শিবের অনুকম্পায় বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। মিশরের আমন-দেবের মন্দিরে গিয়াও বন্ধ্যা-নারীগণ পুত্র-কামনায় আমনের আরাধনা করিত। আরব-মরুভূমে বিচরণকারী বেদুইন

স্ত্রীলোকেরা আজি পর্য্যন্ত আমন-দেবের মন্দিরে গমন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। মিশর-বাসীর সর্ব্বপ্রধান দেবতা—আমন। আমন শব্দ হিন্দুগণের ওঁম শব্দেরই রূপান্তর। মিশর-দেশ জয় করিবার সময় মহাবীর আলেকজাণ্ডার তত্রত্য শিবের মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। হেরোডোটাস, প্লেটো, সোলন, পীথাগোরাস এবং ফিলাষ্ট্রেটস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—ভারতবর্ষ হইতেই মিশরের ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। জোসেফাস, জুলিয়স আফ্রিকেনাস এবং ইউসেবিয়স পূর্ব্বোক্ত মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।··· এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয়, হিন্দু-ধর্ম্মই সকল দেশের সকল ধর্ম্মের আদি। মিশরের সভ্যতাকে অতি প্রাচীন-কালের সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করিলেও, ভারতবর্ষই যে সে সভ্যতার মূল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কোথাও প্রাচীন-কালে হিন্দু-ধর্ম্মের, কোথাও বা আধুনিক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই স্মৃতি এখনও সর্ব্বত্র বিগ্নমান রহিয়াছে।' প্রাচীন মিশরের, গ্রীসের ও আসিরীয়ার পৌরাণিক কাহিনী আলোচনা করিলে তৎসমুদায় যে হিন্দুদিগের পুরাণাদির অনুসরণ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায়। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন,—'বেদানুসারী পৌরাণিক কাহিনী হইতে হোমারের কবিতা-সমূহের উদ্ভব হইয়াছে। বেদ ভিন্ন পুরাণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিথিল হইত ও কল্পনায় পর্য্যবসিত থাকিত।' * এক দিকে যেমন প্রতীচ্য দেশে, অন্য দিকে তেমনি সুদূর প্রাচ্যে—ভারতবর্ষের ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এক দিকে যেমন দেখিলাম,—গ্রীসে, মিশরে, স্কান্দেনেভিয়ায়, ব্রিটেনে ভারতেব ধর্ম্ম প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল; অন্য দিকে তেমনি চীনে, জাপানে, শ্যামে, ব্রহ্মে, যব-দ্বীপে, বলী-দ্বীপে ভারতের ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুদূর আমেরিকায়ও যে ভারতীয় হিন্দু-ধর্ম্ম আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। † চীনের সহিত ভারতের স্মরণাতীত-কালের সম্বন্ধ। অতি প্রাচীন-কালে যে সকল জাতি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং শাস্ত্রে যাহারা পতিত জাতি বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহাদের মধ্যে চীনাদিগের নাম ('পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ'—মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৪৪শ শ্লোক) দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়-কালে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ চীনে গমন করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। খৃষ্ট-জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চীন-সম্রাট বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সমূহ এদেশ হইতে চীনে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে সেই সকল গ্রন্থের নীতি-কথা চীনে প্রচারিত হইয়াছিল। ৬২ খৃষ্টাব্দে চীনের আর এক সম্রাট বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ-সমূহ চীনে লইয়া গিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এ সকল কথা লিখিত আছে। কাউণ্ট জোরণস-জারণার উক্তি হইতে আমরা বুঝিয়াছি,—খৃষ্ট-ধর্ম্মের উপর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। বুদ্ধের এবং খৃষ্টের জীবন-চরিত আলোচনা

* "The poetry of Homer is founded on the mythology of the Vedas."—Max Muller, *Chips from a German Workshop*, Vol. III.

† "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, ১ম ও ৩১শ অধ্যায়ে আমেরিকার ও ভারতের সম্বন্ধ দ্রষ্টব্য।

করিলেও এ তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। ঐ দুই মহাপুরুষের জীবন-কাহিনীর সাদৃশ্যের অন্ত নাই। সে সাদৃশ্যের বিষয় আলোচনা করিলে, একে অন্যের ছায়াপাত হইয়াছে, বেশ বুঝা যায়। যীশু-খৃষ্টের জন্ম-কালে আকাশে এক অভিনব তারকার উদয় হইয়াছিল; বুদ্ধদেবের জন্ম-সময়ে পুষ্যা নক্ষত্রের উদয় হয়। জনৈক সাধু-পুরুষ যীশু-খৃষ্টের জন্ম-দিবসে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভবিষ্য-জীবনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়া গিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্মের সময়েও একজন সাধুপুরুষ আসিয়া তাঁহার পিতা-মাতাকে সন্তানের শুভ-লক্ষণের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ও যীশু-খৃষ্ট উভয়েই অমানুষিক কার্য্য-পরম্পরা সম্পন্ন করেন। অন্ধের দর্শন-শক্তি-লাভ, বধিরের শ্রবণ-শক্তি-প্রাপ্তি, মূকের বাক্‌পটুতা,—বুদ্ধের ও খৃষ্টের প্রভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। গৌতম-বুদ্ধের বার জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। যীশু খৃষ্টেরও বার জন প্রধান শিষ্য। অভিষেক প্রথা—উভয়ের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বুদ্ধের এবং যীশু-খৃষ্টের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মোপদেশ বা নীতি-বিষয়ে সাদৃশ্যের অন্ত নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত খৃষ্ট-ধর্ম্মের বিবিধ সাদৃশ্য দেখিয়া ডক্টর রিজ ডেভিড বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিয়াছেন,—'এরূপ সাদৃশ্য দৈবাৎ ঘটিয়াছে বলিয়া যদি কেহ সিদ্ধান্ত করেন, তাহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় সংসারে আর কিছুই হইতে পারে না। তাহা অযুত অলৌকিক ব্যাপার হইতে অলৌকিক।' * অধিক বলিবার আবশ্যক নাই! কেবল আর একটী কথা বলিয়াই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। যে একেশ্বর-বাদ লইয়া অধুনা সংসারে ঘোর কোলাহল চলিয়াছে, সেই একেশ্বর-বাদ যে ভারতবর্ষেরই নিজস্ব সামগ্রী, সেই একেশ্বর-বাদ যে সর্ব্বাগ্রে পাশ্চাত্য-দেশে উদ্ভূত হয় নাই, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণই সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ দার্শনিক শ্লেজেল স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—'ভারতের প্রাচীন অধিবাসিগণই যে সর্ব্বপ্রথমে সত্যস্বরূপ একেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন,—তাহা কোনমতে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। মনুষ্যের ভাষায় ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোনও উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইতে পারে, তাঁহাদের সকল গ্রন্থেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে!' একা শ্লেজেল নহেন; যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত হিন্দু-শাস্ত্রের মধ্যে একটু প্রবেশ-লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রেভারেণ্ড ওয়ার্ড খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক হইয়াও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—'হিন্দুগণ যে একেশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, ইহা ধ্রুব সত্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যেই তাঁহাদের একেশ্বর-বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন।' কত বিষয়ে কত দেখাইব? পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মুখে কোনও কথা না শুনিলে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত সমাজ কোনও বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। তাই স্থূল স্থূল কয়েকটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলাম। নচেৎ, যাঁহারা একটু অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে,—আমাদের এই সনাতন বেদ-বিহিত ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের জনয়িতা।

---

* "If all this be chance, it is a most stupendous miracle of coincidence; it is in fact ten thousand miracles."—Dr, Rhys David's *Hibbert Lectures.*

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

[প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ;—চিকিৎসা-বিজ্ঞান,—কিবা ভেষজ-নির্ব্বাচনে, কিবা অস্ত্র-চিকিৎসায় প্রাচীন ভারতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সাক্ষ্য ;—ভারতবর্ষ বিজ্ঞানালোচনায় আদি,—লর্ড অ্যাম্পথিলের উক্তি ;—শারীর-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞান,—তদ্বিষয়ে প্রাধান্যের পরিচয় ;—ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে চিকিৎসা-বিজ্ঞান-প্রচার বিষয়ে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ;—গণিত-বিজ্ঞানে, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে, সামরিক-বিজ্ঞানে, পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠা।]

ভারতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

বিজ্ঞানের চর্চ্চায়ও ভারতবর্ষ আদি-স্থানীয়। কেহ কেহ মনে করেন, ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-সম্বন্ধেই উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল, ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণেই ভারতবাসীরা চিন্তা-জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; কিন্তু 'সায়েন্স' বা বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তা আদৌ স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই। এমন কি, বিজ্ঞানালোচনায় এদেশ যে কখনও প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠাবোধ করেন। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিতে পারা যায়,—ভারতবর্ষ বিজ্ঞানালোচনার আদি-স্থান, বিজ্ঞানালোচনার বীজ ভারতবর্ষ হইতেই অন্যান্য দেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সায়েন্স বা বিজ্ঞান বলিতে নানা-বিষয়ক জ্ঞানকে বুঝাইয়া থাকে। তদনুসারে সাধারণতঃ চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষ, শিল্প প্রভৃতির বিভিন্ন বিভাগ—সায়েন্স বা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানের দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহাই বিজ্ঞানের অন্তর্নিবিষ্ট। সুতরাং বিজ্ঞান এখন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ; যথা,—আয়ুর্ব্বিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি। বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগই এক সময়ে ভারতবর্ষে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখুন ;—আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের সকল তথ্যই তন্মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। গণিত-বিজ্ঞানের অন্তর্গত অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি বীজগণিত প্রভৃতির বিষয় অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাই,—স্মরণাতীত অতীত কালে তৎসমুদায় এদেশে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলিত-জ্যোতিষ, গণিত-জ্যোতিষ প্রভৃতিতেও ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠার অবধি ছিল না। সামরিক-বিজ্ঞানে অধুনা পাশ্চাত্য-দেশ অশেষ প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন ; কিন্তু সামরিক-বিজ্ঞানেও অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ কি উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্মিত হইতে হয়! সঙ্গীত-বিদ্যায়, শিল্প-বিদ্যায়, স্থপতি-বিদ্যায়—বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে প্রাচীন ভারতবর্ষ গৌরবের উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ় ছিল। পাশ্চাত্য-দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে, এ সকল বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পারে। অধুনা পাশ্চাত্য-মতেই জন-সাধারণ অধিকতর আস্থাবান। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে, প্রথমে পাশ্চাত্য-মতের আলোচনা করিয়া পরিশেষে অন্যান্য পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ভৈষজ্য-তত্ত্বে হিন্দুগণের মৌলিকত্ব বিষয়ে ইউরোপের অনেকে এখনও সন্দিহান; অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিও এ বিষয়ে গ্রীসকে আদিভূত বলিয়া প্রচার করেন। ইউরোপে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তনায় গ্রীস আদিভূত হইতে পারে; কিন্তু গ্রীস কোথা হইতে ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের (চিকিৎসা-বিজ্ঞানের) মূল তত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন? তদ্বিষয়েও যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই সকল সংশয় দূর হইতে পারে; এরিয়ান বলিয়া গিয়াছেন,—'গ্রীকগণ ব্যায়রাম-পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, ব্রাহ্মণ-দিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। যে সকল পীড়ায় শান্তির সম্ভাবনা আছে, ব্রাহ্মণগণ অমানুষিক কৌশলে সে সকল পীড়ার শান্তি বিধান করিতেন।' ডায়স্কোরাইডস *—গ্রীস দেশের একজন প্রধান ও প্রাচীন ভৈষজ্য-তত্ত্ববিৎ। প্রাচীন-কালের ভৈষজ্য-তত্ত্বের আলোচনায় ডায়স্কোরাইডসের প্রসিদ্ধি সর্ব্ববাদিসম্মত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভৈষজ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু-জাতির ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের প্রাচীনত্বের ও মৌলিকত্বের বিষয় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে (১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে) লণ্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার রয়েল তাঁহার ভৈষজ্য-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভৈষজ্য-তত্ত্ব বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুগণের কিরূপ অভিজ্ঞতা ছিল এবং পাশ্চাত্য-দেশ তাহা হইতে কি কি উপাদান-সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন, ডাক্তার রয়েলের গ্রন্থে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। † খৃষ্ট-জন্মের ৪৬০ বৎসর পূর্ব্বে ভূমধ্য-সাগরস্থিত 'কস'-দ্বীপে হিপক্রেটস ‡ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পিতৃস্থানীয় বলিয়া পরিচিত। ইউরোপে তিনিই প্রথমে ভৈষজ্য-তত্ত্বের আলোচনা করেন। তিনিই বলিয়া গিয়াছেন,—'হিন্দুদিগের নিকট হইতেই ইউরোপ ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য গ্রহণ করিয়াছে।' ডাক্তার ওয়াইজ 'চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস' বিষয়ক আলোচনায় গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি মুক্ত-কণ্ঠে বলিয়াছেন,—'আমরা হিন্দুদিগের নিকট হইতেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছি।' § অধ্যাপক উইলসন বহু অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—'পৃথিবীর যে সকল জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাঁহাদের

চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

---

* "Dioscorides,—Pednius or Pedacius, a Greek physician, was a native of Anazarba or Anazarbus in Cilicia and flourished in the first or second century...In his great work, *De Materia Medica*, he treats of all the then known medicinal substances and their properties"—*Chamber's Encyclopædia.*

† *Vide*, Dr. Royle's *Antiquity of Hindu Medicine.*

‡ *Hippocrates*, the most celebrated physician of antiquity, was born in the island of Cos, about the year 460 B. C. and died in Larissa in Thessaly. He was called the *Father of Medicine*, because he first cultivated the subject as a science in Europe.

§ ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise, I. M. S.) এই দেশেরই 'মেডিকেল সার্ভিসে' কাজ করিতেন। সুতরাং এ দেশের এবং পাশ্চাত্য-দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনায় তিনি বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দুদিগের প্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৬৭

মধ্যে প্রাচীন হিন্দুগণ চিকিৎসা-শাস্ত্রে এবং অস্ত্র-বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। রোগ-নির্ণয়ে এবং রোগের লক্ষণাদি-নির্দ্ধারণে তাঁহারা যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই আশ্চর্য্যজনক। তাঁহাদের ভৈষজ্য-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাতব্য-তত্ত্বপূর্ণ ও বৃহদায়তন।' * স্যর উইলিয়ম হাণ্টার লিখিয়া গিয়াছেন,—'হিন্দুগণের ভৈষজ্য তত্ত্বে ধাতব, ঔদ্ভিদ ও জান্তব অসংখ্য ভেষজের বিবরণ লিখিত আছে। ইউরোপীয় ভিষক-গণ তাহা হইতে অনেক তথ্যই গ্রহণ করিয়াছেন।' †

যেমন ভৈষজ্য-বিজ্ঞানে, তেমনই অস্ত্র-চিকিৎসায়ও হিন্দুগণ পারদর্শী ছিলেন। ওয়েবার বলেন,—'অস্ত্র-চিকিৎসায় ভারতবাসীরা অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় অস্ত্র-চিকিৎসকগণ এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট হইতে অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনও কোনও বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। নাসিকার কোনও অংশ নষ্ট হইয়া গেলে, যেরূপ কৌশলে তাঁহারা ক্ষত অংশ স্থানান্তরিত করিয়া, তৎস্থলে কৃত্রিম নাসিকা গঠন করিয়া দিতেন, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। সেই অস্ত্র-চালনার কৌশল ভারতবর্ষ হইতেই ইউরোপ শিক্ষা করিয়াছিলেন।' ‡ বম্বের ভূতপূর্ব্ব গবরণর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ তৎপ্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন,—'যেমন ভৈষজ্য-বিদ্যায় তেমনি অস্ত্র-চিকিৎসায় হিন্দুগণ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। প্রাচীন ও মধ্যকালের ভারতবর্ষ বিষয়ক গ্রন্থে মিসেস ম্যানিং বলিয়াছেন,—'হিন্দুগণের অস্ত্র সমূহ এত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ-ধার-সম্পন্ন ছিল যে, তদ্দ্বারা একগাছি চুলকে পর্য্যন্ত লম্বালম্বি-ভাবে সমভাগে বিভক্ত করা যাইত।' § ডক্টর স্যর ডব্‌লিউ ডব্‌লিউ হাণ্টার 'ইণ্ডিয়ান গেজেটিয়ার' গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম,—'প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকগণ অস্ত্র-চিকিৎসায় পারদর্শী ও সুনিপুণ ছিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসার সময় কোনও অঙ্গ ছেদন করিবার আবশ্যক হইলে, তাঁহারা অতি কৌশলে রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া ফেলিতেন। পাক-তৈলে ব্যাণ্ডেজ-বস্ত্র সিক্ত করিয়া কর্ত্তিত স্থানে বাঁধিয়া দিতেন। অশ্মরিচ্ছেদে অর্থাৎ পাথুরি কাটিতে অস্ত্র-ব্যবহারে তাঁহারা বিশেষ

অস্ত্র-চিকিৎসায় নৈপুণ্য।

খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে তাঁহার ভৈষজ্য-ইতিহাস সমালোচনা নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"It is to the Hindus we owe the first system of medicine."—*Vide*, Dr. Wise, *Review of the History of Medicine.*

* "The ancient Hindus attained a thorough proficiency in medicine and surgery as any people whose acquisitions are recorded."—H. H. Wilson.

† "The *Materia Medica* of the Hindus embraces a vast collection of drugs belonging to the mineral vegetable and animal kingdoms, many of which have now been adopted by European physicians."—Sir William Hunter, *Imperial Gazetteer*, India

‡ "In surgery, too, the Indians seem to have attained a special proficiency and in this department, European surgeons might, perhaps even at the present day, still learn something from them, as indeed they have already borrowed from them the operation of rhinoplasty."—Weber's *Indian Literature.*

** Mrs. Manning—*Ancient and Mediæval India.*

পারদর্শী ছিলেন। মূত্র-নালীতে এবং অন্ত্র-মধ্যে অস্ত্র-চালনায় তাঁহাদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্ত্র-বৃদ্ধি, ভগন্দর, অর্শ প্রভৃতি পীড়া তাঁহারা আরোগ্য করিতে পারিতেন। শরীরের কোনও স্থানের কোনও হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে বা স্থানান্তরিত হইলে, তাঁহারা যথাস্থানে তাহা স্থাপন করিতে জানিতেন। শরীরের মধ্যে কোনও স্বাস্থ্য-হানিকর পদার্থ (গোলাগুলি প্রভৃতি) প্রবেশ করিলে, তাঁহারা অনায়াসে তৎসমুদায় শরীর হইতে বাহির করিতে পারিতেন। নাসিকা ও কর্ণ সুগঠিত না হইলে, অস্ত্র-চিকিৎসার দ্বারা হিন্দুগণ তৎসমুদায় নূতন করিয়া গঠন করিতে সমর্থ ছিলেন। সেই অভিনব অস্ত্র-সঞ্চালন-ক্রিয়া তাঁহাদের নিকট হইতেই ইউরোপীয় অস্ত্র-চিকিৎসকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। অস্ত্র-চিকিৎসা দ্বারা তাঁহারা স্নায়ুরোগ নিবারণ করিতে পারিতেন। অধুনা পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক-গণ স্নায়ুরোগের উপশমনার্থ অক্ষি-শিরার অংশ-বিশেষ ছেদন করিয়া থাকেন; এ প্রথা পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিরই অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্র-সমূহ প্রস্তুত করিতে হিন্দুগণ বিশেষ আয়াস-স্বীকার করিতেন। ছাত্রদিগকে অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষাদানের জন্য তাঁহারা মোমের উপর অস্ত্র-সঞ্চালন শিক্ষা করাইতেন। বল্কলের উপর বা কাষ্ঠ-খণ্ডের উপর সেই মোম বিস্তৃত থাকিত। মৃত জন্তু লইয়া ছাত্রদিগকে ব্যবচ্ছেদ-প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ধাত্রী-বিদ্যায় হিন্দুগণ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; যেরূপ ক্ষেত্রে অস্ত্র-প্রয়োগে বিষম শঙ্কটের সম্ভাবনা, সেরূপ ক্ষেত্রেও অস্ত্র-চালনায় তাঁহারা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতেন। বাল-রোগাধিকার এবং স্ত্রীলোকদিগের বহু কঠিন পীড়া তাঁহাদের চিকিৎসায় নিরাময় হইত। কারণ-নির্ণয়, লক্ষণ-নির্দ্ধারণ, চিকিৎসা-নির্ব্বাচন, রোগ-নির্ণয় ও নিদান,—তাঁহাদের চিকিৎসা-প্রণালীর বিভাগ মধ্যে পরিগণিত ছিল। পশ্বাদির চিকিৎসায়, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুর ব্যাধি-নিবারণেও, তাঁহাদের নিপুণতার অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।'

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সকল অঙ্গেই ভারতবর্ষ যে গৌরবের উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ় হইয়াছিল, তাহার ভূয়সী প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মাদ্রাজের গবরণর লর্ড আম্পথিল স্বাস্থ্য-তত্ত্ব বিষয়ে হিন্দুগণের যে অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষ যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ও অস্ত্র-বিদ্যায় আদিস্থান অধিকার করিয়া আছে, স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ হয়।

লর্ড আম্পথিলের উক্তি।

লর্ড আম্পথিল বলিয়াছিলেন,—'এখনও আমরা দেখিতে পাইতেছি, স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্রে বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে মানব-জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানের জন্য এ পর্য্যন্ত যাঁহারা মস্তিষ্ক-চালনা করিয়াছেন, মহর্ষি মনু তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। হিন্দুশাস্ত্রে তিনি বিজ্ঞান-সম্মত স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-বিধি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বসন্ত প্রভৃতি রোগে টীকা দেওয়ার প্রথা এবং মহামারীর সময় দেশত্যাগ ও ঘর-বাড়ী পরিষ্কার করার বিধি হিন্দুশাস্ত্রে প্রাচীন-কাল হইতেই বিহিত আছে।' বক্তৃতায় লর্ড আম্পথিল আরও বলিয়াছেন,—'নানারূপ বিপ্লবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান-গণের

* *Vide* Dr. Sir W. W. Hunter, *Indian Gazetteer*, India.

আধিপত্য বিস্তৃত হইলে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পুনরভ্যুদয় সাধিত হয়। যে জ্ঞান বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এদেশ হইতে অন্য দেশে চলিয়া গিয়াছিল, তদধিক জ্ঞান এখন বৃটিশ গবরমেণ্ট ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রীস ও রোম প্রভৃতি দেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষই তাহার মূল।' * লর্ড আম্পথিল স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন,—'এ সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য-দেশ প্রাচ্য-ভারতেরই অনুসরণকারী।' মান্দ্রাজের 'কিংস ইনষ্টিটিউট অব প্রিভেণ্টিভ মেডিসিন' প্রতিষ্ঠার বক্তৃতায় লর্ড আম্পথিল এই সকল কথা বলেন। তিনি এ সম্বন্ধে আরও যাহা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন,—'ইউরোপ যখন অসভ্য, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; রোগ-প্রতিষেধক ও রোগ-প্রতিকারক ভেষজ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ তখন অভিজ্ঞ। কর্ণেল কিং তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ। ভারতবর্ষই যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদি-স্থান সাধারণে তাহা জানেন কি না, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ভারতবর্ষই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদিস্থান। ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রথমে আরবে এবং আরব হইতে ইউরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় ভিষক-গণ আরব-দেশীয় চিকিৎসক-গণের গ্রন্থাদি হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং উহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ধন্বন্তরি, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ভারতীয় প্রসিদ্ধ ভিষক-গণের গ্রন্থ হইতে আরবের চিকিৎসক-গণ ভৈষজ্য-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা-লাভ করেন। প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে যে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই জ্ঞানালোকে জগৎ এক্ষণে উদ্ভাসিত। কিন্তু আদিস্থান ভারতবর্ষে তাহার বিশেষ কোনও স্থায়ী চিহ্ন নাই, পৃথিবীর ক্রমোন্নতির ইতিহাসে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।' † অধুনা ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলায় ইউরোপীয় চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত। কিন্তু এমন

* ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে "কিংস ইনষ্টিটিউট অব প্রিভেণ্টিভ মেডিসিন" (King's Institute of Preventive Medicine) নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় মান্দ্রাজের তাৎকালিক গবরণর লর্ড আম্পথিল যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশের মর্ম্ম মাত্র আমরা এস্থলে প্রদান করিলাম। সেই বক্তৃতায় এক স্থলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"Knowledge of medicine which flourished in the Near East at the commencement of the Christian era emanated, as I have already shown you, from India."

† "The people of India should be grateful to him (Colonel King) for having pointed out to them that they can lay claim to have been acquainted with the main principles of curative and preventive medicine at a time when Europe was still immersed in ignorant savagery. I am not sure whether it is generally known that the science of medicine originated in India, but this is the case, and the science was first exported from India to Arabia aud thence to Europe. Down to the close of the seventeenth century, European physicians learnt the science from the works of Arabic doctors; while the Arabic doctors, many centuries before, had obtained their knowledge from the works of great Indian physicians such as Dhanwantri, Charaka and Susruta. It is a strange circumstance in the world's progress that the centre of enlightenment and knowledge should have travelled from East to West leaving but little permanent trace of its former existence in the East."

এক দিন ছিল, যখন এই প্রাচ্যের চিকিৎসা-বিজ্ঞান পাশ্চাত্যে সমাদৃত হইত! অধিক বলিব কি, বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে মাসিডনের অধিপতি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের শিবিরে হিন্দু-ভিষকগণ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যাধি ইউরোপের চিকিৎসক-গণ আরোগ্য করিতে পারেন নাই, সেই সকল ব্যাধির চিকিৎসার ভার হিন্দু-ভিষকগণের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ইতিহাস এ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাগ্‌দাদের কালিফ হারুণ-উল-রসিদ আপনার রাজধানীতে দুই জন হিন্দু-ভিষককে প্রধান চিকিৎকের পদে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। আরবী-ভাষায় লিখিত রাজকীয় কাগজ-পত্রে সেই দুই চিকিৎসকের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সে আজ প্রায় একাদশ শতাব্দী অতীত হইতে চলিল। কিন্তু, হায়, ভারতবর্ষ এখন সর্ব্ববিষয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী!

শারীর-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান প্রভৃতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ দুই বিভাগেও হিন্দুগণ স্মরণাতীত কাল হইতে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। অধ্যাপক

শারীর-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞান।

ওয়েবার তাঁহার প্রণীত 'ভারতীয় সাহিত্য-বিষয়ক' গ্রন্থে প্রথমোক্ত বিষয়ে এবং ডক্টর রায় শেষোক্ত বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন। * ওয়েবার বলেন,—'বৈদিক কালেও জীবজন্তুর অস্থি ও গঠনাদি বিষয়ে হিন্দুদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কারণ, দেহের প্রত্যেক অংশের নাম বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।' তিনি আরও বলেন,—অমরকোষে মানব দেহ ও তাহার রোগ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তদ্দ্বারা শারীর-বিজ্ঞানে হিন্দুগণের অভিজ্ঞতার বিষয় প্রতিপন্ন হয়।' ডক্টর রায় বলেন,—'সুশ্রুতের মতে শব-ব্যবচ্ছেদ ক্রিয়া ছাত্র-মাত্রকেই শিক্ষা করিতে হইত। পরীক্ষায় এবং ভূয়োদর্শনে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, সুশ্রুত তাহারই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।' শব-ব্যবচ্ছেদ-সংক্রান্ত অস্ত্র-চালনায় হিন্দু-ভিষকগণের নৈপুণ্যের বিষয় আলোচনা করিলে, শারীর-বিজ্ঞানে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। অসম্পূর্ণ নাসাকর্ণ কর্ত্তন করিয়া নূতন (কৃত্রিম) নাসাকর্ণ সংগঠন করা এবং তীক্ষ্ণ-ধার সূক্ষ্ম অস্ত্র-ব্যবহারে সূক্ষ্ম চুলগাছটীকে পর্য্যন্ত লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত করিতে পারা প্রভৃতির যে সকল দৃষ্টান্ত উপরে উল্লেখ করিয়াছি, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই বিভাগের কৃতিত্বের তাহা পূর্ণ নিদর্শন। সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে হিন্দু-গণ চ'খের ছানি কাটিতে পারিতেন, পাথুরীকে খণ্ড খণ্ড করিতেন, গর্ভ হইতে ভ্রূণ বাহির করিতে সমর্থ ছিলেন এবং অতি প্রাচীন-কালে অন্যূন এক শত সাতাইশ প্রকার অস্ত্র-চিকিৎসার উপযোগী যন্ত্র তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ডাক্তার রয়েল তাঁহার প্রণীত 'হিন্দুগণের ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের আদিমত্ব' গ্রন্থে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়ে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। রসায়ন-বিদ্যায় হিন্দু-গণ কীদৃশ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,

---

* *Vide*, Dr. P. C. Roy, D. Sc. *A History of Hindu Chemistry* and Dr. Weber's *Indian Literature*,

† এ বিষয়ে ডাক্তার রয়েল এবং এলফিন্‌ষ্টোন যাহা বলিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের উক্তিই উদ্ধৃত করিতেছি,—"It is no doubt surprising to find among the operations of those ancient

ডক্টর রায়ের 'হিন্দু-রসায়ন' গ্রন্থ তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনও তাঁহার ইতিহাসে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—'ভারতবাসীর রসায়ন-বিজ্ঞানে অভাবনীয় অভিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। * তাঁহারা গন্ধক-দ্রাবক (সাল্‌ফিউরিক এসিড Sulphuric Acid), মরুতক-দ্রাবক (Nitric Acid নাইট্রিক এসিড), উপহরিণ-দ্রাবক (মিউরেটিক এসিড বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড Muriatic Acid or Hydrochloric Acid), দগ্ধ-তাম্রক দগ্ধ-লৌহ, দগ্ধাঞ্জন, দগ্ধ-টিন (বা রাঙ বা বঙ্গ), দগ্ধ-দস্তা বা যশদ (Oxides of copper, iron, lead, tin, zinc), গন্ধক মিশ্রিত লৌহ, তাম্র, পারদ, অঞ্জনক ও তালক বা সেঁকো (Sulphurates of iron, copper, mercury, antimoy and arsenic), তুঁতে, হিরাকস প্রভৃতি (Sulphates of copper, iron, zinc etc.), অঙ্গারক লৌহ ও সীসক (Carbonates of iron and lead) প্রস্তুত করিতে জানিতেন। বিশেষ কৌশলে তাঁহারা এই সকল রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করিতেন। ধাতব পদার্থ ও পারদ ব্যবহারে রোগ-শান্তির বিষয় ভারতীয় হিন্দু-গণই প্রথম আবিষ্কার করেন। আর্সেনিকের ব্যবহারেও তাঁহারাই আদি।' মাধবাচার্য্য রসায়ন-সংক্রান্ত বহু প্রাচীন গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে এখন একমাত্র 'রসার্ণব' গ্রন্থ প্রচলিত আছে। 'রসরত্নকর্ণ' ও রসার্ণব' গ্রন্থ আলোচনা করিয়া ডক্টর রায় বলিয়াছেন,—'এই দুই খানি তন্ত্র-গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ রসায়ন-বিজ্ঞানের আলোচনা দৃষ্ট হয়। রস-রত্ন-সমুচ্চয় নামক অপর একখানি গ্রন্থে ভৈষজ্য-তত্ত্ব, ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ এবং ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাই। এরূপ বিজ্ঞান-সম্মত সুশৃঙ্খলায় এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে যে, অধুনা-প্রচলিত যে কোনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পার্শ্বে উহা দাঁড়াইতে পারে। সংস্কৃত-সাহিত্যে এই গ্রন্থের তুলনা নাই।' ইউরোপীয় রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাসে প্যারাসেল্‌সাসের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। একাধিক পদার্থের সংমিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঔষধের অভিনব শক্তির বিষয় তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে প্রচার করেন। ইউরোপে পারদ-ঘটিত ঔষধের ব্যবহারও তাঁহারই প্রবর্ত্তনা বলিয়া প্রচারিত আছে। প্যারাসেল্‌সাস পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে সুইজরলণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকর্ত্তৃক ইউরোপে রসায়ন-বিজ্ঞান প্রচারিত হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইলে, তাহা আধুনিক ঘটনা বলা যাইতে পারে। আর তিনি যে এই প্রাচ্য-দেশ হইতেই রসায়ন-শাস্ত্র-সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। 'হিন্দু-দিগের রসায়ন-বিজ্ঞান' সংক্রান্ত গ্রন্থে ডক্টর রায়ও সেই আভাষই প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তার রয়েল বলেন,—'প্রাচীন গ্রীসের এবং রোমের ইতিহাসে যদিও ধাতব-পদার্থের বাহ্য-প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়;

---

surgeons those of lithotomy and the extraction of the fœtus *ex utera*; and that no less than 127 surgical instruments are described in their works." – Dr. Royle's ***Antiquity of Hindu Medicine.*** "They cut for the stone, couched for the cataract extracted the fœtus from the womb, and in their early works enumerate not less than 127 sorts of surgical instruments."—*Vide* Elphinstone, *History of India*

* "Their chemical skill is a fact more striking and more unexpected."—"Elphinstone, *History of India.*

কিন্তু ঔষধ-রূপে ধাতব-পদার্থ-সেবনের পদ্ধতি আরব্‌-জাতির নিকট হইতেই তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। এদিকে আবার চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থ আরবীয়-গণের মধ্যে প্রচারের বিষয় স্মরণ করিলে, ভারতবর্ষ হইতেই যে তাঁহারা ঔষধে ধাতব-পদার্থের ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারা যায়।' ফলতঃ, যে দিক দিয়াই দেখি, দেখিতে পাই,—অতি প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদি স্থান। ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে আরবে এবং পরে ইউরোপে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বীজ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। *

ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বীজ ভারতবর্ষ হইতে আরবে এবং আরব হইতে ইউরোপে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল,—ইতিহাসে তদ্বিষয়ের প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। স্তর উইলিয়ম হাণ্টার বলিয়া গিয়াছেন,—'ভারতবর্ষে চিকিৎসা-বিজ্ঞান আপনা-আপনিই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ এ সম্বন্ধে অন্য কাহারও সাহায্য গ্রহণ করে নাই। বাগদাদের কালিফের আদেশে, ৯৫০খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৬০খৃষ্টাব্দের মধ্যে চিকিৎসা-সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থের আরবী ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল। আরবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তাহাই ভিত্তি-স্থানীয়। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে চিকিৎসা বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তৎসমুদায় আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুসরণ মাত্র। আবিসেন' (আবুসিনা), রাজেস (আবু রাসি), সেরাপিয়ন (আবু সিরাপি) প্রভৃতির যে সকল গ্রন্থ লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থে ভারতীয় ভিষক-প্রবর চরকের নামোল্লেখ পুনঃ-পুনঃ দৃষ্ট হয়।' মিসেস ম্যানিং অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—'চিকিৎসা-সংক্রান্ত ভারতীয় গ্রন্থ-সমূহ যখন পৃথিবী-ব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, বাগদাদের কালিফ তখন বহু প্রধান প্রধান সংস্কৃত-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সেই সময়ে যে সকল প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ছিলেন, আপন রাজধানীতে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া তিনি রাজধানীর বিদ্যার প্রভা বর্দ্ধিত করেন।' চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে ভারতবর্ষই যে ইউরোপের প্রতিষ্ঠার আদি, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার রয়েলের গ্রন্থে প্রকাশ,—'আরব-দেশের তিন জন প্রাচীন গ্রন্থকার চরকের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেরাপিয়ন বলিয়াছেন,—'জারাক' (জার্ক), রাজেস বলিয়াছেন—'সারাক।' আবিসেনা বলিয়াছেন—'সিরাক'। † সেরাপিয়ন সকলের আদি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি তৎকাল-

* এ বিষয়ে মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড আম্পথিলও তাঁহার বক্তৃতায় এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন,—"Hindu medicine dealt with the whole range of the science ; the science of medicine originated in India and was first exported from India to Arabia and thence to Europe."—Lord Ampthill's speech at the opening of the *King's Institute of Preventive Medicine* at Madras, 1905.

† "One of the earliest of the Arab authors, Serapion, mentions *Charaka* by name as *Xarch*. Another Arab writer, Avicenna quotes him as *Scirak* ; while Rhazes who was prior to Avicenna calls him *Scarac*.'—*Vide* R. C. Dutt, *Civilisation in Ancient India* and Royle's *Ancient Hindu Medicine*.

প্রচলিত চিকিৎসা-শাস্ত্রের মধ্যে চরককে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেরাপিয়ন অপেক্ষাও রাজেস প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। আল্-মনসুরের রাজত্ব-কালে বাগদাদ রাজধানী তাঁহার যশঃ-প্রভায় উজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি রসায়ন সম্বন্ধে বার খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উদ্ভিদ ও ভেষজ সম্বন্ধে তিনি চরকের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রাজেসের পর, অবিসেনা (আবু আলি আল্ হোসেন ইবন্ আবদুল্লা ইবন্ সিনা) প্রতিষ্ঠান্বিত হন। তিনি সেখ রইস বা রাজ বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বোখারার সন্নিকটে সারমাটেন পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে 'কানুন-ফি-এলতিব' নামক গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তৎপ্রণীত ঐ কানুন গ্রন্থ লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হয়। সেই গ্রন্থে তিনি সুশ্রুত ও চরক উভয়েরই প্রাধান্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। জলৌকার বিষয় আলোচনা করিবার সময় প্রথমেই তিনি হিন্দুগণের উক্তির অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তার পর, জলৌকা সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তৎসমুদায়ই সুশ্রুতের অনুবাদ বলিয়া প্রতীত হয়। ছয় প্রকার বিষাক্ত জলৌকার যে বর্ণনা সুশ্রুতে লিখিত আছে, আবিসেনার গ্রন্থে তাহাই অবিকল প্রদত্ত হইয়াছে। * বাগদাদের কালিফ-গণ অতি প্রাচীন কাল হইতে বাগদাদে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনায় সহায়তা করিতেন। পারস্যের সাসানিয়ান বা সাসানাইড † রাজগণও তদ্বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। সাসানীয় বংশের রাজা প্রথম খসরু 'নসিরভন' অর্থাৎ পবিত্রাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে (৫৩১ খৃঃ-৫৭২ খৃঃ) বারজোহেয়া নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। আল্-বারুণির পুস্তকে প্রকাশ,—'আব্বাস' ‡-বংশীয় প্রথম নৃপতিগণ অনেক সংস্কৃত-গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। আলি ইবন্ জৈন কর্ত্তৃক সেই সময় চরকের অনুবাদ হইয়াছিল।' অধ্যাপক সাচাউ—আল্-বারুণি প্রণীত ভারতবর্ষ গ্রন্থের যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় এই মর্ম্মের উক্তিই দেখিতে পাওয়া যায়। বাগদাদের কালিফ আল্ মনসুর বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করান। চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত চরক সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার উৎসাহে অনুবাদিত হইয়াছিল। তখন চরক 'সাঙ্ক' নামে এবং সুশ্রুত 'শাশ্রুদ' নামে পরিচিত হয়। আল্-মনসুর ৭৫৪

* ছয় প্রকার বিষাক্ত জলৌকার বিষয় আবিসেনা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদে ডাক্তার রয়েল এই সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুশ্রুতে আছে,—'যাহারা রোমশ, যাহাদের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, যাহাদের রামধনুর ন্যায় ঊর্দ্ধরেখা বিরাজিত, ইত্যাদি।' আবিসেনার গ্রন্থের অনুবাদে ডাক্তার রয়েলের ভাষায়—"Those called krishna or black, the hairy leech that which is variegated like a rainbow etc." সুশ্রুত-সংহিতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এবং Royle's *Ancient Hindu Medicine* গ্রন্থের ৩৮শ পৃষ্ঠা মিলাইয়া দেখিলে, এ বিষয় উপলব্ধি হইবে।

† 'আব্বাসাইড' বংশের রাজত্বের পর পারস্যে সাসানীয়-বংশের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। সাসান হইতে এই বংশের উৎপত্তি। সেই জন্য এই বংশ 'সাসানীয়' বংশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

‡ হজরত মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাস হইতে 'আব্বাসাইড' বংশের উৎপত্তি হয়। তিনি ৬৫২ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বংশধর-গণ ৭৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাগদাদের কালিফ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। দামাস্কস হইতে তিনিই বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি আব্বাস-বংশীয় দ্বিতীয় কালিফ। তাঁহার নাম—আবু জাফর আবদাল্লা বেন মহম্মদ আল মনসুর। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি আল্-মনসুর বা 'ঈশ্বরের সাহায্য-প্রাপ্ত' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাগদাদের সহিত যখন গ্রীসের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, গ্রীকগণ তখন বাগদাদ হইতে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 'প্রাচীন ও মধ্যকালের ভারতবর্ষ' সংক্রান্ত গ্রন্থে মিসেস ম্যানিং এতদ্বিষয় প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। * নগরকোট আক্রমণের সময় তোগলক-বংশীয় সম্রাট ফিরোজ সা সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত চিকিৎসা-সংক্রান্ত কতকগুলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আয়াজুদ্দীন কালিফ কর্ত্তৃক সেই গ্রন্থগুলি আরবী-ভাষায় অনুবাদিত হয়। † হারুণ-অল-রসিদের রাজধানীতে দুই জন হিন্দু-চিকিৎসক চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেই দুই জন হিন্দু-ভিষক—মানকা ও সালে বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তাঁহারা যে হিন্দু ছিলেন, বহু গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। হারুণ-অল-রসিদের পীড়ার চিকিৎসার জন্য মানকা ভারতবর্ষ হইতে ইরাক সহরে গমন করিয়াছিলেন। কালিফকে রোগমুক্ত করিয়া তিনি বিশেষ যশস্বী হন; তখন তাহা কর্ত্তৃক সংস্কৃত চরকের বিষ-সংক্রান্ত অংশ পারস্য-ভাষায় অনুবাদিত হয়। হারুণ-অল্-রসিদের রাজত্ব-কালে হিন্দু-চিকিৎসক সালে ইরাক নগরে বসবাস করিয়াছিলেন। সেখানে চিকিৎসা-বিষয়ে তাঁহার খ্যাতির অবধি ছিল না। তিনি মিশর এবং প্যালেস্তাইন পরিভ্রমণ করেন। মিশরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গেব্রিল ব্যাপটিশনা নামক জনৈক সিরীয়া-দেশবাসী সংস্কৃত হইতে আরবী ভাষায় চিকিৎসা-সংক্রান্ত কতকগুলি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। অধ্যাপক ডায়েজ প্রণীত 'য়্যানালেক্টা মেডিকা' গ্রন্থে এ সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। ‡ কালিফ মনসুরের রাজত্ব-কালে সিন্ধু-প্রদেশের কিয়দংশ মনসুরের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সেই সময় চিকিৎসা-সংক্রান্ত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বাগদাদে অনুবাদিত হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বহু গ্রন্থেও আরব-গণ সেই সময় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, অতি প্রাচীন-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ পাশ্চাত্য-দেশ-সমূহে প্রচারিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলে তৎসমুদায়ের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারতের অভিজ্ঞতার পরিচয়, ইংরাজী-সাহিত্যে অতি অল্প দিন মাত্র স্থান লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক এইচ এইচ উইলসন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন' পত্রে অতি সংক্ষেপে হিন্দুদিগের ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করেন। প্রসিদ্ধ পর্য্যটনকারী সোমা-ডি

* "Later Greeks at Baghdad are found to have been acquainted with the medical works of the Hindus and to have availed themselves of their medicaments."—Mrs. Manning, *Ancient and Mediœval India*, Vol I.

† *Vide* Max Muller, *Science of Language*.

‡ *Vide*, Prof Dietz's *Analecta Medica*, Leipsic Edition.

কোরস কর্তৃক তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে সুশ্রুত, চরক ও বাগ্‌ভটের অনুবাদের বিষয় আলোচিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে' তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে হেন এবং এনস্লি হিন্দু-দিগের ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রয়েলের এবং তৎপরে অন্যান্য অনেকের দৃষ্টি এতদ্বিষয়ে আকৃষ্ট হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেমন চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, তেমনি গণিত-বিজ্ঞানে জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে, সামরিক-বিজ্ঞানে, সঙ্গীত-বিজ্ঞানে, পদার্থ-বিজ্ঞানে এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণা প্রভাবেই যেমন ভারতবর্ষের মৌলিকত্ব প্রতিপন্ন হয়, অন্যান্য বিজ্ঞান-সম্বন্ধেও অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সেইরূপ মতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের কয়েকটী উক্তি উল্লেখ করা, বোধ হয়, এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জর্ম্মণ-দেশীয় প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্লেজেল বলিয়াছেন,—'ভারতবর্ষই দশমিক বিন্দুর আবিষ্কর্ত্তা। বর্ণমালার পরই ইহার উপযোগিতা উপলব্ধি হয়। হিন্দু-গণই যে এই দশমিক-বিন্দু আবিষ্কার করেন, ঐতিহাসিক-গণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।' * অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল বলেন,—'পৃথিবীতে অধুনা যে গণনাঙ্ক প্রচলিত, ভারতবর্ষই তাহার আবিষ্কর্ত্তা। খৃষ্টীয় অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে পাটীগণিত ও বীজগণিত বিষয়ে ভারতবর্ষ আরব-জাতির শিক্ষক ছিলেন। পাশ্চাত্য-দেশ আরবের নিকট হইতেই ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।' † বীজগণিতের অধুনা-প্রচলিত যে পাশ্চাত্য নাম 'য়্যাল্‌জাব্রা,' ম্যাক্‌ডোনেল বলেন, 'সে নামের মূল আরবী হইলেও বীজ-গণিতের জন্য আমরা ভারতের নিকট ঋণী।' ‡ স্যর মনিয়ার উইলিয়মস্ বলিয়া গিয়াছেন,—'হিন্দু-দিগের নিকট হইতে আরবীয়-গণ কেবল যে বীজগণিতের মূল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা গণনাঙ্ক এবং দশমিক-চিহ্নও হিন্দু-দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। তাহাই এখন ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত। গণিত-বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে তদ্দ্বারা যে সহায়তা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বর্ণনার অতীত।' § মিসেস ম্যানিং বলেন,—'যে কোনও কোষ-গ্রন্থ, সাময়িক পত্র বা প্রবন্ধ আলোচনা করি না কেন; আমাদের গণাঙ্ক যে ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতীত হয়। আরব-গণের মধ্যবর্ত্তিতায় উহা ইউরোপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, স্পষ্টই বুঝা যায়।' ¶ ওয়েবার মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন,—

বিবিধ বিজ্ঞানে ভারতের প্রতিষ্ঠা।

* *Vide*, Dr. Schlegel's *History of Leterature.*

† *Vide*, Prof. Macdonell's *History of Sanskrit Literature.* "There is in the first the great fact that the Indians invented the numerical figures used all over the world."

‡ বীজ-গণিতের ইংরাজী নাম য়্যাল্‌জাবরা—(Algebra)। উহা স্পেনীয় শব্দ। আরবী-ভাষার 'আল্‌জাবর' শব্দ হইতে উহা উৎপন্ন। মুরগণ কর্তৃক স্পেনে এই নাম প্রবর্ত্তিত হয়।

§ *Vide*, Sir Monier Williams, *Indian Wisdom.*

¶ *Vide*, Mrs. Manning, *Ancient and Mediæval India*, *Vol. I.*

'হিন্দু-গণ বীজ-গণিতে এবং পাটীগণিতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। আরব-গণ তাঁহাদের নিকট সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ঋণী। ইউরোপ আরব-দিগের নিকট হইতেই তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে।' * স্যর উইলিয়ম হাণ্টার এবং অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতিও এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মতই অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—জ্যামিতির আদি ভারতবর্ষ, জ্যোতিষের আদিও ভারতবর্ষ। জ্যামিতির আবিষ্কারক বলিয়া পাশ্চাত্য-দেশ স্পর্দ্ধান্বিত। জ্যামিতির প্রথম ভাগের সপ্ত-চত্বারিংশ প্রতিজ্ঞা গ্রীক-দার্শনিক পীথাগোরাসের আবিষ্কার বলিয়া প্রচারিত ছিল। কিন্তু ডক্টর থিবোর গবেষণা প্রভাবে সে মত এখন উল্টাইয়া গিয়াছে। থিবো দেখাইয়াছেন, সুত্র-গ্রন্থ হইতে ঐ প্রতিজ্ঞার বিষয় জানা যায়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণের মতেই সুত্র-গ্রন্থ খৃষ্ট-জন্মের আট শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং গ্রীসে ঐ বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উহা আলোচিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। গ্রীক-দার্শনিক এ বিষয়ে হিন্দু-গণের অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বিশেষতঃ, দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পীথাগোরাস ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়া যখন প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন ভারতবর্ষ হইতেই তিনি জ্যামিতি-তত্ত্বের মূল-শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বতঃই মনে হইতে পারে। † জ্যোতিষ-শাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে আরবে এবং আরব হইতে ইউরোপে গিয়াছিল, সে প্রমাণের অভাব নাই। স্যর উইলিয়ম হাণ্টার বলেন,—'অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয় পণ্ডিতগণ হিন্দু-দিগের জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সমূহ 'সিন্দ হেন্দ' নামে আরবী-ভাষায় অনুবাদিত হয়।' ‡ সমর-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ যে কতদূর নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল, প্রাচীন-কালের যুদ্ধ-কৌশলের বিষয় আলোচনা করিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। এইরূপ, সঙ্গীত-বিদ্যায়, উদ্ভিদ-বিদ্যায়, ভূ-বিদ্যায় এবং তাড়িত-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

---

* *Vide*, Weber's *Indian Literature*.

† গণিত-শাস্ত্রের ইতিহাস-লেখক ক্যাণ্টর, গ্রীক-দিগের জ্যামিতির সহিত 'শুল্‌ভ-সূত্রের' সাদৃশ্য দেখিয়া 'শুল্‌ভ'-সূত্রে গ্রীক-সাহিত্যের প্রভাবের বিষয় লিখিয়া যান। কিন্তু ডক্টর থিবোর মতের আলোচনা করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত এবং ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ ক্যাণ্টর প্রভৃতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ বিষয়ে ডক্টর রায়ের উক্তি,—"The *Sulva Sutras*, however, dated from about the eighth century B. C. and Dr. Thibaut has shown that the geometrical theorem of the 4th proposition, Bk. I., which tradition ascribes to Pythagoras, was solved by the Hindus at least two centuries earlier, thus confirming the conclusion of V. Schroder that the Greek philosopher owed his inspiration to India."

‡ "The Arabs became their (Hindus') disciples in the eighth century and translated Sanskrit treatise, *Siddhanta* under the name *Sindhends*."—Hunter, *Indian Gazetteer*, India.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আয়ুর্ব্বেদ।

[আয়ুর্ব্বেদ-পরিচয় ;—আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব,—বেদে আয়ুর্ব্বেদের বীজ,—বেদে বিবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা প্রসঙ্গ,—উপনিষৎ-পুরাণাদিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিচয় ;—আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টির ইতিহাস,—ষোল জন আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তকের নাম,—তাঁহাদের গ্রন্থাদির উল্লেখ,—চরক ও সুশ্রুত ;—চরক ও সুশ্রুতের পৌর্ব্বাপর্য্য,—উভয়ের আবির্ভাব সম্বন্ধে বিতর্ক ;—চরক ও সুশ্রুতের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে নানা মতের আলোচনা,—চরক ও সুশ্রুতের ভাষা,—বাগভট, দাহ্লনাচার্য্য, নাগার্জ্জুন প্রভৃতির প্রসঙ্গ,—প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধারে চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ ;—চরক ও সুশ্রুতের আধুনিকত্ব প্রমাণে কয়েক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নিস্ফল প্রয়াস,—হাস প্রভৃতির যুক্তির প্রতিবাদ ;—আয়ুর্ব্বেদের বিভাগ,—আট বিভাগ ভিন্ন অন্যান্য বিভাগের অস্তিত্ব ;—সুশ্রুত-সংহিতা ও তাহার বর্ণিতব্য বিষয়,—চরক-সংহিতা ও তাহার বর্ণিতব্য বিষয় ;—অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ,—অষ্টাঙ্গহৃদয়, নিদান, সিদ্ধযোগ, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি ;—নাগার্জ্জুন, বৃন্দ, চক্রপাণি, মাধব কর, ভাবমিশ্র, শার্ঙ্গধর প্রভৃতির প্রসঙ্গ ;—আরবী-ভাষায় চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতির অনুবাদের সাদৃশ্য ;—প্রাচীন-ভারতে শরীর-বিজ্ঞানালোচনা,—শবব্যবচ্ছেদ-প্রণালী ;—অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রাদি,—তৎসমুদায়ের ব্যবহার শিক্ষাদান ;—দ্রব্যগুণ-তত্ত্ব ;—কঠিন কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা,—সর্পদংশনাদির বিষ-চিকিৎসা ;—রসায়ন-বিজ্ঞান,—দৃষ্টান্ত ;—চিকিৎসা-বিজ্ঞানালোচনার জন্য বিভিন্ন দেশের ভিষকগণের সম্মিলন,—মেডিকেল কংগ্রেস ;—পশু-চিকিৎসাদি ;—উপসংহারে বক্তব্য।]

আয়ুর্ব্বেদ-পরিচয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নাম—আয়ুর্ব্বেদ। সুশ্রুত বলিয়াছেন,—'এই শাস্ত্রে আয়ু বিদ্যমান আছে, অথবা এই শাস্ত্র পাঠ করিলে আয়ুর জ্ঞান হয়, এই অর্থে ইহার নাম আয়ুর্ব্বেদ হইয়াছে।' যথা, সুশ্রুতোক্তি,—"আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতেঽনেন বা আয়ুর্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ।" চরকের মতে,—'আয়ুই হিত এবং আয়ুই অহিত, আয়ুই সুখ এবং আয়ুই দুঃখ। অতএব হিতাহিতই আয়ুর মান। আয়ু যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহারই নাম—আয়ুর্ব্বেদ। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগকে আয়ু কহে। আয়ুর অন্যান্য নাম—ধারী, জীবিত, নিত্যগ, অনুবন্ধ। বেদবিৎ পণ্ডিতগণের মতে, আয়ুর জ্ঞান অতি পবিত্র সামগ্রী এবং মানব-গণের পক্ষে ইহ-পরলোকে হিতকর; তাহাই এই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।' এ সম্বন্ধে চরকের উক্তি,—

"হিতাহিতং সুখংদুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্। মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদ সঃ উচ্যতে॥
শরীরেন্দ্রিয়সত্ত্বাত্মসংযোগো ধারি জীবিতম্। নিত্যগশ্চানুবন্ধশ্চ পর্য্যায়ৈরায়ুরুচ্যতে॥
তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ। বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োর্হিতঃ॥"

অন্যত্র,—"তদা আয়ুর্বেদয়তীত্যায়ুর্ব্বেদঃ কথমিত্যুচ্যতে স্বলক্ষণতঃ সুখা সুখতো হিতাহিততঃ প্রমাণাপ্রমাণতশ্চ; যতশ্চায়ুষ্যানায়ুষ্যাণি চ দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি বেদয়ত্যতোঽপ্যায়ুর্ব্বেদঃ।" অর্থাৎ,—আয়ুকে বিদিত করে, এই জন্য আয়ুর্ব্বেদ নাম হইয়াছে। কিরূপে বিদিত করে, তাহা বলা হইতেছে। ইহা আয়ুর লক্ষণ, সুখায়ু, অসুখায়ু, আয়ুর প্রমাণ ও অপ্রমাণ

নির্ণয় করে। আর দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম সকল যেরূপে আয়ুষ্কর ও আয়ুঃক্ষয়কর হইয়া থাকে, তাহা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিলে জানা যায়। স্বাস্থ্য-রক্ষায় এবং রোগ-নিবারণ জন্য আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন।' 'ভাব-প্রকাশ' গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—"অনেন পুরুষো যস্মাৎ আয়ুর্বিন্দতি বেত্তি চ। তস্মান্মুনিবরৈরেশ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ॥" কিরূপে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন—আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সকলই অরোগিতা-সাপেক্ষ। রোগ দ্বারা সকল শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে রোগের হেতু, লক্ষণ ও নিদান বর্ণিত আছে। কি ঔষধ ব্যবহারে বা কি উপায়ে রোগমুক্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র কত কাল হইতে বিদ্যমান আছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সৃষ্টির যেমন আদি নির্ণয় করা যায় না; আয়ুর্ব্বেদেরও তেমনি মূল তথ্য নির্ণয় করা সুকঠিন।

আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব।

আয়ুর্ব্বেদ—বেদের একটী অঙ্গ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের সাধারণ নাম—আয়ুর্ব্বেদ। বেদে আয়ুর্ব্বেদ শব্দটী না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদের আলোচ্য বিষয় চারি বেদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। 'চরণ-ব্যূহ' গ্রন্থে মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন,—'আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ। আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত শস্ত্র-শাস্ত্র অথর্ব্ব-বেদের উপবেদ।' অথর্ব্ব-বেদের উপাঙ্গ-স্বরূপ লক্ষ-শ্লোকময় আয়ুর্ব্বেদ সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বেই স্বয়ম্ভু প্রচার করিয়াছিলেন,—সুশ্রুতে এতদুক্তি দৃষ্ট হয়। * চরক বলেন,—'ঋক, সাম, যজু, অথর্ব্ব, এই চারি বেদের মধ্যে ভিষক-গণ অথর্ব্ব-বেদকেই আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।' † স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হইতেই আয়ুর্ব্বেদের বিকাশ। প্রজাবর্গকে দীর্ঘজীবী করিতে এবং তাঁহাদিগের সুখ-সাধন অভিলাষে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ পঞ্চম বেদ মধ্যে পরিগণিত,—পুরাণাদি শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সনাতন বেদ এবং বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ, পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণের মতেও, পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে আয়ুর্ব্বেদ শব্দটী লিখিত না থাকিলেও, আয়ুর্ব্বেদের প্রভাবের বিষয় লিখিত আছে। ঋগ্বেদের অশ্বিদ্বয় চিকিৎসা-শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় পদে পদে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিলে, তাঁহাদিগকে অদ্বিতীয় ভেষজ-বিৎ এবং অদ্বিতীয় অস্ত্র-চিকিৎসক বলিয়া বুঝা যাইবে। তাঁহারা বৃদ্ধকে নবযৌবন-সম্পন্ন করিতে সমর্থ ছিলেন;—তাঁহারা অন্ধের দৃষ্টি-শক্তি-প্রদানের পরিচয় দিয়াছেন;—তাহারা খঞ্জের কৃত্রিম পদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ত্রিচত্বারিংশত্যধিক শততম সূক্তের প্রথম ঋকে অত্রি-ঋষি প্রার্থনায় জানাইতেছেন,—"হে অশ্বিদ্বয়! অত্রি ঋষি যজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহাকে তোমরা এরূপ করিলে যে, তিনি ঘোটকের ন্যায় গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।...

---

* "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ।"—সুশ্রুত-সংহিতা, সূত্রস্থান, প্রথম অধ্যায়, দ্রষ্টব্য।

† চরক-সংহিতা, সূত্রস্থান, ত্রিংশ অধ্যায়, দ্রষ্টব্য।

যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয়, তদ্রূপ তোমরা কক্ষিবান্ ঋষিকে নবযৌবন প্রদান করিয়াছিলে।" চলচ্ছক্তিহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের যৌবন-প্রাপ্তির বিষয় এই ঋকে উপলব্ধি হয়। প্রথম মণ্ডলের যোড়শাধিক শততম সূক্তেও (১০ম ঋকে) এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। সে ঘটনা সর্ব্বজনবিদিত। কক্ষিবান্ ঋষি অশ্বিদ্বয়ের * উপাসনায় বলিতেছেন,—"হে নাসত্যদ্বয়! শরীরের আবরণ যেরূপ খুলিয়া ফেলে, তোমরা জীর্ণ চ্যবন ঋষির শরীর-ব্যাপ্ত জরা সেইরূপ খুলিয়া ফেলিয়াছিলে। হে দস্রদ্বয়! তোমরা সেই পুত্রাদি-ত্যক্ত ঋষির জীবন-বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলে এবং তৎপরে তাহাকে কন্যা-সমূহের পতি করিয়া দিয়াছিলে।" চ্যবন ঋষির বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। চ্যবনপ্রাশ নামক বৈদ্যক ঔষধেও সে স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে। ফলতঃ, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের সাহায্যে অসাধ্য-সাধন হইত, এতাদৃশ ঘটনার উল্লেখ দৃষ্টে, বেশ বুঝিতে পারা যায়। ঐ সূক্তের পঞ্চদশ ও ষোড়শ ঋকদ্বয়েরও বঙ্গানুবাদ দেখুন,—"খেলের স্ত্রী বিশপ্‌লার পা পক্ষীর একটী পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রাত্রিযোগে সত্বই বিশপ্‌লাকে গমনের জন্য এবং শত্রু-ন্যস্ত ধন-লাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে। ১৫॥ যে ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার পিতা দৃষ্টি-হীন করিয়াছিলেন। হে ভিষজ দস্র নাসত্যদ্বয়! তাহার চক্ষুর্দ্বয় দর্শনে অসমর্থ হইয়াছিল। তোমরা তাহার সেই চক্ষুর্দ্বয় দর্শন-সমর্থ করিয়াছিলে।" খঞ্জের কৃত্রিম পদ-প্রস্তুতের এবং অন্ধের দর্শন-শক্তি-দানের ক্ষমতার বিষয় এই দুই ঋকে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতেছে। আরও অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়—মানুষ এখন বিশ্বাস করিতে পারিবেন না—সেই দেবভিষকদ্বয় মস্তক কাটিয়া তৎস্থলে নূতন মস্তক সংস্থাপিত করিতে সমর্থ ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সূক্তেরই দ্বাদশ ঋক এবং সায়নাচার্য্য-কৃত টীকা পাঠ করিলেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অস্ত্র-চিকিৎসার এবং ভেষজ-জ্ঞানের এতাধিক উন্নতির পরিচয় কোনও দেশে কোনও কালে দেখিতে পাই কি? সোমরস পান করিলে মানুষ তখন অমরত্ব লাভ করিতে পারিত,—বেদে, পুরাণে—নানা স্থানে এতদুক্তি দৃষ্ট হয়। কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া-প্রভাবে কিরূপে সোম প্রস্তুত হইত, এখন আর তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাইবার উপায় নাই। এখন নানা জনে সে সম্বন্ধে নানা কল্পনায় উপনীত হইতেছেন। কিন্তু যাহাই হউক, সোমরসের ইতিহাস স্মরণ করিলে রসায়ন-শাস্ত্রের চরম উন্নতির বিষয় মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে না কি? ঔদ্ভিজ্জোৎপন্ন ঔষধাদির এবং দ্রব্যগুণ-জ্ঞানের কি পরিচয়ই তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন! বেদে, পুরাণে, সর্ব্বত্রই সে পরিচয় দেদীপ্যমান্। দশম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের কয়েকটী ঋকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে ওষধি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যগুণ-বিভাগে ভিষকগণ কতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন, স্বতঃই প্রতিপন্ন হইবে। সে ঋক কয়েকটীর বঙ্গানুবাদ,—"যেমন রাজগণ যুদ্ধে একত্র হন, তদ্রূপ যে ব্যক্তির নিকট ওষধিগণ মিলিত হয়, অর্থাৎ যে ওষধি জানে,—

* গ্রীকদিগের পৌরাণিক কাহিনীতে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের ডায়স্কুরোই (Dioskouroi) নামক যমজ ভ্রাতৃদ্বয় অশ্বিনীকুমার-দ্বয়েরই অনুকৃতি।

সেই বুদ্ধিমান ভিষক ব্যক্তিকে চিকিৎসক কহে। সে রোগের ধ্বংস করে। অশ্ববতী, সোমবতী, উর্জ্জয়ন্তী, উদোষণ প্রভৃতি তাবৎ ওষধি সংগ্রহ করিয়াছি। অভিপ্রায় যে, এই ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করিব।" অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। সূক্তের অন্যান্য ঋকেও ঐ মর্ম্মের উক্তিই দৃষ্ট হয়। 'শরীরে যে কিছু পীড়া বিদ্যমান ছিল ওষধিগণ তাহা দূরীকৃত করিল, ওষধির দ্বারা রোগীর দৌর্ব্বল্য নিরাকৃত হয়—রোগ উপশম হয়' ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট করিয়াই সূক্তে উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, পূর্ব্বকালে দেবতারা ঐ সমস্ত ওষধির গুণের বিষয় অবগত ছিলেন এবং তাহাদিগের শত প্রকার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এতদ্বিষয়ও এই সূক্তে লিখিত আছে। * কেবল দুই একটী সূক্তে বা ঋকে নহে; ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাচীন আর্য্যগণের ভেষজ-তত্ত্ব-জ্ঞানের পূর্ণ-পরিচয় দেদীপ্যমান। প্রথম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশতি সূক্তে বরুণ-রাজের স্তবে শুনঃশেপ বলিতেছেন,—"শতন্তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্র-মুর্ব্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু।" অর্থাৎ,—'হে বরুণদেব! আপনার শতসংখ্যক এবং সহস্র সংখ্যক ঔষধ সকল আছে। আপনার প্রসাদ এবং অনুগ্রহ আমাদিগের উপর স্থির হউক।' উক্ত মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তের বিংশতিতম ঋকটী ভেষজ-জ্ঞানের পূর্ণ নিদর্শন। অধিকন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে প্রাচীন আর্য্যগণ যে অভিজ্ঞ ছিলেন, তদ্দ্বারা তাহা উপলব্ধি হয়। সে ঋকটী,—"অপ্সুমে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং আপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ।" অর্থাৎ,—'সোমদেব আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে অমৃত আছে, সকল জগতের সুখকর তেজ আছে এবং সকল প্রকার ঔষধ আছে।' এই ঋকের আলোচনায় পণ্ডিতগণ কিরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহারই উল্লেখ করিতেছি। তাঁহারা বলেন,—"এস্থলে আর্য্যদিগের জল-চিকিৎসার (Hydropathy) বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। জলেতে অমৃত, ঔষধ-সমূহ এবং পুষ্টিকর তেজঃ আছে, তাহা আর্য্যগণ জ্ঞাত ছিলেন। জল—সকল ঔষধের আধার, ইহা আর্য্যেরা সোম-দেবতার নিকটে শিক্ষা করেন। সোম ওষধি-সকলের ঈশ্বর। সুতরাং ওষধি-সকলের সার নিষ্কর্ষ পূর্ব্বক যে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত হয়, তৎসমস্তের গুণ জানেন। অধুনাতন চিকিৎসা পঞ্চবিধ;—এলোপ্যাথি (সমে বিষম চিকিৎসা), হোমিওপ্যাথী (সমে সমচিকিৎসা), হাইড্রো-প্যাথি (জল-চিকিৎসা), হাইজিনিজম্ (পথ্যমাত্র দ্বারা চিকিৎসা) এবং সাইকোপ্যাথী (ঔষধাদি ব্যবহার না করিয়া মনকে প্রফুল্ল রাখিয়া চিকিৎসা)। আর্য্যেরা সকল প্রকার চিকিৎসাই জানিতেন। জলের মধ্যে তাঁহারা যে বিশ্ব-শুভকর অগ্নি বা তেজঃ দেখিতেন, তাহার তথ্য নিশ্চয় করা সুকঠিন। ইহা দ্বারা মনুষ্য তেজস্বী, বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘজীবী হইতে পারে। এক্ষণেও যেমন পবিত্র নদীর জল স্পর্শ করিলে, সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইয়া স্নানকারী শুচি হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বেও হইত।" †

---

* দশম মণ্ডলের ৯৭ম সূক্তের প্রথম ঋকের প্রথম অংশে এবং দ্বিতীয় ঋকের শেষ অংশে দৃষ্ট হয়,—
"যা ওষধীঃ পূর্ব্বা জাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা। মনৈ নু বভ্রূণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ॥
শতং বো অম্ব ধামানি সহস্রমুত বো রুহঃ। ...অধা শতক্রত্বো যুয়মিমং মে অগদং কৃত॥"

† পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী, এম-এ, মহাশয় ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা দ্রষ্টব্য। এই টীকায় এবং এতদুক্ত সূক্তের ষোড়শ ঋকের টীকায় প্রতিপন্ন হয়,—গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীদিগকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করার প্রথা আবহমান-কাল প্রচলিত আছে এবং সে পূজা বেদ-বিরুদ্ধ নহে।

প্রাচীন-কালে চিকিৎসা যে ব্যবসায় মধ্যে পরিগণিত ছিল,—ঋগ্বেদে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। নবম মণ্ডলের দ্বাদশাধিক শততম সূক্তের তৃতীয় ঋকে প্রকাশ, শিশু ঋষি সোম-দেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—'দেখ আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যবভর্জ্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি।' * পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অথর্ব্ব-বেদে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিষয় অধিকতর বিশদভাবে লিখিত আছে। বিবিধ উদ্ভিদের শক্তির পরিচয় অথর্ব্ব-বেদে দৃষ্ট হয়। অপামার্গ (আপাংগাছ) আজি পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদে কোষ্ঠ-পরিষ্কারক ও মূত্রকারক ঔষধ মধ্যে গণ্য। অথর্ব্ব-বেদে (১।১৭।১) অপামার্গের উক্তবিধ রোগ-প্রতিষেধকতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। রক্তামাশয় পীড়ায় মুঞ্জ-ঘাসের উপকারিতার বিষয় অথর্ব্ববেদে বর্ণিত আছে; অথর্ব্ববেদের প্রথম কাণ্ডের দ্বিতীয় সূক্তে তদ্বিষয় দৃষ্ট হয়। কুষ্ঠব্যাধি দুরারোগ্য; কিন্তু এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভিদের নির্য্যাসে কুষ্ঠ-ব্যাধি আরোগ্য হইত, অথর্ব্ব-বেদে (১.২৩।১) তাহার পরিচয় পাই। গাছ-গাছড়ার রসে কেশ বৃদ্ধি পাইত, নূতন কেশ উৎপন্ন হইত, কেশের শোভা বৃদ্ধি পাইত,—অথর্ব্ববেদে (৬.১৩৬।১-২) লিখিত আছে। অধুনা-প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে উক্ত হয় নাই, এতাদৃশ রাসায়নিক সামগ্রীর বিষয়ও বর্ণিত আছে। অমৃত-প্রস্তুতের এবং অমৃত-পানে শত বৎসর জীবন-লাভের বিষয় অথর্ব্ববেদে দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত কত উল্লেখ করিব? মন্ত্র-শক্তিতে রোগ-নিবারণের বিষয় অথর্ব্ব-বেদে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। মন্ত্র-শক্তিতে অসাধ্য-সাধন হয়, অথর্ব্ব-বেদে তাহার বিশদ পরিচয় পাই। রোগী আসন্ন-মৃত্যুশয্যাশায়ী। ঋষি মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। মৃত্যু দূরে পলাইতেছে। মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া ঋষি বলিতেছেন,—

"অন্তকায় মৃত্যবে নমঃ প্রাণা অপানা ইহ তে রমন্তাম্।
ইহায়মস্তু পুরুষঃ সহাসুনা সূর্য্যস্য ভাগে অমৃতস্য লোকে॥"

অর্থাৎ,—'হে জীবনান্তকারী মৃত্যু! তোমাকে নমস্কার করি। ইহার প্রাণ এবং অপান বায়ু এখানেই থাকুক। ইহার আত্মা সূর্য্য-লোকে এবং অমৃত-লোকে অবস্থিতি করুক।' মন্ত্রের দ্বারা রোগ-নিবারণের বিষয় কেবল যে অথর্ব্ব-বেদেই দৃষ্ট হয়, তাহা নহে; ঋগ্বেদেও তদ্বিষয় বর্ণিত আছে। যক্ষ্মা-রোগ-প্রতিকারের বিষয়ে অথর্ব্ব-বেদের দ্বিতীয় কাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্তে যে মন্ত্র দেখিতে পাই, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ত্রিষষ্ট্যধিক শততম সূক্তে সেই মন্ত্রই রহিয়াছে। অথর্ব্ব-বেদে তাহার সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র লক্ষিত হয়। † অথর্ব্ব-বেদে অসংখ্য

* এই ঋকের অর্থ-নিষ্পত্তি সম্বন্ধে নানা গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। এক রমেশচন্দ্র দত্তই দুই স্থলে দুই রূপ অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার ঋগ্বেদ-সংহিতার বঙ্গানুবাদে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, উপরে আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রাচীন ভারতের সভ্যতা (*Civilisation in Ancient India*) গ্রন্থে তিনি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সেখানে তিনি লিখিয়াছেন,—"Behold, I am a composer of hymns, my father is a physician, my mother grinds corn on stone. We are all engaged in different occupatious." ডক্টর পি সি রায় 'হিন্দু-রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাসের' (*A History of Hindu Chemistry*) ভূমিকায় এই ইংরাজী অনুবাদটী রমেশচন্দ্র দত্তের পুস্তক হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

† গ্রিফিথ্সের অথর্ব্ববেদের অনুসরণে (*Translation of the Atharva Veda* by Mr. R. T. H. Griffiths.) খৃষ্টীয় সমিতি যে অথর্ব্ব-বেদ প্রকাশ করিয়াছেন, নানা ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ হইলেও সেই গ্রন্থে স্বতন্ত্রভাবে রোগ ও রোগের প্রতিকার বিষয়ে অথর্ব্ববেদের বর্ণনার আভাষ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাধির ও তাহার প্রতিকারের বিষয় লিখিত আছে। ফলতঃ, সংসারে যত প্রকার ব্যাধি ও তাহার চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে, শাস্ত্র-গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে সকলই তন্মধ্যে দেখিতে পাই। আর্য্য-হিন্দুগণের রসায়ন-বিজ্ঞানে জ্ঞানের পরিচয়ও অথর্ব্ব-বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথর্ব্ব বেদের স্তোত্র-সংক্রান্ত গ্রন্থে বুলুমফিল্ড * অথর্ব্ব-বেদের যে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, এ বিষয়ে তাহা প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি। রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ ডক্টর রায় সেই প্রমাণই মান্য করিয়াছেন। তাহারই অনুসরণে তিনি বলিয়াছেন,—'অথর্ব্ব-বেদের সময়ে স্বর্ণের এবং সীসকের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে হিন্দু দিগের যে অভিজ্ঞতার বিষয় অথর্ব্ব-সূক্তে প্রকাশিত আছে, তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক।' † যজুর্ব্বেদে, আরণ্যকে, উপনিষদে এবং পুরাণাদি গ্রন্থেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আর্য্যগণের অভিজ্ঞতার প্রমাণ-পরম্পরা বিদ্যমান আছে। যজ্ঞাহুতি প্রদানের সময় উৎসর্গীকৃত পশুর বিভিন্ন অংশ কর্ত্তন করিয়া আহুতি দিবার কথা, যজুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয়। তাহাতে শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম এবং তৎসমুদায় শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য অস্ত্র-সঞ্চালন-ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা শারীর-বিদ্যার ও অস্ত্র-বিদ্যার পরিচায়ক। যজুর্ব্বেদের বৃহদারণ্যকে (৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) শরীরের শিরা-প্রশিরার পরিচয়াদির বিষয় লিখিত আছে। শারীর-বিজ্ঞানে প্রাচীন হিন্দুদিগের অভিজ্ঞতার তাহা প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যজুর্ব্বেদীয় গর্ভোপনিষদে গর্ভস্থ ভ্রূণের এবং তাহার পরিবৃদ্ধি বিষয়ে যে বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে হিন্দুদিগের ধাত্রী-বিদ্যার চরমোৎকর্ষ-লাভের বিষয় অবগত হওয়া যায়। ঐ উপনিষদে শরীরের অবয়ব-সমূহের বিভাগ পরিবর্ণিত আছে। অথর্ব্ব-বেদের অন্তর্গত শারীর-উপনিষদেও শরীর-বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন-কালে পশ্বাদির পীড়ারও বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তদ্দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নাই। অগ্নিপুরাণ ও গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতে অশ্ব-চিকিৎসা, হস্তিচিকিৎসা প্রভৃতির বিবরণ দৃষ্ট হয়। ফলতঃ, সকল প্রকার চিকিৎসা-প্রণালীই স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সকল প্রকার চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরই প্রাচীন ভারতে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু সে উন্নতি এত দূর-অতীতের কথা যে, যিনিই যত গবেষণা করুন, তাহা কাল-নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে।

আয়ুর্ব্বেদ-সৃষ্টির ইতিহাস নানা স্থানে নানা-রূপে পরিকীর্ত্তিত আছে। কতদিন হইতে আয়ুর্ব্বেদ বা চিকিৎসা-শাস্ত্র পৃথিবীতে বিদ্যমান, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গরুড়-পুরাণের

আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টির ইতিহাস।

পূর্ব্বখণ্ডে একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—'ক্ষীরোদ-মন্থনের সময় ধন্বন্তরি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের ও ধার্ম্মিকদিগের জীবন-রক্ষার্থ ভগবান স্বয়ং বিশ্বামিত্র-তনয় মহাত্মা সুশ্রুতের নিকট আয়ুর্ব্বেদ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।' অগ্নিপুরাণের উনাশিত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে ঐ উক্তিরই সমর্থন আছে। দেব ধন্বন্তরি মৃত-সঞ্জীবনীকর আয়ুর্ব্বেদ সুশ্রুতের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন;

* Bloomfield's *Hymns of the Atharva Veda.*

† "It is of interest to know the alchemical notions which had gathered round gold and lead at the time of the *A. V.*"—Dr. Ray, *A History of Hindu Chemistry.*

সুশ্রুত কর্ত্তৃক জগতে তাহা প্রচারিত হয় ;—অগ্নিপুরাণে ইহাই দেখিতে পাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে, ব্রহ্মখণ্ডে, ষোড়শ অধ্যায়ে, লিখিত আছে,—"প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক চারি বেদ দর্শন করিয়া, পরে তাহার অর্থ-সকল পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ নামক অপর একখানি বেদের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা উক্ত পঞ্চম বেদ ভাস্করকে দান করিলে, ভাস্কর দেবও সেই আয়ুর্ব্বেদ হইতে স্বতন্ত্র একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন। পরিশেষে ভাস্কর নিজকৃত সংহিতার সহিত শিষ্যগণকে উক্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলে তাঁহারাও সকলে উভয় শাস্ত্র দর্শন করিয়া এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন। তাঁহাদের সেই সকল সংহিতা 'তন্ত্র' নামেও পরিচিত হয়। আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ বিশেষ অংশ, তাহারই অংশ-বিশেষ বলিয়া, আজ পর্য্যন্ত তন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভাস্করের ষোল জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম—ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, যাজলি, পৈল, করথ, অগস্ত্য। ইঁহাদের মধ্যে ভগবান ধন্বন্তরি প্রথমে 'চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিজ্ঞান' নামে এক সংহিতা প্রণয়ন করেন। পরে দিবোদাস 'চিকিৎসা-দর্শন' নামে ও কাশীরাজ 'চিকিৎসা-কৌমুদী' নামে অতি উত্তম শাস্ত্র রচনা করেন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় চিকিৎসকগণের ভ্রমনাশক 'চিকিৎসাসার' নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। পরে নকুল মহাশয় 'বৈদ্যক-সর্ব্বস্ব' নামে ও সহদেব 'ব্যাধিসিন্ধু-বিমর্দ্দন' নামে এবং যমরাজ 'জ্ঞানার্ণব' নামে মহাতন্ত্র প্রস্তুত করেন। পরে ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান চ্যবন 'জীবদান' নামে ও পরমযোগী জনক 'বৈদ্যক-সন্দেহ-ভঞ্জন' নামে সংহিতা প্রণয়ন করেন। বুধ 'চন্দ্রসার' নামে, জাবাল 'তন্ত্রসারক' নামে এবং মুনিবর যাজলি 'বেদাঙ্গসার' নামে তন্ত্র রচনা করেন। অনন্তর পৈল 'নিদান' নামে, করথ 'সর্ব্বধর' নামে ও অগস্ত্য মহাশয় 'দ্বৈধনির্ণয়' নামে সংহিতা রচনা করেন। এই ষোড়শ তন্ত্রই চিকিৎসা-শাস্ত্রের বীজ-স্বরূপ এবং ব্যাধি-নাশের কারণ ও বলাধানকারী।" সুশ্রুত-সংহিতায় প্রকাশ,—'আয়ুর্ব্বেদ প্রথমে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট দক্ষ ইহা প্রাপ্ত হন। দক্ষ হইতে অশ্বিনী-কুমারেরা, অশ্বিনীকুমার-দিগের নিকট হইতে ইন্দ্র এবং ইন্দ্র হইতে আমি ইহা প্রাপ্ত হই।' এই 'আমি' অর্থে সুশ্রুতকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, সুশ্রুত-সংহিতার প্রথমেই তাহা লিখিত আছে। কাশীরাজ দিবোদাস সেই ধন্বন্তরি বলিয়াও পরিচিত। এদিকে সুশ্রুত আপনাকেও ধন্বন্তরি বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। * চরক-সংহিতায় দেখিতে পাই,—'প্রথমতঃ ব্রহ্মা প্রজাপতি দক্ষকে এই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। পরে অশ্বিনীকুমার-দ্বয় দক্ষের নিকট এবং ইন্দ্র অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে সেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আসিয়া ঋষিদিগকে তাহা শিক্ষা-দান করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজের নিকট হইতে কোন্ কোন্ ঋষি কিরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ চরকে লিখিত নাই বটে; তবে তাঁহার পরবর্ত্তি-কালে পুনর্ব্বসু ছয় জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ

* সুশ্রুতোক্তি,—"অহং হি ধন্বন্তরিরাদিদেবো" ইত্যাদি। সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ে এতদুক্তি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন,—ইহা প্রক্ষিপ্ত

শিখাইয়াছিলেন এবং সেই ছয় জন আপন আপন নামে তন্ত্র রচনা করিয়া যান,—চরকে তাহার উল্লেখ আছে। সেই ছয় জনের নাম—অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি। তাঁহারা ঋষিগণ সমবেত আত্রেয়কে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাদের অসংখ্য শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র প্রচারিত হয়। আপাতঃ-দৃষ্টিতে আয়ুর্ব্বেদ-প্রচারের পূর্ব্বোক্ত বিবরণ-সমূহে পরস্পর-বিরোধী মত দৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যত দিন সৃষ্টি, তত দিন হইতেই জন্ম-জরা-মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব এবং তত দিন হইতেই জরা-ব্যাধি-প্রশমনের ও স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুষ্ঠান। কাহার নিকট হইতে কে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার তিনটী কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এক নামে একাধিক পুরুষের বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে; অথবা নামগুলি তাঁহাদের উপাধি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যে সুশ্রুত ধন্বন্তরি-রূপী ভগবানের নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান-প্রচলিত সুশ্রুত-সংহিতার সংকলনকর্ত্তা সুশ্রুত—হয় তো দুই জন দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইতে পারেন। শেষোক্ত সুশ্রুত প্রথমোক্ত সুশ্রুতের বংশধর হওয়াও বিচিত্র নহে। ধন্বন্তরি শব্দ পরবর্ত্তি-কালে উপাধি-রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াও অনুমান করা যাইতে পারে। ধন্বন্তরি কত সময়ে কত জন ছিলেন, একটু অনুসন্ধান করিলে সে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবরণাবলীতে একবার দেখিলাম,—ধন্বন্তরি সুশ্রুতের শিক্ষাগুরু, ধন্বন্তরিই আদিভূত; কিন্তু অন্যত্র আবার দেখিতে পাই, ধন্বন্তরি বলিতেছেন,—পূর্ব্বকালে আত্রেয় মুনিগণ ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। * অথচ চরক বলিয়াছেন,—আত্রেয়াদি ঋষিগণ ভেল প্রভৃতির শিষ্য। ভেল প্রভৃতি আবার পুনর্ব্বসুর শিষ্য এবং আয়ুর্ব্বেদ-প্রচারের বহু পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে অবস্থিত। সুশ্রুতের আর এক স্থলে (১ম অধ্যায়ে) আবার প্রকাশ,—কাশীরাজ-রূপে অবতীর্ণ দিবোদাস নামক সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান ধন্বন্তরির নিকট হইতে সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন। তবেই কত জন ধন্বন্তরি কত সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, সহজেই প্রতিপন্ন হয়। তাই আমরা ধন্বন্তরি, সুশ্রুত প্রভৃতি শব্দ পরবর্ত্তি-কালে উপাধি-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয়তঃ,—কাল-ব্যবধানে পর্য্যায়-ভঙ্গ। যতই কাল চলিয়া যায়, ততই পর্য্যায় নষ্ট হইয়া পর্য্যায়ের প্রধান প্রধান জনের নাম মাত্র বিদ্যমান থাকে। বিভিন্ন পুরাণে সূর্য্য-বংশের ও চন্দ্র-বংশের বংশলতায় অনৈক্য দৃষ্ট হয়। সেই অনৈক্যের সামঞ্জস্য-সাধন ব্যপদেশে আমরা যে মত ব্যক্ত করিয়াছি, এই পর্য্যায়ভঙ্গ সম্বন্ধেও সেই মত প্রকাশ করা যাইতে পারে। † সকলের সকল শিষ্যের নাম উল্লিখিত নাই; উল্লিখিত হওয়াও সম্ভবপর নহে। তৃতীয়তঃ,—কাল-ব্যবধানে পরিচয়-চিহ্ন লোপ। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের

---

* গরুড়-পুরাণে পূর্ব্ব-খণ্ডে, পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ে,—

"সর্ব্বরোগনিদানঞ্চ বক্ষ্যে সুশ্রুত তত্ত্বতঃ। আত্রেয়াদৈর্মুনিবরৈর্যথাপূর্ব্বমুদীরিতম্ ॥"

† "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ডের 'বংশ-পর্য্যায় আলোচনা' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। উক্ত খণ্ডের 'বেদ-চতুষ্টয়' শীর্ষক পরিচ্ছেদেও এতদ্বিষয়ের আলোচনা আছে।

অসম্ভাব নাই। ধন্বন্তরি দিবোদাসাদি আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন,—পরবর্ত্তী গ্রন্থে তাহার উল্লেখ মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু মূল গ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া সুকঠিন। এইরূপে যত দিন চলিয়া যায়, স্মৃতি ততই ক্ষীণ হইয়া আসে। তাই, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র এখনও পর্য্যন্ত লোপ না পাইলেও আয়ুর্ব্বেদের মেরুদণ্ড-স্থানীয় সকল ঋষির সকল গ্রন্থ এখন আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।

চরক ও সুশ্রুত (পৌর্ব্বাপর্য্য।)

চরক এবং সুশ্রুত ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য প্রায় সকল প্রাচীন গ্রন্থই এখন লোপ পাইয়াছে। চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থও যে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, তাহাও মনে হয় না। তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য কর্ত্তৃক লিখিত হইবার সময় উহার কোনও কোনও অংশ রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়ও মনে হইতে পারে। আপন গ্রন্থের প্রায় সকল স্থলেই সুশ্রুত আপনাকে ধন্বন্তরির শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অথচ, এক স্থলে লিখিত আছে দেখিতে পাই,—"অহং হি ধন্বন্তরিরাদিদেবো জরারুজামৃত্যুহরোঽমরাণাম্" অর্থাৎ,—'আমিই ধন্বন্তরি, আমিই আদি দেব (বিষ্ণু); আমি অমরদিগের জরা, মৃত্যু ও রোগ হরণ করিয়া থাকি।' এ উক্তি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। চরক-সংহিতার প্রণেতা বিষয়েও এইরূপ মতান্তর ঘটিবার কারণ আছে। চরকের উপসংহারে দেখিতে পাই, গ্রন্থকার বলিতেছেন,—'সুস্থ-রোগের চিকিৎসা-সম্বন্ধে অগ্নিবেশ এই তন্ত্রে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্য কোনও চিকিৎসা-শাস্ত্রেও থাকিতে পারে; কিন্তু এই তন্ত্রে যাহা নাই, তাহা আর কোনও চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাই।' তবে কি অগ্নিবেশই চরক-সংহিতার রচয়িতা? পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ যেরূপ শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে চলিয়া আসিয়াছে, চরকের ও সুশ্রুতের মত-পরম্পরাও সেইভাবে পুরুষানুক্রমে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। চরক-সংহিতায় ও সুশ্রুত-সংহিতায় চরকের ও সুশ্রুতের যে পরিচয় দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের এবং সংহিতাদ্বয়ের সময় নির্ণয় করা যায় না। সুশ্রুতে প্রকাশ,—'তিনি বিশ্বামিত্রের সন্তান এবং ধন্বন্তরির শিষ্য; আর তিনি ধন্বন্তরির মতই বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। চরকে প্রকাশ,—'চরক আত্রেয় ঋষির মত প্রকাশ করিতেছেন। চরকের প্রায় প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভেই 'ভগবান আত্রেয় কহিলেন' এইরূপ লিখিত আছে। 'ভাবপ্রকাশ' নামক বৈদ্যক গ্রন্থে চরক ও সুশ্রুতের কিছু কিছু পরিচয় আছে। চরক সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশ লিখিয়াছেন,—'মৎস্যাবতারে শ্রীহরি কর্ত্তৃক বেদের উদ্ধার সাধিত হয়। শেষ বা অনন্ত তখন অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। তিনি চর-রূপে মহীতলে আসিয়া লোক-সমূহকে পীড়ায় ব্যথিত দেখিতে পান; আপনিও তাহাতে ব্যথিত হন। জীবের রোগ-যাতনা দূর করিবার জন্য তিনি কোনও এক বিখ্যাত মুনি-গৃহে মনুষ্যরূপে জন্ম-গ্রহণ করেন। চর-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম চরক হয়। আত্রেয় মুনির শিষ্য অগ্নিবেশ চিকিৎসা-সংক্রান্ত যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল গ্রন্থের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া চরক-সংহিতা প্রণয়ন করেন।' সুশ্রুতের সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে প্রকাশ,—'বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত বারাণসী-ধামে গমন করিয়া কাশীরাজ দিবোদাসের নিকট

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেই দিবোদাসই ধন্বন্তরি নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তিনি সুশ্রুত নামক সংহিতা প্রণয়ন করেন।' চন্দ্রবংশের বংশ-লতায় কাশীরাজ দিবোদাসের অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাই,—দিবোদাস, ধন্বন্তরির প্রপৌত্র। (হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বংশলতা দ্রষ্টব্য; পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৩০৭, ৩০৮ ও ৩২৬ পৃষ্ঠা।) এ সকল বিবরণ হইতে চরক বা সুশ্রুতের সময়-নির্দ্ধারণের কোনই সম্ভাবনা নাই। তবে তাঁহাদের পূর্ব্বেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবর্ষে হইয়াছিল, এ সকল উক্তিতে সে প্রমাণ বিশেষ-ভাবেই পাওয়া যায়। চরক ও সুশ্রুত উভয় গ্রন্থ যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই সুশ্রুত অপেক্ষা চরকের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন। চরক ও সুশ্রুত-সংহিতার প্রসিদ্ধ অনুবাদক এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'চরক ও সুশ্রুতের কাল-নির্ণয় করা যায় না। চরক বলেন যে, ভরদ্বাজ—ইন্দ্রের শিষ্য। সুশ্রুত বলেন যে, মদীয় শিক্ষক ধন্বন্তরি ইন্দ্রের শিষ্য এবং কাশীরাজ দিবোদাসই ধন্বন্তরি। তবেই চরকের ভরদ্বাজ ও সুশ্রুতের ধন্বন্তরি পরস্পর সহাধ্যায়ী না হইলেও সমকালীন বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু এস্থলে একটু গোল আছে। বেদব্যাসের মতে ধন্বন্তরি বৈদ্যরাজ-রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ। তিনি কাহারও শিষ্য নহেন। যাহা হউক, মনে করা যাউক যে, সুশ্রুতোক্ত ইন্দ্র-শিষ্য ধন্বন্তরি ভরদ্বাজের সমকালীন; সুতরাং চরকের পূর্ব্বে আবির্ভূত। চরকেও ধন্বন্তরির উল্লেখ আছে। কিন্তু যিনি চরক ও সুশ্রুত একত্রে পাঠ করিয়াছেন, তিনি আপনিই বলিবেন যে, সুশ্রুত চরক অপেক্ষা নব্য। সুশ্রুতে পারদের উল্লেখ আছে, চরকে নাই। ইহাও সুশ্রুতের আপেক্ষিক নব্যত্বের প্রমাণ।' * পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এই কথাই বলিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু এ মতের সর্ব্বথা অনুমোদন করি না। সুশ্রুতের নাম পুরাণের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত আছে। † কিন্তু চরকের নাম কোনও প্রসিদ্ধ পুরাণের কোথাও উক্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে হিসাবে চরককে আধুনিক বলিয়া মনে করিতে হয়। 'ভাব-প্রকাশ'-প্রণেতা চরককে সংগ্রহ-কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সংগ্রহ-কালে তিনি যদি পারদের উল্লেখ নাই করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। কোনও গ্রন্থে কোনও বিষয়ের উল্লেখ না থাকাই যে আদিমত্বের পরিচায়ক, তাহাই বা কি করিয়া স্বীকার করিতে পারি? অধিকন্তু চরক দুই এক স্থলে

---

* "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার কর্ত্তৃক অনুবাদিত, 'সুশ্রুত-সংহিতার' ভূমিকা দ্রষ্টব্য। চরকের ও সুশ্রুতের অনুবাদ-উদ্ধারে স্থানে স্থানে 'বঙ্গবাসী' সংস্করণেরই অনুসরণ করিয়াছি।

† গরুড়পুরাণ, পূর্ব্ব-খণ্ড, ১৪১ম অধ্যায় হইতে ১৭৬ম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রায় সকল অধ্যায়েই সুশ্রুতের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণের ২৭১ম, ২৮১ম প্রভৃতি অধ্যায়-সমূহে সুশ্রুতের নাম আছে। ঐ সকল স্থলে ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণের সূর্য্য-বংশে জনকের পরবর্ত্তী ত্রিচত্বারিংশ পর্য্যায়ে সুশ্রুত নামক জনৈক রাজার নাম দৃষ্ট হয়। গরুড়পুরাণেও ১০২ম অধ্যায়ে মৈথিল-রাজবংশে সুপার্শ্বের তনয়ের নাম সুশ্রুত। সে সুশ্রুত স্বতন্ত্র। বিশ্বামিত্র-তনয় সুশ্রুতই আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা বলিয়া পরিচিত।

বলিয়াছেন,—'অস্ত্র-চিকিৎসা বিষয়ে ধন্বন্তরি-সম্প্রদায়ই প্রামাণ্য।' সুশ্রুতে প্রকাশ,—সুশ্রুত শল্যতন্ত্র (অস্ত্রাদি প্রয়োগ-প্রণালী) বর্ণন করিয়াছেন। ইহা দ্বারাও প্রকারান্তরে সুশ্রুতের পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রতিপন্ন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে, চরক ও সুশ্রুত অতি প্রাচীন গ্রন্থ, উহাদের সময় নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে,—এই পর্য্যন্ত বলাই বোধ হয় সমীচীন।

চরকের ও সুশ্রুতের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে অধুনা অনেকেই মস্তিষ্ক চালনা করিয়া থাকেন; আর তাঁহাদের অধিকাংশের মতেই সুশ্রুত অপেক্ষা চরকের প্রাচীনত্ব কীর্ত্তিত হয়।

পৌর্ব্বাপর্য্য বিষয়ে আলোচনা।

এম সিল্‌ভেন্ লেভি *—ফরাসী দেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। প্রাচ্য-ভাষায় অভিজ্ঞ বলিয়াও তিনি পরিচিত। চীন-দেশীয় 'ত্রিপিটক' গ্রন্থের আলোচনা ব্যপদেশে তিনি চরক-নামীয় জনৈক চিকিৎসকের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেই চরক—শক-বংশীয় নৃপতি কনিষ্কের দীক্ষা-গুরু ছিলেন। এই কনিষ্কের রাজত্ব-কাল দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং চরক দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে গ্রীসের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল—গ্রীস হইতেই চরক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বীজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফরাসী-পণ্ডিতের এ যুক্তি যে সমীচীন নহে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। পাণিনির সূত্রে চরকের নাম আছে। যথা,—'কঠচরকাল্লুক্' (৪।৩।১০৭)। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকারের গবেষণা প্রভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে,—পাণিনি খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। গোল্ডষ্টুকার বলেন,—'খৃষ্ট-জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যমুনি বুদ্ধদেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পাণিনি তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তি-কালের লোক।' † কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি ‡ উভয়েই পাণিনি-সূত্রের টীকা ও ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। কাত্যায়নের টীকার নাম—বার্ত্তিক; আর পতঞ্জলির ব্যাখ্যার নাম—মহাভাষ্য। পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিকের উপর মহাভাষ্য লিখিত হইয়াছিল। কথিত হয়, ঐ কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই সমসাময়িক। গোল্ডষ্টুকার ১৪০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইঁহাদিগের বিদ্যমানতার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণি এবং ভোজ উভয়েই পতঞ্জলিকে চরকের সম্পাদনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। § এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে, ফরাসী পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত যে ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুশ্রুত অপেক্ষা চরককে প্রাচীন বলিবার প্রধান কারণ, পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন,—'চরক অপেক্ষা সুশ্রুতের বিষয়-বিন্যাস-প্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ। যখন যাহা মনে আসিয়াছে, চরক বিশৃঙ্খল-ভাবে তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। সময় সময় তিনি অবেক্ষণে ও পরীক্ষায় উপেক্ষা-প্রদর্শন করিয়া দার্শনিক-তত্ত্বেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। এ পক্ষে চরক অপেক্ষা সুশ্রুতের মত অনেকাংশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির

---

* M. Sylvan Levi—*Journ. Asiatique, 1896.*

† Goldstucker, *Panini : His Place in Sanskrit Literature.*

‡ ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রচারক কাত্যায়ন ও যোগশাস্ত্র-প্রণেতা পতঞ্জলি হইতে স্বতন্ত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

§ চক্রপাণি ও ভোজ সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবিৎ চক্রপাণি প্রণীত চক্রদত্ত, দ্রব্যগুণ ও চরকের টীকা প্রভৃতি বিশেষ আদরণীয়।

উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অনেক বিষয়ের অনুসরণ চরকে দেখিতে পাই। সে হিসাবেও চরকের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়।' * পণ্ডিতগণ আরও বলেন,—'চরকের ভাষা সরল, অলঙ্কার-বর্জ্জিত; বেদের ব্রাহ্মণ অংশের সহিত উহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।' বুলার এবং ফ্লিট অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন,—দ্বিতীয় শতাব্দীর গদ্য-ভাষা কাব্যময়। গির্ণারের এবং নাসিকের খোদিত-লিপি-সমূহে যে গদ্য পরিদৃষ্ট হয়, সপ্তম শতাব্দীর বাণভট্টের এবং সুবন্ধুর রচনা অপেক্ষা তাহা অল্প অলঙ্কারযুক্ত ও অপেক্ষাকৃত সরল। সপ্তম শতাব্দীর বাণ প্রভৃতির ভাষা অতি-বিস্তৃত পদাবলী-সম্বলিত এবং অনুপ্রাস ও উপমাপূর্ণ। কিন্তু চরকের ভাষা সে তুলনায় অতি সরল। সুতরাং চরক ঐ সকল রচনার পূর্ব্ববর্ত্তি-কালেই রচিত হইয়াছিল। অথর্ব্ব-বেদের পরে চিকিৎসা-সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও তাহা স্বীকার করেন। কারণ, চরকেই প্রকাশ,—চরক অগ্নিবেশের গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন এবং সে সময় অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি প্রভৃতি প্রণীত চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ-সমূহ দেশে আদরণীয় ছিল। কালক্রমে সে সকল গ্রন্থ লোপ পাইয়া আসে। বাগ্‌ভট যখন চরক ও সুশ্রুত- অবলম্বনে 'অষ্টাঙ্গহৃদয়' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহাতে ভেল এবং হারীতের নামোল্লেখ আছে মাত্র। তখনই সে সকল গ্রন্থ লোপ পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়,—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে চরক-সংহিতা প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণই এই মতের পোষকতা করেন; সুতরাং পাশ্চাত্য-দেশে সভ্যতা-বিস্তারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ চিকিৎসা-বিজ্ঞানালোচনায় প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল, প্রতিপন্ন হয়। যেমন চরকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে, তেমনি সুশ্রুতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও প্রমাণের অভাব নাই। সুশ্রুত এখন যে ভাষায় লিখিত ও প্রচারিত আছে, অনেকে মনে করেন, সে ভাষা চরকের ভাষা অপেক্ষা আধুনিক। অনেক পরিভাষা ও সংজ্ঞা চরকে ও সুশ্রুতে অভিন্ন দৃষ্ট হয় বটে। কিন্তু সুশ্রুতের ভাষা চরকের ভাষা অপেক্ষা কিছু নীরস, সংক্ষিপ্ত ও সারকথা পূর্ণ। এই জন্য সুশ্রুতকে চরকের পরবর্ত্তী বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু রচনা নীরস, সংক্ষিপ্ত ও সারকথা-পূর্ণ হইলেই যে তাহা আধুনিক হইবে, তাহাও স্বীকার করা যায় না। সূত্র-সাহিত্যের রচনা নীরস, সংক্ষিপ্ত ও সারকথা-পূর্ণ। কিন্তু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণই নির্দ্ধারণ করেন,—'পুরাণাদির সরল ও বিস্তৃত ভাষার প্রবর্ত্তনার পূর্ব্বে সূত্র-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল।' তার পর, অধুনা-প্রচলিত সুশ্রুত-সংহিতাই কি প্রচীন সংহিতা? এই সংহিতা কি অপরিবর্ত্তিত-ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে? প্রমাণ তাহা পাওয়া যায় না। পরন্তু তাহার বিপরীত প্রমাণই দেখিতে পাই। এখন সুশ্রুত-সংহিতা যে ভাষায় প্রচলিত, কথিত হয়, সুশ্রুত-সংহিতার সঙ্কলন সময়ে নাগার্জ্জুন এইরূপ ভাষায় সুশ্রুতের অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদির ভাষা-পরিবর্ত্তনের এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মানব-ধর্ম্ম-সংহিতা কোন্ কালে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় হয় না। প্রথমে সূত্রাকারে উহা গ্রথিত ছিল বলিয়াই

* ন্যায়োক্ত ষোড়শ পদার্থের অনুসরণে চরক চুয়াল্লিশ পদার্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বিষয় চরক-সংহিতার বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে উহার ভাষা অন্য আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক বলিব কি, সে দিনের কৃত্তিবাস বাঙ্গালা পদ্যে যে রামায়ণ লিখিয়া যান, সেই পদ্য এখন পরিবর্ত্তিত। রামায়ণ সেই কৃত্তিবাসের রচিত বলিয়াই প্রচারিত আছে; অথচ তাহার ছন্দোবন্ধ অন্যের প্রবর্ত্তিত। * প্রাচীন সুশ্রুত গ্রন্থও এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। অনেকে বলেন,—সুশ্রুতের 'উত্তর তন্ত্র' অংশটী সুশ্রুতের সময়ে প্রচলিত ছিল না; নাগার্জ্জুন-চার্য্য তাহা সুশ্রুতের সহিত সংযোজন করিয়া যান। ইতিহাসে নাগার্জ্জুন নামে বহু ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আল্-বারুণি এক জন নাগার্জ্জুনের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। আল্-বারুণির বর্ণনায় প্রকাশ,—'সেই নাগার্জ্জুন রসায়ন-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সোমনাথের নিকটবর্ত্তী দৈহক গড়ে তাঁহার বসতি ছিল। তিনি রসায়ন-সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ পূর্ণ যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা এখন প্রায়ই পাওয়া যায় না।' আল্‌বারুণি আরও বলেন,—তাঁহার ইতিহাস রচনার এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই নাগার্জ্জুন বিদ্যমান ছিলেন। অনেকে এই নাগার্জ্জুনকেই সুশ্রুতের সংস্কার-কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন। এদিকে আবার হুয়েন-সাং যখন (৬২৯ খৃষ্টাব্দে) ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে নাগার্জ্জুন নামধেয় জনৈক সুপণ্ডিত ও সম্মানার্হ রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ বৌদ্ধ শতবাহন নৃপতির দরবারে অবস্থিতি করিতেন। বিল বলেন,—'নাগার্জ্জুন শতবাহন রাজার বন্ধু ছিলেন। শতবাহন উড়িষ্যার দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত কোশল-দেশের অধিপতি বলিয়া পরিচিত। এই নাগার্জ্জুন—নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব নামেও প্রসিদ্ধ। ইনি রসায়ন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন ভেষজের সংমিশ্রণে ইনি একরূপ বটিকা প্রস্তুত করিতে জানিতেন; তাহা সেবন করিলে শত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি পাইত, শরীর ও মন একটুও ক্ষয়-প্রাপ্ত হইত না। শতবাহন রাজা এই অপূর্ব্ব গুণসম্পন্ন ঔষধ সেবন করিয়াছিলেন।' বিলের গ্রন্থে আরও প্রকাশ,—'এই নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব বিভিন্ন ভেষজের সংমিশ্রণে রসায়ন প্রক্রিয়া প্রভাবে প্রস্তর-খণ্ড হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারিতেন।' † হুয়েন-সাং যে নাগার্জ্জুনের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং বিল যে নাগার্জ্জুনের অলৌকিক শক্তির বর্ণন করিয়াছেন, কবি বাণভট্ট বিরচিত 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে সেই নাগার্জ্জুনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাণভট্ট হুয়েন সাঙের ভারতাগমন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন প্রতিপন্ন হয়। এখন, পূর্ব্বোক্ত দুই নাগার্জ্জুনের কোন্ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত সঙ্কলন করিয়াছিলেন, কে বলিতে পারেন? বৌদ্ধ-দিগের

* ৬৬ বা ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসের রামায়ণের পরিবর্ত্তন সাধন করেন। এদেশে এখন যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাহা জয়গোপালের সংস্করণেরই আদর্শ।

† Nagarjuna Bodhisatva was practised in the art of compounding medicines; by taking a preparation (pill of cake) he nourished the years of life for many hundreds of years, so that neither the mind nor appearance decayed. Satavaha raja had partaken of this mysterious medicine,...Then Nagarjuna Bodhisatva, by moistening all the great stones with a divine and superior decoction (medicine or mixture) changed them into gold"—Beal's *Buddhist Records of the Western World.* Vol. II.

ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মধ্যে নাগার্জ্জুনের নাম প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত নাগার্জ্জুন-দ্বয় হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝা যায়। তিনি মাধ্যমিক দর্শনের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত। এই নাগার্জ্জুন কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন,—খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বিদর্ভ-রাজ ভোজভদ্র এই নাগার্জ্জুনের সারগর্ভ বক্তৃতা ও ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ভোজভদ্র ৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। এই নাগার্জ্জুনই মাধ্যমিক সূত্র-প্রণেতা; ইনি চিকিৎসা-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। অর্থাৎ,—ইহা দ্বারাও সুশ্রুত-গ্রন্থ সঙ্কলিত হওয়ার কথা প্রচারিত আছে। কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণীতে' কাশ্মীর-রাজ আর এক নাগার্জ্জুনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শাক্যসিংহের জন্মের দেড় শত বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে হিসাবে, খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থ শতাব্দীর শেষ অংশে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমাংশে তাঁহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। কাশ্মীররাজ নাগার্জ্জুন সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীর উক্তি,—"বোধিসত্ত্বশ্চ দেশেঽস্মিনেকভূমীশ্বরোঽভবৎ। স তু নাগার্জ্জুনঃ শ্রীমান্ ষড়্দর্শনসংশ্রয়ী॥" অনুসন্ধান করিলে, এইরূপ আরও নানা নাগার্জ্জুনের পরিচয় পাওয়া যায়; এবং কোন্ নাগার্জ্জুন যে সুশ্রুতের সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হয়। যাহাই হউক, যে নাগার্জ্জুনই সুশ্রুতের সংস্কার-সাধন করুন, এই সংস্কার-সাধনের বিষয় আলোচনায় দুইটী ভাব উপলব্ধি হইতে পারে। প্রথমতঃ,—সুশ্রুতের প্রাচীনত্ব। দ্বিতীয়তঃ,—পাশ্চাত্যদেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। মহাভারতে সুশ্রুতকে বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কাত্যায়নের বার্ত্তিকেও সুশ্রুতের নাম দৃষ্ট হয়। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন খৃষ্ট-জন্মের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন,—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং সুশ্রুত কত পূর্ব্বের, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। প্রাচীনকালের সংগৃহীত লিপি প্রভৃতি দৃষ্টেও চরক ও সুশ্রুতের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়। বাওয়ার পাণ্ডুলিপিতে (Bower Manuscriptএ) চরক ও সুশ্রুতের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। চ্যবনপ্রাশ, শিলাজতু প্রভৃতি ঔষধের উপাদান-সমূহ তাহাতে লিখিত আছে। তন্মধ্যে বৃদ্ধ-সুশ্রুত নামক সুশ্রুতের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ডক্টর হর্ণেল পূর্ব্বোক্ত সেই সকল 'বাওয়ার পাণ্ডুলিপির' একটী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির বর্ণমালার কাল-নির্দ্দেশে চেষ্টা পাইয়াছেন। ডক্টর বুলারও বিশেষ গবেষণা প্রকাশে পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলিপির লিখন-কাল নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অনুমান করেন, ৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সেই সকল পাণ্ডুলিপি সঙ্কলিত হইয়াছিল। যে সময় ঐ সকল পাণ্ডুলিপি লিখিত হইয়াছিল, তখনও সুশ্রুতাদির আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে কেহ কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের কাল-নির্দ্দেশ লইয়া এখনও যে সংশয় উপস্থিত, তখনও সেই সংশয় ছিল। ৪০০ বা ৫০০ খৃষ্টাব্দের পাণ্ডুলিপিতে চরক ও সুশ্রুতের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হওয়ায় এবং তখনও তাঁহারা বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক বলিয়া প্রচারিত থাকায়, তাঁহাদের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। বর্ত্তমানে যে পরিবর্ত্তিত

ভাষায় এবং যে পরিবর্ত্তিত পদ্ধতিতে সুশ্রুত ও চরক প্রচারিত হইতেছে, এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে, সে পরিবর্ত্তনও সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

আধুনিকত্ব প্রমাণে নিষ্ফল চেষ্টা।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোনও কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থকে আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। কীদৃশ যুক্তির সাহায্যে তাঁহারা এবম্বিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহার আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। জর্ম্মণ পণ্ডিত হাস বলেন,—'দশম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল।' তাঁহার মতে,—'বাগ্‌ভট, মাধব ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি গ্রন্থে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে বীজ ছিল, চরক এবং সুশ্রুত তাহাই বিস্তৃত-ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন; অথচ, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার-গণের অনুসরণের কথা স্বীকার করেন নাই।' চিকিৎসা-বিজ্ঞানে হিন্দু-গণের মৌলিকত্ব হাসের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছে। * তিনি বলিয়াছেন,—'হিন্দুগণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গ্রীক-দিগের অনুসরণকারী। বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতির বৈষম্যে যে রোগোৎপত্তি ঘটে, এই ধাতুগত রোগনিদান-তত্ত্ব হিন্দুগণ গ্রীক-দিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। গ্যালেন ও হিপক্রেটস্ চিকিৎসা বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় ভেষজ-বিজ্ঞানের তাহাই মূল অবলম্বন। সুশ্রুত নামটীতে পর্য্যন্ত অনুকরণ। সক্রেটিস হইতে আরবী ভাষায় সাক্রাত শব্দের উৎপত্তি। সুশ্রুত নামের তাহাই মূল। সাক্রাত শব্দ কখনও কখনও বাক্রাত

* একা হাস নহেন; হাসের ন্যায় অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতই ভারতের প্রাধান্যের বিষয় অস্বীকার করিয়াছেন। যিনি নিতান্ত অস্বীকার করিতে না পারিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,—'একই সময়ে দুই দেশে একই ভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল।' কিন্তু যাঁহারা একেবারে সত্যের অপলাপ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাঁহারা সকল বিষয়েই ভারতকে অন্যের অনুসরণকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্টের নাম এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—'সংস্কৃত ভাষাটী পর্য্যন্ত গ্রীক-ভাষার অনুকরণ। আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ অধিকার করার পর ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ গ্রীক-ভাষার আদর্শে সংস্কৃত ভাষা গঠন করিয়াছে। এক হিসাবে গ্রীক-ভাষা জাল করিয়া সংস্কৃত-ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।' এ সকল লোকের কথা উল্লেখযোগ্য নহে। তথাপি যে উল্লেখ করিলাম, তাহার কারণ,—ম্যাক্সমূলার, ম্যাকডোনাল প্রভৃতির কথাতেই এ প্রকার অর্ব্বাচীনতার উত্তর আছে; এতৎপ্রসঙ্গে সে উত্তর জানিয়া রাখা মন্দ নহে। প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় ম্যাক্সমূলার সারা জীবন অতিবাহিত করেন। শেষ জীবনে এ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই সকল কথা বিশেষ-ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন,—"In some respects, and particularly in respect to the greater things........ India has as much to teach as Greece and Rome, nay, I should say more. We must not forget, of course, that we are the direct intellectual heirs of the Greeks, and that our philosophical currency is taken from the capital left to us by them. Our palates are accustomed to the food which they have supplied to us from our very childhood and hence whatever comes to us now from the thought'minds of India is generally put aside as merely curious or strange, whether in language, mythology, religion or philosophy."—*Auld Lang Syne.*

রূপেও উচ্চারিত হয়। বাক্রাত শব্দ—হিপক্রেট্স্ নামেরই অপভ্রংশ।' হাস কেবলমাত্র এই কথা বলিয়াই নিরস্ত নহেন। হিপক্রেট্সের জন্মস্থান 'কস'-পল্লীর নামানুসারে কাশী নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াও তিনি প্রচার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। যাঁহারা সামান্য একটু অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল যুক্তিতে কখনই আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের অনেক সামগ্রীর সহিত গ্রীসের অনেক সামগ্রীর সাদৃশ্য আছে; আমরা তাহা অস্বীকার করি না। অধ্যাপক রোথ দেখাইয়াছেন,—চরকের 'সূত্রস্থান' অধ্যায়ের সহিত এস্কিউলাপিয়সের 'এডিস' অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। রোথ সেই সাদৃশ্যটুকু দেখাইয়াছেন বলিয়াই এম লিটার্ড একেবারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'হিন্দুরা গ্রীক-দিগের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছে।' হাসের সিদ্ধান্তও এইরূপ। ইঁহারা উভয়েই কাহারও পৌর্ব্বাপর্য্য বা আদিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। গ্রীসের সভ্যতার অনেক পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষের সভ্যতালোকে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল,—এ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, হাস বা লিটার্ড কেহই ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহসী হইতেন না। হাসের যুক্তির প্রতিকূলে দুই একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি; তাহাতেই তাঁহাদের যুক্তির অসারতা উপলব্ধি হইবে। প্রথমতঃ, হাস যে বলিয়াছেন,—'ধাতুগত রোগনিদান-তত্ত্ব গ্রীকদিগের নিকট হইতে হিন্দুগণ গ্রহণ করিয়াছেন';—এ উক্তি সম্পূর্ণ উপহাসাস্পদ। কারণ, ঋগ্বেদেই এতদ্বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় আছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে চতুস্ত্রিংশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে "ত্রিধাতু শর্ম্ম বহতং শুভস্পতী" বাক্যে বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা ত্রি-ধাতু-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ অংশের অর্থ,—'হে উত্তম ঔষধের পালক! তোমরা আমাদিগের তিন ধাতুর (বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা) সাম্য-কারক ঔষধ প্রদান কর।' প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সমূহেও এতাদৃশ প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিপিটকের অন্তর্গত মহাবগ্‌গে, ভেষজ-প্রকরণ অধ্যায়ে, সুশ্রুতের অনুসরণ দেখিতে পাই। ধাতুগত রোগ-নিদানের পরিচয়ও সেখানে বিদ্যমান। মহাবগ্‌গ গ্রন্থ—বিনয়-পিটকের অংশ। ত্রিপিটক—বুদ্ধদেবের বাণী; সুতরাং বুদ্ধদেবের সময়েও সুশ্রুতের প্রচার ছিল, বুঝিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদে রোগের যে সকল নাম আছে, পাণিনির সূত্রে তাহার বহু নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্দ্বারা পাণিনির সময়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং রোগ-নিদান বিষয়ে ভারতবর্ষ বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল, ইহাও প্রতিপন্ন হয়। কাত্যায়নের বার্ত্তিকে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা ত্রি-ধাতুর উল্লেখ আছে। কাত্যায়ন গ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। রিজ ডেভিডস্ এবং ওল্ডেনবর্গ প্রমুখ পণ্ডিত-বর্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—বিনয়-পিটক খৃষ্ট-জন্মের ৩৬০ হইতে ৩৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায়;—হিপক্রিট্সের জন্মের বহু পূর্ব্বে হিন্দু-দিগের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ত্রি-ধাতু (বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা) বিষয়ক জ্ঞান স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাগভট, মাধব এবং শার্ঙ্গধরকে হাস যে চরক ও সুশ্রুতের

* এই ধাতু-বিষয়ক সাদৃশ্যে আর একটী কথা বলিবার আছে। হিন্দুদিগের চিকিৎসা-বিজ্ঞান মতে ধাতু প্রধানতঃ ত্রিবিধ,—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। কিন্তু গ্রীকদিগের মতে ধাতু চতুর্ব্বিধ,—রক্ত, পিত্ত, জল ও

পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভ্রমাত্মক। কারণ, বাগ্‌ভট গ্রন্থারম্ভেই চরক ও সুশ্রুতের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ। ভেড়াদ্যা কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥" অর্থাৎ,—প্রাচীন-কালের ঋষির গ্রন্থ বলিয়াই যদি কোনও গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া চিরকাল মান্য হইত, তাহা হইলে সুশ্রুতের ও চরকের পরিবর্ত্তে সাধারণে্য কেন ভেল প্রভৃতির গ্রন্থ প্রচলিত হয় না? যাহা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহাই গ্রাহ্য হয়। বাগ্‌ভটের গ্রন্থে সুশ্রুত ও চরকের যে পরিচয় আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে অতি প্রাচীন-কালের গ্রন্থকার বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুশ্রুতের একটী টীকার নাম—ভানুমতী। চক্রপাণি দত্ত সেই টীকা প্রণয়ন করেন। ১০৬০ খৃষ্টাব্দে চক্রপাণির বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। দহ্লন-মিশ্র 'নিবন্ধ-সংগ্রহ' নামে সুশ্রুতের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। মথুরার নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থানপালের রাজত্বে তিনি বাস করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে গয়াদাস, ভাস্কর, মাধব এবং জেজ্জটা সুশ্রুতের টীকা লিখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তবেই বুঝা যায়, কতকাল হইতে কি ভাবে চরক ও সুশ্রুতাদি গ্রন্থ সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ শব্দে কোনও নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থকে বুঝায় না। আয়ুর্ব্বেদ বলিতে সাধারণতঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানকেই বুঝাইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে সুশ্রুত প্রধানতঃ আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেই আট ভাগের নাম—শল্য-তন্ত্র, শালাক্য-তন্ত্র, কায়-চিকিৎসা, ভূত-বিদ্যা, কৌমার-ভৃত্য, অগদ-তন্ত্র, রসায়ন-তন্ত্র ও বাজীকরণ-তন্ত্র। আয়ুর্ব্বেদের এই বিভাগ-অষ্টকের কোন্ কোন্ বিভাগে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সুশ্রুত তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

আয়ুর্ব্বেদের বিভাগ।

"শল্যতন্ত্র—বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, ধূলি, লোষ্ট্র, অস্থি, কেশ, নখ প্রভৃতি শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা বাহির করিবার জন্য, পুঁযস্রাব করিবার জন্য এবং গর্ভ-শল্য উদ্ধার করিবার জন্য, যেরূপ উপায় সকল আবশ্যক, তাহা এই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আর ইহাতে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নির প্রয়োগ এবং ব্রণ-সমূহের বিবরণ কথিত হইয়াছে। শালাক্য-তন্ত্র—এই তন্ত্রে যত্রুর (কণ্ঠ-বক্ষের সন্ধির) উপরিস্থ অঙ্গ-সমূহের অর্থাৎ কর্ণ, চক্ষু, মুখ, নাসিকা প্রভৃতির রোগ-সমূহের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। কায়-চিকিৎসা—এই তন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ-সংশ্রিত ব্যাধি অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোথ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতির চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। ভূতবিদ্যা—দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃ-গণ, পিশাচ, নাগ প্রভৃতি গ্রহদিগের আবেশ জন্য যাহাদের মন বিকৃত হইয়া থাকে, এই শাস্ত্রে তাহাদের গ্রহ-শান্তির জন্য শান্তি-কর্ম্ম, বলিদান প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে। কৌমার-ভৃত্য—এই শাস্ত্রে শিশু-পালন, ধাত্রী-দুগ্ধের শোধন এবং দূষিত স্তন্য ও গ্রহ-দোষ-

শ্লেষ্মা। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ গ্রীকদিগের মৌলিকত্ব অনুভব করেন। কিন্তু সুশ্রুত-সংহিতার সূত্রস্থানের একবিংশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা দেখিলে গ্রীক-গণকে তাহারই অনুসরণকারী বলিয়া বুঝা যাইবে। সেখানে আছে,—"কফ, পিত্ত ও বায়ু ভিন্ন দেহ থাকিতে পারে না এবং শোণিত ভিন্নও দেহ থাকিতে পারে না।"

জনিত বালরোগ-সমূহের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। অগদ-তন্ত্র—এই শাস্ত্রে সর্প, কীট, লুতা, বৃশ্চিক ও মুষিকাদির দংশন-জনিত বিষের বিবরণ এবং বিবিধ প্রকার বিষ ও সংযোগ বিষের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। রসায়ন-তন্ত্র—যাহাতে অকালে বৃদ্ধ হওয়া না যায়, যাহাতে আয়ু, মেধা ও বল হয় এবং যাহাতে চিরকারী রোগ-সমূহের উপশম হয়, এই শাস্ত্রে সেই সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে। বাজীকরণ-তন্ত্র—ইহাতে অল্প শুক্রের বর্দ্ধন, দূষিত শুক্রের শোধন, ক্ষীণ শুক্রের উপচয় ও শুষ্ক শুক্রের পুনরুৎপাদন এবং পুংশক্তি প্রভৃতির উপায় সকল কথিত হইয়াছে।" এই আট বিষয়ের উপদেশ আছে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ 'অষ্টাঙ্গ' নামেও অভিহিত হয়। সুশ্রুতে আয়ুর্ব্বেদের এইরূপ আট বিভাগের পরিচয় পাওয়া যাইলেও, আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে আরও বহু বিভাগ আছে এবং আয়ুর্ব্বেদে আরও বহু বিভাগের আলোচনা হইয়াছে;—আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র আলোচনা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। দ্রব্য-গুণ-বিচার—আয়ুর্ব্বেদের একটী অঙ্গ। যদিও সুশ্রুত আপন সংহিতার নানা স্থানে দ্রব্যগুণ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের তদুক্ত আট বিভাগের মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই। তার পর, আয়ুর্ব্বেদকে স্থূলভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান মনে করিলে পশ্বাদির চিকিৎসা-প্রণালীও আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুশ্রুতে ও চরকে তদ্বিষয় লিখিত হয় নাই। কিন্তু শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহা আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে। এইরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত আরও বিবিধ বিষয় সুশ্রুত ও চরকে উল্লিখিত হয় নাই; অথচ, এ প্রসঙ্গে সাধারণ-ভাবে তত্তদ্বিষয় অবশ্য উল্লেখ-যোগ্য। তবে সুশ্রুতে ঐ সকল বিষয় বর্ণিত না হওয়ার কারণও বুঝিতে পারি। কারণ, ধন্বন্তরি যখন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র বর্ণন করেন, শিষ্যগণ তাঁহার নিকট হইতে কেবল শল্য-তন্ত্রের বিষয়েই উপদেশ চাহিয়াছিলেন। সুশ্রুত শল্য-তন্ত্রের বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াই সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরির নিকট শিষ্যগণ কেবল শল্য-তন্ত্র বিষয়েই যে কি জন্য উপদেশ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ-পরম্পরাও সুশ্রুত উল্লেখ করিয়াছেন। 'শল্য-তন্ত্র আয়ুর্ব্বেদের প্রথম অঙ্গ। কেন না, জ্বরাদি শারীর-রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে আঘাত-হেতু ব্রণ-সকল উৎপন্ন হইত এবং এই তন্ত্রের উপদেশ মতেই সেই সকল ব্রণের পূরণ করা হইত। আর এই তন্ত্রের সাহায্যেই যজ্ঞের ছিন্ন মস্তক সংযুক্ত করা হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, রুদ্র যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। পরে দেবতারা অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের নিকট আসিয়া কহিলেন,—'হে প্রভাবশালী পুরুষদ্বয়! তোমরা আমাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, তোমরা যজ্ঞের মস্তক সংযুক্ত করিয়া দাও। অশ্বিনী-কুমারেরা কহিলেন,—তাহাই হউক। অনন্তর তাঁহাদিগের জন্য দেবতারা ইন্দ্রকে যজ্ঞভাগ দিতে সম্মত করিয়াছিলেন। অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের মতে, শল্য-তন্ত্রই অধিক অভিমত। কেন-না, ইহার সাহায্যে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, ও অগ্নি প্রয়োগ করা যায় বলিয়া আশু ক্রিয়া হয়; অথচ, সর্ব্ব-তন্ত্রের সহিত ইহার সমানতা আছে।' তবেই বুঝা যায়, একমাত্র শল্য-তন্ত্রের আলোচনা লক্ষ্য ছিল বলিয়াই সুশ্রুত স্থূলভাবে আট বিভাগে আয়ুর্ব্বেদকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ফলতঃ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্বকেই 'আয়ুর্ব্বেদ' শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারা যায়।

নানারূপ বিপ্লবে আয়ুর্ব্বেদের প্রায় সকল প্রাচীন গ্রন্থই এক্ষণে লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে এখন সুশ্রুত আর চরকই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সুশ্রুত ও চরক ভিন্ন আর আর যে সকল গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় পরবর্ত্তি-কালের রচনা বা সঙ্কলন মাত্র। সুতরাং অন্যান্য সকল গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিবার পূর্ব্বে সুশ্রুতে এবং চরকে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার একটু আভাষ দিবার প্রয়াস পাইতেছি। সুশ্রুত-সংহিতা ছয় অংশে বিভক্ত। সেই ছয় অংশের নাম,—(১) সূত্রস্থান, (২) নিদান-স্থান, (৩) শারীর-স্থান, (৪) চিকিৎসিত-স্থান, (৫) কল্প-স্থান, (৬) উত্তর তন্ত্র। সুশ্রুত-সংহিতার সূত্রস্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে সুশ্রুতের অষ্ট বিভাগের কোন্ কোন্ অধ্যায়ে কি কি বিষয় লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে, তাহার সূচী দৃষ্ট হয়। (১) সূত্রস্থান ছয়-চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সেই অধ্যায়-সমূহে শরীরের ব্যাধির, ঔষধের ও অস্ত্রাদির বিষয় সাধারণ-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাদি ধাতুর বিষয়, রক্ত চলাচলের বিষয় এবং বিবিধ ব্রণোৎপত্তি, ক্ষত-বিষয়ক জ্ঞান ও সুকৌশলে অস্ত্র-চালনার পদ্ধতি এই অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্রাকারে সকল বিষয়ের আলোচনা আছে বলিয়া এই অংশের নাম সূত্রস্থান হইয়াছে। (২) নিদান-স্থান ষোলটী অধ্যায়ে বিভক্ত। বাতব্যাধি, অর্শ, অশ্মরী, ভগন্দর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, উদর, মূঢ় গর্ভ, বিদ্রধি, বিসর্প, নারীস্তনরোগ, গলগণ্ড, মুখরোগ প্রভৃতি রোগের হেতু ও লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় এই অংশ নিদান-স্থান নামে অভিহিত। (৩) শারীর-স্থানে দশটী অধ্যায় আছে। শুক্র, শোণিত, গর্ভ, শিরা, ধমনী প্রভৃতির বর্ণন এই অংশে দৃষ্ট হয়। এই অংশকে শারীর-বিজ্ঞান বলিলে বলা যায়। গর্ভ-সঞ্চার ও সন্তানের উৎপত্তি, ধাত্রী-বিদ্যা প্রভৃতির পরিচয় এই অংশেই বিবৃত আছে। (৪) চিকিৎসিত স্থান চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে নানাবিধ ব্যাধির চিকিৎসার বিষয় বিবৃত আছে; এই জন্য ইহার নাম—চিকিৎসিত স্থান। মহাকুষ্ঠ, মহাবাতব্যাধি, অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি বিষম বিষম রোগের চিকিৎসা-প্রণালী এই অংশে বিবৃত আছে। (৫) কল্প-স্থান আটটী অধ্যায়ে-বিভক্ত। বিষ ও বিষনাশক ঔষধ এই অংশে কল্পিত হইয়াছে বলিয়া এই অংশের নাম—কল্পস্থান। সর্পদষ্ট-রোগীর চিকিৎসা এই অংশে লিখিত আছে। (৬) উত্তর-তন্ত্র ষটূষষ্টিতম অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অংশে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ও মস্তিষ্ক প্রভৃতির রোগের এবং জ্বর, রক্তামাশয়, যক্ষ্মা, গুল্ম, পাণ্ডু, ক্রিমি, উন্মত্ততা, সর্দ্দিগর্ম্মি প্রভৃতি অসংখ্য পীড়ার চিকিৎসার বিষয় পরিবর্ণিত রহিয়াছে। উত্তর-তন্ত্র সুশ্রুতের পরিশিষ্ট। কারণ, এই তন্ত্রে অন্যান্য অংশের বর্ণিতব্য বিষয়-সমূহও প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইয়াছে।

সুশ্রুত-সংহিতা।

চরক-সংহিতা আট ভাগে বিভক্ত;—(১) সূত্রস্থান, (২) নিদান-স্থান, (৩) বিমান-স্থান, (৪) শারীর-স্থান, (৫) ইন্দ্রিয়-স্থান, (৬) চিকিৎসিত স্থান, (৭) কল্পস্থান, (৮) সিদ্ধিস্থান। সূত্র-স্থানের ত্রিশটী অধ্যায়ে ঔষধের উৎপত্তি, ভিষকের কর্ত্তব্য, ঔষধের ব্যবহার, রোগের আরোগ্য-প্রণালী, ভেষজ-তত্ত্ব এবং খাদ্যাদির বিষয় লিখিত আছে। (২) নিদান-স্থান অংশে জ্বর, রক্তপিত্ত, গুল্ম, প্রমেহ, কুষ্ঠ, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি রোগের বর্ণন

চরক-সংহিতা।

আছে। (৩) বিমানস্থান আট অধ্যায়ে বিভক্ত। এই বিমান-স্থান বিভাগে রসায়ন-বিস্তার, দেহ-তত্ত্বের ও শারীর-বিজ্ঞানের বিষয় দৃষ্ট হয়। রোগের বিভাগ, ভিষকের লক্ষণ প্রভৃতিও এই অংশে লিখিত আছে। (৪) শারীর-স্থানের আটটী অধ্যায়ে আত্মার ও শরীরের সম্বন্ধ, গর্ভাবক্রান্তি এবং শরীরের অস্থি-পঞ্জরাদির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। (৫) ইন্দ্রিয়-স্থান দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ের পীড়া ও অন্তিম অবস্থার পূর্ব্ব লক্ষণের বিষয় এই অংশে পরিবর্ণিত। (৬) চিকিৎসিত স্থান ত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই সকল অধ্যায়ে জ্বর, রক্ত-পিত্ত, গুল্ম, প্রমেহ, কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, অর্শ, অতিসার, সর্প, গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগের চিকিৎসা-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। (৭) কল্পস্থান অংশ দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। বমন, বিরেচন প্রভৃতি প্রতিষেধন কার্য্য কি ঔষধে সাধিত হইতে পারে এবং কোন্ কোন্ পীড়ায় উহার আবশ্যক হয়, এই অংশে তাহা লিখিত আছে। (৮) স্বেদ, বমন, বিরেচন, নাস ও বস্তি এই পঞ্চ ক্রিয়া কোন্ অবস্থায় আবশ্যক এবং কোন্ অবস্থায় অনাবশ্যক, তাহার বিবরণ এই অংশের বারটী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সুশ্রুত ও চরক উভয়ই বিস্তৃত গ্রন্থ। উহাদের এক একটী অধ্যায় অসংখ্য জ্ঞাতব্য-তত্ত্বে পূর্ণ। এত অল্প স্থানে, দুই চারি ছত্রে, তাহার সম্যক্ আভাষ প্রদান করা সম্ভবপর নহে। অধ্যায়ের সূচীগুলি বা শিরোনাম মাত্র উল্লেখ করিতে গেলেই বহু পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করে।

সুশ্রুত এবং চরকের পরই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-ক্ষেত্রে বাগ্‌ভটের সমাদর। তাঁহার গ্রন্থের নাম—'অষ্টাঙ্গহৃদয়'। শল্য, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারবিদ্যা, অগদ-তন্ত্র, রসায়ন-তন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র—আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের যে আট অঙ্গ, সেই অষ্টাঙ্গের * আলোচনা আছে বলিয়াই বাগ্‌ভট্ট প্রণীত গ্রন্থের নাম—অষ্টাঙ্গ-হৃদয়। বাগভটের অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ে চরকের ও সুশ্রুতের সার সার বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকন্তু ভেল-সংহিতা এবং হারীত-সংহিতা (এই দুই গ্রন্থ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য) হইতেও কোনও কোনও অংশ বাগ্‌ভটের গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ আছে। অস্ত্র-চিকিৎসা বিষয়ে বাগ্‌ভটের গ্রন্থে কোনও কোনও বিষয়ের সংযোজন ও পরিবর্দ্ধন দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জাত ঔষধের সহিত তিনি খনিজ ও স্বভাবজ লবণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। পারদ-ব্যবহার-প্রণালীও তাঁহার গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা তেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। ধাতুঘটিত ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালীর বিষয়ও অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ে দৃষ্ট হয়। বাগ্‌ভট কোন্ সময় বিদ্যমান ছিলেন এবং কোন্ সময় তাঁহার অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মতামত আছে। রাজতরঙ্গিণীর মতের

বাগ্‌ভট ও অষ্টাঙ্গ-হৃদয়।

* অষ্টাঙ্গ শব্দে চিকিৎসা-শাস্ত্রে এইরূপ আট বিভাগের বিষয় সূচিত হয় বটে; কিন্তু যোগ-শাস্ত্রে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি,—এই আট প্রকার যোগকে অষ্টাঙ্গ বলে। শরীরের অষ্টাঙ্গ বলিতে দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, কণ্ঠ ও মেরুদণ্ড অথবা দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, জানু এবং দুই চরণ অথবা দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, মন এবং বাক্য বুঝাইয়া থাকে। অষ্টাঙ্গ-প্রণাম বলিতে জানু, পদ, হস্ত, উরস, বুদ্ধি, শিরস, বাক্য, চক্ষুঃ—এই অষ্টাঙ্গ বুঝা যায়। রাজনীতির অঙ্গীভূত উপায়াষ্টককেও অষ্টাঙ্গ বলে।

অনুসরণে কোর্ডিয়র নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—'কাশ্মীর-রাজ জয়সিংহের রাজত্ব-কালে, ১১৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় সঙ্কলিত হইয়াছিল।' কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণে বাগ্‌ভট যে ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে তাঁহার বিদ্যমানতার বিষয় বুঝিতে পারা যায়। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচার—বাগ্‌ভট প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজক ইৎ-সিং যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি অষ্টাঙ্গহৃদয় সঙ্কলনের পরিচয় পাইয়াছিলেন। যদিও ইৎ-সিং * আপনার গ্রন্থে অষ্টাঙ্গহৃদয়ের বা বাগ্‌ভটের নামোল্লেখ করেন নাই; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের আট-বিভাগ বা আট অঙ্গ অবলম্বন করিয়া জনৈক চিকিৎসক যে একখানি সুন্দর গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় 'তাঞ্জুরে' চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের অনুবাদের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জর্জ্জ হথ (George Huth) সিদ্ধান্ত করেন,—'খুব আধুনিক হইলেও তাঞ্জুর গ্রন্থ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পরে রচিত হয় নাই। বাগদাদের কালিফ-গণ কর্তৃক বাগ্‌ভট অনুবাদিত হওয়ার সহিত এ সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য-সাধন করা যাইতে পারে। কোর্ডিয়রের নির্দ্দেশ-ক্রমে ইহার অপেক্ষা আরও পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে অষ্টাঙ্গহৃদয় সঙ্কলনের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।' তবে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়াদি পর্য্যালোচনা করিয়া কুন্তে (Kunte) নির্দ্ধারণ করেন,—'খ্রীষ্ট-জন্মের অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

সুশ্রুত, চরক ও বাগ্‌ভট ভিন্ন বৈদ্যক-শাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মধ্যে নাগার্জ্জুন, বৃন্দ, চক্রপাণি, মাধবকর, ভাবমিশ্র প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে নাগার্জ্জুন পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতীত হয়। নাগার্জ্জুন নামক চিকিৎসা গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি।

নাগার্জ্জুন, চক্রপাণি, মাধব প্রভৃতি।

নাগার্জ্জুনের নামে আরও অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে; নাগার্জ্জুন নামেও একাধিক ব্যক্তির বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে নাগার্জ্জুনের বৈদ্যক-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি, তাঁহার সম্বন্ধে রোগ-প্রতিকারক ভেষজাদির প্রচার বিষয়ে নানা কিংবদন্তী আছে। তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া প্রস্তর-স্তম্ভে এবং বৃক্ষ-বল্কলে ভিন্ন ভিন্ন রোগের ঔষধাবলী লিখিয়া রাখিতেন; তদ্দৃষ্টে ঔষধ-ব্যবহারে জনসাধারণ রোগমুক্ত হইত। কক্ষপুট-তন্ত্রে তাঁহার প্রচারিত বিবিধ ঔষধের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। চক্রপাণির 'চিকিৎসা-সংগ্রহ' গ্রন্থে নাগার্জ্জুনাঞ্জন ও নাগার্জ্জুন-যোগ প্রভৃতি ঔষধের উল্লেখ দৃষ্টে, নাগার্জ্জুনের গ্রন্থ হইতে তৎসমুদায় সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। নাগার্জ্জুন যে চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপে তাহা বুঝা যায়। নাগার্জ্জুন-তন্ত্র, নাগার্জ্জুনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, যোগরত্নাবলী, লঘুযোগ রত্নাবলী, কৌতুহল-চিন্তামণি, পক্ষপুট এবং নাগার্জ্জুনীয় প্রভৃতি চিকিৎসা-গ্রন্থ নাগার্জ্জুনের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাগার্জ্জুন

* "ইৎ-সিং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্যের পরিচয়,—"These eight arts formerly existed in eight books, but lately a man epitomised them and made them into one bundle." I'Tsing—*Records of the Buddhist Religion* by Taka Kasu. ডাক্তার রায় এই উল্লেখ হইতে অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের বিষয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন

নামে বহু জনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের কোন্ জন কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এবং কোন্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তন্নতন্ন নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী জনৈক নাগার্জ্জুনের প্রসিদ্ধির পরিচয় ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হুয়েন-সাঙের এবং ফা-হিয়ানের ভারতভ্রমণ-কালে তাঁহারা নাগার্জ্জুন নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধলেখকের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গয়ার ষোল মাইল উত্তরে নাগার্জ্জুনী গুহা নামে যে প্রসিদ্ধ গুহা দৃষ্ট হয়, নাগার্জ্জুনের নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেই নাগার্জ্জুনী গুহায় যে খোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের উত্তরাধিকারী দশরথ কর্ত্তৃক তাহা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া প্রচার। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী নাগার্জ্জুনই যদি বৈদ্যক-গ্রন্থ প্রণেতা নাগার্জ্জুন হন, তাহা হইলে তিনি অশোকের সমসময়ে বা তাঁহার অল্প দিন পরে বিদ্যমান ছিলেন। কারণ, দশরথ—অশোকের পৌত্র। তৎকর্ত্তৃক নাগার্জ্জুনী গুহার উল্লিখিত লিপি খোদিত হইয়াছিল। সে হিসাবে, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে নাগার্জ্জুন বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাকেই বৈদ্যক-শাস্ত্র-প্রণেতা নাগার্জ্জুন বলা যাইতে পারে। চক্রপাণির প্রধান গ্রন্থের নাম—চক্রদত্ত; বৃন্দের প্রধান গ্রন্থের নাম—সিদ্ধযোগ। ইঁহারা উভয়েই নাগার্জ্জুন-প্রবর্ত্তিত বিবিধ চিকিৎসা-প্রণালীর অনুসরণ করেন। পাটলিপুত্র নগরের প্রস্তর স্তম্ভে নাগার্জ্জুন নেত্র-পরিষ্কারক ঔষধের বিবরণ লিখিয়া যান। বৃন্দ ও চক্রপাণির গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে;—"নাগার্জ্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে।" ইঁহারা উভয়েই চরক, সুশ্রুত ও বাগ্ভটের অনুসরণকারী ছিলেন। চক্রপাণি—দত্ত উপাধিধারী। ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্যমানতার বিষয় সপ্রমাণ হয়। তিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার রচনায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থে মগধের নাম মহাবোধি প্রদেশ এবং 'বোধিসত্ত্বেন ভাষিতম্, সুখবতীবর্ত্তি, সৌগতমঞ্জনম্' প্রভৃতি উক্তি দৃষ্টে পণ্ডিতগণ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগিতার কথা উল্লেখ করেন। চক্রপাণির পিতার নাম—নারায়ণ। তিনি গৌড়েশ্বর নয়পালের * রাজচিকিৎসক ছিলেন। নয়পাল মহীপালের উত্তরাধিকারী। নয়পাল ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রন্থের উপসংহারে চক্রপাণি আপনার এইরূপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

"গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারিপাত্র নারায়ণস্যতনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনুপ্রথিতলোধ্রবলী কুলীনঃ শ্রীচক্রপাণিরিহকর্ত্তৃপদাধিকারী॥"

গ্রন্থকার শ্রীচক্রপাণি লোধ্রবলী বংশজ। তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ভানু। পিতা নারায়ণ গৌড়েশ্বরের পাকশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। চক্রপাণির বাসগ্রামের নাম—ময়ূরেশ্বর। শেষ জীবনে তিনি চৌপাড়িয়ায় বাস করিয়াছিলেন। চক্রদত্ত, দ্রব্যগুণ, সর্ব্বসার-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনায়, চরকের টীকা-প্রণয়নে, শব্দ-চন্দ্রিকা নামক অভিধান সঙ্কলনে, তিনি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। কাদম্বরী, মাঘ এবং ন্যায়ের টীকা-প্রণয়নেও চক্রপাণি অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার শিক্ষকের নাম—

* নয়পালের রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে কানিংহামের 'আর্কিয়লজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে এবং 'এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' ৬০শ ভাগে আলোচনা আছে।

দত্ত এবং ইনি নিদান-প্রণেতা মাধবকরের সমসাময়িক। চক্রপাণি-প্রণীত চক্রদত্ত গ্রন্থে বিভিন্ন রোগের ঔষধের ব্যবস্থা এবং সেই সকল ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী বিবৃত আছে। বৃন্দের রচিত গ্রন্থের আদর্শে চক্রপাণি আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন;—"যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিক সিদ্ধযোগানত্রৈব নিক্ষিপতি কেবলমুদ্ধরেদ্বা॥" মাধবকর—নিদান প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি বৃন্দ ও চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। চক্রপাণির গ্রন্থে পতঞ্জলিকে * চরকের একজন সঙ্কলন-কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ আছে। চক্রপাণির টীকাকার শিবদাস সেই পতঞ্জলিকে লৌহ-শাস্ত্রবিৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতে কোনও কোনও অংশ টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পতঞ্জলিকে রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ বলিয়া মনে হয়। খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনুসন্ধিৎসুগণ প্রমাণ করেন। চক্রপাণি যেমন বৃন্দের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বৃন্দ সেইরূপ নিদানের ও মাধবকরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। চক্রপাণির দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে বৃন্দের এবং বৃন্দের দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে নিদান-গ্রন্থ-প্রণেতা মাধবকরের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। মাধবকরের পিতার নাম—ইন্দুকর। আয়ুর্ব্বেদ-প্রকাশ, আয়ুর্ব্বেদ-রসশাস্ত্র, কুটমুদ্গর, রসকৌমুদী এবং নিদান প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে নিদান গ্রন্থই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি বহু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে এই নিদান গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। ব্যাধি-সমূহের উৎপত্তির কারণ, স্বরূপ-তত্ত্ব এবং তাহাদের ভাবী ফল নিদান গ্রন্থে বিবৃত আছে। ইংরাজীতে যাহাকে প্যাথলজি (Pathology) বলে, নিদান সেই গ্রন্থ। ব্যাধির পঞ্চলক্ষণ, জ্বর-নিদান, অতিসার-নিদান প্রভৃতি রোগ লক্ষণ-সমূহ এই গ্রন্থে পরিবর্ণিত। মাধব-কর বঙ্গদেশজ বলিয়া প্রচার থাকিলেও কেহ কেহ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যজ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব 'আর্য্যগণের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস' সংক্রান্ত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি মাধবকরকে সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার হিসাবে মাধব-করই মাধবাচার্য্য; গোলকণ্ডা প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। বলা বাহুল্য, এ মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। বিশেষতঃ, সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্যের (মাধব বিদ্যারণ্যের) বিদ্যমানতা খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সপ্রমাণ হয়। কিন্তু বাগ্‌দাদের কালিফগণ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে নিদান আরবী-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'কিতাব-উল্-ফিরিস্ত' গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রণীত হয়। হাজি কালিফ এবং ইব্‌ন্ আবু উসাইবিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

---

* যোগ-শাস্ত্র-প্রণেতা পতঞ্জলির সহিত এই পতঞ্জলিকে অনেকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। আল্-বারুণির গ্রন্থে (ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ডে) সেই কথাই আছে। আবার ন্যায়-বার্ত্তিকায় ভোজ লিখিয়া গিয়াছেন,—'পতঞ্জলি দেহের ও মনের উভয়ের চিকিৎসক ছিলেন।' অর্থাৎ, যিনিই যোগশাস্ত্র-প্রণেতা, তিনিই বৈদ্য ছিলেন।' "যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন। যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলীরানতোঽস্মি।"

ইঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, হারুণ-অল্-রসিদের এবং আল্ মনসুরের রাজত্ব-কালে হিন্দুগণের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ—ভৈষজ্য-তত্ত্ব, দ্রব্যগুণ-তত্ত্ব, চিকিৎসা-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ—আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। * ডায়েজ প্রণীত 'ম্যানালেক্টা মেডিকা' গ্রন্থ এবং উষ্টেনফিল্ড, কর্টন, ফ্লুগেল, মুলার এবং অন্যান্য আরবী-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের গ্রন্থ এ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সকল প্রমাণ সত্ত্বে মাধব করকে কোনক্রমেই মাধবাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রাচীন বৈদ্যক-গ্রন্থের মধ্যে আর একখানি প্রসিদ্ধ বৈদ্যক-গ্রন্থ—'ভাবপ্রকাশ'। ভাবমিশ্র এই গ্রন্থের সঙ্কলন-কর্ত্তা। ধন্বন্তরি, আত্রেয়, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি অবলম্বনে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ভাবপ্রকাশ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রায় সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের সার এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া, এই গ্রন্থের উপযোগিতা অত্যধিক। শারীর-তত্ত্ব, স্বাস্থ্য-বিধি, রোগনিদান এবং চিকিৎসা-প্রণালী এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ভাবমিশ্রের বনরত্নমালা প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। ভাবমিশ্রের পিতার নাম—লটকণ মিশ্র। পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণেতৃগণের তুলনায় ভাবমিশ্র যে আধুনিক, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। শার্ঙ্গধর নামক আর এক প্রাচীন বৈদ্যক-শাস্ত্র-প্রণেতার পরিচয় দৃষ্ট হয়। জর্ম্মণ পণ্ডিত হাস বলিয়াছেন,—'শার্ঙ্গধর, চরকের ও সুশ্রুতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। চরক ও সুশ্রুতের গ্রন্থে তাঁহার গ্রন্থের বহু সাহায্য গৃহীত হইয়াছে।' কেবল জর্ম্মণ পণ্ডিত হাস বলিয়া নহেন; এ দেশের চিকিৎসা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও কেহ কেহ ঐ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শার্ঙ্গধরের গ্রন্থে ধাতব-ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী ও সেবন-বিধি লিখিত আছে। শার্ঙ্গধরের গ্রন্থের তাহাই বিশেষত্ব। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, শার্ঙ্গধর-প্রণীত গ্রন্থে চরকের ও সুশ্রুতের সহায়তা গৃহীত হইয়াছে। তান্ত্রিক গ্রন্থ-সমূহের অনুসরণও উহাতে দৃষ্ট হয়। † কত জনের কত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া যাইবে? চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সকল অঙ্গই পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সকল বিভাগেরই গ্রন্থ-সমূহ প্রচারিত ছিল। রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিদ্যা, শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ

* আরবদেশীয় গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ-পত্রে ভারতবর্ষের সহিত তাঁহাদের সংস্রব বিষয়ে যে সকল প্রমাণ আছে, রেভারেণ্ড ডব্লিউ কর্টন (Rev. W, Cureton—*A Collection of such Passages relative to India as may occur in Arabic Writers*), তাহা সংগ্রহ করেন। সেই গ্রন্থের উপর টিপ্পনী লিখিয়া অধ্যাপক এইচ এইচ উইলসন যাহা বলিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; যথা,—"In medicine the evidence is more positive, and it is clear that the *Charak*, the *Susruta*, the treatise called *Nidan* or diagnosis, and others on poisons, diseases of women and therapeutics, all familiar to Hindu Science, were translated and studied by the Arabs in the days of Harun and Mansur, either from the originals or translations made at a still earlier period, into the language of Persia."—*Journal of the Royal Asiatic Society*, Old series. VI.

† ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্তের 'মেটিরিয়া মেডিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় শার্ঙ্গধরের প্রাচীনত্বের বিষয় লিখিত আছে। ডক্টর রায় প্রতিবাদ করিয়া উহাকে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রচারিত থাকারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আর সেই সকল গ্রন্থ যে অতি প্রাচীন-কালে বিদ্যমান ছিল, তাহাও প্রমাণিত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রসায়নেরই নাম উল্লেখ করিতেছি। বেদে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হিন্দুদিগের অভিজ্ঞতার নিদর্শন আছে। তন্ত্রের নানা স্থানেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিষয় দেখিতে পাই। অধুনা-প্রচলিত 'রসার্ণব', 'রসরত্ন-সমুচ্চয়', 'রসেন্দ্র চিন্তামণি', 'রসরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থেও সে অভিজ্ঞতার পরিচয় দেদীপ্যমান্। এইরূপ উদ্ভিজ্জাদির জ্ঞান সম্বন্ধেও প্রাচীন-ভারতের অভিজ্ঞতার অশেষ পরিচয় আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে এই সকল পরিচয়-চিহ্ন লোপ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর রাষ্ট্রবিপ্লবে এক এক অঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; পুরাতনের উপর নূতন আসিয়া আধিপত্য-বিস্তার করে; প্রধানতঃ এই কারণেই ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞান অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ সকল কথা অনেকেই স্বীকার করিতেন না। ভারতের নিজস্ব কিছুই ছিল না বলিয়া, সকল কথাই প্রায় তাঁহারা উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু আজ কাল এ স্রোত যেন একটু ফিরিয়াছে। এখন অনেকেই স্বীকার করিতেছেন,—'ভারতবর্ষ জ্ঞান-গৌরবের উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন ছিল; কিন্তু এখন তাহার অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।' তবে তাঁহাদের স্বীকারোক্তিতে একটু প্রকার-ভেদ আছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষিতগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান-গরিমার বিষয় স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রায়ই বলেন,—'ব্রাহ্মণদিগের উৎপাতেই সে সকল লোপ পাইয়াছে। জাতিভেদ-প্রথাই সকল অনর্থের মূল।' হিন্দুদিগের গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেও তাঁহাদিগকে তাই বলিতে শুনা যায়,—'বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব লোপ-প্রাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণ-গণ পুনরায় আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া বসেন। বৈদিক-কালের ঋষিগণ কোনও ব্যবসা কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু নবভাবে বিভোর হইয়া ব্রাহ্মণগণ জাতি-ভেদের কঠিন নিগড়ে সমাজকে বন্ধন করেন। তখন উচ্চ-বংশের কোনও লোক-চিকিৎসাদি ব্যবসায় গ্রহণ করেন না। সুশ্রুতের সময় ছাত্রগণ শব-ব্যবচ্ছেদ ক্রিয়া শিক্ষা করিত; পরীক্ষা ও ভূয়োদর্শন-সঞ্চিত জ্ঞানের অধিকারী হইত; তখন হইতে সে প্রথা রহিত হইয়া যায়। মনু-সংহিতা মৃতদেহ-স্পর্শ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে দোষাবহ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সকল কারণে বাগ্‌ভটের অব্যবহিত পরেই অস্ত্র-চিকিৎসার প্রথা রহিত হয়। শারীর-বিদ্যা এবং অস্ত্র-চিকিৎসা কেহ আর শিক্ষা করে না। কাজে-কাজেই হিন্দুদের মধ্যে ঐ দুই বিদ্যা লোপ প্রাপ্ত হয়।' * লোপপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একমত হইলেও লোপপ্রাপ্তির কারণ-পরম্পরা সম্বন্ধে আমরা কখনই একমত হইতে পারি না। বিপ্লবের পর বিপ্লবে শিক্ষার সুবিধা নষ্ট হইয়াছিল, ইহাই প্রধান কারণ। জ্ঞান-সূর্য্য প্রাচ্যে আপনার জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ প্রতীচ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; প্রাকৃতিক নিয়ম বশেই এইরূপ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান আরবে এবং

* রমেশচন্দ্র দত্তের অনুসরণে ডক্টর পি সি রায় এই মর্ম্মের কথাই কহিয়াছেন। Cf. R. C. Dutt's *Civilisation in Ancient India*, pp 155-157 and Dr. P. C. Ray, *A History of Hindu Chemistry*, Vol. 1. pp. 105-106.

আরব হইতে ইউরোপে বিস্তৃত হয়,—এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। বগদাদে প্রচারিত 'সানাক' এবং 'সানাস্রাদ' গ্রন্থ-দ্বয়ে কি ভাবে চরকের ও সুশ্রুতের অংশ-বিশেষ গৃহীত হইয়াছে, সামান্য একটু তুলনা করিয়া দেখিলেই তদ্বিষয় উপলব্ধি হইতে পারিবে। * আর, তাহাতে ভারতবর্ষের মৌলিকত্ব অতি সহজেই সপ্রমাণ হইবে।

---

* চরক ও সুশ্রুত কি ভাবে বিদেশে যায়, তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। চরক—সানাক (Sanaq) নামে এবং সুশ্রুত—সানাস্রাদ (Sanasrad) নামে বাগদাদে প্রচারিত হইয়াছিল। সানাকের ও চরকের এবং সুশ্রুতের ও সানাস্রাদের ইংরাজী অনুবাদ আমরা নিম্নে পাশাপাশি উদ্ধৃত করিতেছি।

1. Sanaq the Indian

The vapour emitted by poisoned food has the colour of the throat of the peacock...when the food is thrown into the fire, it rises high in the air; the fire makes a crackling sound as when salt deflagrates....the smoke has the smell of a burnt corpse. Poisoned drinks: butter milk and thin milk have a light blue to yellow line.

1. The Charaka.

The food is to be thrown into fire for testing ...the flame becomes particoloured like the plumes of a peacock. The tongue of the flame also becomes pointed; a crackling sound is emitted and the smell of a putrid corpse is perceived......Water, milk and other drinking liquids, when mixed with poison, have blue lines printed upon.—Chikitsa. Ch XX III. 29-39.

1. The Susruta.

When poisoned food is thrown into fire, it makes a crackling sound and the flame issuing therefrom is tinted like the throat of the peacock—Kalpa, Ch. 1, 27.

এতদ্বিষয়ে আমরা সুশ্রুতের ও চরকের মূল শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সবিষং হি প্রাপ্যাগ্নিং বহূন্ বিকারান্ ভজত্যগ্নিঃ
শিখিবর্হবিচিত্রার্চ্চিস্তীক্ষ্ণোরূক্ষকুণপধূমশ্চ।
ফট্ফটি চ সশব্দমশব্দমেকাবর্ত্তো বিহতার্চ্চিরপিস্যাৎ॥
পানে নীলা রাজী বৈবর্ণ্যং সাপ নেক্ষতেচ্ছায়াম্।
বিকৃতামথবা পশ্যতি লবণাক্তে ফেণমালা স্যাৎ॥"
—চরক-সংহিতা, চিকিৎসিত-স্থান, ২৫শ অধ্যায়।

অর্থাৎ,—বিষাক্ত অন্ন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে, অগ্নি বহুবিধ বিকার ভজনা করে। উহার শিখা ময়ূর-বর্হের ন্যায় বিচিত্র হয়। উহা তীক্ষ্ণ, ঈষৎ রুক্ষ ও কুণপ গন্ধি (শবদাহের ন্যায় গন্ধযুক্ত) হয়। ফট্ফট্ শব্দ হইতে থাকে, একাবর্ত্ত বিশিষ্ট হইয়া জ্বলিতে থাকে এবং শিখাহীনও হইতে পারে।...পানীয় দ্রব্য বিষাক্ত হইলে উহাতে নীলবর্ণ রেখা সকল উত্থিত হয়, উহা বিবর্ণ হইয়া থাকে, উহাতে নিজের ছায়া দেখা যায় না; অথবা ছায়া বিকৃত হইয়া থাকে। আর উহাতে লবণ নিক্ষেপ করিলে, ফেনমালা উঠিয়া থাকে।

"হুতভুক্তেন চান্নেন ভৃশং চট্চটায়তে।
ময়ূরকণ্ঠপ্রতিমো জায়তে চাপি দুঃসহঃ॥"
—সুশ্রুত-সংহিতা, কল্পস্থান, ১ম অধ্যায়।

অর্থাৎ,—বিষাক্ত অন্ন অগ্নিতে দিলে চট্চট্ শব্দ হইতে থাকে এবং অগ্নি ময়ূর-কণ্ঠের ন্যায় আভাযুক্ত হয় ও দুঃসহ হইয়া থাকে।

[ইংরাজী অনুবাদে চরক ও সুশ্রুতের যে যে স্থল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, আমরা চরক-সংহিতার ও সুশ্রুত-সংহিতার যে অংশ হইতে উহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহার সহিত পরিচ্ছেদের ও শ্লোক-সংখ্যার ঐক্য নাই। কারণ, নানা জনের হস্তে পড়িয়া পুঁথির আকারে লিখিত হইয়া আসিতে আসিতে স্থান-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।]

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞান কতদূর উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তাহার সামান্য একটু আভাষ প্রদান করিবার জন্য চরকের ও সুশ্রুতের দুইটী স্থানের মর্ম্ম প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। শারীর-বিজ্ঞানে

শারীর-বিজ্ঞান।

ও অস্ত্র চিকিৎসায় অধুনা পাশ্চাত্য-দেশের গৌরবের অবধি নাই। সুতরাং ঐ দুইটী বিষয়ে সুশ্রুত ও চরক কি বলিয়াছেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার বিষয় বুঝাইতে হইলে, তাহা অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। শরীরের কোথায় কোন্ অংশ অবস্থিত, কোথায় কোন্ শিরায় কিরূপ কার্য্য করিতেছে, সুশ্রুতের শারীর-স্থান অংশে, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তিনটী অধ্যায়ে, তাহার আভাষ পাওয়া যায়। অধ্যায় তিনটীর একটীর নাম—শরীর-সংখ্যা ব্যাকরণ, একটীর নাম—প্রত্যেক মর্ম্ম-নির্দ্দেশ, অপরটীর নাম—শিরাবর্ণন-বিভক্তি। উহাদের মধ্যে শরীর-সংখ্যা-ব্যাকরণ অধ্যায়ে শরীরের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, শরীর, শিরা, পেশী, স্নায়ু, অস্থি, মর্ম্ম, ধমনী প্রভৃতির সংখ্যা ও অবস্থানের বিষয় লিখিত আছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—'গর্ভ, হস্ত, পদ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, কর্ণ, নিতম্বাদি অঙ্গ সকল প্রাপ্ত হইলে, শরীর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। গর্ভের ছয় অঙ্গ; চারিটী শাখা এবং পঞ্চম স্থলে মধ্য এবং ষষ্ঠ স্থলে মস্তক উল্লেখ-যোগ্য।... মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, নাসা, চিবুক, বস্তি ও গ্রীবা,—ইহারা এক একটী করিয়া এক এক প্রত্যঙ্গ। কর্ণ, নেত্র, নাসা, ভ্রূ, শঙ্খ, অংস, গণ্ড, পক্ষ, স্তন, বৃষণ, পার্শ্ব, স্ফিক, জানু, বাহু ও উরু প্রভৃতি, ইহারা দুই দুইটী করিয়া এক একটী প্রত্যঙ্গ। অঙ্গুলি বিংশতি।...শরীরের সংখ্যা,—ত্বক-সমূহ, কলা-সমূহ, ধাতু-সমূহ, মল-সমূহ, দোষ-সমূহ, প্লীহা ও যকৃত, ফুসফুস ও উণ্ডুক, হৃদয়, আশয়-সমূহ, অন্ত্র-সমূহ, বৃক্কদ্বয়, স্রোতঃ-সমূহ, কণ্ডরা, জাল-সমূহ, কূর্চ্চ সমূহ, রজ্জু-সমূহ, সেবনী-সমূহ, সঙ্ঘাত সমূহ, সীমন্ত-সমূহ, অস্থি-সমূহ, সন্ধি-সমূহ, স্নায়ু-সমূহ, পেশী-সমূহ, শিরা-সমূহ, ধমনী-সমূহ ও যোগবহ স্রোতঃ-সমূহ। সংক্ষেপে ত্বক সাতটী, কলা সাতটী, আশয় সাতটী, ধাতু সাতটী, শিরা সাত শত, পেশী পাঁচ শত, স্নায়ু নয় শত, অস্থি তিন শত, সন্ধি দুই শত দশ, মর্ম্ম এক শত সাত, ধমনী চতুর্ব্বিংশতি, দোষ তিন, মল তিন এবং স্রোত নয়।' এইরূপে মোটামুটি শরীরের বিভাগ-সমূহের

II. Susruta.

The variety of leeches called *Krishna* is *black* in colour and have *thick heads*, *Karvuras* have their bodies, like that of eels with elevated stripes across their abdomen. *Alagardhas* have hairs on their bodies, large sides and black mouths, *Indrayudhas* have longitudinal lines along their back, *of the colour of the rainbow.*

II. *Rases* quoting *Sanasrad.*

Of the leeches one is poisonous, *which is intensely black like antimony having a large head* and scales like certain fishes and having the middle green: also another upon which are hairs, has a large head and *different colour like the rainbow.*

সুশ্রুত-সংহিতায় সংস্কৃতে এ বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, সূত্র-স্থানে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, জলৌকাচরণীয় প্রসঙ্গে তাহা দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ করিয়া সুশ্রুত উহার প্রত্যেকটীর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার সকলগুলির উল্লেখ সম্ভবপর নহে। কেবল অস্থি-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিবার চেষ্টা পাইতেছি। 'অস্থি-সমূহের সঙ্ঘাত (সংহতি বা বহু অস্থির সম্মিলন) চতুর্দ্দশ। তন্মধ্যে তিনটী সঙ্ঘাত গুল্‌ফে (পাদমূল, গোড়ালি), জানু, বঙ্ক্ষণ (উরু-সন্ধিতে) আছে। অতএব এক এক সক্থিতে * (উরুতে) তিনটী এবং এক এক বাহুতে তিনটী তিনটী। ত্রিকস্থানে (বাহু-দ্বয়ের ও গ্রীবার সন্ধিস্থলে) একটী এবং মস্তকে একটী (৬+৬+১+১=১৪)। সঙ্ঘাত-সকল যে স্থলে সঞ্চিত আছে, সে স্থলের নাম সীমন্ত। সুতরাং সীমন্তও অস্থি-সঙ্ঘাতের ন্যায় গণনীয়, অর্থাৎ চতুর্দ্দশটী। কোনও কোনও মতে, সঙ্ঘাত অষ্টাদশ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ, নিতম্ব-কাণ্ডের উপর এক, বক্ষের উপর এক, উদর ও বক্ষের সন্ধিতে এক এবং অংশকূটের (স্কন্ধদেশের) উপর এক। আয়ুর্ব্বেদীরা বলেন যে, অস্থির সংখ্যা তিন শত ছয়; কিন্তু এই শল্য-তন্ত্রে তিন শত অস্থিই বলা হইয়াছে। † তন্মধ্যে শাখা-সমূহে এক শত বিংশতি অস্থি আছে, শ্রোণি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষে এক শত সতেরটী অস্থি আছে। গ্রীবার উর্দ্ধ-ভাগে তেষট্টি অস্থি। তবেই অস্থির তিন শত সংখ্যার পূরণ হইতেছে। শাখা-সমূহে এক শত বিংশতি অস্থি আছে; যথা—এক এক পাদাঙ্গুলিতে তিনটী করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পনেরটী, পাদতলে পাঁচটী শলাকাস্থি এবং তদীয় বন্ধনাস্থি একটী; অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী আর কূর্চ্চে ও গুল্‌ফে দুই দুইটী করিয়া চারিটি। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ দশটী। পার্ষ্ণিতে একটী, জঙ্ঘাতে দুইটী। জানুতে একটী, উরুতে একটী। তবে এক এক সক্থিতে সর্ব্বশুদ্ধ (১৫+১০+১+২+১+১=৩০) ত্রিশটী অস্থি আছে। এইরূপ বাহুতেও ত্রিশটী অস্থি আছে। তন্মধ্যে করাঙ্গুলে পনেরটী; করতল, কূর্চ্চ ও মণিবন্ধে দশটী ইত্যাদি সংখ্যা বুঝিতে হইবে।' এইরূপে তিন-শতাধিক অস্থির পরিচয় প্রদান করিয়া সুশ্রুত সন্ধিস্থান-সমূহের পরিচয় দিয়াছেন। সন্ধির সংখ্যা দুই শত দশ। সেই দুই শত দশটী সন্ধি কোথায় কি ভাবে অবস্থিত, তন্ন তন্ন করিয়া তাহা বলা হইয়াছে। অস্থি-সন্ধি ভিন্ন, পেশী, স্নায়ু ও শিরাদিগের সন্ধি আছে। স্নায়ু নয় শত। সেই নয় শত স্নায়ু কি ভাবে কোথায় অবস্থিত, তাহার পরিচয় দিয়া সুশ্রুত বলিয়াছেন,—'যে চিকিৎসক বাহ্য ও আভ্যন্তর স্নায়ু-সকল বিশেষ-রূপে অবগত আছেন, তিনিই দেহীদিগের শরীর হইতে গূঢ় শল্য আহরণ করিতে পারেন।' সুশ্রুতের মতে, পেশীর সংখ্যা পাঁচ শত। সে গুলিও কি ভাবে কোথায় কোথায় অবস্থিত, তাহার বর্ণনা আছে। এই সকল বর্ণনার পর সুশ্রুত বলিয়াছেন,—'ত্বক পর্য্যন্ত দেহের যে সকল অঙ্গ নিরাকৃত হইল, শল্য-শাস্ত্রের জ্ঞান না থাকিলে, তাহাদের মধ্যের কোনও অঙ্গই বর্ণন করা যায়

---

* কটি-সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া পাদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানকে সক্থি বলে। জানুর উপর হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্ক্ষণ-সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে উরু বলে। গুল্‌ফের অধোভাগকে পার্ষ্ণি বলে। গুল্‌ফ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানকে জঙ্ঘা বলে।

† ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise) সুশ্রুত-সংহিতার ইংরাজী অনুবাদের টীকায় লিখিয়াছেন,—'তরুণাস্থি ও অস্থি একত্র ধরিলে তিন শত ছয়টী অস্থি হয়।'

না। আর যদি শল্য-হর্ত্তা সেই সকল অঙ্গের নিঃসংশয় জ্ঞান ইচ্ছা করেন, তবে মৃতদেহ শোধন করিয়া সেই সকল অঙ্গ সম্যক-রূপে প্রত্যক্ষ করিবেন। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ও শাস্ত্র-দৃষ্ট উভয় হইলে সমাসতঃ অতিশয় জ্ঞান-বিবর্দ্ধক হয়। পরীক্ষার্থে গৃহীত শবদেহ সম্পূর্ণ-গাত্র হওয়া উচিত, যেন উহা বিষ-দূষিত না হয়, যেন দীর্ঘকাল ব্যাধি-পীড়িত না হইয়া থাকে, যেন শতবর্ষ বয়স্ক (অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ) ব্যক্তির মৃতদেহ না হয়। মৃত-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চাক্ষুষ দর্শন করিলে ও শাস্ত্রার্থে অবগতি থাকিলে, আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ হওয়া যায়।' শব-ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়া যে অতি প্রাচীন-কালে প্রচলিত ছিল, শেষোক্ত অংশে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। চরক-সংহিতায় সঙ্ক্ষেপে শরীর-সংখ্যা নামক অধ্যায়ে (শারীর-স্থান, সপ্তম অধ্যায়ে) শরীরের অস্থি-শিরা প্রভৃতির অবস্থিতির বিষয় লিখিত আছে। অন্যান্য স্থানেও প্রসঙ্গতঃ চরক এ সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শারীর-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইলে চিকিৎসক অস্ত্র-ব্যবহার শিক্ষা করিতেন। অস্ত্র—বহুবিধ। সেই অস্ত্র-সমূহ সাধারণতঃ যন্ত্র ও শস্ত্র নামে পরিচিত। যন্ত্র সকল প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত ;—(১) স্বস্তিক-জাতীয় যন্ত্র, (২) সন্দংশ-জাতীয় যন্ত্র, (৩) তালযন্ত্র, (৪) নাড়ীযন্ত্র, (৫) শলাকাযন্ত্র ও (৬) উপযন্ত্র-সমূহ। সুশ্রুত বলেন,—'স্বস্তিক-যন্ত্র চব্বিশ প্রকার, সন্দংশ যন্ত্র দুই প্রকার, তালযন্ত্র দুই প্রকার, নাড়ী-যন্ত্র বিংশতি প্রকার, শলাকা-যন্ত্র আটাইশ প্রকার ও উপ-যন্ত্র পঁচিশ প্রকার। এই সকল যন্ত্র প্রায়ই লৌহ-নির্ম্মিত হয়। লৌহের অভাবে লৌহের সদৃশ গুণবিশিষ্ট ও লৌহের সদৃশ দৃঢ় অন্যান্য দ্রব্যেও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র-দিগের মুখ সিংহাদি নানা প্রকার হিংস্র জন্তুর ও মৃগ-পক্ষীর মুখের ন্যায় প্রায়ই কল্পিত হয়। এই জন্য ঐ সকল জন্তুর মুখ বলিলেই যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন শাস্ত্র-উপদেশ, অন্য যন্ত্র দর্শন ও যুক্তির সাহায্যেও যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করা হয়।...স্বস্তিক নামক যন্ত্র সমূহের পরিমাণ দীর্ঘে অষ্টাদশ অঙ্গুলি। উহাদের মুখ সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, তরক্ষু, ঋক্ষ, দ্বীপী, বিড়াল, শৃগাল, হরিণ, এর্ব্বারুক, কাক, কঙ্ক, কুরব, চাস, ভাস, শশঘাতী, উলূক, চিল্লী, শ্যেন, গৃধ্র, ক্রৌঞ্চ, ভৃঙ্গরাজ, অঞ্জলি, কর্ণাবভঞ্জন ও নন্দীমুখ এই চব্বিশটী জন্তুর মুখের ন্যায় কল্পিত হইয়া থাকে। উহারা বেড়ীর ন্যায় দন্ত-বিশিষ্ট এবং একটী মসূরা-কৃতি খিলের উপর ঘুরিয়া-ফিরিয়া থাকে। উহাদের মুখ অঙ্কুশের ন্যায় আবৃত্ত (নত); অস্থি-মধ্যে শল্য প্রবিষ্ট হইলে তাহার উদ্ধারার্থে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। সন্দংশ বা সাঁড়াশী জাতীয় যন্ত্র দুই প্রকার। এক প্রকার খিল দ্বারা আবদ্ধ, দ্বিতীয় প্রকার খিল দ্বারা আবদ্ধ নহে (যেমন চিম্‌টে)। সন্দংশ যন্ত্র দৈর্ঘ্যে ষোড়শাঙ্গুলি হয়। ত্বক, মাংস, শিরা ও স্নায়ুগত শল্য উদ্ধার করিবার জন্য সন্দংশ যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। তালযন্ত্র দুই প্রকার। উহার দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ দ্বাদশ অঙ্গুলি। উহা দ্বারা কর্ণের, নাসার ও নাড়ীর ভিতর হইতে শল্য বাহির করা হয়। নাড়ী বা নলযন্ত্র অনেক প্রকার হয় এবং অনেক প্রয়োজন সাধন করে। উহাদের মুখ এক দিকে থাকিতে পারে, দুই দিকেও থাকিতে পারে। শরীর-স্রোতের (কর্ণাদি পথের) মধ্যে শল্য প্রবেশ করিলে, তাহা উদ্ধার

অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রাদি।

করিবার নিমিত্ত, অর্শ প্রভৃতি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কিংবা দূষিত রক্তাদি চূষণ করিবার নিমিত্ত এবং তদ্বিধ অন্যান্য ক্রিয়ার সৌকর্য্যার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।...শলাকা যন্ত্র নানা প্রকার ও নানা প্রয়োজনে লাগিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে যে দুই প্রকার এষণ কর্ম্মে (শোথাদির গতি অন্বেষণে) ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ গণ্ডূপদের (কেঁচোর) ন্যায়। যে দুই প্রকার ব্যূহন (শল্যাদি উর্দ্ধে তুলিয়া ধরা) কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ শরপুঙ্খের ন্যায়। যে দুই প্রকার চালন কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ সর্পফণার ন্যায় এবং যে দুই প্রকার শল্যোদ্ধারার্থ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ বড়িশের ন্যায়। তন্মধ্যে স্রোতোগত শল্যোদ্ধার করিবার জন্য যে শলাকা ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ নিস্তুষ মসূরের অর্দ্ধখণ্ডের ন্যায়; ইত্যাদি।...শস্ত্র বিংশতি প্রকার;—মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, নখ-শস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপল পত্র, অর্দ্ধধার, সূচী, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারিমুখ, অন্তর্মুখ, ত্রিকূর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতসপত্রক, বড়িশ, দন্তশঙ্কু ও এষণি। এই সকল শস্ত্রের মধ্যেও আবার প্রকার-ভেদ আছে। যেমন এষণি তিন প্রকার,—তীক্ষ্ণ, কণ্টকমুখী, প্রথম-যবপত্র-মুখী, গণ্ডূপদাকার-মুখী। করপত্র অস্থি-সমূহের ছেদনে ব্যবহৃত হয়। সূচী সকল সীবন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; ইত্যাদি।' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে, চরক ও সুশ্রুতাদির ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে, এই যন্ত্রাদির বিষয় লিখিত আছে। এখানে আমরা তাহার কয়েকটীর নাম মাত্র প্রদান করিলাম। তবে ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, কিরূপ সন্ধিস্থলে কিরূপ কৌশলে অস্ত্র-সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। কণ্ঠনালীর মধ্যে ক্ষতাদি হইলে, তাহার ছেদন ও ভেদন কৌশল হিন্দু-চিকিৎসকগণ অবগত ছিলেন। সুশ্রুতান্তর্গত শস্ত্র-চালন অধ্যায়ে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুদ্রিকা নামক অস্ত্রের পরিচয়ে ব্যাখ্যাকারগণ কহেন,—'সুশ্রুত যাহাকে মুদ্রিকা কহেন, বোধ হয় বাগ্‌ভট তাহাকেই অঙ্গুলি-শস্ত্রক কহেন। উহার মুখ একটী মুদ্রিকার (অঙ্গুরীয়ের) মধ্য দিয়া বহির্গত থাকে। ফলা অর্দ্ধাঙ্গুল আয়ত। উহার সংস্থান মণ্ডলাগ্র বা বৃদ্ধি-পত্রের সমান। বৈদ্যের তর্জ্জনী অঙ্গুলির অগ্রপর্ব্বের যে পরিমাণ, তদনুসারেই মুদ্রিকা উহাতেই অর্পিত হইয়া থাকে। উহা সূত্র দ্বারা মণিবন্ধে বদ্ধ করিয়া, গলস্রোতো-গত রোগ-সমূহের ছেদন-ভেদনে ব্যবহার করা যায়।' এরূপভাবে গলনালী মধ্যে অস্ত্র-সঞ্চালনে চিকিৎসকগণ সমর্থ ছিলেন; অথচ, এখন তাহার কোনই চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, বর্ণনা হইতেও কিছুই বুঝিবার উপায় নাই! ছাত্রগণকে কিরূপভাবে অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, সুশ্রুতে সূত্রস্থানের যোগ্য-সূত্রীয় অধ্যায়ে তাহা বিবৃত আছে। শিষ্য সর্ব্ব-শাস্ত্র অবগত হইলেও তাহাকে যোগ্য অর্থাৎ কর্ম্মাভ্যাস করাইবে। ছেদন প্রভৃতি কার্য্য ও স্নেহ-প্রয়োগাদি কর্ম্মের পথও তাহাকে উপদেশ দিবে। বহু বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াও যদি কর্ম্মাভ্যাস না করা যায়, তবে কর্ম্মের অযোগ্য হইতে হয়। ছেদনাদি কর্ম্ম শিখিতে হইলে পুষ্প, ফল, অলাবু, কালিন্দক (তরমুজ), শশা, কাঁকুড় ও কর্কারু (কুষ্মাণ্ড) প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছেদন, উৎকর্ত্তন (উর্দ্ধদিকে ছেদন) ও পরিবর্ত্তন (অধচ্ছেদ) উপদেশ দিবে। দৃতি (ভিস্তি), বস্তি ও প্রসেবক (চামের থলি) জল বা কর্দ্দমে পূর্ণ করিয়া তাহাতে শস্ত্র-প্রয়োগ দ্বারা ভেদন-কর্ম্ম শিক্ষা দিবে। এইরূপে রোমযুক্ত প্রসারিত চর্ম্মখণ্ডে অস্ত্র-প্রয়োগ

পূর্ব্বক লেখন-কর্ম্ম, মৃতপশুর শিরায় ও পদ্মনালে শস্ত্র-প্রয়োগ পূর্ব্বক বেধন-ক্রিয়া, ঘুণভক্ষিত কাষ্ঠ, বেণু বা নলের নালীতে অথবা শুষ্ক অলাবু-মুখে এষণি প্রয়োগ পূর্ব্বক এষণ-কর্ম্ম, পনশ (কাঁঠাল), বিম্বী (তেলাকুচা) ও বিম্বফলের মজ্জা এবং মৃতপশুর দন্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক আহরণ কর্ম্ম (উদ্ধরণ), মোমলিপ্ত শিমুল তক্তায় সূচী প্রভৃতি প্রয়োগ পূর্ব্বক বিস্রাবণ কর্ম্ম, সূক্ষ্ম বস্ত্র বা ঘনবস্ত্র-দ্বয়ের অন্তর্ভাগে (সম্মিলন-স্থলে) অথবা মৃদু চর্ম্মদ্বয়ের অন্তর্ভাগে সূচী প্রয়োগ পূর্ব্বক সীবন-ক্রিয়া এবং বস্ত্র-নির্ম্মিত পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বন্ধন প্রয়োগ পূর্ব্বক বন্ধন-কর্ম্ম শিক্ষা দিবে। সন্ধি হইতে কর্ণ ছিন্ন হইলে যেরূপে তাহা বন্ধন করিতে হয়, মৃদু মাংস, বর্ত্তি বা পদ্মনাল সমূহ সংহিত করিয়া তাহা দেখাইবে। অগ্নি ও ক্ষার যেরূপে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা মৃদু মাংস-খণ্ড সমূহ প্রয়োগ করিয়া দেখাইবে। কিরূপে বস্তিনাল প্রবেশ করাইতে হয়, কিরূপে বস্তি পীড়ন করিতে হয়, কিরূপে ব্রণ-বস্তি পীড়ন করিতে হয়, তাহা জলপূর্ণ ঘটের পার্শ্বস্থ ছিদ্রে অথবা অলাবু প্রভৃতির মুখে প্রয়োগ করিয়া দেখাইবে।' কেবলমাত্র পুস্তকের বর্ণনা দৃষ্টে অস্ত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপার বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। পরীক্ষা ও অস্ত্র-চালনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিলে, তাহা শিক্ষা করা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা সম্ভবপর নহে। সেই জন্য চরক-সুশ্রুতাদিতে যে সকল রোগের যে প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী লিখিত আছে, এখন প্রায়ই তদনুসারে কার্য্য হয় না। মধ্যযুগে কিছুকাল আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা লোপ পাইয়াছিল; সুতরাং চিকিৎসা-প্রণালীও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ করিবার সুবিধা ঘটে নাই। দৃষ্টান্ত-স্থলে সুশ্রুতের মতে এবং ডাক্তারী মতে ছিন্ন-নাসিকার চিকিৎসা-প্রণালী বিবৃত করিতেছি। সুশ্রুতের মতে,—'ছিন্ননাসিক ব্যক্তিকে বন্ধুবান্ধবেরা ধরিয়া থাকিবে। অনন্তর একটী বৃক্ষ পত্র (বা চর্ম্মখণ্ড বা কাগজ) নাসিকার পূর্ব্বাকৃতির সমান গ্রহণ করিয়া গণ্ডের উপর স্থাপন করিবে (এবং উহার চতুর্দ্দিক কালি দিয়া চিহ্নিত করিবে। পরে সেই চিহ্নিত ত্বক) গণ্ড হইতে ছেদন করিবে। অনন্তর ছিন্ন নাসিকার অগ্রভাগ (অর্থাৎ কিনারা সকল) লেখন করিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ত্বক সাবধানে শীঘ্র জুড়িয়া দিবে এবং উত্তমরূপে বন্ধন করিবে। সংযোজিত ত্বক ঝুলিয়া না পড়ে এই জন্য, নাসিকার দুই রন্ধ্রে পত্রের নল বা অন্য নল প্রবেশিত করিয়া নাসিকা উত্তোলিত করিয়া রাখিতে হয়। পরে উহাতে পতঙ্গ (রক্তচন্দন), যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনের চূর্ণ অবচূর্ণন করিবে। (অবচূর্ণন শব্দের অর্থ ঈষৎ ঘর্ষণ অথবা চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া টিপিয়া বসাইয়া দেওয়াকে অবচূর্ণন বলা যায়।) অনন্তর শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে সম্যকরূপে আচ্ছাদিত করিয়া, তাহার উপর তিল-তৈল পরিসেক করিবে। আর সেই ব্যক্তিকে ঘৃত পান করাইবে। ঘৃত সুজীর্ণ হইলে, অভ্যঙ্গযোগে স্নিগ্ধ করিয়া যথা-শাস্ত্র বিরেচন দিবে। নাসা-সন্ধি রূঢ় ও সংহিত হইলেও যদি সংহিত হইতে অর্দ্ধেক বাকী থাকে, তবে পুনর্ব্বার লেখন করিয়া পরস্পর সংহিত করিতে হইবে। নাসিকা হীন হইলে তাহা বর্দ্ধিত করিতে যত্ন করিবে। আর উহার মাংস অতি-বর্দ্ধিত থাকিলে সমান করিয়া দিবে। ছিন্ন ওষ্ঠের সন্ধান-বিধিও নাসা-সন্ধির সন্ধান-বিধির ন্যায়। কেবল নাসা-সন্ধানে যে নলের উল্লেখ আছে, ছিন্ন ওষ্ঠের সন্ধানে তাহার প্রয়োজন হয় না।' ডাক্তারীতে ছিন্ন-নাসা ও ছিন্ন-ওষ্ঠ সংহিত করিবার প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে;—'এই চিকিৎসার

নাম রাইনোপ্লাষ্টিক অপারেশন (Rhinoplastic Operation)। নাসিকার অগ্রভাগের কোনও অংশ বা নাসিকার সমস্ত অগ্রভাগ ব্যাধি বা আঘাত বশতঃ নষ্ট হইলে, পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে ত্বক উদ্ধৃত করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিতে হয়। নাসিকা ব্যাধি-বশতঃ নষ্ট হইলে, ব্যাধি আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত, অস্ত্র-ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে হয়। নাসিকার নষ্ট অংশের সমান একখণ্ড কাগজ বা চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ললাটের উপর স্থাপন করিয়া উহার প্রান্ত সকল কালি দিয়া চিহ্নিত করিতে হয় এবং ললাটের সেই চিহ্নিত ত্বক সেলুলার টিসু ও পেরিয়স্ক্িওমের সহিত এরূপভাবে ছিন্ন করিতে হয়, যেন সমুদায় ত্বক একেবারে ছিন্ন না হইয়া ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থিত ত্বকের সহিত অতি সূক্ষ্ম ত্বকাংশ দ্বারা মিলিত থাকে। অনন্তর নাসিকার যে স্থানে ললাটস্থ ত্বক জুড়িতে হইবে, ললাটের রক্তপাত বন্ধ হইলে, সেই স্থান লেখন করিয়া এবং ললাটস্থ ত্বক ভ্রূর মধ্যস্থ ত্বক হইতে ছিঁড়িয়া না যায়, এরূপভাবে ঘুরাইয়া আনিয়া জুড়িয়া দিতে হয়। উভয় ত্বক পরস্পর মিলিত হইয়া গেলে, ভ্রূ-সংলগ্ন ত্বক ছিন্ন করিয়া দিবে।" * বলা বাহুল্য, এ সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা ভূয়োদর্শন সাপেক্ষ। কেবল গ্রন্থের বর্ণনা-পাঠে এ সকল বিষয় শিক্ষা করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

দ্রব্যগুণ-তত্ত্ব।

দ্রব্যগুণ-তত্ত্ব আয়ুর্ব্বেদের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আয়ুর্ব্বেদের প্রায় সকল গ্রন্থেই দ্রব্যগুণ-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। সুশ্রুতের এবং চরকের বহু অধ্যায় দ্রব্যগুণ আলোচনায় পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে আমরা প্রধানতঃ চরকের সূত্রস্থানের সপ্তবিংশ অধ্যায় এবং সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলি। চরক আহার-সমূহকে দশ বর্গে বিভাগ করিয়াছেন। যথা,—শূকধান্যবর্গ, শমীধান্যবর্গ, মাংসবর্গ, শাকবর্গ, ফলবর্গ, হরিতবর্গ, মদ্যবর্গ, অম্বুবর্গ, গোরস বর্গ (দুগ্ধ ঘৃতাদি), ইক্ষুবর্গ, কৃতাহার বর্গ ও তৈলবর্গ। শূক-ধান্যবর্গ (যে সকল ধান্যের মুখে শূক অর্থাৎ সোঁয়া আছে, তাহাই শূক) প্রসঙ্গে চরক রক্তশালি, মহাশালি প্রভৃতি বহুবিধ শালি-ধান্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গুণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যব, গম প্রভৃতিও এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। চরক-মতে,—শালি-ধান্য শীত-বীর্য্য, রসে ও পাকে মধু, অল্পবায়ুকর, মলবদ্ধকারক ও অল্পমলকারক, স্নিগ্ধ, বৃংহণ ও মূত্রবিরক এবং শুক্রকারক। সুশ্রুতের মতে, শালিসকল মধুর, শীতবীর্য্য, লঘুপাকী, বলকারক, অল্পবাত-কফ-কারক এবং বিষ্ঠাবিবন্ধ ও অল্পতাকারক। শালি-ধান্য বহু প্রকার; তন্মধ্যে রক্ত-শালিকে কেহ কেহ দাদখানি কহেন। উহাই শ্রেষ্ঠ এবং উহা দোষঘ্ন, শুক্র-মূত্রকারক, চক্ষুষ্য, বর্ণবলকারক, স্বরহিত, হৃদ্য, শ্রমনাশক, ব্রণহিত, জ্বরহর এবং সর্ব্বদোষ ও সর্ব্ববিষনাশক। অন্যান্য শালি অল্পান্তর গুণ এবং ক্রমশঃ নিকৃষ্ট। শমী ধান্য অর্থে ডাইল বুঝায়। শিম্বীজের সদৃশ দ্রব্য বলিয়াই উহার নাম শমী ধান্য। কোন্ চাউলের কি গুণ বর্ণন করিয়া শমী-ধান্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সুশ্রুত শমী-ধান্যকে কু-ধান আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই অংশে কোন্

* সুশ্রুত-সংহিতার অনুবাদক সুশ্রুতের অনুবাদের সহিত ডাক্তারী মতেরও এইরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; বলা বাহুল্য, 'হাতে হেতেড়ে' শিক্ষা না করিলে, এ চিকিৎসা-প্রণালীর কোনটাই বুঝিবার উপায় নাই। 'বঙ্গবাসী' সংস্করণে এই অনুবাদ দ্রষ্টব্য

ডাইলের কি গুণ, তাহা লিখিত আছে। শমী ধান্য বহুবিধ। তন্মধ্যে মুদ্গাই, চরকের মতে, উৎকৃষ্ট। ইহা কষায়, মধুর, রুক্ষ, শীতল, পাকে কটু, লঘু, বিশদ ও শ্লেষ্মা-পিত্ত-নাশক। সুশ্রুতের মতে,—'মুগ, কলাই, মটর, অরহর প্রভৃতি বৈদল সংজ্ঞাভুক্ত এবং উহারা সাধারণতঃ কষায়, মধুর, শীতল, কটুপাক, বায়ুকর, মূত্র ও বিষ্ঠার বিবন্ধকর এবং পিত্ত-শ্লেষ্মানাশক। এতন্মধ্যে মুগ অতিশয় বায়ুকারক নহে। মসূর বিপাকে মধুর ও বিষ্ঠা-বদ্ধকারক। অরহর কফ-পিত্তঘ্ন অথচ অতিশয় বাত-প্রকোপক নহে।' * ইত্যাদি। মাংসবর্গ প্রসঙ্গে পশু-মাংস পক্ষি-মাংস, মৎস্য-মাংস প্রভৃতির বিষয় পরিবর্ণিত। মাংসবর্গের মধ্যে শৃগালের ও গো-সাপের মাংস পর্য্যন্তের গুণাগুণ বর্ণিত আছে। রোহিত-মৎস্য,—কষায়ানুরস, শষ্পশৈবালভোজী, বায়ুনাশী অথচ অত্যন্ত পিত্ত-কোপন নহে (সুশ্রুতের মতে); শৈবালভোজী ও নিদ্রাবর্জ্জিত বলিয়া দীপনীয়, লঘুপাকী ও মহাবলকারক (চরকের মতে)। ফলবর্গ প্রসঙ্গে মনুষ্যের ব্যবহার্য্য প্রায় সকল ফলেরই গুণাগুণ লিখিত হইয়াছে। বাদাম, আখ্‌রোট প্রভৃতি পিত্ত-শ্লেষ্মা-হর (চরকের মতে—কফ পিত্ত বর্দ্ধক), স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু, বৃংহণ, বায়ুনাশক, বল্য ও মধুর। ফল-সমূহের মধ্যে যাহা পরিপক্ক, তাহারই গুণাধিক। কিন্তু বিল্বফল কাঁচাই ভাল। শাক-বর্গের মধ্যে বহুবিধ শাকের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুশ্রুত শাক-সমূহকে প্রধানতঃ পিত্তঘ্ন, বায়ুকারক, অল্প-কফকারক, মূত্র-পুরীষ-বিসর্জ্জনকারক এবং স্বাদুপাক ও স্বাদুরস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চরকের মতে—লাউ মলভেদক, রুক্ষ, শীতল ও গুরু। সুশ্রুতও ঐ মতের পরিপোষক। শাকবর্গের মধ্যে সুশ্রুত পুষ্পশাক পর্য্যায়ে বকপুষ্প প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পের গুণাগুণ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বক-পুষ্প নাতি-শীতোষ্ণ এবং রাত্র্যন্ধদিগের পক্ষে প্রশস্ত। পদ্মপুষ্প ঈষৎ তিক্ত, মধুর, শীতল ও পিত্ত-কফ-নাশক। উল্লিখিত পাঁচটী বর্গ-বিভাগে সুশ্রুতের সহিত চরকের মিল আছে। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী পাঁচ বর্গে সুশ্রুতে কন্দ-বর্গ, লবণাদি-বর্গ এবং অপর দুইটী বর্গ দৃষ্ট হয়। কৃতান্ন-বর্গ উভয়ত্রই আছে। চরকের হরিদ্বর্গে আদা, শুঁট, মূলা, পলাণ্ডু প্রভৃতির বিবরণ এবং মদ্য-বর্গে জগল মদ্য, সুরাসব (সুরা চুয়াইয়া যে মদ্য হয়), অম্লকাঞ্জিক (আমানি) প্রভৃতি বিবিধ মদ্যের গুণাগুণ লিখিত আছে। জলবর্গে নদীর জল, বৃষ্টির জল, প্রস্রবণের জল, সরোবরের জল প্রভৃতির গুণাগুণ এবং দুগ্ধবর্গের মধ্যে গোদুগ্ধ, ছাগীদুগ্ধ, মহিষী-দুগ্ধ প্রভৃতি দুগ্ধের ও দধি, ঘৃত প্রভৃতির গুণাগুণ পরিবর্ণিত। ইক্ষুবর্গ অংশে ইক্ষুরস, গুড়, চিনি, মধু প্রভৃতির গুণাগুণ লিখিত হইয়াছে। মধু সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন,—'মধু সাধারণতঃ বাতল, গুরু, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, কফনাশক, সন্ধানক, ছেদক, রুক্ষ, কষায় ও মধুর। মক্ষিকাগণ সর্ব্বপ্রকার পুষ্প হইতেই মধু সংগ্রহ করে। তন্মধ্যে বিষপুষ্পও থাকে। অতএব মধুর সহিত বিষের সম্বন্ধ আছে। এই জন্য মধু উষ্ণ করিয়া খাইতে নাই এবং তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির খাওয়াও

* এক এক বর্গের মধ্যে নানা দ্রব্যের পরিচয় আছে। শূকধান্যবর্গের মধ্যে অনূন পঞ্চাশ প্রকার ধান্যের পরিচয় দৃষ্ট হয়। শমীধান্য বা ডাইল পর্য্যায়ের মধ্যে কত প্রকার ডাইলেরই কথা লিখিত আছে। বর্ত্তমান কালে সে সকল প্রকারের ধান্য এবং ডাইল কি নামে পরিচিত, এখন তাহার অধিকাংশ নির্দ্দেশ করাই সুকঠিন।

উচিত নহে। মধু গুরু, রুক্ষ, কষায় ও শীতল বলিয়া অল্প পরিমাণ সেবন করিলেই হিতকর হয়। মধু অধিক সেবন করিলে যদি উদরে আম হয়, তবে তাহাকে মধ্বাম কহে। ইহার অপেক্ষা কষ্টকর পীড়া আর নাই। তৈলবর্গ প্রসঙ্গে চরক সর্ষপ তৈল, তিল তৈল, এরণ্ড তৈল প্রভৃতির গুণাগুণ উল্লেখ করিয়াছেন। তৈলবর্গ প্রসঙ্গেই চরকে কয়েক প্রকার লবণের গুণাগুণ বর্ণিত আছে। সুশ্রুতে লবণাদি বর্গ প্রসঙ্গে তাহা উক্ত হইয়াছে। কৃতান্ন-বর্গে চরকে ও সুশ্রুতে মণ্ড প্রভৃতির বিষয় বিবৃত আছে। একাধিক পদার্থের একত্র সংমিশ্রণে যে সকল সামগ্রী প্রস্তুত হয় (যেমন পিষ্টকাদি), তাহার গুণাগুণ এই অংশে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। সুশ্রুতোক্ত কন্দবর্গ অংশে নানাবিধ আলু, মূলা প্রভৃতির বিষয় পরিবর্ণিত। এই দ্রব্যগুণের বিষয় চরক ও সুশ্রুতের বিভিন্ন স্থানেই আলোচিত হইয়াছে। সূত্র-স্থানের মিশ্রক অধ্যায়ে কতকগুলি ঔষধের নাম উপলক্ষে কতগুলি দ্রব্যের গুণাগুণের পরিচয় দেখিতে পাই। ভূমি-প্রবিভাগীয় অধ্যায়ে মৃত্তিকাভ্যন্তর-প্রাপ্ত কতকগুলি দ্রব্যের পরিচয় আছে। দ্রব্য সংগ্রহণীয়, সংশোধন ও সংসমনীয় প্রভৃতি অধ্যায়েও সুশ্রুতে দ্রব্যগুণ-তত্ত্বের পরিচয় পাই। চিকিৎসিত-স্থানে চরক ও সুশ্রুত উভয়েই নানা দ্রব্যের নাম ও তাহাদের গুণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। চরকের সূত্রস্থানের প্রথম পাঁচটী অধ্যায়ে নানা দ্রব্যের গুণাগুণ দেখিতে পাই। দ্রব্য-সমূহকে জাঙ্গম, ঔদ্ভিদ ও পার্থিব এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া চরক বলিয়াছেন,—'এতন্মধ্যে মধু, দুগ্ধ, পিত্ত, বসা, মজ্জা, রক্ত, আমিষ, বিষ্ঠা মূত্র, চর্ম্ম, শুক্র, অস্থি, স্নায়ু, শৃঙ্গ, নখ, খুর, কেশ, লোম ও রোচনা,—এই সকল জাঙ্গম অর্থাৎ প্রাণিজ দ্রব্য। এবং অপর পাঁচ ধাতু—যথা, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, বঙ্গ, লৌহ এবং তাহাদের মল; আর বালি, চূর্ণ, মনছাল, হরিতাল, মণি, লবণ, গৈরিক (স্বর্ণমাক্ষিক ও গেরুমাটি প্রভৃতি) ও অঞ্জন (রসাঞ্জন প্রভৃতি),—এই সকল দ্রব্য পার্থিব। ঔদ্ভিদ ঔষধ চারি প্রকার; যথা,—বনস্পতি, বানস্পত্য, বীরুধ ও ওষধি। * বনস্পতির কেবল ফল হয়, বানস্পত্যের পুষ্প ও ফল উভয়ই হয়, ওষধি সকল ফল-পাকান্তে শুষ্ক হইয়া যায় এবং লতা-সকল প্রতান-বিশিষ্ট (জড়ান) হয়। এই উহাদের লক্ষণ। মূল, ছাল, সার, আটা, রস, পল্লব, ক্ষার, ক্ষীর, ফল, পুষ্প, ভস্ম, তৈল, কণ্টক, পত্র, কন্দ ও অঙ্কুর,—ইহারা ঔদ্ভিদ দ্রব্য। ষোল প্রকার ঔষধ-মূল-প্রধান অর্থাৎ তাহাদের কেবল মূলই ঔষধে ব্যবহার করা যায় এবং উনিশ প্রকার ফল-প্রধান ঔষধ। অন্যান্য ঔষধের ফল-মূল প্রভৃতি সমস্ত অংশই ব্যবহার করা হয়। মহাস্নেহ চারি প্রকার, লবণ পাঁচ প্রকার, মূত্র আট প্রকার এবং দুগ্ধ আট প্রকার। যিনি এই সকল ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন রোগে প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনিই আয়ুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ।' ফলতঃ, সংসারের প্রত্যেক পদার্থটি তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণাগুণ-বিভাগ এবং এক পদার্থের সহিত অন্য পদার্থের সংমিশ্রণে তাহার গুণাগুণ নির্দ্ধারণ আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র যেরূপভাবে করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না।

---

* সুশ্রুতে এ বিষয় আর এক ভাবে লিখিত আছে। সেখানে চতুর্ব্বিধ বৃক্ষের নাম—বনস্পতি, বৃক্ষ, বিরুধ ও ওষধি। জঙ্গম চতুর্ব্বিধ—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। সুশ্রুত-সংহিতা, সূত্রস্থান, প্রথম অধ্যায়, দ্রষ্টব্য।

ধাতুর বৈষম্যই ব্যাধি। বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা,—ত্রি-ধাতুর সাম্যভাবে শরীর সুস্থ এবং বৈষম্যে অসুস্থ। বায়ু-পিত্ত-কফ ব্যাপন্ন বা বৈষম্য-সম্পন্ন হইলে ধ্বংসের হেতু হয়। চিকিৎসা—সাম্যভাব-রক্ষার চেষ্টা। সুশ্রুত বলিয়াছেন,—'বায়ু, পিত্ত, কফ এবং শোণিত,—এই চারি দ্রব্যের সমবায়ে শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি। কফ, পিত্ত, বায়ু ভিন্ন দেহ থাকিতে পারে না এবং শোনিত ভিন্নও দেহ থাকিতে পারে না। ইহারাই দেহকে ধারণ করে।' পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকগণ রোগ-সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম, অরগানিক (organic) বা শারীর-যন্ত্র সংক্রান্ত; দ্বিতীয়, ফাংশনাল (functional) বা ক্রিয়াগত। পেশী-সমূহের বৈষম্য জন্য হৃৎকম্প হইলে, তাহাকে 'অর্গানিক' পীড়া; আর ভয় বা অতিরিক্ত পরিশ্রম জন্য হৃৎকম্প হইলে, তাহাকে ফাংশনাল পীড়া কহে। সুশ্রুত ও চরক ব্যাধি-সমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে,—ব্যাধি দ্বিবিধ; নিজ (সুশ্রুতের মতে, শারীর) ও আগন্তু।' এতভিন্ন তাঁহারা ত্রি-দোষ-ভেদে ত্রিবিধ এবং সাধ্য, অসাধ্য, মৃদু ও দারুণ ভেদে চতুর্ব্বিধ প্রভৃতিও ব্যাধির ভাগ করিয়াছেন। বিভাগ সম্বন্ধে যাহাই হউক, মূল তত্ত্ব উভয়ত্রই অভিন্ন। সুশ্রুতের মতে, শারীর ব্রণ—বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও সান্নিপাত হইতে উৎপন্ন। আর, আগন্তু ব্রণ—মানুষ, পশু, পক্ষী, ব্যাল, সরীসৃপ, পতন, পীড়ন, প্রহার, অগ্নি, ক্ষার, বিষ, তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। রোগ-চিকিৎসায় প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে চিকিৎসকের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন;—(১) নিদান-তত্ত্ব, (২) চিকিৎসা-তত্ত্ব বা ভৈষজ্য-জ্ঞান। ইংরাজীতে নিদান-তত্ত্বকে 'প্যাথলজি' (Pathology) এবং চিকিৎসা-তত্ত্বকে 'থেরাপিউটিক্স' (Therapeutics) বলা যাইতে পারে। ভিষকগণ আবার নিদান-তত্ত্বের দুই অঙ্গ নির্দ্দেশ করেন; যথা, এক অঙ্গ—কারণ, অপর অঙ্গ—লক্ষণ। কি কারণে রোগ উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় কারণ-তত্ত্বের অন্তর্গত; আর, কোন্ রোগের কি লক্ষণ, তাহা নির্ণয় করাই লক্ষণ-তত্ত্বের উদ্দেশ্য। কারণ-তত্ত্ব ও লক্ষণ-তত্ত্ব ইংরাজীতে যথাক্রমে 'ইটিওলজি' (Etiology) এবং 'সিমটমেটলজি' (Symptomatology) নামে অভিহিত হয়। চরক ও সুশ্রুতের নিদান-স্থানে রোগের এই দুই তত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট আছে। বাতজ্বরের কারণ ও লক্ষণ বিষয়ে চরক অতি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এস্থলে তাহা উল্লেখ করিতেছি। "রুক্ষ, লঘু, শীতল, পরিশ্রম, বমন, বিরেচন ও আস্থাপনের অতিযোগ, বেগধারণ, উপবাস, আঘাত, স্ত্রী-প্রসঙ্গ, উদ্বেগ, শোক, অতিশয় রক্তস্রাব, জাগরণ, বিষমভাবে শরীর স্থাপন,—এই সকল অতিশয় সেবিত হইলে বায়ু প্রকুপিত হয়। সেই বায়ু কুপিত হইয়া, আমাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক উষ্মার সহিত মিলিত হইয়া, আহারের সারভূত প্রসাদাখ্য রসকে * আশ্রয় করে। তখন রস ও স্বেদের প্রবাহ রুদ্ধ হয়। পাচকাগ্নি মন্দীভূত হয় এবং উষ্মা পাকস্থান হইতে বহিষ্কৃত হয়। তখন বায়ু শরীরকে একাকী পাইয়া অধিকার করে (অর্থাৎ তখন বায়ুর ক্রিয়াই বলবতী হয়) এবং

রোগ-নিদান, কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা প্রভৃতি।

* সূত্রস্থানের ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে চরক রসের প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে 'মেডিকেল কংগ্রেস' বিষয়ক আলোচনায় এই পরিচ্ছেদের পরবর্ত্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

বাতজ্বর হইয়া থাকে।" এইরূপে উৎপত্তির কারণ বিবৃত করিয়া, বাতজ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে চরক বলিতেছেন,—"শারীরিক তাপের আরম্ভ ও ত্যাগের বিষমতা হয়। সর্ব্বদা এক ভাব থাকে না। কখনও তীক্ষ্ণতা, কখনও বা মৃদুতা। আহার-পাকান্তে, দিবসান্তে, গ্রীষ্মান্তে বাতজ্বরের উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয়। এই জ্বরে নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ ও ত্বকের অত্যন্ত পরুষতা ও অরুণ-বর্ণতা হয়। শরীরের ভাব ক্লিপ্তবৎ হইয়া যায়। শরীরে ও অঙ্গ-সমূহে অনেকবিধ চলাচল ও বেদনা অনুভূত হয়। যথা, পাদদ্বয়ের সুপ্ততা, পিণ্ডিকের (পায়ের ডিমির) উদ্বেষ্টন (মোচড়ান), জানু ও পৃথক পৃথক সন্ধিদিগের বিশ্লেষণ, ঊরুদ্বয়ের অবসন্নতা, কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, বাহু, অংস ও বক্ষের ভগ্নবৎ বেদনা, মুদিতবৎ (চাপিয়া ধরার ন্যায়) বেদনা, মথিতবৎ বেদনা, চটিতবৎ বেদনা, পীড়নের ন্যায় বেদনা এবং সূচীভেদনবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। হনুস্তম্ভ, কর্ণনাদ, শঙ্খনিস্তোদ (কপাল পার্শ্বে সূচীভেদবৎ পীড়া), কষায় আস্বাদ, মুখবৈরস্য, মুখ-তালু-কণ্ঠ শোষ, পিপাসা, হৃৎ-পীড়া, শুষ্ক বমি, শুষ্ক কাশ, হাঁচি ও উদ্গারের বোধ, অন্নরস-যুক্ত নিষ্ঠিবন, অরুচি, অপাক, বিষাদ, জৃম্ভা, বিনাম, কম্প, বিনাশ্রমে শ্রমবোধ, ভ্রম (ঘূর্ণন), মৃদু, প্রলাপ, অনিদ্রা, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, উষ্ণাভিলাষ এবং নিদানোক্ত রুক্ষ-লঘু-শীতাদি গুণের বিপরীত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সেবন দ্বারা আরাম বোধ হয়। এই সকল বাতজ্বরের লক্ষণ।" এই বাতজ্বর ও তৎপ্রকার রোগের বিবিধ অবস্থার বিবিধ প্রকার ঔষধের বিষয় চরক ও সুশ্রুত ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনুষ্যের যত প্রকার কঠিন পীড়া সম্ভবপর, সর্ব্ববিধ পীড়ারই চিকিৎসা-প্রণালী আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। কুষ্ঠ রোগ কত প্রকার এবং সেই সকল কুষ্ঠ কি প্রকার ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হয়, চরকে ও সুশ্রুতে তাহার বিবিধ ঔষধ লিখিত আছে। যে ঔষধ বা রসায়ন সেবনে মনুষ্যের জীবন বৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্বিধ ঔষধের বা রসায়নের প্রস্তুত-প্রণালীও চরক-সুশ্রুতাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। আবার রোগ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, চরক ও সুশ্রুত পূর্ব্ব হইতেই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। সুশ্রুত-সংহিতার কল্প-স্থানের অধ্যায়াষ্টকে বিষ-চিকিৎসার বিবরণ পরিবর্ণিত আছে। প্রথম অধ্যায়ে অন্ন-পানের সহিত শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হইলে, কিরূপ স্থলে কিরূপ ভাবে সেই বিষ নষ্ট করিতে হইবে, সুশ্রুত তাহার উপদেশ দিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থাবর-বিষ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে জঙ্গম-বিষ সম্বন্ধে উপদেশ আছে। চতুর্থ অধ্যায়—সর্পদষ্ট বিষ-বিজ্ঞানীয়। কত প্রকার সর্প আছে, তাহাদের দষ্ট-লক্ষণ এবং বিষের বেগ প্রভৃতির বিষয় ঐ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে—সর্পদষ্ট কল্প-চিকিৎসা। সেই চিকিৎসা-প্রণালী সুশ্রুত এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—'যে কোনও সর্পেই দংশন করুক না কেন; যদি হস্তাদি শাখায় দংশন করে, তবে দংশনের পর চারি অঙ্গুলি রাখিয়া অরিষ্টা (অর্থাৎ মন্ত্রপূত বসনাদি) দ্বারা বন্ধন করিয়া দিবে। বস্ত্র, চর্ম্মান্ত (চামের টুকরা) বা বল্কল মন্ত্রাদি সহকারে বন্ধন করিলে বিষ আর শরীরে উঠে না। তদনন্তর দংশকে ছেদন করিয়া দগ্ধ করিবে। যেখানে বন্ধন আছে, সেখানে ছেদন করিবে না। আচুষণ, সেক ও দাহ সর্ব্বস্থলেই প্রশস্ত। মুখ বস্ত্র দ্বারা পূর্ণ করিয়া আচুষণ করা উচিত। যে সর্পে

দংশন করিয়াছে, তাহাকে হস্ত দ্বারা ধরিয়া তৎক্ষণাৎ দংশন করা ভাল। তদভাবে লোষ্ট্রে দংশন করা ভাল। মণ্ডলী সর্পে দংশন করিলে, কথনও দষ্টস্থান দগ্ধ করিবে না। কেন-না, মণ্ডলীর বিষে পিত্ত কুপিত করে; সুতরাং বিষ দাহ হেতু বিসর্পিত। মন্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা মন্ত্রের সহিত অরিষ্টাও বন্ধন করিবে। সেই অরিষ্টা রজ্জু প্রভৃতির সহিত বদ্ধ হইলেই বিষের প্রতিকারী হয়। দেব ও ব্রহ্মর্ষিদিগের মন্ত্র সকল সত্যময় ও তপোময়। * .. মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক প্রোক্ত হইলেও অথবা স্বরবর্ণতঃ হীন হওয়াতে যদি সিদ্ধ না হয়, তবে অগদ চিকিৎসা করিবে। অগদক্রম যথা,—দংশের চারিদিকে শিরা সকল বিদ্ধ করিবে। বিষ প্রসৃত হইয়া পড়িলে, হস্তাগ্রে বা পদাগ্রে বা ললাটে শিরাবেধ করিবে। রক্ত নির্গত হইলে সমস্ত বিষ নির্গত হইয়া যায়। অতএব রক্ত মোক্ষণ করিবে। রক্ত-মোক্ষণই বিষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। দংশ-স্থানকে চিরিয়া সমন্তাৎ অগদ নামক দুই তোলা পরিমাণে ঔষধ লেপন করিবে। আর চন্দন ও বেণার মূলের ক্বাথ পরিসেচন করিবে। তদভাবে কৃষ্ণবর্ণ বল্মীক মৃত্তিকা লেপন ও পান করাইবে। অথবা কোবিদা, শিরীষ, অর্ক ও কটভীর (শ্বেত অপরাজিতা) কল্ক বা ক্বাথ পান করাইবে। দষ্ট ব্যক্তি তৈল, কুলথ যূস, মদ্য ও সৌবীরক পান করিবে না। অন্য যাহা কিছু দ্রব দ্রব্য পুনঃপুনঃ পান করিয়া বমন করিবে। প্রায়ই বমন দ্বারা বিষ অনায়াসে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। সর্প-বিষের প্রথম বেগে প্রথমে রক্ত-মোক্ষণ করিবে; দ্বিতীয় বেগে মধু ঘৃতযোগে অগদ পান করাইবে; তৃতীয় বেগে বিষনাশক নস্য-কর্ম্ম ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে; চতুর্থ বেগে বমি করাইবে। অনন্তর স্থাবর-বিষাধিকারোক্ত কোষত্তকাদি দ্রব্য কৃত যবাগূ পান করাইবে। ইত্যাদি।...” সুশ্রুতে এবং চরকে সর্পবিষ চিকিৎসার যে প্রণালী লিখিত আছে, তাহা সাধারণের সহজ-বোধ্য নহে। কিন্তু এই চিকিৎসায় সর্পদষ্ট রোগী যে আরোগ্য হইত, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ইউরোপই সে প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়ানের † ইতিহাসে প্রকাশ,—মাসিডনাধিপতি আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কাস এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নিয়ার্কস বলিয়া গিয়াছেন,—গ্রীস-দেশের ভিষকগণ সর্পদংশনের কোনই প্রতিকার জানিতেন না।

* ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডল ৫০শ সূক্তটী সর্পবিষের মন্ত্র বলিয়া প্রচারিত।

† এরিয়ান (আরিয়ান Arian Flavius) এক শত খৃষ্টাব্দে বিথিনিয়ার অন্তর্গত নিকোমিডিয়া পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ষ্টোয়িক দার্শনিক এপিক্টেটসের শিষ্য ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই ইঁহার রচনা-শক্তি বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। এথেন্সের বিদ্বন্মণ্ডলী ইঁহার রচনা দৃষ্টে মুগ্ধ হন। ইনি জেনোফনের রচনার আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এথেন্স-বাসিগণ তজ্জন্য ইঁহাকে 'নব্য জেনোফন' (Young Xenophon) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ১২৪ খৃষ্টাব্দে ইনি গ্রীসের সম্রাট হাড্রিয়ানের সহিত পরিচিত ও তাঁহার নিকট সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাড্রিয়ানের উত্তরাধিকারী এণ্টনিয়স পায়াস, এরিয়ানের সম্মান-বর্দ্ধনের জন্য তাঁহাকে 'কন্সাল' (Consul) পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এরিয়ান বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে আলেকজাণ্ডারের অভিযান বিষয়ক গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে ইনি আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন; তাহাতে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে।

কিন্তু ভারতবাসীরা সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসায় সমর্থ ছিলেন। যাহারা সর্পদষ্ট হইয়াছিল, ভারতীয় ভিষকগণ তাহাদিগের আরোগ্য-বিধানে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক প্রধান অঙ্গ—রসায়ন। কোন্ কোন্ পদার্থের কি গুণ ও ধর্ম্ম এবং একের সহিত এক বা ততোধিক পদার্থের সংমিশ্রণে কি পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং সেই নবজাত পদার্থে কি গুণ বা ধর্ম্ম অবস্থিতি করে,—রসায়ন-বিজ্ঞানে সেই জ্ঞান লাভ হয়। একের সহিত অন্যের মিশ্রণ স্বভাবতঃ যে নিয়মের অধীন, তাহাকে কাল্পনিক বা ঐপপত্তিক রসায়ন-বিজ্ঞান বলা যায়; আর একের সহিত অন্যের মিশ্রণে অভিনব পদার্থের উৎপত্তি-মূলক গুণ-ধর্ম্ম যাহাতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম—ব্যবহারিক রসায়ন। সংসারে বহুবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া আপনা-আপনিই সংসাধিত হইতেছে। তাহাই প্রথমোক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত; এবং মনুষ্য আপন জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে পদার্থাদির যে সংযোগ-ক্রিয়া সাধিত করে ও তাহার গুণাগুণ অবগত হয়, তাহাই শেষোক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। প্রাচীন আর্য্যগণ যে প্রত্যেক দ্রব্যের গুণাগুণ অবগত ছিলেন, সে বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সংসারে প্রত্যেক পদার্থের কি গুণ-ধর্ম্ম, প্রাচীন হিন্দুগণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক-দর্শনকে রসায়ন-বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরমাণু-সমূহের সংযোগ-বিয়োগে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে, বৈশেষিক-দর্শন সে তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। বৈশেষিক-দর্শনকে বা কণাদের মতকে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ যত আধুনিক বলিয়াই নির্দ্দেশ করুন না কেন; খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সে মত প্রতিষ্ঠিত ছিল, তদ্বিষয়ে আজি পর্য্যন্ত কেহ সংশয়-সন্দেহ উত্থাপন করেন নাই। সাঙ্খ্য-দর্শনেও এ সংযোগ-তত্ত্বের মূল দেখিতে পাই। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে যে বিকৃতি, তাহাও কি রসায়ন-বিজ্ঞানের চরম পরিণতির পরিচয় নহে? সুশ্রুত বলিয়াছেন,—'এই রসায়ন-তন্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, মানুষ নীরোগ শরীরে আয়ুর্বৃদ্ধি করিয়া অবস্থিতি করিতে পারে। চরকের চিকিৎসিত-স্থানে, প্রথম অধ্যায়ে, বহু রসায়ন প্রস্তুত-প্রণালী লিখিত আছে। সেই সকল রসায়নের কোনটীতে দীর্ঘ-জীবন লাভ হয়, কোনটিতে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ নবযৌবন প্রাপ্ত হয়। চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি ব্রাহ্ম রসায়ন এই অংশের অন্তর্গত। একাধিক ঔষধির সংযোগে, একাধিক ধাতব পদার্থের পরস্পর সংমিশ্রণে যে সকল রসায়ন প্রস্তুত হয়, তাহার কতকগুলির ফলাফল ঐ অংশে বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ চরক-বর্ণিত দুই একটি রসায়ন প্রস্তুত-প্রণালী ও তাহার গুণাগুণ বর্ণন করিতেছি। এক প্রকার—ত্রিফলা রসায়ন; যথা,—'লৌহাদিগণ কিংবা কেবল সুবর্ণের সহিত বা বচের সহিত বা মধু ঘৃতের সহিত বা বিরঙ্গ পিপ্পলীর সহিত বা সৈন্ধবের সহিত সম্বৎসর ত্রিফলা সেবন করিলে, মেধা, স্মৃতি ও বল-বৃদ্ধি হয়। এই রসায়ন আয়ুপ্রদ, ধন্য ও জরারোগ নিবারক। শিলাজতু-রসায়ন,—গিরি-

রসায়ন।

* "Nearchus (*apud*-Arian) informs us that "the Grecian physicians found no remedy against the bite of snakes, but the Indians cured those who happened to incur that misfortune."—*Civilisation in Ancient India.*

পার্শ্বস্থ সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু-সকল সূর্য্যতাপে তাপিত হইলে স্রাবিত হইতে থাকে। তন্মধ্যে যে স্রাব জতুর ন্যায় আভাযুক্ত, মৃত্তিকাবর্ণ মিশ্রিত ও কোমল, তাহাই শিলাজতু। সুবর্ণজাত শিলাজতু মধুর, ঈষৎ তিক্ত, জবাপুষ্পনিভ, বিপাকে কটু ও শীতল। রৌপ্য-জাত শিলাজতু কটু, শ্বেত, শীতল ও স্বাদুপাক। তাম্রজাত শিলাজতু ময়ুর-কণ্ঠের ন্যায় আভাযুক্ত, তিক্ত, উষ্ণ, ও কটুবিপাক। যে শিলাজতু গুগ্‌গুল্‌ বর্ণ ও তিক্ত-লবণরূপ, বিপাকে কটু, শীতল ও গোমূত্র-গন্ধী, তাহাই লৌহজাত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সর্ব্বপ্রকার শিলাজতুই সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু রসায়ন-প্রয়োগে শেষোক্ত শিলাজতুই প্রশস্ত। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহের শিলাজতু যথাক্রমে বাতপিত্ত, শ্লেষ্মাপিত্ত, কফ ও ত্রিদোষে প্রশস্ত। পৃথিবীতে এরূপ সাধ্য রোগ নাই, যাহা শিলাজতুতে নষ্ট না হয়।" সুশ্রুত-সংহিতার সূত্রস্থানের একাদশ অধ্যায়ে ক্ষার-পাক-বিধি লিখিত আছে। "ক্ষার ছেদন, ভেদন ও লেখন কর্ম্মের উপযোগী। অথচ, ইহা ত্রিদোষ-নাশক দ্রব্য-সমূহ যোগে কল্পিত হয় এবং অর্শ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রোগে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। অতএব শস্ত্র-অনুশস্ত্র-দিগের মধ্যে ক্ষার প্রধান।...ক্ষার দুই প্রকার;—প্রতিসার (যাহা ঘর্ষণ বা লেপন করিতে হয়) এবং পানীয়। তন্মধ্যে প্রতিসারণীয় ক্ষার কুষ্ঠ, কিটিভ, দদ্রু কিলাস, মণ্ডল, ভগন্দর, অর্ব্বুদ, দুষ্ট-ব্রণ, নালী ঘা, চর্ম্মকিল, কিলফালক, ন্যচ্ছ্‌, বঙ্গ, মশক, বাহ্যবিদ্রধি, কৃমি ও বিষ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়। আর উপজিহ্বা, অধিজিহ্বা, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ ও তিন প্রকার রোহিণী,—এই সাতটী মুখরোগেও ক্ষার উপযোগী। পানীয় ক্ষার গরদোষ, গুল্ম, উদর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরোচক, আনাহ, শর্করা, অশ্মরী, অন্ত-র্বিদ্রধি, কৃমি, বিষ ও অর্শরোগে উপযোগী।*...ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে শরৎকালে শুচি হইয়া উপবাস করিয়া প্রশস্ত দিবসে পর্ব্বতোপরি জাত, প্রশস্ত দেশ সম্ভূত, অনুপহত (নিখুঁত), মধ্যবয়স্ক বৃহৎ একটি ঘণ্টা-পারুল গাছ এক দিন অধিবাসের পর, পরদিন ছেদন ও খণ্ড খণ্ড করিয়া নির্ব্বাত স্থানে রাশীকৃত করিয়া রাখিবে এবং উহার সহিত ঘুটিং মিশ্রিত করিয়া তিলনাল দ্বারা জ্বালাইয়া দিবে। অনন্তর অগ্নি শান্ত হইলে, ঘণ্টাপারুল ভস্ম ও ঘুটিং পৃথক পৃথক গ্রহণ করিবে। পূর্ব্বোক্ত বিধানেই, কুড়চী, পলাশ, অশ্বকর্ণ, পালিমাদার, বিভীতক, সোঁদল, তিল্লক, আকন্দ, মনসা, অপাং, পারুল, নক্তমাল, বাসক, কদলী, চিতা, পূটিক, হাফলমালী, করবীর, ছাতিম, গনিয়ারী, কুঁচ এবং মূল-শাখা সমন্বিত চারি প্রকার কোধা,—একত্র দগ্ধ করিবে। অনন্তর এক দ্রোণ ক্ষার ছয় দ্রোণ জলে বা গোমূত্রে আলোড়িত করিয়া একুশ বার ছাঁকিয়া লইবে। পরে একটি বৃহৎ কটাহে দর্ব্বী দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে ক্ষার-জল স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ ও পিচ্ছিল হইয়া আসিলে, উহা গ্রহণ করিয়া একটি ঘনবস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে, পরে কিট্ট ভাগ স্বতন্ত্র রাখিয়া পুনরায় অগ্নিতে স্থাপন করিবে। সেই ক্ষার-জল হইতে এক কুড়ব বা দ্বাদশ পল পরিমিত ক্ষার-জল পৃথক রাখিয়া দিবে। অবশিষ্ট ক্ষার-জল দুই দ্রোণ থাকিতে নামাইবে। অনন্তর খড়ি ও পূর্ব্বোক্ত ঘুটিং এবং শুক্তি ও শঙ্খের নাভি সমান সমান অংশে অগ্নিযোগে অগ্নিবর্ণ করিয়া লৌহ-পাত্রে

* যে যে অবস্থায় ক্ষার ব্যবহার্য্য, এই স্থানে তাহার উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বোক্ত কুড়ব বা দ্বাদশ পল পরিমিত পৃথক-স্থাপিত ক্ষার-জল নির্ব্বাপিত ও শীতল করিয়া সেই ক্ষার জল দ্বারাই পাথরে পিশিয়া অষ্ট পল পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত দুই দ্রোণ ক্ষার জলে নিক্ষেপ করিয়া অনবরত সাবধানে দর্ব্বী দ্বারা ঘট্টিত করিতে করিতে পাক করিবে। আসন্ন পাকে নামাইয়া অসঙ্কীর্ণ-মুখ লৌহ-পাত্রে স্থাপন করিবে। ইহাই মধ্যম ক্ষার। আর যদি পূর্ব্বোক্ত খড়ি প্রভৃতি প্রক্ষেপ না দিয়া পাক শেষ করা যায়, তবে তাহাকে সংব্যূহীন বা মৃদু ক্ষার কহে। আর যদি পূর্ব্বোক্ত মধ্যম ক্ষারে দন্তী, দ্রবন্তী, চিতার মূল, লাঙ্গলিকী নাটা-করঞ্জের পল্লব, তালমূলী, বিড়, সুবর্চ্চিকা, হিঙ্গ, বচ, স্বর্ণক্ষীড়ী, বিষ,—এই সকল সমান ভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকের চারি তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পাক করা যায়, তবে পাক্য নামক তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুত হয়। ব্যাধির বল বুঝিয়া এই সকল ক্ষার প্রয়োগ করা যায়।' হিন্দুদিগের রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অনাবশ্যক। কোন্ দ্রব্য কিরূপ অবস্থায় অপরের সহিত সম্মিলিত হইলে কিরূপ গুণ-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তাহার আভাস প্রদানের উদ্দেশ্যেই প্রোক্ত দৃষ্টান্ত কয়েকটীর অবতারণা করা হইল। নচেৎ, উহা দেখিয়া কেহ কোনও রসায়ন প্রস্তুত পক্ষে চেষ্টা পান, ইহা কদাচ অভিপ্রেত নহে। কারণ, কেবল গ্রন্থগত উপদেশে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা করা যায় না। বিশেষতঃ, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এতই পাঠান্তর আছে এবং গ্রন্থ-বর্ণিত দ্রব্যাদির স্বরূপ নিরূপণ পক্ষে এতই অন্তরায় ঘটিয়াছে যে, বহুদর্শী শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন, এ সকল বিষয় শিক্ষার প্রয়াস পাইতে গেলে কুফল ফলিবারই সম্ভাবনা। *

বিভিন্ন দেশের ভিষকবর্গ একত্র সমবেত হইয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতির বিষয়ে চেষ্টা পাইতেন এবং আপনাদের ভূয়োদর্শনের ফলাফল পরস্পরকে বিজ্ঞাপিত করিতেন; প্রাচীন ভারতে এরূপ সম্মিলনের বহু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন যেরূপ সময় সময় বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞ ভিষকগণের সমবায়ে ভিষক-সম্মিলন (নামান্তরে 'মেডিকেল কংগ্রেস') হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বোক্তেরই অনুস্মৃতি বলিয়া মনে করিতে পারি। চরক-সংহিতায় সূত্র-স্থানের ষড়বিংশ অধ্যায়ে ভিষকগণের এক মহা-সম্মিলনের বিবরণ বর্ণিত আছে। সেই সম্মিলনের বিবরণ এই;—"কোনও সময়ে আত্রেয়, ভদ্রকাপ্য, শাকুন্তেয়, পূর্ণাক্ষ মৌদ্গল্য, হিরণ্যাক্ষ কৌশিক, পবিত্র-স্বভাব কুমার-শিরা ভরদ্বাজ, শ্রীমান্ ও ধীমান্ রাজর্ষি বার্য্যোবিদ, নিমি রাজর্ষি বৈদেহ, মহামতি বড়িশ এবং বহ্লিক-সম্প্রদায়স্থ বৈদ্যদিগের শ্রেষ্ঠ কাঙ্কায়ন বাহ্লিক,—এই সকল বিদ্যা-বৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ রমণীয় চৈত্ররথে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সে স্থানে উপবিষ্ট হইলে রস ও আহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিবার জন্য এইরূপ মহতী কথা উপস্থিত হইয়াছিল,—ভদ্রকাপ্য কহিলেন,—'রস এক প্রকার। এই রসকে বিজ্ঞেরা রূপ-রসাদি বিষয়-সমূহের অন্যতম ও জিহ্বাগ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রস—জল

ভিষক-সম্মিলন বা মেডিকেল কংগ্রেস।

* বাঙ্গালা ভাষায় এবং ইংরাজী ভাষায় চরক ও সুশ্রুতের নানা সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সেই সকল সংস্করণের অনেক স্থলে একের সহিত অন্যের মিল নাই। অধ্যায় প্রভৃতিও অনেকে আপন ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লইয়াছেন।

ভিন্ন আর কিছুই নহে।' ব্রাহ্মণ শাকুন্তেয় কহিলেন,—'রস দুই প্রকার; ছেদনীয় (যাহা দোষ-দিগকে শরীর হইতে ছেদন অর্থাৎ সংশোধন করে) এবং উপশমনীয় (যাহা দোষ-দিগকে সংশোধন না করিয়াই শান্ত করে)।' পূর্ণাক্ষ মৌদ্গল্য ঋষি কহিলেন,—'রস তিন প্রকার; ছেদনীয়, উপশমনীয় এবং সাধারণ।' হিরণ্যাক্ষ কৌশিক কহিলেন,—'রস চারি প্রকার; হিতকর স্বাদু, অহিতকর স্বাদু, অহিতকর অস্বাদু এবং হিতকর অস্বাদু।' কুমার-শিরা ভরদ্বাজ কহিলেন,—'রস পাঁচ প্রকার; ভৌম, ঔদক, আগ্নেয়, বায়ব্য এবং আন্তরীক্ষ।' রাজর্ষি বার্য্যোবিদ কহিলেন,—'রস সাত প্রকার; গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ।' নিমি বৈদেহ কহিলেন,—'রস সাত প্রকার; যথা,—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায় ও ক্ষার।' বড়িশ ধামার্গব কহিলেন,—'রস আট প্রকার; যথা,—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়, ক্ষার ও অব্যক্ত। (অব্যক্ত রস যেমন ভাতের স্বাদ, জলের স্বাদ ইত্যাদি)'। বৈদ্য কাঙ্কায়ন বাহ্লিক কহিলেন,—"রস অসংখ্য; কারণ, উহাদের আশ্রয়, গুণ, কর্ম্ম ও সংস্কার-ভেদ অসংখ্য।' ভগবান আত্রেয় পুনর্ব্বসু কহিলেন যে,—'রস ছয়ই। মধুর, অম্ল, লবণ, কটু তিক্ত ও কষায়। এই ছয় রসের যোনি জল। ছেদন ও উপশমন,—এই দুইটী উহাদের কর্ম্ম বটে; কিন্তু ঐ দুইটী ক্রিয়া পরস্পর মিশ্রিত বলিয়া উহাদের এক-একটীর বিশেষ-রূপে গণনা হয় না। 'রস দুই শ্রেণীর বটে; যথা,—স্বাদু ও অস্বাদু। রসের প্রভাব দুই প্রকার; হিত ও অহিত। পাঞ্চ-ভৌতিক দ্রব্যই রসের আশ্রয়। সেই সকল আশ্রয়—প্রকৃতি, বিকৃতি, বিচার, দেশ ও কালের বশ; সেই সকল দ্রব্য-সংজ্ঞক আশ্রয়েই গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষাদি গুণ সকল আশ্রিত। ক্ষরণ হইতে ক্ষার নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষার রস নহে। উহা দ্রব্য; উহা নানা রস হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং উহা নানা-রস-বিশিষ্ট। তন্মধ্যে উহাতে কটু ও লবণ রসের ভাগই অধিক। এই ক্ষার দ্রব্য কেবল রস নহে; রস ভিন্ন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ার্থও ইহাতে আছে। উপকরণ-ভেদে উহা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করিয়া থাকে। রসের তন্মাত্রা অব্যক্ত এবং অনুরস-সমন্বিত দ্রব্যের অনুরসেও অব্যক্তীভাব আছে; আবার সেই সমস্ত রসের আশ্রয় প্রভৃতি দ্রব্য অসংখ্য বলিয়া আশ্রয়-ভেদে রস অসংখ্য নহে। রস রসই থাকে; উহা অন্যত্ব প্রাপ্ত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পরস্পর-সংযোগ-হেতু রসের প্রভেদ অসংখ্য হইলেও কটু-তিক্তাদি ছয় রসের অনির্দ্ধারণ হয় না। তবে গুণ ও প্রকৃতির অসংখ্যতা হয়। কিন্তু সংসৃষ্ট রস অসংখ্য বলিয়া বুদ্ধিমানেরা সংসৃষ্ট রসের কর্ম্ম উপদেশ করেন না।...দ্রব্য দেশ ও কালের প্রভাব হেতু ছয় রসের তেষট্টি প্রকার বিকল্প (ভেদ) হয়। সেই ছয় রস দুই দুইটী সংযোগে এক একটী করিয়া কমিয়া পাঁচটী হইয়া অপর পাঁচটীর সহিত যুক্ত হয়। যথা,—মধুর রস, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পাঁচটীর সহিত দুইটী করিয়া মিলিত হইলে একটীর সংখ্যা কম হইয়া পাঁচটী সংখ্যা হয়,—যেমন, মধুরাম্ল, মধুর-লবণ, মধুর-তিক্ত, মধুর-কটু ও মধুর-কষায়। এইরূপ অম্ল-রসও পাঁচটী হয়; যথা,—অম্ল-মধুর, অম্ল-লবণ, অম্ল-তিক্ত, অম্ল-কটু, অম্ল-কষায়। কিন্তু মধুরাম্ল দুইবার হইতেছে; অতএব দ্বিতীয় স্থানে মধুরাম্ল পরিত্যাজ্য হওয়াতে দ্বিতীয় স্থানে প্রকৃতপক্ষে চারিটী বিকল্প

হইয়াছে। এই নিয়মে দেখা যায় যে, দুই দুইটী সংযোগে মধুর রস পাঁচটী, অম্লরস চারিটী, লবণ রস তিনটী, তিক্তরস দুইটী ও কটু রস একটী। অতএব দুই দুইটী সংযোগে সর্ব্বশুদ্ধ পনেরটী রস হইল। এইরূপে তিন তিনটী করিয়া সংযোগ করিলে মধুর রস দশটী, অম্ল ছয়টী, লবণ তিনটী ও তিক্ত একটী অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ কুড়িটী হয়। এইরূপে চারি চারিটী করিয়া সংযোগ করিলে মধুর রস দশটী, অম্ল চারিটি ও লবণ একটি অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ পনেরটি হয়। এইরূপ, পাঁচটি করিয়া সংযোগ করিলে মধুর রস পাঁচটী ও অম্ল-রস একটি অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি হয়। আর ছয়টি একত্র যোগে একটি রস হয়। অতএব যৌগিক রস সর্ব্বশুদ্ধ—১৫+২০+১৫+৬+১=৫৭ সাতান্নটি হইতেছে। আর, যেহেতু মূল রস ছয়টি। অতএব রস-সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ—৫৭+৬=৬৩ তেষট্টি হইতেছে। * এই তেষট্টি প্রকার রস—রস ও অনুরস ভেদে এবং রস ও অনুরসের তারতম্য ভেদে অসংখ্য হইয়া থাকে। এইরূপে রসের সাতান্নটী সংযোগ ও তেষট্টিটী বিকল্প হয়। রস-দিগের এইরূপ যোগ্যত্ব বলিয়াই রস-চিন্তকেরা এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন।...দোষ ও ঔষধাদির বিষয় বিচার করিয়া, বুদ্ধিমান বৈদ্য, রোগের বলাবল বুঝিয়া, কোথাও দুই রস, কোথাও বহু রস, কোথাও এক রস, ইত্যাদি ক্রমে দ্রব্য প্রয়োগ করিবেন। যিনি রসের বিকল্প ও দোষের বিকল্প ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে রোগের কারণ, লক্ষণ ও শান্তির উপায় স্থির করিতে কষ্ট পাইতে হয় না।" এইরূপে রস-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দ্রব্যের বিষয় বিচার করা হইয়াছে। কোন্ দ্রব্যে কিরূপ রস আছে; আর সেই রসের অভাবাতিশয্যে দেহে কিরূপ সাম্য-বৈষম্য ঘটিতে পারে, সমবেত বৈজ্ঞানিকগণ সেই তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তবেই বুঝুন,—প্রাচীন-ভারতে বিজ্ঞানের কিরূপ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আলোচনা চলিয়াছিল, আর বৈজ্ঞানিক-গণ কতদূর অনুসন্ধিৎসু ছিলেন এবং কীদৃশ ভূয়োদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। আরও দেখুন, বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতি—সত্য তথ্য নির্ণয়ের প্রয়াস—আধুনিক সভ্যতা-সমুদ্ভূত নহে; অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-গবেষণার আদান-প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল। কেবল চিকিৎসা-বিজ্ঞান আলোচনার জন্যই যে অভিজ্ঞ-গণের সম্মিলন হইত, তাহা নহে। পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে নানা স্থানেই সময় সময় অভিজ্ঞগণের সম্মিলনের নিদর্শন রহিয়াছে। সেই সকল সম্মিলনে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কত জটিল তত্ত্বের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে! বৌদ্ধ-নৃপতিগণের প্রতিপত্তি সময়ে ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনার জন্য যে কতই মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজা হর্ষবর্দ্ধন বা দ্বিতীয় শিলাদিত্য প্রত্যেক পঞ্চম বৎসরে মহা-সম্মিলনের অধিবেশন করাইতেন। হুয়েন-সাং যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, রাজা হর্ষবর্দ্ধনের অনুষ্ঠিত মহা-সম্মিলনের অধিবেশন দর্শন করিয়াছিলেন। প্রতি উৎসব-ক্ষেত্রে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে, হিন্দুর গৃহে স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের সম্মিলন-প্রথা আজি পর্য্যন্ত অব্যাহত আছে। জ্ঞান-গবেষণা আদান-প্রদানের এরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ লক্ষ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

* বীজ-গণিতের অঙ্কপাত (Permutation ও Combination) সূত্রে এইরূপ গণনা হইয়া থাকে।

পশ্বাদির চিকিৎসা-বিষয়ে অধুনা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। অতি অল্প দিন মাত্র ভারতবর্ষে পশু-চিকিৎসা শিক্ষা-দানের চেষ্টা চলিয়াছে। পশু-চিকিৎসা বিষয়ক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের (Veterinary Science) আলোচনা এবং

পশু-চিকিৎসা। পশু-চিকিৎসা শিক্ষার বিদ্যালয়ের (Veterinary Schools) প্রতিষ্ঠা ইংরাজ-রাজত্বে সেদিনকার ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পশ্বাদির চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন-ভারত কতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়। পশ্বাদির প্রতি সদয়-ব্যবহারের বিষয়ে শাস্ত্র অনেক স্থলেই উপদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে গো-জাতি দেবতা বলিয়া সম্পূজিত হইয়া থাকেন। পশু-দিগের স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, শাস্ত্র তজ্জন্য উপযুক্তরূপ চারণ-ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তে 'গো-সঞ্চরণ ভূমির' উল্লেখ দেখিতে পাই। দেবগণের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'সেই ভূমি যেন আবশ্যকানুরূপ জলের দ্বারা সিক্ত অতএব তৃণাদি পূর্ণ থাকে।' গোচারণ ভূমি নির্দ্দিষ্ট রাখিবার জন্য মহর্ষি মনু রাজার প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—'গ্রামের চতুর্দ্দিকে চারি শত হস্ত পরিমাণ অথবা বৃহৎ যষ্টিত্রয়-পাতের পরিমিত স্থান গোচরণার্থ রাখিবে। নগরে ইহার তিন গুণ স্থান গোচারণার্থ রাখিবে। পরীহার-স্থানে বেড়া না দিয়া তৎসমীপে যদি কেহ শস্য বপন করে, আর গবাদি পশু ঐ শস্য ভক্ষণাদি দ্বারা নষ্ট করে, তজ্জন্য নৃপতি পশু-রক্ষকদিগকে দণ্ড করিবেন না।' * তার পর পশ্বাদির চিকিৎসা-বিধি। ধন্বন্তরি-প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রেই তাহা লিখিত ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে শাস্ত্র এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। তবে অগ্নি-পুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতে তাহার (পশ্বাদির চিকিৎসা-প্রণালীর) পরিচয় লিখিত আছে। ধন্বন্তরি ভিন্ন পশু-চিকিৎসাবিৎ অন্য কয়েকজন ঋষির বিষয়ও পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগ্নিপুরাণের সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে গজ-চিকিৎসার বিবরণে পালকাপ্য নামক গজায়ুর্ব্বেদ-বেত্তার পরিচয় পাই। তিনি লোমপাদ ঋষিকে যাহা বলিয়াছেন, ধন্বন্তরি তাহাই উল্লেখ করিতেছেন। এইরূপ, উক্ত পুরাণেরই একোননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় হইতে একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় পর্য্যন্ত অধ্যায়ত্রয়ে অশ্ব ও অশ্বিনীগণের এবং গজগণের রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা-প্রণালী যাহা বিবৃত আছে। তৎসমুদায় শালিহোত্র কর্ত্তৃক সুশ্রুতকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ধন্বন্তরিও এ সকলের চিকিৎসায় শালিহোত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুরাণের অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে এবং দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে অশ্ব-চিকিৎসার এবং গো-চিকিৎসার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ধন্বন্তরি স্বয়ং সেই দুই চিকিৎসা-প্রণালী বর্ণন করিতেছেন। অগ্নি বলিয়াছেন,—'শালিহোত্র সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করেন। পালকাপ্য অঙ্গরাজকে গজায়ুর্ব্বেদ প্রদান করিয়াছিলেন।' গরুড়পুরাণের পূর্ব্বখণ্ডে সপ্ত-নবত্যধিক শততম অধ্যায়ে পশ্বাদির চিকিৎসা-প্রণালী পরিবর্ণিত। কোন্ পশুর কি প্রকার পীড়ায় কিরূপ

* মনু-সংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ২৩৭ম ও ২৩৮ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে, এতৎপ্রসঙ্গে তাহার সবিশেষ পরিচয় প্রদান সম্ভবপর নহে। তবে স্থূলভাবে দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। 'যে সকল গো-মেষাদি পশুর দেহ পুষ্ট নহে এবং যাহাদের স্ত্রী-গণ অল্প দুগ্ধ প্রদান করে,' গরুড়পুরাণ বলিয়াছেন,—'তাদৃশ গোমহিষাদিকে শালিধান্য ও মসুর একত্র ঘোলের সহিত পোষণ করিয়া পান করাইবে। ঘৃত-কুমারীর পত্র লবণের সহিত খাওয়াইলে, তুরঙ্গগণের কেশরগত কণ্ডু বিনাশ পায়। গোমহিষগণের কণ্ঠে কুকুরের অস্থি বন্ধন করিয়া দিলে, তাহাদিগের দেহের সমস্ত কৃমি পতিত হয়।' ইত্যাদি। পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে পশু-চিকিৎসা প্রণালীর যে বিবরণ প্রাপ্ত হই, ইতিহাসে তদধিক বৃত্তান্তের অসদ্ভাব নাই। স্যর. এইচ এম ইলিয়ট এ সম্বন্ধে এক অভিনব তথ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। * তিনি বলেন,—ভারতে মুসলমানদিগের রাজত্বের প্রারম্ভ-সময়ে লক্ষ্ণৌ সহরের রাজকীয় পাঠাগারে পশ্বাদির চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল। গিয়াস উদ্দীন মহম্মদ সা খিলিজীর আদেশ অনুসারে সংস্কৃত ভাষা হইতে সেই গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হয়। পারস্য ভাষায় সেই পুস্তকের নাম—'কুর্‌রাৎ-উল্ মুল্‌ক।' হিজরী ৭৮৪ অব্দে (১৩৮১ খৃষ্টাব্দে) ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। মূল সংস্কৃত গ্রন্থের নাম—শালোটার। একজন ব্রাহ্মণের নামানুসারে ঐ গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছিল। তিনি সুশ্রুতের শিক্ষক ছিলেন। সেই পুস্তকের ভূমিকায় অনুবাদক লিখিয়া গিয়াছেন,—'অসভ্য হিন্দী ভাষা হইতে সুসভ্য পারসী ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদিত হইল। বিধর্ম্মীদিগের গ্রন্থ দেখিবার আর যাহাতে আবশ্যক না হয়, তজ্জন্যই উহার অনুবাদ করা গেল।' 'কর্‌রাৎ-উল্-মুলক, গ্রন্থ এগারটী অধ্যায়ে এবং ত্রিশটী বিভাগে বিভক্ত। সেই অধ্যায় ও বিভাগ-সমূহের পরিচয়,—

অধ্যায়।		বিষয়।		বিভাগ।
১ম	...	অশ্বের নাম ও জাতি-বিভাগ	...	৪
২য়	...	তাহাদের ত্রাণ, প্রতিপালন ও চড়িবার বিষয়		৪
৩য়	...	অশ্বশাবক তত্ত্বাবধান এবং অশ্বশালায় বোল্‌তার চাক সম্বন্ধে	...	২
৪র্থ	...	অশ্বের বর্ণ ও প্রকার-ভেদ	...	২
৫ম	...	অশ্ব-গণের দোষ বিষয়ক	...	৩
৬ষ্ঠ	...	তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ে	...	২
৭ম	...	তাহাদের পীড়া ও প্রতিকার	...	৪
৮ম	...	রক্তপাত সম্বন্ধে	...	৪
৯ম	...	তাহাদের খাদ্য-সম্বন্ধে	...	২
১০ম	...	মেদ-বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা	...	২
১১শ	...	দাঁত দেখিয়া বয়স-নির্দ্ধারণ	...	১

* Sir H. M. Elliot, *Historians of India*, Part I.

এই গ্রন্থের অনুবাদের প্রকৃত সময়-নির্দ্ধারণে নানারূপ সংশয়-সন্দেহ উপস্থিত হয়। কারণ, যদিও গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়াই লিখিত আছে,—'হিজরী ৭৮৩ অব্দে ঐ গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল এবং তৎকালে মহম্মদ সার পুত্র গিয়াস উদ্দীন মহম্মদ সা রাজত্ব করিতেছিলেন; কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ঐ সময়ে ঐ নামের কোনও নৃপতির বিদ্যমানতার বিষয় জানিতে পারা যায় না। যদি সুলতান গিয়াসউদ্দীন তোগলকের বিষয় উহাতে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ঘটনা আরও ষাট বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আর যদি উহাতে মালব-দেশাধিপতি গিয়াস উদ্দীনকে বুঝায়, তাহা হইলে উহাকে আরও এক শত বৎসর পরবর্ত্তি-কালের ঘটনা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যাহাই হউক, যে গিয়াস-উদ্দীনের আদেশেই ঐ গ্রন্থ অনুবাদিত হউক, তিনি যে আকবরের রাজত্বের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। পশ্বাদির চিকিৎসা-বিষয়ক আর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পূর্ব্বে বাগদাদে আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। সেই পুস্তকের নাম আরবী ভাষায়—'কিতাব-উল্‌-বৈতারাৎ।' প্রথমোক্ত গ্রন্থের অনুবাদক বাগদাদে অনুবাদিত গ্রন্থের কোনই উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি তদ্বিষয় অবগত ছিলেন না। মোগল-সম্রাট সাজাহানের শাসন-সময়ে পশ্বাদির চিকিৎসা-বিষয়ক ষোড়শ সহস্র শ্লোকযুক্ত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পারসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। সে গ্রন্থেরও নাম—সালোতারি। * সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ ঐ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। গ্রন্থখানি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কালে চিতোর হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। অমরসিংহ তখন চিতোরের রাণা ছিলেন। মিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া অন্যান্য লুণ্ঠিত সামগ্রীর সহিত সৈন্যগণ কতকগুলি সংস্কৃত-গ্রন্থ লুণ্ঠন করিয়া আনে। ঐ পুস্তকখানি সেই গ্রন্থ-সম্পদের অন্তর্ভুক্ত; পুস্তকখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। পূর্ব্বোক্ত কুররাৎ-উল্‌-মুল্‌ক গ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থ আকারে দ্বিগুণ বৃহৎ। এতৎপ্রসঙ্গে বোধ হয় আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর রাষ্ট্র-বিপ্লব আসিয়া কত রত্ন কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, কে নির্ণয় করিবে। নচেৎ, এখনও পর্য্যন্ত অন্যের যাহার কল্পনায়ও আসে না, ভারতে তাহার সকলই বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বা আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের কথা বলিতে হইলে, আরও অনেক কথাই বলিতে হয়। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যথেচ্ছ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিত। আজি পর্য্যন্ত সংসারে যত প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে, প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা-প্রণালীর মধ্যে তাহার সকল পদ্ধতিই বিদ্যমান ছিল; আর এখনও অনুসন্ধিৎসু হইলে সকল সন্ধানই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিক বলিব কি, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং বিদ্যামন্দির প্রভৃতিরও প্রাচীন ভারতে অভাব ছিল না। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা

বিবিধ বক্তব্য।

* ইংরাজী অনুবাদে প্রথমোক্ত সংস্কৃত গ্রন্থের নাম সালোটার (Salotar) এবং শেষোক্ত সংস্কৃত গ্রন্থের নাম সালোটারি (Salotari) রূপে লিখিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত স্থানে সালোটার ব্রাহ্মণ এবং সুশ্রুতের শিক্ষক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ঐ নামে সুশ্রুতের কোনও শিক্ষকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়

লাভ করিয়া তদনুসারে জীবন-গতি নির্দ্ধারিত করিলে মানুষ যথা ইচ্ছা দীর্ঘজীবন-লাভে সমর্থ হইত। এ কথা শুনিয়া অনেকে এখন শিহরিয়া উঠিবেন, সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুসরণে ঋগ্বেদাদির আলোচনা করিয়া যাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন,—প্রাচীন-কালের ঋষিগণ শতবর্ষ মাত্র পরমায়ু লাভের জন্য দেবতাদিগের আরাধনা করিতেছেন; কেহ কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে শত বর্ষ পরমায়ু হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন; তাঁহারা বা তাঁহাদের অনুসরণকারী নব্য-সমাজ এতদুক্তিকে প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতে পারেন। কিন্তু আমরা শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিয়া আজিও স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিতে পারি,—আমাদের বর্ষের শত বর্ষ, সে তো তুচ্ছ কথা; শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিয়া আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের অনুসরণে জীবন যাপন করিতে পারিলে, মনুষ্যের পক্ষে এখনও বহু শত দীর্ঘজীবন-লাভ অসম্ভব নহে। ঋগ্বেদাদিতে শত বর্ষ আয়ুলাভের বিষয়ে যে প্রার্থনা আছে, বলা বাহুল্য, সে বর্ষ মনুষ্যের বর্ষ নহে; তাহা দিব্যমানের বর্ষ। দৈবকর্ম্মে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে (চতুশ্চত্বারিংশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে) তাহার আভাস পাই। অগ্নিদেবের উপাসনায় প্রস্কন্ন ঋষির আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। চ্যবন ঋষি প্রভৃতির পুনর্যৌবন প্রাপ্তির ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধির বিষয় সকল শাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে। শাস্ত্র মানিতে হইলে, মানিতে হয়, কৃতযুগে (সত্যযুগে) মনুষ্যের আয়ু চারি শত বৎসর, ত্রেতা যুগে তিন শত বৎসর, দ্বাপর যুগে দুই শত বৎসর এবং কলিযুগে এক শত বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে এখনও পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্যের পরমায়ু বৃদ্ধি পাইতে পারে। আজিও ভারতবর্ষে এক শত পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত মানুষকে বাঁচিতে দেখা যায়। 'ইউরোপে ১৫০, ১৭৫, ১৮০ প্রভৃতি বৎসর পর্য্যন্ত মানুষ বাঁচিতে দেখা গিয়াছে।' যোগী ঋষিরা কত কাল বাঁচিয়া থাকেন, যিনি পরিচয় পাইয়াছেন, তিনিই তাহা জানিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা জীবন বৃদ্ধি হয়, শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সে যোগ কয়জনই বা শিখিতে ইচ্ছা করেন; আর তাহার শিক্ষকই বা কোথায় আছেন? চরক বলিয়াছেন,—ভল্লাতক্ষীর রসায়ন সেবন করিলে শত বর্ষ বয়সেও জরা উপস্থিত হয় না! চরক-সংহিতায় চিকিৎসিত স্থান অংশের প্রথম অধ্যায়ে এই রসায়নের অনুপান ও ব্যবহার প্রণালী লিখিত আছে। যোগাঙ্গ প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা প্রশ্বাস-বায়ু রোধ করিয়া আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। দিবসে কত বার নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মনুষ্য অনূ্যন ২১, ৬০০ শ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে। অতিরিক্ত অঙ্গ-সঞ্চালনে বা পীড়া উপস্থিত হইলে, এই শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া হইলে, পরমায়ু হ্রাস হয়। মনুষ্যের যদি এক শত বৎসর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে, অতিরিক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হওয়ায় সে পরমায়ু কমিয়া যায়। প্রাণায়ামাদি দ্বারা মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিতে সমর্থ হন। তদ্দ্বারা

না। পরন্তু অগ্নিপুরাণাদিতে শালিহোত্র নামক জনৈক অশ্বায়ুর্ব্বেদ-বেত্তার পরিচয় পাইয়াছি। সুশ্রুতের উপদেষ্টা বলিয়াও তিনি সেখানে অভিহিত। সেই শালিহোত্র নামই বৈদেশিক ভাষায়, উচ্চারণের তারতম্যে, রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। সেই রূপান্তরের রূপান্তরে ইংরাজী ভাষায় উহা সালোটার ও সালোটারি হইয়াছে।

পরমায়ু বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, শত বৎসর পরমায়ু হইলে স্বভাবতঃই ৭৭ কোটী ৭৬ লক্ষ বার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া হইবে। সেই শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া রোধ করিয়া অধিক অপচয় নিবারণ করিতে পারিলে যে পরিমাণ অপচয় নিবারিত হইবে, জীবন সেই পরিমাণ দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইবে। দিন দিন মানুষের আয়ুঃ-পরিমাণ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে; সেই হ্রাস-প্রাপ্তি যাহাতে না ঘটে মানুষ যাহাতে দীর্ঘায়ু হয়, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র তদুদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইয়াছিল। মানুষ যে পূর্ব্বে দীর্ঘায়ু ছিল, মানুষ যে পূর্ব্বে দৃঢ়বল-সম্পন্ন ছিল, আয়ুর্ব্বেদ আলোচনা করিলে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। চরক বলিয়া গিয়াছেন,—'যতই দিন যাইতেছে, মানুষ ততই অল্পায়ু হইতেছে।' তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন,—প্রতি এক শত বৎসর অন্তর মানুষের আয়ু-পরিমাণ এক বৎসর করিয়া কমিয়া থাকে। অধুনা যে ঔষধ যেরূপ মাত্রায় প্রযুক্ত হয়, চরকাদিতে তাহার মাত্রাধিক্য দেখিতে পাই। বিরেচনে এরণ্ড তৈল ব্যবহার পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু চরকে বিরেচনার্থ এরণ্ড তৈল সেবনের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে—অর্দ্ধ সের। এখন সে মাত্রা—অর্দ্ধ ছটাকে দাঁড়াইয়াছে। এই একটী সামান্য দৃষ্টান্তেই পূর্ব্বেকার লোকের শারীরিক সামর্থ্যের এবং দীর্ঘায়ুর পরিচয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। স্বাস্থ্য-বিধি অনুসারে জীবন-গতি নিয়মিত করিলে এখনও সে দীর্ঘজীবন-লাভ অসম্ভব নহে। প্রকৃত রোগ-নির্ণয়ের অভাবে এবং ঔষধের অপপ্রয়োগে অনেক সময় চিকিৎসকগণই মনুষ্যের আয়ুঃ-পরিমাণ খর্ব্ব করিয়া থাকেন। প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া প্রকৃত ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র তাই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,—"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে। স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ॥" অর্থাৎ,—'তাহাই উপযুক্ত ঔষধ, যাহাতে আরোগ্য লাভ হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট চিকিৎসক, যিনি রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারেন।'

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধুনা পৃথিবীতে যত প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সকল প্রকার চিকিৎসা-প্রণালীর মূল তথ্যই অবগত ছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপ্যাথি।

দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। অধুনা পাশ্চাত্য-দেশে দুই প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে;—(১) য়্যালোপ্যাথি, (২) হোমিওপ্যাথি। এই দ্বিবিধ চিকিৎসায় ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাত্মক। বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে। শরীরে সেই সকল দ্রব্য তদনুসারে ঔষধরূপে প্রয়োগ করা হয়। সেই প্রয়োগের বিভিন্নতা লইয়াই য়্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি মত প্রচলিত। মোটামুটি বলিতে পারি, য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যে অবস্থায় যে দ্রব্য যে ভাবে ঔষধরূপে ব্যবহার করেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ সে অবস্থায় তাহার বিপরীত ঔষধ বিপরীত ভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সহজ অবস্থায় যে দ্রব্য সেবন করিলে ভেদ-বমন উপস্থিত হয়, ভেদ-বমন করাইবার আবশ্যক হইলে য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রোগীকে সেই দ্রব্য সেবন করান। সুস্থ শরীরে অধিক মাত্রায় কর্পূর সেবন করিলে কম্পন, ভেদ-বমন, মূর্চ্ছা প্রভৃতির লক্ষণ

প্রকাশ পায়; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কম্পন, ভেদবমন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্টে ঐ কর্পূরই অতি অল্পমাত্রায় ঔষধরূপে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সুস্থ অবস্থায় ঔষধ পরীক্ষা আর রোগ-প্রতীকারার্থে রুগ্ন শরীরের অল্পমাত্রায় তাহার ব্যবহার,—ইহাই হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীর মূল ভিত্তি। অ্যালোপ্যাথির ও হোমিওপ্যাথির পার্থক্য সম্বন্ধে জনৈক প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক লিখিয়া গিয়াছেন,—"প্রত্যেক ঔষধ সুস্থ দেহে কোনও ব্যক্তি সেবন করিলে, তাহার শরীরে কতকগুলি করিয়া লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সেই লক্ষণগুলি সেই ঔষধের বিশিষ্ট লক্ষণ; এইরূপে পরীক্ষা না করিলে কোন্ ঔষধের কি গুণ বা কি লক্ষণ, তাহা কখনই অবগত হইতে পারা যায় না। অ্যালোপ্যাথি-মতে কোনও ঔষধ ধারক, কোনও ঔষধ রেচক, কোনও ঔষধ উত্তেজক, কোনও ঔষধ বমনকারক—এইরূপ মোটামুটি লক্ষণ অবগত হইতে পারা যায়। কবিরাজী মতেও ঐরূপ কোনও ঔষধ সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট, কোনও ঔষধ উষ্ণতা-গুণযুক্ত, কোনও ঔষধ কফ-নাশক, কোনও ঔষধ পিত্তনাশক—এইরূপ মোটামুটি লক্ষণ জানা যায়। হোমিপ্যাথিক 'মেটিরিয়া মেডিকা' বা ভৈষজ্য-তত্ত্ব ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীতে সংগঠিত; প্রত্যেক ঔষধ সুস্থ মানব-দেহে পরীক্ষিত। এইরূপে পরীক্ষিত হইয়া প্রত্যেক ঔষধের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লক্ষণগুলি তালিকাকারে লিখিত হইয়াছে। ঐ লক্ষণগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ। অন্য কোনও ঔষধে ঐরূপ লক্ষণ-সমষ্টি নাই।...পলিফার্ম্মেসি (Polypharmacy) বা বহু ঔষধ একত্রে সংমিশ্রণ হোমিওপ্যাথিতে নাই। পরীক্ষার সময়ও নাই, চিকিৎসা-কার্য্যের সময়ও নাই। পরীক্ষার সময় এক একটী ঔষধ পৃথক পৃথক পরীক্ষিত হয়; চিকিৎসার সময়ও এক একটী ঔষধ এক এক বারে প্রযুক্ত হয়। অ্যালোপ্যাথি-মতে একটী ঘর্ম্মের জন্য, একটী মস্তিষ্ক উত্তেজনার জন্য, একটী বলপ্রদানের জন্য, একটী রেচনের জন্য, এইরূপ নানা কার্য্যের জন্য নানা ঔষধ একত্র মিশ্রিত হইয়া প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এই ঘর্ম্মোৎপাদক, উত্তেজক, বলকারক ও চেরক ঔষধ একত্র মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক সংমিশ্রণে কি নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিল এবং সেই নূতন পদার্থের গুণই বা কি দাঁড়াইল, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট ঔষধ একত্র হইলে যে, সেই ভিন্ন ভিন্ন গুণই বর্ত্তমান থাকিবে, এমন নহে। জল ও আগুন একত্র মিশ্রিত হইলে যে, উভয়েরই গুণ অর্থাৎ শৈত্য ও উষ্ণতা বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা অসম্ভব। কবিরাজী মতেও বহুসংখ্যক ঔষধ একত্র মিশ্রিত হইয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জগতের মধ্যে কেবল একমাত্র হোমিওপ্যাথি সুস্থ মানব দেহে ঔষধ পরীক্ষা করে। এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ পরীক্ষা করে এবং এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ প্রয়োগ করে। ঔষধের গুণ-নির্ণয়ের জন্য এরূপ এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ পরীক্ষা এবং রোগে এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ প্রয়োগ হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য কোনও চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাই।" * প্রোক্ত অংশের সকল মতের সহিত আমরা একমত নহি। তবে উহাতে হোমিওপ্যাথির সহিত অ্যালোপ্যাথি প্রভৃতির পার্থক্যের একটু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র—'সিমিলিয়া

* ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত 'হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্বের' উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

সিমিলিবাস কিউরেণ্টার' (Similia Similibus Curantur *)। এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই হানিমান † হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন। হানিমানের এই মূল-সূত্রের আদি কোথায়?—এতদ্বিষয় অনুসন্ধান করিতে গেলে, এ সূত্রেরও আদি ভারতবর্ষ বলিয়া প্রতীত হয়। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন-কাল হইতে 'সমঃ সমং সময়তি' সূত্র প্রচলিত আছে। চরক বলিয়াছেন (সূত্রস্থান, ষোড়শ অধ্যায়),—'যে সকল ক্রিয়া দ্বারা বৈষম্য ধাতু সকল সমতা-প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে রোগ-সমূহের চিকিৎসা বলে। সেই চিকিৎসাই বৈদ্যের আচরণীয়। শরীরস্থ ধাতুদিগের কোনরূপ বৈষম্য না হয়, এবং সমধাতুদিগের স্থিরতা হয়, এই জন্যই চিকিৎসার প্রয়োজন। বিষম হেতু-সমূহের পরিহার এবং সমহেতুদিগের রক্ষা হইলে ধাতু-সকল বিষম হইতে পারে না; পরন্তু সমভাবেই অবস্থান করে। যেহেতু, সমান কারণ দ্বারাই ধাতু-সমূহের সমতা হয়।' আবার 'বিষস্য বিষমৌষধম্' ‡ সূত্রেও হানিমানের ভাব বা হোমিওপ্যাথির মূল তত্ত্ব ব্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু প্রোক্ত দুইটি সূত্রই আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্নিবিষ্ট। চরক স্পষ্টতঃ লিখিয়া গিয়াছেন,—"বিষং বিষঘ্নমুক্তম্ যৎ প্রভাবস্তত্র কারণম্।" § অর্থাৎ—'বিষে বিষক্ষয় হয়, এইরূপ কথা আছে। এস্থলে প্রভাবই কারণ জানিবে।' বিষস্য বিষমৌষধম্—এ প্রবাদ-বাক্য এ দেশে আবহমান-কাল প্রচলিত। মহাকবি কালিদাসের 'শৃঙ্গারতিলক' কাব্যে—'শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম'; অর্থাৎ—পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে বিষের ঔষধ-রূপে বিষ ব্যবহৃত হইত,

---

* এই লাটিন বাক্যের ইংরাজী অর্থ—"Like things are cured by the like." সংস্কৃত—'সমঃ সমং সময়তি।' অর্থাৎ, 'সমে সম' এই ভাবজ্ঞাপক।

† ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীর অন্তর্গত 'মিসেন' পল্লীতে হানিমান জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৮৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার দুই বৎসর পরে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের লিপজিগ সহরে অবস্থান কালে, হানিমান হোমিওপ্যাথির মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ঐ বৎসর তিনি কলেন-প্রণীত একখানি গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। সেই পুস্তকের অনুবাদের সময় সিঙ্কোনার জ্বর-উৎপাদিকা শক্তির বিষয় জানিতে পারেন। 'সিঙ্কোনা' বা কুইনাইন জ্বরঘ্ন বলিয়া পরিচিত; অথচ, সহজ শরীরে ব্যবহারে তাহাতে জ্বরোৎপত্তি ঘটে,—এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই হানিমানের মনে হোমিওপ্যাথিক মতের উদয় হয়। তখন দুই একটী ঔষধ দুই চারি জনের শরীরে প্রবেশ করাইয়া হানিমান তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

‡ অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক 'বিষস্য বিষমৌষধম্' বাক্যকে হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র বলিয়া মনে করেন। (ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রকরণ' নামক গ্রন্থের ভূমিকার ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) কিন্তু কেহ কেহ আবার এ মতের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—'বিষস্য বিষমৌষধি বলিলে সাধারণতঃ লোকে যেরূপে বুঝিয়া থাকে, ইহা (হোমিওপ্যাথি) তদ্রূপ নহে। কারণ, কুইনাইন সেবন-জনিত জ্বর কখনও কুইনাইনে নিরাময় করা যায় না। হস্তপদাদি অগ্নিতে দগ্ধ হইলে পুনরায় অগ্নিতে সন্তাপ প্রয়োগ দ্বারা উহার চিকিৎসা করার নাম—'আইসোপ্যাথি' (Isopathy)।—(হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্ব নামক গ্রন্থে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ীর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।)

§ চরক-সংহিতা. সূত্রস্থান, ২৬শ অধ্যায়, ৭৮ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শুনা যায়। মহাকবি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থেও—"শুনিয়াছি ধনি, পুরাতন লোকে কয় লো। বিষের ঔষধ বিষ, বিষে বিষ ক্ষয় লো॥"—উক্তি আছে। ইহাতে আমরা অবশ্য বলিতেছি না যে, ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' বা কালিদাসের 'শৃঙ্গারতিলক' হইতেই হানিমান এই সূত্র লাভ করিয়াছিলেন। তবে এ কথা উত্থাপন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, 'বিষস্য বিষমৌষধম্'—এ সূত্র ভারতবর্ষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই পরিজ্ঞাত ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের সহিত যাঁহাদের কথনও সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাঁহারাই ইহা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। 'বিষস্য বিষমৌষধম্' বাক্যের অর্থ—'সমঃ সমং সময়তি' বাক্যের অর্থের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন। 'বিষের ঔষধ বিষ' বলিলে যাহা বুঝায়, উহার অর্থ তাহা নহে; উহার অর্থ,—সুস্থ শরীরে যাহা বিষের ক্রিয়া করে, রুগ্ন শরীরে তাহারই প্রয়োগ। কেহ বিষ ভক্ষণ করিয়াছেন; তাঁহাকে যে পুনরায় সেই বিষই পান করান হয়, তাহা নহে। তবে কি হয়? যে দ্রব্য সেবন করাইলে বমন হইতে পারে, সেই দ্রব্য সেবন করাইয়া বমনের চেষ্টা পাওয়া হয়। বলা বাহুল্য, যে দ্রব্যে বমন করান হয়, সহজ শরীরে তাহাও বিষের কার্য্য করে। সুতরাং সে হিসাবে, বিষ দিয়াই বিষের চিকিৎসা হয়। এই অর্থেই 'বিষস্য বিষমৌষধম্' বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিষ-নাশের জন্য যে স্বতন্ত্র ঔষধের তালিকা চরম-সুশ্রুত-চক্রদত্ত প্রভৃতিতে প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা করিলেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। চক্রদত্তে বিষ প্রতিষেধক সাতাইটী ঔষধের নাম আছে। সেই সাতাইটি ঔষধের মধ্যে কনক-ধুস্তুর, গোপিত্ত, তাম্রচূর্ণ, হরিতাল, হিঙ্গু, আকন্দ প্রভৃতি বিষ-পদার্থের নাম আছে। কিন্তু সেই সকল ঔষধের উল্লেখের সময় আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণ কথনই বলেন নাই যে, হরিতাল বিষ গলাধঃকরণ করিলে, হরিতাল বিষ খাইতে হইবে, ইত্যাদি। মাধবনিদানে সুশ্রুতের একটি বচন উদ্ধৃত আছে। তাহাতে 'সমে সম' চিকিৎসার বা 'সদৃশ-চিকিৎসার আভাব পাওয়া যায়। মাধবকরোদ্ধৃত সুশ্রুতের সেই বচনটি,—"হেতুব্যাধি বিপর্য্যস্ত বিপর্যস্তার্থকারিণাম্। ঔষধান্ন বিহারাণামুপযোগং সুখাবহম্। বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ স হি সাত্ম্যমিতি স্মৃতঃ॥" যাহাতে যেরূপ রোগোৎপত্তি হয়, সেইরূপ রোগের উপশমনার্থ সেই দ্রব্য ব্যবহার করা বিধেয়। এতদ্দ্বারা 'হোমিওপ্যাথিরই' মূল তথ্য পাওয়া যায়। 'চরক-সংহিতার' চিকিৎসিত স্থানে, ত্রিংশ অধ্যায়ে, ষোড়শাধিক দ্বিশততম প্রকরণ আলোচনা করিলেও তন্মধ্যে হোমিওপ্যাথির মূল-তত্ত্ব স্পষ্টতঃ বিবৃত রহিয়াছে বুঝিতে পারা যায়। যথা,—'পিত্তে উষ্ণ ক্রিয়া অবৈধ; অথচ, দাহাদি পিত্তলক্ষণযুক্ত স্ফোটকাদিতে স্বেদ, উষ্ণ সেক ও উষ্ণ উপনাহ প্রয়োগ করিলে অন্তর্গত গূঢ় পিত্ত বহির্দ্দেশে আনীত হইয়া দাহাদির শান্তি হয়। এস্থলে উষ্ণ দ্বারাই উষ্ণার শান্তি হইতেছে। যদি এস্থলে বহির্দ্দেশে শীতল সেকাদি প্রয়োগ করা যায়, তবে উষ্ণা শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পীড়া বৃদ্ধি করে। আবার দেখ, যথন ব্রণে পূযাদি লক্ষণযুক্ত কফ অন্তর্গূঢ় থাকে, তথন ঘৃতাদি শীতল প্রলেপ দ্বারা উষ্ণা অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে শুষ্ক করিয়া থাকে। এস্থলে শীত দ্বারা শীতের শান্তি হইতেছে। দেখ, রক্তচন্দন শীতল; অথচ যদি তাহা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঘনপ্রলেপ দেওয়া যায়, তবে দাহ হইতে থাকে। কারণ, ত্বকগত

উদ্গার রোধ হয়! আবার দেখ, অগুরু উষ্ণ হইলেও যদি উহা উত্তম রূপে পেষণ করিয়া পাতলা প্রলেপ দেওয়া যায়, তবে দাহ শান্তি হয়। দেখ, মক্ষিকার বিষ্ঠা বমিনাশক; কিন্তু মক্ষিকা বমিকারক।' চরকের এই সকল উক্তির মধ্যে হোমিওপ্যাথির মূল তত্ত্ব নিহিত নহে কি? তার পর লক্ষণ দেখিয়া ঔষধ-নির্ব্বাচন—হোমিওপ্যাথির একটী বিশেষ অঙ্গ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ তদ্বিষয়ে বিশেষ স্পর্দ্ধাই করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—"লক্ষণ-সমষ্টিতে রোগের বিকাশ। রোগের আর কোনও অস্তিত্ব নাই। যদি রোগ জানিতে চাও, তবে লক্ষণ-সমষ্টি একত্র কর। দেখিবে, রোগের প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হইয়াছে। রোগীর লক্ষণ-সমূহ বাদ দিলে, রোগের আর অস্তিত্ব থাকে না। রোগীর লক্ষণ-সমূহ দূর করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য করা হয়। লক্ষণ-সমষ্টিই রোগ, ইহা হোমিওপ্যাথির কথা। জগতে যত প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী আছে, তন্মধ্যে হোমিওপ্যাথিরই প্রধানতঃ এই সত্যের উপর নির্ভর। হোমিওপ্যাথিই এই সত্য অনুসারে রোগ-চিকিৎসা করিয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে তজ্জন্যই লাক্ষণিক চিকিৎসা (Symptomatic Treatment) কহে। য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকে—রোগজ-স্থানীয় পরিবর্ত্তন-ঘটিত চিকিৎসা (Pathological Treatment) বলে।" হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এ কথা বলিয়া থাকেন বটে; লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা তাঁহাদেরই নিজস্ব বলিয়া প্রচার করেন বটে; কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। চরক-সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে রোগের লক্ষণানুসারে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এক এক প্রকার ব্যাধিকে তাঁহারা কত ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয় আলোচনা করিলেই তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। বাতব্যাধি কত প্রকার, কুষ্ঠব্যাধি কত প্রকার ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করিলে এবং সেই বিভিন্ন প্রকার পীড়ার বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ ও বিভিন্ন প্রকার ঔষধের ব্যবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, লক্ষণ দেখিয়াও চিকিৎসার প্রণালী হিন্দু-ভিষক্‌গণ জানিতেন, প্রতিপন্ন হইতে পারে। এইরূপ দেখিতে গেলে, অল্প ঔষধ প্রয়োগ এবং ঔষধ বন্ধ রাখা প্রভৃতিও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর অঙ্গীভূত হইয়া আছে। দৃষ্টান্ত আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের নানা স্থানেই দেখিতে পাইবেন। চিকিৎসিত স্থানের (ত্রিংশ অধ্যায়ে) চরক এ কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"উপক্রমাণাং করণম্ প্রতিষেধে চ কারণম্।"

য়্যালোপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালী যে আয়ুর্ব্বেদেরই অনুসারী, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। অথচ, ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ভারতবর্ষের নামোল্লেখ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন,—'মিশরেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভ্যুদয়; মিশর হইতেই ইউরোপে উহা প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে—'মিশরের ধর্ম্মযাজকগণই চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন। মনোব্যাধি ও শারীর-ব্যাধি উভয় প্রকার ব্যাধি দূর করিবার ভার ধর্ম্মযাজক-দিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল।' তাঁহারা আরও বলেন,—'ইহুদীরা রোগ-প্রতিষেধক ঔষধের বিষয় অবগত ছিলেন'—মোজেসের প্রণীত গ্রন্থ-পত্রে সপ্রমাণ হয়। বিশেষতঃ, কুষ্ঠ-রোগের চিকিৎসায় তাঁহাদের পারদর্শিতার কথা সেই গ্রন্থে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। ধর্ম্মযাজক-গণই

আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য-চিকিৎসা।

সে সময়ে রোগের চিকিৎসা করিতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আর রোগ সংক্রমণ নিবারণ করা—তাঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল।' চিরণ কর্তৃক গ্রীসে চিকিৎসা-তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল,—এইরূপ কিংবদন্তী আছে। চিরণ—গ্রীসের একজন দেবতার নাম। এই দেবতার আকৃতি—অর্দ্ধেক মানুষ, অর্দ্ধেক ঘোটকের ন্যায়। চিরণ—দক্ষিণ-গোলার্দ্ধের নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্নিবিষ্ট। গ্রীসে চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রচারের ইতিহাস এইরূপ আরও নানা উপকথায় পরিপূর্ণ। কেহ কেহ এস্কিউলাপিয়সকেও গ্রীসের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করেন। এস্কিউলাপিয়স—হোমারের গ্রন্থের একজন নায়ক। তিনি চিকিৎসক। প্রথমে তিনি মনুষ্য ছিলেন; শেষে দেবতা-মধ্যে পরিগণিত হন। চিরণের নিকট তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াও কিংবদন্তী আছে। দার্শনিক-গণের মধ্যে পীথাগোরাস, ডেমক্রিটস, হিরাক্লিটাস প্রভৃতির গবেষণায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কোনও কোনও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল বটে; কিন্তু হিপক্রেটস সাধারণতঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক বলিয়া অভিহিত হন। হিপক্রেটসের পুত্র (থেসেলাস ও ড্রাকো) এবং জামাতা (পলিবিয়স) তাঁহারই পদাঙ্ক-অনুসরণে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রচার করেন। ইহার পর আলেকজেন্দ্রিয়া সহরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। টলেমি-রাজবংশের বদান্যতার প্রভাবে, ৩০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, আলেকজেন্দ্রিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানালোচনার কেন্দ্রস্থান মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তত্রত্য দুই জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নাম—এরাসিষ্ট্রেটাস এবং হেরোফিলাস। এরাসিষ্ট্রেটাসের অধ্যাপকের নাম—ক্রাইসিপ্পস। কোনও তেজস্কর ঔষধের ব্যবহারের অথবা শরীর হইতে রক্তপাত করার তিনি বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে ছাত্র—অধ্যাপকের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কেবল পথ্যের সুব্যবস্থায় রোগমুক্ত হইতে পারে,—এরাসিষ্ট্রেটাস প্রধানতঃ এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে দুইটি দলের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এক দল শারীর-তত্ত্ব অবগত হইয়া ঔষধ-প্রয়োগের উপযোগিতা স্বীকার করিতেন। অন্য দল শারীর-তত্ত্ব অবগত হওয়াকে অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। খৃষ্ট-জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রোম-সাম্রাজ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রচার আরম্ভ হয়। পিলোপোনিসাস-বাসী আর্কাগাসাস প্রথমে রোমে চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালী এতই কঠোর ও নিস্ফল হইয়াছিল যে, তাঁহাকে তজ্জন্য রাজাদেশে নির্ব্বাসিত হইতে হয়। তাঁহার পর, বিথিনিয়ার অধিবাসী আসক্লেপিয়াডেস চিকিৎসক বলিয়া রোমে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। ইহার পর, সম্রাট অগাষ্টাসের শাসন-সময়ে, রোম-সাম্রাজ্যে সেলসাস চিকিৎসা-বিজ্ঞানালোচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "ডি'মেডিসিনা' গ্রন্থে তিনি তৎকাল-প্রচলিত চিকিৎসার ইতিহাস প্রকাশ করিয়া যান। অতঃপর, খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ডায়স্কোরাইড্স্, গ্যালেন, হিপক্রেটস্ প্রভৃতির গবেষণা প্রকাশ পায়। ইহার পর, পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণের মতে নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে আরবে এবং আরব হইতে ক্রমশঃ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণের এবম্বিধ ইতিহাস যে ভ্রমসঙ্কুল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। সুতরাং

এতদ্বিষয়ে আর অধিক আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। ইউরোপে প্রথমে কি ভাবে চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্তিত হয়, একজন বহুদর্শী চিকিৎসক সংক্ষেপে তাহার বিবরণ এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন,—"চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রথমে যুক্তি-মূলক ছিল না, ফলোপাধায়ক ছিল। ইউরোপে চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস এইরূপ,—পীড়িত ব্যক্তিকে কোনও প্রকাশ্য পথপ্রান্তে রাখা হইত; কেন-না, পান্থগণ যদি কেহ তদ্রূপ পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকেন, তবে তিনি যে ঔষধে আরোগ্য হইয়াছেন, তাহাকেও সেই ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারেন। তৎপরে পীড়ামুক্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মাধিকরণে যাইয়া স্বীয় রোগ-লক্ষণ এবং তৎপ্রশমনকারী ঔষধ লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে হইত; কালক্রমে ঐ সকল বিবরণ পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয়। যাজকগণ তাহা আত্মসাৎ করতঃ চিকিৎসা-বিধান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। চিকিৎসা-বিধানের কোনও ব্যবস্থা কাহারও উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা ছিল না; তদনুসারে চিকিৎসিত হইয়া যদি কোনও রোগীর মৃত্যু ঘটিত, তজ্জন্য কেহই অপরাধী হইতেন না। বরং উল্লঙ্ঘনে যে রোগীর অনিষ্ট হইত, তজ্জন্য চিকিৎসকের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। আদিম কালে চিকিৎসা-শাস্ত্র ধর্ম্মযাজক-গণের হস্তে পতিত হইয়া এইরূপে অপরিবর্ত্তনীয় পদ্ধতিতে পতিত হইয়াছিল এবং ভাবী উন্নতির পন্থা অবরুদ্ধ ছিল। কালক্রমে হিপক্রেটস প্রভৃতি মহাত্মার উদ্যোগে যাজক-গণের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন অবস্থা ধারণ করিল এবং ফলোপাধায়ক হইতে যুক্তি-মূলকে অগ্রসর হইতে লাগিল।" প্রথম অবস্থার ইতিহাস নানা জনে এই প্রকার নানারূপ বিবৃত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা যদি ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকল সংশয়ই দূরীভূত হইত। ধর্ম্মযাজক-গণের হস্তে চিকিৎসার ভার—উহাও ভারতবর্ষেরই অনুসরণ। গ্রহাদির প্রকোপ-নিবারণে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের দ্বারা রোগমুক্তির প্রথা ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে প্রচলিত। অন্য দেশের ধর্ম্মযাজকগণ তদনুসরণেই রোগীর রোগ-শান্তির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতে পারে। যাহা হউক, ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল যে এই ভারতবর্ষ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। য়্যালোপ্যাথি চিকিৎসা—আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসার সম্পূর্ণ অনুসারী। এইরূপ একটু অনুসন্ধান করিলে আপনিই প্রতিপন্ন হয়,—হাকিমী-চিকিৎসাও আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী। হাকিমী মতে বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া রোগের উৎপত্তি হয়। সুশ্রুতের এক স্থানেও এই চারি ধাতুর উল্লেখ দেখিয়াছি। বাগ্‌ভট স্পষ্টাক্ষরেই ঐ চারি ধাতু (বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত) দূষিত হইলে রোগোৎপত্তি হয়, লিখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, কিবা য়্যালোপ্যাথি, কিবা হোমিওপ্যাথি, কিবা হাকিমী,—সকল চিকিৎসা-প্রণালীই আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা-প্রণালীর সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য-সম্পন্ন। সেই সকল বিষয় আলোচনা করিলে সকলেরই মূল—ভারতবর্ষে—আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

নবম পরিচ্ছেদ

উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা প্রভৃতি।

[বিবিধ বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা;—পাশ্চাত্য-দেশে উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনা;—উদ্ভিদ-বিষয়ক বিবিধ জ্ঞাতব্য;—উদ্ভিদ বিদ্যায় প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠা;—পাশ্চাত্য-দেশে প্রাণিবিদ্যালোচনা;—প্রাণি-রাজ্যের অলৌকিক বৃত্তান্ত;—প্রাচীন ভারতে প্রাণিবিদ্যালোচনার নিদর্শন;—জীবজন্তুর সহিত মনুষ্যের কথাবার্ত্তা;—খনিজ-বিদ্যায় পাশ্চাত্য-দেশ;—পাশ্চাত্য-দেশে খনিজ-বিদ্যার ইতিহাস;—প্রাচীন ভারতে খনিজ-বিদ্যা আলোচনার নিদর্শন;—অন্যান্য বিবিধ বিদ্যায় প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠা।]

বিবিধ বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা।

উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা প্রভৃতি যে বিদ্যার বিষয়ই অনুসন্ধান করি না কেন, প্রাচীন ভারত সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, পারদ, সীসক প্রভৃতি ধাতুর সর্ব্ববিধ ব্যবহারেই প্রাচীন ভারতবর্ষ অভিজ্ঞ ছিল। সভ্য-জগতে মণি-মুক্তার সমাদর। প্রাচীন ভারতবর্ষে কতরূপ মণিমুক্তা কত প্রকারে ব্যবহৃত হইত এবং তৎসমুদায়ের গুণাগুণের বিষয়ে ভারতবাসীরা কতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা সংক্ষেপে ঐ সকল বিষয়ের কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। তাহাতেই উপলব্ধি হইবে,—বিবিধ বিজ্ঞানে ভারতবাসীর জ্ঞান কীদৃশ সর্ব্বতোমুখ ছিল!

উদ্ভিদ-বিদ্যা।

পাশ্চাত্যদেশে উদ্ভিদ-বিদ্যা।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ভিদ-বিদ্যার যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে উদ্ভিদ-বিদ্যায় ভারতবাসীর অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ নাই। তাঁহারা বলেন,—জোরওয়াষ্টার বৃক্ষাদির বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে গ্রীক-দার্শনিকগণ উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। থিওফ্রেটাস কর্ত্তৃক লিখিত উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। থিওফ্রেটাস—আরিষ্টটলের শিষ্য ছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। গ্রীসের ব্যবহার-বিধি-প্রবর্ত্তক সফোক্লেশের কঠোর বিধান-অনুসারে গ্রীসের দার্শনিক-গণ ৩০৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এথেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। থিওফ্রেটাসও সেই সময় নির্ব্বাসিত হন। ২৮৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। যদিও উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার আলোচনা সম্পূর্ণ নহে; কিন্তু তিনিই ইউরোপে উদ্ভিদ-বিদ্যা আলোচনার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর চারি শত বৎসর ইউরোপে উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ডায়স্কোরাইডস্ উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনা করেন। ডায়স্কোরাইডস্—এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত আনাজার্ব্বাস পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিশারদ বলিয়া পরিচিত না হইলেও, তিনি ছয় শতাধিক বৃক্ষের গুণাগুণের বিবরণ বিবৃত করিয়া গিয়াছেন! বলা বাহুল্য, এ সময়ও উদ্ভিদ-বিদ্যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার পর

'এল্ডার' প্লিনি, * উদ্ভিদ-বিদ্যার বিষয় আলোচনা করেন। তিনি এক সহস্র বৃক্ষের গুণাগুণের পরিচয় দিয়া যান। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যায়; আর বড় কেহ ইতিমধ্যে উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনা করেন নাই। অষ্টম শতাব্দীতে আরবে উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হয়। সেই সময়ে আবিসেনা উদ্ভিদ-বিদ্যায় বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। মধ্যে আরও কয়েক শতাব্দী অতীত হইয়া যায়। কিন্তু আর কোথাও উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনার বিষয় জানিতে পারা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, জর্ম্মণীতে উদ্ভিদ-বিদ্যা স্ফূর্ত্তি-লাভ করে। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে অটো ব্রুন্সফেল্স্ 'হিষ্টোরিয়া প্লাণ্টেরম আরজেণ্টোরাটি' অর্থাৎ বৃক্ষাদির ইতিহাস-মূলক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ষ্ট্রাসবর্গ সহর হইতে ঐ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ইহার পর জর্ম্মণীতে ট্রাগস ও ফসিয়াস, ইতালীতে ম্যাথিওলস ও সিসাল্‌পিনস, সুইজর্লণ্ডে জেস্‌নার, ফ্রান্সে ডি-লা-সাম্পা ও মলিনিয়াস এবং ইংলণ্ডে লোবেলিয়স প্রভৃতি উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনা করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হয়, উদ্ভিদ-বিদ্যা আলোচনার জন্য উদ্যান-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে এবং কোনও কোনও উদ্ভিদ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিয়া, উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এইরূপে যাঁহারা উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্লুসিয়াসের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, বহু বিপদ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনা করেন। পরিশেষে লেডেনে উদ্ভিদ-বিদ্যার অধ্যাপক-পদে ব্রতী হন। ইংলণ্ডে ডাক্তার টার্ণার উদ্ভিদ-বিদ্যার আদি-স্থানীয়। তিনি সাধারণতঃ 'ফাদার অব ইংলিশ বটানি' অর্থাৎ ইংলণ্ডের উদ্ভিদ-বিদ্যার পিতৃ-স্থানীয় বলিয়া পরিচিত। টার্ণার সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি পাঁচ সহস্রাধিক উদ্ভিদের পরিচয় প্রদান করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ডক্টর রবার্ট মরিসন এবং ডক্টর রে উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনায় ইংলণ্ডে বিশেষ

---

* প্লিনি নামে দুই জন পণ্ডিতের পরিচয় পাওয়া যায়। দুই জনই উত্তর-ইতালীর অন্তর্গত 'নোভম্ কমম্' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং একজন 'এল্‌ডার প্লিনি (Elder Pliny) এবং অপর জন 'ইয়ঙ্গার প্লিনি' (Younger Pliny) বলিয়া প্রসিদ্ধ। এল্‌ডার প্লিনি ২৩ খৃষ্টাব্দে এবং ইয়ঙ্গার প্লিনি ৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 'এল্‌ডার প্লিনির প্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম—'হিষ্টোরিয়া নেচারেলিস' (Historia Naturalis)। ঐ গ্রন্থে ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব খনিজ-তত্ত্ব উদ্ভিদ-তত্ত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের আলোচনা আছে। গ্রন্থখানি সাঁইত্রিশ ভাগে বিভক্ত। গ্রন্থের সূচনায় লিখিত আছে যে, দুই সহস্র পুস্তকের সাহায্যে এই গ্রন্থ রচিত হইল এবং ইহাতে বিশ সহস্রাধিক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এল্‌ডার প্লিনির সম্পূর্ণ নাম—সি প্লিনিয়াস সেকাণ্ডাস (C. Plinius Secundus)। 'ইয়ঙ্গার' প্লিনি—'এল্‌ডার' প্লিনির ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচিত। ইঁহারও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। কিন্তু 'এল্‌ডার প্লিনিই অধিক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন; তাঁহার 'হিষ্টোরিয়া নেচারেলিস' গ্রন্থেরই সর্ব্বদা উল্লেখ হইয়া থাকে। ৮৯ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়স আগ্নেয়-গিরির অগ্নিস্রাবে যখন পম্পী ও হারকিউলেনিয়ম নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন প্লিনি সেই দৃশ্য দর্শনার্থ এবং অগ্ন্যুৎপাতের কারণ অনুধাবন জন্য ষ্টেবিয়ায় উপনীত হইয়াছিলেন। সেই সময় অগ্ন্যুৎপাতের বাষ্পে শ্বাসরোধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। ইহার পর উদ্ভিদ-বিদ্যার চর্চ্চা দিনদিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিনিয়াস * উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনায় অশেষ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মে সুইডেনের অন্তর্গত স্মালাণ্ড প্রদেশে রোসল্ট গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধর্ম্মগ্রন্থাধ্যয়নে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু লিনিয়াস উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া লিনিয়াস উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে অশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ-সমূহকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। লিনিয়াসের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অংশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্য্যন্ত ইউরোপে উদ্ভিদ-বিদ্যা আলোচনার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ব্যারণ হামবোল্ট আমেরিকার উদ্ভিদ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে ইউরোপে আরও বহু গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হয়। সে সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করাও সম্ভবপর নহে। তখন উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্বন্ধে অন্যূন পঞ্চদশ সহস্র গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। প্রিজেল প্রণীত 'থেসাওরাস লিটারেটার বোটানিকা' গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। অতঃপর উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্বন্ধে ইউরোপ যে উন্নতিলাভ করিয়াছে, ইউরোপের নানা স্থানে উদ্ভিদ-তত্ত্ব আলোচনার জন্য যে রাজকীয় উদ্যানাদি † প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই অবগত আছেন। ইংরাজী-ভাষায় লিখিত উদ্ভিদ-বিদ্যা সংক্রান্ত যে কোনও সাধারণ গ্রন্থ দেখিলেই উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে ইংরেজ-জাতির ও ইউরোপের জ্ঞান-গবেষণার ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজীতে উদ্ভিদ-বিদ্যা—বটানি (Botany) নামে অভিহিত।

উদ্ভিদ-বিষয়ে বিবিধ জ্ঞাতব্য।

প্রাকৃতিক পদার্থ-সমূহকে লিনিয়াস তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। উহার এক একটি শ্রেণী এক একটি 'কিংডম' বা রাজ্য নামে অভিহিত হয়। সেই তিনটি শ্রেণীর নাম—প্রাণি-রাজ্য, উদ্ভিদ-রাজ্য, খনিজ-রাজ্য। ঐ তিন রাজ্যের জ্ঞান যদ্দারা লাভ হইতে পারে, তাহা যথাক্রমে প্রাণি-বিদ্যা (Zoology), উদ্ভিদ-বিদ্যা (Botany) এবং খনিজ-বিদ্যা (Mineralogy) নামে অভিহিত হয়। উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে লিনিয়াসের সূক্ষ্ম-দর্শন ও গবেষণা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। লিনিয়াস যদিও উদ্ভিদ-সমূহকে বিবিধ বিভাগে

* লিনিয়াসের নাম—স্যর চার্লস লিনিয়াস বা লিনে (Sir Charles Linnæus or Linne)। উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ে ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। খনিজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইঁহার গ্রন্থ আছে। 'সিষ্টেমা নেচারা', 'এমেনিটেটস একাডেমিকা', 'ফিলজফিয়া বটানিকা' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

† ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষে উদ্ভিদ-সমূহের প্রকৃতি-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য কলিকাতার পরপারে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে 'বোটানিকাল গার্ডেন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ঐ উদ্যানে তিন শত জাতীয় উদ্ভিদ সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ঐ উদ্যানে বৃক্ষ-জাতির সংখ্যা—সাড়ে তিন হাজারে দাঁড়ায়; তন্মধ্যে পনের শত জাতীয় বৃক্ষের বিষয় পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না বলিয়া প্রচারিত। অধুনা ঐ উদ্যানে প্রায় সর্ব্ববিধ জাতীয় উদ্ভিদই স্থান পাইয়াছে।

বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, এবং প্রত্যেক উদ্ভিদের আকৃতি-প্রকৃতি ও গুণাগুণের বিষয় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; তথাপি উদ্ভিজ্জগতের ও প্রাণিজগতের পার্থক্য অবধারণে তাঁহাকে বড়ই সংশয়ে পতিত হইতে হইয়াছিল। তিনি উদ্ভিদের ও প্রাণীর সংজ্ঞা-নির্দ্ধারণে উভয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে বলিয়া যান,—'উদ্ভিদে ও প্রাণীতে পার্থক্য এই যে, প্রাণীর গতি-শক্তি আছে, উদ্ভিদের তাহা নাই। অর্থাৎ, প্রাণী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে; কিন্তু উদ্ভিদ তাহা পারে না।' বলা বাহুল্য, এ সংজ্ঞাও সর্ব্বতোভাবে প্রমাদ-পরিশূন্য নহে। অধুনা, এমন অনেক প্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাদের গতি-শক্তি একেবারেই নাই; আবার এমন অনেক উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের গতি-শক্তি আছে;—সে সকল উদ্ভিদের শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে গমন করে না, তাহারা জলের উপর ভাসমান থাকিয়া যেন আপনাদের খাদ্য-দ্রব্য অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। * জলের মধ্যে পরমাণু-পুঞ্জ পতিত হইলে, অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখা গিয়াছে, তাহারা গতিশক্তি-বিশিষ্ট হয়। এই জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—'উদরাদি শারীর-যন্ত্র সম্পন্ন হইলেই প্রাণি-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে; আর, তাহা না হইলে, উদ্ভিদ মধ্যে গণ্য হয়।' যদিও এই মত প্রধানতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু এ বিষয়েও সংশয়ের অবধি নাই। 'জুফাইট'-জাতীয় বহু পদার্থে (জুফাইটের অন্যান্য বিবরণ প্রাণিবিদ্যালোচনায় দ্রষ্টব্য) এবং সামুদ্রিক জীব-জন্তুর নিম্নতম পর্য্যায়ে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত হয়। তাহাদিগের কতকগুলি দেখিতে উদ্ভিদের ন্যায়; অথচ, তাহাদের মধ্যে গতি-শক্তি এবং উদরাদি শারীর-যন্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি, সেই সকল পদার্থকে উদ্ভিদ বলিলেও বলা যায়, আবার প্রাণী বলিলেও বলা যায়। তাহাদের এক একটী পদার্থকে, প্রাণিবিদ্যাবিদ্‌গণ প্রাণি-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, আবার উদ্ভিদ-বিদ্যাবিশারদগণ উদ্ভিদ-শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উদ্ভিদ-বিদ্যাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া উদ্ভিদদিগের শারীর-বিদ্যা, নিদান-তত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মানুষের যেমন শারীর-যন্ত্র আছে, উদ্ভিদ-বিদ্যাবিদ্গণ বলেন, উদ্ভিদেরও সেইরূপ শারীর-যন্ত্র আছে। তাহাদের শারীর-যন্ত্র প্রধানতঃ তিনটি;—মূল, কাণ্ড ও পত্র। উহারাও আবার নানা উপবিভাগে বিভক্ত। মানুষের ত্বকের সহিত উদ্ভিদের ত্বকের তুলনা করা হইয়াছে, মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের সহিত উদ্ভিদের মধ্যবর্ত্তী সারাংশের তুলনা করা হইয়াছে; উদ্ভিদ-গণের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, উদ্ভিদ-গণের সন্তান-সন্ততি প্রভৃতির প্রসঙ্গ ও উদ্ভিদ-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। উদ্ভিদ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে উদ্ভিদের নানা অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ভিদ ফল-পুষ্প প্রদান করে; উদ্ভিদ মরুভূমে 'পান্থপাদপ' রূপে অবস্থিত থাকিয়া পথিক-দিগের তৃষ্ণা নিবারণ করে; আবার উদ্ভিদে হিংস্র জন্তুর হিংসার

---

* Many animals have, however, now been discovered, which seem to be unable to remove themselves from the spot on which they first made their appearance; and, on the other hand, there are many plants as duck-weed *(Lemna)*, ball-conferva *(conferva aegagropile)*, and others which, if they have roots, do not send them into the earth, but float about as if in search of food."

ভাবও প্রকাশ পায়। প্রাণিভোজী উদ্ভিদের বিবরণ অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। উত্তর কারোলিনা, কালিফোর্ণিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, মাদাগাস্কর এবং ভারতবর্ষেও কতকগুলি প্রাণিভোজী উদ্ভিদ পাওয়া যায়। 'ভেনাস ফ্লাইট্রাপ্' নামক এক শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে, তাহাদের পাতা ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। সেই পাতার শেষভাগে দুইখানি ডালির মত আচ্ছাদন থাকে। সেই আচ্ছাদনের ভিতর দিকে কেশরের ন্যায় সূক্ষ্ম ছয়টি স্পর্শানুভবকারী কেশর আছে। কোনও কীট-পতঙ্গ উহার মধ্যে পতিত হইলে গর্ভস্থ কেশরের উপর তাহাদের পতনজনিত সামান্য স্পর্শাঘাতে পূর্ব্বোক্ত আচ্ছাদন দুই খানি এত শীঘ্র জুড়িয়া যায় যে, পতিত পতঙ্গাদি কোনক্রমেই পলায়ন করিতে অবসর পায় না। পতিত পদার্থ প্রাণী কিংবা জড়—এই উদ্ভিদ বেশ বুঝিতে পারে। অর্থাৎ, পতিত পদার্থ জড় হইলে ডালি দুইখানি শীঘ্র শীঘ্র খুলিয়া যায় এবং প্রাণী হইলে যে পর্য্যন্ত না তাহার সারাংশ উত্তমরূপে শোষণ করে, সে পর্য্যন্ত ডালি দুইখানি মুদ্রিত থাকে। পরে অনেক বিলম্বে উহার পুনরায় আহারের ক্ষমতা হইলে ডালি দুইখানি খুলিয়া যায়। এই বৃক্ষের সহিত আমাদের দেশের লজ্জাবতী লতার সামান্য একটু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সকলেই জানেন, কোনরূপ স্পর্শন পাইলে লজ্জাবতী লতা নমিত হইয়া কুঞ্চিত হয়। সে সময়ে তাহাতে কোনও ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ পড়িলে, তাহাও ঐরূপে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। লজ্জাবতীর স্পর্শজ্ঞান আছে বলিয়া বোধ হয়। আর এক জাতীয় উদ্ভিদ আছে; তাহাদিগকে 'ভেজিটেবল হুইস্কিসপ' বলে। তাহারা পতঙ্গ-দিগকে মাতোয়ারা করিয়া গ্রাস করে। ঐ জাতীয় উদ্ভিদের আকার অবিকল একটি বাড়ীর ন্যায় এবং উহার পার্শ্ব-দিকে লম্বমান একটি দ্বার আছে। উক্ত আচ্ছাদন-পার্শ্বে কতকগুলি মধুময় কোমল কেশর থাকে। সূর্য্যের উত্তাপে তাহা হইতে মধু ক্ষরিত হয়। ঐ মধু-লোভে পতঙ্গ-গণ উহার পার্শ্বে বসিয়া মধু পান করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ভিতরে এক প্রকার স্বচ্ছ মাদক পদার্থ আছে জানিতে পারিয়া ক্রমশঃ সেই দিকে অগ্রসর হয়। আচ্ছাদন-পার্শ্বের ন্যায় ভিতর দিকেও ঐ প্রকার কেশর থাকে। পতঙ্গগণ ইচ্ছা করিলে প্রবেশ-দ্বার হইতে পলায়ন করিতে পারে; কিন্তু মধুপানে মত্ত হইয়া তাহারা ক্রমশঃই কেশরের উৎপত্তি স্থানে গিয়া পড়ে। তথা হইতে তাহারা আর পলায়ন করিতে পারে না। কারণ, উর্দ্ধ মুখে উঠিতে হইলে বিপরীতগামী কেশরে আবদ্ধ হয়। তখন তাহারা উড়িবার চেষ্টা করে ও সঞ্চিত মধুতে নিমজ্জিত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। 'মশকভোজী' আর এক প্রকার উদ্ভিদ আছে। ইহারা উর্দ্ধে প্রায় এক ফুট; ইহাদের পাতা কতক পরিমাণে উর্দ্ধে উঠিয়া উজ্জ্বল নির্য্যাসময় কেশরাচ্ছাদিত ভাগে বিভক্ত হয়। সূর্য্য-কিরণে ইহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। মশকময় কোনও গৃহে এইরূপ একটি উদ্ভিদ রাখিলে মশকের দৌরাত্ম্য অল্প সময়ের মধ্যেই নিবারিত হয়। ইহা যে প্রকারে মশক ধরে, তাহা দেখিতে বড়ই চমৎকার। মশক উহাতে নামিবামাত্র উহার ছয়টি পদের মধ্যে কোনও একটি পদ উহা স্পর্শ করিলেই কেশরাগ্রস্থিত মধুময় পদার্থে জড়িত হয়। তখন পালাইবার জন্য মশক যতই চেষ্টা করিতে থাকে, ততই মধুতে আরও জড়াইয়া যায়। ইত্যবসরে কেশরগুলি পতিত

মশকের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ক্রমশঃ তাহাকে ভিতরের দিকে টানিয়া লয় এবং তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া তাহার জীবন-শোণিত পান করে। আমাদের দেশের পুষ্করিণী-সমূহে এক প্রকার ঝাঁজি জন্মে। পতঙ্গ-সমূহ উহাদের উপর উপবেশন করিলে উহারা কুঞ্চিত হইয়া সেই পতঙ্গ-সমূহকে গ্রাস করে। ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জে এবং পূর্ব্ব-সাগরীয় দ্বীপ-পুঞ্জ-সমূহে 'উপাস' নামক এক প্রকার বিষাক্ত বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের নির্য্যাস মাখাইয়া তীর নিক্ষেপ করিলে যাহার গায়ে সেই তীর বিদ্ধ হয়, সেই মারা যায়। যবদ্বীপের অধিবাসীরা এইরূপে তীর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিত। কথিত হয়, কোনও অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইলে অপরাধীকে সেই বৃক্ষের পার্শ্বে রক্ষা করা হইত এবং বৃক্ষের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া অপরাধী ইহলোক পরিত্যাগ করিত। বোর্ণিয়ো-দ্বীপে এক প্রকার বাঁশ গাছ আছে। সেই বাঁশ গাছের নিম্ন দিকের তিন চারি পাপে সুস্বাদু জল পাওয়া যায়। যে সকল পার্ব্বতীয় প্রদেশে নদনদী বা অন্য কোনও জলাশয় নাই, সেই স্থলেই এইরূপ বাঁশের বড় বড় ঝোপ দৃষ্ট হয়। পিপাসার্ত্ত পথিকগণ অনেক সময় সেই জল পান করিয়া জীবনধারণ করেন। মরুভূমে 'পান্থপাদপ', আর পার্ব্বত্য-প্রদেশে এই পিপাসা-নিবারক বংশ—জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় করুণার পরিচায়ক।* উদ্ভিদের অসংখ্য পর্য্যায়, অসংখ্য কার্য্যকারিতা। এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে তাহার কণামাত্র পরিচয় দেওয়াও সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য-দেশের উদ্ভিদ-বিদ্যাবিশারদগণ কয়েক শতাব্দী হইতে এই সকল তত্ত্বের অনুসন্ধানে জীবন নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, এক জীবনে বা দুই চারি দশ জীবনেও এ তত্ত্ব কখনই সম্পূর্ণরূপ অধিগত হইবার নহে।

প্রাচীন-ভারতে উদ্ভিদ-বিদ্যা।

যে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে উদ্ভিদ-বিদ্যা পূর্ণ স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদ-বিদ্যা একরূপ লোপ-প্রাপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন ভারতবর্ষে উদ্ভিদ-বিদ্যার যে চর্চ্চা হইতেছে, তাহা ইউরোপীয় উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থের অনুসরণ মাত্র। ভারতবর্ষে উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে কোনও সময়ে কোনরূপ আলোচনা হইয়াছিল কি না, ভারতবর্ষীয় যে সকল ছাত্র উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে আলোচনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই তাহা অবগত নহেন। উদ্ভিদ-তত্ত্ব আলোচনা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে কোনও গ্রন্থাদি ছিল, এখন তাহার পরিচয় পাওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তবে উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে প্রাচীন-ভারতে যে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ-পরম্পরা একেবারে লোপ পায় নাই। মনু (১ম অ, ৪৬-৪৯শ শ্লোক) বলিয়াছেন,—

"উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ। ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ॥
অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ। পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ॥
গুচ্ছগুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ। বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা। অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥"

* ১২৯৪ সালের 'অনুসন্ধান' পত্রে 'প্রাণিভোজী উদ্ভিদ' এবং 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি প্রসঙ্গে এই সকল তথ্যের আলোচনা আছে।

অর্থাৎ,—'সমুদায় উদ্ভিদই স্থাবর। তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে জন্মে ও কতকগুলি রোপিত শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা বহু পুষ্পফলযুক্ত হইয়া থাকে ও ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে; যথা,—ধান্য, যব প্রভৃতি। যাহারা পুষ্পিত না হইয়া ফলবন্ত হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে; এবং পুষ্পিতই হউক বা কেবল ফলবানই হউক, উভয় প্রকারকে বৃক্ষ বলা যায়। গুচ্ছ ও গুল্ম নানা প্রকার আছে। তৃণজাতিও বিবিধ প্রকার। বিবিধ প্রকার প্রতান ও বল্লী আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, কেহ বা কাণ্ড হইতে জন্মে। (গুচ্ছ—মল্লিকাদি; গুল্ম—বংশাদি; প্রতান—অলাবু কুষ্মাণ্ডাদি; এবং বল্লী—গুরুচ্চাদি)। ইহারা বহুবিধ অসৎ কর্ম্মের ফলে তমোগুণে আচ্ছন্ন; ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে এবং ইহারা সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে।' মহর্ষি মনুর এই উক্তি হইতে উদ্ভিদ-বিদ্যায় প্রাচীন আর্য্যগণের অভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায় না কি? পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদকে যাঁহারা কয়েকটী মাত্র বিভাগে বিভক্ত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উদ্ভিদ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণ আছে, অধুনা সপ্রমাণ হইতেছে। কিন্তু কত কাল পূর্ব্বে মহর্ষি মনু সে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে, বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বকসার, বিরুধ, বৃক্ষ প্রভৃতি উদ্ভিদের পর্য্যায় বর্ণিত আছে। সেখানে দেখা যায়, মহর্ষি বেদব্যাসও উদ্ভিদের প্রাণ-শক্তির বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উদ্ভিদের তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকাশিত হইয়াছে। কোন্ উদ্ভিদের কি গুণ, কোন্ উদ্ভিদ কোন্ স্থানে কিরূপে উৎপন্ন হয়, চরক-সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহা প্রত্যক্ষ করুন। সুশ্রুত-সংহিতার সূত্রস্থানে প্রথম অধ্যায়ে এবং চরক-সংহিতার সূত্রস্থানে প্রথম অধ্যায়ে উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। * "যিনি উদ্ভিদ-দিগের নাম, রূপ ও গুণের বিষয় অবগত আছেন, তিনি উদ্ভিদবিৎ বলিয়া পরিচিত। উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিশারদ হইয়া দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে যিনি ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনিই ভিষক-শ্রেষ্ঠ।"†—চরক-সংহিতার সূত্রস্থানে এবম্বিধ উক্তিই দৃষ্ট হয়; চরক আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—'উদ্ভিদের নাম ও রূপ অনেকে জানিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা নাম, রূপ, গুণ তিনই জানেন, তাঁহারাই উদ্ভিদবিৎ।' প্রাচীন ভারতে কিরূপ-ভাবে উদ্ভিদ-বিদ্যা আলোচনা হইত, ইহাতে তাহা উপলব্ধি হয় না কি? উদ্ভিদগণকে প্রধানতঃ চারি ভাগে ভাগ করিয়া, সেই চারি ভাগকে যে অসংখ্য উপবিভাগে বিভক্ত করা হইত, চরকে ও সুশ্রুতে তাহাও দেখিতে পাই। শমী-ধান্য বর্গ, ইক্ষুবর্গ প্রভৃতিই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সুশ্রুত ইক্ষুবর্গের মধ্যে প্রথমতঃ ইক্ষুবর্গের সাধারণভাবে গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন; তাহার পর বলিয়াছেন,—'ইক্ষু অনেক বিধ যথা,—পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচীপত্রক, নৈপালী দীর্ঘ-পত্রক, নীলপোর, কোষকৃৎ।' এইরূপে সুশ্রুত ইক্ষুবর্গের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ইক্ষুর

---

* এই গ্রন্থের ২৪৪ম পৃষ্ঠায় চরক ও সুশ্রুতের কথিত উদ্ভিদের পর্য্যায় দ্রষ্টব্য।

† চরক-সংহিতা, সূত্রস্থান, প্রথম অধ্যায়, ৫৫শ ও ৫৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের এক একটীর গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্ভিদ-বিদ্যার কীদৃশ জ্ঞান থাকিলে এমন তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেক উদ্ভিদের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, সহজেই বুঝা যায়। শার্ঙ্গধরোদ্ধৃত 'পাদপবিবক্ষা প্রকরণে' পাদপ জাতিকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; এবং কোন্ পাদপ কোন্ জাতীয়, তাহারা বীজ হইতে বা কাণ্ড হইতে বা কন্দ হইতে জন্মগ্রহণ করে, তাহার উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গধরোদ্ধৃত উদ্ভিদ-বিদ্যার পরিচয়ে দেখিতে পাই, উদ্ভিদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে;—এক ভাগে পাদপ জাতি, অন্য ভাগে তৃণ ও ওষধি। তথায় দৃষ্ট হয়,—'পাদপ-জাতির সহিত তৃণ বা ওষধির কোনও সম্বন্ধ নাই। তৃণৌষধি যেরূপ-ভাবে লয়প্রাপ্ত হয় এবং যেরূপ-ভাবে উৎপন্ন হয়, পাদপ-জাতির উৎপত্তি ও লয়প্রাপ্তি তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের। এই মতে পাদপ-জাতি বনস্পতি, দ্রুম, লতা ও গুল্ম এই চারি ভাগে বিভক্ত। বনস্পতি-দিগের ফল হয়, কিন্তু পুষ্প হয় না। দ্রুমের পুষ্প ও ফল উভয়ই হইয়া থাকে। যাহারা প্রসারিত বা প্রতানিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই লতা বলে। যাহারা বহু স্তম্ভযুক্ত, তাহারা গুল্ম নামে অভিহিত। জম্বু, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, চিঞ্চিনি, কপিত্থ, বদরী, বিল্ব, কুম্ভকারী, প্রিয়ঙ্গু, পনস, আম্র, মধুক, কর্ম্মর্দ্দ প্রভৃতি পাদপ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। তাম্বুলী, সিন্ধুবারা ও তগর প্রভৃতি পাদপ কাণ্ড হইতে জন্মে। পাটলা, দাড়িম, করবীর, প্লক্ষ, বট প্রভৃতি এবং মল্লিকা, উদম্বর, কুন্দ প্রভৃতি—বীজ ও কাণ্ড উভয় হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুঙ্কুম, আর্দ্র, রশুন, আলু প্রভৃতি—কন্দ সমুদ্ভুত। এলাপত্র, উৎপল প্রভৃতি—বীজ ও কন্দ উভয় হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।' কৃষি-পরাশর গ্রন্থে কৃষিকার্য্যের যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহাতেও উদ্ভিত-বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই। কোন্ সময়ে কোন্ শস্য কিরূপ ভাবে রোপণ করিলে সুফল লাভ হয়, কি ভাবে চাষ-আবাদ করিলে ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ হয়, 'কৃষি-পরাশরে' তাহার বর্ণনা আছে! কৃষি-পরাশর—পরাশর ঋষির উপদেশ বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার উপদেশের সামান্য একটু পরিচয় এ স্থলে প্রদান করিতেছি। "বীজ-স্থাপন বিধি; যথা,—মাঘ বা ফাল্গুন মাসে সর্ব্বপ্রকার বীজ সংগ্রহ করিবে। সেই সকল বীজ রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিয়া রাত্রিতে শিশিরে স্থাপন করিবে। পরে বীজ-পুটিকা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বীজ স্থাপন করিবে এবং তাহা শোধন অর্থাৎ ভিন্ন-জাতীয় বীজ হইতে পৃথক করিবে। নানা জাতীয় মিশ্র বীজ ফলের হানিকর। এক প্রকারের বীজ অত্যন্ত ফল প্রদান করে; অতএব যত্নের সহিত এক প্রকারের বীজ সংগ্রহ করিবে।...বীজোপরি ঘৃত, তৈল, লবণ, তক্র বা প্রদীপ কদাচ রাখিবে না। গার্গ্য মুনি বলেন—দীপ-অগ্নি-ধূপ-যুক্ত, বৃষ্টির দ্বারা উপহত বা গর্ত্তের মধ্যে স্থাপিত বীজ বর্জ্জন করিবে। শুণ্ডযুক্ত অর্থাৎ গুঁড়া বা আগড়া যুক্ত বীজ বন্ধ অর্থাৎ নিস্ফল হয়।" এইরূপে বীজের বিষয় বর্ণন করিয়া তিথি-নক্ষত্রাদি অনুসারে বীজ বপন করিতে পরাশর ঋষি উপদেশ দিয়াছেন। ইহাকে আমরা উদ্ভিদ-বিদ্যার একটী অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি। উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে, যে স্বতন্ত্র সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, অগ্নিপুরাণে তাহার প্রমাণ পাই। 'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' নামক গ্রন্থের উল্লেখে ধন্বন্তরি শিক্ষাদান-ব্যপদেশে সুশ্রুতকে বলিতেছেন,—

"বৃক্ষায়ুর্ব্বেদমাখ্যাস্তে প্লক্ষশ্চোত্তরতঃ শুভঃ। প্রাগ্বটো যাম্যতস্থাম্র আপ্যেঽশ্বত্থঃ ক্রমেণ তু॥
দক্ষিণাং দিশমুৎপন্নাঃ সমীপে কণ্টকদ্রুমাঃ। উদ্যানং গৃহবাসে স্যাৎ তিলান ব্যাপ্যথ পুষ্পিতান্॥
গৃহ্নীয়াদ্রোপয়েদ্বৃক্ষান্ দ্বিজং চন্দ্রং প্রপূজ্য চ। ধ্রুবাণি পঞ্চ বায়ব্যং হস্তং প্রাজেশবৈষ্ণবম্॥
নক্ষত্রাণি তথা মূলং শস্যন্তে দ্রুমরোপণে। প্রবেশয়েন্নদীবাহান পুষ্করিণ্যাস্তু কারয়েৎ॥
হস্তা মঘা তথা মৈত্রমাদ্যাং পুষ্যাং সবাসবম্। জলাশয় সমারম্ভে বারুণঞ্চোত্তরাত্রয়ম্॥
সম্পূজ্য বরুণং বিষ্ণুং পর্জ্জন্যং তৎ সমাচরেৎ। অরিষ্টাশোক-পুন্নাগ শিরীষাঃ সপ্রিয়ঙ্গবঃ॥
অশোকঃ কদলী জম্বুস্তথা বকুল-দাড়িমাঃ। সায়ং প্রাতস্তু ঘর্ম্মর্ত্তৌ শীতকালে দিনান্তরে॥
বর্ষারাত্রৌ ভুবঃ শোষে সেক্তব্যা রোপিতা দ্রুমাঃ। উত্তমং বিংশতির্হস্তা মধ্যমং ষোড়শান্তরম্॥
স্থানাৎ স্থানান্তরং কার্য্যং বৃক্ষাণাং দ্বাদশাবরম্। বিফলাঃ স্যুর্ঘনা বৃক্ষাঃ শস্ত্রেণাদৌহি শোধনম্॥
বিড়ঙ্গঘৃতপঙ্কাক্তান্ সেচয়েচ্ছীতবারিণা। ফলনাশে কুলত্থৈশ্চ মাষৈ মুদ্গৈর্যবৈস্তিলৈঃ॥
ঘৃতশীতপয়ঃসেকঃ ফলপুষ্পায় সর্ব্বদা। অবিকাজশকৃচ্চূর্ণং যবচূর্ণং তিলানি চ॥
মৎস্যাম্ভসা তু সেকেন বৃদ্ধির্ভবতি শাখিনঃ। বিড়ঙ্গতণ্ডুলোপেতং মৎস্যং মাংসং হি দোহদম্।
সর্ব্বেষামবিশেষেণ বৃক্ষাণাং রোগমর্দ্দনম্॥"—অগ্নিপুরাণ, দ্বাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

অর্থাৎ,—'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ বর্ণন করিতেছি। ভবনের উত্তর দিকে প্লক্ষ, পূর্ব্বদিকে বট, দক্ষিণে আম্র ও পশ্চিমে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিলে কল্যাণকর হয়। গৃহের নিকটে দক্ষিণ দিকে উৎপন্ন কণ্টকদ্রুম-সকলও মঙ্গলদায়ক। গৃহবাসে উদ্যান প্রস্তুত করাইবে অথবা পুষ্পিত তিলকাণ্ড সকল বিরাজিত থাকিবে। দ্বিজগণের ও চন্দ্রের পূজা করিয়া বৃক্ষ গ্রহণ বা রোপণ করাইবে।* বায়ব্য, হস্ত, প্রাজেশ, বৈষ্ণব ও মূল এই পঞ্চ নক্ষত্র বৃক্ষ-রোপণে প্রশস্ত। নদীর প্রবাহ সকল উদ্যানে বা ক্ষেত্রে প্রবেশ করাইবে। নদ্যাদি না থাকিলে পুষ্করিণীর প্রবাহ যাহাতে উদ্যানে প্রবেশ করে, এরূপ উপায় করাইবে। জলাশয়ের আরম্ভ বিষয়ে হস্তা, মঘা, আদ্যা, পুষ্যা, সবাসব, বারুণ ও উত্তরাত্রয় এই সকল নক্ষত্র শুভকর। বরুণ, বিষ্ণু ও মেঘের পূজা করিয়া জলাশয় আরম্ভ করিবে। অরিষ্টাশক, পুন্নাগ, শিরীষ, প্রিয়ঙ্গু, অশোক, কদলী, জম্বু, বকুল, দাড়িম,—এই বৃক্ষ সকল রোপণ করিয়া গ্রীষ্মে সায়ং ও প্রাতঃকালে, শীত ঋতুতে দিনান্তরে এবং বর্ষাকালে ভূমি শুষ্ক হইলে সেচন করিবে। এক স্থানে বৃক্ষরোপণ করিয়া তাহার বিংশতি হস্ত অন্তরে অন্য বৃক্ষ রোপণ করিলে উত্তম, ষোড়শ হস্ত অন্তরে মধ্যম, দ্বাদশ হস্ত অন্তরে অধম রোপণ হয়। ঘন-সান্নিবিষ্ট বৃক্ষ ফলহীন হইয়া থাকে। ফলনাশ হইলে প্রথমে অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তন করিয়া পরে বিড়ঙ্গ, ঘৃত ও পঙ্ক মাখাইয়া শীত-বারি দ্বারা সেচন করিবে; এবং কুলত্থ, মাষ, মুদ্গ, যব ও তিলের সহিত ঘৃত ও শীতল সলিল সেক করিলে সর্ব্বদা ফল-পুষ্প উৎপন্ন হয়। আমিষ জল সেচন করিলে শাখিগণ সম্বর্দ্ধিত হয়। বিড়ঙ্গ ও তণ্ডুলযুক্ত মৎস্য ও মাংস বৃক্ষগণের বৃদ্ধি এবং সমস্ত বৃক্ষগণের নির্ব্বিশেষে রোগ মর্দ্দন করিয়া থাকে।' 'বৃহৎ-সংহিতা' গ্রন্থেও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের বিষয় লিখিত আছে। কোন্ বৃক্ষ কিরূপ-ভাবে রোপণ করিতে হয় এবং বৃক্ষের পীড়া হইলে কিরূপে তাহা দুর করা যায়, বৃহৎ-সংহিতায় (পঞ্চপঞ্চাশদধ্যায়ে) দেখুন। ১২৯৪ সালে কাশ্মীর রাজ্যে একখানি সংস্কৃত পুঁথি

আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই পুঁথিখানি উদ্ভিদ-বিদ্যাবিষয়ক। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থাদি যে প্রচলিত ছিল, উহা দ্বারা তাহা প্রতীত হয়। ফলতঃ, উদ্ভিদ-রোপণ, উদ্ভিদ-রক্ষা-করণ, উদ্ভিদের পীড়া-শান্তি এবং উদ্ভিদের গুণাগুণ যাঁহারা অবগত ছিলেন, তাঁহারা যে উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রাণি-বিদ্যা।

প্রাণি-বিদ্যা বিষয়ে পাশ্চাত্য-দেশ এখন নানা অভিনব-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পৃথিবীর প্রাণি সমূহ প্রধানতঃ কত ভাগে বিভক্ত হইতে পারে এবং এক এক ভাগের মধ্যে কত উপবিভাগ আছে, তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন্ শ্রেণীর প্রাণীর মস্তিষ্কের পরিমাণ কি প্রকার, কোন্ শ্রেণীর প্রাণী কি ভাবে কত দিন জীবিত থাকিতে পারে, কোন্ শ্রেণীর প্রাণী অপর শ্রেণী হইতে কি বিষয়ে কিরূপ স্বতন্ত্র, তাঁহাদের সূক্ষ্ম-দর্শনের প্রভাবে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাণি-বৃত্তান্ত অধুনা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ইংরাজী ভাষায় সেই বিজ্ঞানের নাম—জুলজি (Zoology)। এই প্রাণি-বিজ্ঞানে প্রত্যেক প্রাণীর প্রকৃতি, অবস্থা ও ইতিহাস বিবৃত আছে। প্রাণি-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে প্রাণি-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ প্রথমে প্রাণি-শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বিষম সমস্যায় পতিত হন। যাহার প্রাণ আছে, সেই যদি প্রাণী হয়, তাহা হইলে, সংসারের সকল পদার্থই প্রাণি-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। বৃক্ষের মধ্যে প্রাণ আছে; খনিজ পদার্থে প্রাণ আছে; প্রস্তরের মধ্যে প্রাণ আছে; দ্বিপদ-চতুষ্পদ কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ প্রভৃতির তো কথাই নাই! সুতরাং কোন্ পদার্থ প্রাণী নামে অভিহিত হইবে, আর কোন্ পদার্থ প্রাণিপর্য্যায়ভুক্ত নহে, তাহা নির্ণয় করিতে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ আজিও সংশয়ান্বিত। পৃথিবীতে এমন বৃক্ষ আছে, প্রাণীর সহিত যাহাদের প্রায়ই পার্থক্য লক্ষিত হয় না; অথচ, অন্যান্য বৃক্ষাদির সহিত তাহাদের সাদৃশ্য নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে। একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, খনিজ-পদার্থের সহিত উদ্ভিদের এবং উদ্ভিদের সহিত প্রাণি-সমূহের পর পর এক অভিনব সাদৃশ্য আছে। মানুষকে প্রাণি-রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন বলা যাইতে পারে। কতকগুলি খনিজ-পদার্থের, আমিয়ান্থাস (Amianthus) ও আসবেষ্টোস (Asbestos) প্রভৃতি ধাতুর গঠন বৃক্ষাদির গঠনের ন্যায়, অর্থাৎ তন্তুসমষ্টি দ্বারা গঠিত। প্রবাল—দেখিতে অনেকাংশে বৃক্ষাদির ন্যায়; কিন্তু উহার উপরিভাগের উপাদান-সমূহ প্রস্তরের বুনন-বিশিষ্ট। এইরূপ দেখিতে গেলে, এক শ্রেণীর পদার্থের সহিত অপর শ্রেণীর পদার্থের অনেক সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। আরও বুঝিতে পারা যায়,—স্তরে স্তরে প্রাণি-জগতে যেন পরিবর্ত্তন-পর্য্যায় বিদ্যমান। উদ্ভিদের এবং প্রাণীর মধ্যবর্ত্তী পদার্থের নাম—'জুফাইট' (Zoophytes)। জুফাইট নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। অন্ত্র-মধ্যস্থ কৃমিকীট জুফাইটের অন্তর্ভুক্ত। আবার, জলশোষক স্পঞ্জ, প্রবাল-জাতীয় পদার্থ প্রভৃতি, সমুদ্রজ বিবিধ-সামগ্রী জুফাইটের পর্য্যায়-মধ্যে গণ্য। জুফাইটের কোনটীর আকৃতি বৃক্ষমূলের ন্যায়, কোনটীর আকৃতি বৃক্ষের পত্রের প্রায়, কোনটী নাড়ীভুঁড়ীর মত, কোনটী বা পুষ্প-

পাশ্চাত্যে প্রাণিবিদ্যা।

স্তবকের মত। জুফাইটের আকৃতি দর্শন করিলে, প্রাণি-জগতের বৈচিত্র্য ধারণা করিতে পারা যায় না। কোনটীর মুখ আছে, কিন্তু চলচ্ছক্তি নাই; কোনটীর উদর আছে, কিন্তু অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই; কোনটীর কেবলমাত্র পাকস্থলী আছে; কোনটীর বা কোনও শারীর-যন্ত্রই লক্ষিত হয় না। ফলতঃ, উদ্ভিদ কি প্রাণী, কি খনিজ-পদার্থ, কিছুই নির্ণয় করা যায় না,—জুফাইট এমনই মাঝামাঝি সামগ্রী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—এমন অনেক উদ্ভিদ আছে, যাহাদিগকে প্রাণী বলিলেও বলা যায়; আবার এমন অনেক প্রাণী আছে, যাহারা উদ্ভিদ-পর্য্যায়ভুক্ত। প্রাণিতত্ত্ববিৎ লিনিয়াস খনিজ-পদার্থ ও উদ্ভিদকে তাই প্রাণি-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'খনিজ-পদার্থ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহার বৃদ্ধি-প্রাপ্তিই প্রাণের পরিচায়ক। উদ্ভিদ-সমূহকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে এবং জীবিত থাকিতে দেখা যায়। তাহাতে উহাদের প্রাণের সত্বা বুঝিতে পারি। প্রাণিগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জীবিত থাকে এবং অনুভব করিতে পারে। খনিজ-পদার্থ এবং উদ্ভিদ প্রভৃতির সহিত ইহাই তাহাদের পার্থক্য। বৃদ্ধি-প্রাপ্তি—ঐ তিনের সাধারণ ধর্ম্ম।' রসায়ন-সংক্রান্ত প্রবন্ধে ল্যাণ্ডফের বিশপ লিখিয়া গিয়াছেন,—'প্রাণী, উদ্ভিদ এবং খনিজ-পদার্থ সমস্তই বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। ক্ষুদ্র বালুকা-কণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াই বিশালাকার ধারণ করে।' এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। রাসায়নিকগণ বলেন,—'রাসায়নিক ক্রিয়ায় বালুকাকণার সহিত অন্য পদার্থের সংযোগ ঘটায় প্রস্তরাদি গঠিত হইয়া থাকে।' যাহা হউক, প্রাণী, উদ্ভিদ ও খনিজ-পদার্থ—এই তিনের মধ্যেই যে এক সাদৃশ্য আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। উদ্ভিদের বীজ, পক্ষীর ডিম এবং সমস্ত জীবজন্তুর আদি অবস্থার গোলত্ব—এতদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাণি-পর্য্যায়ের মধ্যে মানুষ সর্ব্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ—ইহা অবিসম্বাদিত। কিন্তু মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণীর এক একটী ইন্দ্রিয়ের শক্তি এতই প্রবল এবং সর্ব্ব-বিষয়ে পূর্ণতা-প্রাপ্ত যে, তাহার নিকট মনুষ্যকে হারি মানিতে হয়। মনুষ্যের অপেক্ষা কোনও প্রাণী ঘ্রাণ-শক্তি, কোনও প্রাণীর দর্শন-শক্তি, কোনও প্রাণীর শ্রবণ-শক্তি যে অনেক অধিক, তাহা আমরা অনেক সময়ই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। মনুষ্যের মধ্যে চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি সমভাবে বর্ত্তমান। কুক্কুরের (গ্রে-হাউণ্ড প্রভৃতি কয়েক জাতীয় জারজ কুকুর ভিন্ন) ঘ্রাণশক্তি অন্যান্য প্রাণীর অপেক্ষা অধিক; শিকারী পক্ষীর দর্শন-শক্তি অতি তীক্ষ্ণ; খরগোসের শ্রবণ-শক্তির তুলনা নাই; হস্তিশুণ্ডের স্পর্শ-শক্তি অপরিমেয়; মনুষ্য রসাস্বাদনে অদ্বিতীয় ক্ষমতা-সম্পন্ন। কীট-পতঙ্গাদির মধ্যে শম্বুক-জাতীয় জন্তু, কর্কট জাতীয় জন্তু (কাঁকড়া প্রভৃতি) এবং সকল প্রকার মৎস্য, সরীসৃপ ও চতুষ্পদ জন্তু প্রধানতঃ প্রখর দর্শন-শক্তি-সম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে (শম্বুকাদি ভিন্ন অন্য) কতকগুলি জন্তুর শ্রবণ-শক্তিও আছে। পতঙ্গাদির শরীরে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোনও যন্ত্র আছে কি না, তাহা যদিও আজিও পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা বিবিধ স্বর উচ্চারণ করিতে সমর্থ বলিয়া তাহাদের শ্রবণ-শক্তি আছে, মনে করা যাইতে পারে। জুফাইট পর্য্যায়-ভুক্ত প্রাণি-জাতীয় উদ্ভিদের কোনও দর্শনেন্দ্রিয় আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু আলোক-লাভ করিলে তাহাদের ক্রিয়াশক্তি যে বৃদ্ধি পায়, ইহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। সে সময়

তাহাদের মধ্যে স্পর্শ-জ্ঞানেরও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাফন বলেন,—'মনুষ্যের স্পর্শ-শক্তি অন্যান্য জন্তুর অপেক্ষা অধিক। অন্যান্য প্রাণীতে ঘ্রাণ-শক্তির আধিক্য; তজ্জন্য তাহাদের ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি অত্যধিক। স্পর্শ-জ্ঞানের প্রাবল্য-হেতু মানুষে জ্ঞানের আধিক্য এবং শ্রবণ-শক্তির প্রাবল্য-হেতু মনুষ্যেতর জন্তুতে ক্ষুধার বৃদ্ধি। কি জন্য মনুষ্য অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে নানা মতান্তর আছে। সাধারণের ধারণা, মস্তিষ্কের জন্য মনুষ্যের প্রাধান্য; অর্থাৎ,—অন্যান্য প্রাণীর শরীরের তুলনায় তাহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ কম এবং মনুষ্যের শরীরের তুলনায় তাহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক। কিন্তু এ সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত নহে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, মনুষ্যের অপেক্ষাও মনুষ্যেতর কোনও কোনও প্রাণীর মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক। চড়ুই, বাবুই, ফিঙে, প্রভৃতি পক্ষী আকারে ক্ষুদ্র; কিন্তু সে আকারের তুলনায় তাহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ অনেক অধিক। শরীরের তুলনায় মনুষ্যের মস্তিষ্কের পরিমাণ ১এর ২২ হইতে ১এর ৩৫ মধ্যে। শরীরের তুলনায় বিভিন্ন প্রাণীর মস্তিষ্ক-পরিমাণ এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে; যথা,—'গীবন' বা দীর্ঘবাহু লাঙ্গুলহীন বানরের ১এর ৪০ অংশ, ঘোটকের ১এর ৪০০ অংশ, ঈগল পক্ষীর ১এর ১০৮ অংশ, চড়ুই পক্ষীর ১এর ২৫ অংশ, কেনারী পক্ষীর ১এর ১৫ অংশ, মোরগের ১এর ২৫ অংশ, পাতিহাঁসের ১এর ৩৬০ অংশ, দেশজ কচ্ছপের ১এর ৫৬৮৮ অংশ ইত্যাদি) বৈজ্ঞানিকগণ আরও নির্দ্ধারণ করেন,—মনুষ্য হইতে যতই নিম্ন-পর্য্যায়ে অবতরণ করা যায়, ততই শরীরের প্রধান প্রধান যন্ত্র-সমূহের অভাব ও অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইয়া থাকে। স্তন্য-পায়ী জীব জন্তুর অপেক্ষা সরীসৃপ, মৎস্য এবং অন্যান্য নিম্ন-স্তরের প্রাণীর প্রধান প্রধান শারীর-যন্ত্রের অভাব স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়। তবে অন্যান্য জন্তুর তুলনায় পক্ষি-গণের কোনও কোনও যন্ত্র অধিক, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাণি-সমূহের গঠনাদি বিষয়ে যেরূপ বৈচিত্র্যই ঘটুক না কেন, আহারই সকলের পরিপুষ্টির মূলীভূত। বেকন বলিয়াছেন, —'যে প্রাণী যত উচ্চ স্তরে অবস্থিত, সে তাহার নিম্নস্তরের প্রাণীকে বা সামগ্রীকে ভক্ষণ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করে। জল ও মৃত্তিকা উদ্ভিদের পুষ্টিকারক। প্রাণি-সমূহ সাধারণতঃ উদ্ভিদভোজী; মনুষ্য প্রধানতঃ প্রাণি-ভোজী। ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মেই প্রাণিজগৎ প্রধানতঃ পরিপুষ্ট। তবে কোনও কোনও জন্তু মাংসাশী, কোনও কোনও মনুষ্য উদ্ভিদ-ভোজী এবং কোনও কোনও জন্তু ও কোনও কোনও মনুষ্য মাংস ও উদ্ভিদ উভয়ই ভক্ষণ করিয়া থাকে।' যাহা হউক, আহার ভিন্ন কাহারও বাঁচিবার উপায় নাই। আহারের প্রভাবেই প্রাণি-সমূহ যৌবন, শক্তি এবং কার্য্যকারিতা লাভ করে। আহারের প্রভাবেই তাহাদের শরীর পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু অনাহারে বা অল্পাহারে প্রাণী যে নির্দ্দিষ্ট সময় জীবিত থাকিতে না পারে, তাহা নহে। আমাদের দেশে যৌগিক ক্রিয়ার প্রভাবে মানুষ সহস্র সহস্র বৎসর অনাহারে অতিবাহিত করিয়াছেন, পুরাতত্ত্ব সাক্ষ্যদান করিতেছে। অনাহারে বা অল্পাহারে প্রাণী কত দিন বাঁচিতে পারে, ইউরোপেও তাহার পরীক্ষা হইয়াছে। 'বাউন্টি' জাহাজের কাপ্তেন ব্লি সতের জন সঙ্গীর সহিত একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া চারি সহস্র মাইল পথ অতিক্রম করিয়া-

ছিলেন। সেই সময় তাঁহাদের সতের জনের আহারের উপযোগী কোনই সামগ্রী ছিল না। একটী মাত্র পক্ষী, ওজনে কয়েক ছটাক মাত্র, তাঁহারা কয়জনে ভাগ করিয়া খাইতেন। আর, তাহাতেই তাঁহারা জীবিত থাকিয়া কতদূর পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। আরাকানের উপকূলে 'জুনো' জাহাজ জলমগ্ন হয়। সেই জাহাজের চৌদ্দ জন স্ত্রী-পুরুষকে তেইশ দিন অনাহারে কাটাইতে হইয়াছিল। দুই জন পঞ্চম দিবসে ইহলীলা সম্বরণ করেন। অন্যান্য সকলে তেইশ দিনই জীবিত ছিলেন। প্রাণি-তত্ত্ববিৎ রেডি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অন্যান্য প্রাণী মনুষ্য অপেক্ষা অধিক দিন অনাহারে বাঁচিতে পারে। গৃহ-পালিত মার্জ্জার দশ দিন, হরিণ কুড়ি দিন, বন্য বিড়াল কুড়িদিন, ঈগল পক্ষী আটাইস দিন, খেঁকশিয়ালী জাতীয় বেজার এক মাস এবং বিভিন্ন-জাতীয় কুকুর ছত্রিশ দিন অনাহারে বাঁচিয়াছে। 'একাডেমি অব সায়েন্সের' গ্রন্থপত্রে প্রকাশ,—একটী কুকুরী চল্লিশ দিন একটী গৃহের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; গৃহের একখানি কম্বল চর্ব্বন করিয়া, সে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে। তদ্ভিন্ন তাহার মুখ নাড়িবার আর কোনও সামগ্রীই সে ঘরে ছিল না। কুম্ভীর দুই মাস, বৃশ্চিক তিন মাস, ভল্লুক ছয় মাস, উষ্ট্র আট মাস, বিষাক্ত সর্প দশ মাস অনাহারে বাঁচিয়া ছিল প্রমাণ পাওয়া যায়। ভেলাণ্ট নামক এক ব্যক্তি একটী মাকড়কে এক বৎসর অনাহারে রাখিয়াছিলেন। এক বৎসরের পর মাকড়টীকে ছাড়িয়া দিলে সে অপর একটী মাকড়কে ধরিয়া খাইয়াছিল। সে সময় অনাহার-জনিত তাহার শক্তি-হ্রাসের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। জন হাণ্টার নামক এক ব্যক্তি দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত পুষ্প-দানের মধ্যস্থলে একটী ভেককে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। চৌদ্দ মাস পরে তিনি দেখিতে পান, ভেকটী সজীব রহিয়াছে। দেশজ কচ্ছপ আঠার মাস অনাহারে বাঁচিতে পারে। বেকার নামক এক ব্যক্তি একটী গুবরে-পোকাকে তিন বৎসর কাল অনাহারে রাখিয়া ছিলেন। তার পর সেটী পলাইয়া যায়। ডাক্তার সাও দুইটী সর্পকে একটী বোতলের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সর্প দুইটী পাঁচ বৎসর অনাহারে জীবিত ছিল। অনেক জন্তু নিদ্রিত অবস্থায় বহুকাল কাটাইয়া দেয়। সে সময় তাহাদের আহারের প্রয়োজন হয় না। শীতপ্রধান দেশে এরূপ অসংখ্য প্রাণী দৃষ্ট হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ আরও কত তত্ত্বই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কোন্ জাতীয় জীবের শরীরের উত্তাপ কত, কোন্ জাতীয় জীব কিরূপ শৈত্যে বা কিরূপ উত্তাপে বসবাস করিতে পারে, কোন জাতীয় জীবের সন্তান-সন্ততি কত দিনে কি প্রকারে উৎপন্ন হয়,—সকল তত্ত্বই তাঁহারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আজকাল কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক আবার বলিতেছেন,—'আহারের পরিমাণ মানুষ যতই কমাইয়া আনিতে পারিবে, ততই তাহাদের দীর্ঘ-জীবন লাভ সম্ভবপর।' উপবাসে শরীর অনেক সময় সুস্থ হয়, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। অনাহারে কতদিন মানুষ বাঁচিতে পারে, সে পরীক্ষাও চলিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাণিতত্ত্বের বিষয়ে যেরূপ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, প্রাণি-বিজ্ঞান বিষয়ে অধুনা পাশ্চাত্য-দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার আভাস মাত্র প্রদান করিতে হইলেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রণয়নের আবশ্যক হয়।

প্রাণিবৃত্তান্ত কি অলৌকিক রহস্যপূর্ণ। মনুষ্য আপনাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া গৌরব করেন। কিন্তু যে জ্ঞান, যে বুদ্ধি এবং যে শক্তির জন্য মনুষ্যের দর্প, মনুষ্যের নীচ প্রাণীর মধ্যেও সে সকল বৃত্তিই কি অল্প পরিস্ফুট! ব্যাঘ্র হিংস্র জন্তু, নর-শোণিত পান তাহার প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। কিন্তু সেই ব্যাঘ্র—মনুষ্য সমাজে হিংস্র বলিয়া পরিচিত সেই ব্যাঘ্র—সময় সময় মনুষ্যের প্রতি কিরূপ স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করে, শুনিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। স্যর উইলিয়ম শ্লিমান ঠগী-দমন ব্যাপারে প্রতিষ্ঠান্বিত। গোমতী-নদীর তীরস্থিত জঙ্গলে ব্যাঘ্র কর্তৃক কয়েকটী মনুষ্য-শিশু প্রতিপালিত হওয়ার বিষয় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। সে ব্যাপার তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। সুলতানপুর নামক স্থানে জঙ্গলের নিকট বেড়াইবার সময় এক দিন তিনি দেখিতে পান,—একটী ব্যাঘ্র ও তাহার তিনটী শাবকের সহিত একটী বালক নদী তীরে জলপান করিতে চলিয়াছে। বালকটী হামাগুড়ি দিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় চলিতেছিল। শ্লিমান কৌশলে সেই বালককে ধৃত করেন। ধৃত হইয়াও বালক নানারূপে পলাইবার চেষ্টা পায়। গৃহে আনিয়া বালককে প্রথমে তিনি অন্নাদি আহার করাইবার চেষ্টা পান। কিন্তু বালক কিছুতেই সে সকল খাদ্য স্পর্শ করে না। এমন কি, রন্ধন করা মাংস খাইতে দিলেও সে তাহা স্পর্শ করিত না। অবশেষে সাহেব তাহাকে কাঁচা মাংস খাইতে দিতে বাধ্য হন। বালক যে কয়দিন জীবিত ছিল, কাঁচা মাংসই তাহার প্রিয় আহারের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। আহারের সময় নিকটে কুক্কুরাদি থাকিলে, সে তাহাদিগকে আপনার খাদ্য-দ্রব্যের অংশ দিতে পারিত; কিন্তু সে সময় নিকটে কোনও মানুষ দেখিলে সে কেবলই গোঁ গোঁ শব্দে চীৎকার করিয়া ভয় দেখাইত। নিকটে কোন বালক-বালিকা যাইলে, সে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাইত, কুক্কুরের মত চেঁচাইত ও কামড়াইবার চেষ্টা পাইত। কাপ্তেন নিকলেটাস নামক একজন সৈন্য শ্লিমানের নিকট হইতে ঐ বালকটীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সৈনিকের যত্নে বালকের হিংস্রভাব অনেকাংশে কমিয়া আসে। তখন সে রন্ধন করা মাংসও অল্প অল্প খাইতে শিখে। কিন্তু তখনও মানুষের সঙ্গ অপেক্ষা শৃগাল-কুক্কুরের সঙ্গই তাহার প্রিয় ছিল। কাপড় পরাইলে সে তাহা সহ্য করিতে পারিত না। অতি শীতের সময়ও গায়ে কাপড় দিলে ব্যস্তসমস্তে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিত। তুলার নরম গদী পাতিয়া পরিষ্কার বিছানা করিয়া দিলে, সে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিত এবং তুলাগুলি খাইবার চেষ্টা পাইত। এইরূপে বার বৎসর কাল কাটাইয়া সামান্য জ্বরে বালকের মৃত্যু হয়। একাল পর্য্যন্ত সে কোনও কথাই কহিতে পারে নাই। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার মনে যেন একবার তাহার শৈশব-কাহিনী উদিত হইয়াছিল। পীড়ার কষ্ট প্রকাশ করিয়া 'বড় তৃষ্ণা, একটু জল দাও,' বলিতে বলিতে তাহার জীবনলীলার অবসান হয়। স্যর উইলিয়ম এইরূপ আরও সাতটী ব্যাঘ্র-পালিত শিশুর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজের চ'খের দেখা। তাহার মধ্যে একটী প্রধান ঘটনা এই যে, একটী শিশুর পিতামাতা মাঠে কাজ করিবার সময় শিশুকে বাঘে লইয়া গিয়াছিল এবং ছয় বৎসর পরে ব্যাঘ্র-শাবকের দলে জলপান করিতে গিয়া শিশু ধৃত হয়। এ বালকও কখন কথা কহিতে পারে নাই বা কাপড়

প্রাণিজগতের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত।

পরিতে চাহিত না। অধিকন্তু মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হইত। শেষে তাহার পিতামাতা তাহাকে আর খুঁজিয়া পায় নাই। ইউরোপে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক মানব-শিশু প্রতিপালনের এমন অনেক ঘটনাই প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। জর্ম্মণ-দেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ রেক বন্য-শূকর কর্ত্তৃক মনুষ্য-শিশু প্রতিপালনের একটী অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রুশীয় যুদ্ধের পর ডুসেলডফ সহরে রেক একটী অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া যাহারা প্রাণভয়ে বনে আশ্রয় লইয়াছিল, তদ্রূপ শত শত অনাথ বালক সেই অনাথাশ্রমে প্রতিপালনার্থ রক্ষিত হয়। অনাথাশ্রমে এক দিন একটী অপূর্ব্ব-প্রকৃতির বালককে আনা হইয়াছিল। সে বালক বন্য শূকরের দলে মিশিয়া তাহাদের সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া চতুষ্পদের ন্যায় বেড়াইতেছিল। তাহার গাত্র পুরু ময়লায় আবৃত, পরিধেয় বস্ত্রের সামান্য মাত্র ছিন্ন অংশ তাহাতে জড়িত। তাহার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত; বোধ হয়, যেন আত্ম-রক্ষার্থ অপর কোনও জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার ঐ অবস্থা ঘটিয়াছে। সন্ধানে জানা যায়, বালকটী তত্রত্য কোনও গ্রামে শূকর-পালকের কর্ম্ম করিত। রাত্রিকালেও তাহাকে শূকরের ঘরে শূকরদিগকে আগুলিয়া শুইয়া থাকিতে হইত; আর সেই অবসরে গভীর রাত্রিতে প্রভুর অজ্ঞাতসারে সে প্রতিদিনই বাঁট হইতে চুষিয়া চুষিয়া শূকরের দুগ্ধ পান করিত। ক্রমে যখন ফরাসী-বিপ্লবে তাহার প্রভুর ঘরবাড়ী ধ্বংস হইল, সেও তখন ঐ সকল শূকরদলের সহিত প্রাণ লইয়া বনে পলাইল। বহুদিন শূকর-দলের সহিত বনে বাস করার পর সে যখন ধৃত হয়, তখন আর তাহার মনুষ্য-প্রকৃতি নাই, সে ভালরূপ কথা কহিতেও পারে না; যে কথা কহে, তাহা শূকরের ন্যায় অস্ফুট-স্বর-বিশিষ্ট। সে কেবল শূকরের সহিত থাকিতে ভালবাসিত; আর শূকরগণও তাহার হাবভাব বুঝিতে পারিত। আর একটী বালক ঐ সময়ে অনাথাশ্রমে আনিত হয়। তাহার প্রকৃতি বিহঙ্গের ন্যায়। পক্ষীর মত তাহার চক্ষুর বক্রদৃষ্টি। মুখের সাদৃশ্যও পক্ষীর ন্যায়; মানুষের স্বরে সে কথা কহিতে পারিত না। সদাই পক্ষীর মত স্বর উচ্চারণ করিত। এই বালক পক্ষীর ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়াছিল, প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ নির্দ্ধারণ করেন। এ সকল আধুনিক ঘটনা। পুরাণ-ইতিহাসেও পশুপক্ষীর আলয়ে মানব-শিশু প্রতিপালিত হওয়ার বিবরণের অসদ্ভাব নাই। পারস্যের ইতিহাসে সাইরস, রোমের ইতিহাসে রোমিউলাস ও রিমস্ এবং পুরাণে শকুন্তলা প্রভৃতির বৃত্তান্ত এতাদৃশ ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কুকুরের প্রভুভক্তির ও বুদ্ধিমত্তার বিবরণ অনেক সময়ই অবগত হওয়া যায়। অন্যান্য অনেক জন্তুরই এইরূপ নানা গুণাগুণের পরিচয় প্রাপ্ত হই।

প্রাচীন-ভারতে প্রাণি-বিদ্যা।

প্রাচীন ভারতবর্ষেই কি প্রাণি-বিজ্ঞান আলোচনার অল্প নিদর্শন দেখিতে পাই? প্রাচীন ভারতে যে প্রাণি-বিদ্যার বিশেষরূপ আলোচনা হইয়াছিল, মনুসংহিতায় তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—'জীবগণের মধ্যে যাহার যেরূপ কর্ম্ম ও যাহার যেরূপ জন্মক্রম পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় আপনাদিগকে বলিতেছি।' এতদুক্তিতে প্রতিপন্ন হয়, মনুসংহিতা প্রবর্ত্তনার পূর্ব্বেও এদেশে প্রাণি-বিদ্যার আলোচনা হইয়াছিল। সুতরাং বুঝা

যাইতেছে, পূর্ব্বাচার্য্যগণের সে সকল গ্রন্থ এখন লোপ পাইয়াছে। এখন বিচ্ছিন্ন-ভাবে যেখানে যে কিছু প্রাণিতত্ত্বের আভাস আছে, তাহারই উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে পরিতুষ্ট হইতে হইতেছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন-ভাবেও যাহা আছে, তাহাও বড় অল্প নহে। পূর্ব্বাচার্য্যগণের উল্লেখমাত্র করিয়া মনু আরও বলিয়াছেন,—'জীবগণের মধ্যে পশু, মৃগ, হিংস্র জন্তু, দুই পংক্তি দন্ত বিশিষ্ট জন্তু, রাক্ষস, পিশাচ ও মনুষ্য ইহারা গর্ভকোষে জন্মগ্রহণ করে। পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ এবং এবম্প্রকার স্থলজ নক্রাদি ও জলজ ভেকাদি, ইহারা অণ্ডজ অর্থাৎ অণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দংশ, মশক, যুক, মক্ষিক, মৎকুণ ইহারা স্বেদজ এবং ইহাদের সদৃশ অপরাপর পিপীলিকাদি প্রাণিগণও উষ্মা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।' যথা,—
"যেষান্তু যাদৃশং কর্ম্ম ভূতানামিহ কীর্ত্তিতম। তৎ তথা বোঽভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি॥
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ। রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ॥
অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রাঃ মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ। যানি চৈবম্প্রকারাণি স্থলজান্যৌদকানি চ॥
স্বেদজং দংশমশকং যুকা-মক্ষিক-মৎকুণম্। উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্॥" *
বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থের অন্তরে চৈতন্য আছে এবং তাহারাও সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে,—মনু এ কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। যথা—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ-দুঃখ সমন্বিতাঃ।" এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। বৃক্ষাদির চেতনার বিষয় এবং একশফ, দ্বিশফ, পঞ্চনখ, খেচর প্রভৃতি প্রাণিগণের বিভাগের আভাসও সেখানে প্রদত্ত হইয়াছে। † সুশ্রুত ও চরক প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে প্রাণি-বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। সুশ্রুত দ্রব্য-সকলকে প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—স্থাবর ও জঙ্গম। তাঁহার মতে—'স্থাবরও চতুর্ব্বিধ, জঙ্গমও চতুর্ব্বিধ। চতুর্ব্বিধ স্থাবরের নাম—বনস্পতি, বৃক্ষ, বিরুধ ও ওষধি; এবং চতুর্ব্বিধ জঙ্গমের পর্য্যায়—জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও ঔদ্ভিজ্জ। পশু, মনুষ্য, ব্যাল প্রভৃতি (ব্যাল শব্দে হিংস্র পশুপক্ষী এবং কোনও কোনও সর্পকেও বুঝায়) জরায়ুজ। পক্ষী, সর্প, সরীসৃপ প্রভৃতি অণ্ডজ। কৃমি, কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি স্বেদজ। ইন্দ্রগোপ (গুবরেপোকা), মণ্ডূক প্রভৃতি ঔদ্ভিজ্জ। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রাণিতত্ত্বালোচনায় উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যবর্ত্তী পদার্থকে জুফাইট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জুফাইট—সুশ্রুত-বর্ণিত ঔদ্ভিজ্জ জীবই নহে কি? তবেই বুঝুন, আধুনিক জুফাইট তত্ত্বটী পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ববিদগণ কেমন অবগত ছিলেন! প্রাণিতত্ত্বে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ সুশ্রুত হইতে আরও দুইটী বিষয় উদ্ধৃত করিতেছি। জলৌকাবচারণীয় অধ্যায়ে জলৌকা সম্বন্ধে লিখিত আছে—'জল ইহাদিগের আয়ু বলিয়া জলৌকাদিগের নাম জলায়ুকা হইয়াছে। আর জল ইহাদিগের ওক অর্থাৎ বাসস্থান বলিয়া জলৌকা নাম হইয়াছে। জলৌকা—দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে ছয় প্রকার সবিষ এবং ছয় প্রকার নির্ব্বিষ। সবিষ জলৌকাদিগের নাম; যথা—কৃষ্ণা, কর্ব্বুরা, অলগর্দ্দা, ইন্দ্রায়ুধা, সামুদ্রিকা ও গোচন্দনা। তন্মধ্যে কজ্জলবর্ণ ও স্থূলমস্তক

* মনু-সংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ৪২শ—৪৫শ শ্লোক এবং ৪৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ, দশম অধ্যায় এবং এই গ্রন্থের ১০৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জলোকা-দিগকে কৃষ্ণা কহে। যে সকল জলোকা বাইন মাছের ন্যায় আয়ত (চেটাল), যাহাদের কুক্ষি কোথাও ছিন্ন কোথাও বা উন্নত, তাহাদিগকে কর্ব্বূরা কহে। যাহারা রোমশ (রোমাচ্ছন্নের ন্যায় প্রতীয়মান), যাহাদের পার্শ্বদ্বয় বৃহৎ ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগকে অলগর্দ্দা কহে। রামধনুর ন্যায় ঊর্দ্ধরেখা বিরাজিত জলোকাদিগকে ইন্দ্রায়ুধা কহে। ঈষৎ কৃষ্ণ, পীতবর্ণ ও বিচিত্র পুষ্পাকৃতি (নানা ধবলবর্ণ চিত্রিত) জলোকা-দিগকে সামুদ্রিকা কহে। যাহা-দিগের অধোভাগ দেখিতে গোবৃষণের ন্যায়, যাহাদের আকৃতি দ্বিধাভূত (দ্বিখণ্ডিতের ন্যায়) এবং যাহাদের মুখ সূক্ষ্ম, তাহাদিগকে গোচন্দনা কহে। এই সকল জলোকার দংশনে দংশ-স্থানে অতিমাত্র শোথ, কণ্ডুয়ন, মূর্চ্ছা, দাহ, বমি, মত্ততা ও অবসাদ, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে।...ইন্দ্রায়ুধের দংশন অচিকিৎস্য।...নির্ব্বিষ জলোকাদিগের নাম; যথা,—কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কুমুখী, মূষিকা, পুণ্ডরীকমুখী ও শাবরিকা। এতন্মধ্যে যে সকল জলোকার পার্শ্বদ্বয় মনঃশীলা-রঞ্জিতের ন্যায় এবং যাহাদিগের বর্ণ স্নিগ্ধ মুদ্গের ন্যায়, তাহাদিগকে কপিলা বলে। কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ গোল শরীর, পিঙ্গল ও শীঘ্রগতি জলোকা-দিগকে পিঙ্গলা কহে। যাহাদের বর্ণ যকৃতের ন্যায়, যাহারা শীঘ্র রক্ত পান করে এবং যাহাদিগের মুখ দীর্ঘ তীক্ষ্ণ, তাহাদিগকে শঙ্কুমুখী কহে। মূষিকের ন্যায় আকৃতি ও বর্ণ হইলে এবং শরীর দুর্গন্ধ হইলে, তাহাদিগকে মূষিকা কহে। যাহাদের বর্ণ মুদ্গের ন্যায় ও পদ্মের ন্যায় বিস্তীর্ণ, তাহাদিগকে পুণ্ডরীকমুখী কহে। শাবরিকা নামক জলোকার শরীর স্নিগ্ধ, বর্ণ পদ্মপত্রের ন্যায় ও পরিমাণ অষ্টাঙ্গুল।' এই সকল জলোকা যে কেবল একটী প্রদেশে জন্মিয়া থাকে এবং একটী প্রদেশ-জাত জলোকার বিষয় লক্ষ্য করিয়াই যে এতদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নহে। এই সকল জলোকা কোন্ কোন্ দেশে অবস্থিতি করে, তদ্বিষয়ও অনুসন্ধিৎসু প্রাণিতত্ত্ববিদগণ লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল দেশের নাম—যবন-দেশ, পাণ্ড্য-দেশ, সহ্যদেশ ও পোতন-দেশ। ঐ সকল দেশে কোথায় অবস্থিত, তদ্বিষয়ে নানা মতান্তর আছে। নিবন্ধকার যবনদেশকে তুরস্কদেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এদিকে আবার গ্রীসকেও যবনদেশ বলিয়া থাকে। তুরস্কই হউক, আর গ্রীসই হউক,—সেই দূরদেশজাত জলোকার সংবাদ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাণি-তত্ত্ববিদগণ অবগত ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়। ঐ সকল জলোকা কোন্ জাতীয় জলোকা, কোন্ সামগ্রী হইতে জন্মগ্রহণ করিত এবং কোন্ পদার্থ দ্বারা জীবনধারণ করিত, আর কিরূপে উহাদিগকে ধরা যাইত, সুশ্রুতের জলোকাবচারণীয় অধ্যায়ে তাহারও বর্ণনা আছে। যথা, 'সবিষ জলোকা-সকল—সবিষ মৎস্য, সবিষ কীট ও সবীষ ভেক প্রভৃতির মূত্র, পুরীষ ও পুতিযুক্ত শব হইতে এবং দূষিত জল হইতে উৎপন্ন হয়। আর নির্ব্বিষ জলোকা-সকল—পদ্মপত্র, নীলোৎপল-পত্র, রক্তপদ্মপত্র, কুমুদ-পত্র, কহ্লার-পত্র, কুবলয়-পত্র, পুণ্ডরীক-পত্র ও শৈবালের কোথ (পুতিভাব) হইতে জন্মিয়া থাকে।, ইত্যাদি। সামান্য এক জলোকার বিষয়ে যাঁহারা এতদূর অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, অন্যান্য প্রাণি-বিষয়ে তাঁহাদের গবেষণা কতদূর পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে! সুশ্রুত একস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন,—'রক্তজাত কৃমি সাত প্রকার এবং সেই সাত প্রকার কৃমি চক্ষুর অগোচর।' তবেই বুঝুন, চক্ষুর অগোচর কৃমিগুলির তথ্য পর্য্যন্ত

ভারতবাসীরা অবগত ছিলেন। সুশ্রুতের 'কল্পস্থান' অধ্যায়ে বিবিধ প্রকার বিষাক্ত কীটের বর্ণনা আছে। 'সর্পদষ্টবিষ বিজ্ঞানীয়' অধ্যায়ে পৃথিবীর যাবতীয় বিষাক্ত সর্পের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে সুশ্রুত বলিয়াছেন,—'যে সকল দংষ্ট্রাবিষ ভৌমসর্প মানুষদিগকে দংশন করিয়া থাকে, ঐ সকল সর্প অশীতি প্রকার। সে অশীতি প্রকার আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত; যথা,—দর্ব্বিকর (ফণাযুক্ত), মণ্ডলী (ফণাহীন), রাজিমান (রেখাযুক্ত), নির্ব্বিষ ও বৈকরঞ্জ (সঙ্কর জাতি)। এতন্মধ্যে দর্ব্বিকর ছাব্বিশ প্রকার, মণ্ডলী (বোড়া) বাইশ প্রকার এবং রাজিমান্ দশ প্রকার। নির্ব্বিষের সংখ্যা দ্বাদশ; নির্ব্বিষ বৈকরঞ্জ তিন প্রকার এবং সবিষ বৈকরঞ্জ সাত প্রকার।' এই সকল সর্পের নাম, ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি ও বর্ণাদি এবং ইহাদের বিষের তীব্রতা প্রভৃতির বিষয় সুশ্রুত তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কোন্ সর্পের দংশনে কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, কোন্ সর্পের বিষের বেগ কি প্রকার, এবং কোন্ জন্তুর শরীরে কোন্ বিষের কিরূপ ক্রিয়া হয়, তত্তদবস্থার চিকিৎসা-প্রণালী সহ, তথায় লিখিত আছে। এই তো গেল জলৌকা-সরীসৃপ প্রভৃতি বিষয়ে! এতদ্ভিন্ন পক্ষী ও ঘোটকাদি অন্যান্য প্রাণীর বিষয়ে ভারতবাসীর অনুসন্ধানের অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণে একটী অধ্যায় আছে—অশ্বলক্ষণ। কোন্ প্রকার তুরঙ্গম বর্জ্জনীয়, কোন্ প্রকার তুরঙ্গম শুভ, কোন্ প্রকার তুরঙ্গমের কি প্রকার রোগে কোন্ ঔষধ ব্যবহার্য্য, তাহা ঐ অধ্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়। অশ্ব সম্বন্ধে প্রকাণ্ড বিস্তৃত গ্রন্থ-সমূহ প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল; সেই সকল গ্রন্থের দুইখানি গ্রন্থ পারসী ও আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়; এ পরিচয় পূর্ব্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি। * প্রাণিতত্ত্বে কতদূর অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, তাদৃশ গ্রন্থ বিরচিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রত্যেক প্রাণীর কার্য্য বিষয়ে এতই সূক্ষ্ম দর্শন ছিল যে, শাস্ত্র-গ্রন্থে নানা স্থানের উপমায়ও সে পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—'নশ্বর-দেহ মনুষ্যের গৃহারম্ভই দুঃখের কারণ ও নিষ্ফল। সর্প পরকৃত গৃহে বাস করিয়া সুখী হইয়া থাকে। যেমন উর্ণনাভ মুখ দ্বারা হৃদয় হইতে উর্ণা বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে, তদ্রূপ মহেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন।... দেহী স্নেহ, দ্বেষ বা ভয় হেতু যাহাতে যাহাতে সমগ্র মন ধারণ করে, মরণান্তে তাহারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। কীট পেশস্কারকে ধ্যান করিতে করিতে তৎকর্ত্তৃক ভিত্তির মধ্যে প্রবেশিত হইয়া পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তাহার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়। প্রাণি-বিশেষের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় যে প্রবল, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞার নিদর্শন-স্বরূপ একটী লোক-প্রসিদ্ধ উক্তির উল্লেখ করিতে পারি। ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য-হেতু প্রাণীর নাশ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে,—

"পতঙ্গমাতঙ্গকুরঙ্গভৃঙ্গামীনাহতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥"

অর্থাৎ,—এক এক প্রাণীর এক একটী ইন্দ্রিয় প্রবল হওয়ায় (অর্থাৎ পতঙ্গের দর্শনেন্দ্রিয়, মাতঙ্গের স্পর্শেন্দ্রিয়, কুরঙ্গের শ্রবণেন্দ্রিয়, ভৃঙ্গের ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং মীনের রসনেন্দ্রিয় প্রবল

* এই গ্রন্থের আয়ুর্ব্বেদ পরিচ্ছেদে ২৫৪ম—২৫৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হওয়ায়) তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। এক ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য-হেতু প্রাণীর সর্ব্বনাশ হয়; যাহাদের পঞ্চেন্দ্রিয় প্রবল, সেই মনুষ্য কেমন করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে!' অধিক দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন অনাবশ্যক। উদ্ধৃত অংশ-সমূহে প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে প্রাচীন ভারতের অভিজ্ঞতার বিষয় নিশ্চয়ই উপলব্ধি হইবে।

পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের নানা স্থানে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির সহিত মানুষের কথা-বার্ত্তার পরিচয় পাই। রামায়ণের বিভিন্ন স্থানে হনুমান প্রভৃতির সহিত শ্রীরামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর কথোপকথনের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃত হইলে, তাঁহার অন্বেষণে হনুমান যখন লঙ্কায় গমন করেন, অশোক-কাননে সীতা-দেবীর সহিত হনুমানের অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। সেই কথাবার্ত্তার বর্ণনা বাল্মীকির রামায়ণে যেরূপভাবে লিখিত আছে, তাহার এক স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সেখানে মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়া গিয়াছেন,—

জীবজন্তুর সহিত কথাবার্ত্তা।

"সীতায়াস্তু বচঃ শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। শিরস্যঞ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ॥
ক্ষিপ্রমেষ্যতি কাকুৎস্থ হর্য্যক্ষপ্রবরৈর্বৃতঃ। যস্তে যুধি বিজিত্যারীন্ শোকং ব্যপনয়িষ্যতি॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্যক সত্যং সুভাষিতং। জানকী বহু মেনে তং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥"

অর্থাৎ—"পবনপুত্র হনুমান সীতার কথা শুনিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্তর করিলেন,—'যিনি সমরে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার দুঃখ দূর করিবেন, সেই কাকুৎস্থ রাম প্রধান বানর ও ভল্লুকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া লঙ্কায় আগমন করিবেন।'... জনকদুহিতা সীতা সর্ব্বতোভাবে সুভাষী বায়ুপুত্র হনুমানের সত্য বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সম্মানপূর্ব্বক তাহার উত্তর দিলেন।" এই বর্ণনা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই প্রতীত হয়, হনুমানের ভাষা মানুষে বুঝিতে পারিতেন এবং মানুষের কথাও হনুমানের উপলব্ধি হইত; অর্থাৎ, এমন এক সময় ছিল, যখন বানরকুলের সহিত মনুষ্যের কথাবার্ত্তা চলিত। অনেকে অধুনা এ সকল বিবরণকে উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ আমাদের পুরাণ-উপপুরাণ-সমূহে এইরূপ ঘটনাবলীর সমাবেশ দেখিয়া তৎসমুদায়কে 'উপকথা' বলিয়া উপহাস করিতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর উষার আলোকে যে নূতন তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়াছে, অধ্যাপক আর, এল, গার্ণারের যে অভিনব গবেষণার ফল প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে এখন আর কোনক্রমেই ঐ সকল বিবরণকে উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। অধ্যাপক গার্ণার বানর-গণের ভাষা-শিক্ষার জন্য জীবন সমর্পণ করেন। প্রাণি-তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার মনে হয়,— 'জীবজন্তু সকলেরই ভাষা আছে। মানুষ চেষ্টা করিলে সে ভাষা শিক্ষা করিতে পারে।' সেই সময় তাঁহার আরও মনে হয়,—'মানুষের অব্যবহিত নিম্ন-স্তরে বানরের পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং মানুষের ভাষার সহিত বানরের ভাষার অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকাই সম্ভবপর।' এই মনে করিয়া অধ্যাপক গার্ণার আফ্রিকার এক নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করেন। সে জঙ্গলে অসংখ্য বানর বাস করিত। একখানি লৌহ-পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়া লইয়া, জীবন-ধারণোপযোগী খাদ্য-দ্রব্যাদি সহ, তিনি সেই পিঞ্জর-মধ্যে প্রবেশ

করেন। বানরের লীলাভূমি সেই অরণ্য-মধ্যে সেই লৌহ-পিঞ্জর রক্ষা করিয়া, অধ্যাপক গার্ণার জীবনের বহু বর্ষ কাল সেই অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। অরণ্য মধ্যে বাস করিবার সময়, বানর-গণের চীৎকার, কণ্ঠ-স্বর, গতিবিধি ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করাই তাঁহার একমাত্র কর্ম্ম ছিল। এইরূপ-ভাবে কয়েক বৎসর কাল অরণ্য-মধ্যে বাস করিয়া, তিনি বানর-গণের উচ্চারিত কতকগুলি শব্দ ও তাহার অর্থ স্থির করিয়া লন। তাহাতে জগতে এক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। এখন যাঁহারা বিশেষ বিশেষ স্থানের বানর-গণের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে চাহেন, গার্ণারের ন্যায় অধ্যবসায়ী হইলে, তাঁহার অনুসরণে, উদ্দেশ্য-সাধনে সফলকাম হইতে পারেন। গার্ণার বলেন,—'সকল মনুষ্যের বাক্য সমভাবে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ও বিশুদ্ধ নয়। নিম্নস্তরের অসভ্য জনের ভাষা স্বভাবতঃই কর্কশ ও অবিশুদ্ধ। বানর-গণের ভাষা এই নিয়মের অধীন। যদিও তাহাদের ভাষা নিম্নস্তরে অবস্থিত; কিন্তু তদ্দ্বারাই তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ হয়। মনুষ্য যেমন এক এক উদ্দেশ্য-সাধনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দ ব্যবহার করে, বানর-গণের শব্দোচ্চারণেও সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। ভাবের অল্পতায় চিন্তার সত্যতা হ্রাস হয় না, অথবা শব্দের অল্পতায় বাক্যের সত্যতা হ্রাস পায় না।' * গার্ণারের এ সিদ্ধান্ত সমীচীন, সন্দেহ নাই। সাঁওতাল, কোল, কুকী প্রভৃতি অসভ্য-জাতিগণের ভাষার বিষয় আলোচনা করিলে, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। তাহাদের ভাষায় শব্দ-সম্পদ অল্প; তাহাদের উচ্চারণে কর্কশতার আধিক্য। অসভ্য-জাতি-গণের উচ্চারিত শব্দ-সমূহ সংগ্রহ করিয়া অধুনা তাহাদের উচ্চারিত ভাষায় নূতন জীবন-সঞ্চারের চেষ্টা হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল অসভ্য জাতির ভাষা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু এখন, মিশনরি-গণের এবং গবরমেণ্টের চেষ্টার ফলে, বহু অসভ্য-জাতির ভাষা শিক্ষিত-ব্যক্তিমাত্রের অধিগত হইয়া আসিতেছে। যে অধ্যবসায় ও যে পরিশ্রমের ফলে অসভ্য-জাতিগণের ভাষা বোধগম্য হইতেছে, জীব-জন্তুর ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে, সে তুলনায় কত আয়াস স্বীকার করিতে হইবে,—সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং, পুরানেতিহাসে জীব-জন্তুর সহিত মনুষ্যের কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া, তৎসমুদায়কে একেবারে উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। প্রাচীন ভারতবর্ষ যখন জ্ঞান-গৌরবের উচ্চ-চূড়ায় আরূঢ় ছিল, তখন জীব-জন্তুর ভাষা শিক্ষা-পক্ষেও ভারতবর্ষ সাফল্য লাভ করিয়াছিল,—বলিতে পারি না কি? আজি গার্ণার যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, দশ বৎসর পরে, দশ বৎসর না হউক—শতাব্দী পরেও, অপর কোনও মনীষী আবির্ভূত হইয়া, সে পথ অধিকতর পরিষ্কার ও পরিসর করিয়া

* এ সম্বন্ধে গার্ণার যাহা বলিয়াছেন, তাহার কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—"All types of human speech are not equally copious or refined and the lowest types of mind employ the rudest form of speech. The speech of monkeys conforms to this law, and while it is a very low type it meets the demands of the mental state of the animal and serves the same purpose in his social life as human speech does in ours. The dimness of an idea does not lessen its reality as a thought, nor does paucity of words lessen the reality of speech."

দিতে পারেন—অনেকেই এরূপ আশা করেন। যদি সে আশা সম্ভবপর হয়, সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত এই মনুষ্য-সমাজই যদি জীব-জন্তুর ভাষা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, সভ্যতার শিখর-দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভারতবর্ষ এক সময় সে শিক্ষা—সে বিদ্যা লাভ করিয়াছিল এবং কালোচিত অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সকলই বিস্মৃতির গহ্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছে,—এই কথাই মনে আসিতে পারে না কি? হনুমান সম্বন্ধে মতান্তরের কথা উল্লেখ না করিয়া, বাল্মীকি-বর্ণিত হনুমানকে যদি বানর-জাতিরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী প্রভৃতি তাহাদের ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন,—ইহা অবিসম্বাদে মানিয়া লইতে হয়; তাহা হইলে, প্রাণি-বিদ্যায় ভারতবর্ষ কতদূর প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

খনিজ-বিদ্যা।

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের মহিমা খনিজ-বিদ্যায়ও অল্প প্রকটিত নহে! খনির মধ্যে ভূগর্ভে কত রত্ন কি ভাবে লুকায়িত আছে, অধুনা নব নব কৌশলে তৎসমুদায় উদ্ধৃত হইতেছে; আর তদ্দ্বারা মনুষ্য-সমাজের ধন-সম্পদ কতমতেই বৃদ্ধি পাইতেছে। খনির মধ্যে হীরক আছে, সুবর্ণ আছে, রৌপ্য আছে, তাম্র আছে, লৌহ আছে, আরও কত কি সামগ্রী লুপ্ত রহিয়াছে। খনির গর্ভে পাথুরিয়া কয়লা ছিল, কিছুকাল পূর্ব্বে সে সন্ধান কেহই রাখিতেন না। পাশ্চাত্য-দেশে কত দিন হইতে পাথুরিয়া কয়লার ব্যবহার প্রচলিত, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই; ১২৮১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নিউক্যাসেল সহরে প্রথমে জ্বালানি কার্য্যে কয়লা ব্যবহার হইয়াছিল। প্রথম এডওয়ার্ডের রাজত্ব-কালে কয়লার ব্যবহার আইনের দ্বারা বন্ধ হয়। তখন অনেকে বিশ্বাস করেন,—কয়লার ধূমে স্বাস্থ্যহানি হয়। ইহার পর কখনও কয়লার ব্যবহার প্রচলিত, কখনও বা বন্ধ হইয়াছিল। অতঃপর, প্রথম চার্লসের রাজত্ব-কাল হইতে ইংলণ্ডে কয়লার ব্যবহার অব্যাহত-ভাবে চলিয়াছে। তদবধি ভূগর্ভ হইতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা মানুষ অশেষ উপকার পাইতেছে। বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, তাড়িতালোক প্রভৃতি সেই কয়লার সাহায্যেই পরিচালিত হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জর্জ্জ এগ্রিকোলা পাশ্চাত্য-দেশে প্রথমে খনিজ-বিদ্যাকে বিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য করিবার প্রয়াস পান। এগ্রিকোলা জর্ম্মণ-দেশের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। ধাতব-পদার্থের পরীক্ষায় ও গুণাগুণ প্রচারে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মার্চ্চ মিসনার অন্তর্গত গ্লাউচার পল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পর, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুইডেন-বাসী ওয়ালেরিয়স ও ক্রনষ্টেড খনিজ-বিদ্যার পথ প্রশস্ত করেন। তৎপরে ওয়ার্ণার ঐ বিষয়ে অধিকতর অগ্রসর হন। ইহার পর হোয়ে * কর্তৃক কৃত্রিম স্ফাটিক নির্ম্মাণ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত

পাশ্চাত্যে খনিজ-বিদ্যা।

* হোয়ে (Hauy) ফরাসী-দেশের একজন প্রসিদ্ধ খনিজ-তত্ত্ববিৎ। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৮এ ফেব্রুয়ারী পিকাডের অন্তর্গত সেণ্ট-জষ্ট পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য-দেশে কৃত্রিম স্ফাটিক ইনিই প্রথমে নির্ম্মাণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

হয়; তখন রসায়নের ক্রমোন্নতির সহিত খনিজ-বিদ্যা নূতন অবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন হইতেই খনিজ-বিদ্যাবিদ্‌গণের মধ্যে দুই একটী দলের সৃষ্টি। এক পক্ষ খনিজ-পদার্থের বাহ্য-প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। আর, অপর পক্ষ কোন্ পদার্থের সহিত কোন্ খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে কিরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয়, সেই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন। ভূস্তরে এত বিভিন্ন পদার্থের অসংখ্য সমাবেশ আছে যে, রসায়ন-শাস্ত্রানুসারে তাহাদের বিভাগ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। খনিজ-পদার্থ-সমূহ এরূপ মিশ্রিত-ভাবে অবস্থিত যে, তাহাদের রাসায়নিক ক্রিয়ার বিষয় নির্দ্ধারণ করাও সুসাধ্য নহে। অতি নির্ম্মল হীরক-খণ্ডও অগ্নি-দগ্ধ করিলে ভস্মের চিহ্ন লক্ষিত হয়; আবার অনেক হীরকের এবং অন্যান্য ধাতুর বর্ণ-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। খনির মধ্যে অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণে সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। চেষ্টা করিলে সে বৈষম্য দূর করিতে পারা যায়। মলামাটি বা অন্য পদার্থের সংযোগ অপসারিত করিয়া এক এক পদার্থের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করা, অনেক স্থলে অসম্ভব নহে। তবে কতকগুলি পদার্থ পরস্পর মিশ্রিত হইলে তাহাদের মধ্যে এমনই গুরুতর রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয় যে, তাহাদের পরস্পরের পৃথক সত্ত্বা নির্দ্ধারণ করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা হউক, খনিজ-পদার্থ বলিতে প্রধানতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টিন, কয়লা, চুণ, লবণ, প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য বুঝাইয়া থাকে। শিলাজতু, আলকাত্‌রা, শিলা-তৈল, পেট্রোলিয়ম, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি বিবিধ তরল পদার্থও খনিজ-পদার্থের মধ্যে গণ্য। হীরক ও বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান প্রস্তর খনিজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। খনিজ-বিদ্যাকে ইংরাজী-ভাষায় 'মিনারেলজি' (Mineralogy) বলে। খনিজ-বিদ্যার সহিত জিওলজির বা ভূ-বিদ্যার অভিন্ন সম্বন্ধ। এমন কি, খনিজ-বিদ্যাকে প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগের নাম—'মিনারেলজি' বা খনিজ-বিদ্যা, অন্য ভাগের নাম—'জিওলজি' বা ভূবিদ্যা। খনিজ-বিদ্যায় কেবল খনিজ-পদার্থেরই আলোচনা হইয়া থাকে; আর, আকাশের বিষয়, জলের বিষয়, ভূস্তরের বিষয় এবং পৃথিবীর উত্তাপ, আকৃতি, ঘনত্ব, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতির বিষয় ভূ-বিদ্যার অন্তর্নিবিষ্ট। ভূ-বিদ্যা বা ভূ-তত্ত্বের বিষয় পূর্ব্বেই আমরা একটু আলোচনা করিয়াছি। * ইউরোপে কত দিন হইতে ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও আভাস পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে তদ্বিষয়ের অধিক আলোচনা বাহুল্য-মাত্র।

খনিজ-বিদ্যার পাশ্চাত্য ইতিহাস।

যদিও অনেক দেশে প্রাচীন কাল হইতে খনিজ-পদার্থের ব্যবহারের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু খনিজ-বিদ্যার বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা পাশ্চাত্য-দেশে অতি অল্প দিনই আরম্ভ হইয়াছে। তবে কতদিন হইতে খনিজ-পদার্থের ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং কিরূপভাবে খনি হইতে প্রথমে খনিজ-পদার্থ-সমূহ উত্তোলিত হইতে আরম্ভ হয়, সে তত্ত্ব কেহই এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে বুঝিতে পারা যায়, জলপ্লাবনের পূর্ব্বে পিত্তল বা তাম্র এবং লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল; তাৎকালিক তুবাল-কেইন লৌহাদি ব্যবহার করিয়া-

* এই খণ্ডের 'সৃষ্টি-তত্ত্ব' প্রসঙ্গে ২৮২ম পৃষ্ঠা হইতে ২৮৮ম পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। তুবাল-কেইনের বিবরণ-পাঠে মনে হয়, তাঁহারও বহু পূর্ব্বে খনিজ-পদার্থের ব্যবহার বিষয়ে মনুষ্যের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। কি করিয়া মানুষ প্রথমে খনিজ-পদার্থের বিষয় অবগত হইল, তৎসম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে। লুক্রেটিয়াস বলেন,—'দাবানল উপস্থিত হইলে ধাতুব-পদার্থ-সমূহ গলিতে আরম্ভ করে। তদ্দৃষ্টে মানুষের মনে ধাতব পদার্থ গলাইবার ও তাহাকে যথেচ্ছ আকারে পরিণত করিবার জ্ঞান বিকাশপ্রাপ্ত হয়।' আরিষ্টটলেরও সেইরূপ সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন,—স্পেনের কতকগুলি মেষপালক একটী অরণ্যে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিল। অরণ্য অগ্নি সংযুক্ত হইলে পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠের অব্যবহিত নিম্নস্তরস্থিত রৌপ্যের খনি গলিয়া স্তূপীকৃত হয়। পরিশেষে ভূকম্পনে সেই স্থান বিদীর্ণ হইলে, রৌপ্য-স্তূপ বাহির হইয়া পড়ে। ষ্ট্রাবোও এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করেন। ঐ প্রকারে আণ্ডালুশিয়ার রৌপ্য খনি-সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল—ষ্ট্রাবো এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রীস-দেশে ক্যাডমস্ কর্ত্তৃক বর্ণমালা প্রবর্ত্তিত হয়। তিনিই প্রথমে স্বর্ণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু গ্রীসের পৌরাণিক আখ্যায়িকা-সমূহে এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত ব্যক্ত আছে। কোনও মতে প্রকাশ—থ্রেসের থোয়াস কর্ত্তৃক, কোনও মতে প্রকাশ—জুপিটারের (বৃহস্পতির) পুত্র মার্কারি (বুধ) কর্ত্তৃক, কোনও মতে ইটালীর রাজা পাইসাস কর্ত্তৃক পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম সুবর্ণ আবিষ্কৃত হয়। পাইসাসের সম্বন্ধে অধিকন্তু কথিত হয়,—তিনি ইটালি পরিত্যাগ করিয়া মিশরে গমন করেন এবং তত্রত্য রাজা মিজরেমের মৃত্যুর পর মিশরের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। সুবর্ণের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া তিনি 'গোল্ডেন গড' বা সুবর্ণের ঈশ্বর নামে পরিচিত হন। এস্কাইলাস * বলেন যে,—কেবল স্বর্ণ বলিয়া নহে, সকল ধাতুই প্রমিথিউস † কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সাইপ্রাস দ্বীপের তাম্র-খনি-সমূহ

---

* এস্কাইলাস (Æschylus)—এথেন্সের একজন বিখ্যাত কবি। বিয়োগান্ত কাব্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। কথিত হয়, তিনি ৪১৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এস্কাইলাসের কয়েকখানি গ্রন্থ ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু-বিবরণ বড়ই আশ্চর্য্যজনক। একদিন এস্কাইলাস মাঠের মধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন। এমন সময়, আকাশ হইতে একটী কচ্ছপ সবেগে তাঁহার মস্তকের উপর পতিত হয়। তাহাতেই তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। একটী উড্ডীয়মান ঈগল পক্ষীর মুখ হইতে স্খলিত হইয়া কচ্ছপটী তাঁহার মস্তকের উপর পতিত হইয়াছিল।

† প্রমিথিউস (Prometheus)—গ্রীক-দিগের দেবতা-বিশেষ। জিয়সের রাজত্বকালে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম—জ্যাপেটাস, মাতার নাম—ক্লাইমেন। আটলাস প্রভৃতি ইঁহার তিন ভ্রাতা। হেসিয়ড বলেন,—তিনি মেকনের রাজপুত্র। তাঁহার স্ত্রীর নাম—ক্লেমেন এবং পুত্রের নাম ডিউকেলিয়ন। দুই টুকরা কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, প্রমিথিউস প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মনুষ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া জুপিটার পৃথিবী হইতে অগ্নি হরণ করেন। প্রমিথিউস স্বর্গ হইতে সেই অগ্নি আনিয়া মনুষ্যদিগকে প্রদান করেন। এই বিবাদ-সূত্রে জুপিটারের আদেশে ভল্কান কর্ত্তৃক প্রমিথিউস ককেশাশ পর্ব্বতে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ত্রিশ সহস্র বৎসর তাঁহাকে সেই অবস্থায় থাকিতে হয়। সেই সময়ে একটী ঈগল-পক্ষী আসিয়া প্রত্যহ তাঁহার যকৃৎ ভক্ষণ করিত। সেই ঈগল-পক্ষীকে নিহত করিয়া হারকিউলিস তাঁহার উদ্ধার-সাধন করেন।

এপ্রিওপার পুত্র সিনাইস কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ক্রীট-দ্বীপের লৌহ-খনি-সমূহ ডাক্টিলি ইডাই কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের বহু প্রাচীন গ্রন্থে প্রকাশ,—ক্যাসিটারাইডস্ দ্বীপের লৌহখনি হইতে মেডাক্রাইটাস প্রথমে টিন উত্তোলন করেন। খনি হইতে খনিজ-পদার্থ উত্তোলনের তিনিই পথ-প্রদর্শক বলিয়া পরিচিত। খনিজ-পদার্থের এবম্প্রকার আবিষ্কারের বিষয় আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন,—এ সকল আবিষ্কার দৈবাৎ সংঘটিত হইয়াছিল। ইঁহারা কেহই বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে খনিজ-পদার্থ আবিষ্কারের বা উদ্ধারের জন্য আয়াস স্বীকার করেন নাই। এইরূপ-ভাবে খনিজ-পদার্থের আকস্মিক আবিষ্কার এখনও সময় সময় ঘটিয়া থাকে। কোথাও নদী-প্রবাহে তটভূমি ভঙ্গ হইলে, কোথাও সমুদ্র-তরঙ্গে পাহাড় চূর্ণ হইলে, কোথাও বা আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদ্গিরণের প্রভাবে, সময় সময় খনিজ-পদার্থের অস্তিত্ব আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে।' বোয়েক প্রণীত 'পাবলিক একনমি অব এথেন্স' নামক অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তকের পরিশিষ্টে লরেনের রৌপ্যখনি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। প্রাচীনকালে ইউরোপে খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে কোথায় কিরূপ অনুসন্ধান চলিয়াছিল, তাহার কতকটা আভাস সেই গ্রন্থে পাওয়া যায়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্স-রাজ্যে কতকগুলি খনি ছিল। তন্মধ্যে লরেনের রৌপ্য-খনি বিশেষ প্রসিদ্ধ। সেই রৌপ্য-খনির আয়ে এথেন্সের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এথেন্সের তাৎকালিক সেনাপতি ও রাজনীতিক থেমিষ্টোক্লস্ সেই রৌপ্য-খনির আয়ের সাহায্যে নৌ-সেনা-বিভাগের সম্পূর্ণরূপ সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন। সেই খনি সাত মাইল বিস্তৃত ছিল। সক্রেটিস ও জেনোফেনের সময়ে সেই খনির আয় কমিয়া যায়। ষ্ট্রাবোর অভ্যুদয় সময়ে সেই খনির কাজ একেবারে বন্ধ হয়। এথেন্স-রাজ্যের খনি-সমূহে প্রধানতঃ রৌপ্য, সীসক, দস্তা এবং তাম্র উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই সকল খনিতে স্বর্ণ উদ্ভূত হওয়ার সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। থোরিকাসের খনিতে সময় সময় মরকত মণি পাওয়া যাইত। সেই খনিতে সিন্দুর উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ খনি হইতে আর এক পদার্থ বাহির হইয়াছিল; সে পদার্থ রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। থ্রেসের এবং থেসোসের খনিতে সর্ব্বপ্রথম স্বর্ণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ফিনিসীয়গণ সেই স্বর্ণ-খনির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। থেসোস-প্রদেশের অন্তর্গত স্কাপথাইল নামক স্থানের খনিতেও প্রচুর স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছিল। রোম-সাম্রাজ্যের মধ্যে কয়েকটী তাম্র-খনি আবিষ্কৃত হয় বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ইটালিতেই প্রথম তাম্রের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় তামার চাকতি অনেক দিন পর্য্যন্ত ইটালীতে বিনিময়ের মধ্যস্থ-রূপে প্রচলিত ছিল। খনিজ-পদার্থের আবিষ্কারে স্পেন-দেশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঐ প্রদেশের খনি হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য উৎপন্ন হইত। আষ্টুরিয়াস, গ্যালিসিয়া, লুসিটানিয়ার খনি হইতে প্রতি বৎসর বিশ হাজার পাউণ্ড (পাউণ্ড প্রায় আধ সের) ওজনের সুবর্ণ উত্তোলিত হইত। অত্যধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ রৌপ্যও স্পেন-দেশের খনিতে জন্মিত। স্পেনের স্বর্ণ-রৌপ্যাদিতে কার্থেজ ও রোম ধনবান হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত হয়, বেলবেলের একটী মাত্র খনি হইতে হানিবল * এক দিনে তিন শত পাউণ্ড

* হানিবল (Hannibal)—প্রাচীন কার্থেজ-রাজ্যের স্বনাম-প্রসিদ্ধ সেনাপতি। তাঁহার পিতার

রৌপ্য উত্তোলন করিয়াছিলেন। স্পেন যখন সম্পূর্ণরূপে রোম-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়, সেই সময় নয় বৎসরের মধ্যে রোমীয়গণ এক লক্ষ দশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ বৎসরে প্রায় বার হাজার চারি শত পাউণ্ড পরিমাণ রৌপ্য স্পেন হইতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো বলেন,—স্পেনের অন্তর্গত টুরডেটানিয়ার খনিতে যে পরিমাণ যত উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র প্রাপ্ত হওয়া যাইত, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তাহার তুলনা নাই। *

পাশ্চাত্য-দেশে খনিজ-বিদ্যার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যেরূপ-ভাবে আলোচনা হইয়া থাকে, আর তাহার যে আভাস আমরা প্রদান করিলাম, তন্মধ্যে কোথাও প্রাচীন ভারতবর্ষের নাম উল্লিখিত হয় নাই। অথচ, খনিজ-বিদ্যা বিষয়ে ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ করিলেও চমকিত হইতে হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে সর্ব্ববিধ খনিজ-পদার্থেরই ব্যবহার প্রচলিত ছিল। স্বর্ণ, রৌপ, লৌহ, তাম্র, বঙ্গ প্রভৃতি যে ধাতু যে প্রকার ব্যবহারের প্রয়োজন, প্রাচীন ভারতে তাহার সর্ব্ববিধ নিদর্শনই দেদীপ্যমান। খনিগর্ভজাত হীরকাদি রত্ন-সমূহ প্রাচীন ভারতবর্ষে যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অনুসন্ধানে দেখিতে পাই, ধাতু ও মূল্যবান রত্ন-সমূহের ব্যবহার স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। স্বর্ণালঙ্কার কত কাল হইতে প্রচলিত, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বর্ণালঙ্কার-ব্যবহারের এবং সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনের উল্লেখ আছে। প্রথম মণ্ডলে ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্তের অষ্টম ঋকে ইন্দ্র-দেবতার স্তোত্রে হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলিতেছেন,—

প্রাচীন-ভারতে খনিজ-বিদ্যা।

"চক্রণাসঃ পরীণহং পৃথিব্যা হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানাঃ।
ন হিন্বানাসস্তিতিরুস্ত ইন্দ্রং পরিস্পশো অদধাৎ সূর্য্যেণ॥"

অর্থাৎ,—মণিখচিত সুবর্ণময় আভরণে বিভূষিত হইয়া বৃত্রের অনুচরগণ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছিল; তাহারা বিপুল বেগশালী হইলেও রণোদ্যত ইন্দ্রকে পরাভব করিতে পারে নাই। ইন্দ্রদেব সূর্য্যকে ব্যবধান রাখিয়া বৃত্রানুচরগণকে ব্যাহত করিয়া-

---

নাম—হামিল্কার বার্কাস। তাঁহার জন্ম—২৪৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে। তাঁহার জন্ম সময়ে রোমের সহিত কার্থেজের যুদ্ধ চলিতেছিল। সেই যুদ্ধ—'পিউনিক যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। বাল্যকালেই পিতার সহিত হানিবল যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইতেন। আঠার বৎসর বয়সের সময় (২২৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতৃবিয়োগ হইলেও হানিবল রোম-সাম্রাজ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাঙ্মুখ হন নাই। এমন কি, তাঁহার রণনৈপুণ্যে রোম-সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি প্রকম্পিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার স্বদেশবাসীরা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সহায়তা করেন নাই; পরন্ত, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন। আর সেই জন্যই হানিবল রোম-সাম্রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। ২০১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আফ্রিকায় অন্তর্গত যামা নামক স্থানের যুদ্ধে হানিবলের পতনকাল উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে তিনি রোমীয় সেনাপতি সিপিওর নিকট পরাজিত হন। এই যুদ্ধের পর সর্ব্বস্ব হারাইয়া, হানিবল, সিরীয়ার রাজা আণ্টিওকাসের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু আণ্টিওকাসও যুদ্ধে পরাজিত হন (১৯০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে)। তাঁহার সহিত রোমের সন্ধি হয়। সন্ধি-সর্ত্তে তিনি হানিবলকে রোমের হস্তে প্রদান করিতে সম্মত হন। এই অবস্থায় শত্রুহস্তে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন।

* Boeckh, *Public Economy of Athens*; Niebuhr, *History of Rome*; Pliny, *Historia Naturalis*; Strabo, *Geographia*.

অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের অর্থ-নির্দ্ধারণে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ২৪৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বের বিংশ বর্ষে, এই লিপি উৎকীর্ণ হয়।

"দেবান পিযেন পিযদসিন লাজিন বীসতিবসাভিসিতেন অতন আগাচ মহীয়িতে হিদবুধে জাতে (,)) সক্যমুনীতি সিলাবিগডভীচা কালাপিত সিলাথভে চ উসপাপিতে হিদ ভগবং জাতেতি লংমিনিগামে উবলিকে কটে অঠভাগিযে চ।"

সংস্কৃত অনুবাদ।—"দেবপ্রিয়েন প্রিয়দর্শিনা রাজ্ঞা বিংশতিবর্ষাভিষিক্তেন আত্মনা আগত্য মহিতং ইহ বুদ্ধঃ জাতঃ শাক্যমুনিরিতি। শিলাফলকং চ কারিতং শিলাস্তম্ভাঃ চ উচ্ছ্রাপিতাঃ। অত্র ভগবান জাতঃ ইতি লুম্বিনীগ্রামঃ অপবলিকঃ কৃতঃ অষ্টভাগী চ।"

মর্ম্মার্থ।—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের বিংশতি বর্ষে এই স্থানে স্বয়ং আগমন করিয়া এই স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থানে শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্য তিনি এখানে একটি প্রস্তর-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি একটী অশ্বমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কারণ, ভগবান বুদ্ধদেব এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। (ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মস্থান বলিয়া) এই লুম্বিনী গ্রাম নিষ্কর প্রদত্ত হইল, আর ইহার উৎপন্ন শস্যের মাত্র অষ্টম ভাগ রাজ-কর-রূপে নির্দ্ধারিত করা গেল। *

নিগ্লীভ-স্তম্ভলিপি।

বস্তী-জেলার উত্তরাংশে, নেপালের অন্তর্গত তরাই প্রদেশে, নিগ্লীভা-পল্লীর সন্নিকটে, নিগ্লীভা (নাগাইল) সাগরের পশ্চিম তীরে, এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্তম্ভের শিখর-দেশ নষ্ট হইয়াছে। স্তম্ভের লিপি-সমূহ অস্পষ্ট। লিপিতে গৌতম-বুদ্ধের পূর্ব্বে বিভিন্ন কল্পে বিভিন্ন বুদ্ধের আবির্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-গ্রন্থ-পত্রাদিতে চব্বিশ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে। তাঁহাদের মধ্যে কনকমুনি নামা বুদ্ধ অন্যতম। তীর্থপর্য্যটনকালে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক কনকমুনি বুদ্ধের স্তূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এই লিপিতে তদ্বিষয় সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে।

দেবানং পিযেন পিযদসিন লাজিন 'চোদসবসা(ভিসিতেন) বুধস কোনাকমনস থুবে দুতিযং বঢিতে [বিসতিব]সাভিসিতেন চ অতন আগাচ মহীযিতে (সিলাথবে চ উস) পাপিতে (।)"

সংস্কৃত অনুবাদ।—"দেবপ্রিয়েণ প্রিয়দর্শিনা রাজ্ঞা চতুর্দ্দশবর্ষাভিষিক্তেন বুদ্ধস্য কনকমুনেঃ স্তম্ভঃ দ্বিতীয়ং বর্দ্ধিতঃ। (বিংশতিব)র্ষাভিষিক্তেন চ আত্মনা আগত্য মহিতঃ। (শিলাস্তম্ভঃ চ উচ্ছ্রাপিতঃ।"

---

* প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন প্রকার রাজকর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। স্মৃতি গ্রন্থাদিতে ষষ্ঠভাগ রাজার প্রাপ্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ঐ রাজকর চতুর্থ ভাগ নির্দ্দিষ্ট হয়। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থপত্রে এবং চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে তদ্বিষয় উল্লিখিত আছে। ষষ্ঠ ভাগের পরিবর্ত্তে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক রাজকর অষ্টম ভাগ নির্দ্ধারিত করেন।

মর্ম্মার্থ।—রাজ্যাভিষেকের চতুর্দ্দশ বর্ষে দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী কনকমুনি বুদ্ধের স্তূপ দ্বিতীয় বার সংস্কৃত করিলেন। অভিষেকের বিংশতি বর্ষে স্বয়ং আগমন করিয়া (দেবপ্রিয়) সেই স্তূপের পূজা করিয়া তৎসান্নিধ্যে প্রস্তর-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন।

* * *

কৌশাম্বী-লিপি।

এলাহাবাদ স্তম্ভগাত্রে এই লিপি উৎকীর্ণ আছে। এ লিপির পাঠ অসম্পূর্ণ। সাঁচীর স্তম্ভে এই লিপির স্বতন্ত্র এক পাঠ দৃষ্ট হয়। শোভাযাত্রার জন্য বৌদ্ধ-সংঘকে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক একটী রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, সে লিপিতে তদ্বিষয় উল্লিখিত আছে।

[দেবানং পি]যে আনপযতি কোসংবিয মহামতা (রমরি)...সংঘসি নিল-হিযো ই......ঠতিভিতি ভংতি নিত...চি ব...পিনং ধপযিত অত অঠ অং:সযি।"

মর্ম্মার্থ।—কৌশাম্বীর মহামাত্যগণের প্রতি দেবগণের প্রিয় এই আদেশ করিতেছেন যে, কেহ সঙ্ঘের নিয়ম যেন লঙ্ঘন না করেন। যিনি সংঘের মধ্যে ভেদভাব আনয়ন করিবেন, তিনি শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য হইবেন এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের আবাস-স্থানের সন্নিকটে বাস করিতে পারিবেন না,—তিনি সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত হইবেন।

* * *

দেবী-লিপি।

এই লিপি অভিষেকের অষ্টাবিংশ বর্ষে উৎকীর্ণ হয়। দ্বিতীয়া মহিষী কৌরুবকীর দানের বিষয় এই লিপিতে সন্নিবদ্ধ আছে। মহিষী-প্রবর্ত্তিত দানধর্ম্মাচরণ যাহাতে সুচারুরূপে সমাহিত হয়, তদ্বিষয়ক আদেশ-পরম্পরা এই লিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

দেবানংপিযসা বচনেন সবত মহামতা বতবিয়া (।) এ হেত দুতিযাযে দেবিযে দানে অংবাবডিকা বা আলমে ব দান গ[হে] বা এ বাপি অংনে কিছি গনীযতি তাযে দেবিযে সে নানি সব দুতিযাযে দেবিযে তী তিবলমাত কালুবাকিযে (।)

মর্ম্মার্থ।—দেবপ্রিয়ের আদেশে (রাজ্যের) সর্ব্বত্র মহামাত্যগণকে এইরূপ আদেশ করা হউক যে, দ্বিতীয়া দেবীর দানধর্ম্ম অর্থাৎ আম্রকানন, প্রমোদ-উদ্যান, দানশালা এবং অপরাপর যাহা কিছু তিনি দান করিয়াছেন, তৎসমুদায় সেই দ্বিতীয়া মহিষীর দান মধ্যে গণ্য হইবে, আর তাহা তাঁহার (দ্বিতীয়া মহিষীর) নামানুসারেই অভিহিত হইবে। পুণ্যার্জ্জনের জন্য এতৎসমুদায় তিবরমাতা কারুবকীর অনুষ্ঠান।

* * *

বরাবর গুহা-লিপি।

গয়ার নিকটবর্ত্তী বরাবর গুহায় এই লিপি খোদিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী আজীবকদিগের জন্য রাজচক্রবর্ত্তী অশোক এই গুহা প্রদান করিয়াছিলেন।

১। লাজিনা পিযদসিনা দুবাডসব[সাভিসিতেনা] ই(যং) নি(গো)হন কুভা দি[না] আজিবিকেহি।

২। লাজিনা পিযদসিনা দুবাডসবসাভিসিতেনা ইযং কুভা খলটিকপবতসি দিনা [আজি]বিকেহি।

৩। লা[জা] পিযদসি এ[কু] ন [বি] সতিবসাভিসিতে [নামে অদমঠা]৷ তিম ইযং কুভা সুপিযে খলতিপবত দিনা [।]

মর্ম্মার্থ।—(১) অভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এই ন্যগ্রোধ গুহা আজীবকদিগকে দান করিলেন, (২) অভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী খলটিক গিরিগুহা আজীবকদিগকে দান করিলেন। (৩) অভিষেকের ঊনবিংশ বর্ষে দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী রাজা খলতি পর্ব্বতের সুলিয়া নামক গিরিগুহা আজীবকদিগকে দান করিলেন। যাবৎ চন্দ্র দিবাকর, তাঁহারা উহা ভোগ করিবেন।

* * *

উপসংহার।

মধ্যযুগে পাশ্চাত্য-জগতে সার্লেমেনের যশঃজ্যোতি খ্যাতি-প্রতিপত্তি যেমন বিশ্ব-বিশ্রুত হইয়াছিল, বৌদ্ধ-প্রাধান্য-সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের কীর্ত্তিস্মৃতি যশঃ-খ্যাতির শুভ্র জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ সেইরূপ আলোকিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের সার্লেমেনের ইতিহাস যেরূপ বিবিধ উপকথায় পরিপূর্ণ, বৌদ্ধযুগের অশোকের ইতিহাসও সেইরূপ বিবিধ আখ্যায়িকায় সমাচ্ছন্ন। এরূপ সাদৃশ্য সত্ত্বেও উভয় আখ্যায়িকার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্যের সার্লেমেন, আলেকজাণ্ডার, আর্থার প্রভৃতির কীর্ত্তি-কাহিনীর অধিকাংশই উপকথা-সমূহে পরিপূর্ণ; আর উপাখ্যানের সে কল্পনা-জাল ভেদ করিয়া সত্য তথ্য নিষ্কাষণ করা বড়ই দুরূহ! কিন্তু অশোকের জীবনচরিত বিভিন্ন স্থলে উপকথায় পূর্ণ হইলেও, সে উপাখ্যানের মধ্যে কতকগুলি সত্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। উপাখ্যানের আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া সত্য তথ্য নিষ্কাষণ করাই প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য্য। কিন্তু অনেক সময় মৌর্য্যবংশের ইতিহাস লেখকগণ সমালোচনার প্রণালীবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া থাকেন এবং কল্পনা-বহুল আখ্যায়িকার সহিত লিপি-সমূহের তুলনায় সমালোচনা করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হন। যাহা হউক, অশোকের অনুশাসন-রাজিই যে তাঁহার অশেষ কীর্ত্তির নিদর্শন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বহুবিধ বিভিন্ন আখ্যায়িকার অবতারণা হইলেও লিপি-সমূহই যে তাঁহার রাজ্যের ও রাজত্বের যথার্থ ইতিহাস, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ-সমূহে অশোকের লিপির পরিচয় প্রদান করিয়াছি; এক্ষণে তাহাদের সার নিষ্কাষণ করিয়া দেখা যাউক, লিপি-সমূহে অশোকের ধর্ম্মবিধি প্রচার ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কি পরিচয় পাইতে পারি। লিপি-সমূহের অনুশীলনে যে ভাব উপলব্ধি হয়, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল; যথা,—(১) জীবের জীবন পবিত্র সুতরাং প্রাণিহিংসা করা উচিত নয়, প্রথম গিরি-লিপিতে এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইয়াছে। আর বলা হইয়াছে,—উৎসবে বা যজ্ঞকার্য্যে কোনও পশু বধ করিবে না। (২) জনহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানের বিষয় দ্বিতীয় গিরি-লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কূপ খনন, ভেষজাগার-স্থাপন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির চিকিৎসা-ব্যবস্থা, রাজপথে বৃক্ষাদি-রোপণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠান যেরূপ আপনার

রাজ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি পরকীয় রাজ্যেও—যথা, চোল, পাণ্ড্য, কেরল, সিংহল, সতীয়পুত্র প্রভৃতি রাজ্যে এবং গ্রীকরাজ এণ্টিওকাস থিয়সের রাজ্যে ও তাঁহার অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য-সমূহে—যাহাতে সে বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তৎপক্ষে অশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন। (৩) ধর্ম্মবিধি প্রচার জন্য ধর্ম্মমাহামাত্যগণ যে ভাবে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অনুসাম্যায়নে বহির্গত হইবেন, তৃতীয় গিরিলিপিতে তাহা লিপিবদ্ধ আছে। (৪) চতুর্থ গিরিলিপি রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ধর্ম্মব্যাখ্যায় বিনিযুক্ত। ধর্ম্মের মহিমা এ লিপিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। (৫) পঞ্চম গিরিলিপি মহামাত্যগণের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে প্রযুক্ত। লিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায়,—রাজ্যের অভ্যন্তরে যবন, কাম্বোজ, গান্ধার, রাষ্ট্রিক, পিটিনক প্রভৃতি সীমান্ত-রাজগণ যাহাতে দেবপ্রিয়ের ধর্ম্মোপদেশ এবং ধর্ম্ম-নীতির অনুসরণ করে, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তজ্জন্য মহামাত্যগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (৬) ষষ্ঠ গিরিলিপিতে তাঁহার কার্য্যতৎপরতার বিষয় পরিবর্ণিত। তিনি যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকিবেন—অন্তঃপুরে, শয়নে, নিদ্রায়, জাগরণে, আহারে, উপবেশনে, শিকারকালে, প্রমোদ-উদ্যানে, শয্যাগৃহে, বিরাম-কক্ষে—যেখানে যে অবস্থায়ই থাকিবেন, রাজদূতগণ সেখানেই তাঁহাকে প্রজার দুঃখ এবং অভিযোগের বিষয় জ্ঞাপন করিবে। তাহাতে তাহারা কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিবে না; পরন্তু তাহারা আবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি অতি সত্বর যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত করিবে। অশোক সকলকেই আদেশ করেন,—তিনি প্রজাসাধারণের হিতকর সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতেই প্রস্তুত রহিয়াছেন। তাঁহাতে তৎপরতার ত্রুটি ছিল না; তথাপি তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন,—'আমার কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটি হইতেছে। অধিকতর তৎপরতার সহিত কার্য্য করিতে পারিলে বিশেষ সন্তোষের কারণ হইত।' (৭) ইন্দ্রিয়-সংযম, চিত্তের নির্ম্মলতা-সাধন, কৃতজ্ঞতা, দান, বিশ্বাস প্রভৃতি যে ধর্ম্ম-সাধনের মুখ্য উপায়,—সপ্তম গিরিলিপিতে তাহা সুপরিব্যক্ত। (৮) এ লিপি—তীর্থ-পর্য্যটনের মাহাত্ম্যমূলক। পূর্ব্বে প্রমোদ-বিহার, মৃগয়া প্রভৃতি উপলক্ষে বিদেশ-গমনের প্রথা ছিল; রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তৎপরিবর্ত্তে তীর্থ-ভ্রমণের প্রাধান্য খ্যাপন করেন। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর, রাজ্য-লাভের একাদশ বর্ষে, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর সাধনার ফলে তীর্থ-পর্য্যটনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হয়। তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া তিনি বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। তদুপলক্ষে নানা স্থানে স্তুপাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণগণকে এবং ভিক্ষুদিগকে তিনি প্রচুর পরিমাণে অর্থ-সম্পৎ দান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই বিবিধ লিপি এবং অনুশাসন প্রচারিত হইতে থাকে। (৯) নবম গিরিলিপিতে মঙ্গলানুষ্ঠানের বিষয় পরিকীর্ত্তিত। প্রকৃত মঙ্গলানুষ্ঠানের সংজ্ঞা এই লিপিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মদান, ধর্ম্মবিধির অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাহাত্ম্য এই লিপিতে সুপরিব্যক্ত। (১০) প্রকৃতি-পুঞ্জের ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধনই যে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ধর্ম্মবিধির মূল্য লক্ষ্য ছিল, এই নবম গিরিলিপিতে তাহার উল্লেখ আছে। কি উপায়ে প্রকৃতিপুঞ্জের সুখসাধন সম্ভবপর, কি ভাবে তাহাদের

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, দশম গিরিলিপিতে সেই প্রচেষ্টারই পরিচয় পাই। (১১) প্রকৃত দানের সংজ্ঞা নির্দ্দেশে ধর্ম্মদানের শ্রেষ্ঠত্ব, একাদশ গিরিলিপিতে ব্যক্ত রহিয়াছে। ধর্ম্মবিধি-প্রচারে যে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, একাদশ গিরিলিপিতে সেই বিষয় বিঘোষিত হইয়াছে। (১২) দ্বাদশ লিপিতে অশোকের প্রশান্ত হৃদয়ের উদারতা সুপরিব্যক্ত। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সদয়-ব্যবহার এবং সকলের প্রতি সমচিত্ততা যে প্রতিষ্ঠা-লাভের মূলীভূত, দ্বাদশ গিরি-লিপিতে তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান। অশোক বলিয়াছেন,—'সমবায় সাধু। স্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা-খ্যাপনোদ্দেশ্যে পরধর্ম্মের নিন্দা করিলে, স্বধর্ম্মেরও গ্লানি উপস্থিত হয়; আর সেরূপ গ্লানিজনক আচরণ স্বসম্প্রদায়েরও হানিজনক।' (১৩) কলিঙ্গ বিজয় এবং ধর্ম্মগ্রহণের বিষয়, এই অনুশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে। রাজত্বের নবম বৎসরে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক কলিঙ্গদেশ জয় করেন। কলিঙ্গের সে যুদ্ধে অসংখ্য প্রাণী জীবনদান করে। কলিঙ্গের সে হৃদয়ভেদী দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া অশোকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তদবধি 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' প্রচারে উদ্‌বুদ্ধ হন। ফলে, তিনি মৈত্রী ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। (১৪) চতুর্দ্দশ গিরিলিপিতে পূর্ব্বানুস্মৃতি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব লিপিতে যে সকল বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার কোনটীর বিস্তৃতির এবং কোনটীর সংক্ষিপ্ততার বিষয় এই লিপিতে উল্লিখিত। ফলতঃ, ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যেই রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের লিপি-সমূহ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার হয়; তদুপলক্ষে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি নিজে যে আলোক-রশ্মি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, আবালবৃদ্ধ নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে সেই আলোক বিস্তারের জন্য তাঁহার প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল। সেই আকাঙ্ক্ষার সাফল্য-কল্পেই তাঁহার লিপি-সমূহের সৃষ্টি। লিপি-সমূহ তাঁহার ধর্ম্মোপাসনার শুভ ফল। প্রতি জনের হৃদয়ে হৃদয়ে তাহা অঙ্কনের জন্যই প্রস্তর ও স্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ হইয়া অনুশাসনরাজি সাধারণের গতিবিধির ও সম্মিলনের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন বিদ্যাশিক্ষার বহুল প্রচার ছিল; তাই প্রাদেশিক ভাষায়, চলিত কথায়, লিপিসমূহ নিবদ্ধ হইয়াছিল। প্রজাসাধারণ যাহাতে সহজে তাঁহার অনুশাসনের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে লিপি-সমূহে নিরলঙ্কার প্রাদেশিক ভাষার অবতারণা। ফলতঃ, রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোকের সকল অনুষ্ঠানই জনহিত-সাধনকল্পে নিয়োজিত হইয়াছিল। লোকচরিত্র সংগঠন, প্রকৃতিপুঞ্জের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মঙ্গল-বিধান প্রভৃতি বিবিধ বিধানের প্রবর্ত্তনায় জগতের হিতসাধনে ব্রতী হইয়া, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যে শ্রেষ্ঠ আদর্শের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা হয় না।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভাষা ও ভাস্কর্য্য।

[লিপিতে ধর্ম্মের প্রভাব,—উত্থানে ও পতনে ধর্ম্মের বিজয় বিঘোষিত;—স্তূপ-সমূহে তাহার নিদর্শন,—স্তূপ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য,—পুণ্যাত্মগণের দেহাবশেষ-রক্ষার প্রচেষ্টায় স্তূপের উৎপত্তি,—ভিল্‌সা, সাঁচী প্রভৃতি স্তূপ,—দন্তপুরের উৎপত্তি প্রসঙ্গ;—অশোক-লিপির প্রাচীনত্ব,—বাইবেলে লিপির প্রসঙ্গ,—বর্ণমালা-প্রসঙ্গে লিপির প্রাচীনত্ব;—ভাষা, লিপি ও বর্ণমালা প্রভৃতি,—বর্ণমালার প্রাচীনত্ব,—পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের মত,—পাশ্চাত্য মতে ভারতীয় বর্ণমালায় বৈদেশিক প্রভাব,—ভারতের বর্ণমালার মৌলিকত্ব খ্যাপন;—বর্ণমালার আদিমত্ব,—ফিনিসীয়, সেমিটিক, গ্রীক প্রভৃতি বর্ণমালার প্রসঙ্গ,—ভারতীয় বর্ণমালা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-দেশের অভিজ্ঞতা;—অশোকাক্ষরের মৌলিকত্ব বিষয়ে আলোচনা,—তৎসম্পর্কে বৈদেশিক সংস্রব-প্রসঙ্গ,—পাশ্চাত্য অভিমত;—বাণিজ্য-প্রসঙ্গে বর্ণমালা-প্রসঙ্গ;—লিপির ভাষা ও বর্ণমালা;—অশোকাক্ষরের মৌলিকত্ব বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা,—বর্ণমালা সম্পর্কে ভারত কাহারও নিকট ঋণী নহে,—তৎসম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ব-বিদগণের অভিমত;—অশোক-লিপিতে পারস্যের প্রভাব,—দারায়ুসের লিপির দৃষ্টান্ত;—মৌর্য্য-রাজত্বে ভাস্কর্য্যের পরিচয়;—স্তূপ-বিহারাদিতে তাহার দৃষ্টান্ত;—ভিল্‌সা, সাঁচী, ভারহুত প্রভৃতি স্তূপে আদর্শ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন,—স্তম্ভাদির ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্প,—রেলিং প্রভৃতি,—ভারতীয় স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের মৌলিকত্ব;—প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রশিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবিধ বক্তব্য।]

লিপিতে ধর্ম্মের প্রভাব।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত-ভ্রমণে আসিয়া লিখিয়াছিলেন,—'পাটলিপুত্রের সে গৌরব আর নাই। রাজপ্রাসাদ পরিত্যক্ত, প্রকোষ্ঠ জনমানবশূন্য, অট্টালিকা-সমূহ ধূলিধূসরিত। সারি সারি ভগ্নায়মান অট্টালিকা-শ্রেণী দণ্ডায়মান থাকিয়া পথিকের প্রাণে অতীত-গৌরবের অনন্ত-মহিমা জাগাইয়া তুলিতেছে মাত্র। একদিন যে প্রাসাদ—যে তোরণ দেবশিল্পিগণ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছিল,—যে তোরণের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন জন্য বিচিত্র-বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তররাজি আহরিত হইয়াছিল, কালের কঠোর কশাঘাতে আজ সে প্রাসাদ—সে তোরণদ্বার—সে প্রকোষ্ঠ ধ্বংসমুখে নিপতিত। আলঙ্কারিক শিল্প-চাতুর্য্যে—চিত্র-বিচিত্র কারুকার্য্যে, যে প্রসাদের অনুপম সৌন্দর্য্য একদিন জগৎকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল, অধুনা-পরিত্যক্ত সে হর্ম্ম্য-রাজির সে শিল্প-সৌন্দর্য্য এখন ধ্বংসমুখে নিপতিত।' সে শিল্পের সে সৌন্দর্য্য-সাধন, সে কারুকার্য্যের সে উৎকর্ষ-বিধান, মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে।'*

---

* ফা-হিয়ানের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—'The royal palace and halls in the midst of the city (Pataliputra), which exist now as of old, were all made by spirits which he employed, and which piled up stones, reared the walls and gates, and executed the elegant carving and inlaid sculpture work, in a way which no human hands of this world could accomplish."—Chap. XXVII. Legge's translation.

ফা-হিয়ানের প্রায় দুই শত বৎসর পরে পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। সে সময়ে মৌর্য্য-রাজধানী পাটলিপুত্র ধ্বংসমুখে নিপতিত, জনমানবহীন—মরু-সদৃশ পরিত্যক্ত। তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত তখন বিদ্যমান ছিল না। সে অভ্রভেদী প্রাসাদ চূড়া, সে অশেষ জাঁকজমকপূর্ণ চিত্র-বিচিত্র রাজপ্রাসাদ, তখন গঙ্গা ও শোণ নদীর বালুকাগর্ভে নিমজ্জিত। পাটলিপুত্রের এই উত্থান-পতনের—তাহার এই গৌরব-পদস্খলনের কারণ কি? সে উত্থান-পতন—সে গৌরব-পদস্খলনের মধ্যেও সেই একই শক্তির বিচিত্র লীলা পরিলক্ষিত হয় না কি? অন্ধকারের পর আলোক, আলোকের পর অন্ধকার,—ইহা যেমন প্রকৃতির বিচিত্র লীলা,—বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র-বিধান; পতনে ও অভ্যুত্থানেও সেই বিচিত্র শক্তির বিচিত্র লীলাই প্রত্যক্ষীভূত হয়। চন্দ্রগুপ্তের বিপুল আয়াসের ফলে মগধ-সাম্রাজ্যে মৌর্য্য-রাজগণের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহার লোকান্তরের পর তৎপৌত্র অশোকের রাজত্বকালে সে প্রতিষ্ঠা অশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন কেহ কি মনে করিতে পারিয়াছিল, সে প্রতিষ্ঠার এইরূপ পরিণতি সংঘটিত হইবে? তবে কেন এমন হইল? বলিয়াছি তো—ইহাও সেই বিচিত্র শক্তির বিচিত্র লীলা; বলিয়াছি তো—সে ইতিহাসও ধর্ম্মের ইতিহাস! ভারতের সকল কালের সকল যুগের ইতিহাসই ধর্ম্মের সহিত সংস্রবযুক্ত। ধর্ম্মের পতনের ও ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সে ইতিহাসেরও পতন এবং অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ে জৈনধর্ম্মের যে উন্মাদনা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারই ফলে তিনি সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায়ই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। তাঁহার পুত্র বিন্দুসারও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণে পিতৃকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাই তাঁহার রাজত্বকালেও মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার লাঘব হয় নাই। কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ধর্ম্মানুরাগিতায় ফলে সে প্রতিষ্ঠা অশেষ পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মের সাধনায় ব্রতী হইয়া জীবহিতসাধনের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। ধর্ম্মের গ্লানি-নিবারণে ধর্ম্ম-সংস্থাপনে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কীর্ত্তি-স্মৃতি চিরবিদ্যমান রহিয়াছে। অশোকের বংশধরগণ পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে তাদৃশ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন নাই। তাই তাঁহাদের পতন সঙ্ঘটিত হইল। পতনের ও অভ্যুত্থানের ইতিবৃত্তে ধর্ম্মশক্তির এই বিচিত্র ক্রিয়া সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের লিপি-সমূহে ধর্ম্মের সেই অপূর্ব্ব প্রভাব সুপ্রকটিত রহিয়াছে।

লিপি এবং অনুশাসন ভিন্ন স্তূপ-সমূহেও এই ভাব পূর্ণ প্রকটিত। 'অবদান' গ্রন্থে অশোকের চুরাশীতি সহস্র সংখ্যক স্তূপ নির্ম্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে। অশোকের প্রতিষ্ঠিত বিহার ও মন্দির সমূহ সকলই কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে; কিন্তু স্তূপ-সমূহের অধিকাংশ অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঐ সকল স্তূপের নির্ম্মাণ-কৌশল এতই মনোরম—এতই চিত্তাকর্ষক যে, অনেকে তৎসমুদায়কে দেবশিল্পী বিরচিত বলিয়া মনে করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যখন ভারতভ্রমণে আগমন করেন, তখন তিনি মাত্র আশীটি স্তূপ এবং বিহার দর্শন করিয়াছিলেন। তখন পাটলিপুত্র নগরের সে অশোকা-

স্তূপ।

রাম বা সে কুক্কুটারাম বিহার ধ্বংসমুখে নিপতিত হইয়াছিল। তখন হূনজাতির প্রবল আক্রমণে অশোকের প্রায় সকল কীর্ত্তি-স্তম্ভই বিনষ্ট হইয়াছিল। যে স্থাপত্য-কৌশল সন্দর্শন করিয়া, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ সকলেই তৎসমুদায়কে দেবদৈত্যের অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন,কালবশে বৈদেশিক আক্রমণের প্রবল অভিঘাতে, সে সকলই তখন বিনষ্ট হইয়াছিল। নালন্দা বিহার, লামা তারানাথের মতে, অশোকের অক্ষয় কীর্ত্তি এবং ভারতীয় শিল্পচাতুর্য্যের অন্যতম অপূর্ব্ব নিদর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং তাহার যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু সে বিহারেরও এখন অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। যাহা হউক, অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ-সমূহের যে কয়েকটীর অস্তিত্ব অধুনা সন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভিল্‌সা স্তূপ, সাঁচী, বারহুত, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানের স্তূপ-সমূহ মৌর্য্য-যুগের আদর্শ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। অধুনা যেমন সমাধির উপর প্রস্তর-নির্ম্মিত সুশোভন স্তম্ভ বা গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে, সে সময়ে স্তূপের অভ্যন্তরে মৃতব্যক্তির দেহাবশেষ রক্ষা করিবার প্রথা বর্ত্তমান ছিল। তবে সে প্রথা অধুনাতন কালের প্রথা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে সময় মাত্র বুদ্ধদেব বা তৎসদৃশ যোগিজনের দেহাবশেষ সংরক্ষিত হইত। সে সকল স্তূপে বৌদ্ধ-ইতিহাসের কোনও স্মরণীয় বিষয়ও অঙ্কিত থাকিত। বৌদ্ধযুগে যখনই কোনও মহাত্মার দেহত্যাগ ঘটিয়াছে, তখনই তাঁহার দন্ত, নখ বা চুল লোকে ভক্তি প্রণোদিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক স্তূপ-মধ্যে স্থাপন করিয়াছে। মহাপুরুষগণের স্মৃতি-রক্ষার্থ মানব-হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তির উৎস হইতেই স্তূপ-সমূহের সৃষ্টি-পুরিপুষ্টি। ভগবান গৌতম বুদ্ধ এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োবিংশতি বুদ্ধের অস্থিকঙ্কাল এবং দেহাবশেষ কেশ—নখ প্রভৃতি, লোকে বিশেষ পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিত। সেইজন্য, বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর, কুশীনগরের আটটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার দেহাস্থি বিতরিত হইয়াছিল। কথিত হয়, ঐ সকল স্থানে যে সকল স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহাই আদি স্তূপ। তৎপূর্ব্বে অন্য কোথাও কোনও স্তূপ নির্ম্মাণ প্রথা বিদ্যমান ছিল না। যাহা হউক, কুশীনগরের ঐ সকল স্তূপের চিহ্নমাত্র অধুনা দৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে, বুদ্ধদেবের একটী শ্বাপচ-দন্ত উড়িষ্যা-প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। যে স্থানে ঐ দন্ত স্থাপিত হয়, অনেকে অনুমান করেন, সেই স্থান দন্তপুর নামে অভিহিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সেই দন্তপুরের অবস্থান-নির্দ্দেশে বলিয়া থাকেন,—বর্ত্তমান পুরী সহরই দন্তপুর নামে পরিচিত ছিল; আর যে স্থানে বুদ্ধদেবের সেই দন্ত স্থাপিত হইয়াছিল, সেই স্থানেই বর্ত্তমান জগন্নাথদেবের মন্দির অবস্থিত। যাহা হউক, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালেই স্তূপ-নির্ম্মাণের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে আজি পর্য্যন্ত যতগুলি স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, কথিত হয়, সেই সকল স্তূপের মধ্যে ভিল্‌সা স্তূপই সর্ব্বপ্রধান। এই স্তূপ মধ্যভারতের ভূপাল-প্রদেশে অবস্থিত। তত্রত্য ভিল্‌সা সহরের নাম অনুসারে, স্তূপের নাম—ভিল্‌সা স্তূপ হইয়াছে। ঐ স্তূপের সন্নিকটে আরও ছয়টী স্তূপশ্রেণী বিদ্যমান। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বপ্রধান, সেইটী সাঞ্চী স্তূপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভাউদাজি অনুমান করেন,—'ঐ স্তম্ভ পঞ্চম শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছিল।' ডক্টর ফার্‌গুসন বলেন,—'গুপ্তবংশীয় রাজগণের রাজত্ব-কালে ৩৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, ঐ স্তম্ভ নির্ম্মিত হওয়া সম্ভবপর।' কিন্তু কেহই নিশ্চয় করিয়া কোনরূপ স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, খুব আধুনিক হইলেও ঐ স্তম্ভ ৪০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল—ইহাই স্বীকার করিয়া লইয়া, ফার্‌গুসন বলিয়াছেন,—'এত কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ এরূপভাবে লৌহ-স্তম্ভ প্রস্তুত করিতে পারিত, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ঐরূপ-ভাবে লৌহ-স্তম্ভ ঢালাই করিবার প্রণালী ইউরোপে অতি অল্প দিন মাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অধিক কি, এখনও ইউরোপ সচরাচর ঐরূপ ভাবের লৌহ-স্তম্ভ ঢালাই করিতে সমর্থ নহে।' * এ হিসাবেও, চৌদ্দ শত বৎসরের অধিক কাল জল-বায়ুর অত্যাচার সহ্য করিয়াও উহা অব্যাহত রহিয়াছে। দিল্লীর ঐ লৌহ-স্তম্ভের † ওজন দশ টন (টন=২৭॥০ মণ) নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দিল্লীর ঐ লৌহ-স্তম্ভ ভিন্ন পুরী-ধামে লোহার কড়ি, সোমনাথের মন্দিরে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত সিংহ-দ্বার, মুরভারে প্রাপ্ত ঢালাই-লৌহের চব্বিশ ফিট পরিমিত দীর্ঘ কামান প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতে ধাতব-পদার্থ ব্যবহারের পূর্ণ-পরিচয় প্রাপ্ত হই। কানারকের মন্দির-সংলগ্ন ‡ চাঁদনিতে যে লোহার কড়ি দৃষ্ট হয়, তাহাও বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন। একমাত্র লৌহ বলিয়া নহে; সকল ধাতুরই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার এ দেশ বহুকাল হইতে অবগত ছিল, সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়। তুলনায় এ সকল আধুনিক ঘটনা। সুতরাং এতৎসংক্রান্ত দুই একটী অতি প্রাচীন কালের বিবরণও উল্লেখ করিতেছি। 'কামসূত্র' গ্রন্থে বাৎসায়ন § চৌষট্টী কলার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই চৌষট্টী কলার মধ্যে একটী কলার নাম—'স্বর্ণ-রত্ন পরীক্ষা'; স্বর্ণ ও মণি-মাণিক্যের পরীক্ষা ও মূল্য নির্দ্ধারণ উহার অন্তর্ভুক্ত। অন্য একটী কলার নাম—'ধাতুবাদ'; রসায়ন ও ধাতু-ব্যবহার উহার অন্তর্নিবিষ্ট। আর একটী কলার নাম—'মণি-রাগাকরজ্ঞান;' মণি-মুক্তার রঞ্জিত করিবার প্রণালী এবং

* ডক্টর ফার্‌গুসন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাচীন স্থাপত্যের সন্ধান লন। সেই সন্ধানের ফলাফল তিনি তাঁহার 'ভারতীয় ও প্রাচ্য স্থাপত্য' সংক্রান্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভ সম্বন্ধে তাহার উক্তিতে প্রকাশ,—"Taking A. D. 400 as a mean date—and it certainly is not far from truth—it opens our eye to an unsuspected state of affairs to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron larger than any that have been forged even in Europe up to a very late date, and not frequently even now."—Dr. Fergusson's *History of Indian and Eastern Architecture, (1899).*

† 'এই স্তম্ভটী লৌহ-নির্ম্মিত কি না, তদ্বিষয়ে বহু ইংরেজের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। জেনারেল কানিংহাম তাই ইহার একটু একটু টুকরা কাটিয়া লইয়া দুই জন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়,—'লৌহ গলাইয়া ঐ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল।'

‡ কানারকের মন্দির, ফারগুসনের মতে, ৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দির এখন ভগ্নাবশেষে পরিণত; চাঁদনির কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তমান। কাড়গুলি একুশ হইতে তেইশ ফিট দীর্ঘ। কাড়ের উপরে প্রস্তরের ছাদ।

§ বাৎসায়ন ঋষি কতকাল পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না। পাণিনি (৪।১।৭৩) বাৎসায়নের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৪০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পাণিনির বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং পাণিনির কত পূর্ব্বে বাৎসায়ন বিদ্যমান ছিলেন, সহজেই বুঝা যায়।

খনি-বিষয়ক জ্ঞান-লাভের উপায় উঁহার বিষয়ীভূত। শুক্রাচার্য্য প্রণীত 'শুক্রনীতিসার' গ্রন্থে বিবিধ কলা-বিদ্যার পরিচয় আছে। (১) "পাষাণধাত্বাদিদৃতিতদ্ভস্মীকরণং কলা।" অর্থাৎ,—প্রস্তর এবং ধাতু বেধকরণ ও ভস্মীকরণের নাম—এক প্রকার কলাবিদ্যা। (২) "ধাত্বৌষধীনাং সংযোগক্রিয়াজ্ঞানং কলা স্মৃতঃ।" অর্থাৎ,—বিভিন্ন ধাতুর এবং ঔদ্ভিজ্জাদির সংমিশ্রণ সংক্রান্ত জ্ঞানকেও কলা বলে। (৩) "ধাতু-সাঙ্কর্য্যপার্থক্যকরণন্ত কলা স্মৃতা।" অর্থাৎ,—ধাতু-সমূহের সংযোগ ও বিয়োগ প্রণালী-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার নামও কলাবিদ্যা। (৪) "সংযোগাপূর্ব্ব-বিজ্ঞানং ধাত্বাদীনাং কলা স্মৃতা।" অর্থাৎ,—সংযোগের পূর্ব্বে স্বতন্ত্রভাবে ধাতু-সমূহের জ্ঞানের নামও কলা-বিদ্যা। (৫) "ক্ষারনিষ্কাসনজ্ঞানম্ কলাসংজ্ঞন্ত তৎ স্মৃতম্। কলাদশকমেতদ্ধি হ্যায়ুর্ব্বেদাগমেষু চ॥" ক্ষার প্রস্তুত-করণ সংক্রান্ত জ্ঞানও কলা-বিদ্যা নামে অভিহিত; আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে দশবিধ কলার উল্লেখ আছে। 'হর্ষ-চরিত' প্রণেতা বাণভট্টের সহচরগণের মধ্যে ধাতু-পরীক্ষক এবং ধাতু-ব্যবহারবিৎ বিদ্যমান ছিলেন, দেখিতে পাই। * লৌহবিৎ ও ধাতুবিৎ শব্দদ্বয় সংস্কৃত-সাহিত্যের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। তাহাতে লৌহাদি ধাতুর ব্যবহারে ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মণি-মুক্তার ব্যবহার।

খনিজ ধাতু ও মণি-মাণিক্যের যেমন প্রচলন ছিল, প্রাচীন-ভারতবর্ষে সামুদ্রিক ও জান্তব মণি-মুক্তার প্রচলনও সেইরূপ দেখিতে পাই। সে সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ-প্রদর্শন বাহুল্য-মাত্র। অগ্নি-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ, তন্ত্রসার, শুক্রনীতি, মৎস্য-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে রত্নের যে পরিচয় আছে, তাহাই এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। রত্ন কত প্রকার, কোন্ রত্নের কোথায় উৎপত্তি-স্থান এবং কোন্ রত্ন কি প্রকারে চিনিয়া লইতে হয়, ঐ সকল গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার আলোচনা আছে। অগ্নি-পুরাণ নিম্নলিখিত রত্ন-সমূহের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—'বজ্র (হীরক), মরকত, পদ্মরাগ, মৌক্তিক, ইন্দ্রনীল, মহানীল, বৈদুর্য্য, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, স্ফটিক, পুলক, কর্কেতন, পুষ্পরাগ, রাজপট্ট, রাজময়, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শঙ্খ, ব্রহ্মময়, গোমেদ, রুধিরাক্ষ, ভল্লাতক, ধূলি, তুথ, সীম, পীলু, প্রবালক, গিরিরত্ন, ভুজঙ্গ মণি, টিট্টিভ, পিণ্ড, ভ্রামর ও উৎপল। অগ্নি-পুরাণের মতে,—রাজগণ এই সকল রত্ন সুবর্ণ-মণ্ডিত করিয়া ধারণ করিতেন। অগ্নি-পুরাণ বলিয়াছেন,—'মুক্তা-সমূহের মধ্যে, শুক্তিজাত, শঙ্খোদ্ভব, নাগদন্ত ও নাগকুম্ভোদ্ভব এবং শূকর ও মৎস্যজাত বিমল মুক্তাফল উৎকৃষ্ট; বেণু এবং নাগভব ও মেঘজ মুক্তাও শ্রেষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত।' গরুড়-পুরাণ বলেন,—'হস্তী, মেঘ, শূকর, শঙ্খ, মৎস্য, সর্প, শুক্তি ও বেণু (বাঁশ),—এই সকলে মুক্তা উৎপন্ন হয়; এই সকল মুক্তার মধ্যে শুক্তিজাত মুক্তাই প্রধান।...সিংহল, পারলোক, সৌরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণ, পরাশর, কৌবের, পাণ্ড্য, হাটকা-হেমক, এই অষ্টাদশ দেশ †

---

* *Translations of Harshacharita* by Cowell and Thomas.

† বৃহৎ-সংহিতায় এই আট স্থানের নাম—সিংহলক, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্রীক, তাম্রপর্ণি, পারশব, কৌবের পাণ্ডবাটক ও হৈম।

মুক্তার আকর। পুণ্ড্রবর্দ্ধন, পারসিক, পাতাল লোক ও সিংহল,—এই সকল স্থানে যে মুক্তা জন্মে, প্রমাণ, আকৃতি, গুণ ও প্রভায় তাহা শুক্তিজাত মুক্তা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।...যদি কোনও মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে ঐ মুক্তাকে লবণ-মিশ্রিত জলে একত্রিত রাখিবে। তার পর ধান্যের সহিত মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এই প্রকার করিলে যে মুক্তা বিবর্ণ হয় না, সেই মুক্তা অকৃত্রিম জানিবে।' ইত্যাদি। কোন্ শ্রেণীর মুক্তার কিরূপ মূল্য, গরুড়-পুরাণে এবং বৃহৎ-সংহিতায় তাহা লিখিত আছে। বলা বাহুল্য, উভয় গ্রন্থে মুক্তার মূল্যের তারতম্য দৃষ্ট হয়। মূল্যের তারতম্য হওয়াই সম্ভব; কারণ, দুই গ্রন্থে দুই সময়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। যে সকল মণি-মুক্তার উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, সে সকল মুক্তার মধ্যে গজমুক্তা, সর্পমণি বা ফণিমুক্তা, মীনজ মুক্তা, বরাহ-মুক্তা, দদ্রুমুক্তা বা ভেক-মস্তকজাত মুক্তা, বেণুজ মুক্তা প্রভৃতি দেশের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শঙ্খজ ও শুক্তিজ মুক্তাই প্রধানতঃ সমুদ্র হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। মেঘ হইতে বা বৃষ্টি হইতে মুক্তা হয়,—এরূপ উক্তিও শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই। ভারতবর্ষে বহু দিন হইতে যে মুক্তার ব্যবসায় প্রচলিত ছিল এবং সে ব্যবসায়ে যে আয় হইত, তাহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্রে' মুক্তার আয়—রাজকোষের একটী আয়ের অন্তর্গত ছিল, লিখিত আছে।* 'শুক্রনীতি' গ্রন্থে শুক্রাচার্য্য মুক্তার পরীক্ষা বিষয়ে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মুক্তা-পরীক্ষা-সংক্রান্ত শুক্রাচার্য্যের সে উপদেশ,—

"কুর্ব্বন্তি কৃত্রিমং তদ্বৎ সিংহলদ্বীপবাসিনঃ। তৎসন্দেহবিনাশার্থং মৌক্তিকং সুপরীক্ষয়েৎ॥
উষ্ণে সলবণস্নেহে জলে নিশুাষিতং হি তৎ। ব্রীহিভির্ম্মর্দ্দিতং নেয়াৎ বৈবর্ণ্যং তদকৃত্রিমম্॥"

অর্থাৎ,—সিংহল দ্বীপের অধিবাসিগণ কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করে। সেই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য মুক্তা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া লইবে। ইত্যাদি। তার পর মুক্তার বেধ-কার্য্য বড়ই কঠিন ব্যাপার। প্রস্তরে বেধ করা বরং সহজ; কিন্তু মুক্তায় বেধ করা বহু প্রক্রিয়া-সাপেক্ষ। আবার সকল মুক্তার বেধ করাও সম্ভবপর নহে। বৃহৎ-সংহিতাকার বলেন,—'শঙ্খজাত, তিমি মৎস্যজাত, বেণুজাত, মাতঙ্গজাত বরাহজাত, সর্পজাত ও মেঘজাত মুক্তা অবেধ্য। একমাত্র শুক্তিজাত মুক্তাই বেধযোগ্য। কিন্তু সে বেধ-ক্রিয়াও অতি কঠিন। যেরূপে সেই মুক্তার বেধকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহার প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে,—

"কৃত্বা পচেৎ সুপিহিতে সুভদারভাণ্ডে মুক্তাফলং নিহিতনূতনশুক্তিকাণ্ডম্।
স্ফোটস্তথা প্রণিদধীত ততশ্চ ভাণ্ডাৎ সংস্থাপ্য ধান্যনিচয়ে চ তমেকমাসম্॥
আদায় তৎ সকলমেব ততোরভাণ্ডম্ জম্বীরজাতরসযোজনয়া বিপক্কম্।
গৃষ্টং ততো মৃদুতনুকৃতপিণ্ডমূলৈঃ কুর্য্যাৎ যথেচ্ছমিহ মৌক্তিকমাশুবিদ্ধম্॥"

মুক্তাকে বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা নরম করিয়া লইয়া বিদ্ধ করিতে হয়। সেই প্রক্রিয়ার মাসাধিক কাল কাটিয়া যায়। এতদ্বিষয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন বাহুল্য মাত্র।

* 'অর্থশাস্ত্র', দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

গণিত, জ্যোতিষ, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি।

[ভারতবর্ষে গণিত, জ্যোতিষ, যুদ্ধ-বিদ্যা প্রভৃতির উৎপত্তি-তত্ত্ব;—গণিত-বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ;—পাশ্চাত্য-মতে গণিত-বিদ্যার ইতিহাস;—প্রাচীন ভারতে গণিত-বিদ্যার আলোচনা;—জ্যামিতি;—পাটীগণিত, বীজগণিত, পরিমিতি প্রভৃতির প্রসঙ্গ;—জ্যোতিষ-শাস্ত্র,—পাশ্চাত্য-মতে জ্যোতিষের ইতিহাস;—প্রাচীন-ভারতে জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের আলোচনা,—ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত জ্যোতিষ—জ্যোতিষের দুই অঙ্গ;—সমর-বিজ্ঞান,—প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ-বিদ্যার উৎকর্ষ;—ধনুর্ব্বেদ, অস্ত্র-শস্ত্রাদি;—বিবিধ।]

প্রাচীন ভারতে যখনই যে কোনও বিদ্যার বা বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়াছে, সকল বিদ্যার সঙ্গেই ধর্ম্মের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ছিল। অধুনা সংসারে যে কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা চলিয়াছে, সকলেরই মূল লক্ষ্য—সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি। কিন্তু ভারতবর্ষে যখনই যে বিদ্যার আলোচনা হইয়াছিল, সকলেরই মূল লক্ষ্য ছিল—ধর্ম্মসাধন। গণিত বলুন, জ্যোতিষ বলুন, যুদ্ধ-বিদ্যা বলুন, এমন কি আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত সকলই ধর্ম্ম-সাধনার সহায়তার জন্য সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনায় দেখিয়াছি, শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—'জরা-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মনুষ্য ধর্ম্মাচরণে অসমর্থ হইতেছে। মানুষের সেই জরাব্যাধি দূর করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম-সাধনের সহায়তার জন্য আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র প্রণীত হইল।'* গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতিরও ধর্ম্মের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ। শব্দ, ছন্দ, ভাষা, ব্যাকরণ,—সকলই ধর্ম্মের জন্য। কোন্ তিথিতে কোন্ শুভানুষ্ঠান প্রয়োজন, তাহা নির্দ্ধারণ জন্য জ্যোতিষের আবশ্যকতা। জ্যোতিষ-শাস্ত্র আবার গণিতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কোন্ নক্ষত্র কতক্ষণ স্থায়ী, কোন্ তিথির কিরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে,—গণিতের সাহায্যে জ্যোতিষ সে তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন। যজ্ঞবেদীর আকৃতি-গঠন প্রভৃতি বিষয়েও গণিতের অঙ্গ-বিশেষের আবশ্যক হইয়া থাকে। ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভাষা, ব্যাকরণ বা শব্দোচ্চারণের আবশ্যকতার বিষয় সহজেই প্রতিপন্ন হয়; কারণ, বিশুদ্ধ স্বরে বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চারণ করিতে না পারিলে, কোনও মন্ত্র সুফলপ্রসূ হয় না। ভারতে যুদ্ধবিদ্যা বা সমর-বিজ্ঞানের উন্নতিও ধর্ম্মের জন্য। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় এবং অধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনেই প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূচনা হইয়াছিল; আর সেই জন্যই ভারতে সামরিক-বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। কিবা গণিতবিদ্যা, কিবা জ্যোতির্ব্বিদ্যা, কিবা যুদ্ধ-বিদ্যা,—সকল জ্ঞানের উন্মেষ ভারতে আপনা-আপনিই সাধিত হইয়াছিল। এ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষ কথনও

গণিত, জ্যোতিষ, যুদ্ধ-বিদ্যা প্রভৃতি।

---

* চরক-সংহিতার প্রথমেই এতদ্বিষয়ের আলোচনা আছে। 'রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হওয়াতে মানবদিগের তপস্যা ও উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত, ও আয়ুর বিঘ্ন উপস্থিত হইল।' তখন অঙ্গিরা, জমদগ্নি, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ সমবেত হইয়া মনুষ্যের রোগ-মুক্তির বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্। রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥
প্রাদুর্ভূতো মনুষ্যাণামন্তরায়ো মহানয়ম্। কঃ স্যাৎ তেষাং শমোপায় ইত্যুক্ত্বা ধ্যানমাস্থিতাঃ॥"

ইহার পর ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসেন।

কাহারও নিকট ঋণী নহে। যিনিই একটু অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, যে ভাবেই স্বীকার করুন না কেন, তিনিই এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন; * তিনিই একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে,—ভারতবর্ষই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস।

গণিত-বিদ্যা।

গণিত-শাস্ত্র, গণিত-বিজ্ঞান বা গণিত-বিদ্যা—যে নামেই অভিহিত করুন, প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে;—(১) ব্যক্ত বা স্ফুট-গণিত, (২) অব্যক্ত বা মিশ্র গণিত। †

গণিত-বিদ্যার নানা বিভাগ।

পাটীগণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি ব্যক্ত-গণিতের অন্তর্ভুক্ত; আর জ্যোতিষ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, তাড়িত-বিজ্ঞান, জল-বিজ্ঞান, শব্দ-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যে গণিতের আবশ্যক হয়, তাহাই অব্যক্ত বা মিশ্র-গণিত। গণিতের বিভিন্ন অংশ মিশ্রভাবে আবশ্যক হয় বলিয়াই উহার নাম মিশ্র-গণিত। কিবা ব্যক্ত-গণিত, কিবা মিশ্র-গণিত,—গণিতের সকল বিভাগেই ভারতবর্ষের আদি-প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষের উপর এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বে কখনও কাহারও প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য-জাতির লিখিত গণিত-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এতদ্বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশিত হয়, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকেরই বিশ্বাস,—গণিত-বিজ্ঞানের বীজ মিশর হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। থেলিস এবং পীথাগোরাস মিশরের ধর্ম্মযাজকগণের নিকট

পাশ্চাত্য-মতে গণিত-বিদ্যার ইতিহাস।

শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া গ্রীসে প্রত্যাবৃত্ত হন। মিশর হইতে তাঁহারা যে জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়া আনেন, প্রথমে গ্রীসে এবং গ্রীস হইতে ক্রমশঃ অন্যান্য দেশে সে ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মাইলেটাস সহরে যখন 'আইওনিক দার্শনিক' সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়; যখন

---

* এ সম্বন্ধে ডক্টর থিবোর উক্তি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতে পারি। যথা—"The want of some rule by which to fix the right time for the sacrifices gave the first impulse to astronomical observations; urged by this want the priest remained watching night after night the advance of the moon through the circle of the *Nakshatras*, and day after day the alternate progress of the sun towards the north and the south. The laws of the Phonetics were investigated, because the wrath of the gods followed the wrong pronunciation of a single letter of sacrificial formulas; grammar and etymology had the task of securing the right understanding of the holy texts. The close connection of philosophy and theology so close that it is often impossible to decide where the one ends and the other begins,—is too well-known to require any comment."—Dr. Thibaut in the *Journal of the Asiatic Society*, Bengal, 1875. ডক্টর থিবোর যুক্তি মানিয়া লইলেও বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মে গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতির ব্যবহারের বিষয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আর তাহা হইলে কত কাল পূর্ব্বে ঐ সকলের চর্চ্চা চলিয়াছিল, সহজেই প্রতীত হইবে।

† লীলাবতী মতে,—"ব্যক্তং পাটীগণিতম্ অব্যক্তং বীজগণিতম্।" গোলাধ্যায় মতে,—"দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তসংজ্ঞং তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ।" আমরা কিন্তু ব্যক্ত ও অব্যক্ত শব্দ অমিশ্র ও মিশ্র অর্থে ব্যবহার করিলাম।

থেলিস আপনার জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন; গণিত-বিজ্ঞান সেই সময়ে গ্রীসে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মিশরে গিয়া থেলিস তত্রত্য পীরামিড-স্তম্ভের পরিমাপ-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে মেম্পিসে অত্যুচ্চ পীরামিড-স্তম্ভ-সমূহের উচ্চতার পরিমাপ করিতে হইলে, তৎসমুদায়ের ছায়ার পরিমাপ গ্রহণ করা হইত। তাহা হইতে গণনা দ্বারা মিশরীয় ধর্ম্মযাজকগণ পীরামিডের উচ্চতা নির্দ্ধারণ করিতেন। অনেকেই অনুমান করেন, বৃত্তের ব্যাসের দ্বারা কোণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার প্রণালী থেলিসই প্রথম উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, এতদ্বিষয়ে থেলিস বিশেষ কোনও প্রমাণ-পরম্পরা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পীথাগোরাস আপন দর্শন-শাস্ত্রে 'সংখ্যার' বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে অনেকে পীথাগোরাসকে ইউরোপে পাটীগণিত-প্রচারের আদিভূত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু গণনাঙ্কের কয়েকটী তালিকা ভিন্ন তাঁহার সময়ে পাটীগণিত আলোচনার আর কোনও বিশেষ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন,—'জ্যামিতি-তত্ত্বে পীথাগোরাসের প্রতিষ্ঠা অবি-সম্বাদিত। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম খণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ প্রতিজ্ঞার তিনিই আবিষ্কর্ত্তা।' অর্থাৎ,—একটী সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের পার্শ্বস্থ দুই ভুজের উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজদ্বয়ের পরিমাণ-ফলের সমষ্টি কর্ণের উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজের পরিমাণ-ফলের সমান,—এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াই পীথাগোরাস অমর হইয়া আছেন। পীথাগোরাসের জন্ম হইতে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গণিত-বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার বিষয় প্রচারিত আছে। একটী নির্দ্দিষ্ট বিন্দু হইতে একটী নির্দ্দিষ্ট সরল রেখার উপর একটী লম্ব টানিবার বিষয় (ইউক্লিড, ১ম ভাগ, ১১শ প্রতিজ্ঞা), একটী কোণকে দুইটী সমান ভাগে ভাগ করার বিষয় এবং একটী কোণের সমান করিয়া একটি কোণ অঙ্কিত করা প্রভৃতির বিষয় ওনোপিডস কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইহার পর জেনোডোরস, প্লেটো, হিপক্রেটস্ প্রভৃতি কর্ত্তৃক গণিত-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনা হইয়াছিল। একটি কোণকে সমান তিন ভাগে বিভক্ত করার প্রণালী সম্বন্ধে প্লেটোর মতাবলম্বীদিগের মধ্যে বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়াছিল। প্লেটো, ইউডোক্সাস প্রভৃতির গবেষণার পর ইউক্লিড, জ্যামিতি-তত্ত্বের, ক্ষেত্র-ব্যবহারের, এক নূতন আকার প্রদান করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন-ভাবে জ্যামিতি-তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল বটে; কিন্তু তিনি পূর্ব্ব-বর্ত্তী পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয় আলোচনা করিয়া জ্যামিতিকে নূতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তদনুসারে আজি পর্য্যন্ত অনেকে ইউক্লিডকেই জ্যামিতির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। ৩০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া সহরে ইউক্লিডের জন্ম হয়। অনেকে তাঁহাকে গণিত-বিজ্ঞানের পিতৃস্থানীয় বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন। টলেমি-সোটরের রাজত্ব-কালে আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যালয়ে ইউক্লিড গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ব-বিশ্রুত লাইব্রেরী বিদ্যোৎসাহী টলেমি সোটর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ইউক্লিডের পঞ্চাশ বৎসর পরে আর্কিমেডিস জ্যামিতি-বিষয়ে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। ব্যাস ও পরিধির অনুপাত—তিনিই প্রথম নির্ণয় করেন। তাঁহার

নির্দ্দেশ মতে,—বৃত্তের পরিধি-পরিমাণ যদি ২২ হয়, তাহা হইলে তাহার ব্যাসের পরিমাণ ৭ হইবে। আর্কিমেডিসের * পর (য়্যাপোলোনিয়াস) পারজিয়াস জ্যামিতি-তত্ত্বে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। জ্যামিতি সম্বন্ধে তিনিও অনেক বিষয় প্রকাশ করিয়া যান। মেনিলাস ত্রিকোণমিতির আলোচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন। থিওডোসিয়সও তদ্বিষয়ে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। ডাওফেণ্টাস, পেপাস, ডায়ক্লেস, প্রোক্লস প্রভৃতি কর্ত্তৃকও গণিত-বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব প্রকটিত হয়। এইরূপে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গ্রীসে এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় গণিত-বিজ্ঞানের বিবিধ-বিষয়িণী উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহার পর এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়। সে বিপ্লবে সকল বিদ্যার আলোচনা একরূপ লোপ পাইয়া আসে। হজরত মহম্মদের † লোকান্তরের পর ইস্‌লাম-ধর্ম্মের প্রচারকগণ

* "আর্কিমেডিস (Archimedes) ১৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিসিলি-দ্বীপের সাইরাকিউস পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। জলমধ্যে যে পরিমাণ দ্রব্য পতিত হইবে, সেই পরিমাণ জল স্থানান্তরিত হইবে,—এই তত্ত্ব আর্কিমেডিস প্রথম আবিষ্কার করেন। রাজা হায়রো একটী স্বর্ণ-মুকুট প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলেন। মুকুট প্রস্তুত হইলে রাজার সন্দেহ হয়,—স্বর্ণকার স্বর্ণ চুরি করিয়া তৎসহ রৌপ্য মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে। মুকুটের মধ্যে কতখানি সোণা ও কতখানি রূপা আছে, আর্কিমেডিসের উপর তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার অর্পিত হয়। কি করিয়া স্বর্ণকারের প্রতারণা পরীক্ষা করিবেন, এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আর্কিমেডিস একদিন স্নান করিতে যান। স্নান করিতে গিয়া তিনি বুঝিতে পারেন, জলে অবতরণ মাত্র তাঁহার শরীরের সমপরিমাণ জল স্থানান্তরিত হইল; আর যে পরিমাণ জল সরিয়া গেল, তাহার শরীরের ভার সেই পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। এই বিষয় অনুধাবন করিয়া তাঁহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। আনন্দে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া, উলঙ্গ অবস্থায়ই চীৎকার করিতে করিতে তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন; চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'ঠিক হইয়াছে, ঠিক হইয়াছে।' অতঃপর, তিনি সেই মুকুটের সমান ওজনের একভাগ স্বর্ণ ও একভাগ রৌপ্য গ্রহণ করিলেন। একটী জলপূর্ণ পাত্রে একে একে সেই স্বর্ণ ও রৌপ্য নিক্ষিপ্ত হইল। আর তাহাতে কত পরিমাণ জল পাত্র হইতে সরিয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিয়া উভয় ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া লইলেন। পরিশেষে সেই জলপূর্ণ পাত্রে মুকুট ডুবান হইল। তাহাতে যতখানি জল সরিয়া গেল, আর্কিমেডিস তাহাও হিসাব করিয়া দেখিলেন। পরিশেষে তিন বারের স্থানান্তরিত জলের পরিমাণের অনুপাত ও আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া মুকুটস্থ স্বর্ণের ও রৌপ্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আর্কিমেডিসের মৃত্যু-ঘটনা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। তিনি এক দিন সাগর-তীরে বসিয়া বালুকার উপর জ্যামিতির চিত্রাবলী অঙ্কিত করিতেছিলেন। সহসা বিষম ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া তাঁহাকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া যায়; আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

† ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন সোমবার দ্বিপ্রহরে হজরত মহম্মদের লোকান্তর ঘটে। লোকান্তরের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি স্বর্গীয় দূতের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—লোকান্তরের তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন চাইবার ও ফাদাকের য়িহুদী-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে জৈনাব (জয়নাব) নাম্নী য়িহুদী রমণী তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার দেহে সেই বিষের প্রভাব ছিল। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যায়, সে বিষ-প্রয়োগ মহম্মদের মৃত্যুর কারণ নহে। খাদ্য-দ্রব্যের সহিত জয়নাব বিষ প্রদান করিয়াছিল বটে; কিন্তু খাদ্য-দ্রব্য সম্মুখে আসিবামাত্র মহম্মদ বিষের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, তিন বৎসর পরে তিনি যখন লোকান্তরে গমন করেন, তখন তাঁহার শরীরে বিষের প্রকোপ বিশেষ কিছু লক্ষ্য হয় নাই। তাঁহার অলৌকিক জীবন-বৃত্ত ও তাঁহার লোকান্তর-কাহিনী যথাস্থানে অপর খণ্ডে আলোচিত হইবে।

এক হস্তে তরবারি এবং এক হস্তে কোরাণ লইয়া দেশ-বিজয়ে বহির্গত হন। সেই সময়ে মুসলমানগণ কর্তৃক বহু পাঠালয় বিধ্বস্ত হয় এবং তাঁহাদের অত্যাচারে অনেক পণ্ডিত সাহিত্য-বিজ্ঞানের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া দেশদেশান্তরে পলাইতে বাধ্য হন। সেই সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারে * তৎকালে প্রায় সমস্ত গ্রন্থাদি সংগৃহীত হইয়াছিল এবং সেই পাঠালয়-সন্নিধানে তাৎকালিক প্রায় সকল সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমবেত হইয়া আপন আপন প্রতিভার পরিচয় দিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সারাসেন-গণ † কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া আক্রান্ত এবং তাহার পাঠালয় বিধ্বস্ত হয়। কালিফ ওমারের ‡ আদেশ অনুসারে

* মিশর-দেশে প্রথম লাইব্রেরী বা পাঠাগার স্থাপিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি মিশর-রাজ অসিম্যাণ্ডিয়াস প্রথম লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা। জল-প্লাবনের ছয় শত বৎসর পরে অথবা বাইবেলের মতে পৃথিবী-সৃষ্টির ২২৫০ বৎসর পরে তাঁহার বিদ্যমানতার বিষয় জানিতে পারা যায়। যেখানে তিনি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই স্থান কখনও বা তাঁহার প্রাসাদ বলিয়া কখনও বা তাঁহার কবর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তিনি সেই পাঠাগারের প্রবেশ-দ্বারে একটী নীতিবাক্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই নীতিবাক্যের অর্থ—'আত্মার ঔষধ।' অর্থাৎ,—এই গৃহে যে ঔষধ আছে, তাহাতে আত্মার তৃপ্তিসাধন হইতে পারে। পারস্যের অধিপতি ক্যাম্বাইসিস যখন মিশর-দেশ আক্রমণ করেন, সেই সময় সেই পাঠাগার ধ্বংস হইয়াছিল। ইহার পর মাম্পিসে থা দেবতার মন্দিরে অপর একটী পাঠালয় প্রতিষ্ঠার বিষয় প্রচার আছে। কথিত হয়, সেই পাঠালয় হইতে ইলিয়ড ও ওডেসি গ্রন্থদ্বয় অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া হোমার আপনার নামে ঐ দুই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারই সকল পাঠাগার অপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। মিশর-রাজ টলেমি সোটর কর্তৃক ঐ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৯০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ঐ লাইব্রেরীর সঙ্গে সোটর একটী সাহিত্যিক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সভার নানা দেশের সাহিত্যিকগণ আসিয়া যোগদান করেন। টলেমি সোটরের জীবিতকালে ঐ লাইব্রেরীর পুস্তকের সংখ্যা কত ছিল, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এপিকোনিয়াস বলেন—৫২ হাজার, জোসেফাস বলেন—দুই লক্ষ। টলেমি সোটরের পুত্র টলেমি ফিলাডেলফাস পিতার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। আলেকজেন্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যান। তিনি লক্ষাধিক নূতন গ্রন্থ ঐ পাঠাগারে সন্নিবিষ্ট করেন। তিনি নানা দেশ হইতে নানা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া আনাইয়াছিলেন। এইরূপে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে পুস্তকের সংখ্যা—সাত লক্ষ দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় সেই লাইব্রেরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রোম-সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসে গীবন, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর ধ্বংসের বিবরণকে অতিরঞ্জিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক আবুল ফরাজিয়াস এ বিষয়ে যে প্রমাণ পরম্পরা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, গীবন তাহার স্পষ্টতঃ প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই।

† সিরীয়া, প্যালেস্তাইন ও আরবের মুসলমানগণ প্রধানতঃ 'সারাসেন' (Saracens) নামে পরিচিত। উত্তর আফ্রিকার আরব-বারবার (Arab Berber) জাতিরাও সারাসেন-পর্য্যায়ভুক্ত। উঁহারাই এক সময়ে সিসিলি, পর্ত্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি জয় করিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তি-কালে সারাসেন শব্দে অন্য অর্থ সূচিত হইয়া থাকে। খৃষ্টান-গণ যে সকল জাতির বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (তুর্কিগণ, আর্কোনিয়মের সেল্জুক জাতি, পৌত্তলিক প্রুশিয়গণ), সারাসেন শব্দে তাঁহাদিগকেই বুঝাইত।

‡ বাগদাদের কালিফ (আবু-হাপসা-ইবন্-আল্ খেত্তার) ওমার—মুসলমানদিগের দ্বিতীয় কালিফ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৫৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনার মসজিদের মধ্যে একজন পারসিক ক্রীতদাস কর্তৃক তিনি নিহত হন।

সারাসেন-গণ পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্ছেদ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়। জয়দৃপ্ত সেনাপতি আমরৌ, সেই প্রাচীন-কালের জ্ঞানবিজ্ঞানের রত্নভাণ্ডার ধ্বংস করিতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালিফের কঠোর আদেশ—তিনি অমান্য করিতে পারিবেন কি প্রকারে? তিনি পাঠাগারের রত্নভাণ্ডার রক্ষা করিবার অভিপ্রায় কালিফকে জ্ঞাপন করিলেন। কালিফ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। উত্তরে কালিফ বলিয়া পাঠাইলেন,—'যদি ঐ পাঠাগারে গ্রীকদিগের রচনায় মধ্যে কোরাণের বাণী লিখিত থাকে, তাহা হইলেও তৎসমুদায় রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, তৎপক্ষে কোরাণই বিদ্যমান আছে। আর যদি সে সমস্ত গ্রন্থ কোরাণের মতানুসারী না হয়, তাহা হইলে তৎসমুদায় বিষবৎ বর্জ্জনীয়; তাহা হইলে তৎসমুদায় অবিলম্বে ধ্বংস করা আবশ্যক।' বলা বাহুল্য, কালিফের আদেশ-পালনে সেনাপতি একটুও ত্রুটি রাখেন নাই। কথিত হয়, ভূর্জ্জপত্র-লিখিত, গ্রন্থ-সমূহ নগরের চারি সহস্র স্নানাগারে প্রেরিত হইয়াছিল এবং ছয় মাসের অধিক কাল সেই সমস্ত গ্রন্থ দগ্ধ করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার সেই পাঠাগারে তখন অন্যূন সাত লক্ষ পুস্তক সংগৃহীত ছিল। সারাসেনাদিগের এই লুণ্ঠন-ব্যাপারে সেই সকল গ্রন্থ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কেবল গ্রন্থ-পত্র ধ্বংস বলিয়া নহে; এই লুণ্ঠন-ব্যাপারে জ্ঞানান্বেষী পণ্ডিতগণও চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলতঃ, আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারাদির ধ্বংস-ব্যাপারে সাহিত্যের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হইয়াছিল, বুঝি আজিও তাহার পূরণ হয় নাই! যাহা হউক, পরিশেষে মুসলমানগণ কর্ত্তৃকই পুনরায় পাশ্চাত্য-দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত হইয়াছিল; যেন পূর্ব্বকৃত কলঙ্কের স্খালন জন্যই বিধাতা আরবে জ্ঞান-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। পাটীগণিতের অঙ্কপাত আরবীয়-গণের নিকট হইতে ইউরোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্পেন-রাজ্য যখন মুসলমানগণের অধিকার-ভুক্ত হয়, সেই সময়ে জারবাট (পোপ সিল্‌ভেষ্টার, ২য়) স্পেনদেশ পরিভ্রমণ করিতে গিয়া পাটীগণিতের মূল তত্ত্ব প্রাপ্ত হন। তাহাই ইউরোপে প্রচারিত হয়। বীজগণিতও আরবীয়-গণ কর্ত্তৃক প্রথমে ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল,—এ কথাও অনেকে স্বীকার করেন। এই সময় জ্যামিতির আলোচনায়ও আরব প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,—'গ্রীসদেশীয় জ্যামিতি-গ্রন্থের অনুবাদে আরব এই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।' মহম্মদ বিন মুসা সমতল-ক্ষেত্র ও গোলক বিষয়ে এবং জেবার বিন আফ্‌লা সমতল-ক্ষেত্র ও ত্রিকোণমিতি বিষয়ে আরবীয় ভাষায় নানা তথ্য প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া আছেন। জরিপ সম্বন্ধে বাগদাদের মহম্মদ ঐ সময় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এদিকে আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগার ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে গ্রীস-দেশীয় পণ্ডিতগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পারলৌকিক-তত্ত্ব সম্বন্ধেই প্রধানতঃ মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছিলেন। তৎকালে গণিত-বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ কোনও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না। ১২০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইটালীতে 'ঝ্যালজাব্রা' বা বীজগণিত প্রচারিত হয়। আরবীয়গণের গবেষণার ফল লিওনার্ডো (ডি'পিসা) ইটালীতে প্রচার

করেন। জোভানাস এবং পেমোরারিয়স ইটালীতে পাটীগণিত সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নোভারার ক্যাম্পেনিয়াস কর্ত্তৃক ইটালীতে ইউক্লিডের গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইটালীতে গণিত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা চলিয়াছিল। গণিত-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে কোপারনিকাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রুসিয়া-রাজ্যের থর্ণ পল্লীতে ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৫৭ বৎসর বয়সে, ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রণীত জ্যোতিষ-সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে তিনি প্রতিপন্ন করেন, সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিব্যাদি গ্রহ বিঘূর্ণিত হইতেছে। পাশ্চাত্য খণ্ডে এই মত তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন বলিয়া প্রচার। ইহার পর, বম্বেলি (১৫৭৯ খৃঃ), ভিয়েটা (১৫৪০ খৃঃ—১৬০৩ খৃঃ), নেপিয়ার (১৫৫০ খৃঃ—১৬১৭ খৃঃ) হেরিয়ট (১৫৫৯ খৃঃ—১৬২১ খৃঃ), ফার্ণেল এবং মেলিটাস গণিত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া যান। মেলিটাস—জর্ম্মণদেশীয় গণিতশাস্ত্রবিৎ। তিনি প্রমাণ করেন, —যদি গোলকের ব্যাস ১১৩ হয়, তাহা হইলে তাহার পরিধি ৩৫৫ হইবে। ইঁহাদের পর ডেকার্টে (১৫৯৬ খৃঃ—১৬৫০ খৃঃ), প্যাসক্যাল (১৬২৩ খৃঃ—১৬৬২ খৃঃ), ফারমট (১৫৯০ খৃঃ—১৬৬৩ খৃঃ), ক্যাভেলারি (১৬৩৫ খৃঃ), রবারভেল (১৬৩৪ খৃঃ), টোরি সেলি (১৬৪০ খৃঃ), ওয়ালিস (১৬৫৫ খৃঃ) এবং স্যর আইজাক নিউটন (১৬৪২ খৃঃ—১৭২৭ খৃঃ) গণিত-বিজ্ঞানের নানা উৎকর্ষ সাধন করেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে স্যর আইজাক নিউটনের 'ফিলজফিয়া নেচারেলিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের আবিষ্কারে তিনি যেরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন, এই গ্রন্থ-প্রকাশে গণিত-বিজ্ঞানে তাঁহার সেইরূপ যশ প্রকাশ পায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—গণিত-বিজ্ঞানের সকল অঙ্গই স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। যতদিন বেদ-বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, ততদিন হইতেই জ্যোতিষ, ততদিন হইতেই গণিতের সৃষ্টি-পরিপুষ্টি। জ্যোতিষে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি-স্থিতি নির্ণয়ে গণনাঙ্কের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের আবশ্যকতা। সুতরাং যতদিন জ্যোতিষ, ততদিনই গণিতের প্রতিষ্ঠা। তার পর, যজ্ঞবেদী-নির্ম্মাণে ও তাহার পরিমাণাদি নির্দ্ধারণেও গণিতের সাহায্য প্রয়োজন। তাহাতে জ্যামিতি, পরিমিতি, পাটীগণিত ও বীজগণিত প্রভৃতির অভিজ্ঞতা অবশ্যম্ভাবী। ফলতঃ, এক যজ্ঞ-কাণ্ডের বিষয় স্মরণ করিলেই গণিতের সর্ব্বাঙ্গ-পুষ্টির পরিচয় প্রাপ্ত হই। গণিত-বিজ্ঞানের অন্তর্গত পাটীগণিত—যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগহার সরলভাবে শিক্ষা দেয়। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বিদ্যমানতা বিষয়ে ঋগ্বেদের উক্তি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পরেও বলিতেছি। তদ্ভিন্ন ঋগ্বেদের বিবিধ সূক্তে গণনাঙ্কের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগহার সংক্রান্ত জ্ঞানের নিদর্শন আছে। একটী ঋক (ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, ৫৩শ সূক্ত, ৯ম ঋক) ও তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া তদ্দৃষ্টান্তেও এতদ্বিষয় বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

প্রাচীন-ভারতে গণিত-বিজ্ঞান।

ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞো দ্বির্দশাবন্ধুনা সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নব শ্রুতো নি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্॥

অর্থাৎ,—হে ইন্দ্র, অতি-বিখ্যাত আপনি সহায়বিহীন সুশ্রবাঃ রাজা কর্তৃক আক্রমিত বিংশতি সংখ্যক জনপদাধিপতি ও তাহাদের ষষ্টিসহস্র নিরানব্বই সংখ্যক অনুচর-সকলকে শত্রুনাশক দুর্ধর চক্র দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন।" এই ঋকে গণিত-বিজ্ঞানের অন্তর্গত পাটীগণিতের কোনও উল্লেখ নাই বটে; কিন্তু এতদুক্ত অঙ্কের বা রাশির মধ্যে পাটীগণিতের যোগ-বিয়োগাদির জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। 'দ্বির্দশ' শব্দে (১০×২=২০) গুণনাঙ্কে অভিজ্ঞতার বিষয় বুঝা যাইতেছে। 'ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নব' প্রভৃতি বাক্যে (৬০০০০+৯০+৯=৬০০৯৯) যোগ বা সমষ্টির অভিজ্ঞতা জ্ঞাপক। পণ্ডিতগণ বলেন,—"অঙ্কপাতের মধ্যেই সঙ্কলন, ব্যবকলন ও গুণনের নিয়ম রহিয়াছে। পঞ্চদশ বলিলে, দশ এবং পঞ্চ (১০+৫) বুঝাইতেছে। সুতরাং সঙ্কলন দ্বারা এই রাশি লিখিত হইল। একোনবিংশতি বলিলে (২০−১=১৯) বিংশতির এক কম বুঝাইতেছে। সুতরাং ইহাতে ব্যবকলন রহিয়াছে। ত্রিংশৎ বলিলে (১০×৩=৩০) তিন গুণ দশ বুঝাইতেছে। অতএব এখানে গুণের নিয়ম রহিয়াছে।" এ সকল কথা অবশ্য দূরন্বয়ে কথিত হইতেছে। বেদ—পাটীগণিত আলোচনার ক্ষেত্র নহে। সুতরাং বেদে এতৎসংক্রান্ত অধিক কিছু অবগত হইবার আশা করা দুরাশা মাত্র। তবে বেদে যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনার কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে; সূর্য্যের আহ্নিক-গতি, সূর্য্যের দ্বাদশ অর বা রাশি, সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসর গণনা, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন নির্ণয়, প্রভৃতির প্রসঙ্গ যে উত্থাপিত আছে; তাহারই মধ্যে গণিত-বিজ্ঞানের সকল তত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে। সৌর-বৎসর ও চান্দ্র বৎসর সম্বন্ধে ঋগ্বেদের (১ম মণ্ডল, ২৫শ সূক্ত ৮ম ঋক) উক্তি; যথা,—

"বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে॥"

অর্থাৎ,—'যে বরুণদেব সমস্ত জগৎ নিজ শাসনে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি বৎসরের দ্বাদশ মাসে যে সকল প্রাণী জন্মিয়া থাকে, সেই প্রাণী সকল যুক্ত দ্বাদশ মাস দেখিয়া থাকেন এবং সম্বৎসরের মধ্যে যে অধিক মলমাস হইয়া থাকে, তাহাও জানেন।' এই ঋকটীতে যেমন জ্যোতিষের তেমনি গণিতের এক নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সূর্য্যের চারিদিক ঘুরিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে, তাহাকে বৎসর কহে। বৎসরে বারটী অমাবস্যা গণনা করা হয়। এমনও ঘটিতে দেখা যায় যে, প্রতি তিন বৎসরে একটি অমাবস্যা বাড়িয়া যায়। অর্থাৎ—প্রতি তৃতীয় বৎসরে এক মাসে দুইটী অমাবস্যা ঘটিয়া থাকে। তাই 'জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সৌরমাস ও চান্দ্রমাস গণনা-প্রণালী-দ্বয়ের সাম্য ও ঐক্য বিধান করিবার নিমিত্ত, প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটি মলমাস ধরিতে হয়। এই মাসে কোনও সদনুষ্ঠান হইতে পারে না। মলমাস জানিবার বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাতে দুইটি অমাবস্যা থাকে। যে মাসে দুইটী অমাবস্যা, সেই অমাবস্যাদ্বয়ের মধ্যগত চান্দ্রমাস—মলিম্লুচ বা মলমাস।' যে গণনার ফলে এই মলমাসাদি নির্ণীত হয়, সে গণনায় যোগ-বিয়োগ-গুণনের সাহায্য-গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। পাটীগণিতে অভিজ্ঞতা ভিন্ন এ সকল তত্ত্ব কখনই নির্ণীত হইতে পারে না। এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্তের অবতারণা বাহুল্য বলিয়া মনে করি। অথর্ব্ববেদেও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গণিত-বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে গণিত-

শাস্ত্রের যে অধ্যাপনা হইত এবং ছাত্রগণ যে তাহা শিক্ষা করিতেন, ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭ম প্রপাঠক, ১ম খণ্ড, ২য় বল্লীতে) তাহার নিদর্শন আছে। নারদ সনৎকুমারকে বলিতেছেন,—'আমি ঋগ্বেদ শিক্ষা করিয়াছি, যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছি, সামবেদ শিক্ষা করিয়াছি। চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস-পুরাণ, বেদের জ্ঞান-স্বরূপ ব্যাকরণ, পিত্র্যো অর্থাৎ পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যজ্ঞকর্ম্ম, রাশিশাস্ত্র অর্থাৎ গণিত-বিজ্ঞান, দৈব অর্থাৎ ভবিষ্যদ্গণনা, নিধি অর্থাৎ সময়-বিজ্ঞান, বাক্যোবাক্য অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র, একায়ন অর্থাৎ নীতি-বিজ্ঞান, দেববিদ্যা অর্থাৎ শব্দ-প্রকরণ, ভূতবিদ্যা অর্থাৎ পদার্থ-বিজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ শব্দজ্ঞান, ক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ সমর-বিজ্ঞান, নক্ষত্র-বিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষ, সর্পদেবজনবিদ্যা অর্থাৎ সর্প ও উপদেবতার শান্তি-বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি।' মূল সূত্র যথা,—"স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি।" বৃহদারণ্যক উপনিষদে (দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণে, দশম বল্লীতে) দেখিতে পাই,—সমগ্র বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, জ্ঞান প্রভৃতি সকলই ঈশ্বর হইতে সৃষ্ট অর্থাৎ সৃষ্টির আদিকাল হইতে বিদ্যমান। ইহাতে বুঝা যায়,—এই সকল জ্ঞান ভারতবর্ষের কতকাল হইতে আয়ত্ত ছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। পূর্ব্বে যে যজ্ঞবেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, সূত্র-সাহিত্যে তাহার নিয়মাবলী লিখিত আছে। সেই নিয়মাবলী আলোচনা করিলে জ্যামিতি, পরিমিতি, বীজগণিত, পাটীগণিত প্রভৃতি গণিতের বিভিন্ন বিভাগে প্রাচীন ভারতের অভিজ্ঞতার পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায়। * খ্রীষ্ট-জন্মের আট শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সূত্র-সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণই তাহা বলিয়া থাকেন। তার পর, সূত্র-সাহিত্যে গণিত-জ্ঞানের যে নিদর্শন বিদ্যমান, গণিত-জ্ঞানের তদ্রূপ উৎকর্ষ-সাধন যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বহু শতাব্দীর গবেষণার ফল, তাহাও তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং পাশ্চাত্য গণিত-বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের কতকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উহার আলোচনা হইয়াছিল, সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। মহর্ষি কশ্যপ অষ্টাদশ জন জ্যোতিষ-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তকের নাম উল্লেখ করিয়া যান। বলভদ্র-প্রণীত 'সন্ধায়নরত্ন' গ্রন্থে সেই বচনটী দৃষ্ট হয়। সন্ধায়ন-রত্নধৃত কশ্যপের সেই বচনটী এই,—

"সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠাত্রিপরাশরাঃ।
কশ্যপো নারদো গর্গো মরীচির্মনুরঙ্গিরাঃ॥
লোমশঃপৌলিশশ্চৈব চ্যবনো যবনো গুরুঃ।
শৌনকোঽষ্টাদশাশ্চৈব জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ॥"

এই বচনে দেখিতে পাই,—সূর্য্য, ব্রহ্মা, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, লোমশ, পৌলিশ, চ্যবন, যবন, বৃহস্পতি এবং শৌনক,—এই

* সূত্রগ্রন্থে জ্যামিতি, পরিমিতি, পাটীগণিত বীজগণিত প্রভৃতির প্রসঙ্গ কিরূপভাবে আলোচিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী অংশে তাহার উদাহরণ-সমূহ প্রদত্ত হইল।

অষ্টাদশ জন জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা বা প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহারা যে সমসাময়িক নহেন, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। অপিচ, পর্য্যায়ক্রমে ইঁহাদিগের নামোল্লেখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, ভারতবর্ষে আদিকাল হইতেই জ্যোতিষের সুতরাং গণিত-শাস্ত্রের সকল বিভাগেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। উল্লিখিত অষ্টাদশ জন জ্যোতির্ব্বিদের মধ্যে নয় জন জ্যোতির্ব্বিদের নাম-সংযুক্ত গ্রন্থ বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচারিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। সেই নয়খানি গ্রন্থ 'নবসিদ্ধান্ত' নামে অভিহিত। যথা,—(১) ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, (২) সূর্য্যসিদ্ধান্ত, (৩) সোমসিদ্ধান্ত, (৪) বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত, (৫) গর্গসিদ্ধান্ত, (৬) নারদ-সিদ্ধান্ত, (৭) পরাশর-সিদ্ধান্ত, (৮) পুলস্ত্য-সিদ্ধান্ত এবং (৯) বশিষ্ট-সিদ্ধান্ত। এই সকল সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের অনেকগুলি আরবে এবং বাগদাদে অনুবাদিত হয়। তৎসমুদায় গ্রন্থ 'সিন্দহেন্দ' নামে পরিচিত হইয়াছিল। উল্লিখিত সিদ্ধান্ত-সমূহের মধ্যে 'সূর্য্য-সিদ্ধান্তকেই' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের (মাধ্যায়ন অধ্যায়, ২২-২৩) অন্তর্গত দুইটী শ্লোকেও উহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়,—

"কল্পাদস্মাচ্চ মানবঃ ষড়্ব্যতীতাঃ সসন্ধয়ঃ।
বৈবস্বতস্যচ মনোর্যুগানাম্ ত্রিঘনগতঃ॥
অষ্টাবিংশাদ্যুগাদস্মাদাদ্যাতমে তৎকৃতং যুগম্!
অতঃ কালং প্রসংখ্যায়য় সংখ্যামেকত্র পিণ্ডয়েৎ॥"

অর্থাৎ,—'বর্ত্তমান কল্পের ছয় মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। সপ্তম মন্বন্তরেরও সাতাইশ চতুর্যুগ অতীত। অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের সত্যযুগ চলিয়া গিয়াছে। এই সময়ে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়।' এ হিসাবে, অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের প্রথমে উহা রচিত হইলে, অন্যূন ২১ লক্ষ ৬৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষে বৃটিশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনুসন্ধিৎসু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চ্চার বিষয় অনুসন্ধান করেন। 'ভারতীয় সাহিত্য'-সংক্রান্ত গ্রন্থে ওয়েবার প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—'খৃষ্ট-জন্মের ২৭৮০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।' * ফরাসী পণ্ডিত মুঁসে বেলি, খৃষ্ট-জন্মের তিন সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। হিব্রু-ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহে পৃথিবী-সৃষ্টির যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, বেলি দেখাইয়াছেন, তাহারও বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষ জ্যোতি-র্ব্বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ জ্যোতিষ-শাস্ত্র-সংক্রান্ত গণনাঙ্কের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া যান। সেই তালিকাটী বেলির দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা দেখিয়া তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ হন। তাহা হইতেই তিনি বুঝিতে পারেন,—কতকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কিরূপ সভ্যতার উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে গণিত-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা-দানের অত্যুত্তম প্রণালীর বিষয়ও তাহাতে তাঁহার উপলব্ধি হয়। অধিকন্তু, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন,—'ভারতে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের আলোচনার

* *Vide* Weber's *Indian Literature*.

তিনি যে নিদর্শন পাইয়াছেন, তাহা প্রাথমিক শিক্ষার ফল নহে; তাহা জ্যোতিষ-শাস্ত্রালোচনার উৎকর্ষের শেষ স্মৃতি মাত্র।' একা বেলি নহেন, ক্যাসিনি, জেণ্টিল, প্লেফেয়ার † প্রভৃতি পণ্ডিত-গণও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—'হিন্দুদিগের যে জ্ঞান এখন লোপ-প্রাপ্ত, খৃষ্ট-জন্মের তিন সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে তাহা পূর্ণ পরিস্ফুট ছিল। সেই দূর অতীত কালে হিন্দুগণ যে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া কাউণ্ট জোরণ্স্-জারণা বলিয়াছেন,—'বেলি প্রভৃতির গণনা অনুসারে খ্রীষ্ট-জন্মের তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এবং জ্যামিতির আলোচনায় অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, যদি স্বীকার করিয়া লই; তাহা হইলে, তাহার আরও কত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, বুঝা যায় না কি? মনুষ্য ধীরে ধীরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক এক স্তরে অগ্রসর হয়। উচ্চ স্তরে উঠিতে কত জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়!' স্যর উইলিয়ম হাণ্টার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। তিনি বৃটিশ-দূতের সহিত উজ্জয়িনী নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে উজ্জয়িনীর জনৈক জ্যোতির্ব্বিদের নিকট হইতে তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক জন জ্যোতির্ব্বিদের আবির্ভাব-কালের পরিচয় সংগ্রহ করেন! সেই কয়েক জন জ্যোতির্ব্বিদের নাম ও আবির্ভাব-কালের বিষয় হাণ্টার এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। যথা,—

বরাহমিহির	১২২ শক	২০০-১ খৃঃ।	শ্বেতোৎপল	৯৩৯ শক	১০১৭-১৮ খৃঃ।
ঐ (২য়)	৪২৭ শক	৫০৫-৬ খৃঃ।	বারুণভট্ট	৯৬২ শক	১০৪০-৪১ খৃঃ।
ব্রহ্মগুপ্ত	৫৫০ শক	৬২৮-২৯ খৃঃ।	ভোজরাজ	৯৬৪ শক	১০৪২-৪৩ খৃঃ।
মুঞ্জল	৮৫৪ শক	৯৩২-৩৩ খৃঃ।	ভাস্কর	১০৭২ শক	১১৫০-৫১ খৃঃ।
ভট্টোৎপল	৮৯০ শক	১০৬৮-৬৯ খৃঃ।	কল্যাণচন্দ্র	১১০১ শক	১১৭৯-৮০ খৃঃ।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত তালিকার সময়-নির্দ্দেশ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। বরাহমিহির বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। উক্ত তালিকায় উল্লিখিত বরাহমিহির যদি রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি আরও অনেক পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, প্রতিপন্ন হয়। বিক্রমাদিত্যের বিদ্যমান-কাল সম্বন্ধে যদিও নানা মতান্তর আছে;

* এ সম্বন্ধে বেলির উক্তি,—"Plutot lest debris que les elemens d'une science."—The remains rather than the elements of science.—*Histoire de l' Astromime Ancienne.*

† প্লেফেয়ার (Playfair—John) স্কটলণ্ড-দেশের একজন বিখ্যাত গণিত-বিজ্ঞান-বিৎ ও প্রকৃতিতত্ত্ব-বিশারদ। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১৯এ জুলাই ইঁহার মৃত্যু হয়।... ফরাসী-দেশের ক্যাসিনী (Cassini) বংশ জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ভূ-তত্ত্ব আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। ক্যাসিনী (জিওভানি ডোমিনিকো) ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই বলোগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার পুত্র জ্যাকুয়েস ক্যাসিনী (Cassini—Jacques) ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী পারিস সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতাপুত্র উভয়েই জ্যোতির্ব্বিদ্যায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। জ্যাকুয়েস ক্যাসিনীর পৌত্র ডোমিনিক জিন ক্যাসিনী (জন্ম ১৭৪৮ খৃঃ) ভূ-তত্ত্বের আলোচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কিন্তু খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে তিনি শকদিগকে পরাজিত করিয়া 'সম্বৎ' অব্দ স্থাপনা করিয়াছিলেন,—ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কাহিনী। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত তালিকার প্রথম বরাহমিহিরকে যদি বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিদ্যমান-কাল আরও আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে গিয়া দাঁড়ায়। অথবা, তালিকায় লিখিত বরাহমিহিরের পূর্ব্বে (বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক) আর একজন বরাহমিহিরের বিদ্যমানতার বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তার পর, ঐ বরাহমিহিরের পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যভট্ট এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পরাশর মুনির বিদ্যমানতার বিষয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহাঁরা যে বিক্রমাদিত্যের বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, নানারূপে তাহা প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদ পরাশরকে বেদব্যাসের পিতা জ্যোতির্ব্বিদ পরাশর বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, দ্বাপরের শেষভাগে (বর্ত্তমান সময়ের ৫০১২ বৎসর পূর্ব্বে) তাঁহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। আর্য্যভট্ট—বরাহমিহির প্রভৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার কোনও কোনও মতের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্যভট্ট—বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। আর্য্যভট্টের প্রধান গ্রন্থের নাম—'আর্য্য-সিদ্ধান্ত'। তিনি 'আর্য্যভটীয়' নামে আপন গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থ 'আর্য্যাষ্টশত' নামে অভিহিত হইত। অধুনা আর্য্যভট্টের গ্রন্থ 'আর্য্যসিদ্ধান্ত, লঘু-আর্য্য-সিদ্ধান্ত' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ অধুনা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে আর্য্যভট্টকেই অধিকতর প্রাচীন বলিয়া সাধারণতঃ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহ কেহ আর্য্যভট্টকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেরূপ নির্দ্দেশের আমরা কোনও প্রকৃষ্ট কারণ দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ, তাঁহার গ্রন্থে (গণিতপাদ অংশে) তিনি যে কুসুমপুরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার আবির্ভাব-কালের কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মকুশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরুকোণভগণান্নমস্কৃত্য।
আর্য্যভট্টস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানম্॥"

এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া কেহ কেহ কুসুমপুরকে আর্য্যভট্টের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এই শ্লোকে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জন্মস্থানের কোনই উল্লেখ নাই। শ্লোকটির অর্থ,—ব্রহ্ম, কু (পৃথিবী), শশী, বুধ, ভৃগু (শুক্র), কুজ (মঙ্গল), রবি, গুরু (বৃহস্পতি), কোণ (শনি), ভগণ (নক্ষত্র),—ইহাঁদিগকে নমস্কার করিয়া কুসুমপুরে অভ্যর্চ্চিত অর্থাৎ প্রচলিত (জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিষয়ক) জ্ঞান আর্য্যভট্ট এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, তৎকালে কুসুমপুরে গণিত-বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে মত প্রচলিত ছিল, আর্য্যভট্ট তাহাই প্রচার করেন। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন,—পাটলিপুত্রের প্রাচীন নাম কুসুমপুর।* পাটলিপুত্র নগরের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে

* হুয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ কাহিনীতে পাটলিপুত্রের প্রাচীন নাম কুসুমপুর বলিয়া উল্লিখিত।

নানা কিংবদন্তী আছে। তবে বুদ্ধদেবের সমসময়ে অজাতশত্রু কর্ত্তৃক পাটলিপুত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এই মতই প্রবল। কেহ কেহ বলেন,—পাটলিপুত্রকেই প্রথম প্রথম লোকে কুসুমপুর বলিত। কেহ কেহ বলেন,—'কুসুমপুরই পরে পাটলিপুত্র-নামে অভিহিত হয়। পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধি সময়ে—চন্দ্রগুপ্ত অশোক প্রভৃতির রাজত্ব-কালে পাটলিপুত্র-নগরী যখন সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়, তখন কুসুম-স্তবকের ন্যায় ঐ নগরের শোভা-সন্দর্শন করিয়া লোকে ঐ নগরকে কুসুমপুর নামে অভিহিত করিয়াছিল।' তাহা হইলে, খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে, চন্দ্রগুপ্ত-অশোকাদির রাজত্ব-কালের মধ্যে, আর্য্যভট্টের আবির্ভাব হইয়াছিল, বুঝা যাইতে পারে। কুসুমপুর বা প্রাচীন পাটলিপুত্র জ্যোতিষ-শাস্ত্রালোচনার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। সুতরাং প্রাচীন পাটলিপুত্র কুসুমপুর নামে অভিহিত হইবার সময়ই আর্য্যভট্ট বিদ্যমান ছিলেন, প্রতিপন্ন হয়। সূর্য্য, ব্রহ্মা, ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্গণের প্রসঙ্গকে অতি দূর অতীতের বা পৌরাণিক কাহিনী বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া আর্য্যভট্ট হইতেই যদি জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের আদি-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাই, তাহা হইলেও সকল দেশের সকল প্রকার উন্নতির ইতিহাস তাহার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আর্য্যভট্টের পর বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। বরাহমিহিরের গ্রন্থের নাম—বৃহৎ-সংহিতা; ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থের নাম—ব্রহ্মসিদ্ধান্ত। ইঁহাদের পর লল্লাচার্য্য, শ্রীপতি মিশ্র প্রভৃতি আরও অনেক জ্যোতির্ব্বিদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাস্করাচার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। তিনি পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ,—সকল বিষয়ই বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তবে তিনিও যে বহু গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বে পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত ছিল, তাঁহার গ্রন্থেই তাহার পরিচয় আছে। তিনি যে যে গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, বীজগণিত সংক্রান্ত তাঁহার গ্রন্থের উপসংহারে তিনি তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থের রচয়িতাগণের মধ্যে ব্রহ্ম, শ্রীধর ও পদ্মনাভের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। পদ্মনাভের ও শ্রীধরের কয়েকটী সূত্রও তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। ভাস্করাচার্য্যের প্রধান গ্রন্থের নাম—'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি।' ভাস্কর-ব্যবহার, ভাস্কর-বিবাহপটল, কারণ-কুতূহল, বাসনা-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়াও তিনি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থ চারি ভাগে বিভক্ত। উহার প্রথম ভাগের নাম—লীলাবতী (লীলাবতীতে পাটীগণিত এবং ক্ষেত্র-ব্যবহার প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে); দ্বিতীয় ভাগের নাম—বীজ-গণিত; তৃতীয় ভাগের নাম—গ্রহ-গণিতাধ্যায় (উহাতে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা হইয়াছে); চতুর্থ ভাগের নাম—গোলাধ্যায় (উহা ভূগোল-বিষয়ক আলোচনায় পূর্ণ)। ভাস্করাচার্য্য কোন্ সময়ে আবির্ভূত হন, 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' গ্রন্থে তাহার আভাষ পাওয়া যায়;—

"রসগুণপূর্ণম্ হি সমশকনৃপসময়েঽভবন্মমোৎপত্তিঃ।
রসগুণবর্ষেণ ময়া সিদ্ধান্তশিরোমণি রচিতঃ॥"

সাধারণতঃ এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা হয়,—১০৩৬ শকাব্দে (পাশ্চাত্য-হিসাবে ১১১৪-১১১৫ খৃষ্টাব্দে) ভাস্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন; ৩৬ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তাঁহার 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এইরূপ অন্য আর একটী শ্লোকে (প্রশ্নাধ্যায়ে) ভাস্করাচার্য্য আত্ম-পরিচয় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তদুক্ত সে পরিচয়,—

"আসীৎ সহ্যকুলাচলাশ্রিতপুরে ত্রৈবিদ্যবিদ্বজ্জনে।
নানাসজ্জনধাম্নি বিজ্জড়বিড়ে শাণ্ডিল্যগোত্রো দ্বিজঃ॥
শ্রৌতস্মার্ত্তবিচারসারচতুরো নিঃশেষবিদ্যানিধিঃ।
সাধূনামবধির্মহেশ্বরকৃতী দৈবজ্ঞচূড়ামণিঃ॥
তজ্জস্তচ্চরণারবিন্দযুগলপ্রাপ্তপ্রসাদঃ সুধীঃ
মুগ্ধোদ্বোধকরং বিদগ্ধগণকপ্রীতিপ্রদং প্রস্ফুটম্।
এতদ্ব্যক্ত সদুক্তিযুক্তিবহুলং হেলাবগম্যং বিদাং
সিদ্ধান্তগ্রথনং কুবুদ্ধিমথনং চক্রে কবির্ভাস্করঃ॥"

অধুনা-প্রচলিত পুঁথিপত্রে এই শ্লোক দৃষ্ট হয় বলিয়া এতদনুসারেই ভাস্করাচার্য্যের পরিচয় প্রদান করা হইয়া থাকে। ভাস্করাচার্য্যের নিজের উক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে বুঝা যায়, সহ্য কুলাচলাশ্রিত বিদ্বজ্জন-পরিপূর্ণ নানাসজ্জনাধার বিজ্জড়বিড় * নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রজ। তাঁহার পিতা মহেশ্বর দৈবজ্ঞ (মহেশাচার্য্য) নামে প্রখ্যাত। পাটনে এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সেই শিলালিপি প্রকাশিত আছে। তদনুসারে অবগত হওয়া যায়,—'পাটনে ভবানী-মন্দিরে তত্রত্য রাজা সিংঘন চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে ভাস্করাচার্য্যের পৌত্র চঙ্গদেব একটী মঠ স্থাপন করেন। সেই মঠে ভাস্করাচার্য্যের এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-গণের গ্রন্থাদি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। মঠে ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যাপনাও হইত। ভাস্করাচার্য্যের পিতৃপুরুষগণ সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতা মহেশ্বরাচার্য্য 'কবীশ্বর' বলিয়া প্রখ্যাত। তাঁহার পিতামহ মনোরথ। প্রপিতামহ গোবিন্দ 'সর্ব্বজ্ঞ' বলিয়া অভিহিত হইতেন। ভাস্করাচার্য্যের বৃদ্ধ-প্রপিতামহের নাম—ভাস্কর ভট্ট। তাঁহারি বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া ভোজরাজ তাঁহাকে 'বিদ্যাপতি' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ভোজরাজের পিতার নাম—ত্রিবিক্রম। তিনি 'কবিচক্রবর্ত্তী' বলিয়া পরিচিত। যেমন পূর্ব্বপুরুষগণ, তেমনই পুত্র-পৌত্রাদি। ভাস্করের পুত্র লক্ষ্মীধর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রহযাগ-বিশারদ ছিলেন। পাটনের রাজা জৈত্রপাল তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন রাজ্যে লইয়া যান। সেই হইতে রাজা জৈত্রপালের পুত্র সিংঘনই চঙ্গদেবকে মঠ-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছিলেন;' ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী

* বিজ্জড়বিড় অধুনা বীরগ্রাম নামে অভিহিত। বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর আহম্মদনগরের চল্লিশ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে ঐ গ্রাম বিদ্যমান আছে। লীলাবতী গ্রন্থে 'গণেশায় নমো নীলকমলামলকান্তয়ে' এইরূপ মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হয়। এতদুক্ত নীলমূর্ত্তি গণেশ ঐ গ্রামের অনতিদূরে আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্বন্ধে বিবিধ মত প্রচারিত আছে। এক মত এই যে, ঐ গ্রন্থ লীলাবতী নাম্নী মহিলার রচিত। সে মতে আস্থা স্থাপন করিলে বুঝিতে পারা যায়,—সে দিন পর্য্যন্তও এ দেশের মহিলাগণ কীদৃশী বিদ্যাবতী ছিলেন! গ্রন্থখানি যদি লীলাবতীর রচনা না হইয়া ভাস্করাচার্য্যের রচনা হইত, তাহা হইলে কখনই উহার নাম 'লীলাবতী' হইত না। বীজগণিত, গ্রহগণিতাধ্যায়, গোলাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার গ্রন্থের নাম; তিনি কেন আপন গ্রন্থের 'লীলাবতী' নাম প্রদান করিবেন? এই যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে লীলাবতীকেই লীলাবতী-গ্রন্থের রচয়িত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অন্য মতে, ভাস্করাচার্য্যই লীলাবতী-গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থের নামকরণে লীলাবতীর প্রতি তাঁহার স্নেহের নিদর্শন বিদ্যমান। লীলাবতীর সহিত ভাস্করাচার্য্যের সম্বন্ধের বিষয় পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। কেহ বলেন,—লীলাবতী ভস্করাচার্য্যের পত্নী ছিলেন। কেহ বলেন,—লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা ছিলেন। * ভাস্করাচার্য্যের পর যাঁহারা গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আধুনিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে তাঁহাদেরও অনেকে যে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। গণেশ দৈবজ্ঞ নামে দুই জন জ্যোতির্ব্বিদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের একজন 'গ্রহলাঘব' গ্রন্থের এবং অপর জন 'জাতকালঙ্কার' গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া পরিচিত। প্রথমোক্ত গণেশ দৈবজ্ঞের পিতার নাম—কেশব দৈবজ্ঞ। তাঁহাদের নিবাস—নন্দীগ্রাম। তাঁহারা কৌশিকী-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয়োক্ত গণেশ দৈবজ্ঞের পিতার নাম—গোপাল দৈবজ্ঞ। তাঁহারা ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের নিবাস—গুজরাট প্রদেশের সূর্য্যপুর গ্রামে। ১৪৪২ শকাব্দে (১৫২০-২১ খৃষ্টাব্দে) 'গ্রহ লাঘব" গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল প্রতিপন্ন হয়। মহারাষ্ট্র-দেশে পুণা-নগরে কমলাকর জ্যোতিষী জ্যোতিষ-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 'সিদ্ধান্ত-তত্ত্ববিবেক' গ্রন্থের রচয়িতা। ১৫৮০ শকাব্দে (১৬৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'যবন-সিদ্ধান্ত' অনুসরণে তাঁহার ঐ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। বলভদ্র নামক আর একজন জ্যোতির্ব্বিদের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার 'সন্ধায়ন-রত্ন' গ্রন্থে অনেক তত্ত্ব বিবৃত আছে। 'সন্ধায়ন-রত্ন' গ্রন্থে প্রকাশ,—যবনাচার্য্য 'জাতক-স্কন্ধ' বিষয়ক 'তাজিক' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থ পারসিক-ভাষায় লিখিত ছিল। মিবারের রাণা সংগ্রামসিংহ (সমরসিংহ) উহার অনুবাদ করাইয়াছিলেন। সন্ধায়ন-রত্নে যবনাচার্য্যের যে পরিচয় আছে, তাহাতে তিনি যবন † নামে অভিহিত। উক্ত গ্রন্থে দুন্মুখাচার্য্য, যবনাচার্য্য এবং হিল্লাল প্রভৃতি আরও

* পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৩৪ম পৃষ্ঠায় লীলাবতীর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

† উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকে যবন (জবন) নাম দৃষ্টে কেহ কেহ ভারতবর্ষে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আধুনিকত্ব প্রমাণের প্রয়াস পান। তাঁহাদের মতে, যবন বা গ্রীস-দেশীয় পণ্ডিতগণ যখন জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সেই সময়ই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে দুইটী বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষীয় কোনও জ্যোতির্ব্বিদের যবন নাম ছিল, বলা যাইতে পারে; অথবা ক্রিয়ালোপ-হেতু যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হন, (মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৪৪শ শ্লোক—"কম্বোজা যবনা শকাঃ।") তাঁহাদের মধ্যে যবন জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। সেই

কয়েকজন জ্যোতির্ব্বিদের পরিচয় পাওয়া যায়। 'রোমক-সিদ্ধান্ত' নামে একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ আছে। যাবনিক ভাষায় ঐ গ্রন্থ লিখিত ছিল; পরিশেষে উহা সংস্কৃত-ভাষায় অনুবাদিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি। কিন্তু 'রোমক-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থ যে প্রথমে সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল বা এদেশীয় পণ্ডিতগণের উপদেশ অনুসারে রচিত হইয়াছিল, রোমক-সিদ্ধান্তেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমক-সিদ্ধান্তের একটী শ্লোকে লিখিত আছে,—

"ব্রহ্মণা গদিতং ভানোর্ভানুনা যবনায় যৎ।
যবনেন চ যৎ প্রোক্তং তাজিকং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্॥"

অর্থাৎ,—'ব্রহ্মার নিকট হইতে সূর্য্য এবং সূর্য্যের নিকট হইতে যবন উপদেশ প্রাপ্ত হন। যবন যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই 'তাজিক' গ্রন্থ নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই শ্লোক দৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন,—'এই সূর্য্য সূর্য্যবংশীয় কোনও ব্যক্তির নাম। তাঁহার নিকট হইতে কোনও যবন (গ্রীক) বা যবন নামক কোনও পণ্ডিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রোমক সিদ্ধান্ত প্রভৃতি তাহারই অনুকৃতি।' রোমক-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ কোনও যাবনিক ভাষার গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে মনে করিয়া, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ইউরোপকে ভারতের জ্যোতির্ব্বিদ্যার ভিত্তিভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু যদি 'রোমক-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থ পাশ্চাত্য কোনও গ্রন্থের অনুবাদ হয়, (যদিও তাহার প্রমাণ নাই), তথাপি উহা যে আধুনিক-কালের ঘটনা এবং উহার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষ গণিত-জ্যোতিষাদির আলোচনায় প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে আদৌ সংশয় নাই।

প্রাচীন ভারতবর্ষে গণিত-বিজ্ঞান আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। যাঁহারা বৈদিক-কাল, পৌরাণিক-কাল,—এইরূপ কাল বিভাগ করিয়া ভারতবর্ষের সভ্যতার বিচার করিতে প্রবৃত্ত; পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, —কিবা বৈদিক কালে, কিবা পৌরাণিক কালে—স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে গণিত-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তবে গণিতের কোন্ বিভাগ কি ভাবে পরিপুষ্ট হয়, এইবার তাহার একটু আভাষ দিবার প্রয়াস

জ্যামিতি-তত্ত্ব।

ও 'জবন' দুই প্রকার বর্ণ-বিন্যাস দেখিয়া কেহ কেহ বলেন,—'যবন ও জবন দুই ব্যক্তি ছিলেন। একজন ভারতবর্ষীয়, অপর একজন গ্রীসদেশীয়। যাঁহার নামে বর্গীয় জ-কার ব্যবহৃত, তিনি ভারতের ঋষি মধ্যে পরিগণিত; আর যাঁহার নামে য-কার ব্যবহৃত, তিনি গ্রীস-দেশীয়।' পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যবন শব্দে প্রধানতঃ গ্রীসদেশকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস, যবন শব্দ কুৎসাবাচক; মুসলমানদিগকে গালি দিবার উদ্দেশ্যে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। কারণ, ইসলাম-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে ঐ শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে। উহা গ্লানিবাচক শব্দ নহে। তার পর, যবন ও ম্লেচ্ছ শব্দ সমসংজ্ঞাবাচক হইলেও যবন বা ম্লেচ্ছের মধ্যে কেহ যদি গুণী জ্ঞানী হইতেন, তাঁহার সম্মানের অবধি ছিল না। 'সন্ধ্যায়নরত্নের' একটী শ্লোকেই তাহা প্রতীত হয়। যথা,—

"ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু সম্যকশাস্ত্রমিদং স্থিতং। ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দ্দৈববদ্দ্বিজঃ॥"

অর্থাৎ,—জ্যোতিষ শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞানলাভ করিলে, ম্লেচ্ছ ও যবনগণও ঋষিগণের ন্যায় সম্মানার্হ হন। দেবোপম ব্রাহ্মণগণ তৎশাস্ত্রজ্ঞানে পূজনীয় হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিদ্যার আদর এদেশে

পাইতেছি। প্রথমে জ্যামিতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাউক। কিছুদিন পূর্ব্বে জ্যামিতি সম্পূর্ণ বৈদেশিক সামগ্রী বলিয়া এদেশে প্রচারিত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষই যে জ্যামিতির উৎপত্তি-স্থান, তখন এ কথা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ কথা যদি কেহ বলিবার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি হাস্যাস্পদ হইতেন। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির তালিকা সংক্রান্ত গ্রন্থে মিঃ বার্ণেল এতদ্বিষয়ের আভাষ দেন। তাঁহার পর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর জি থিবো (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার) এতদ্বিষয়ে জন-সাধারণের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেন। বৈদিক যাগযজ্ঞে নানাবিধ বেদীর প্রয়োজন হইত। সেই সকল বেদী প্রস্তুতের জন্য বহু সূত্র প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সূত্র-সমূহ জ্যামিতির এক একটী প্রতিজ্ঞা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সূত্রগুলি 'শুল্বসূত্র, নামে পরিচিত। বৈদিক কল্পসূত্র-সমূহ বেদোক্ত বিবিধ ক্রিয়াকর্ম্মের উপদেশমূলক। তন্মধ্যে শুল্বসূত্রগুলিতে বেদী-নির্ম্মাণ-প্রণালী পরিবর্ণিত। কিরূপ যজ্ঞে কিরূপ ভাবের বেদীর প্রয়োজন,—সেইরূপ বেদীর কিরূপ ভূমি, কিরূপ ক্ষেত্র, কিরূপ ভুজ, কিরূপ কোণ, কিরূপ কর্ণ, কিরূপ লম্ব, কিরূপ ভাগ, কিরূপ পরিমাণ হইবে,—শুল্বসূত্রগুলিতে তাহাই লিখিত আছে। কি কারণে, শুল্বসূত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে থিবো যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা অবশ্য তাহার সকল মতের অনুমোদন করি না। তিনি বলিয়াছেন,—'গার্হপত্য বেদী প্রস্তুতের প্রয়োজন হইলে, পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা বিচার-বিতর্ক উপস্থিত হয়। কেহ বলেন,—উহা বর্গক্ষেত্র বা সমচতুর্ভুজাকৃতি হইবে। কেহ বলেন,—উহার আকার বৃত্তের ন্যায় হওয়া আবশ্যক। শুল্ব-সূত্রের পরিভাষা অংশে ব্রাহ্মণগণের এই বিতর্কের ফলাফল লিখিত আছে। তন্মধ্যে একটী বিষয় বিশেষভাবে আলোচনার উপযোগী। সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন বাহুর উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ সমকোণের পার্শ্বস্থ দুই বাহুর উপর অঙ্কিত দুই সমচতুর্ভুজের সমান; অর্থাৎ, ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ভাগের সপ্তচত্বারিংশ প্রতিজ্ঞাটী, সেই শুল্বসূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট আছে। তদ্দৃষ্টে বুঝা যায়, জ্যামিতির এই প্রতিজ্ঞার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া পীথাগোরাস যে যশের অধিকারী হইয়াছেন, বহু পূর্ব্বে প্রাচীন আচার্য্যগণ সে প্রতিজ্ঞার বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন; অন্ততঃ ঐ প্রতিজ্ঞার মূল-তত্ত্ব তাঁহারা যে অবগত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। প্রথমে তাঁহারা একটী সমচতুর্ভুজের বা বর্গক্ষেত্রের দ্বিগুণ একটী বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত-করণের সূত্র উদ্ভাবন করেন। পরিশেষে তাঁহারা একটী নির্দ্দিষ্ট সমচতুর্ভুজের সমান করিয়া আর একটী সমচতুর্ভুজ অঙ্কিত করিবার সূত্র-সংগঠনে প্রবৃত্ত হন। ঐ দুই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে গিয়া দুইটী প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, জ্যামিতির সপ্তচত্বারিংশ প্রতিজ্ঞা সেই দুই প্রতিজ্ঞারই অন্তর্ভুক্ত। প্রতিজ্ঞা দুইটীর বিষয় একে একে উল্লেখ করিতেছি। প্রথম প্রতিজ্ঞা বিষয়ে মহর্ষি বোধায়নের সূত্র; যথা,—

"সমচতুরস্রস্যাক্ষ্ণয়ারজ্জুর্দ্বিস্তাবতীং ভূমিং করোতি।"

সমচতুরস্রের অর্থাৎ সমচতুর্ভুজের কর্ণের উপর একগাছি রজ্জু বিস্তৃত কর। উহার বর্গফল সমচতুর্ভুজের যে কোনও বাহুর বর্গফলের দ্বিগুণ হইবে। ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয়,—সমচতুর্ভুজের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র সেই সমচতুর্ভুজের দ্বিগুণ। ক খ গ ঘ একটি

সমচতুরস্র অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র। উহার ক ঘ কর্ণের উপর সমচতুরস্র বা বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত হইলে, তাহা ক গ ঘ খ সমচতুরস্রের দ্বিগুণ হইবে। আপস্তম্ব এবং কাত্যায়নও এইরূপ দুইটী সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, আপস্তম্ব—'চতুরস্রস্যাক্ষয়ারজ্জু-দ্বিস্তাবতীং ভূমিং করোতি।' কাত্যায়ন,—'সমচতুরস্রস্যাক্ষয়া-রজ্জুর্দ্বিকরণী।' অর্থাৎ,—সমচতুরস্রের কর্ণের পরিমাণ যে রজ্জু, তাহার বর্গফল সেই সমচতুরস্রের দ্বিগুণ হইবে। ফলতঃ, একই প্রকারের উক্তি উল্লিখিত তিনটী সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, এবং ঐ উক্তির মূলে জ্যামিতির প্রথম ভাগের সপ্তচত্বারিংশ প্রতিজ্ঞার মূল সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। শুল্বসূত্রে যে স্থলে 'সমচতুরস্র' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে,
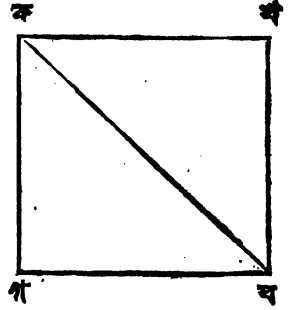
তাহার সকল স্থলেই উহাতে সমকোণী সমচতুর্ভুজ বা বর্গক্ষেত্র বুঝাইয়াছে। 'সম' শব্দে চারি বাহুর সমতা বা সমান পরিমাণ এবং চতুরস্র শব্দে চারি কোণ সমকোণ অর্থ সূচিত হইয়া থাকে। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে সমচতুরস্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়,—(১) সমকর্ণ সমচতুর্ভুজ ও (২) বিষমকর্ণ সমচতুর্ভুজ। 'অক্ষয়ারজ্জু' শব্দে কর্ণ-রজ্জু বা কর্ণকে বুঝাইয়া থাকে। ভূমি শব্দে প্রথমে বর্গফল বা পরিমাণ-ফল বুঝাইত। কিন্তু এখন ঐ শব্দে ত্রিভুজের বা কোনও ক্ষেত্রের বাহু-বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। অধুনা-প্রচলিত জ্যামিতি-গ্রন্থে যেমন ভূমি, ক্ষেত্র, কোটী, কর্ণ, ত্রিভুজ, সমকোণ প্রভৃতি এক একটী বিষয় সম্বন্ধে এক একটী সূত্র আছে, সূত্র-গ্রন্থেও সে পরিচয় দেখিতে পাই। যথা, মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—

"করণী তৎকরণী তির্য্যঙ্‌মানী পার্শ্বমান্যক্ষয়েতি রজ্জবঃ।"

নির্দ্দিষ্ট কোনও বর্গক্ষেত্রের বাহুকে 'করণী' বলে। সেই বর্গক্ষেত্রের দ্বিগুণাকার বর্গক্ষেত্র হইলে, তাহার এক একটী বাহুকে দ্বিকরণী বলা হয়। 'কর্ণ' বুঝাইতেও 'করণী' শব্দ প্রযুক্ত হয়। এইবার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার বিষয় আলোচনা করা যাউক। বৌধায়ন সূত্র,—

"দীর্ঘচতুরস্রস্যাক্ষয়ারজ্জুঃ পার্শ্বমানী তির্য্যঙ্‌মানী চ যৎপৃথগ্-
ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি।"

দীর্ঘচতুরস্রের অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের কর্ণের পরিমাণ-ফল—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই বাহুর পরিমাণ-ফলের সমান হইবে। অর্থাৎ, আয়ত-ক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত সমচতুরস্র সমকোণের পার্শ্বস্থ দুই বাহুর উপর অঙ্কিত সমচতুরস্রের সমান হইবে। ক গ ঘ খ একটী দীর্ঘচতুরস্র বা আয়তক্ষেত্র। উহার ক ঘ কর্ণের উপর অঙ্কিত সমচতুরস্র ক গ ও গ ঘ দুই বাহুর উপর অঙ্কিত সমচতুরস্রের সমান হইবে। কাত্যায়ন প্রভৃতির সূত্র মধ্যেও এই একই মত দেখিতে পাই। কাত্যায়ন—বৌধায়নের উক্তিরই সমর্থন করিয়াছেন। দীর্ঘচতুরস্র শব্দে আয়তক্ষেত্র বুঝায়। সেই আয়তক্ষেত্রের সমান্তরাল দুই বাহু পরস্পর সমান এবং চারিটী কোণই সমকোণ।
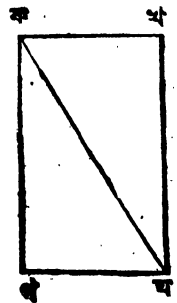
'পার্শ্বমানী রজ্জুঃ' শব্দে আয়তক্ষেত্রের দীর্ঘবাহুদ্বয়কে বুঝায়। বৃহৎ দুই বাহু সেই দুই বাহুর

উপর লম্বভাবে দণ্ডায়মান এবং প্রত্যেক কোণ সমকোণ। 'পৃথগ্‌ভুতে' শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে,—দুইটী বাহুকে একত্র করিয়া লইয়া তাহার উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজের বর্গফল ধরিয়া লওয়ার বিধি নহে; পরন্তু বাহুদ্বয়কে স্বতন্ত্ররূপে ধরিয়া লইয়া প্রত্যেকটির উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজের বর্গফল ঠিক করিয়া লওয়াই নিয়ম। অর্থাৎ,—'পৃথগ্‌গ্রহণম্ সমসর্গ-মাভূদিতি এবমর্থম্।' বৌধায়নের আর একটি সূত্রের উল্লেখ করিতেছি। সেই সূত্রটির মধ্যেও জ্যামিতির সপ্তচত্বারিংশ প্রতিজ্ঞার মূল তত্ব নিহিত আছে। সূত্রটি এই,—

"ত্রিকচতুষ্কয়োর্দ্বাদশিকপঞ্চিকয়োঃ পঞ্চদশিকাষ্টিকয়োঃ সপ্তিকচতুর্বিংশিকয়োঃ দ্বাদশিকপঞ্চত্রিংশিকয়োঃ পঞ্চদশিকষট্‌ত্রিংশিকয়োরিত্যেতাস্বুপলব্ধিঃ।"

এই সূত্রটিতে ছয়টি ত্রিভুজের দুইটি করিয়া বাহুর পরিমাণের বিষয় লিখিত আছে। ছয়টি ত্রিভুজের প্রত্যেকের বাহুদ্বয়ের পরিমাণ—যথাক্রমে ৩ ও ৪, ১২ ও ৫, ১৫ ও ৮, ৭ ও ২৪, ১২ ও ৩৫, ১৫ ও ৩৬। সূত্রকার বলিতেছেন,—যে সকল ত্রিভুজের বাহুদ্বয়ের পরিমাণ ঐরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাদের কর্ণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা সুসাধ্য; অর্থাৎ,—সেই সকল ত্রিভুজের কর্ণ (ভগ্নাংশ-রহিত) অখণ্ড রাশি হইবে। ক খ গ একটি সমকোণী ত্রিভুজ। ঐ ত্রিভুজের ক খ বাহুর পরিমাণ ৪ এবং খ গ বাহুর পরিমাণ ৩; তাহা হইলে উহার কর্ণ ক গ অখণ্ড রাশি হইবে। জ্যামিতির সপ্তচত্বারিংশ প্রতিজ্ঞার মর্ম্মানুসারে জানিতে পারি, সমকোণের সম্মুখীন বাহুর বা কর্ণের উপর অঙ্কিত সমচতুরস্রের ক্ষেত্রফল, পার্শ্বস্থ দুই বাহুর উপর অঙ্কিত সমচতুরস্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান। অর্থাৎ, $ক খ^২ + খ গ^২ = ক গ^২$। অতএব $৪^২ + ৩^২ = ক গ^২$ অর্থাৎ, $১৬ + ৯ = ক গ^২$; অথবা $২৫ = ক গ^২$। তাহা হইলে $৫ = ক গ$। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে,—যে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের পার্শ্বস্থ দুই বাহুর পরিমাণ যথাক্রমে ৪ ও ৩, তাহার কর্ণের পরিমাণ ৫ অর্থাৎ অখণ্ডিত রাশি হইবে।
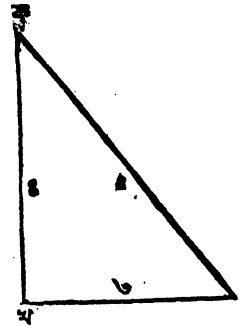
লীলাবতী গণিত-গ্রন্থের ক্ষেত্রব্যবহার-প্রকরণেও এই উদাহরণটি ঠিক এই ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—ভুজ ও কোটীর পৃথক পৃথক বর্গ নির্ণয় করিয়া সেই সেই বর্গফলের যোগ কর। এই যোগফলের মূলই (বর্গমূলই) কর্ণের পরিমাণ হইবে। বৌধায়ন যে ছয় প্রকার ত্রিভুজের বাহুদ্বয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার সকল গুলিরই কর্ণের পরিমাণ এইরূপ অখণ্ডরাশি নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সূত্রটী কেবল জ্যামিতি বিষয়ক জ্ঞানের পরিচায়ক নহে; পরন্তু, ইহার মধ্যে ক্ষেত্রব্যবহারে—পরিমিতি-তত্বে অভিজ্ঞতার নিদর্শনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সূত্র-সাহিত্যে গণিত-বিজ্ঞানের সকল অঙ্গেরই স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই। জ্যামিতি, পরিমিতি, পাটীগণিত, বীজগণিত,—সকলই উহার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সোমযাগে বেদী প্রস্তুতকরণ-প্রণালী বিষয়ে সূত্রগ্রন্থে একটী সূত্র দৃষ্ট হয়। বেদীর কোন্ পার্শ্ব কিরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট হইবে এবং কিরূপভাবে বেদী অঙ্কিত করা আবশ্যক, সূত্রটীতে তাহার পরিচয় আছে। তার পর, বেদী প্রস্তুত হইলে সেই বেদীর পরিমাণ-ফল কিরূপ

ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে, সূত্রকার তাহার আলোচনা করিয়াছেন। বেদী-নির্ম্মাণ সংক্রান্ত আপস্তম্বের একটি সূত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সূত্রটি এই,—

ত্রিংশৎপদানি প্রক্রমা বা পশ্চাত্তিরশ্চী ভবতি ষট্‌ত্রিংশৎ প্রাচী
চতুর্বিংশতিঃ পুরস্তাত্তিরশ্চীতি সৌমিক্যা বেদের্বিজ্ঞায়তে।"

বেদীর পশ্চিম পার্শ্বের পরিমাণ ত্রিংশ পদ বা প্রক্রম। বেদীর পূর্ব্ব পার্শ্বের পরিমাণ চতুর্ব্বিংশতি পদ বা প্রক্রম। বেদীর প্রাচী অর্থাৎ পশ্চিম পার্শ্বের মধ্য হইতে পূর্ব্ব পার্শ্বের মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃতির পরিমাণ ছত্রিশ পদ বা প্রক্রম। পার্শ্বস্থ চিত্রের ক খ পশ্চিম পার্শ্ব; উহার পরিমাণ ত্রিংশ পদ বা প্রক্রম। গ ঘ বেদীর পূর্ব্ব পার্শ্ব; উহার পরিমাণ চতুর্ব্বিংশ পদ বা প্রক্রম। চ ছ বেদীর প্রাচী-রেখা; উহার পরিমাণ ষট্‌ত্রিংশ পদ বা প্রক্রম! সোমযাগের বেদী এইরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট হইবে। ক খ গ ঘ বেদীর চারিটি কোণ। ক কোণের নাম উত্তর শ্রোণী, খ কোণের নাম দক্ষিণ শ্রোণী। ঘ কোণের নাম দক্ষিণ অংশ এবং গ কোণের নাম উত্তর অংশ। যাহা হউক, এইরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট বেদী প্রস্তুত হইলে তাহার পরিমাণ-ফল কত হইতে পারে? সূত্রকার অতি বিচক্ষণতার সহিত অভিনব প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

"ষট্‌ত্রিংশিকায়া মেহষ্টাদশোপসমস্যাপরস্মাদন্তাদ্ দ্বাদশসু লক্ষণং
পঞ্চদশসু লক্ষণং পৃষ্ঠ্যান্তয়োরন্তৌ নিয়ম্য পঞ্চদশিকেন দক্ষিণাপায়ম্য
শঙ্কুং নিহন্ত্যেবমুত্তরতন্তে শ্রোণী বিপর্য্যস্যাংসৌ পঞ্চদশিকেনৈবা-
পায়ম্য দ্বাদশিক শঙ্কুং নিহন্ত্যামুত্তরতস্তাবংসা তদেকরজ্জ্বা বিহরণম্।"

প্রাচীর দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ ছত্রিশের সহিত আঠার যোগ কর। পশ্চিম পার্শ্বের সীমা রেখায় পঞ্চদশ পদ এবং পূর্ব্ব পার্শ্বের সীমা রেখায় দ্বাদশ পদ (অর্থাৎ উভয়ের মধ্য-বিন্দু) চিহ্নিত কর। অতঃপর ৫৪ পদ পরিমিত রজ্জু প্রাচীর দুই মুখে বা সীমন্ত-বিন্দুতে আবদ্ধ কর। সেই রজ্জু দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে টানিয়া প্রাচী-মূলে সমকোণ করিলে একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কিত হইতে পারে। ঐ ভাবে ঐ রজ্জু আকর্ষণ করিলে, দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকেও ঐরূপ আর একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত হইতে পারিবে। যেমন, ছ চ ক এবং ছ চ খ ত্রিভুজদ্বয়। সেই দুইটি ত্রিভুজের ছ চ বাহুর পরিমাণ ৩৬, চ ক বা চ খ বাহুর পরিমাণ ১৫ এবং উহাদের কর্ণের অর্থাৎ কছ বা খছ বাহুর পরিমাণ ৩৯ হয়। আবার পূর্ব্বোক্ত রজ্জুকে যদি ছ ঘ বা ছ গ রেখার সহিত সমসূত্রে রাখিয়া দুই পার্শ্বে দুইটি ত্রিভুজ অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে চ ছ জ, চ ছ ঝ দুইটি ত্রিভুজ অঙ্কিত হইবে। আর সেই দুইটি ত্রিভুজের কর্ণের ও বাহুদ্বয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৯, ৩৬ ও ১৫ হইবে।
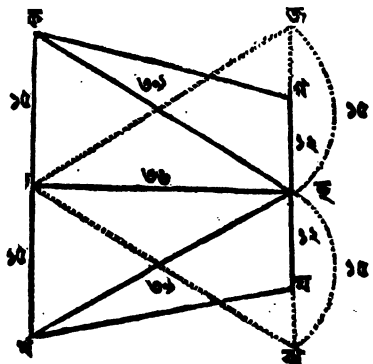
এইরূপভাবে বেদীর পরিমাণ-ফল

নির্দ্ধারণে যে কিছু প্রক্রিয়া, তাহার মূল সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাহু-নির্দ্ধারণের উপর নির্ভর করিতেছে। উপরে যে পদ্ধতির বিষয় বিবৃত হইল, তদ্ভিন্ন আরও তিন প্রকার প্রক্রিয়ায় বেদীর পরিমাণ-ফল নির্দ্ধারিত হইতে পারে। সূত্রকার বলিয়াছেন,—"ত্রিকচতুষ্কয়োঃ পঞ্চিকাক্ষয়ারজ্জুঃ।" আয়তক্ষেত্রের অর্থাৎ সমকোণী চতুর্ভুজের সমকোণের পার্শ্বস্থ বাহুদ্বয়ের পরিমাণ যদি যথাক্রমে ৩ ও ৪ হয়, তাহা হইলে উহার কর্ণের পরিমাণ ৫ হইবে। (পূর্ব্বে এ বিষয় প্রতিপন্ন হইয়াছে)। "তাভিস্ত্রিরভ্যস্তাভিরংসৌ।" পূর্ব্বোক্ত ত্রিভুজের বাহুত্রয়ের বা রজ্জুর প্রত্যেকটিকে চতুর্গুণ করিলে, বেদীর দুইটি পূর্ব্বকোণ নির্দ্ধারিত হয়। চ ছ প্রাচী রেখার ছ বিন্দু হইতে ১৬ পদ অন্তরে পশ্চিমে জ বিন্দু নির্দ্ধারণ কর। অবশেষে বত্রিশ পদ পরিমিত একগাছি রজ্জু লইয়া ছ বিন্দু হইতে ত্রিভুজাকারে ঘুরাইয়া জ বিন্দুর সহিত সংযুক্ত কর। অর্থাৎ, ছ ঘ জ ত্রিভুজ অঙ্কিত হউক। তাহা হাইলে যে সমকোণীত্রিভুজ গঠিত হইবে, তাহার সমকোণের পার্শ্বের দুই ভুজের পরিমাণ যথাক্রমে ১৬ ও ১২ এবং কর্ণের পরিমাণ ২০ হইবে।
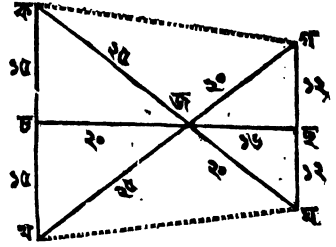
অপর পার্শ্বেও আর একটি ত্রিভুজ অর্থাৎ ছ গ জ অঙ্কিত করা যাইতে পারে। ইহার পর অন্য একটি সূত্রে পশ্চিম-উত্তরের ও পশ্চিম-দক্ষিণের কোণ-নির্দ্দেশের ব্যবস্থা আছে। সূত্রটি এই,—'চতুরভ্যস্তাভিঃ শ্রোণী।" পূর্ব্বোক্ত রজ্জুকে পাঁচ গুণ বর্দ্ধিত করিলে পশ্চিম দিকের (উত্তর-পশ্চিমের ও দক্ষিণ-পশ্চিমের) দুইটি কোণ নির্দ্ধারিত হয়। এস্থলে চল্লিশ পদ দীর্ঘ রজ্জু গ্রহণ করিলে যথাক্রমে চ ক জ ও চ খ জ ত্রিভুজ-দ্বয় অঙ্কিত হইতে পারে। এ প্রক্রিয়ায়ও সমকোণী ত্রিভুজের দুই বাহুর ও সমকোণের পরিমাণ বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। অন্য আর একটী সূত্রে আর এক প্রকারে বেদীর পরিমাণ-ফল নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

"দ্বাদশীকপঞ্চিকয়োস্ত্রয়োদশিকাক্ষয়ারজ্জুস্তাভিরংসৌ।'

সমকোণী চতুর্ভুজের দুইটী বাহুর পরিমাণ ১২ ও ৫ হইলে, তাহার কর্ণের পরিমাণ ১৩ হইবে। পূর্ব্ব প্রকার রজ্জুর দ্বারা পূর্ব্ব প্রকার পদ্ধতি ক্রমেই তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। আর এক প্রকার প্রক্রিয়ার বিষয় আর একটী সূত্রে গ্রথিত আছে। সূত্রটী এই,—"পঞ্চদশিকাষ্টিকয়োঃ সপ্তদশিকাক্ষয়ারজ্জুস্তাভিঃ শ্রোণী।" অর্থাৎ,—কোনও সমকোণী চতুর্ভুজের সমকোণের পার্শ্বস্থ দুই বাহুর পরিমাণ ১৫ ও ৮ হইলে, তাহার কর্ণের পরিমাণ ১৭ সপ্তদশ হইবে। এই নিয়মে বেদীর পশ্চিমাংশের দুইটী শ্রোণী নির্দ্ধারিত হয়। ভপিচ, অন্য আর একটি সূত্রে পূর্ব্বদিকের দুইটী কোণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সেই সূত্রটী,—"দ্বাদশিকপঞ্চত্রিংশিকয়োঃ সপ্তত্রিংশিকাক্ষয়ারজ্জুস্তাভিরংসৌ।" অর্থাৎ,—কোনও সমকোণী চতুর্ভুজের সমকোণের পার্শ্বস্থ দুই বাহুর পরিমাণ যদি ১২ ও ৩৫ হয়, তাহা হইলে তাহার কর্ণের পরিমাণ ৩৭ হইবে। শেষোক্ত প্রক্রিয়া দুইটিও চিত্রের দ্বারা প্রকটন করা যায়। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে আমরা তদঙ্কনে বিরত হইলাম। যাহা হউক, এই সকল সূত্রের আলোচনায় স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে,

রাস কর্ত্তৃক জ্যামিতি-তত্ত্ব প্রচারের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষ—কেবল কল্পনায় নহে, আপনাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহারিক কার্য্যেও জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা-সমূহের প্রয়োগ-প্রণালী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

সমকোণী আয়তক্ষেত্রের কর্ণ ও বাহুর পরিমাণ অনেক স্থলে অবিমিশ্র রাশিতে ব্যক্ত করা যায় বটে; কিন্তু সমকোণী সমবাহু চতুর্ভুজের কর্ণের পরিমাণ তদ্রূপ রাশি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে কি-না, সূত্রকারগণ তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। সমকোণী সমচতুর্ভুজের বাহুর সহিত কর্ণের সম্বন্ধের যে অনুপাত, তাহাতে অবিমিশ্র রাশিতে কর্ণের পরিমাণ ব্যক্ত করা যায় না। পরন্তু মিশ্র রাশিতেও সে পরিমাণ স্থূলভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়। এ তত্ত্বও সূত্র-গ্রন্থে সুচারুরূপে ব্যক্ত আছে। সমকোণী সমচতুর্ভুজের কর্ণ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বৌধায়ন বলিয়াছেন,—

গণিত-তত্ত্ব।

"প্রমাণং তৃতীয়েন বর্দ্ধয়েত্তচ্চ চতুর্থেনাত্মচতুস্ত্রিংশোনেন। সবিশেষঃ॥"

অর্থাৎ,—বাহুর পরিমাণের সহিত তাহার এক-তৃতীয়াংশ যোগ কর; তাহার সহিত পুনরায় সেই এক-তৃতীয়াংশের চতুর্থ-ভাগ যোগ কর। তাহাতে যে রাশি পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত এক-তৃতীয়াংশের চতুর্থ-ভাগের এক-চতুস্ত্রিংশ অংশ বিয়োগ কর। সেই বিয়োগ-ফলই কর্ণের পরিমাণ। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে রাশি পাওয়া যাইবে, তাহার নাম সবিশেষ। এ বিষয়ে আপস্তম্বের সূত্রও বৌধায়নের সূত্রের অনুরূপ। অর্থাৎ, উভয়ের সূত্রের ভাষা অভিন্ন। এতৎসম্বন্ধে মহর্ষি কাত্যায়নের সূত্রের ভাষা অনুরূপ। যথা,—

"করণীং তৃতীয়েন বর্দ্ধয়েত্তচ্চ সচতুর্থেনাত্মচতুস্ত্রিংশোনেন সবিশেষ ইতি বিশেষঃ॥"

মূলে দুইটি সূত্রই অভিন্ন। সূত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা টিকাকারগণ বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা,—সমকোণী সমচতুর্ভুজের কর্ণের পরিমাণ হইবে $১+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩\times৪}-\frac{১}{৩\times৪\times৩৪}$। এই অঙ্ককে দশমিক ভগ্নাংশে পরিবর্ত্তিত করিলে, ইহারে ফল ১.৪১৪২১৫৬... হয়। সূত্রের নিয়মানুসারে কর্ণের পরিমাণ এইরূপই নির্দ্ধারিত হয় বটে; কিন্তু আধুনিক গণনা অনুসারে ঐ পরিমাণে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। এখনকার হিসাবে সমকোণী সমচতুর্ভুজের বাহুর পরিমাণ ১ হইলে, কর্ণের পরিমাণ $\sqrt{২}=$ ১.৪১৪২১৩......হয়। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগহারের সরল প্রক্রিয়া দ্বারা ঋষিগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বর্গমূল বাহির করিবার প্রণালী শিক্ষা না করিলে অধুনা সে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ফলতঃ, গণিত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার এ যে পূর্ণ নিদর্শন, তাহাতে সংশয় নাই।

একটী নির্দ্দিষ্ট সমকোণী সমচতুর্ভুজের দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ সমচতুরস্র অঙ্কন করিবার প্রণালী, একটি সমকোণী সমচতুর্ভুজকে বৃত্তাকারে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া, একটি বৃত্তকে একটি সমকোণী সমচতুর্ভুজে পরিবর্ত্তন করিবার পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও সূত্র-সাহিত্যে অশেষ গবেষণা দৃষ্ট হয়। জ্যামিতি-তত্ত্বে প্রাচীন ভারতবর্ষে অভিজ্ঞতার তাহা প্রকৃষ্ট পরিচয়। সমকোণী সমচতুর্ভুজের কর্ণের উপর অঙ্কিত সমকোণী সমচতুর্ভুজ তাহার দ্বিগুণ হয়, পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সমচতুর্ভুজ প্রসঙ্গ।

সুতরাং কোনও সমচতুরস্রের দ্বিগুণ কোনও সমচতুরস্র অঙ্কিত করিতে হইলে, তাহার কর্ণকে বাহু করিয়া সমচতুরস্র অঙ্কিত করিলেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। সূত্রকারগণ সেই দ্বিগুণ সমচতুরস্রের কর্ণকে দ্বিকরণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ একটি সমকোণী সমচতুর্ভুজের ত্রিগুণ সমকোণী সমচতুর্ভুজ অঙ্কিত করিবার প্রক্রিয়াও সূত্র-সাহিত্যে বিবৃত আছে। সে ক্ষেত্রে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত সমচতুরস্রের একটী বাহুকে প্রস্থ-রূপে এবং তাহার দ্বিকরণীকে দৈর্ঘ্য-রূপে গ্রহণ করিয়া একটি সমকোণী আয়তক্ষেত্র অঙ্কিত করিতে হয়। সেই আয়তক্ষেত্রের কর্ণের নাম—ত্রিকরণী। ত্রিকরণীর উপর অঙ্কিত সমচতুরস্রই প্রথমোক্ত সমচতুরস্রের ত্রিগুণ। একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া সেই চিত্রের সাহায্যে বিষয়টী বিশদীকৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছি। চিত্র ও তাহার ব্যাখ্যা; যথা,—

ক গ ঘ খ একটি সমচতুরস্র। ক ঘ কর্ণের উপর অঙ্কিত ক চ ছ ঘ সমচতুরস্র ক গ ঘ খ সমচতুরস্রের দ্বিগুণ। এক্ষণে ক গ ঘ খ সমচতুরস্রের তিন গুণ একটি সমচতুরস্র অঙ্কিত করিতে হইবে। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, তিন জনেই বলিয়াছেন,—'প্রমাণং তির্য্যগ্ দ্বিকরণ্যায়ামস্তস্যাক্ষয়ারজ্জুস্ত্রিকরণী। ক গ ঘ খ সমচতুরস্রের ক গ বাহুকে ভূমি করিয়া ক ছ কর্ণের উপর ক ছ জ গ একটী সমকোণী আয়তক্ষেত্র অঙ্কিত কর। ঐ আয়তক্ষেত্রের ক জ কর্ণের উপর অঙ্কিত ক ঝ ট জ সমচতুরস্র ক গ ঘ খ সমচতুরস্রের ত্রিগুণ হইবে। জ্যামিতির সপ্তচত্বারিংশ প্রতিজ্ঞা অনুসারে ইহার সার্থকতা সপ্রমাণ হইতে পারে। এইরূপে যে কোনও সমচতুরস্রের যথেচ্ছ গুণ বৃহৎ সমচতুরস্র অঙ্কনের প্রক্রিয়া সূত্র-গ্রন্থে বিবৃত আছে। অন্য পক্ষে, একটি সমচতুরস্রকে যথেচ্ছ অংশে বিভক্ত করিবার প্রণালীও সূত্রকার-গণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন সমচতুরস্রকে নয় ভাগে বিভক্ত করিবার প্রণালী বিষয়ে বৌধায়নের উক্তি,—"তৃতীয়করণ্যেতেন ব্যাখ্যাতা নবমস্তু ভূমের্ভাগো ভবতীতি।" অর্থাৎ,—একটি নির্দ্দিষ্ট সমচতুরস্রের বাহুর তৃতীয়াংশের উপর অঙ্কিত সমচতুরস্রের পরিমাণ-ফল সেই নির্দ্দিষ্ট সমচতুরস্রের পরিমাণ ফলের নবমাংশ হয়। এতদ্বিষয়ে আপস্তম্বের উক্তি,—"তৃতীয়করণ্যেতেনা ব্যাখ্যাতা বিভাগস্তু নবধা।" কাত্যায়নের উক্তি,—""তৃতীয়করণ্যেতেন ব্যাখ্যাতা প্রমাণবিভাগস্তু নবধা। করণীতৃতীয়ং নবভাগো নবভাগস্ত্রয়স্তৃতীয়করণী।" এই সকল সূত্র আলোচনা করিয়া টিকাকার-গণ উহার দ্বিবিধ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক পক্ষ বলেন,—সমচতুরস্রের বাহুকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় ভাগের উপর বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করিলে, সেই বর্গক্ষেত্র পূর্ব্বোক্ত সমচতুরস্রের নবমাংশ হইবে। অপর পক্ষ বলেন, সমচতুরস্রের করণীকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া তাহার এক এক অংশকে করণী (এই করণীকে তৃতীয় করণী বলে). ধরিয়া বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করিলে, সেই বর্গক্ষেত্র প্রথমোক্ত সমচতুরস্রের নবমাংশ হইবে। এই প্রকারে সমচতুরস্রকে চতুর্থ, পঞ্চম প্রভৃতি ভাগেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। বিভিন্ন আকারের অর্থাৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ দুইটি সমচতুরস্রকে
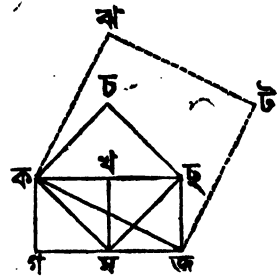
একটী সমচতুরস্রে পরিণত করিবার প্রক্রিয়াও সূত্র-সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। কাত্যায়ন সূত্র,—

"সমচতুরস্রাণামুক্তঃ সমাসো নানাপ্রমাণসমাসে হ্রসীয়সঃ করণ্যা
বর্ষীয়সোঽপচ্ছিন্দ্যাত্তস্যাক্ষ্ণয়ারজ্জুরুভে সমস্যতীতি সমাসঃ।"

অর্থাৎ,—বিভিন্ন আকারের দুইটী সমচতুরস্রের পরিমাণে একটী সমচতুরস্র অঙ্কিত করিতে হইলে, উভয় সমচতুরস্রের দুইটী বাহু লইয়া একটী সমকোণী আয়তক্ষেত্র অঙ্কন কর। সেই আয়তক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত সমচতুরস্রের পরিমাণ-ফল পূর্ব্বোক্ত দুইটী সমচতুরস্রের পরিমাণ-ফলের সমান হইবে। ক গ ঘ খ ও চ জ ঝ ছ দুইটী অসমান সমচতুরস্র। ঐ দুইটীর পরিমাণ-ফলের সমান একটী সমচতুরস্র অঙ্কিত করিবার প্রয়োজন। ক গ ঘ খ সমচতুরস্রের গ ঘ বাহু হইতে জ ঝ বাহুর সমান করিয়া থ ঘ অংশ কাটিয়া লও। সেই থ ঘ অংশ ও খ ঘ বাহু লইয়া একটি সমকোণী আয়ত-ক্ষেত্র অঙ্কিত কর। তাহা হইলে সেই ত থ ঘ খ আয়ত ক্ষেত্রের ত ঘ কর্ণের উপর অঙ্কিত সমচতুরস্র ক গ ঘ খ ও চ জ ঝ ছ সমচতুরস্রদ্বয়ের সমান হইবে। বলা বাহুল্য, এস্থলেও জ্যামিতির সপ্তচত্বারিংশ প্রতিজ্ঞা-বিষয়ক অভিজ্ঞতার পরিচয় দেদীপ্যমান।
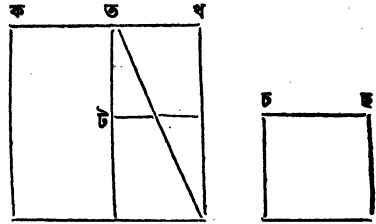
একটী বর্গক্ষেত্র হইতে অপর একটী বর্গ-ক্ষেত্র বিয়োগ করিতে হইলে কিরূপ প্রক্রিয়ার আবশ্যক, বৌধায়ন এবং আপস্তম্ব তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত সূত্রটী প্রদান করিয়াছেন।

"চতুরস্রাচ্চতুরস্রং নির্জিহীর্ষন্যাবন্নির্জিহীর্ষেত্তস্য করণ্যা বর্ষীয়সো বৃধ্রমুল্লিখেদ্বৃধ্রস্য
পার্শ্বমানীমক্ষ্ণয়েতরৎপার্শ্বমুপসংহরেৎসা যত্র নিপতেত্তদপচ্ছিন্দ্যাচ্ছিন্নয়া নিরস্তম্।"

অর্থাৎ,—যদি বৃহত্তর সমচতুরস্র হইতে অপর একটী ক্ষুদ্র সমচতুরস্রের সমানাংশ বিয়োগ করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বৃহত্তর সমচতুরস্রের একটি বাহু হইতে ক্ষুদ্রতর সমচতুরস্রের একটি বাহুর সমান করিয়া একটী অংশ কাটিয়া লও। পরে সেই অংশে ও বৃহত্তর সমচতুরস্রের পার্শ্বস্থ বাহুতে একটী সমকোণী আয়তক্ষেত্র অঙ্কিত কর। তার পর, সেই সমকোণী আয়ত-ক্ষেত্রের একটী বাহুকে বিপরীত দিকে বৃহত্তর সমচতুরস্রের একটী বাহুর সহিত মিলাইয়া দাও; সেই মিলন-বিন্দু হইতে ক্ষুদ্রতর অংশ কাটিয়া লও। তদ্দ্বারা অভীপ্সিত বিয়োগ-ক্রিয়া সাধিত হইবে। ক গ ঘ খ এবং ট ড ঢ ঠ দুইটী সমচতুরস্র। ইহার মধ্যে বৃহত্তর সমচতুরস্র ক গ ঘ খ হইতে ট ড ঢ ঠ সমচতুরস্রের বিয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে ক গ ঘ খ সমচতুরস্র হইতে চ খ ঘ ছ আয়তক্ষেত্র এরূপ ভাবে কাটিয়া লও, যেন ঐ আয়তক্ষেত্রের চ খ ও ছ ঘ বাহু যথাক্রমে ট ড ও ঢ ঠ সমচতুরস্রের ট ঠ ও ড ঢ বাহুর সমান হয়।
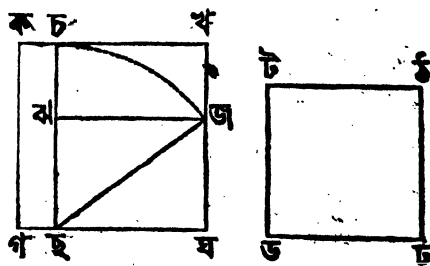
ইহার পর চ ছ বাহুর পরিমাণে একগাছি রজ্জু লইয়া, ছ বিন্দুতে সংলগ্ন করিয়া, চ বিন্দু হইতে ঘুরাইয়া খ ঘ বাহুর সহিত মিলাইয়া দাও। তাহাতে রজ্জুটী জ বিন্দুতে আসিয়া মিলিত

হইবে। তখন জ ঘ অংশের উপর অঙ্কিত ঝ জ ঘ ছ সমচতুরস্র দ্বারা বিয়োগ-ফল বিজ্ঞাপিত হইবে। অর্থাৎ ঙঘ২=ছঝ২−ছঘ২। একটী সমকোণী আয়তক্ষেত্রকে সমচতুরস্রে পরিণত করিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে মহর্ষি বৌধায়নের এই সূত্র দৃষ্ট হয়,—

"দীর্ঘচতুরস্রং সমচতুরস্রং চিকীর্ষংস্তির্যাঙ্‌মানীং করণীং কৃত্বা শেষং দ্বেধা বিভজ্য
বিপর্য্যস্তেতরত্রোপদধ্যাৎ খণ্ডমাবাপেন তৎসংপূরয়েত্তস্য নির্হ্রাস উক্তঃ।"

সূত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—একটী সমকোণী আয়তক্ষেত্রকে সমচতুরস্রে পরিণত করিতে হইলে, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থের পরিমাণানুসারে উহার দীর্ঘ বাহুর উপর একটি সমচতুর্ভুজ অঙ্কিত কর। আয়তক্ষেত্রের অবশিষ্টাংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লও। ঐ দুই অংশ সমচতুরস্রের দুই পার্শ্বে স্থাপিত কর। তাহার পর শূন্য অংশটুকু যুক্ত করিয়া দাও। তদ্দ্বারা অভীপ্সিত সমচতুরস্র প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ক গ ঘ খ একটী সমকোণী আয়তক্ষেত্র। ইহাকে সমচতুরস্রে পরিণত করিতে হইলে, ঐ আয়তক্ষেত্র হইতে উহার ক খ বা গ ঘ বাহুর পরিমাণে জ গ ঘ থ সমচতুরস্র আঁকিয়া লও। ইহার পর ক খ থ জ অংশকে ক চ ত খ ও চ জ থ ত দুই সমান ভাগে বিভক্ত কর। এক্ষণে ক চ ত খ চতুর্ভুজকে থ ঘ দ ঝ আয়ত-ক্ষেত্ররূপে জ গ ঘ থ সমচতুরস্রের পার্শ্বে স্থাপন কর। ত থ ও থ ঝ বাহুর মধ্যে যে শূন্য স্থান রহিল, ত ছ ঝ থ সমচতুরস্রের দ্বারা তাহা পূরণ কর। এক্ষণে সমচতুরস্রনির্হ্রাস দ্বারা ত থ ঝ ছ ক্ষুদ্র সমচতুরস্রকে চ ছ দ গ বৃহৎ সমচতুরস্র হইতে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার পরিমাণ—পূর্ব্বোক্ত আয়ত-ক্ষেত্রের সমান। আয়তক্ষেত্রকে যেরূপ সমচতুরস্রে পরিণত করিবার নিয়ম আছে, সেইরূপ সমচতুরস্রকে আয়তক্ষেত্রে পরিণত করিবার বহু সূত্রাদি সূত্র-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

গণিত-বিজ্ঞানের—জ্যামিতি, পরিমিতি, পাটীগণিত প্রভৃতির আরও বহু তত্ত্ব সূত্র-সাহিত্যে পরিদৃশ্যমান। উপসংহারে আমরা আর তিনটী মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

বৃত্ত ও সমচতুরস্র।

একটি বিষয়—সমচতুরস্রকে বৃত্তাকারে পরিণত করিবার প্রণালী। তৎসম্বন্ধে বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতির সূত্র দৃষ্ট হয়। তিন জন ঋষির তিনটী সূত্রই পর পর উদ্ধৃত করিতেছি। বৌধায়ন সূত্র,—"চতুরস্রং মণ্ডলং চিকীর্ষন্নক্ষয়ার্দ্ধং মধ্যাৎপ্রাচীমভ্যাপাতয়েদ্যদতিশিষ্যতে তস্য সহ তৃতীয়েন মণ্ডলং পরিলিখেৎ।" যদি একটি সমচতুরস্রকে বৃত্তে পরিণত করিবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সেই সমচতুরস্রের কর্ণের অর্দ্ধ-পরিমাণ রজ্জু গ্রহণ করিয়া কর্ণের মধ্যবিন্দুতে সংলগ্ন কর। অতঃপর কর্ণের অপর বিন্দু হইতে টানিয়া উহাকে প্রাচী-রেখার দিকে লইয়া যাও। তাহাতে কর্ণের সেই শেষ বিন্দু হইতে প্রাচী-রেখার সীমান্ত পর্য্যন্ত একটি বৃত্তাংশ অঙ্কিত হইবে। রজ্জুর যে অংশ সমচতুরস্রের বহির্ভাগে প্রাচী রেখার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত থাকিবে, সেই অংশকে তিন খণ্ডে বিভক্ত কর। অতঃপর কর্ণ-রেখার মধ্য-বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া রজ্জুর যে অংশ সমচতুরস্রের

গুণ করিয়া সেই গুণফল প্রত্যেক ব্যক্তির সমুদায় রত্ন হইতে পৃথক পৃথক বিয়োগ কর! বিয়োগ করিলে পৃথক পৃথক যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা ইষ্ট রাশিকে পৃথক পৃথক ভাগ করিলেই প্রত্যেক রত্নের মূল্য নির্ণীত হইবে। অথবা বিয়োগফলগুলিকে পরস্পর গুণ করিয়া সেই গুণফলকে উক্ত পৃথকস্থিত বিয়োগ-ফল দ্বারা পৃথক পৃথক ভাগ করিলেও প্রত্যেক রত্নের মূল্য নিরূপিত হইবে। এক্ষণে দুই-রূপ নিয়মেই অঙ্কটীকে কষিয়া দেখা যাউক। অঙ্কে দেখিয়াছি—জনসংখ্যা ৪, মাণিক্য ৮, ইন্দ্রনীল মণি ১০, মুক্তা ১০০, বজ্রমণি ৫, পরিবর্ত্তন ১ এক। এক্ষণে, 'নিয়মানুসারে জন-সংখ্যা ৪ দিয়া পরিবর্ত্তিত রত্ন সংখ্যা ১ কে গুণ করিয়া গুণফল ৪ পাওয়া গিয়াছে। এই ৪ ক্রমান্বয়ে রত্ন-সংখ্যা হইতে বিয়োগ করিলে, মাণিক্য ৪, ইন্দ্রনীল ৬, মুক্তা ৯৬, বজ্রমণি ১ অবশিষ্ট থাকিতেছে। এই বিয়োগফল চারিটী দিয়া এক্ষণে একটি অভীষ্ট রাশিকে ভাগ করিতে হইতেছে। কিন্তু এরূপ অভীষ্ট রাশি কল্পনা করা উচিত, যাহার ভাগশেষ না থাকে। এই হেতু এখানে ৯৬ কে * অভীষ্ট রাশি কল্পনা করিয়া, প্রাগুক্ত বিয়োগফল দ্বারা ক্রমান্বয়ে এই ৯৬ কে ভাগ করিয়া, ২৪, ১৬, ১ এবং ৯৬ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব প্রতি মাণিক্যের ২৪, ইন্দ্রনীলের ১৬, মুক্তার ১ এবং বজ্রের ৯৬ মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। এতদনুপাতে প্রত্যেক ব্যক্তির ধনের সমষ্টি ২৩৩ হইবে। দ্বিতীয় নিয়মানুসারে, বিয়োগাবশিষ্ট ৪, ৬, ৯৬ এবং ১ এর পরস্পর গুণফল ২৩০৪ হইবে। এই গুণফলকে উক্ত বিয়োগাবশিষ্ট ৪, ৬, ৯৬ ও ১ দিয়া পৃথক পৃথক ভাগ করিলে ৫৭৬, ৩৮৪, ২৪ ও ২৩০৪ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ইহাই ক্রমান্বয়ে উক্ত চারি প্রকার রত্নের মূল্য এবং ধনের সমষ্টি ৫৫৯২ হইবে।' † লীলাবতী গ্রন্থে ক্ষেত্র-ব্যবহার সম্বন্ধেও কৌতুহলপ্রদ উদাহরণ-সমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। ত্র্যস্র অর্থাৎ ত্রিকোণ, চতুরস্র অর্থাৎ চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল অর্থাৎ গোলাকার এবং চাপ অর্থাৎ ধনুরাকার,—ক্ষেত্র সমূহকে ভাস্করাচার্য্য প্রধানতঃ এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যেরূপ ক্ষেত্রই হউক না কেন, তাহার পরিমাণ-ফল নির্ণয়-কালে তাহাকে ঐ চতুর্ব্বিধ ক্ষেত্রের কোন-না-কোনও ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া পরিমাণ-ফল ধরা হইয়াছে। লীলাবতীর টীকার মধ্যে মুনীশ্বরের টীকাই প্রধান। তাঁহার টীকার অনুসরণেই প্রধানতঃ ক্ষেত্রফল নির্ণীত হইয়া থাকে। কিরূপভাবে ঐ ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয়, তাহার দুইটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। একটী উদাহরণ,—'নয় হাত উচ্চ একটী স্তম্ভের উপরিভাগে একটি ময়ূর পাখী বসিয়া ছিল। ঐ ময়ূর সেই স্তম্ভের সাতাইশ হাত দূরে এক সর্পকে দেখিতে পাইয়া, উহাকে ধরিবার জন্য উড্ডীন হইল। এদিকে সর্পও ময়ূরকে দেখিয়া ভীত হইয়া স্তম্ভের নিম্নস্থ গর্ত্তের অভিমুখে যাইতে লাগিল। উভয়ের গতি ঠিক সমান ছিল। বল দেখি, এমত অবস্থাতে স্তম্ভ হইতে কত হাত দূরে ময়ূর সর্পকে ধরিতে পারিয়াছিল?' এই অঙ্ক সমাধানের সূত্র,—'ভুজ ও কর্ণের যোগ-সংখ্যা দ্বারা কোটীর বর্গকে ভাগ করিয়া, সেই ভাগফল ভুজ ও কর্ণের যোগ-সংখ্যা হইতে বিয়োগ কর। ঐ বিয়োগ-ফলের অর্দ্ধেক

* লঘিষ্ঠ-সাধারণ গুণনীয় গুণিতকের প্রক্রিয়া অনুসারে এই রাশি পাওয়া যাইতে পারে।

† ৺ গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'লীলাবতী' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ভুজের পরিমাণ হইবে। পরন্তু ভুজ ও কর্ণের যোগ-সংখ্যা হইতে এই ভুজ-পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই কর্ণ।' বলা বাহুল্য, এই সূত্রের উদাহরণ-রূপেই ময়ূর ও সর্পের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। স্তম্ভ হইতে কত হাত দূরে সর্প ধৃত হইল, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, মনে করুন, ক খ সেই স্তম্ভ, আর খ গ রেখার গ বিন্দুতে সর্প অবস্থিতি করিতেছিল। ক খ স্তম্ভের পরিমাণ ৯ হাত এবং খ স্তম্ভমূল হইতে গ বিন্দুর দূরত্ব ২৭ হাত। এক্ষণে দেখিতে হইবে, খ বিন্দু হইতে কত দূরে ময়ূরটী সর্পকে ধরিতে পারিবে। মনে করুন, ঘ বিন্দুতে ময়ূর আসিয়া সর্পকে ধরিয়া ফেলিল। তাহা হইলে, ক বিন্দু হইতে
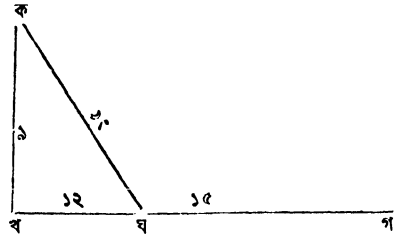
ঘ বিন্দু পর্য্যন্ত রেখা টানিলে, কঘ রেখা ঘগ রেখার সমান হয়। কেন না, ক বিন্দু হইতে ময়ূর যত দূর আসিবে, গ বিন্দু হইতে সর্পকে ঠিক তত দূরই আসিতে হইবে; যেহেতু উভয়ের গতি সমান। তবেই দেখা যাইতেছে, কখ + খঘ = খগ = ২৭। এক্ষণে সূত্রানুসারে [খগ – (কখ^২ ÷ খগ)] ÷ ২ = খঘ। অর্থাৎ, [২৭—(৯^২ ÷ ২৭)] ÷ ২ = [২৭—(৮১ ÷ ২৭] ÷ ২ = [২৭—৩] ÷ ২ = ২৪ ÷ ২ = ১২। অর্থাৎ, স্তম্ভ হইতে বার হাত দূরে ময়ূর কর্ত্তৃক সর্প ধৃত হইবে। দ্বিতীয় উদাহরণ,—'একটী সরোবরে জল হইতে অর্দ্ধ হস্ত উর্দ্ধে মৃণালোপরি একটী পদ্ম প্রস্ফুটিত ছিল। সহসা ঝটিকাঘাতে পদ্মটী দুই হস্ত দূরে জলমগ্ন হইল। সরোবরে কত জলের উপর মৃণাল জাগিয়া ছিল অর্থাৎ জলের গভীরতা কত ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ কর।' এই অঙ্ক সমাধানে নিম্নরূপ প্রক্রিয়ার আবশ্যক; যথা,—'কোটী ও কর্ণের বিয়োগ-ফল দ্বারা ভুজের বর্গকে ভাগ করিয়া, ভাগফলের সহিত কোটী ও কর্ণের বিয়োগ-ফল যোগ কর। ঐ যোগ-ফলের অর্দ্ধেক লইলে কর্ণের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। আর সেই কর্ণের পরিমাণ হইতে কোটী ও কর্ণের বিয়োগ-ফল বাদ দিলে কোটীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে।" এস্থলে খ জলের উপরিভাগ। খ ক পদ্ম-সংযুক্ত মৃণাল, খ অর্থাৎ জলের উপরিভাগে অবস্থিত। খ ক মৃণালের পরিমাণ অর্দ্ধ, হস্ত। ক খ পদ্ম-সংযুক্ত মৃণাল ঝটিকাঘাতে খ হইতে দুই
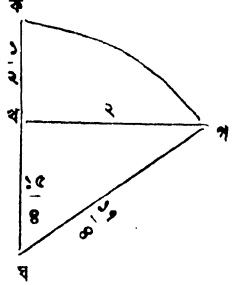
হস্ত দূরে গ বিন্দুতে জলমগ্ন হইল। খ গ ভুজ, উহার পরিমাণ ২ হস্ত। এক্ষণে খ ঘ কোটীর পরিমাণ বা জলের গভীরতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এখানে দেখা যাইতেছে, কঘ = গঘ। নিয়মানুসারে, কোটির ও কর্ণের বিয়োগ-ফল অর্থাৎ ১এর ২ দ্বারা খ গ ভুজের বর্গকে অর্থাৎ ৪ কে ভাগ দিলে ৮ রাশি পাওয়া গেল। সেই ৮ ভাগ ফলের সহিত কোটি ও কর্ণের বিয়োগ ফল অর্থাৎ ১এর ২ যোগ দিতে দিলে ১৭র ২ পাওয়া গেল। তাহার অর্দ্ধেক ১৭র ৪ই কর্ণের পরিমাণ। কর্ণ ১৭র ৪ হইতে কর্ণ ও কোটির বিয়োগ-ফল ১এর ২ বিয়োগ করিলে ১৫র ৪ অবশিষ্ট থাকে। তাহাই কোটির পরিমাণ বা জলের গভীরতা।

এইরূপ আরও বহু দুর্ব্বোধ্য অঙ্ক বিবিধ সহজসাধ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাধান করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সকলই এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে।

বীজগণিত-তত্ত্ব।

অতঃপর বীজগণিত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাইতেছি। যে গণিত-শাস্ত্রে বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সংখ্যাস্বরূপ গ্রহণ করা হয় এবং কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহারে গণনাঙ্ক বিষয়ক সিদ্ধান্ত-সমূহ যুক্তি-সহকারে সংস্থাপিত হয়, তাহারই নাম—বীজ-গণিত। বীজ-গণিতের সাহায্যে গণনাঙ্কের সমাধান-পদ্ধতি প্রাচীন-ভারতে যে এককালে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, তাহার নানা প্রমাণ বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বেই আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি, বীজ-গণিতের বীজ ভারতবর্ষ হইতে আরবে যায়; আরব হইতে প্রথমে স্পেনে এবং পরিশেষে ইউরোপের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। বীজ-গণিতের যে ইংরাজী নাম 'য়্যালজাব্রা' তাহা স্পেনিস শব্দ-সম্ভূত; সেই স্পেনিস শব্দ 'য়্যালজাব্রার' মূল—'আল্ জেবর্ ওয়াল্ মোকাবল্।' গণিত-বিজ্ঞান যখন উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে, তখনই য়্যালজাব্রার বা বীজ-গণিতের প্রয়োজন হয়। প্রাচীন-ভারতবর্ষের গৌরব-বিভবের দিনের তুলনায় আর্য্যভট্ট সে দিনের লোক ছিলেন। সে দিনের হইলেও খৃষ্ট-জন্মের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিদ্যমানতার বিষয় প্রতিপন্ন হয়। * কিন্তু আর্য্যভট্ট যে স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে বীজ-গণিতের প্রকৃষ্টরূপ আলোচনার নিদর্শন রহিয়াছে। গণনাঙ্কের অনির্দ্দিষ্ট রাশিকে বা বহু রাশিকে বর্ণমালার একটী বর্ণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করাই বীজগণিতের মূল লক্ষ্য। এক কোটী তিতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার চারি শত পঞ্চাশ—এই রাশিটীকে অঙ্ক দ্বারা লিখিতে হইলে ১, ৪৩, ২০, ৪৫০ এই অঙ্কগুলি লিখিবার আবশ্যক

* আর্য্যভট্টের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে আমরা যে কাল-নির্দ্দেশ করিয়াছি, অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—আর্য্যভট্ট খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তিকালে ৪৭৫ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। এতদ্বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপ আর্য্য-সিদ্ধান্তের 'কালক্রিয়াপাদ' অংশের (দশম শ্লোক) তাঁহারা উল্লেখ করেন। শ্লোকটী এই,—

"ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ। ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥"

আর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ আর্য্যভট্ট তেইশ বৎসর বয়সের সময় রচনা করিয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহারই আভাষ আছে। অধিকন্তু ইহাতে তাঁহার জন্মকালেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ এই শ্লোকটীর অর্থ করেন, সত্যত্রেতাদ্বাপর তিন যুগ অতীত হইবার পর, ষষ্টিগুণিত ষষ্টি বৎসর (অর্থাৎ ৬০×৬০=৩৬০০ বৎসর) অতীত হইলে আর্য্যভট্টের বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং ৩৬০০ বৎসর হইতে ২৩ বৎসর বাদ দিলে, যে বৎসর-সংখ্যা পাওয়া যায়, অর্থাৎ বর্ত্তমান কলি-যুগের ৩৫৭৭ বৎসর গত হইলে, আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। এ হিসাবে ৪৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার জন্মকাল স্থির হইতে পারে। কিন্তু এই কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে দুই প্রকার আপত্তির কথা উঠিয়া থাকে। প্রথম,—শ্লোকটীর পাঠান্তর; দ্বিতীয়,—অর্থ-নিষ্পত্তি। 'মৃণ্ময়ী' গ্রন্থে উহার পাঠ এইরূপ লিখিত আছে,—

"ষষ্ট্যব্দানা ষষ্টির্যদা ব্যতীতা তত্র যে চ যুগপদাঃ। অধিকা বিংশতিরব্দাস্তদিহ মমজন্মনোঽতীতাঃ॥"

এইরূপ পাঠ অনুসারে, কলির ৩৬২০ বৎসরাগত হইলে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। তবে মৃণ্ময়ী গ্রন্থ-প্রণেতা এইরূপ অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াও আর্য্যভট্টের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে সংশয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'এমতাবস্থাতে আর্য্যভট্ট কেন যে নিজের গ্রন্থে সম্বৎ বা শকাব্দ ব্যবহার করেন নাই, বুঝিতে পারা যায় না।' অন্যান্য বক্তব্য স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

হয়। কিন্তু বীজ-গণিত—ক, খ বা যে কোনও বর্ণের দ্বারা ঐ অঙ্ক ব্যক্ত করিতে সমর্থ। আর্য্যভট্ট স্থূলভাবে বর্ণমালা-গুলির এক একটী সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছিলেন। ক্ হইতে ম্ পর্য্যন্ত পঁচিশটী বর্ণে তিনি পঁচিশটী বিভিন্ন সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, ক্ = ১, খ্ = ২, গ্ = ৩ .... ম্ = ২৫ ইত্যাদি। ব্যঞ্জনবর্ণের য্ র্ ল্ ব শ্ ষ্ স্ হ্ এবং স্বরবর্ণ ও যুক্তাক্ষর প্রভৃতি সংখ্যা-নির্ণয় সম্বন্ধেও তাঁহার অভিনব নিয়ম ছিল। তাঁহার একটী শ্লোকে এতদ্বিষয়ের আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। শ্লোকটী এই,—

"বর্গাক্ষরাণি বর্গেঽবর্গেঽবর্গাক্ষরাণি কাৎ ঙমৌযঃ।
খ দ্বিনবকে স্বরানব বর্গেঽবর্গে নবান্ত্যবর্গে বা॥"

এ শ্লোকটী বুঝিতে হইলে অনেক বিষয় বুঝিবার প্রয়োজন হয়। এই শ্লোকে আর্য্যভট্ট বর্ণমালার সমস্ত বর্ণগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই দুই ভাগের এক ভাগের নাম—বর্গ, অপর ভাগের নাম—অবর্গ। বৈয়াকরণ-গণ ক্ হইতে ম্ পর্য্যন্ত বর্ণ-গুলিকে পাঁচ বর্গে বিভক্ত করিয়াছেন। আর্য্যভট্টের নিকট সেই পাঁচ বর্গ অর্থাৎ ক্ হইতে ম্ পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পঁচিশটি বর্ণ 'বর্গাক্ষর' বলিয়া পরিচিত; তদ্ভিন্ন অন্যান্য বর্ণগুলি অর্থাৎ য্ র্ ল্ ব্ শ্ ষ্ স্ হ্ এবং স্বরবর্ণ-সমূহ 'অবর্গের' মধ্যে গণ্য। বলা বাহুল্য, আর্য্যভট্ট অ ও আ একই রাশি বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ ই ও ঈ একই রাশি এবং উ ও ঊ একই রাশি বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। গণিত-শাস্ত্রে সাধারণতঃ পরার্দ্ধ সংখ্যাকে গণনাঙ্কের শেষ সংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তাহার মধ্যেও আবার বর্গ ও অবর্গ আছে। এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটী অর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য, পরার্দ্ধ,—গণনাঙ্কের এই যে অষ্টাদশ অবস্থা বা পর্য্যায়, ইহাদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, একাদশ, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ প্রভৃতি বর্গস্থান এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, ষোড়শ, অষ্টাদশ প্রভৃতি অবর্গস্থান। অর্থাৎ, $১^২ = ১$, $১০^২ = ১০০$, $১০^৪ = ১০০০০$, $১০^৬ = ১০০০০০০$ ইত্যাদি বর্গস্থান; এবং ১০, $১০^৩ = ১০০০$, $১০^৫ = ১০০০০০$, $১০^৭ = ১০০০০০০০$ ইত্যাদি অবর্গস্থান। মোট কথা একক, দশক, শতক, সহস্রক প্রভৃতি ক্রমে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যে সকল রাশির বর্গমূল অখণ্ড-রাশি, তাহারাই বর্গস্থানীয়; অবশিষ্টগুলি অবর্গ-স্থানীয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে,—'বর্গাক্ষরাণি বর্গে'। তাহার তাৎপর্য্য,—বর্গাক্ষর অর্থাৎ ক্ খ্ প্রভৃতির সহিত অবর্গাক্ষর অর্থাৎ অ আ প্রভৃতি যুক্ত হইলে তাহার পরিমাণ-ফল বর্গস্থানীয় হইবে। কিন্তু অবর্গের সহিত অবর্গের যোগ হইলে, তাহার ফল অবর্গ-স্থানীয় হইবে। এ বিষয়টী বিশদভাবে বুঝিতে হইলে অক্ষরগুলির প্রত্যেকটীতে কি কি সংখ্যা জ্ঞাপন করে, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন। ভাস্করাচার্য্যের মতে, স্বরবর্ণ-গুলির প্রত্যেকটীতে দ্বিবিধ সংখ্যা সূচিত হয়। তাহার একটী সংখ্যা বর্গস্থানীয়, অপর সংখ্যা অবর্গস্থানীয়। তাঁহার মতে,—অ বর্ণে ১ ও ১০, ই বর্ণে $১০^২$ ও $১০^৩$, উ বর্ণে $১০^৪$ ও $১০^৫$, ঋ বর্ণে $১০^৬$ ও $১০^৭$, ৯ বর্ণে $১০^৮$ ও $১০^৯$, এ বর্ণে $১০^{১০}$ ও $১০^{১১}$, ঐ বর্ণে $১০^{১২}$ ও $১০^{১৩}$ ও বর্ণে $১০^{১৪}$ ও $১০^{১৫}$ এবং ঔ বর্ণে $১০^{১৬}$ ও $১০^{১৭}$ বুঝাইয়া থাকে। অবর্গের অঙ্ক কয়েকটী

অক্ষর অর্থাৎ য্ র্ ল্ ব্ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম, য্=৩, র্=৪, ল্=৫, ব্=৬, শ্=৭, ষ্=৮, স্=৯, হ্=১০। সূত্রে আছে,—"ঙমৌযঃ।" অর্থাৎ ঙ ও ম বর্ণের যোগে য বর্ণ নিষ্পন্ন হয়। তাহা হইলে য বর্ণের পরিমাণ ৩০ হয়। কিন্তু উহার পরিমাণ ধরা হয় ৩। কেন ঐরূপ পরিমাণ হিসাব করা হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, আরও একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্যভট্টের মতে ক্ অক্ষরে ১, খ্ অক্ষরে ২ ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইয়া থাকে। সে হিসাবে ক্+অ=১×১, খ্+অ—২×১, গ্+অ=৩×১ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এরূপ স্থলে ক্-কারাদি হলন্ত ব্যবহৃত হয়; যেমন ক্ খ্ গ্...ব্ ভ্ ম্। হলন্ত ক্ গ্ প্রভৃতিতে যেমন যেমন স্বরবর্ণ মিলিত হইবে, তেমনই তেমনই তাহার গুণ হইতে থাকিবে। যথা কি=ক্+ই=১× ১০০=১০০; খি=খ্+ই=২×১০০=২০০; চি=চ্+ই=৬×১০০=৬০০; ইত্যাদি। এস্থলে দেখা যাইতেছে,—বর্গাক্ষরে অবর্গাক্ষরাদি মিলিত হওয়ায় অবর্গাক্ষরাদির বর্গস্থানের ক্রিয়াই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু অবর্গস্থানে অর্থাৎ য্ র্ প্রভৃতিতে ঐ সকল স্বরবর্ণ অ-কারাদি যুক্ত হইলে তাহাতে উহাদের ক্রিয়া অন্যরূপ হয়। যথা, য=য্+অ=৩×১০ —৩০; যি=য্+ই=৩×১০০০=৩০০০ ইত্যাদি। এইবার দেখা যাউক,—শ্লোকে 'ঙমৌয' লিখিত থাকা সত্ত্বেও য্ অক্ষরে যেন ৩ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে—ঙ ও ম সংযোগে যে য হইলে, সে য অকারান্ত য; অর্থাৎ, তাহা য্+অ। সুতরাং তাহা ৩০ হইলেও হলন্ত য্ এর পরিমাণ ৩ হয়। এতদালোচনায় বর্গাক্ষর ও অবর্গাক্ষর মিলনের মূল-তত্ত্ব বুঝা যাইতে পারে। ক্ বর্ণের সহিত যে অ মিলিত হওয়ায় ক্ এর পরিমাণ ক্+অ=১×১ অর্থাৎ ১ হইয়াছিল; যে অ বর্ণ খ্ এর সহিত মিলিত হওয়ায় খ-এর পরিমাণ খ্+অ=২×১ অর্থাৎ ২ মাত্র হইয়াছিল; এখানে সেই অ বর্ণ হলন্ত য্ এর সহিত মিলিত হওয়ায় য্ এর পরিমাণ দশ গুণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ য্+অ=৩×১০ অর্থাৎ ৩০ হইল। র্ ল্ প্রভৃতি অ বর্ণের সহিত মিলিত হইলে তাহাদের পরিমাণও ঐরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গ্ বর্ণে ৩ সংখ্যাকে বুঝায়, আবার য্ বর্ণেও ৩ সংখ্যাকে বুঝায়। অথচ গ্ এর সহিত যখন ই যোগ হইবে, তখন তাহার পরিমাণ হইবে গ্+ই=৩০০; কিন্তু য্ এর সহিত যখন ই যোগ হইবে, তখন তাহার পরিমাণ হইবে—৩০০০। আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বিশদীকৃত করিতেছি। আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন,—'রবির ভগণ' অর্থাৎ সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি পরিভ্রমণের কাল-পরিমাণ—'খুঘৃ'। ঐ শব্দ হইতে পণ্ডিতগণ রবির ভগণ ৪৩২০০০০ বৎসর নির্দ্ধারণ করেন। অর্থাৎ ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর না বলিয়া 'খুঘৃ' বলিয়া আর্য্যভট্ট ঐ অঙ্ক বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু খুঘৃ হইতে কিরূপে ঐরূপ অঙ্কপাত হইয়া থাকে? খু শব্দের মধ্যে খ্+উ এবং ঘ্+উ আছে; এবং 'ঘৃ' শব্দের মধ্যে ঘ+ঋ আছে। * খ=২, উ=১০০০০; সুতরাং খু শব্দে ২০০০০ হইল। (এখানকার উ বর্গ-উ

* এই স্থলে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ব্যঞ্জন-বর্ণের সহিত ব্যঞ্জন-বর্ণ যুক্ত হইলে সেই দুইটীকে দুইটী স্বতন্ত্র বর্ণ ধরা হয়; আর সেই যুক্ত বর্ণের সহিত যে স্বরবর্ণের যোগ হইয়া থাকে, তাহা দুই বর্ণেই স্বতন্ত্র-ভাবে যুক্ত হইল, মনে করিতে হয়।

হিসাবে ধরা হইল)। যু শব্দে য্+উ=৩×১০০০০০=৩০০০০০ (এখানকার উ অবর্গ উ হিসাবে ধরা হইল)। ঘৃ শব্দে ঘ+ঋ অর্থাৎ ৪×১০০০০০০ বা ৪০০০০০০ বুঝায় (এস্থলে ঋ বর্গ-ঋ হিসাবে ধরা হইল)। এক্ষণে ঐ অঙ্কগুলিকে যোগ করিলে (২০০০০+৩০০০০০× ৪০০০০০০) ৪৩২০০০০ হয়। গুরুর (বৃহস্পতির) ভগণ, আর্য্যভট্টের মতে,—'খ্রিচুাভ'। অঙ্ক-পাত করিলে উহা ৩৬৪২২৪ বৎসর হয়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয়, এদেশে বীজগণিত যখন বিশেষরূপ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, সেই সময় বর্ণমালার সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ রাশিকে এই প্রকারে সঙ্কুচিত করিয়া আনা হইত। সে হিসাবে, এইরূপ প্রক্রিয়াকে বীজগণিতের ভিত্তি বলিলেও বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এ প্রকারে অঙ্কপাত-পদ্ধতি এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে। কেহ কেহ বলেন,—'ভারতবর্ষের অঙ্কশাস্ত্র কবিতার গণ্ডীতে সূত্রের আকারে আবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই এইরূপভাবে অঙ্কপাতের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। বৃহৎ বৃহৎ রাশিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরের সাহায্যে সূত্রের মধ্যে কবিতায় গ্রথিত করা হইত,—এতদপেক্ষা সহজসাধ্য উপায় আর কি হইতে পারে?' এতদ্ভিন্ন অঙ্কপাতের আরও এক অভিনব পদ্ধতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল এবং আজিও অনেক স্থলে সে প্রথার—সে পদ্ধতির অনুসরণ দেখিতে পাই। সে পদ্ধতির মূল—বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শব্দে কয়েকটি সংখ্যার নির্দ্দেশ। যেমন, চন্দ্র=১, পক্ষ=২, নেত্র=৩, বেদ=৪, বাণ=৫, ঋতু=৬, সমুদ্র=৭, বসু=৮, নবগ্রহ=৯, দিক=১০, গুরু=১১, আদিত্য (রবি)=১২। সংখ্যাবাচক এই শব্দগুলি পদ্যে বা গদ্যে নিবদ্ধ হইয়া গণনাঙ্কের বৃহৎ বৃহৎ রাশিকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ভাস্করাচার্য্যের সময়েও এরূপভাবে অঙ্কলিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—"নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্ব্বৎসরা।" এতদন্তর্গত নন্দাদ্রীন্দুগুণা অংশের অর্থ—৩১৭৯ ধরা হইয়া থাকে। ঐ বাক্যটীকে বিশ্লেষণ করিলে নন্দ+অদ্রি+ইন্দু+গুণ এই চারিটী শব্দ পাওয়া যায়। নন্দ শব্দের অর্থ ৯; নবনন্দ হইতে ঐ রাশির উৎপত্তি। আদি শব্দের অর্থ ৭; সপ্তাদ্রি বা সপ্ত কুলাচল হইতে উহার অর্থোৎপত্তি। ইন্দু শব্দের অর্থ ১; চন্দ্র একটী বলিয়াই ঐরূপ রাশি ধরা হয়। গুণ শব্দে ৩ রাশিকে বুঝায়; কারণ সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণেরই প্রাধান্য কার্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐরূপভাবে সোজাসুজি সাজাইলে ঐ বাক্যের অর্থ হইত—৯৭১৩। কিন্তু তাহা না হইয়া, অর্থ হইল—৩১৭৯; কারণ, 'অঙ্কস্য বামাগতি।' এরূপ ক্ষেত্রে দক্ষিণের রাশি পরপর বাম দিকে স্থাপিত করিয়া অঙ্ক-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, ইহাই নিয়ম। অধুনা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের নিমন্ত্রণ-পত্রে এই প্রথার প্রচলন আছে। তবে বলা বাহুল্য, এ প্রথায় অনেক সময় অর্থোপলব্ধি-বিষয়ে বড়ই সমস্যা উপস্থিত হয়। মনে করুন, কোনও স্থলে লিখিত আছে,—'নেত্রেন্দুরসবাণ।' ইহার অর্থ কি হইবে? কেহ হয় তো অর্থ-নিষ্পত্তি করিতে পারেন,—৫৬১৩। কেহ হয় তো অর্থ করিতে পারেন,—৫৯১৩। কারণ, কটু-তিক্ত-কষায়-লবণ-অম্ল-মধুর ভেদে রস ছয় প্রকার অথবা শৃঙ্গার-বীর-করুণ-অদ্ভুত-হাস্য-ভয়ানক-বীভৎস-রৌদ্র-শান্ত ভেদে রস নয় প্রকার হইতে পারে। অনেকে মনে করেন, এবম্বিধ সংশয়াদি উপস্থিত হইবার আশঙ্কাতেই ঐ প্রকারের অঙ্কপাত প্রথা অধুনা

প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। এইরূপ বিবিধ প্রকারে অঙ্কপাতের প্রণালী দর্শন করিলে অঙ্কশাস্ত্র যে কত দিকে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র বা জ্যোতির্বিদ্যা।

জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয় বলিয়াই তৎসংক্রান্ত শাস্ত্র জ্যোতিষ-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা বা জ্যোতির্বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ আছে, আর তাহারা পরস্পর সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া কি নিয়মে পরিচালিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা কি শুভাশুভ সংঘটিত হইয়া থাকে, জ্যোতিষ-শাস্ত্র তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করে। পৃথিবী কি ভাবে অবস্থিত আছে, গ্রহ-নক্ষত্রাদি কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে, কি কারণে দিবারাত্রি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও গ্রহণাদি হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সাহায্যে লাভ করা যায়। ফলতঃ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিব্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি-গতি বিষয়ক জ্ঞান জ্যোতিষেরই অন্তর্গত। ভারতবর্ষে জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত;—ফলিত-জ্যোতিষ ও গণিত-জ্যোতিষ। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতাগতি নিবন্ধন যে শুভাশুভ সংঘটিত হয়, ফলিত-জ্যোতিষ দ্বারা তাহাই নির্ণীত হয়। গ্রহাদি কোন্ নিয়মে কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে, গণিত-জ্যোতিষ, তাহাই বলিয়া দেয়। সামুদ্রিক, করকোষ্ঠি বিচার, জাতক, দৈবগণনা প্রভৃতি ফলিত-জ্যোতিষের অন্তর্গত। আর গ্রহণ, ভগণ, ক্রান্তি-পাত, তিথি-নক্ষত্র-বিচার প্রভৃতি গণিত-জ্যোতিষের অন্তর্নিবিষ্ট। গণিত-জ্যোতিষের ইংরাজী নাম—য়্যাষ্ট্রনমি (Astronomy) ফলিত-জ্যোতিষকে ইংরাজী-ভাষায় অধুনা য়্যাষ্ট্রলজি (Astrology) বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য-হিসাবে জ্যোতিষের নানা বিভাগ কল্পিত হয়। তন্মধ্যে সাধারণতঃ তিনটী বিভাগেরই প্রাধান্য দেখিতে পাই। সেই তিনটি বিভাগের একটীর নাম—থিওরেটিকাল য়্যাষ্ট্রনমি (Theoritical Astronomy) অর্থাৎ ঔপপত্তিক বা কাল্পনিক জ্যোতিষ। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচলিত আছে এবং তৎসম্বন্ধে পণ্ডিত গণ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, কাল্পনিক জ্যোতিষে সূত্রাদি সহ তাহারই আলোচনা আছে। জ্যোতিষের অপর বিভাগের নাম—'ফিজিক্যাল য়্যাষ্ট্রনমি' (Physical Astronomy) অর্থাৎ প্রাকৃতিক জ্যোতিষ। যে শক্তি-প্রভাবে, যে নৈসর্গিক নিয়মে, জ্যোতিষ্ক-গণ পরিচালিত হয়, প্রাকৃতিক জ্যোতিষ অংশে তদ্বিষয় নির্ণীত হইয়াছে। তৃতীয়—'প্র্যাক্টিক্যাল য়্যাষ্ট্রনমি' (Practical Astronomy) বা ব্যবহারিক জ্যোতিষ। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এই অংশে গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়; অর্থাৎ, যন্ত্রাদির সাহায্যে গণিত-বিজ্ঞানের নিয়মে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর আকৃতি-প্রকৃতি ও গতি-স্থিতির বিষয় নির্ণীত হইয়া থাকে। জ্যোতিষের অপর নাম—সিদ্ধান্ত। ভাস্করাচার্য্যের উক্তি,—

> "ত্রুট্যাদিপ্রলয়ান্তকালকলনামানপ্রভেদঃ ক্রমাচ্চারশ্চ দ্যুসদাং দ্বিধা চ গণিতং প্রশ্নাস্তথা সোত্তরাঃ।
> ভূধিষ্ণ্যগ্রহসংস্থিতেশ্চ কথনং যন্ত্রাদি যত্রোচ্যতে সিদ্ধান্তঃ স উদাহৃতোঽত্র গণিতস্কন্ধ প্রবন্ধে বুধৈঃ॥"

'সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে গ্রহ-নক্ষত্রাদির সঞ্চার সংস্থানাদি গণিতের ও যন্ত্রাদির সাহায্যে নির্ণীত হয়।

জ্যোতিষ ও বিভাগাদি।

কতকাল হইতে ভারতবর্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সে তথ্য নির্ণয় করা সহজ-সাধ্য নহে। যদি কেহ সৃষ্টির আদিকাল নির্ণয় করিতে সমর্থ হন, ভারতবর্ষ স্পর্দ্ধা-সহকারে দেখাইতে পারে, সৃষ্টির সেই আদিকাল হইতেই ভারতবর্ষে জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠান্বিত। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে প্রাচীন-ভারতবর্ষের পারদর্শিতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার আভাষ আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। সে বিষয়ে অধিক আলোচনা বাহুল্য-মাত্র। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য দেশে—কিরূপভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারই একটু আভাষ দিবার প্রয়াস পাইতেছি। গ্রীস দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক-গণ বলেন,—কাল্‌ডিয়ায় এবং মিশরেই সর্ব্বপ্রথমে জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা হইয়াছিল। সমতল উর্ব্বর ভূমি-খণ্ডে বাস করিয়া, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রকৃতি দত্ত ফল-শস্যাদি প্রাপ্ত হইয়া, কাল্‌ডিয়ার অধিবাসীরা গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি-বিধির বিষয় লক্ষ্য করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। পরজীবনের সুখান্বেষণের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা অমিত অধ্যবসায়ে সৌর-জগৎ-তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ঐতিহাসিক-গণের অনুসন্ধানে প্রকাশ,—কাল্‌ডীয়-গণ অনূ্ন উনিশ শত বৎসর কাল একাদিক্রমে গ্রহণের বিষয় লক্ষ্য করিতে করিতে জানিতে পারেন যে, অষ্টাদশ সৌর বৎসরে বা দুই শত তেত্রিশ চান্দ্র মাসে চন্দ্র পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ, প্রথম বৎসর চন্দ্র যেরূপ ভাবে রাহুগ্রস্ত হইয়াছিলেন, আঠার বৎসর অন্তর ৬৫৮৫ যুক্ত ১এর ৩ দিনে চন্দ্রের সেই অবস্থা উপস্থিত হয় এবং চন্দ্র প্রতি অষ্টাদশ বর্ষে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটে আসে। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহারা আরও লক্ষ্য করেন,—সূর্য্যও প্রতি আঠার বৎসর অন্তর ৬৫৮৫ যুক্ত ১এর ৩ দিনে সমভাবে রাহু-গ্রস্থ হইয়া থাকেন। এই কালকে কাল্‌ডিয়-গণ 'স্যারোস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রথমে গ্রহণের কাল নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়া কাল্‌ডিয়-গণ জ্যোতিষের অন্যান্য বিষয় নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়া ছলেন। আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক বাবিলন দেশ অধিকৃত হওয়ার পর, বাবিলনে কতকগুলি ইষ্টক-ফলক পাওয়া যায়। সেই সকল ফলকে বহু গ্রহণের বিবরণ লিখিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন,—আলেকজাণ্ডারের বাবিলন-জয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী উনিশ শত বৎসরের গ্রহণের কথা তাহাতে লিখিত ছিল; কেহ বলেন,—৭২০ বৎসরের, কেহ আবার বলেন,—৭৩০ বৎসরের। প্রাচীন কাল্‌ডিয়-দিগের মধ্যে প্রচারিত ছিল,—পৃথিব্যাদি গ্রহ-সমূহ যে উপাদানে গঠিত, ধূমকেতুও সেই উপাদানে গঠিত ডায়ডোরস বলেন,—'কাল্‌ডিয়-গণ বিশ্ব-সংসারকে অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ধূমকেতুর উদয়, গ্রহণ, ভূমিকম্প এবং অন্যান্য নৈসর্গিক ব্যাপার, তাঁহাদের মতে, শুভাশুভ ফলপ্রদ।' ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকেই বিশ্বাস করেন,—'কাল্‌ডিয়গণই প্রথমে জলঘড়ির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রাশিচক্র তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তনা; দিবাভাগকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করাও তাঁহাদেরই কল্পনা। সূর্য্যঘড়ি, জলঘড়ি, ছায়াঘড়ি প্রভৃতি তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তনা।' জ্যোতিষ-তত্ত্বের আলোচনায় মিশর-বাসীরা কাল্‌ডিয়দিগের প্রতি-দ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মিশর-বাসীরা যদিও তৎসম্বন্ধে আপনাদের অভিজ্ঞতার

বিভিন্ন-দেশে জ্যোতিষালোচনা।

বিশেষ কোনও নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের যশোগানে মুক্তকণ্ঠ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—'গ্রীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি মিশর। সুতরাং সকল বিষয়েই গ্রীস মিশরকে আদি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।' ডায়জেনাস লেয়ার্টিয়াস বলেন,—'ভল্কান বা বিশ্বকর্ম্মার রাজত্ব-কাল হইতে আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক মিশরাধিকারের সময় পর্য্যন্ত মিশরীয়-গণ ৪৮,৪৫৩ বৎসর গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহারা ৩৭৩টী সূর্য্যগ্রহণ এবং ৮৩২টী চন্দ্রগ্রহণ মাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন।' বলা বাহুল্য, অত দীর্ঘকালের মধ্যে অত কম পরিমাণ গ্রহণ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং পণ্ডিত-গণ নির্দ্ধারণ করেন, খৃষ্ট-জন্মের ষোল শত বৎসর পূর্ব্বের অধিক কালের বিবরণ মিশরীয়-গণ প্রত্যক্ষ করেন নাই। অর্থাৎ,—১৬০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতেই মিশরে জ্যোতিষ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল।' 'সিরিয়স' বা মৃগব্যাধ নক্ষত্রকে প্রাচীন মিশরীয়-গণ থোথ বা থো দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কথিত হয়, সেই মৃগব্যাধ নক্ষত্রের উদয়াস্ত নির্দ্ধারণ করিতে করিতে তাঁহারা বৎসরকে ৩৬৫ যুক্ত ১এর ৪ দিনে বিভক্ত করিয়াছিলেন। মিশরীয়-গণ সচরাচর ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করিতেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মাচরণে বৎসরে ৩৬৫ যুক্ত ১এর ৪ দিন ধরা হইত। ফলতঃ, বর্ষ নিরূপণ এবং বুধ ও শুক্র গ্রহের আবর্ত্তনের বিষয় মিশরীয়-গণই প্রথম নির্দ্ধারণ করেন,—কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা আছে। কিন্তু তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করেন। কারণ, সেরূপ কোনও তথ্য প্রাচীন মিশরে আবিষ্কৃত হইলে, টলেমি নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। হেরোডোটাসের নিকট মিশরবাসীরা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা দুই বার সূর্য্যকে পশ্চিম দিকে উদয় হইতে দেখিয়াছিলেন। এতাদৃশ অসম্ভব কথা শুনিয়াও অনেকে প্রাচীন মিশরের জ্যোতিষ-জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হন। ফিনিসীয়-গণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে নানা দেশে গতিবিধি করিতেন। নক্ষত্রাদির গতিবিধি উদয়াস্ত দর্শনে অনেক সময় তাঁহাদিগকে দিঙ্নিরূপণ করিতে হইত। ফিনিসীয়-গণ যদিও জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে কোনও নিদর্শন রাখিয়া যান নাই, কিন্তু দিগ্দেশ-পরিভ্রমণ-হেতু তাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিশেষ বিশেষ অংশে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। চীনদেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনার ইতিহাস ঐ সকল জাতির ইতিহাস অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। চীনদেশের জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাই, চীনারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন,—'আমরা অতি প্রাচীন কালের ৩৮৫৮ বৎসরের গ্রহণের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ঐ সকল গ্রহণ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাহার কাল-নির্দ্ধারণে সমর্থ ছিলাম। চীন-সম্রাট ফো-হি খ্রীষ্ট-জন্মের ২১৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধির বিষয় তিনি অধ্যবসায় সহকারে আলোচনা করেন। সম্রাট ফো-হি কর্ত্তৃক চীন-দেশে পাটিগণিত ও সঙ্গীত-বিদ্যা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়াও প্রচার আছে। ২৬০৮ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হোয়াং-টি জ্যোতিষ-শাস্ত্রালোচনার জন্য চীনে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যথাক্রমে সূর্য্যের, চন্দ্রের এবং নক্ষত্রগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তিনি

চীন-দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা।

তিন দল পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বারটি চান্দ্র মাসে পূর্ণ একটি সৌরবর্ষ হয় না অর্থাৎ তাহার সহিত আরও কিছু সময় যোগ করিবার আবশ্যক হয়,—এই তত্ত্ব চীনদেশে তিনিই প্রথম প্রচার করেন। তিনি নির্দ্ধারণ করেন,—'উনিশ বৎসরে সাতটি চান্দ্রমাস অতিরিক্ত ধরিয়া লইতে হয়। এই কালাবর্ত্তের বিষয় গ্রীস-দেশে সর্ব্বপ্রথম মেটন কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রসিদ্ধি। কিন্তু চীন-দেশের জ্যোতিষের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতীত হয়,—এতদ্বিষয়ে গ্রীস-দেশের অভিজ্ঞতার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীন-দেশে সে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। সম্রাট হোয়াং-টি জ্যোতিষ-তত্ত্ব নিরূপণের জন্য কঠোর নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত করেন। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যালোচনার জন্য কতকগুলি প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদকে লইয়া তিনি একটি সঙ্ঘ সংগঠন করিয়াছিলেন। সেই সঙ্ঘের সদস্যগণ সূক্ষ্ম-গণনার জন্য দায়ী থাকিতেন। যদি কাহারও গণনায় কোনরূপ ভুলভ্রান্তি ঘটিত, তাহা হইলে রাজবিধি-ক্রমে তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। প্রধানতঃ গ্রহণাদি-দৃষ্টেই সম্রাট হোয়াং-টি পণ্ডিতগণের গণনার সার্থকতার বিষয় উপলব্ধি করিতেন। সে গণনায় যদি কাহারও ভুলভ্রান্তি ঘটিত, অর্থাৎ যদি কোনও পণ্ডিত সূক্ষ্ম-ভাবে গ্রহণের সঞ্চার ও বিদ্যমানতার বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিতেন, তাঁহার প্রাণদণ্ড হইত। হো এবং হি নামক দুই জন প্রসিদ্ধ গণিত-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, রাজ্যের ঐ আইন অনুসারে, সম্রাট চোং-কাঙের শাসন সময়ে, পূর্ব্বোক্ত কারণে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ঐ দুই পণ্ডিত গণনা দ্বারা একটি গ্রহণের বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই; অথচ, সেই গ্রহণ সংঘটিত হইয়াছিল; তাই তাঁহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২৩২১ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাট য়াও জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনার জন্য জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণকে নানারূপে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি চারি জন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদকে রাজ্যের চারি প্রান্তে প্রেরণ করিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্রাট য়াও-এর শাসন-সময়ে রাশিচক্র আটাইশ নক্ষত্রে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি। গণনায় ভুলভ্রান্তি হইলে, ইঁহার শাসনকালেও জ্যোতির্ব্বিদ-গণ কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। সম্রাট য়াও-এর সময় হইতেই চীনাদিগের বর্ষ-পরিমাণ ৩৬৫ যুক্ত ১এর ৪ দিন নির্দ্ধারিত হয়। ইতিহাস আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—সম্রাট ফৌ-হির রাজত্ব-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৮০ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫০০ বৎসর-কাল, চীন-দেশ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান আলোচনায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। ৪০০ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কন্‌ফিউসিয়াস্ ছত্রিশটি গ্রহণের বিষয় গণনা করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কন্‌ফিউ-সিয়াস-কথিত সেই ছত্রিশটি গ্রহণের একত্রিশটিকে গণনাঙ্ক দ্বারা মিলাইয়া পাইতেছেন। ২২১ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সিং-চি-হং-টি জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনায় বিষম প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন। চীনদেশে ঐ কাল পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কৃষি-বিষয়ক, চিকিৎসা-বিষয়ক এবং ফলিত-জ্যোতিষ বা দৈবগণনা বিষয়ক পুস্তক ভিন্ন আর সমস্ত পুস্তক তিনি ধ্বংস করিবার আদেশ দেন। কথিত হয়, কন্‌ফিউসিয়াসের মতের সহিত তাঁহার মত মিলিত না; সেই জন্য কন্‌ফিউসিয়াসের প্রবর্ত্তিত মত-সমূহের উচ্ছেদ-

সাধন কামনায় সম্রাট এবম্বিধ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে চীনের জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ২০৬ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার উত্তরাধিকারী লেও-পাং গণিত-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত লুপ্ত-রত্নাদির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চীনদেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক জ্ঞান একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ঐ সময়ে চীন-সম্রাট হেং-সং কয়েকজন জ্যোতির্ব্বিদকে রাজ-জ্যোতির্ব্বিদ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সেই জ্যোতির্ব্বিদ্-গণ বিদ্যাবত্তা অপেক্ষা চাটুকারিতাতেই অধিকতর পারদর্শী ছিলেন। যং-হং নামক জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে তিনি চন্দ্র-গ্রহণের বিষয় গণনা করিতে বলেন। কিন্তু ঐ জ্যোতির্ব্বিদ্ দুইটি গ্রহণের বিষয় আদৌ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সম্রাট্ হেং-সং তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান। জ্যোতির্ব্বিদ্ সম্রাট সকাশে উপনীত হইয়া উত্তর দেন,—'আমার গণনার ভুল হয় নাই; আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক ও গুণবান্ সম্রাটের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন জন্য গ্রহগণই আপন আপন কক্ষপথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।' চীনদেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যা পরিশেষে কিরূপ অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, এই উপাখ্যানেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঘটনার পর বহুকাল অতীত হইলে, কালিফ-গণের অভ্যুদয়-কালে চীনদেশে যখন মুসলমানগণের গতিবিধি আরম্ভ হয়, সেই সময় জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে আরব-দেশের জ্ঞান-গবেষণা চীন-সাম্রাজ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য-দেশের আদি দার্শনিক থেলিসের পূর্ব্বে গ্রীস-দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনার যে কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদায় উপকথায় পূর্ণ। থেলিস হইতেই গ্রীস জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন। থেলিস প্রচার করেন,—'নক্ষত্রসমূহ এক একটি অগ্নিপিণ্ড। সূর্য্য হইতে চন্দ্র আলোক-প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যের আলোকলাভের সময় সময় বাধা ঘটে বলিয়াই চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পৃথিবী গোল, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র-স্থলে অবস্থিত।' গোলককে থেলিস পাঁচটি মণ্ডলে বিভক্ত করেন। সেই পাঁচ মণ্ডল যথাক্রমে উত্তরমেরুমণ্ডল দক্ষিণমেরুমণ্ডল, গ্রীষ্ম-মণ্ডল এবং দুইটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল নামে অভিহিত হইতে পারে। তিনি আরও নির্দ্ধারণ করেন,—'বিষুব-রেখা অয়নমণ্ডল বা ক্রান্তিবৃত্তের দ্বারা তির্য্যগ্‌ভাবে এবং যাম্যোত্তর রেখা দ্বারা লম্বভাবে বিভক্ত হয়।' গ্রহণের বিষয়ও থেলিস লক্ষ্য করিয়াছিলেন। হেরোডোটাস বলেন,—যে সময়ে মিডীয়দিগের সহিত লিডীয়গণের যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল, তাৎকালীন প্রসিদ্ধ গ্রহণের বিষয়ে থেলিস ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। *

গ্রীসে জ্যোতিষালোচনা।

* প্রাচীন কালে ইরাণের উত্তর-পশ্চিমের কতকাংশ মিডিয়া রাজ্য নামে অভিহিত হইত। উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে পারস্য, পূর্ব্বে পার্থিয়া এবং পশ্চিমে আসিরীয়া,—এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী দেশ মিডিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন মিডিয়া অধুনা আজারবিজান, ঘিলান, মাজান্দারিন এবং লুরিস্তানের উত্তরাংশ প্রভৃতিতে বিভক্ত। ঐ সকল প্রদেশ আজিকালি পারস্যের অধিকারভুক্ত। ভাষা, ধর্ম্মে এবং আচার-ব্যবহারে মিডীয়গণ অনেকাংশে পারসিক-দিগের অনুসারী ছিল। আসিরীয়-দিগের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া, ৭০৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, মিডিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে। মিডিয়-দিগের প্রথম দলপতির বা রাজার নাম —ডিজোসেন (কৈকোবাদ)। এগবাটানা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ডিজোসেসের পুত্র ফ্রাওরটেস (আরফাক্সাদ) পারসিকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ফ্রাওরটেসের পুত্রের নাম—সায়াক্সারেস

ক্যালিমেকাস * বলেন,—থেলিস 'লেসার বিয়ার' বা ক্ষুদ্র ভল্লুক নক্ষত্রের যে গতি নির্ণয় করিয়াছিলেন, তদনুসরণেই ফিনিসীয় বণিকগণ সমুদ্র-পথে গতিবিধি করিতে সমর্থ হইতেন। থেলিসের পর আনাক্সিমান্দার জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বিষয়ে বহু গবেষণা প্রকাশ করেন। পৃথিবী গোল, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রভৃতি মতও তিনি প্রচার করিয়া যান। রাশি-চক্রের জ্ঞান, তাঁহার আবিষ্কার বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। সূর্য্যের আকৃতি পৃথিবীর আকারের সমান, আনাক্সিমান্দার এবম্বিধ মত প্রচার করিয়া যান। সূর্য্যঘড়ি বা শঙ্কু দ্বারা সময়-নিরূপণ, তাঁহারই আবিষ্কার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। লাসিডেমন সহরে তিনি ঐরূপ একটি শঙ্কুপাত দ্বারা বিষুবদ্দিন (বিষুবরেখার ও অয়ন-মণ্ডলের সংযোগ স্থান) এবং অয়ন নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ভৌগোলিক মানচিত্রের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া তিনি অধিকতর প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। আনাক্সিমেনিস, আনাক্সাগোরাস এবং পীথাগোরাস প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে অনেক আলোচনা করেন। তন্মধ্যে পীথাগোরাস অধিকতর যশস্বী হইয়াছিলেন। পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এবং সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, আর পৃথিবী একটি গ্রহ এবং উহা সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে,—পীথাগোরাস এই সকল বিষয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পরবর্ত্তিকালে কোপানিকাস যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাহা পীথাগোরাসেরই অনুস্মৃতি বলিয়া কথিত হয়। পীথাগোরাসের পর তাঁহার শিষ্য ফিলোলেয়স পৃথিবীর ঘূর্ণন বিষয়ে বিবিধ মত প্রচার করেন। তিনি বলেন,—'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হইতে আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে; কাচবৎ গোলক-সদৃশ সূর্য্যে সেই আলোক প্রতিভাত হওয়ায় সূর্য্য জ্যোতিষ্মান্ হন। তাঁহার হিসাবে চান্দ্রমাসের পরিমাণ ২৯॥ দিন, চান্দ্র বর্ষের পরিমাণ ৩৫৪ দিন। সৌর-বর্ষের পরিমাণ তিনি ৩৬৫॥ দিন নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর সিসিরো প্রভৃতি আর যাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মেটন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি গ্রীস-দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনার যুগান্তর উপস্থিত করেন। সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি কত দিন অন্তর সমসূত্রে অবস্থিতি করেন, স্মরণাতীত কাল হইতে সে তত্ত্ব নির্দ্ধারণ জন্য পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছিল। কাল্ডীয়গণ এতৎসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে

(কৈকাওস)। বাবিলনের রাজা নাবোপোলাসারের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ৬০৪ পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দে তিনি আসিরীয়া-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করেন। মিশর, এসিয়া-মাইনর এবং সিরিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়াছিল। নানা দেশে আপনার প্রভাব বিস্তৃত করিয়া সায়াক্সারেস লিডীয়গণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। লিডিয়া—এসিয়া-মাইনরের একটী প্রাচীন রাজ্য। ঐ রাজ্যের পশ্চিমে আইওনিয়া, দক্ষিণে কেরিয়া, পূর্ব্বে ফ্রিজিয়া, উত্তরে মিসিয়া অবস্থিত ছিল। ৭২০ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে লিডিয়া-রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। সার্ডিস ঐ রাজ্যের রাজধানী ছিল। ৫৪৬ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে মারমনেড বংশের রাজত্ব-কালে লিডিয়া উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। লিডিয়ার সেই উন্নত অবস্থার সময় লিডিয়ার সহিত মিডিয়ার ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধের সময়ে সূর্য্য-গ্রহণে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস লক্ষিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে উভয় পক্ষই ভীত হন। পরিশেষে সন্ধি হইয়া যুদ্ধ মিটিয়া যায়। এই সূর্য্য-গ্রহণের বিষয় থেলিস গণনা করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

* ক্যালিমেকাস খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠালয়ের প্রধান অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কবি, বৈয়াকরণ ও সমালোচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। লিবিয়ার অন্তর্গত সাইরিণে তাঁহার জন্ম।

উপনীত হইয়াছিলেন,—তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সে গণনা অনুসারেও সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। তাই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পুনঃপুনঃ ঐ তত্ত্বের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সূত্র অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। মেটন এবং উক্টেমন এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পথে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, মেটন তদ্বিষয়ে যে অশেষ গবেষণা প্রকাশ করিয়া যান, তজ্জন্য ইতিহাসে 'মেটনিক সাইকেল' বা মেটন-প্রবর্ত্তিত কালাবর্ত্ত শব্দ আজিও স্থান পাইয়া আছে। অনেক দিন হইতে ২৯॥ দিনে চান্দ্র মাস গণনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু ২৯॥ দিনে মাস ধরিতে গেলে, হিসাবের বড়ই গোলযোগ হয় বলিয়া পর্য্যায়ক্রমে বার মাসের কতকগুলি মাসকে ২৯ দিনে এবং কতকগুলি মাসকে ৩০ দিনে ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাহাতে সেইরূপ বার মাসে একটি সৌর বৎসর গণনা করা হইত। যে মাস ২৯ দিনে ধরা হইত, তাহা অপূর্ণ মাস এবং যে মাস ৩০ দিনে ধরা হইত, তাহা পূর্ণ মাস নামে পরিচিত ছিল। মেটন হিসাব করিয়া দেখেন, ১২৫টি পূর্ণ মাসে এবং ১১০টি অপূর্ণ মাসে অর্থাৎ ৬৯৪০ দিনে ২৩৫টি চান্দ্র মাস হয়। ঐ পরিমাণ চান্দ্রমাসে প্রায় ১৯টি সৌর বৎসর হইতে পারে। ৪০৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই হইতে এইরূপে চান্দ্র-মাস গণনা-পদ্ধতি অর্থাৎ কালাবর্ত্ত গণনা আরম্ভ হয়। ইহাই 'মেটনিক সাইকেল' (Metonic Cycle)। গ্রীসের প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই এই কালাবর্ত্ত মান্য করিয়া লন। গ্রীসের প্রধান প্রধান নগরে এবং উপনিবেশ-সমূহে এই কালাবর্ত্ত অনুসারে গণনা আরম্ভ হয়। যে শতাব্দীর যে দিনে এই কালাবর্ত্ত গণনা আরম্ভ হয়, পিত্তল-ফলকে স্বর্ণাক্ষরে তাহা লিখিত হইয়াছিল। তদনুসারে ঐ সংখ্যাগুলি 'গোল্ডেন নম্বর' বা স্বর্ণ-সংখ্যা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ঐ কালাবর্ত্তের অনুসরণেই ইউরোপে আজি পর্য্যন্ত পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সময়োচিত সামান্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া ঐ কালাবর্ত্তের অনুসরণে ইউরোপের ধর্ম্ম-কর্ম্ম পর্য্যন্তের সময় আজিও নির্দ্ধারিত হইয়া আসিতেছে। মেটনের পর ইউডোক্সাস, প্লেটো, আরিষ্টটল, হেলিকন, ইউডেমাস, কালিপ্পস, থিওক্রেটাস, অটোলাইকাস এবং পিথিয়াস প্রভৃতি কর্ত্তৃক গ্রীসে জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৩৭০ অব্দে ইউডোক্সাস জ্যোতির্ব্বিদ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্লিনি বলেন,—'৩৬৫॥ দিনে বৎসর হয়, গ্রীস দেশে তিনি প্রবর্ত্তনা করেন।' আর্কিমেডিস বলেন,—'সূর্য্যের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাস অপেক্ষা নয় গুণ বৃহৎ, ইউডোক্সাস তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন।' আপনার জন্মস্থান ন্নিডাসে ইউডোক্সাস একটী মানমন্দির প্রস্তুত করিয়া গ্রহাদির গতিস্থিতি নির্দ্ধারণ করিতেন। গ্রহগণ প্রতিনিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে, যন্ত্র-সাহায্যে তাহাদের গতিবিধির কাল নিরূপণ করা যাইতে পারে, ইউডোক্সাস এই তত্ত্ব প্রথম প্রচার করেন। ইউডোক্সাস বলিতেন,—'সূর্য্যের ও চন্দ্রের প্রত্যেকের তিনটি করিয়া মণ্ডল আছে। গ্রহগণের মণ্ডলের সংখ্যা চারিটী। তন্মধ্যে একটী মণ্ডল অক্ষরেখাকে বেষ্টন করিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে। তদ্দ্বারা আহ্নিক-গতি সংঘটীত হয়। দ্বিতীয় মণ্ডল দ্বারা বার্ষিক গতি নির্দ্ধারিত হয়। ইত্যাদি।' প্লেটো জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন না বটে; কিন্তু জ্যামিতির সাহায্যে নক্ষত্রাদির গতিস্থিতি নির্দ্ধারণ করা যায়, এই তত্ত্ব তিনি শিক্ষা দিয়া যান। আরিষ্টটলের সূক্ষ্ম-দর্শনের ফলে জ্যোতিষ

শাস্ত্রের কয়েকটী অভিনব তত্ত্ব প্রকাশ পায়। চন্দ্রের দ্বারা মঙ্গল গ্রহে গ্রহণ-সঞ্চার হইয়াছিল, আরিষ্টটল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। হেলিকন ও ইউডেমাস গ্রহণের বিষয় গণনা করিতে পারিতেন। গ্রীসের ইতিহাসে প্রকাশ,—'থেলিস, হেলিকন ও ইউডেমাস ভিন্ন প্রাচীন গ্রীসে আর কেহই সূক্ষ্মভাবে গ্রহণের বিষয় গণনায় সমর্থ হন নাই।' বিষুব-রেখার সহিত ক্রান্তিবৃত্তের সংযোগে যে কোণের উৎপত্তি হয়, তাহার পরিমাণ ২৪° ডিগ্রি,—ইউডেমাস এই মত প্রচার করিয়া যান। মেটন প্রবর্ত্তিত কালাবর্ত্ত গণনার বিচার করিয়া কালিপ্পস একটী নূতন তত্ত্ব প্রচার করেন। কালিপ্পস বলিয়াছিলেন,—'মেটন যে কালাবর্ত্তের গণনা করিয়া যান, তাহার প্রত্যেক কালাবর্ত্তে ১এর ৪ দিনের ভুল আছে। সেই কারণে, ৯৪০ চান্দ্র মাসে চারিটি মেটনিক সাইকেল হয়—হিসাব করিয়া, তাহা হইতে তিনি একটি দিন বাদ দেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর ছয় বৎসর পূর্ব্বে যে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়াই তিনি ঐ তত্ত্ব প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সমসময়ে জ্যোতির্ব্বিদ পিথিয়াস মার্সেলিস সহরে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি শঙ্কুর সাহায্যে নানাস্থানের ক্রান্তিবৃত্ত নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন। তাহাতে তিনি মার্সেলিস এবং বাইজাণ্টাইন সহরদ্বয়ে ছায়াপাতের সমতার বিষয় লক্ষ্য করেন। ভূবিদ্যা এবং জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য পিথিয়াস উত্তর-প্রদেশে আইস্‌লণ্ড পর্য্যন্ত গমন করিয়া-ছিলেন। দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধিতে শীতোত্তাপের হ্রাস এবং ঋতুর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়,—পিথিয়াসই প্রথম প্রচার করেন। ইহার পর আলেকজান্দ্রিয়ায় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অভ্যুদয় হয়; জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনায় আলেকজান্দ্রিয়া সকল দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসে। ইতিপূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বিষয়ে যে দেশে যে কোনও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সকলই কল্পনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্দ্ধারিত জ্যোতিষ-তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কাল পর্য্যন্ত গ্রীস-দেশে—কেবল গ্রীস-দেশেই বা বলি কেন, প্রায় সকল দেশেই—জ্যোতিষের কতকগুলি বিষয় মাত্র লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু কি কারণে সেই সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়; অর্থাৎ, কেন গ্রহণ উপস্থিত হয়, কি পদ্ধতিতে গ্রহ-নক্ষত্রাদি অবস্থিতি করিতেছে,—ইত্যাদি বিষয়ের বিজ্ঞান-সম্মত কারণ কেহই নির্দ্ধারণ করেন নাই। আলেকজান্দ্রিয়া হইতেই তৎসমুদায় নির্দ্ধারণের সূত্রপাত হয়। উপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা এবং ত্রিকোণমিতির নিয়মানুসারে আলেকজান্দ্রিয়াতেই প্রথম জ্যোতিষ-তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছিল। কি প্রকারে আলেকজান্দ্রিয়া এই গৌরব লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস একটু আলোচনা করার আবশ্যক হয়। পৃথিবীর নানা দেশ জয় করিয়া মাসিডনাধিপতি মহাবীর আলেকজাণ্ডার লোকান্তরে গমন করেন। ৩২১ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে বাবিলনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার অধিকৃত রাজ্য-সমূহ তাঁহার সেনাপতিগণ পরস্পরের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। লেগাসের পুত্র টলেমি, লিবিয়া প্রভৃতি সহ মিশর-রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই টলেমি—'সোটর', অর্থাৎ 'রক্ষাকর্ত্তা' নামে

আলেকজান্দ্রিয়ায় জ্যোতিষালোচনা।

পরিচিত। ইঁহার পুত্রপৌত্রগণও টলেমি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইনি 'টলেমি সোটর' বা প্রথম টলেমি নামে পরিচিত। টলেমি সোটর বড়ই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিদ্যানুরাগিতা ও বিদ্যোৎসাহিতা প্রভাবে তিনি অমর হইয়া আছেন। অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া টলেমি সোটর আপন রাজধানীকে বিদ্বন্মণ্ডলীতে সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার পৃথিবী-বিখ্যাত পাঠালয় টলেমি সোটর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রীস-দেশের প্রধান প্রধান দার্শনিক-গণ টলেমি সোটরের সাহায্য পাইয়াই পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। টলেমি সোটরের পুত্র—টলেমি ফিলাডেল্‌ফাস। তিনিও পিতার ন্যায় গুণসম্পন্ন ছিলেন। বিদ্যালোচনায় উৎসাহ-দানে তাঁহারও প্রসিদ্ধির অবধি নাই। পাঠাগারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে একটী যাদুঘর ও একটি বৃহৎ মানমন্দির সংস্থাপিত করিয়া তিনি বিজ্ঞানালোচনার পথ অধিকতর প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। টলেমি ফিলাডেল্‌ফাস সর্ব্বদাই সেই যাদুঘরে, পাঠালয়ে ও মানমন্দিরে গমন করিতেন এবং তত্রত্য পণ্ডিতগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাঁহাদের বিজ্ঞানালোচনায় সহানুভূতি দেখাইতেন। এইরূপে আলেকজান্দ্রিয়ায় যে সকল জ্যোতির্ব্বিদের উদ্ভব হইয়াছিল, আরিষ্টিল্লাস ও টিমোচারিস্ তাঁহাদের আদি-পর্য্যায়ে অবস্থিত। খ্রীষ্ট-জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, প্রথম টলেমির রাজত্ব-কালে, ঐ দুই জ্যোতির্ব্বেত্তার আবির্ভাব হয়। রাশিচক্রের মধ্যে প্রত্যেক নক্ষত্রের পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ, ঐ দুই জ্যোতির্ব্বিদ তাহাই নির্দ্ধারণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। ঐ দুই জ্যোতির্ব্বিদের অবেক্ষণের ফলে পরবর্ত্তিকালে হিপ্পারকাস্ অয়ন-চলন নির্দ্ধারণে সমর্থ হন। জ্যোতির্ব্বিদ আরষ্টিল্লাস ও টিমেচারিসের পর আরিষ্টার্কাসের প্রসিদ্ধির বিষয় উল্লিখিত হয়। তিনি স্যামস দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। ২৮১ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। আরিষ্টার্কাস সূর্য্যের এবং চন্দ্রের আকৃতি-পরিমাণ ও পরস্পরের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পৃথিবীতে যখন অর্দ্ধ-চন্দ্রের উদয় হয়, তখন মনুষ্যের চক্ষুর উপর যে চন্দ্র-রশ্মি পতিত হয়, সেই রশ্মি-রেখা চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যবিন্দুর সংযোগ-রেখার সহিত লম্বভাবে অবস্থিত থাকে। এই অবস্থা দৃষ্টে আরিষ্টার্কাস চন্দ্রের ও সূর্য্যের কৌণিক দূরত্ব নির্দ্ধারণ করেন। তাহাতে দেখা যায়,—সমকোণী ত্রিভুজের নিয়মানুসারে তাহাদের দূরত্ব ৮৭° ডিগ্রি হইতে পারে। ইহা হইতে আরিষ্টার্কাস প্রতিপন্ন করেন,—পৃথিবীর ও চন্দ্রের যে দূরত্ব, পৃথিবীর ও সূর্য্যের দূরত্ব তাহার আঠার-উনিশ গুণের কম নহে। আরিষ্টার্কাসের এবম্বিধ সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ যুক্তি-মূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কোন্ সময়ে ঠিক অর্দ্ধচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। সুতরাং তাঁহার গণনায় ভ্রম ছিল বলিয়া পরবর্ত্তিকালে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আরিষ্টার্কাস যে কোণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন—৮৭° ডিগ্রি, এখন সেই কোণের পরিমাণ ৮৭° ডিগ্রি ৫০′ মিনিট নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পীথাগোরাস প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন,—পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বের তিন বা সাড়ে তিন গুণ দূরে সূর্য্য অবস্থিত। আরিষ্টার্কাসের গণনা কতকটা ভ্রমপূর্ণ হইলেও পীথাগোরাসের মত যে উহাতে খণ্ডিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সূর্য্যের ব্যাসের পরিমাণ সম্বন্ধে আরিষ্টার্কাস বলিয়াছেন,—

'সূর্য্যের আহ্নিক গতি দ্বারা যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, সেই বৃত্তের ৭২০ অংশের এক অংশ সূর্য্যের ব্যাস-পরিমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ফলতঃ, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যে সকল বিষয় লইয়া মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছিলেন, আরিষ্টার্কাস তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর সার তথ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরিষ্টার্কাসের পর এরাটোস্থেন্স আলেকজান্দ্রিয়ার রাজকীয় পাঠাগারের তত্ত্বাবধায়ক-পদ লাভ করেন। ২৭৬ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে সাইরিণে * এরাটোস্থেন্সের জন্ম হয়। মিশর-রাজ তৃতীয় টলেমি (টলেমি ইউয়ারজেটেস্) তাঁহাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় আনয়ন করিয়াছিলেন। 'আর্ম্মিলারি স্ফিয়ার' বা বলয়াকার গোলকের তিনিই আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি। সেই যন্ত্রের সাহায্যে এরাটোস্থেন্স অয়নাংশের এবং ভূ-বৃত্তের অনুপাত নির্দ্ধারণ করেন। তিনি বলিয়াছেন,—'অয়নাংশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দূরত্ব ১১ হইলে, বৃত্তের পরিধি ৮৩ হইবে। অথবা, ১১এর সহিত ৮৩র যে অনুপাত, উহাদের পরস্পরের মধ্যেও সেই অনুপাত ধরিতে হইবে।' সেই অনুপাতের পরিমাণ ৪৭° ডিগ্রি ৪২' মিনিট ৩৯" সেকেণ্ড নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়া তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ২৩° ডিগ্রি ৫১' মিনিট ১৯·৫" সেকেণ্ড তিনি ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরাটোস্থেন্সের এই সিদ্ধান্তের দ্বারা পরবর্ত্তিকালের জ্যোতির্ব্বিদ-গণ বহু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর আকৃতি-পরিমাণ নির্দ্ধারণে এরাটোস্থেন্সের অশেষ প্রসিদ্ধি আছে। পৃথিবীর পরিধির পরিমাণ—এরাটোস্থেন্স ২,৫০,০০০ (মতান্তরে ২,৫২,০০০) ষ্টেডিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর পরিধি-পরিমাণ নির্দ্ধারণ বিষয়ে, এরাটোস্থেন্সের গবেষণা সম্বন্ধে একটি অভিনব ঘটনা প্রচারিত হইয়াছে। ঘটনাটি এই,—'সাইন প্রাচীন মিশরের সর্ব্বদক্ষিণের একটি নগর। আলেকজান্দ্রিয়া সহর ও ঐ নগর প্রায় একই অক্ষরেখায় অবস্থিত। সাইন নগর অয়ন-বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে বিদ্যমান। কারণ, গ্রীষ্মকালে ঐ প্রদেশে যখন সূর্য্যোদয় হয়, শঙ্কুর ছায়াপাত দেখা যায় না। এমন কি নগরে যে সকল গভীর কূপ বিদ্যমান, তাহার মধ্যে সূর্য্য-রশ্মি সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এবম্বিধ অয়নের এক দিবসে আলেকজান্দ্রিয়া সহরে মস্তকের উপরে সূর্য্যের দূরত্ব—মধ্যাহ্নকালে ৭° ডিগ্রী ১২' মিনিট অর্থাৎ ভূ-গোলকের পরিধির পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ দৃষ্ট হয়। আলেকজান্দ্রিয়া এবং সাইন নগরের দূরত্ব ৫০০০ ষ্টেডিয়া। সুতরাং ৫০০০×৫০= ২,৫০,০০০ ষ্টেডিয়া পৃথিবীর পরিধি-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।' এরাটোস্থেন্স প্রভৃতির আবির্ভাবের সমসময়ে ইউক্লিড জ্যামিতি-তত্ত্বের আলোচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের আলোচনায় এই সময় হইতে জ্যামিতির সাহায্য-গ্রহণও আরম্ভ

* ৬৩১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ব্যাট্টাসের অধিনায়কত্বে স্পার্টান্ ঔপনিবেশিকগণ কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। সাইরেন্সিয়া-প্রদেশের রাজধানী বলিয়া এই নগরের প্রসিদ্ধি। এক সময়ে সাইরেন্সিয়া প্রদেশ কার্থেজ হইতে মিশর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দক্ষিণ দিকে ফ্রেজান ওয়েসিস পর্য্যন্ত ইহার সীমানা বিস্তৃত হইয়াছিল। এক সময়ে লিবীয়-গণ এই রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের পর সাইরিণে মিশরের ও রোমের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। পরিশেষে ঐ প্রদেশ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ৬১৬ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজ্য পারস্যের খসরু-বংশের এবং ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে আরবগণের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হয়। অধুনা যে প্রদেশ বার্কা নামে পরিচিত, প্রাচীনকালে সাইরেন্সিয়া বলিতে তাহাকেই বুঝাইত।

হইয়াছিল। এরাটোস্থেনেসের পর হিপ্পার্কাসের জ্যোতির্ব্বিদালোচনা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ৩৬৫ যুক্ত ১এর ৪ দিনে এ পর্য্যন্ত বৎসর গণনা হইয়া আসিতেছিল। হিপ্পার্কাস দেখিতে পান, ঐরূপভাবে বৎসর বিভাগেও সাতমিনিট করিয়া বেশী ধরা হইতেছে। সুতরাং তিনি বৎসরের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন—৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট। বলা বাহুল্য, এ গণনায়ও বৎসরে বার সেকেণ্ড অধিক ধরা হয়। বিষুবরেখার উত্তরে এবং দক্ষিণে সূর্য্যের অবস্থান জন্য শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতু-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। হিপ্পার্কাস নির্দ্ধারণ করেন,—'সূর্য্য বৎসরের মধ্যে ১৮৭ দিন বিষুবরেখার ও উত্তর-মেরু প্রদেশের মধ্যে অবস্থিতি করেন, আর প্রায় ১৭৮ দিন বিষুব-রেখার দক্ষিণাংশে অবস্থিত থাকেন।' এই ব্যাপার অবেক্ষণ করিয়া হিপ্পার্কাস ক্রান্তি-মণ্ডলের উৎকেন্দ্রত্ব অবধারণ করেন। ইহা হইতে তিনি বুঝিতে পারেন, পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে সৌরকেন্দ্রিক নহে। সুতরাং সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর দূরত্বের সময় সময় ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। এইরূপে সূর্য্য যখন পৃথিবী হইতে অধিক দূরে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহার গতির অল্পতা অনুভব হয়; আবার যখন তিনি নিকটে আসেন, তখন তাঁহার গতি যেন বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতেই হিপ্পার্কাস্ সমীকরণ-প্রণালীতে দূরত্বাদির সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন। সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া হিপ্পার্-কাসের চিন্তাস্রোত চন্দ্রের প্রতি প্রধাবিত হয়। কাল্‌ডিয় প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগণের গবেষণার ফল অনুসন্ধান করিয়া হিপ্পার্কাস চন্দ্রের সহিত সূর্য্যের, পৃথিবীর ও নক্ষত্রের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন। চন্দ্রের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি এবং সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রেরও উৎকেন্দ্রত্ব প্রভৃতি হিপ্পার্কাস আলোচনা করিয়া যান। হিপ্পার্কাস ১০৮০টী নক্ষত্রের অবস্থান প্রভৃতির বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। পরবর্ত্তিকালে ঐ তালিকা জ্যোতির্ব্বিদ-গণের অনেক উপকারে আসিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে ত্রিকোণমিতির সাহায্য-গ্রহণের পথ হিপ্পার্কাস অনেকাংশে পরিষ্কার করিয়া যান। অক্ষরেখার এবং দ্রাঘিমার প্রবর্ত্তনায় তিনি ভূগোল-বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করেন। হিপ্পার্কাসের পর তিন শতাব্দী কাল আলেকজান্দ্রিয়ায় আর কোনও প্রতিভাশালী জ্যোতির্ব্বিদের আবির্ভাব হয় নাই। ঐ তিন শতাব্দীর প্রধান ঘটনার মধ্যে জুলিয়স সিজার কর্ত্তৃক রোম-সাম্রাজ্যের পঞ্জিকার সংস্কার বিধান, এবং পোসিডোনিয়স কর্ত্তৃক জোয়ার-ভাটার কারণ-নির্ণয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে টলেমি ক্লডিয়াসের সময়ে আর একবার আলেকজান্দ্রিয়া বিজ্ঞানালোচনায় প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। ১২৯ খৃষ্টাব্দে টলেমি ক্লডিয়াসের জন্ম হয়। তিনি মিশরের টলেমি রাজ-বংশোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই বিখ্যাত পুরুষ নিজেও জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন; অধিকন্তু পুরাকালীন সমস্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারের শোভাসম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। চন্দ্রের তুঙ্গান্তর-গ্রহণ প্রভৃতি তত্ত্বের আবিষ্কার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। টলেমি 'জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের রাজা' বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। টলেমির সময়ে জ্যোতিষ-শাস্ত্র উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার লোকান্তরের পর জ্যোতিষালোচনা লোপপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। তখন গ্রীস-দেশেও জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের আলোচনা লোপ পাইয়া আসে। ইউরোপ ও আফ্রিকা প্রভৃতি যখন এইরূপে অজ্ঞানান্ধকারে

আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, সেই সময় জ্ঞানসূর্য্য বাগ্‌দাদে সমুদিত হইয়াছিলেন। টলেমি-রাজবংশের রাজত্ব-কালে আলেকজান্দ্রিয়া যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল, কালিফ-গণের অভ্যুদয়-কালে বাগ্‌দাদ সেইরূপ জ্ঞান-গৌরবে গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। কালিফ-দিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যোৎসাহিতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম—আবু জিয়াফর্।

আরবে জ্যোতিষালোচনা।

তিনি আল্-মনসুর অর্থাৎ বিজয়ী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিনি বাগ্‌দাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার পৌত্র আল্-মামন্—তাঁহারই ন্যায় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। আল্-মামন্—আব্বাসাইড্-গণের সপ্তম স্থানীয়। তিনি সুপ্রসিদ্ধ হারুন্-উল্-রসিদের দ্বিতীয় পুত্র। আল্-মামন্ ৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাগ্‌দাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানালোচনার জন্য আপনার প্রজাবর্গকে বিশেষরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। গ্রীসের সম্রাট তৃতীয় মাইকেলকে মুক্তি দিবার সময় তিনি যে সন্ধি-সর্ত্ত করেন, তাহা তাঁহার বিদ্যানুরাগিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি সর্ত্ত করিয়াছিলেন,—'গ্রীসের দার্শনিক-গণের লিখিত গ্রন্থাদি যেন তাঁহাকে অবাধে সংগ্রহ করিতে দেওয়া হয়।' আল্-মামন বহু গ্রন্থ আরবী-ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যার অন্তর্গত কঠিন প্রশ্নের সমাধান জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া আল-মামন্ তৎসমুদায়ের মীমাংসা করিয়া লইবার চেষ্টা পাইতেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যা-সংক্রান্ত টলেমির গ্রন্থ আল্-মামনের রাজত্ব-কালে আইজাক বেন হোসেন কর্তৃক অনুবাদিত হয়। থেবিত (থাবেৎ) বেন কোরা সেই অনুবাদের পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ঐ গ্রন্থ 'আল্‌মাজেষ্ট' নামে পরিচিত হয় এবং উহার সহিত আরবীয় জ্যোতির্ব্বিদ-গণের অনেক গবেষণা সন্নিবিষ্ট হয়। আরবের জ্যোতির্ব্বিদ-গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদের নাম—আল্-বাটেনাস বা মহম্মদ বেন্ জবর্ আল্-বাটানি। আল্-বাটানি বলিয়াই তিনি প্রসিদ্ধ। মেসোপোটামিয়ার অন্তর্গত বাটান পল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়। ৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। অয়ন-চলনের গতি বিষয়ে তাঁহার গণনা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গণনা অপেক্ষা সঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্যার গণনা-সংক্রান্ত তিনি যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া যান, তদ্দ্বারা বর্ত্তমান ইউরোপের জ্যোতিষ-তত্ত্বালোচনার পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দেয়। আল্‌বাটানির পর থেবিৎ বেন কোরার নাম উল্লেখযোগ্য। নক্ষত্রের গতির বিষয় তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। আরবীয়-গণের জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনা কেবল যে বাগ্‌দাদে বা আরবে নিবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; তাঁহারা যে যে দেশ অধিকার করিয়া আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তত্তদ্দেশেই তাঁহাদের বিদ্যার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ফতিমার বংশোদ্ভব কালিফগণ দুই শতাব্দী কাল মিশরে রাজত্ব করেন। মিশরের টলেমি-বংশীয় রাজগণ জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনায় উৎসাহ-দান জন্য যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ফতিমাইড বা ফতিমা-বংশীয় * কালিফগণও মিশরে তদ্রূপ

* 'কালিফ' শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী। হজরত মহম্মদের লোকান্তরের পর যাহারা তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারাই কালিফ বলিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত। মহম্মদের কোনও পুত্র-সন্তান

প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। কালিফ হাকেম ৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জ্যোতির্ব্বিদ্‌ ইবন জোনিস সেই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি গ্রহণাদি সম্বন্ধে এবং চন্দ্রের গতি বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া যান, তাহা ইউরোপের বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। সারাসেন-গণ স্পেনদেশ জয় করিয়াও এবম্বিধ বিদ্যানুরাগিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তখন এক স্পেন ভিন্ন ইউরোপের সকল দেশেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। আর্জাচের, আল্‌-হাজেন এবং আভেরস প্রভৃতি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্পেনদেশের জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনার যে স্মৃতি-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, ইউরোপ তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তাতার-দেশে এবং পারস্য-দেশে আরবীয়-গণের বিস্তার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওমার চেয়ম্‌ পারস্য-দেশের পঞ্জিকার সংস্কার-সাধন করেন। হোলেগু ইলেকু খাঁ ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য জয় করিয়াছিলেন। তাউরিসের নিকটবর্ত্তী মারাঘা পল্লীতে তিনি একটী মানমন্দির নির্ম্মাণ করেন। নানাদেশের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তথায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা করিতেন। বিখ্যাত নসির উদ্দীনের উৎসাহে জ্যোতিষ-সংক্রান্ত একটী তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। সে তালিকা জোতিষ-গণনায় বিশেষ উপযোগী বলিয়া কথিত হয়। ১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ তালিকা প্রস্তুতের কার্য্য শেষ হয়। ঐ বৎসর পারস্য-বিজয়ী ইলেকু খাঁ ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাতার দেশে তৈমুরলঙ্গের পৌত্র উলুক বেগ কর্ত্তৃক জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনায় উৎসাহ দান করিতেন এবং আপনিও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার রাজধানী সমরকন্দ সহরে তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের একটী পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেখানে জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনার উপযোগী বহু যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সেই যন্ত্র-সাহায্যে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বিবিধ তত্ত্ব আলোচনার সুবিধা পাইয়াছিলেন। ১৮০ ফিট উচ্চ একটী শঙ্কু-নির্ম্মাণ করিয়া তিনি ক্রান্তিবৃত্তের অপবর্ত্তনের এবং অয়ন-চলনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেন। সে হিসাবে সত্তর বৎসরে প্রথমোক্তের পরিমাণ ২৩° ডিগ্রি ৩০′ মিনিট ২০″ সেকেণ্ড এবং শেষোক্তের পরিমাণ ১° ডিগ্রি নির্দ্ধারিত হয়। হিপ্পার্কাস প্রমুখ প্রাচীন

ছিল না। সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। হজরত মহম্মদের জামাতা আলি কালিফ-পদ অধিকারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে ৬৩২ খৃষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের অন্যতম শ্বশুর আবু বকর কালিফ-পদ অধিকার করিয়া বসেন। তবে আবু বকরের বংশই যে অপ্রতিহতভাবে কালিফ-পদ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। ৬৬১ খৃষ্টাব্দে দামাস্কাসের শাসনকর্ত্তা মোয়াইজা কালিফ বলিয়া পরিচিত হন। ইনি ওমেয়া বংশসম্ভূত। সুতরাং ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ ওমেয়াদ কালিফ-বংশীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ওমেয়া-বংশীয় কালিফগণের প্রাধান্য ৭৫০ খৃষ্টাব্দে বিলুপ্ত হয়। আব্বাস-বংশীয় কালিফগণ বাগ্‌দাদের সিংহাসন অধিকার করেন। মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাস হইতে এই বংশের উৎপত্তি হয়। এই আব্বাস-বংশীয় কালিফগণ ১২৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাগ্‌দাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা 'আব্বাসাইড' কালিফ বলিয়া পরিচিত। ইতিমধ্যে মিশর দেশে ফতিমা-বংশীয় কালিফগণের অভ্যুদয় হয়। আল্‌ মাহ্‌দি ওবেইদাল্লা কর্ত্তৃক এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। মহম্মদের কন্যা ফতেমার বংশে তাঁহার জন্ম। এদিকে তিনি আলির পৌত্র ইস্মাইলের বংশধর। এই কালিফ-বংশ ফতেমাইট বা ফতেমাইড বংশ নামে পরিচিত। ১১৭১ খৃষ্টাব্দে মিশর হইতে এই বংশের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গতিহীন গ্রহ-নক্ষত্রাদির তালিকা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। ষোল শত বৎসর পরে উলুক বেগ এক নূতন তালিকা সঙ্কলন করিয়া যশোমাল্যে বিভূষিত হন। ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে তিনি আপনার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। উলুক বেগের এই অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য-দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যারও অপমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। তখন হইতে এসিয়া-মহাদেশ গণিত-বিজ্ঞানে আর বড় মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই। তখন হইতে ইউরোপে গণিত-বিজ্ঞানের নব-সূর্য্যের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়। স্পেন-রাজ্যের করডোভা সহরে মুরগণের যে বিদ্যা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ক্রমশঃ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জার্বার্ট্ (পোপ সিল্‌ভেষ্টার ২য়) স্পেন হইতে পাটীগণিতের জ্ঞানলাভ করিয়া ইউরোপে সে জ্ঞান বিস্তার করেন। সাক্রোবোস্কো (হালিফক্সের জন) স্পেনে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। 'আল্‌মাজেষ্ট' গ্রন্থের তিনি একখানি সংক্ষিপ্ত-সার প্রকাশ করেন। গোলকের বিবরণ বিষয়ে ঐ গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে ইটালীতে, ক্যাষ্টাইলে (স্পেনের অপরাংশে), জর্ম্মণীতে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হয়। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের আশ্রয়দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। নেপল্‌স্ সহরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহারই সাহায্যে আল্‌মাজেষ্ট এবং অরিষ্টটলের গ্রন্থ-সমূহ লাটিন-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। ক্যাষ্টাইলের রাজা দশম আল্‌ফন্সো, মুরগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনায় উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাজধানী টলেডো সহরে তিনি একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টান হউন, ইহুদী হউন, অথবা মুর হউন—জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত-মাত্রেই সেই কলেজে সম্বর্দ্ধিত হইতেন; আর তাঁহারা সকলে মিলিয়া একযোগে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বিষয়ক ভ্রান্ত-মতের সংশোধন-কার্য্যে চেষ্টা পাইতেন। ইহার ফলে 'আল্‌ফন্সাইন টেবল্' নামক একটী তালিকা প্রস্তুত হয়। ঐ তালিকা পূর্ব্ববর্ত্তী তালিকা-সমূহ অপেক্ষা নির্ভুল হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রাব্বি আইজাক আবেন সিদ (ওরফে হাজান) ঐ তালিকা সংগ্রহ কার্য্যে অশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। কথিত হয়, ঐ তালিকা-সংগ্রহে ৪০ হাজার ডুকাট মুদ্রা * ব্যয় হইয়াছিল। ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দশম আল্‌ফন্সোর মৃত্যু হয়। কিন্তু বিদ্যালোচনার যে পথ তিনি প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অনেক পথিক তখন সেই পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। নিভারি সহরের ক্যাম্পেনাস কর্ত্তৃক ইউক্লিড অনুবাদিত হয়। তিনি গোলক সম্বন্ধেও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। পোলণ্ডের ভিটেলো আলোক-বিজ্ঞান ও দৃষ্টি-বিজ্ঞান বিষয়ে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ দশটী ভাগে বিভক্ত। রাটিসবনের বিশপ আলবার্ট পাটীগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা

ইউরোপের পুনরভ্যুদয়।

---

* পূর্ব্বকালে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে ডুকাট (Ducat) মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রা স্বর্ণের ও রৌপ্যের দুই প্রকার। রৌপ্য-মুদ্রার মূল্য এখনকার হিসাবে ৩ শিলিং হইতে ৪ শিলিং (অর্থাৎ ২৷০ হইতে ৩৲ টাকা) এবং স্বর্ণ-মুদ্রার মূল্য ৯ শিলিং ৪ পেন্স অর্থাৎ প্রায় সাত টাকা।

করিয়া বিশেষ যশস্বী হন। এই সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের নাম—রজার বেকন। ১২১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আলোক-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, রসায়ন এবং দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান-গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই জন্য উপদেবতার সহিত তাঁহার সংশ্রব আছে বলিয়া, পোপের আদেশে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ফলিত-জ্যোতিষের আবশ্যকতা এবং চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির অবস্থান বিষয়ে তিনি নানা গ্রন্থ রচনা করেন। পঞ্জিকা-সংশোধনের আবশ্যকতার বিষয় তিনিই সাধারণ্যে প্রচার করিয়া যান। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ কোনও উন্নতি সাধিত হয় নাই। ঐ শতাব্দীতে ইউরোপে কোনও প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদও জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার পুরবাক বা বারবাক পল্লীতে জর্জ্জ পুর্ব্বাক নামক একজন জ্যোতির্ব্বিদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে পুর্ব্বাকের মৃত্যু হয়। তাঁহার শিষ্য জন মুলার জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কুনিংসবার্গ পল্লীতে ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি রেজিয়-মন-টেনাস নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিকোণমিতির নিয়মানুসারে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের আলোচনায় তিনি যশোভাজন হইয়াছিলেন। নারেনবর্গ সহরের বার্ণার্ড ওয়ালথার নামক জনৈক ধনকুবেরের সহায়তায় মুলার একটী মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মুলারের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াল্থার জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা করিতেন। ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুলারের মৃত্যু হয়। ওয়াল্থার নিজেই তখন মানমন্দিরে জ্যোতিষালোচনায় জীবন সমর্পণ করেন। ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্লক ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়। তখন হইতে ঐ মানমন্দিরে ক্লক ঘড়ির সাহায্যে সময়-নিরূপণ পূর্ব্বক গণনা কার্য্য চলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। ওয়াল্থার ১৪৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সমসময়ে (১৪৬৮ খৃঃ) জন ওয়ার্ণার নামক আর একজন জ্যোতির্ব্বিৎ নারেনবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। এই পর্য্যন্ত সময়কে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানালোচনার একটা স্তর বলা যাইতে পারে। ইহার পর যে নূতন স্তরের সূত্রপাত হয়, পুরাতন গণনা-প্রথা তাহাতে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পাশ্চাত্য-দেশে কোপার্‌নিকাস প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন—'সূর্য্য অচল,—পৃথিব্যাদি গ্রহগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে। সূর্য্য মধ্যস্থলে বিরাজমান; শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল এবং পৃথিবী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। আর পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্র, শুক্র ও বুধ বিঘূর্ণিত হইতেছে।' প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে অনেক নূতন কথা বলিতে হইতেছে বলিয়া কোপার্‌নিকাস জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক আপনার গ্রন্থ-প্রকাশে বরাবর সঙ্কোচ বোধ করিয়া আসিতেছিলেন। পরিশেষে বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে তিনি আপন গ্রন্থ প্রকাশ করিতে দেন। কিন্তু কথিত হয়, গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা যে দিন ছাপা হইতেছিল, কোপার্‌নিকাস সেই দিনই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম—'ঘ্যাষ্ট্রনমিয়া রেষ্টুরাটা।' গ্রহ-নক্ষত্রাদি কি নিয়মে পরিচালিত হইতেছে, কোপার্‌নিকাসের গ্রন্থে তদ্বিষয় বিবৃত আছে। ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়ার থর্ণ পল্লীতে (নিকোলাস) কোপার্‌নিকাস জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়। কোপার্‌নিকাসের

পর ইউরোপে যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পোর্ত্তুগালের লোনিয়স (১৪৯৭ খ্রীঃ—১৫৭৭ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি কতকগুলি যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই যন্ত্রগুলি আজি পর্য্যন্ত তাঁহার নামে পরিচিত। জর্ম্মণীর অন্তর্গত হেসির ভূস্বামী চতুর্থ উইলিয়ম জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ক্যাসেল সহরে তাঁহার যে প্রাসাদ ছিল, সেই প্রাসাদে তিনি মানমন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি যন্ত্র-সাহায্যে চারি শত নূতন তারার অবস্থানের বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ উইলিয়মের লোকান্তর হয়। ব্যবহারিক জ্যোতিষের সম্বন্ধে এই সময়ে টাইকোব্রেহ্ বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হন। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কানিয়ার অন্তর্গত মুড্স্টরপ পল্লীতে ইঁহার জন্ম হয়। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি কতকগুলি বিষয়ে অসাধারণ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছিলেন; আবার কতকগুলি বিষয়ে অনেক ভ্রম-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। পৃথিবী স্থির আছে; সূর্য্য তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে,—এবম্বিধ মতের প্রচারে ইঁহার নিন্দা হয়; আবার কোপার্নিকাসের আবিষ্কৃত কতকগুলি তত্ত্বের ভ্রম-প্রদর্শন করিয়া ইনি যশস্বী হন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু জোয়ার-ভাটার কারণোল্লেখ ব্যপদেশে কেপ্লার যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেও সে আভাষ পাওয়া যায়। কেপ্লার বলিয়াছিলেন,—'পৃথিবীও যেরূপভাবে জলকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও সেইরূপ-ভাবে জলকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। পৃথিবীর যদি আকর্ষণী শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি চন্দ্রলোকে চলিয়া যাইত।' কেপ্লার দরিদ্র ছিলেন। বদান্য ব্যক্তিগণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পুরস্কার-স্বরূপ রাজকোষ হইতে কিছু কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সে সময়ে রাজ্য বিপ্লবময়; সুতরাং রাজকীয় সাহায্যের অর্থ তিনি প্রায়ই নিয়মিত সময়ে প্রাপ্ত হইতেন না; নানাজনের নিকট তাঁহাকে প্রার্থী হইয়া ফিরিতে হইত। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় সাহায্যের অর্থ আনিতে গিয়া রবাটস্বন সহরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সে সময়ে সেই দরিদ্র জ্যোতির্ব্বিদের কেহই তাদৃশ সমাদর করেন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে, উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইতিহাস এখন তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রদানে গৌরব অনুভব করিতেছে। কেপ্লারের সমসময়ে গ্যালিলিও জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও জন্মগ্রহণ করেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং গ্রহাদির স্বরূপ-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পেণ্ডুলাম বা দোলকের সাহায্যে ঘড়ির কাঁটা চালাইবার প্রথা—গ্যারিলিওর প্রবর্ত্তনা। তিনি নির্দ্দেশ করেন,—চন্দ্রের উপরিভাগ অসমতল এবং তাহা পৃথিবীর ন্যায়ই অস্বচ্ছ। চন্দ্রের উপরিভাগের কোনও কোনও অংশের কাঠিন্য হেতু সূর্য্য-রশ্মি সম্পূর্ণরূপ প্রতিবিম্বিত হয় না। শুক্র-গ্রহও তাঁহার মতে চন্দ্রের ন্যায় সম্পূর্ণরূপ অস্বচ্ছ। গ্যালিলিওর

মতে বৃহস্পতির চারিটী চন্দ্র আছে। বৃহস্পতির চতুঃপার্শ্বে সেই চন্দ্র-চতুষ্টয় বিঘূর্ণিত হইতেছে দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন,—'চন্দ্রের সহিত পৃথিবীও সূর্য্যের চারিদিকে বিঘূর্ণিত হইয়া বৎসরান্তে স্বস্থানে আসিতেছে।' গ্যালিলিও সূর্য্যের উপরিভাগে কতকগুলি দাগ লক্ষ্য করেন। সেই দাগগুলির গতি দেখিয়া তাঁহার ধারণা হয়, সূর্য্য সাতাইশ দিনে আপনার কক্ষপথ একবার করিয়া ঘুরিয়া আসেন; তিনি অকাট্য যুক্তি দ্বারা পৃথিবীর গতির বিষয় উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন। সে উক্তি বাইবেলের মত-বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, যাঁহারা আরিষ্টটলের মত ব্যক্ত করিতেন, গ্যালিলিওর উক্তিতে তাঁহারা বড়ই বিচলিত হন। এই সকল কারণে, গ্যালিলিও ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে সৌরজগৎ-তত্ত্ব আবিষ্কারের পর গ্যালিলিও 'ইনকুইজিশন' * বিচারালয়ে বিচারার্থ প্রেরিত হন। বিচারপতিরা জোর করিয়া গ্যালিলিওকে অঙ্গীকার-বদ্ধ করিয়া লন,—'তিনি বাক্যে, রচনায় কিংবা অন্য কোনও প্রকারে কখনও পৃথিবীর গতি-বিষয়ক মত প্রচার করিবেন না।' কিন্তু গ্যালিলিও যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহা প্রচার করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার গ্রন্থে তিনি অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা পৃথিব্যাদি গ্রহগণের গতির বিষয় বিবৃত করিলে পুনরায় 'ইনকুইজিশন' বিচারালয়ে তিনি ধর্ম্মদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গ্যালিলিওর বয়ঃক্রম তখন ৭০ বৎসর। বিচারালয় এই সময় পুনরায় গ্যালিলিওকে আপন মত প্রত্যাহার করিতে বলেন। অধিকন্তু বিচারালয়ের আদেশে অনির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য গ্যালিলিও কারারুদ্ধ হন। এই ঘটনায় সত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই অতিমাত্র ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিলেন। এক বৎসর কারাভোগের পর গ্র্যাণ্ড ডিউকের যত্নে ও চেষ্টায় গ্যালিলিও মুক্তি লাভ করেন বটে; কিন্তু ফ্লোরেন্স হইতে তাঁহাকে চিরতরে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। শেষ জীবনে টাস্কান-প্রদেশের আরসেটারি গ্রামে বৃদ্ধকে আশ্রয় লইতে হয়। সেই [illegible] পল্লীতে বসিয়াও গ্যালিলিও জ্যোতির্ব্বিদ্যা-লোচনায় বিরত হন নাই। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়।

* রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্ট-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ইনকুইজিশন বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যাঁহারা কোনও বিরুদ্ধ-মত প্রচার করিতেন, এই বিচারালয়ে তাঁহাদের অপরাধের বিচার ও দণ্ড হইত। রোম-সাম্রাজ্যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতেই প্রকারান্তরে বিরুদ্ধবাদীদিগের দণ্ড দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। থিওডোসিয়াস ও জাষ্টিনিয়ান প্রমুখ সম্রাট-গণ 'ইনকুইজিটরস্' অর্থাৎ অনুসন্ধানকারী রাজকর্ম্মচারী-দিগকে এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার ভার প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই ক্রমে ইনকুইজিশন বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে ইউরোপের নানা স্থানে 'ইনকুইজিশন' বিচারালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। শেষে এই বিচারালয়ের অত্যাচারে ইউরোপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে স্পেন-রাজ্যে টমাস-ডি-টর্কোমাডা ঐ বিচারালয়ের ভার প্রাপ্ত হইয়া যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ষোল বৎসর তাঁহার উপর বিচারালয়ের ভার ছিল। সেই সময়ের মধ্যে তিনি নয় হাজার ব্যক্তিতে প্রচলিত ধর্ম্ম-মতের বিরুদ্ধ মত প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া জ্বলন্ত অনলে জীবন্তে দগ্ধ করিয়াছিলেন। টর্কোমাডার পরে ডায়গোডেজা বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনিও আট বৎসরের মধ্যে ষোল শত লোককে পুড়াইয়া মারেন। ক্রমে ইউরোপের প্রায় সকল রাজ্যেই এইরূপ ভীষণ বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

গ্যালিলিওর গণনার উপর নির্ভর করিয়া পোতচালনা পূর্ব্বক ওলন্দাজ-গণ দিগ্‌দেশে বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হলণ্ডের রাজা তজ্জন্য গ্যালিলিওর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে গ্যালিলিও অন্ধ হইয়াছিলেন। গ্যালিলিওর দৃষ্টিশক্তি লোপের অব্যবহিত পূর্ব্বে হোর্টেন্‌সিয়াস এবং ব্লো নামক দুই জন জ্যোতির্ব্বিদ হলণ্ডরাজ-প্রদত্ত স্বর্ণহার লইয়া গ্যালিলিও সমীপে উপনীত হন এবং তাঁহার গলদেশে তাহা পরাইয়া দেন। গ্যালিলিও জীবিতাবস্থায় স্বদেশে কোনরূপ সম্মানলাভ না করিলেও—স্বদেশে নির্য্যাতনগ্রস্ত হইলেও—মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বিদেশের এবং অধুনা স্বদেশের ও বিদেশের সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করিতেছেন। কেপ্‌লার ও গ্যালিলিওর অভ্যুদয়-কালে স্কটলণ্ডের সুবিখ্যাত ভূস্বামী লর্ড নেপিয়ার 'লগারিথম্‌'-তত্ত্ব * আবিষ্কার করেন। এতদ্দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়। তাঁহারা দশ ঘণ্টায় যে গণনায় সমর্থ হইতেন, এই নিয়মে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে সে গণনায় তাঁহারা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিতেন। এই সময়ে সেনার, জন বেয়ার, ল্যান্সবার্, স্নেলিয়াস, ক্যাসাণ্ডি, ডে'কার্টে, রিক্সিওলি প্রভৃতি বহু জ্যোতির্ব্বিৎ ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে যাঁহাদের গবেষণা প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে হেভেলিয়সের নাম সুপ্রসিদ্ধ। প্রুশিয়ার অন্তর্গত ডাঞ্জিগ সহরে, ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, হেভেলিয়স জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ধনী ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনায় ইনি ধনপ্রাণ সমর্পণ করেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর হেগেন্স, ডোমিনিক কাসিনী, মারাল্ডি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হন। অতঃপর ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে নিউটনের আবির্ভাবে জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনার পথে নূতন আলোক-প্রভা বিচ্ছুরিত হয়। গ্যালিলিও যে দিন লোকান্তরে গমন করেন, (১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ২৫ এ ডিসেম্বর) সেই দিন নিউটনের জন্ম হয়। মাধ্যাকর্ষণের বিষয়, জোয়ারভাটা-তত্ত্ব, অয়ন-চলনের বিষয় প্রভৃতি প্রচারে নিউটন অশেষ গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের ২০ এ মার্চ্চ ৮৫ বৎসর বয়সে নিউটনের মৃত্যু হয়। নিউটন যে সময়ে প্রাকৃতিক জ্যোতিষের আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন- সেই সময়ে ফ্লামষ্টিড ব্যবহারিক জ্যোতিষের আলোচনায় যশস্বী হন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের ২৯ বৎসর পরে, দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব-কালে, গ্রিনউইচ সহরের বিখ্যাত মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই মানমন্দির গ্রীনউইচ অবজার্ভেটরি' নামে প্রসিদ্ধ। আজি পর্য্যন্ত ঐ মানমন্দির প্রতিষ্ঠান্বিত আছে। ফ্লামষ্টিড এই মানমন্দিরে প্রথম রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তেত্রিশ বৎসর কাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন

---

* লগারিথ্‌ম্ (Logarithm) সাহায্যে বড় বড় গুণ-ভাগ প্রভৃতির কার্য্য সহজে সম্পাদিত হইয়া থাকে। রাশির অনুপাত ধরিয়া লগারিথ্‌ম্ নির্ণীত হয়। মনে করুন, একটী মূল রাশি ১০। তাহা হইলে ১০০০ এর লগারিথ্‌ম্ হইবে ৩। অর্থাৎ ১০ এর ঘনফল যাহা, ১০০০ সেই রাশি। অঙ্কপাত দ্বারা লেখা যায় ১০৩=১০০০। অর্থাৎ,—১০ মূল রাশির সহিত ১০০০এর লগারিথ্‌ম্ ৩। কোন্ রাশির কিরূপ লগারিথ্‌ম্, পণ্ডিত-গণ তাহার তালিকা নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

করেন। তিনি সৌরজগৎ সম্বন্ধে বহু-তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ফ্লামষ্টিডের মৃত্যু হয়। তাঁহার ও নিউটনের সময় হইতেই ইংলণ্ড জ্যোতিষের আলোচনায় প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর। ফ্লামষ্টিডের পর হেলি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। গণিত ও জ্যোতিষের সাহায্যে তিনি বহু তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। একটী বিশেষ ধূমকেতুর আবির্ভাব বিষয়ে তিনি যে মত ব্যক্ত করেন, প্রায় সত্তর বৎসর পরে তাহার সাফল্য দৃষ্ট হয়। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, হেলির গণনা অনুসারে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সেই ধূমকেতু গগনমণ্ডলে প্রকাশমান হয়। বর্ত্তমান বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে) সেই ধূমকেতু পুনরায় আবির্ভূত হওয়ায় হেলির নাম গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে হেলির লোকান্তর হয়। ফ্লামষ্টিডের মৃত্যুর পর হেলি গ্রীনউইচ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হেলির পর ব্রাড্‌লে (১৬৯২ খৃঃ—১৭৬২ খৃঃ), হুক (১৬৭৪ খৃঃ) প্রভৃতি ইংলণ্ডে, ল্যাকেইল (১৭১৩ খৃঃ—১৭৬২ খৃঃ), দ্বিতীয় ক্যাসিনী (১৬৭৭ খৃঃ—১৭৫৬ খৃঃ) প্রভৃতি ফরাসী-দেশে, ডেলাইল (১৬৮৮ খৃঃ—১৭৬৮ খৃঃ), লেমনিয়ার (১৭৯৯ খৃঃ), ওয়ারজেন্টিন (১৭১৭ খৃঃ—১৭৮৩ খৃঃ) প্রভৃতি রুশিয়ায়, লালেণ্ড (১৭৩২ খৃঃ—১৮০৭ খৃঃ) প্রুশিয়ায় জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনায় যশস্বী হইয়াছিলেন। আলোক-বিজ্ঞানের পরিপুষ্টি, গণিত-বিজ্ঞানের সুক্ষ্মাদপি সুক্ষ্ম প্রক্রিয়া-সমূহের প্রবর্ত্তনা এবং যন্ত্রাদির সাহায্যে সৌর-জগতের বিবিধ তথ্য নির্ণয় প্রভৃতিতে ইউরোপ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্যর উইলিয়ম হার্সেল, (১৭৩৮ খৃঃ—১৮২২ খৃঃ) এবং ডক্টর ম্যাস্কেলিন (১৭৩২ খৃঃ—১৮১১ খৃঃ) ইংলণ্ডে জ্যোতিষ-বিদ্যার আলোচনায় যশস্বী হন। ইঁহাদের মধ্যে হার্সেল বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। পূর্ব্বে সৌর-জগতের যে সীমা-পরিমাণ কল্পনা করা হইত, হার্সেলের গণনার ফলে সে সীমা-পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ হার্সেল একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। সেই গ্রহ 'ইউরেনাস' নামে পরিচিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শনি গ্রহের কক্ষপথ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হার্সেলই প্রথম প্রতিপন্ন করেন,—'শনি গ্রহের কক্ষ-পথের বহির্ভাগে, সীমানার পরেও, নূতন গ্রহ-সকল বিদ্যমান আছে এবং তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপগ্রহ-সমূহ বিঘূর্ণিত হইতেছে।' ইউরেনাসের দুইটী চন্দ্র আছে,—এ তত্ত্বও হার্সেল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। নীহারিকা সম্বন্ধে এবং যুক্ত-তারা প্রভৃতি বিষয়ে হার্সেল যে সকল তথ্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সমলঙ্কৃত হইয়া আছে। হার্সেলের পরও অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে) 'নেপচুন' গ্রহের আবিষ্কার হওয়ায় সৌর-জগতের সীমা-পরিমাণ আরও বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পারিস নগরের প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ লাবেরিয়ার ও আডাম কর্ত্তৃক নেপ্‌চুণ গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নেপচুণ সৌর-জগতের শেষ সীমা কিনা, তাহাই বা কে বলিতে পারেন? সৌর-জগৎ-তত্ত্ব বৈচিত্র্যময়! চিরকালই এই বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান চলিয়াছে ও চলিতেছে। কিন্তু সকল তত্ত্ব আজিও সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হইয়াছে কিনা, বলিতে পারা যায় না।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্যার ক্রম-বিকাশের ইতিহাসের সহিত প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্ব্বিদ্যার ইতিহাসের তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, অন্যান্য দেশে কয়েক শত বৎসরের মধ্যে, যে সকল ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল; প্রাচীন ভারতবর্ষ বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তৎসমুদায়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। 'সিদ্ধান্ত' গ্রহ-সমূহের প্রাচীনত্বের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণই স্বীকার করেন,—কিবা কাল্‌ডিয়া, কিবা আরব, কিবা গ্রীস,—সকল দেশের জ্যোতিষ-শাস্ত্রালোচনার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্যোতির্ব্বিদ্যার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। 'এসিয়াটিক রিসার্চ্চ' পত্রে মিঃ ডেভিস দেখাইয়াছেন,—'জ্যোতির্ব্বিদ পরাশর যীশু-খৃষ্টের জন্মের ১৩৯১ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। পরাশর যে গ্রহণের গণনা করেন, সেই গণনা খৃষ্ট-জন্মের অন্ততঃ বার শত বৎসর পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছিল।' ইউরোপীয় অন্যান্য পণ্ডিতগণও তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। কাউণ্ট জোরণস্‌জারণার 'থিওগণি অব দি হিন্দুজ' গ্রন্থে এ সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গণনা অনুসারেই প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। ঋগ্বেদের নানা স্থানে এবং ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ প্রভৃতিতে প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষ-শাস্ত্রালোচনার পরিচয় আছে, পূর্ব্বেই আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। সে সকল অপেক্ষা প্রাচীনত্বের প্রমাণ অধিক কিছু হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। সৌরজগৎ-তত্ত্ব অতি জটিল বিষয়। সে তত্ত্বের আলোচনায় অনেক বড় বড় পণ্ডিতের মস্তিষ্ক অনেক সময় বিঘূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর যে কোনও দেশের জ্যোতিষের ইতিহাস আলোচনা করি না কেন, সকল দেশেই দেখিতে পাই, সৌর-জগৎ-তত্ত্বের এক-একটী বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে আজি পর্য্যন্ত অশেষ মতান্তর ও বাদানুবাদ চলিয়াছে। এই যে পরিদৃশ্যমান্ পৃথিবী,—যে পৃথিবীতে মনুষ্য পুরুষানুক্রমে বসবাস করিয়া আসিতেছে,—এই পৃথিবীর আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেই কি মতান্তরের অবধি আছে? কেহ বলিয়াছেন,—পৃথিবী ত্রিকোণ, কেহ বলিয়াছেন,—চতুষ্কোণ, কেহ বলিয়াছেন—সমতল। এইরূপ কত জনে কত কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিশেষে সিদ্ধান্ত হইয়াছে,—পৃথিবী গোলাকার। গতি-বিষয়ক কত বিচার-বিতণ্ডা চলিয়াছে! ইউরোপে জ্যোতিষের ইতিহাস আলোচনায় দেখিয়াছি, এই সে দিনও, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, পৃথিবীর গতির বিষয় বলিতে গিয়া গ্যালিলিও কি নির্য্যাতন-ভোগই না করিয়াছিলেন! সকল দেশেই এরূপ বিচার-বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে সে বিচার-বিতর্কের মীমাংসা হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে ভারত-বর্ষেও যে এরূপ বিচার-বিতর্ক উপস্থিত না হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীন ঋষিগণ সৌর-জগতের স্বরূপ-তত্ত্ব সকলই অবগত ছিলেন। পৃথিবীর গোলত্বের পরিচয়, পৃথিবীর গতির পরিচয় এবং তদ্দ্বারা মাস, বর্ষ, দিন, পক্ষ, ঋতু প্রভৃতি সংঘটনের বিষয়—বেদে আছে, ব্রাহ্মণে আছে, আরণ্যকে আছে, উপনিষদে আছে, পুরাণে আছে। সুতরাং ঐ সকল তত্ত্ব সেদিন আবিষ্কার হইয়াছে এবং সেই আবিষ্কারের অনুকরণে ভারতবর্ষ ঐ সকল তত্ত্বে অভিজ্ঞ হইতেছে,—এতাদৃশ যুক্তি প্রদর্শন করিতে যাওয়া অজ্ঞতার ও বাতুলতার

প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষালোচনা।

পরিচয় মাত্র। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্তকে সকলেই প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে সূর্য্যসিদ্ধান্তের উক্তিই প্রথমে প্রকটন করিতেছি। যথা,—

"মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি। বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণোধারণাত্মিকাম্॥
সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং। মন্যন্তে খে যতো গোলস্তস্য ক্বোর্দ্ধং ক বাপ্যধঃ॥
অল্পকায়তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্ব্বতোমুখং। পশ্যন্তি বৃত্তামপ্যেতাং চক্রাকারাং বসুন্ধরাং॥"

'পৃথিবী শূন্যে অবস্থান করিতেছে, পৃথিবী গোলাকার,—পরমা শক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিতা; পৃথিবীর ঊর্দ্ধও নাই, অধঃও নাই; অনন্ত আকাশস্থিত যে গোলক, তাহার আবার ঊর্দ্ধ-অধঃ কোথায়? পৃথিবীর বিশাল আকারের তুলনায় মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং বৃত্তাকার পৃথিবীকেই সে সমতল বলিয়া মনে করিতেছে।' এবম্বিধ উক্তিতে পৃথিবীর গোলত্ব, মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব, গতি প্রভৃতি তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইতেছে না কি? শূন্যে অবস্থিত গোলকের ঊর্দ্ধ-অধঃ নাই,—এই উক্তিতে বিঘূর্ণন বুঝায়। কত কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ এ তত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিল,—সূর্য্য-সিদ্ধান্তের এই তিনটী শ্লোকেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সূর্য্যসিদ্ধান্ত অন্যূন ২১ লক্ষ ৬৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যে দেশে যখনই এ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হউক না কেন, সূর্য্য-সিদ্ধান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অন্য কোনও দেশ কখনই এ মত প্রচার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারেন না। বেদাদির প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে উত্থাপন করিবারই বোধ হয় আবশ্যক হয় না। সূর্য্যসিদ্ধান্তের পর আর্য্যভট্টের আর্য্যভটীয় বা আর্য্য-সিদ্ধান্তের নাম উল্লেখ করিতে পারি। এতৎসম্বন্ধে আর্য্যভট্ট যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকটন করিতেছি। যথা,—

"বৃত্তভপঞ্জরমধ্যে কক্ষ্যাপরিবেষ্টিতঃ খমধ্যগতঃ মৃজ্জলশিখিবায়ুময়ো ভূগোলঃ সর্ব্বতোবৃত্তঃ॥
ভপঞ্জরঃ স্থিরোভুরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সংপাদয়তি গ্রহনক্ষত্রাণাং॥
অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ। অচলানি তানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥
উদয়াস্তমননিমিত্তং প্রবহেন বায়ুনাক্ষিপ্তঃ। লঙ্কায়াং সমপশ্চিমগো ভপঞ্জরস্থো গ্রহো ভ্রমতি॥"

'পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবী শূন্যে কক্ষপথে অবস্থিত। উহা গোলাকার। নক্ষত্রমালাপূর্ণ আকাশ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত। পৃথিবী আপন কক্ষপথে পুনঃপুনঃ বিঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়াই গ্রহ-নক্ষত্রাদি উদিত ও অস্তমিত হইতেছে। স্রোতোবেগচালিত নৌকার আরোহী তীরস্থিত তরুলতাগুল্মকে বিপরীত ভাগে চালিত দেখে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তীরস্থিত তরুলতাগুল্ম গতিবিশিষ্ট নহে, নৌকাই গতিশক্তিবিশিষ্ট। সেইরূপ পৃথিবীই বিঘূর্ণিত হইতেছে, আর পৃথিবীস্থ লোক সূর্য্য-চন্দ্রাদির উদয়াস্ত লক্ষ্য করিতেছে।' ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' গ্রন্থে, গোলাধ্যায় অংশে, এই ভাবের উক্তিই দেখিতে পাই। যথা,—

"ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞকবিরবিকুজেজ্যার্কিনক্ষত্র কক্ষা-
বৃত্তৈর্বৃত্তোবৃতঃ সন্ মৃদনিলসলিলব্যোমতেজোময়োঽয়ং।
নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ॥"

'পৃথিবী পিণ্ডাকার। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্র কক্ষাবৃত্ত দ্বারা বেষ্টিত

হইয়া অন্য আধারের অপেক্ষা না করিয়া আপন শক্তি-প্রভাবে আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছে, আর তাহার উপর বিচরণ করিতেছে।' দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভাস্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিত। কদম্বকুসুমগ্রন্থিঃ কেশরপ্রসরৈরিব॥"

'কদম্ব-পুষ্পের গ্রন্থি যেরূপ কেশর-সমূহে আবৃত থাকে; পর্ব্বত, বন, গ্রাম, চৈত্য প্রভৃতিতে পৃথিবী সেইরূপ পরিবৃত আছে।' পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্য যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। তৎসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি,—

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে॥"

পৃথিবীর শূন্যে অবস্থান এবং মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি-প্রভাবে গ্রহাদির পরস্পরের গতিবিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল। সেই সকল তর্ক-বিতর্কের ভাস্করাচার্য্য যে মীমাংসা করেন, তদ্দ্বারা পৃথিবীর গোলত্ব ও আকর্ষণী শক্তির বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়া যায়। সেই তর্ক-বিতর্ক বিষয়ক তাঁহার কয়েকটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"যদি সমা মুকুরোদরসন্নিভা ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোঽপি পরিভ্রমন্ কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥
সমতা যদি বিদ্যতে ভুবস্তরবস্তালনিভাবহূচ্ছ্রয়াঃ।
কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং নুরহো যান্তি সুদূরসংস্থিতাঃ॥"

'পৃথিবী দর্পণের ন্যায় সমতল হইলে নর ও অমর-গণ দ্বারা অত্যুচ্চ অবস্থিত সূর্য্য নিয়তই প্রত্যক্ষীভূত হইতেন। পৃথিবী যদি সমতল হইত, তাহা হইলে তালপ্রমাণ অত্যুচ্চ বৃক্ষ-সকল দূর হইতে সমভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? পৃথিবী গোল বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকে।' পুরাণে কোথাও রূপকে কোথাও স্পষ্ট করিয়া পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় লিখিত আছে। কূর্ম্মপুরাণ—চত্বারিংশ অধ্যায়ে, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির দূরত্বের এবং আকৃতির পরিচয় পরিবর্ণিত। সেখানে স্পষ্টতঃই পৃথিবী মণ্ডলাকার লিখিত আছে। মৎস্য-পুরাণে অষ্টাবিংশদধিক শততম অধ্যায়ে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিব্যাদির আকৃতির ও পরিমাণের পরিচয় দেখিতে পাই। 'উদ্ধৃত্য পৃথিবীং ছায়াং নির্ম্মিতাং মণ্ডলাকৃতিং' প্রভৃতি বাক্যে পৃথিবীর গোলত্বেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক ভৌগোলিক-গণ পৃথিবীর গোলত্বের যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহার মধ্যে একটী কারণ,—গ্রহণের সময় পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হয়, তাহা বৃত্তাংশবৎ। ভারতবর্ষের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এতদ্বিবরণ বিশদভাবেই লিখিত আছে। কোন্ সময় কোন্ গ্রহণে কিরূপ ছায়া পতিত হয়, বৃহৎ-সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে, এবং সূর্য্য-সিদ্ধান্তের বিভিন্ন অধ্যায়ে তদ্বিষয় পরিবর্ণিত রহিয়াছে। আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন,—"ভূগ্রহভানাং গোলার্দ্ধানি যথা বিবর্ণানি। অর্দ্ধানি যথা সারং সূর্য্যা-ভিমুখানি দীপ্যন্তে।" * পৃথিবীর গোলত্ব, স্ব স্ব কক্ষপথে গ্রহাদির পরিভ্রমণ এবং মাধ্যা-কর্ষণের বিষয়ে প্রাচীন-ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার এইরূপ অশেষ নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

---

* ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায়ে 'শৃঙ্গোন্নতি' বিষয়ক বর্ণনায়, লিঙ্গপুরাণ, ৬১শ অধ্যায়ে; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পঞ্চম অধ্যায়ে; এবং হরিবংশ প্রভৃতিতে চন্দ্র-গ্রহণে পৃথিবীর ছায়ার গোলত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে সকল বিষয়ের সকল পরিচয় সম্যগ্‌রূপে প্রদান করা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষের জ্যোতিষ-শাস্ত্র যাঁহারা আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই তত্তদ্বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। জ্যোতিষ-তত্ত্ব নিরূপণের জন্য ভারতবর্ষে প্রাচীন-কালে নানারূপ যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত, তাহারও অশেষ প্রমাণ আছে। সেই সকল যন্ত্রের কয়েকটীর নাম ও তাহাদের দুই একটীর লক্ষণাদির পরিচয় এইরূপ। যথা,—"গোলো নাড়ি বলয়ং যষ্টিঃ শঙ্কুর্ঘটীচক্রং। চাপং তূর্য্যং ফলকং ধীরেকং পারমার্থিকং যন্ত্রং।" ইহার মধ্যে গোলকের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে পাশ্চাত্য-দেশ-প্রচলিত 'গ্লোবের' লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান্‌। গোলক-সম্বন্ধে সূর্য্য-সিদ্ধান্তের উক্তি,—"ভূভগোলস্য রচনাং কুর্য্যাদাশ্চর্য্যকারিণীং। অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্বা তু দারবং। কাষ্ঠের দ্বারা গোলক প্রস্তুত করিয়া লইয়া পৃথিবীর অবস্থানাদি নির্ণীত হইত, এতদ্দ্বারা তাহাই উপলব্ধি হয়। শঙ্কুযন্ত্র দিঙ্‌নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হইত। সূর্য্য-সিদ্ধান্তে শঙ্কুযন্ত্র দ্বারা মৎস্যোৎপাদন-পূর্ব্বক দিঙ্‌নির্ণয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। যথা,—

যন্ত্রাদির ব্যবহার।

"শিলাতলেঽম্বু সংশুদ্ধে বজ্রলেপেঽপি বাসমে। তত্র শঙ্কঙ্গুলৈরিষ্টৈঃ সমং মণ্ডলমালিখেৎ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ শঙ্কুং কল্পনাদ্দ্বাদশাঙ্গুলং। তচ্ছায়াগ্রং স্পৃশেৎ যত্র বৃত্তে পূর্ব্বাপরার্দ্ধয়োঃ॥
তত্র বিন্দুবিধায়োভৌ বৃত্তে পূর্ব্বাপরাবিধৌ। তন্মধ্যে তিমিনা রেখা কর্ত্তব্যা দক্ষিণোত্তরা॥
যাম্যোত্তরদিশোর্ম্মধ্যে তিমিনা পূর্ব্বপশ্চিমা। দিঙ্মধ্যমৎসৈঃ সংসাধ্যা বিদিশস্তদ্বদেব হি॥"

অর্থাৎ,—"জলের ন্যায় সমান কোনও শিলাতলে অথবা কোনও সমতল ভূমিতে ইচ্ছানুরূপ ব্যাসার্দ্ধ দ্বারা একটী বৃত্ত-ক্ষেত্র অঙ্কন করিয়া ঐ ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত একটী শঙ্কু দাঁড় করাইতে হইবে। তার পর প্রথম বেলাতে উহার ছায়া পশ্চিম দিক হইতে ক্রমশঃ ছোট হইতে হইতে যখন পশ্চিম-দিকের পরিধি-রেখার ঠিক উপরে আসিবে, তখন সেই স্থানে একটী চিহ্ন করিয়া পরে অপরাহ্নে পূর্ব্বদিক্‌গামী ছায়া যখন বড় হইতে হইতে পূর্ব্ব পরিধির রেখার উপরে যাইবে, তখন সে স্থানেও চিহ্ন স্থাপন করিতে হইবে। * অতঃপর উক্ত দুই চিহ্নিত স্থানের উপর দিয়া পূর্ব্বাপর এক রেখা টানিয়া ঐ রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ এবং চিহ্ন দুইটীকে কেন্দ্র করিয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কন করিলে, উক্ত উভয় বৃত্তের পরিধি-রেখা দুই স্থানে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া মৎস্য-চিহ্নের উৎপাদন করিবে। ইহার আকার আংশিক মৎস্যের ন্যায় বলিয়া ইহা তিমি বা মৎস্য নামে অভিহিত হয়। এই চিহ্নের দুই সংযোগ-স্থানের উপর দিয়া এক সরল-রেখা টানিলেই উহা উত্তর-দক্ষিণের পরিচায়ক হইবে। অনন্তর এই উত্তর-দক্ষিণাগ্র রেখা প্রথমোক্ত বৃত্ত-পরিধির যে দুই স্থানে সংলগ্ন হয়, সেই দুই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মৎস্যোৎপাদন পূর্ব্বক তদুপরি সরল-রেখা টানিলেই পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হইবে। অতঃপর পরিধিতে উক্ত উভয়-রেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানদ্বয় মাপিয়া সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া মৎস্যোৎপাদন করিলে চারিটী বিদিক অর্থাৎ কোণও পরিজ্ঞাত হইবে।" বৃত্তাঙ্কন দ্বারা যে মৎস্য-চিহ্ন

* এইরূপ ভাবে অঙ্কিত পূর্ব্ব-বিন্দুই প্রাচী-বিন্দু। এই বিন্দুর উপর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সরল রেখার নাম—প্রাচী-রেখা।

প্রকটিত হয়, তাহাকে ধ্রুব মৎস্ত বা ধ্রুবোন্নতি বলিয়া থাকে। শঙ্কু-যন্ত্র কি প্রকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে ভাস্করাচার্য্যের 'গোলাধ্যায়' গ্রন্থে তাহা এইরূপ লিখিত আছে,—

"সমতল-মস্তক-পরিধিঃ ভ্রমসিদ্ধো দন্তি দন্তজঃ শঙ্কুঃ। তচ্ছায়াতঃ প্রোক্তং জ্ঞানং দিগ্‌দেশকালানাং।"

"হাতীর দাঁত এরূপ করিয়া কুঁদাইবে যে, তাহার আগাগোড়া সর্ব্বত্র সমান হয় এবং সমভূমিতে দাঁড় করাইয়া রাখা যাইতে পারে। ইহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নাই; ইচ্ছা-স্বরূপ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু যত বড় দীর্ঘ হউক, তাহাতে ১২ ভাগ কল্পনা করিতে হয়। আর অধিক দীর্ঘাকার হইলে মাটিতে দাঁড় করান যায় না। এ কারণ বার আঙ্গুল দীর্ঘ করিবার রীতি আছে। এই শঙ্কু-যন্ত্র দ্বারা দিগ্‌দেশ-কাল নির্ণীত হয়। হাতীর দাঁতের অভাবে ভারবৎ কাষ্ঠ-খণ্ড দ্বারাও শঙ্কু প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অন্ততঃ বার আঙ্গুল একখানি বাখারি দ্বারাও কোনরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়।" শঙ্কুপাত ভিন্ন অন্যরূপেও দিঙ্‌নির্ণয়ের প্রথা এ দেশে প্রচলিত ছিল। শঙ্কুপাতে সকল স্থানে বৃত্তের উপর ছায়াপাত হয় না,—পাশ্চাত্য-দেশে এরাটোস্থেন্স এই মত প্রথম প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এ তথ্য অবগত ছিলেন। সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থেই এতদ্বিষয়ক বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সে প্রমাণ; যথা—

"তেষামুপরিগো যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ। ন তাসু বিষুবচ্ছায়া নাক্ষস্যোন্নতিরিষ্যতে।"

দিবাকর বিষুব-রেখার উপর উপস্থিত হইলে তৎপ্রদেশে শঙ্কু দ্বারা ধ্রুবোন্নতি নির্ণয় করা যায় না। অর্থাৎ, সেই সময়ে বিষুব-ক্ষেত্রে শঙ্কুর ছায়াপাত সম্ভবপর নহে। ধ্রুবোন্নতি ও অক্ষচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায় না বলিয়াই ভূমণ্ডলের ঐ অংশ নিরক্ষবৃত্ত নামে অভিহিত। নিরক্ষবৃত্তেরই অপর নাম বিষুব-বৃত্ত। নিরক্ষ, নিরক্ষ-দেশ, নিরক্ষ-রেখা ধ্রুবরেখা ও নাড়ী-মণ্ডল প্রভৃতি নামেও উহা পরিচিত। ভূমণ্ডলকে উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ দুই খণ্ডে ভাগ করিলে যে রেখা দ্বারা সেই ভাগ সাধিত হয়, উহা সেই রেখা—নিরক্ষ-রেখা। এই রেখার উপরস্থ দেশ (উত্তর-দক্ষিণের কিয়দংশ পর্য্যন্ত) নিরক্ষ-দেশ। এখানে দিবারাত্রি সমান। নিরক্ষ-রেখার সর্ব্বোত্তরে সুমেরু এবং সর্ব্বদক্ষিণে কুমেরু অবস্থিত। নিরক্ষ-দেশ হইতে তবে কিরূপে দিক্ নির্ণয় সম্ভবপর? সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থে তদ্বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা সৌরজগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পূর্ণ-নিদর্শন। সুমেরু ও কুমেরু প্রদেশে দুইটী ধ্রুবতারা দেখা যায়। বিষুব-বৃত্ত হইতে দৃষ্টিপাত করিলে সেই দুই তারাকে 'ক্ষিতিজাশ্রয়ের' অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষ-পথের সহিত সংলগ্ন বলিয়া মনে হয়। বিষুব-বৃত্ত হইতে যতই উত্তরের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে, দক্ষিণ-মেরুর ধ্রুবতারা ততই অদৃশ্য হইবে এবং উত্তর-মেরুর ধ্রুব-তারা ততই স্পষ্টরূপে দেখা যাইবে। বিষুব-বৃত্ত হইতে আবার যতই দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হওয়া যাইবে, উত্তরস্থ ধ্রুবতারা ততই অদৃশ্য হইবে এবং দক্ষিণস্থ ধ্রুবতারা সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টির মধ্যে আসিবে। উত্তর-মেরুতে বা দক্ষিণ-মেরুতে উপনীত হইলে, ঐ ধ্রুবতারা মস্তকের উপর শোভা পাইবে।' এইরূপে ধ্রুবতারা দৃষ্টে দিক্-নির্ণয়-প্রসঙ্গে কতদূর ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়! অধিকন্তু ঐ দুই ধ্রুবতারা-দর্শন যে সহজ-দৃষ্টিতে সম্ভবপর, তাহাও

দিঙ্-নির্ণয় তত্ত্ব।

মনে করিতে পারি না। দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র-সাহায্যে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ ঐ দুই ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, প্রতীত হয়। ঐরূপ ধ্রুবতারাদ্বয় দর্শন-বিষয়ে সূর্য্য-সিদ্ধান্তের উক্তি,—

"মেরোরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে।
অতো নাক্ষোচ্ছ্রয়াস্তাসু ধ্রুবয়োঃ ক্ষিতিজাশ্রয়োঃ নবতির্লম্বকাংশাস্তু মেরাবক্ষাংশকাস্তথা॥"

এই ধ্রুব-নক্ষত্রের বিষয় কেবল যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রেই আছে, তাহা নহে; শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, কাশী-খণ্ডে ও মৎস্যপুরাণে এই ধ্রুব-নক্ষত্রের পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থের গোলাধ্যায় অংশে ধ্রুব-নক্ষত্রের এইরূপ পরিচয় দেখিতে পাই,—

"নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমণ্ডলোপগৌ ধ্রুবৌ নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ।
তদাশ্রিতং খে জলযন্ত্রবৎ তথা ভ্রমস্তচক্রং নিজমস্তকোপরি॥
উদগ্দিশং যাতি যথা যথা নরস্তথা তথা স্যান্নতমৃক্ষমণ্ডলং।
উদগ্ ধ্রুবং পশ্যতি চোন্নতং ক্ষিতেস্তদন্তরে যোজনজাঃ পলাংশকাঃ॥
সৌম্যা ধ্রুবং মেরুগতাঃ খমধ্যে যাম্যঞ্চ দৈত্যানিজমস্তকোর্দ্ধে।
সব্যাপসব্যং ভ্রমদৃক্ষচক্রং বিলোকয়ন্তি ক্ষিতিজপ্রসক্তং॥"

ধ্রুব নক্ষত্রের সংস্থান লক্ষ্য করিতে পারিলে দিক্ নির্ণয়ে আর কোনই দ্বিধা উপস্থিত হয় না। ফিনিসীয় বণিকগণ নক্ষত্র দেখিয়া, দিঙ্নির্ণয় করিয়া, অর্ণবপোত পরিচালনা করিতেন। থেলিস সেই নক্ষত্রের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। কিন্তু নক্ষত্র-দর্শনে দিঙ্নির্ণয়ের বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ কতকাল পূর্ব্বে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। কেবল নক্ষত্র-দর্শনে দিঙ্নির্ণয়ের চূড়ান্ত হয় নাই। সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্টে দিক্ নির্ণয় হইতে পারে; সেরূপ দিক্নির্ণয়ে কোনই ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায়ে তদ্বিবরণ এইরূপভাবে লিখিত আছে। যথা,—

"পশ্চাদ্ভাগাজ্জলদবদধঃসংস্থিতোঽভ্যেত্য চন্দ্রভানোর্ব্বিম্বং স্ফুরদসিতয়াচ্ছাদয়ত্যাত্মমূর্ত্ত্যা।
পশ্চাৎ স্পর্শোহরিদিশি ততো মুক্তিরস্যাতএব ক্বাপিচ্ছন্নঃ ক্বচিদপিহিতো নৈষ কক্ষান্তরত্বাৎ॥
পূর্ব্বাভিমুখো গচ্ছন্ কুচ্ছায়ান্তর্যতঃ শশী বিশতি। তেন প্রাক্ প্রগ্রহণং পশ্চান্মোক্ষোঽস্য নিঃসরত॥"

সূর্য্যগ্রহণে পশ্চিম দিক হইতে ছায়াপাত এবং চন্দ্রগ্রহণে পূর্ব্বদিক হইতে ছায়াপাত হয়। সূর্য্যগ্রহণে পূর্ব্বদিকে মোক্ষ এবং চন্দ্রগ্রহণে পশ্চিমদিকে মোক্ষ। গ্রহণ যে সকল সময় একই ভাবে হয়, তাহা নহে। গ্রহণে ছায়া কতভাবে পতিত হইয়া থাকে, বৃহৎ-সংহিতায় তাহা লিখিত আছে। সে বর্ণনা সূক্ষ্মদর্শনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। 'দিঙ্নির্ণয় যন্ত্র' নামে হয় তো যন্ত্র ছিল না; দিঙ্নির্ণয় যন্ত্র—এই নাম হয় তো কোনও যন্ত্রের ছিল না; কিন্তু দিঙ্নির্ণয় পক্ষে অনুরূপ যন্ত্রেরই যে অভাব ছিল, তাহাও মনে হয় না। জ্যোতির্ব্বিদ্গণের ব্যবহৃত যন্ত্র-সমূহের মধ্যে 'ধীরেকং' নামধেয় যন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। 'ধীরেকং'-শব্দের অর্থ—যাহা একদিকে স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। 'কম্পাস' বা দিঙ্নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটা যেমন একই দিক (উত্তরের দিক) ভিন্ন অন্য দিকে যায় না; ধীরেকং যন্ত্রও সেইরূপ কোনও যন্ত্র ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি। পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি নির্ণয়, সৌরমাস ও চান্দ্রমাসের তারতম্য নির্দ্ধারণ এবং উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, ঋতু-পরিবর্ত্তন

প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তন্নতন্নরূপে আলোচিত হইয়াছে। জ্যামিতির সাহায্যে সৌরজগতের পরস্পরের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপিত হইত, তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রথম যিনি পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি নির্ণয় করেন, তিনি ষ্টেডিয়াতে উহার পরিমাপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ, সে দেশে তখন ষ্টেডিয়ার মাপ প্রচলিত ছিল। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যোজন দ্বারা সে পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বিভিন্ন কালে ষ্টেডিয়ার বিভিন্নরূপ পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইত; যোজনেরও সেইরূপ নানা পরিমাণের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। ভাস্করাচার্য্যের গণনানুসারে পৃথিবীর পরিধি-পরিমাণ ৪,৯৬৭ যোজন, ব্যাস-পরিমাণ ১৮৫৮ যুক্ত ১০এর ২৪ যোজন এবং পরিধি পরিমাণ ৭৮,৫৩,০৩৪ বর্গ যোজন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবীর ব্যাস ৮ হাজার মাইল এবং পরিধি প্রায় ২৫ হাজার মাইল। যে সময়ে যেরূপ পরিমাণের প্রথা প্রচলিত থাকে, পরিমাণের সেইরূপ সংজ্ঞাই ব্যবহৃত হয়। নচেৎ, মূল বিষয় সর্ব্বত্রই অভিন্ন। মূল বিষয় অভিন্ন না হইলে, এক প্রকার গণনার সহিত অন্য প্রকার গণনার কখনও সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। সুতরাং এখনকার ২৫ হাজার মাইল বলিতে যাহা বুঝায়; পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ ষ্টেডিয়া বা যোজন বলিতেও তাহাই বুঝাইয়াছিল। এরাটোস্থেনস্ যেরূপ পদ্ধতির গণনায় পরিধি-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেন, পূর্ব্বেই তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছি। প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কি পদ্ধতি-ক্রমে পৃথিবীর পরিধি-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহারও আভাষ প্রদান করিতেছি। গোলাধ্যায়ে যথা,—

"পুরান্তরং চেদিদমুত্তরং স্যাৎ তদক্ষবিশ্লেষষ্টৈবগুদা কিম্।
চক্রাংশকৈরিত্যনুপাতযুক্ত্যা যুক্তং নিরুক্তং পরিধেঃ প্রমাণং॥
নিরক্ষদেশাৎ ক্ষিতিষোড়শাংশে ভবেদবন্তী গণিতেন যস্মাৎ।
তদন্তরং ষোড়শসংগুণং স্যাদ্ভূমানমস্মাদ্বহু কিং তদুক্তং॥"

"তাৎপর্য্যার্থ,—প্রথমতঃ কোনও এক স্থানের অক্ষাংশ নিশ্চয় করিবে অর্থাৎ, সেই স্থান কত অক্ষাংশের উপরে স্থিত, তাহা জানিবে। পরে সেই স্থান হইতে ঠিক উত্তরে অন্য এক স্থানেও ঐরূপ করিবে। করিয়া, উভয় স্থানের অন্তর্গত অক্ষাংশ কত হইল, তাহা জানিবে। অতঃপর সেই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান মাপিয়া যোজন বা ক্রোশ নিশ্চয় করিতে হইবে। এইরূপ নিশ্চয় করিলে এক অংশে কত ক্রোশ বা কত যোজন হইল, তাহা সহজেই জানা যাইতে পারিবে। অনন্তর সেই এক অংশের যোজন বা ক্রোশ ৩৬০ দ্বারা গুণ করিলেই পরিধির পরিমাণ-ফল নির্ণীত হইবে। যেহেতু, পরিমাণ নির্ণয়ের সুবিধার নিমিত্ত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্তৃক সমগ্র ভূমণ্ডল ৩৬০ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। নিরক্ষ-দেশ হইতে অবন্তী-নগরী পৃথিবীর ষোল অংশের উপরিস্থিত,—গণিত দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। নিরক্ষ-দেশ আর অবন্তীর অন্তর্ব্বর্ত্তী যোজন বা ক্রোশ ষোল গুণ করিলেই ভূ-পরিধিমানের নিশ্চয় হইতে পারে।" অক্ষাংশ নির্ণয়ের নানা প্রকার পদ্ধতি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। "যে দিন দিবারাত্রি ঠিক সমান হয়, সেই দিনে

(বিষুবদ্দিনে) মধ্যাহ্নকালে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত একটী শঙ্কু অভীষ্ট স্থানে সমভূমির উপরিভাগে সরলভাবে ধারণ করিলে, উহার যে ছায়াপাত হইবে, তাহাই মাপিয়া আদৌ উক্ত স্থানের পলভা (অক্ষছায়া) নির্ণয় করিবে; অর্থাৎ, যত আঙ্গুল ছায়া, তত আঙ্গুল পলভা হইবে। উক্ত পলভা-সংখ্যা দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানে ৫ দিয়া গুণ করিবে। অন্য স্থানে বর্গ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিবে। এইরূপে যে গণিত-ফল পাওয়া যায়, তাহা প্রথমোক্ত ৫ গুণ করা সংখ্যা হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই অভীষ্ট স্থানের অক্ষাংশ হইবে।" * বলা বাহুল্য, সকল স্থানে এ নিয়ম প্রযুক্ত হয় না। সেই জন্য যন্ত্র দ্বারা অক্ষাংশনির্ণয়ের ব্যবস্থা ছিল। গোলাধ্যায়ে 'যষ্টি-যন্ত্র' এবং 'চক্রযন্ত্র' নামক দুই প্রকার যন্ত্রের উল্লেখ আছে। এখন এ দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনা লোপ পাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রাদিও লোপ পাইয়াছে। সুতরাং সে দুই যন্ত্রের এখন আর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। জ্যামিতির সাহায্যে জ্যোতিষ-তত্ত্ব নির্ণয়ের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বৃহৎ-সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে এতদ্বিষয়ক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। যন্ত্রের ব্যবহারের বিষয়ও ঐ অধ্যায়ে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহৎ-সংহিতার মতে জ্যোতিষ-শাস্ত্র তিন স্কন্ধে বিভক্ত। সেই তিন স্কন্ধের নাম—সংহিতা-স্কন্ধ, তন্ত্র স্কন্ধ ও হোরা-স্কন্ধ। সংহিতা-স্কন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত থাকে; তন্ত্র-স্কন্ধে গণিতের সাহায্যে গ্রহগতি প্রভৃতি নির্ণীত হয়; আর হোরা-স্কন্ধে যাত্রা-বিবাহাদির কালাকাল নির্ণীত হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, কত বিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, দৈবজ্ঞলক্ষণপ্রক্রমণে 'বৃহৎ-সংহিতা' তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদ্গণকে পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ,—এই পঞ্চ সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। এই পঞ্চসিদ্ধান্ত-শাস্ত্রোক্ত যুগ, বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র, যাম, মুহূর্ত্ত, নাড়ী, বিনাড়ী প্রাণ, ত্রুটি, ত্রুট্যবয়বাদি কাল ও ক্ষেত্র প্রভৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান জ্যোতির্ব্বিদ্গণের প্রয়োজন। সৌর, সাবন, নাক্ষত্র, চান্দ্র,—এই চতুর্ম্মাস, অধিমাস, অবম প্রভৃতির কারণ জ্যোতির্ব্বিদগণের জানা আবশ্যক। যষ্টি-সংবৎসর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিন ও হোরা প্রভৃতির অধিপতি সকলের প্রতিপত্তি বিষয়ক জ্ঞান, তাঁহাদের অধিগত হওয়া আবশ্যক। সৌরাদি পরিমাণ-সকলের সদৃশাসদৃশত্ব ও যোগ্যাযোগ্যত্বের প্রতিপাদন বিষয়ে তাঁহাদের পটুতা প্রয়োজনীয়। অয়ন-নিবৃত্তিতে সিদ্ধান্ত-বেধ হইলেও সমমণ্ডল, রেখা-সম্প্রয়োগ, অভ্যুদিত অংশ-সমূহের প্রত্যক্ষীকরণ এবং ছায়া, জলযন্ত্র ও দিগ্‌গণিতের সমতা প্রতিপাদন প্রভৃতি বিষয়ে জ্যোতির্ব্বিদগণ নিপুণ হইবেন। সূর্য্যাদি গ্রহ-সকলের শীঘ্র, মন্দ, যাম্যোত্তর, নীচোচ্চ প্রভৃতি গতির কারণ, সূর্য্য-গ্রহণের বা চন্দ্র-গ্রহণের আদি ও মোক্ষফল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা জ্ঞানবান হইবেন। প্রত্যেক গ্রহের ভ্রমণ-যোজন, ভ্রমণ-কক্ষা, ভ্রমণ-প্রমাণ, পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির সংস্থান, অক্ষাংশ, অবলম্বন প্রভৃতিতেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। 'বৃহৎ-সংহিতায়' এইরূপ আরও বহু বিষয়ের উল্লেখ আছে।

* "মৃন্ময়ী" গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা-সংক্রান্ত যে কোনও তত্ত্ব আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতার পরিচয় বৃহৎ-সংহিতার কয়েকটী অধ্যায়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাহারই কয়েকটীর নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, দিনরাত্রির ক্ষয়বৃদ্ধি, ছয় মাস রাত্রি, ছয় মাস দিন প্রভৃতির কারণ-পরম্পরা প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রে কিরূপভাবে বর্ণিত আছে, 'মৃণ্ময়ী' গ্রন্থে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সে পরিচয় এই,—"সূর্য্যের ভ্রমণ-পথের নাম ক্রান্তিবৃত্ত। এই বৃত্ত বিষুব বৃত্তের ঠিক সমসূত্রে স্থিত নহে। বিষুব-বৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে ২৪ যুক্ত ১এর ২৪ অংশ দূর পর্য্যন্ত ইহা তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কেবল মেষ ও তুলা দুই স্থানে উভয় বৃত্ত সম্মিলিত হইয়াছে। উক্ত মেষ ও তুলা স্থান রাশি-চক্রের প্রবহবায়ুবশে নিয়তই পশ্চিমাভিমুখে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। মেষ-রাশি হইতে মিথুনান্ত প্রদেশ বিষুব-বৃত্তের চতুর্ব্বিংশতি অংশ উত্তরে আর ধনুর অন্তস্থান উহার চতুর্ব্বিংশতি অংশ দক্ষিণ দিকে স্থিত আছে। এই দুই স্থান অয়ন নামে অভিহিত হয়। রাশিচক্র বাস্তবিক অচল হইলেও প্রবহবায়ু দ্বারা উহার সকল প্রদেশই স্ব স্ব স্থানে নিয়ত ভ্রাম্যমাণ অবস্থাতেই আছে। মেষাদি কন্যান্ত রাশি-সকল অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা,—এই ছয় রাশি উত্তর। আর তুলাদি মীনান্ত রাশিগণ অর্থাৎ তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন,—এই ছয়টী রাশি দক্ষিণ-গোলোপরি সততই ভ্রমণশীল রহিয়াছে। সূর্য্য যাবৎকাল রাশিচক্রাশ্রিত ক্রান্তিবৃত্ত-পথে মকর হইতে মিথুন রাশি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, তাবৎকাল উত্তরায়ণ এবং যাবৎ কর্কট হইতে ধনু পর্য্যন্ত গমন করে, তাবৎ দক্ষিণায়ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। মকর হইতে মিথুন পর্য্যন্ত সূর্য্য ক্রমশঃই উত্তর দিকে এবং কর্কট হইতে ধনু পর্য্যন্ত ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে গমন করিতে থাকে বলিয়াই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন নাম অন্বর্থ হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে সূর্য্য-সিদ্ধান্তের উক্তি,—

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন প্রভৃতি।

"ভানোর্মকর-সংক্রান্তেঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণং। কর্কাদেস্তু তথৈবস্যাৎ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নং ॥"

সূর্য্যের মকর-সংক্রান্তিকাল হইতে ছয় মাস উত্তরায়ণ এবং কর্কট-সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস দক্ষিণায়ন নামে প্রসিদ্ধ। ঋতু-সকলও এক প্রকার কাল-বিভাগ। সূর্য্য-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে শিশির ঋতু হইতে ঋতু-বিভাগ এবং দুই দুই রাশি এক এক ঋতুর অধিপতিরূপে নির্ণীত।

'দ্বিরাশিনাথা ঋতবস্ততোঽপি শিশিরাদয়ঃ। মেষাদয়ো দ্বাদশৈতে মাসাস্তৈরেব বৎসরাঃ ॥'

দুই দুই রাশিতে অর্থাৎ দুই দুই সৌরমাসে এক এক ঋতু হয়। শিশির ঋতুই আদি; অতএব মাঘ-ফাল্গুনাদি দুই মাস শিশির, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।* এইরূপ ছয় ঋতুতে দ্বাদশ মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হয়। নিরক্ষ-বৃত্তের উপরিভাগে রাশি-চক্রের অবস্থান-নিমিত্ত তৎপ্রদেশে দিন-রাত্রির পরিমাণ ঠিক তুল্যভাবেই থাকিয়া যায়। উক্ত প্রদেশের উত্তরে ও দক্ষিণে দিন-রাত্রির ক্ষয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

* সৌরমণ্ডলের গতিবিধির পরিবর্ত্তন হেতু এই ঋতু-বিভাগ প্রাচীনকালে অন্যরূপ ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। দূর অতীতেও পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে।

'সব্যং ভ্রমতি দেবানামপসেব্যং সুরবিদ্বিষাং। উপরিষ্টাৎ ভগোলোহয়ং ক্ষেব্য পশ্চান্মুখঃ সদা॥
অতস্তত্র দিনং ত্রিংশন্নাড়িকং শর্ব্বরী তথা। হানিবৃদ্ধি সদা বামং সুরাসুর বিভাগয়োঃ॥'
এই প্রত্যক্ষ রাশি-চক্র নিরক্ষদেশের উপরিভাগে সুমেরুবাসী দেবতাদিগের দক্ষিণে আর কুমেরুবাসী অসুরদিগের বামে নিরন্তর পশ্চিমাভিমুখে ভ্রমণ করে। এই কারণ বশতঃ অর্থাৎ উপরিভাগে রাশিচক্রের অবস্থান নিমিত্ত নিরক্ষবৃত্ত প্রদেশে দিবারাত্রিমান সমান অর্থাৎ ত্রিশ ত্রিশ দণ্ড করিয়া হয়। এতদতিরিক্ত উত্তর-দক্ষিণ প্রদেশে সূর্য্যের বিষুবৎ-ক্রমণাতিরিক্ত কালে সততই বিপরীতক্রমে দিবারাত্রির ক্ষয়-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যৎকালে বিষুববৃত্তের উত্তর-প্রদেশে দিবামানের হ্রাস ও রাত্রিমানের বৃদ্ধি, তৎকালে দক্ষিণ-প্রদেশে দিবামানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হইয়া থাকে। পরন্তু যে সময় উত্তর-প্রদেশে দিনমানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হইয়া থাকে, সে সময়ে দক্ষিণ-প্রদেশে দিনের হ্রাস ও রাত্রির বৃদ্ধি হয়। এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় ভাস্করাচার্য্য বলেন,—

'অতশ্চ সৌম্যে দিবসো মহান্ স্যাৎ রাত্রির্লঘুর্ব্যস্ত মতশ্চ যাম্যে।
দ্যুরাত্রবৃত্তে ক্ষিতিজাদধঃস্থে রাত্রির্যতঃ স্যাৎ দিনমানমূৰ্দ্ধং॥
সদা সমত্বং দ্যুনিশো নিরক্ষে নোন্মণ্ডলং তত্র কুজাস্যতোহন্যৎ॥'

যেহেতু ক্ষিতিজ বৃত্তের অধস্থ অহোরাত্র বৃত্তে রাত্রি এবং উপরিস্থ অহোরাত্র বৃত্তে দিবস হয়; অতএব উত্তর গোলে যৎকালে দিনমানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হয়, দক্ষিণ গোলে তৎকালে রাত্রিমানের বৃদ্ধি ও দিবামানের হ্রাস হইয়া থাকে। নিরক্ষ-দেশে ক্ষিতিজ-বৃত্তের সহিত উন্মণ্ডল অভিন্ন বলিয়া সেখানে দিবারাত্রি-মানের গ্রাসবৃদ্ধি হয় না। অর্থাৎ ত্রিশ ত্রিশ দণ্ড করিয়া তুল্যভাবেই থাকে। তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে সময়ে সূর্য্য মেষ ও তুলা রাশিতে গমন করে, সেই সময়ে বিষুবদ্বৃত্ত আর ক্রান্তিবৃত্ত একত্র মিলিত হয়। সূর্য্য প্রথমতঃ মেষরাশি হইতে ক্রমে ১২ অংশ উত্তরে অগ্রসর হইয়া বৃষ রাশিতে উপনীত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ ২০ অংশে মিথুন এবং ২৪ অংশে কর্কটের আদি পর্য্যন্ত গমন করে। এই ২৪ অংশকেই পরমক্রান্তি বলা যায়। সূর্য্য বিষুবদ্বৃত্তের উত্তর দক্ষিণে ২৪ অংশের অধিক আর অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্থান অর্থাৎ উত্তর পরমক্রান্তি হইতে ৪ অংশ দক্ষিণে পিছাইয়া সিংহ-রাশিতে উপস্থিত হয়। তৎপশ্চাৎ বার অংশ দক্ষিণে কন্যা এবং চব্বিশ অংশে তুলা রাশিতে গমন করে। এ স্থলেও বিষুব-বৃত্তের সহিত ক্রান্তিবৃত্ত সম্মিলিত হয়। গতিক্রমানুসারে সূর্য্য এস্থান হইতে ১২ অংশ দক্ষিণে বৃশ্চিক রাশিতে উপস্থিত হয়। এইরূপে ২০ অংশে ধনু এবং ২৪ অংশ দক্ষিণে মকর পর্য্যন্ত গমন করে। এ স্থানকে দক্ষিণ পরমক্রান্তি বলা যায়। অতঃপর এই দক্ষিণ পরমক্রান্তি হইতে ফিরিয়া ৪ অংশ উত্তরে কুম্ভ-রাশি প্রাপ্ত হয়। তৎপশ্চাৎ ১২ অংশ উত্তরে মীন এবং ২৪ অংশে পুনরায় মেষ-রাশিতে উপনীত হয়। ইহা বিষুব-বৃত্ত এবং ক্রান্তি-বৃত্তের সম্মিলন-স্থান। যৎকালে সূর্য্য উত্তর ক্রান্তি-পথে এক হইতে ক্রমে চব্বিশ অংশ পর্য্যন্ত গমন করিতে থাকে, তৎকালে নিরক্ষ-বৃত্তের উত্তর-প্রদেশবাসিগণের ক্রমেই দিনমানের এবং দক্ষিণ-প্রদেশবাসিগণের রাত্রিমাণের ক্ষয় হইতে থাকে।

এইরূপে যখন দক্ষিণ-ক্রান্ত্যংশের বৃদ্ধি, তখন দক্ষিণ-গোলের দিন ও উত্তর-গোলের রাত্রি বৃদ্ধি হয়। যৎকালে দক্ষিণ-ক্রান্ত্যংশের ন্যূনত্ব হয়, তৎকালে দক্ষিণ-গোলের দিন এবং উত্তর-গোলের ক্রমশঃ রাত্রিমানের হ্রাস হইতে থাকে। এই প্রকারে প্রত্যেক দিবারাত্রি-মানের ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। উপরে দিনরাত্রির ক্ষয়বৃদ্ধি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা উত্তর-দক্ষিণ গোলের ৬৬ অক্ষাংশের অন্তর্গত দেশের পক্ষে জানিতে হইবে। ৬৬ অংশ হইতে ৯০ অংশ পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণ সুমেরু কুমেরু প্রদেশের প্রাকৃতিক নিয়ম অন্য প্রকার। যথা, গোলাধ্যায়ে,—

ছয়মাস রাত্রি ও ছয়মাস দিন।

'ষট্‌ষষ্টিভাগাভ্যধিকাঃ পলাংশা যত্রাথ তত্রাস্ত্যপরো বিশেষঃ।
লম্বাধিকা ক্রান্তি রুদক্ চ যাবৎ তাবদ্দিনং সন্ততমেব তত্র।
যাবচ্চ যাম্যা সততং তমিস্রা ততশ্চ মেরৌ সততং সমার্দ্ধং॥'

যে স্থানে অক্ষাংশের পরিমাণ ৬৬র অধিক, সে স্থানের বিশেষ এই যে, যাবৎকাল ক্রান্তির বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রথম হইতে চব্বিশ অংশ পর্য্যন্ত সূর্য্যের গতি হয়; তাবৎকাল উক্ত দেশে নিয়ত কাল দিবাভাগই থাকিয়া যায়। যাবৎকাল দক্ষিণ সুমেরু প্রদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। তাবৎকাল উত্তরমেরু প্রদেশে ছয়মাসব্যাপী দিন হয়। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, জ্যোতির্ব্বিদ্-গণ গণিত-ক্রিয়ার প্রয়োজন বশতঃ গ্রহাদি গোল পদার্থে ৩৬০ অংশের কল্পনা করিয়া থাকেন। এতদনুসারে পৃথিবীও ৩৬০ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। সমগ্র ভূগোল ৩৬০ অংশে বিভক্ত হইলে, তাহার অর্দ্ধাংশ ১৮০ এবং চতুর্থাংশের পরিমাণ ৯০ হয়। সূর্য্য এই ৯০ অংশের অধিক দূরে আর দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় না। এ কারণ উত্তর-দক্ষিণ দুই ধ্রুবতারার নিম্নস্থ সুমেরু ও কুমেরু প্রদেশ হইতে বিষুব বৃত্তস্থ সূর্য্যকে যুগপৎ ক্ষিতিজ বৃত্তের (৯০ অংশস্থ বৃত্তের) সহিত সংলগ্ন দেখা যায়। যেহেতু, বিষুব-বৃত্তই উক্ত উভয় প্রদেশের ৯০ অংশে স্থিত এবং ক্ষিতিজ-বৃত্ত। সূর্য্য এই বিষুব-বৃত্তের উত্তর ক্রান্তি পথে যত অংশ অগ্রসর হয়, দক্ষিণ কুমেরু অংশের তত অংশ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আবার দক্ষিণ ক্রান্তিপথে যত অংশ গমন করে, উত্তর মেরু দেশের তত অংশে অন্ধকার প্রবেশ করে অর্থাৎ রাত্রি হয়। এ প্রকারে ক্রান্ত্যংশের শেষ সীমা ২৪ অংশ পর্য্যন্ত উত্তর বা দক্ষিণে গমন করিলে, উক্ত উভয় দেশের ৬৬ অংশ পর্য্যন্ত সূর্য্যালোক বিকীর্ণ হয়। অবশিষ্ট ২৪ অংশ ব্যাপিয়া রাত্রি হইয়া থাকে। দক্ষিণ ও উত্তর মেরু দেশে পর্য্যায়ক্রমে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হইবার ইহাই একমাত্র কারণ॥"

প্রাচীন-ভারতের জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিষয়ে সকল কথা কহিতে গেলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ-প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এখানে আর একটী মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা এতৎপ্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। সে বিষয়টী রাশিচক্র সংক্রান্ত। রাশিচক্রের প্রবর্ত্তনা বিষয়ে পাশ্চাত্য-দেশে নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ কাল্‌ডিয়াকে, কেহ বাবিলনকে রাশিচক্র-প্রবর্ত্তনার আদিভূত বলিয়া মনে করেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১৬৪ম সূক্তের ১২শ ঋক আলোচনা করিলে রাশিচক্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়। উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নের বিষয়ও

রাশিচক্র।

ঐ সূক্তে উক্ত হইয়াছে। চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের পার্থক্যের বিষয় ঋগ্বেদে যাহা লিখিত আছে, পূর্ব্বেই আমরা তদ্বিষয় আলোচনা করিয়াছি। ১ম মণ্ডল, ২৫শ সূক্তের এবং ১৬৪ম সূক্তের টীকা প্রভৃতি আলোচনা করিলে এ সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনায়ও এতদ্বিষয় উপলব্ধি হইতে পারে। ফলতঃ, রাশিচক্রের ব্যবহার যে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রভৃতির জন্ম-কাল রাশিচক্র অনুসারে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, রামায়ণে লিখিত আছে। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকালে 'রবি মেষ রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শনি তুলা রাশিতে, বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট-রাশিতে এবং শুক্র মীন রাশিতে ছিলেন। ভরত মীন লগ্নে পুষ্যা নক্ষত্রে এবং সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কট লগ্নে অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মপরিগ্রহ করেন। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্মকালেও রবি মেষ রাশিতে ছিলেন।' বাল্মীকির রামায়ণে, আদিকাণ্ড, অষ্টাদশ সর্গে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মরাশিরও উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়, রাশিচক্র-বিষয়ক অভিজ্ঞতায় প্রাচীন-ভারতকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। রাশিচক্র কি এবং সৌর-জগতের সহিত রাশিচক্র কিরূপ-ভাবে সম্বন্ধ-যুক্ত, জ্যোতিষ-শাস্ত্রালোচনা প্রসঙ্গে তাহার আভাস প্রদান করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, ভারতবর্ষে আজি পর্য্যন্ত জ্যোতিষের যে শেষ স্মৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে, রাশিচক্র সংক্রান্ত গবেষণাই তাহার ভিত্তিস্তম্ভ। সৌর-জগতোৎপত্তি-তত্ত্ব আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, সূর্য্য এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিঘূর্ণিত হইতেছে; আর তাহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এক একটী কক্ষপথ আছে। ঐ প্রসঙ্গে আরও দেখিয়াছি, সূর্য্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপ্‌চুন প্রভৃতি গ্রহগণ আপন আপন কক্ষপথে বিঘূর্ণিত হইতেছে। ঐ প্রসঙ্গে আরও দেখিয়াছি, ঐ সকল গ্রহের প্রত্যেকটীর আবার একাধিক উপগ্রহ আছে। কোনও কোনও গ্রহের আবার একাধিক চন্দ্র আছে বলিয়াও প্রতিপন্ন হইতেছে। যেমন, পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে, কেন্দ্রস্থানীয় সূর্য্য যেমন আপন কক্ষপথে বিঘূর্ণিত হইতেছেন, তেমনি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বুধ-শুক্র-পৃথিব্যাদি গ্রহ-গণ, আবার সেই গ্রহ-সকলকে বেষ্টন করিয়া উপগ্রহ-গণ আপন আপন কক্ষ-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রহ-উপগ্রহ সকলই গোলকসদৃশ পিণ্ডাকার; সুতরাং সকলের কক্ষ-পথ একই দিকে একই ভাবে অবস্থিত না হইলেও, অঙ্গুরীয়কের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া আছে, বুঝা যাইতে পারে। সূর্য্য হইতে কোন্ গ্রহ কত দূরে অবস্থিত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি (৯০ পৃষ্ঠা)। গোলাকার বস্তু আঁকিয়া দেখাইতে গেলে, সমতল বৃত্ত-ক্ষেত্রের ন্যায় প্রতীত হয়। সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া গ্রহগণ যেরূপভাবে অবস্থিতি করিতেছে, সাধারণতঃ তাহা বৃত্তের দ্বারা বৃত্তের পরিবেষ্টনের ন্যায়ই প্রদর্শিত হয়। (পরপৃষ্ঠায় চিত্র দেখুন) সেখানে অনুমানে ধরিতে হইবে—সূর্য্য হইতে বুধ ৩ কোটী ৭০ লক্ষ মাইল দূরে, পৃথিবী

নয় কোটী ৫৯ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত, ইত্যাদি। আর পৃথিবীর কক্ষ-পথ লক্ষ্য করিলে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া যে ক্ষুদ্র বৃত্ত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই চন্দ্রের কক্ষ। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব—২,৩৭,৮৪০ মাইল। সুতরাং চন্দ্র কখনও সূর্য্য হইতে দূরে এবং কখনও (পৃথিবী অপেক্ষা) সূর্য্যের নিকটে অবস্থিতি করেন। তার পর, সকল গ্রহই যে একই ভাবে একই রেখার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহা নহে। সকল গ্রহেরই গতির বক্রতা উপলব্ধি হয়। সুতরাং কক্ষ-পথ সকল সময় ঠিক একই স্থানে অবস্থিত নহে। চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আপন কক্ষ-পথে বিঘূর্ণিত হইতেছে। পৃথিবী আবার সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে। সুতরাং চন্দ্রকেও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইতেছে। কাজেই চন্দ্রের কক্ষ-পথ আজ যেখানে আছে, পরদিন সেখানে নাই। চন্দ্র যেন পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলী-আকারে ঘুরিয়া যাইতেছে। আর এক কথা,—গ্রহ-উপগ্রহ সকল কেবল যে সূর্য্যকে বা কোনও বিশেষ গ্রহ-উপগ্রহকে বেষ্টন করিয়াই ঘূরিতেছে, তাহা নহে; ঐ সকল গ্রহ-উপগ্রহ আপনা-আপনি আপন কক্ষ-পথে বিঘূর্ণিত হইতে হইতে চলিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেকের অবস্থা প্রতি-নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজি যে ভাবে যে অবস্থায় এক একটী গ্রহ বা উপগ্রহ অবস্থিত, কত কাল পরে পুনরায় তাহারা সেই অবস্থায় উপনীত হইবে, এই তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য বহুকাল হইতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় গণনাঙ্কের সাহায্য-গ্রহণ প্রথমে এই তত্ত্ব-নির্দ্ধারণেই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্বিষয়ে যে দেশে যে প্রকার গবেষণা হইয়াছিল, পূর্ব্বেই আমরা তাহার আভাস প্রদান করিয়াছি। সূর্য্য এক বৎসরে (৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল) আপন কক্ষ-পথ পরিভ্রমণ করেন। এ হিসাবে সূর্য্যের দৈনিক গতি ৫৯ কলা ৮ বিকলা ১০ অনুকলা। বুধ ৮৮ দিনে (সূক্ষ্ম-গণনায় ৮৭ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল ১৭ বিপল) কক্ষপথ পরিভ্রমণ করে। উহার আহ্নিক-গতি ৪ অংশ ৫ কলা ৩২ বিকলা ২২ অনুকলা।* চন্দ্র এক মাসে (সূক্ষ্ম-গণনায় ২৭ দিন ১৯ দণ্ড ১৭ পল ৪২ বিপল) আপন কক্ষপথ অতিক্রম করে। চন্দ্রের দৈনিক-গতি ১৩ অংশ ১০ কলা ১৪ বিকলা। এইরূপ প্রত্যেক গ্রহের গতি আছে। সময় সময় গতির ন্যূনাতিরেক হয়। সেইজন্য শীঘ্রগতি ও মন্দগতি প্রভৃতি নানা প্রকার গতির গণনা হইয়া থাকে। কখনও শীঘ্রগতি, কখনও মন্দগতি প্রভৃতি হিসাবে গণনা নির্দ্দিষ্ট হয়। গ্রহাদির এবম্বিধ গতিবিধির বিষয় বুঝিবার জন্যই রাশি-চক্রের প্রবর্ত্তনা। যে সৌর-মণ্ডলে গ্রহাদির পরিভ্রমণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, সেই সৌর-মণ্ডল ৩৬০ অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রতি ৩০ ভাগকে এক এক রাশির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ, বারটী রাশিতে সমগ্র সৌর-মণ্ডল বা কল্পিত রাশি-চক্র বিভক্ত হইয়া থাকে। তবেই বুঝা যায়, সূর্য্যকে আপন কক্ষপথ পরিভ্রমণ করিতে যত সময় লাগে, তাহাই তাঁহার রাশি-চক্রে ঘূর্ণনের কাল। এ হিসাবে, চন্দ্র ২৭ দিন ২৯ দণ্ড ১৭ পল ৪০ বিপলে, বুধ ৮৭ দিন

* পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে বুধের আহ্নিক গতি ২৪ ঘণ্টা ৫ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড, শুক্রের ঘ ২৩।২১.৭ সে, পৃথিবীর ঘ ২৩:৫৬ মি, মঙ্গলের ঘ ২৪ ২৯:২১ সে, বৃহস্পতির ঘ ৯।৫৫ মি, শনির ঘ ১০:১৬ মি এবং চন্দ্রের বার্ষিক গতি ৮৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

৬৮ দণ্ড ৯ পল ১৭ বিপলে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন, ধরা হইয়া থাকে। এইরূপ অপরাপর গ্রহেরও সৌরজগৎ বিবর্ত্তনের কালই তাঁহাদের রাশি-চক্র বিবর্ত্তনের কাল বলিয়া গণ্য হয়। রাশিচক্র যেমন দ্বাদশ-রাশিতে বিভক্ত, তেমনি রাশিচক্র আবার সাতাইশ ভাগে বিভক্ত।

রাশিচক্রে নক্ষত্র-সংস্থান।

সেই সাতাইশ ভাগ সাতাইশটী নক্ষত্রের স্থান বলিয়া পরিচিত। সেই সাতাইশ নক্ষত্র রাশিচক্রের বার ভাগের বারটী রাশির মধ্যে পর্য্যায়-ক্রমে অবস্থিত আছে। বারটী রাশির নাম,—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। * সাতাইশটী নক্ষত্র,—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া,

* রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির মেষাদি নামকরণ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। এক মতে প্রকাশ,—'সূর্য্যের গতির পরিবর্ত্তন অনুসারে দ্বাদশ রাশির নামকরণ হইয়াছে। সূর্য্য উত্তরায়ণে আসিবার সময় তাঁহার ঊর্দ্ধগতি কল্পনা করা হয়। মেষগণ অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গেও অনায়াসে উঠিয়া থাকে। এই জন্য সূর্য্যের প্রথম ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার কালকে মেষরাশি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। বৃষ কষ্টসহিষ্ণু; বৃষের তেজ আছে;—এই জন্য সূর্য্য যে সময় তেজঃপুঞ্জ কলেবর অর্থাৎ অধিকতর জ্যোতিষ্মান হন, সেই সময়কে বৃষরাশি বলা হয়। যে সময় সূর্য্যের গতিবশে বর্ষার বারিধারায় ধরণী স্নিগ্ধ হয়, সেই কালটি মিথুন-রাশি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়,—এই তিন মাস, এই হিসাবে যথাক্রমে মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশির অন্তর্ভুক্ত হয়। আষাঢ়ের পর সূর্য্য যখন উত্তর হইতে দক্ষিণে অবতরণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করিয়া কর্কট-গতির সহিত তুলনা করা হয়; এবং সেই কালটি কর্কট-রাশি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভাদ্রের গ্রীষ্ম—সিংহ-প্রভাববিশিষ্ট। সেইজন্য সেই সময়কে সিংহ-রাশি বলা হয়। আশ্বিনে বসুন্ধরা শস্যশ্যামলা; তাই সেই সময়ের নাম কন্যা রাশি; অর্থাৎ, সেই সময়কে নবযৌবন সম্পন্না কন্যার সহিত তুলনা করা হয়। কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রের শস্য কর্ত্তিত হইলে, তুলাদণ্ডে তাহার পরিমাণ করা হইয়া থাকে। সেইজন্যই সেই সময়টি তুলারাশি। অগ্রহায়ণের শীত বৃশ্চিকদংশনবৎ অনুভূতি হয় বলিয়া ঐ সময়টি বৃশ্চিক-রাশির অন্তর্ভুক্ত এবং পৌষের শীত তীক্ষ্ণতীরবৎ যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া ঐ সময়ের নাম ধনু-রাশি। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই তিন মাসের মকর, কুম্ভ, মীন প্রভৃতি নামকরণ সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। মাঘ মাসে প্রবাহের ন্যায় শীত চলিয়া যায় বলিয়া ঐ মাসকে স্রোতোগামী মকরের সহিত তুলনা করা হয়। ফাল্গুনে বসন্ত-সমাগমে স্নিগ্ধতার পরিচয়-স্বরূপ কুম্ভরাশির কল্পনা। চৈত্রে বসন্তানিল সেবনে প্রণয়িপ্রণয়িনীর সম্মিলনরূপ মীনযুগলের সম্মিলনে মীনরাশির পরিকল্পনা। সূর্য্যের অয়নচলন অনুসারে এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় বলিয়াই রাশিচক্রের উক্তরূপ নামের কল্পনা হইয়া থাকে।' অন্যমতে কিন্তু প্রকাশ,—'রাশিচক্র ঐরূপ কল্পনার সামগ্রী নহে। বাস্তব বস্তুর আদর্শেই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে গ্রহাদির কক্ষপথের ন্যায় রাশিচক্রেরও একটি পথ আছে। কতকগুলি নক্ষত্র একত্র মিলিত হইয়া রাশিচক্রের এক এক রাশি সংগঠন করিয়াছে। ছেষট্টিটি তারকার সম্মিলনে যে মেষাকার নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশ-মার্গে অবস্থিত আছে, তাহার নাম মেষরাশি। ঐরূপ এক শত একচল্লিশটি নক্ষত্র মিলিয়া বৃষাকার যে নক্ষত্রসমষ্টি, তাহাই বৃষরাশি। পঁচাশীটি নক্ষত্রে দম্পতিযুগলের ন্যায় অবস্থিত যে রাশি, তাহারই নাম মিথুন-রাশি। কর্কটাকারে অবস্থিত তিরাশীটি তারকা কর্কট-রাশি বলিয়া পরিচিত। সিংহাকার পঁচানব্বইটি তারকা সিংহরাশি, এক শত দশটি তারকা কন্যাকারে কন্যারাশি-রূপে অবস্থিত। একান্নটি তারকা তুলাদণ্ডের ন্যায়, চুয়াল্লিশটি তারকা বৃশ্চিকাকারে, উনষাটটি তারকা ঊর্দ্ধ নর অধঃ অশ্বাকৃতিবিশিষ্ট ধনুর্ধারিরূপে যথাক্রমে তুলা, বৃশ্চিক ও ধনু রাশি নামে পরিচিত।

শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্ব-ভাদ্রপদ, উত্তর-ভাদ্রপদ, রেবতী। * ১ হইতে ২৭ পর্য্যন্ত অঙ্ক দ্বারা পঞ্জিকায় এই সাতাইশ নক্ষত্রের পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ, ১।২।৮।৯ প্রভৃতি নক্ষত্র বলিলে অশ্বিনী, ভরণী, পুষ্যা, অশ্লেষা প্রভৃতি নক্ষত্র বুঝাইয়া থাকে। দ্বাদশ রাশির মধ্যে এই সাতাইশ নক্ষত্র যে ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা এই;—(১) মেষ-রাশিতে অশ্বিনী ও ভরণীর পূর্ণ চারি পাদ এবং কৃত্তিকা-নক্ষত্রের প্রথম এক পাদ; (২) বৃষ-রাশিতে কৃত্তিকা-নক্ষত্রের শেষ তিন পাদ, রোহিণীর পূর্ণ চারি পাদ এবং মৃগশিরার প্রথম দ্বিপাদ; (৩) মিথুন-রাশিতে মৃগশিরার শেষ দ্বিপাদ, আর্দ্রার পূর্ণ চারি পাদ এবং পুনর্ব্বসুর শেষ ত্রিপাদ—ইত্যাদি। অর্থাৎ, প্রত্যেক রাশির মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে সওয়া দুইটী নক্ষত্র বিদ্যমান আছে। রাশিচক্রে মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া মীন পর্য্যন্ত দ্বাদশ-রাশি পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বামভাবে অবস্থিত। অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত সাতাইশটি নক্ষত্র পর পর রাশি চক্রের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাম ভাগে, এক একটী রাশিতে সওয়া-দুইটীর হিসাবে, অবস্থিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সূর্য্য এক বৎসরে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন। তাহা হইলে প্রতি মাসে তিনি এক এক রাশির সীমানার মধ্যে অবস্থিত থাকেন। মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া

একান্নটি নক্ষত্রযুক্ত ছাগবদনবিশিষ্ট মকরাকার রাশি মকররাশি, একশত আটটি নক্ষত্রযুক্ত কুম্ভধারী মনুষ্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কুম্ভরাশি এবং এক শত তেরটি নক্ষত্রে সংগঠিত মীনাকার মীনরাশি।' এইরূপে সৌরজগতের দ্বাদশটি নক্ষত্রস্তবক দ্বাদশ রাশি নামে পরিচিত। রাশিচক্রের এই দ্বাদশ রাশির নাম ইংরাজী ভাষায়—Aries, Taurus, cemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces. রাশিচক্রের ইংরাজী নাম—Zodiac.

* নক্ষত্রগুলির কোনও কোনটী দুই তিনটী তারার সংযোগে সংগঠিত। উহাদের আকার অনুসারে উহাদের নাম হইয়াছে বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। দুই তিনটী তারার সংযোগে অশ্বিনী নক্ষত্রের আকার অশ্বমুণ্ডের ন্যায় হইয়াছে বলিয়াই উহার নাম অশ্বিনী। ভরণী নক্ষত্র—তিনটী তারায় গঠিত একটী ত্রিভুজ সদৃশ। কৃত্তিকার আকার খড়ের ঘরের মত; ছয়টী নক্ষত্রে উহা গঠিত। রোহিণী শকটের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট; উহা পাঁচটী নক্ষত্রে গঠিত। তিনটী নক্ষত্রে গঠিত হরিণের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট নক্ষত্রের নাম—মৃগশিরা। রত্নের ন্যায় পরিদৃশ্যমান একটী নক্ষত্র 'আর্দ্রা' নামে অভিহিত। ছয়টী নক্ষত্রে গৃহের আকৃতিবিশিষ্ট নক্ষত্র পুষ্যা নামে খ্যাত। অশ্লেষা পাঁচটী নক্ষত্রযুক্ত কুলালচক্রসদৃশ। মঘা পাঁচটি তারায় বাড়ীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান্‌ পূর্ব্বফল্গুনী দুইটী তারায় খটাকারে, উত্তরফল্গুনী দুইটী নক্ষত্রে শয্যাকারে, হস্তা পাঁচটী নক্ষত্রে হস্তের পঞ্জাকারে, চিত্রা একত্র নক্ষত্রে মুক্তার আকারে, স্বাতী একটি নক্ষত্রে প্রবালবৎ, বিশাখা ছয়টি নক্ষত্রে পুষ্পমাল্যসদৃশ পরিদৃশ্যমান। অনুরাধা সাতটি নক্ষত্রে বৃষ্টিধারার ন্যায়, জ্যেষ্ঠা তিনটি নক্ষত্রে কর্ণকুণ্ডলবৎ, মূলা এগারটি নক্ষত্রে সিংহলাঙ্গুল সদৃশ, পূর্ব্বাষাঢ়া চারিটি নক্ষত্রে গজদন্তবৎ প্রতীয়মান হয়। উত্তরাষাঢ়া চারিটি নক্ষত্রে গঠিত। শ্রবণা তিনটী নক্ষত্রে ত্রিশূলবৎ, ধনিষ্ঠা পাঁচটি নক্ষত্রে ঢক্কাকারে, শতভিষা শত তারকায় মণ্ডলাকারে, পূর্ব্বভাদ্রপদ দুইটী নক্ষত্রে ঘণ্টাকারে, উত্তরভাদ্রপদ দুইটি নক্ষত্রে দ্বিমুণ্ডবিশিষ্ট নরাকারে, রেবতী বত্রিশটী নক্ষত্রে মৃদঙ্গাকারে অবস্থিত। এই সপ্তবিংশ নক্ষত্রের সহিত অভিজিৎ নামে আর একটী নক্ষত্র আছে। তাহার কিয়দংশ উত্তরাষাঢ়ার এবং কিয়দংশ শ্রবণার মিশিয়া আছে। আরবে ও গ্রীসে নক্ষত্রমণ্ডলে যে অষ্টাবিংশ নক্ষত্রের কল্পনা করা হইত, অভিজিৎ তাহাদের অন্যতম।

দ্বাদশ মাসে তিনি দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করেন। অর্থাৎ, বৈশাখ মাসে রবি মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে, ইত্যাদি-রূপে অবস্থিত হন। অশ্বিন্যাদি যে সাতাইশ নক্ষত্রের কথা বলা হইয়াছে, চন্দ্র এক মাসে সেই সাতাইশ নক্ষত্র অতিক্রম করেন। তাঁহার গতি অনুসারে তাঁহার এক একটী রাশির অর্থাৎ সওয়া দুইটী নক্ষত্রের ভোগকাল—কিঞ্চিদধিক সওয়া দুই দিন। অর্থাৎ, কিঞ্চিদধিক সওয়া দুই দিনে চন্দ্র সওয়া দুইটী নক্ষত্র অথবা একটী রাশি অতিক্রম করেন। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু প্রভৃতিরও এইরূপ গতি আছে। মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের রাশিচক্র পরিভ্রমণের এবং দৈনিক-গতির কাল-পরিমাণ,—

গ্রহ।	রাশিচক্র ভ্রমণের কাল।	দৈনিক গতি।
মঙ্গল ...	৬৮৬ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল ২০ বিপল ...	৪৬ কলা ১৮ বিকলা।
বুধ ...	৮৭ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল ১৭ বিপল ...	৪ অংশ ৫ কলা ৩২ বিকলা ২১ অনুকলা।
বৃহস্পতি ...	১১ বৎসর ১০ মাস ১৫ দিন ৩৬ দণ্ড ৮ পল	১৪ কলা ৪৬ বিকলা।
শুক্র ...	২২৪ দিন ১২ দণ্ড ৩ পল ...	১ অংশ ১৬ কলা ৭ বিকলা ৪৪ অনুকলা।
শনি ...	২৯ বৎসর ৫ মাস ১৭ দিন ১২ দণ্ড ৩০ পল	৮ কলা ৫ বিকলা।
রাহু ও কেতু	১৮ বৎসর ৭ মাস ১৮ দিন ১৫ দণ্ড ...	৩ কলা ১১ বিকলা।

চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি প্রভৃতির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি-পরিমাণের প্রায়ই হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু উপরোক্ত গ্রহ-সমূহের শীঘ্রগতি, মন্দগতি, মধ্যগতি, বক্রগতি প্রভৃতি গতির নানা ইতর-বিশেষ আছে। প্রধানতঃ শীঘ্র-গতির বিষয়ই উপরে লিখিত হইল। ঐ গতি অনুসারে প্রতি রাশিতে মঙ্গল ১ মাস ১৫ দিন, বুধ ১৮ দিন, বৃহস্পতি প্রায় এক বৎসর, শনি প্রায় আড়াই বৎসর অবস্থান করেন। রাশিচক্রের অন্তর্গত সাতাইশটি নক্ষত্র সাধারণতঃ অচল বা গতিহীন নক্ষত্র বলিয়া পরিচিত। তবে উহাদেরও অতি সামান্য গতি আছে বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ-গণ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। সে গতির পরিমাণ—বৎসরে প্রায় ৩ বিকলা। নক্ষত্র-সমন্বিত রাশিচক্র সাধারণতঃ যে ভাবে অবস্থিত, চিত্র-দর্শনে তাহা উপলব্ধি হইবে। এ রাশিচক্রকে একটী অঙ্গুরীয়কের ন্যায় মনে করা যাইতে পারে। সেই রাশিচক্ররূপ অঙ্গুরীয়ক ভূগোলকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া আছে; উহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে বিঘূর্ণিত হইতেছে। বিষুব-রেখা দ্বারা ভূগোল উত্তর গোলার্দ্ধ ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধ দুই ভাগে বিভক্ত। সে হিসাবে রাশিচক্রের কল্পিত অঙ্গুরীয়ক-বৃত্তের দ্বারা ভূগোলকে পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধ ও পশ্চিম-গোলার্দ্ধ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। তবেই, বিষুব-রেখার সহিত রাশিচক্রের রেখা দুই স্থলে সম্মিলিত হইয়াছে। মেষের ও তুলার আদ্য স্থানে বিষুব-রেখা রাশিচক্রে মিলিত হয়, কল্পনা করা যাইতে পারে। তবে, রাশিচক্র এবং ভূগোল উভয়েরই কক্ষপথ পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং মিলন-বিন্দুরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। উত্তরে ও দক্ষিণে যে দুই ধ্রুব-নক্ষত্র আছে, সেই দুই ধ্রুব-নক্ষত্রকে রাশিচক্রের অক্ষদণ্ড (ধুর) বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, ধ্রুব-নক্ষত্রেরও গতি আছে। সুতরাং সে হিসাবেও রাশিচক্র পরিবর্ত্তনশীল। বিষুব-রেখা হইতে সূর্য্য যেমন উত্তরে এবং দক্ষিণে সরিয়া

যান, ধ্রুবের সহিত রাশিচক্রও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত পশ্চিমে ২৭ অংশে সরিয়া গিয়া আবার ২৭ অংশে নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত পূর্ব্বে সরিয়া আসেন। সূর্য্যের এক একটী রাশি অতিক্রমের সময়কে মাস বলে। সূর্য্য কর্ত্তৃক সকল রাশিই সমান কালে অতিক্রান্ত হয় না সুতরাং মাসের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কোন্ রাশিতে সূর্য্য কতকাল অবস্থিতি করেন, ভাস্করাচার্য্য তাহার এইরূপ গণনা (মতান্তরে অন্যরূপ দৃষ্ট হয়) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; যথা,—

রাশি।	সূর্য্যের অবস্থিতির কাল।	রাশি।	সূর্য্যের অবস্থিতির কাল।
মেষ (বৈশাখ)	৩০ দিন ৫৫ দণ্ড ৩৩ পল	তুলা (কার্ত্তিক)	২৯ দিন ৫৭ দণ্ড ২ পল
বৃষ (জ্যৈষ্ঠ)	৩১ দিন ২৪ দণ্ড ৫৬ পল	বৃশ্চিক (অগ্রহায়ণ)	২৯ দিন ২৭ দণ্ড ৩৯ পল
মিথুন (আষাঢ়)	৩১ দিন ৩৭ দণ্ড ৩২ পল	ধনু (পৌষ)	২৯ দিন ১৫ দণ্ড ৩ পল
কর্কট (শ্রাবণ)	৩১ দিন ২৮ দণ্ড ৩৫ পল	মকর (মাঘ)	২৯ দিন ২৪ দণ্ড
সিংহ (ভাদ্র)	৩১ দিন ২ দণ্ড ৫২ পল	কুম্ভ (ফাল্গুন)	২৯ দিন ৪৯ দণ্ড ৪৩ পল
কন্যা (আশ্বিন)	৩০ দিন ২৯ দণ্ড ৪ পল	মীন (চৈত্র)	৩০ দিন ২৩ দণ্ড ৩১ পল

সূর্য্য যখন মেষ হইতে কন্যা রাশি পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন, তখন ভূগোলার্দ্ধের উত্তরে দিনের বৃদ্ধি ও রাত্রির ক্ষয় হয় ; আবার সূর্য্য যখন তুলা হইতে মীন রাশি পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকেন, তখন দক্ষিণ গোলার্দ্ধের দিনের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস ঘটিয়া থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদ্বয়ে ছয় মাস যে দিবারাত্রি হয়, প্রথমোক্ত ছয় রাশিতে ও শেষোক্ত ছয় রাশিতে সূর্য্যের এইরূপ অবস্থান জন্যই তাহা ঘটিয়া থাকে। যেরূপ সূর্য্যের বিষয় বলা হইল, সেইরূপ প্রত্যেক গ্রহই রাশিচক্রের এক এক রাশির মধ্যে এক এক সময় আসিয়া উপনীত হন। গ্রহ-গণের কক্ষ-পথের সহিত রাশি-চক্রের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ৩৬৮ পৃষ্ঠায় একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। ঐ চিত্র দৃষ্টে বলা যাইতে পারে, চন্দ্র কর্কট রাশিতে, শুক্র তুলা রাশিতে অবস্থিত আছেন। ঠিক এই ভাবেই যে গ্রহাদি রাশিচক্রে অবস্থিত হন, তাহা অবশ্য বলিতেছি না। হয় তো এমন সময় আসিতে পারে, যখন একাধিক গ্রহ একই রাশিতে অবস্থিত থাকেন। আবার একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে উপলব্ধি হইতে পারে যে, কোনও কোনও গ্রহ কোনও রাশির অন্তর্গত কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। রাশিচক্রে দেখিতেছি, বৃহস্পতি ধনু রাশিতে রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি ধনু রাশিতে যে অংশে আছেন, সে অংশ মূলা নক্ষত্র। সুতরাং তিনি ধনু রাশির অন্তর্গত তুলা নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। পরিবর্ত্তন নিয়তই সংসাধিত হইতেছে। সুতরাং গ্রহাদিও নিয়ত রাশিচক্রের বিভিন্ন অংশে উপনীত হইতেছেন। ১৩১৯ সালের পঞ্জিকায় তিন মাসের রাশিচক্রের (পর পৃষ্ঠায়) প্রতি লক্ষ্য করিলে, বিষয়টি আরও বিশদভাবে বুঝা যাইবে। বৈশাখ মাসের রাশিচক্রে মেষ রাশিতে 'রা বু র১ শ৩' লিখিত আছে ; মিথুন রাশিতে ম৬, তুলা-রাশির ঘরে কে১৩, বৃশ্চিক রাশির ঘরে বৃ১৮, কুম্ভ রাশির ঘরে চ২৩, মীন রাশির ঘরে শু২৬ লিখিত আছে। ঐ সকলের অর্থ এই যে, মেষ রাশির মধ্যে ঐ দিন রাহু, বুধ, রবি ও শনি অবস্থিতি করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি গ্রহ ১ নক্ষত্রে অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্রে এবং শনি গ্রহ ৩ নক্ষত্রে অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম

পাদে অবস্থিত আছেন। এইরূপ মঙ্গল মিথুন-রাশির অন্তর্গত ৬ নক্ষত্রে অর্থাৎ আর্দ্রায়, কেতু তুলা রাশির অন্তর্গত ১৪ নক্ষত্রে অর্থাৎ চিত্রা নক্ষত্রে, বৃহস্পতি বৃশ্চিক রাশির অন্তর্গত ১৮ নক্ষত্রে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, চন্দ্র কুম্ভ রাশির অন্তর্গত ২৩ নক্ষত্রে অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে, শুক্র মীন রাশির অন্তর্গত ২৬ নক্ষত্রে অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদে অবস্থিত। জ্যৈষ্ঠ মাসের রাশিচক্রের প্রতি লক্ষ্য করুন; সেখানে দেখিতে পাইবেন, মেষ রাশির মধ্যে শু২ বু১, বৃষ রাশির মধ্যে শ র ৩, মিথুন রাশির মধ্যে ম ৭, কন্যা রাশির মধ্যে কে১৪,

বৈশাখ মাসের রাশিচক্র। জ্যৈষ্ঠ মাসের রাশিচক্র। আষাঢ় মাসের রাশিচক্র।

বৃশ্চিক রাশির মধ্যে বৃ ১৮, মীন রাশির মধ্যে চ রা ২৭ রহিয়াছে। ঐ সকলের অর্থ, মেষ রাশির অন্তর্গত অশ্বিনী নক্ষত্রে বুধ ও ভরণী নক্ষত্রে শুক্র, বৃষ রাশির অন্তর্গত কৃত্তিকা নক্ষত্রে শনি ও রবি, মিথুন রাশির অন্তর্গত পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে মঙ্গল, কন্যা রাশির অন্তর্গত চিত্রা নক্ষত্রে কেতু, বৃশ্চিক রাশির অন্তর্গত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতি, মীন রাশির অন্তর্গত রেবতী নক্ষত্রে চন্দ্র ও রাহু অবস্থিতি করিতেছেন। আষাঢ় মাসের রাশিচক্রে আবার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই মাসে কেতু, বৃহস্পতি, রাহু, শনি ইহাঁদের স্থান-পরিবর্ত্তন ঘটে নাই বটে; কিন্তু শুক্র, চন্দ্র, রবি, বুধ, মঙ্গল এক এক রাশিতে সরিয়া গিয়াছেন। আষাঢ় মাসে বৃষ-রাশির মৃগশিরা নক্ষত্রে শুক্র এবং রোহিণী নক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থিতি করিতেছেন; রবি ও বুধ মিথুন-রাশিতে মৃগশিরা নক্ষত্রে এবং মঙ্গল কর্কট রাশির অশ্লেষা নক্ষত্রে গিয়া উপনীত হইয়াছেন। পূর্ব্বে (৩৭১ পৃষ্ঠায়) গ্রহাদির গতির বিষয় বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে, সকল স্থলে গতির সে হিসাব অব্যাহত নাই। তাহার কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রহগণের গতি শীঘ্র, মন্দ, মধ্য, বক্র, অতিবক্র প্রভৃতি ভেদে নানারূপে পরিবর্ত্তনশীল। রাশিচক্র-গণনায় প্রধানতঃ গ্রহ-দিগের শীঘ্র-গতি ধরা হয়। আর সেই শীঘ্র গতি লইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্-গণ এক এক রাশিতে এক এক গ্রহের অবস্থান-কাল নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই অবস্থান-কালকে 'রাশির ভোগ-কাল' বলে। সে হিসাবে রবির ১ মাস, চন্দ্রের ২৭ দিন ১৯ দণ্ড ১৭ পল ৪২ বিপল, মঙ্গলের ১ মাস ১৫ দিন, বুধের ১৮দিন, বৃহস্পতির প্রায় এক বৎসর, শুক্রের ২৪৪ দিন ৪২ দণ্ড ৩ পল, শনির প্রায় ২ বৎসর ৬ মাস, রাহু ও কেতুর ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন সাধারণ-ভাবে ভোগ-কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। গত্যন্তর প্রভৃতির জন্য ভোগ-কালের যে তারতম্য ঘটে, পঞ্জিকা-মাত্রেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। অধিক কি, কোন্ দিন কত দণ্ড কত

পলে কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে ও কোন্ রাশিতে গমন করিবেন, পঞ্জিকার মাসারম্ভের প্রথমেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বৈশাখ মাসের সঞ্চার-গণনা,—

বৈশাখ প্রদং ৪৬।৬।৪৪

মহাবিষুব সংক্রান্তি। পূর্ব্বদিবসীয় রাত্রি-শেষার্দ্ধং রবিসংক্রমণাৎ অদ্য দিবা পূর্ব্বার্দ্ধং পুণ্যম্। দিবা দং ১৫। ৩১।৫৩ ঘ১২।১।১০ মধ্যে সংক্রান্তি কৃত্যং স্নানদানাদি। চরগণে সংক্রমণাৎ মহোদরী সংক্রান্তিরিয়ম্।

দিনমানং	...	৩১।১২।২০
মাসমানং	...	৩০ ৫৬'৪৮
শকাব্দাঃ	...	১৮৩৪
সংবৎ	...	১৯৬৯
সন	...	১৩১৯
ইংরাজী	...	১৯১২
হিজরী	...	১৩৩০
শ্রীচৈতন্যাব্দাঃ	...	৪২৬
শ্রীশ্রী৺শঙ্করাব্দা	...	৪৬৩
অয়নাংশাদি	...	২১।১১'৪২।০
বীজাংশাদি	...	১'৪০ ১৫।০৭

৬ই বৈশাখ দং ১৫।১২ পলে শুক্র রেবতী নক্ষত্রে যাইবেন।
৯ই „ দং ৩৯।৩৪ পলে বক্রী বুধ পূর্ব্বে উদিত হইবেন।
১৪ই „ দং ৩৩ ১৮ পলে বুধ বক্র ত্যাগ করিবেন।
১৬ই „ ংং ২২ ২৮ পলে শনি পশ্চিমে অস্ত যাইবেন।
১৬ই „ দং ৪৫ ১১ পলে মঙ্গল পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে যাইবেন।
১৭ই „ দং ৫ ১৩ পলে শুক্র মেষ রাশিতে যাইবেন।
১৯এ „ দং ১।৩৫ পলে রাহু মীন রাশিতে যাইবেন।
১৯এ „ দং ১।৩৫ পলে কেতু কন্যা রাশিতে যাইবেন।
২০এ „ দং ৪৯ ৩৬ পলে শনি বৃষ রাশিতে যাইবেন।
২৫এ „ দং ৫৬ ৭ পলে বুধ মেষ রাশিতে যাইবেন।
২৭এ „ দং ৫৪।৫৫ পলে শুক্র ভরণী নক্ষত্রে যাইবেন।
৩০এ „ দং ৪৮।২২ পলে শুক্র বৃদ্ধ হইবেন।
(গ্রহের বক্রগতি প্রভৃতিও ইহাতে পরিদৃষ্ট হইবে।)

এইরূপ প্রতি মাসেই ঐ গ্রহাদির গতিবিধি অনুসারে তাহাদের ভোগকালের ও এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমনের বিষয় গণনা হইয়া থাকে। এই গণনা অনুসারে গ্রহণাদির বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে, এই গণনা অনুসারে কোষ্ঠীপত্র নির্ণীত হইয়া থাকে। কোষ্ঠি স্থির করিতে হইলে, প্রথমে জাতকের লগ্ন নির্ণয় করা প্রয়োজন। পৃথিবী ৬০ দণ্ডে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে অর্থাৎ অহোরাত্রের মধ্যে পৃথিবীতে একবার দ্বাদশ রাশির উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এক এক রাশি অতিক্রম করিতে পৃথিবীর গড়ে ৫ পাঁচ দণ্ড সময় অতিবাহিত হয়। পৃথিবীর গতি সকল সময় একরূপ নহে বলিয়া এক এক রাশিতে অবস্থিতি-কালের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। স্থানভেদেও ঐ কালের পরিমাণ ভেদ হয়। এক একটি রাশিতে পৃথিবীর অবস্থান-কালকে লগ্নমান বলা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নানা স্থানের লগ্নমান স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; লগ্নমানের তারতম্য ঘটে বলিয়া প্রতি বৎসর পঞ্জিকায় লগ্নমান স্থির করিয়া দেওয়া হয়। কলিকাতার নিকটস্থ কয়েকটি স্থানের লগ্নমান প্রধানতঃ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—মেষ-রাশির লগ্নমান ৪ দণ্ড ৭ পল, বৃষ-রাশির ৪ দণ্ড ৪৯ পল ৪০ বিপল, মিথুন-রাশির ৫ দণ্ড ২৮ পল ৪০ বিপল, কর্কট-রাশির ৫ দণ্ড ৪০ পল ২০ বিপল, সিংহ-রাশির ৫ দণ্ড ৩৩ পল, কন্যা-রাশির ৫ দণ্ড ২৯ পল, তুলা-রাশির ৫ দণ্ড ৩৭ পল, বৃশ্চিক-রাশির ৫ দণ্ড ৪০ পল ২০ বিপল; ধনু-রাশির ৫ দণ্ড ১৭ পল ২০ বিপল, মকর-রাশির ৪ দণ্ড ৩৩ পল ২০ বিপল, কুম্ভ-রাশির ৩ দণ্ড ৫৭ পল এবং মীন-রাশির ৩ দণ্ড ৪৭ পল লগ্নমান নির্দ্দিষ্ট হয়।* বঙ্গদেশেরই কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ,

কোষ্ঠীর লগ্ন-নির্ণয়।

* এই লগ্নমান-নির্ণয় সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে গৌড়ে ও তৎপূর্ব্ব-পশ্চিম দেশের মেষাদি লগ্নমান

চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে লগ্নমানের সামান্য ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। সূর্য্যের উদয়াস্ত হিসাবে লগ্নমান নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং উদয়াস্ত সময়ের তারতম্য অনুসারে লগ্নমানের তারতম্য ঘটে। জাতকের লগ্ন নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমে কোন্ মাসের কোন্ দিন কোন্ সময় তাহার জন্ম হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে হয়। তার পর, সেই মাসের সেই সময়ে সূর্য্য কোন্ রাশির কত অংশ ভোগ করিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। রাশির যতখানি অংশ রবি কর্ত্তৃক অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহাকে রবির ভোগ বা 'রবিভুক্তি' বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রবি এক এক মাসে এক এক রাশি অতিক্রম বা ভোগ করেন। যে মাসে যে রাশিতে তাঁহার উদয়, তাহার সপ্তম রাশিতে (অর্থাৎ মেষ রাশিতে উদয় হইলে তুলা রাশিতে) তাঁহার অস্ত ধরিতে হয়। রাশির যে অংশ সূর্য্য প্রতিদিন অতিক্রম করেন, তাহার নাম—দৈনিক রবিভুক্তি। উদয়-লগ্নের ও অস্ত-লগ্নের রবি-ভুক্তিকে যথাক্রমে উদয়-রবিভুক্তি ও অস্ত-রবিভুক্তি বলা হইয়া থাকে। এই রবিভুক্তি নির্দ্ধারণ করিবার নিয়ম জ্যোতিষ-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অপিচ, সূর্য্যের উদয়াস্তের বিষয়ও পঞ্জিকায় নির্দ্ধারিত আছে। ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম তারিখে 'মেষ দং ০।৯ ৪৮ বি গতে উদয়, তুলা ০।১৮ ৪৯ বি গতে অস্ত'—এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে,—মেষ রাশির ৯ পল ৪৮ বিপলে সূর্য্যের উদয় আরম্ভ হইয়াছে এবং তুলা রাশির ১৮ পল ৪৯ বিপলে উহার অস্ত হইবে। ঐ দুই উদয়াস্তের কাল হইতেই যথাক্রমে উদয়-রবিভুক্তি ও অস্ত-রবিভুক্তি নাম হইয়াছে। দিবাভাগে জন্ম হইলে উদয়-লগ্নের এবং রাত্রি কালে জন্ম হইলে অস্ত-লগ্নের রবিভুক্তি প্রথমে ঠিক করিয়া লইতে হয়। রবিভুক্তি নির্দ্দিষ্ট হইলে রবিভুক্তির কত সময় পরে জাতকের জন্ম হইয়াছে, স্থির হইতে পারে। আর তখন কোন্ রাশির লগ্ন ছিল, তাহাও অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যায়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী বিশদীকৃত করিবার চেষ্টা পাইতেছি। মনে করুন, ১৩১৯ সালের ৬ই বৈশাখ রাত্রি ৯টার সময় কাহারও জন্ম হইয়াছে; কোন্ লগ্নে তাহার জন্ম, নির্ণয় করিতে হইবে। ঐ দিন মেষ দং ০।৪৯।৫৬ বি গতে উদয়, তুলা দং ১।১৩ ২৭ বি গতে অস্ত। বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে সূর্য্যের উদয় এবং তুলা রাশিতে অস্ত ধরিতে হয়। * রাত্রিতে জন্ম হওয়ায় অস্ত লগ্ন

এবং কলিকাতার ও তৎপূর্ব্ব-পশ্চিম দেশের লগ্নমান পঞ্জিকাদিতে এইরূপ প্রকাশিত আছে। যথা,—

রাশি।	গৌড়-দেশস্থ।	কলিকাতা-নিকটস্থ।	রাশি।	গৌড়-দেশস্থ।	কলিকাতা-নিকটস্থ।
মেষ	৪।৮ ২৫	৪ ৯।৫১	তুলা	৫ ৩৭ ১২	৫।৩৫।৪৫
বৃষ	৪।৫১।৩৫	৪।৫২ ৮	বৃশ্চিক	৫:৪০।১৫	৫।৩৯।২৮
মিথুন	৫।৩০।৪	৫,২৯ ৩৬	ধনু	৫।১৫ ৫৬	৫।১৬।২০
কর্কট	৫।৪০।১৮	৫।৩৯ ১২	মকর	৪ ৩১ ৫২	৪ ৩৩।১২
সিংহ	৫।৩২।৩৯	৫।৩১ ১৫	কুম্ভ	৩ ৫৫ ৩৫	৩.৫৭।১০
কন্যা	৫।২৯ ৪০	৫ ২৮ ৯	মীন	৩;৪৬ ২০	৩।৪৮.০

সুতরাং সূক্ষ্ম-গণনায় অনেক স্থলেই ভুলভ্রান্তি ঘটিতে পারে। তবে তাহাতে মূল বিষয় প্রায়ই ঠিক থাকে।

* পৃথিবীর আহ্নিক গতি অনুসারে বুঝা যায়, যে রাশিতে অবস্থিতি-কালে পৃথিবীর যে অংশে সূর্য্যোদয় হইয়াছিল, পৃথিবী সেই রাশির সপ্তম রাশিতে গমন করিলে, পৃথিবীর সেই অংশে সূর্য্যাস্ত ঘটে অর্থাৎ রাত্রি হয়। এই হিসাবেই রবিভুক্তিতে উদয়াস্ত ধরার নিয়ম বিহিত হইয়াছে।

ধরাই নিয়ম। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, তুলারাশির লগ্ন-পরিমাণ দং ৫।৩৭ পল। বৈশাখ মাস ৩০ দিনে। সুতরাং ঐ লগ্নমানকে (৫ দণ্ড ৩৭ পলকে) ৩০ দিয়া ভাগ দিলে, দৈনিক রবিভুক্তি ৫ দণ্ড ৩৭ পল ১৪ বিপল + ৩০ = ১১ পল ১৪ বিপল হয়। ৬ই বৈশাখ জাতকের জন্ম হইলে, এ হিসাবে, ছয় দিনের রবিভুক্তি (১১ পল ১৪ বিপল × ৬) ১ দণ্ড ৭ পল ২৪ বিপল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ৬ই বৈশাখের সূর্য্যের উদয়াস্ত-কাল ঘণ্টা মিনিট হিসাবে কষিলে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়;—উদয় ঘ ৫।৪০।২৪ সেকেণ্ড গতে এবং অস্ত ঘ ৬।১৮।৫৯ সেকেণ্ড গতে। রাত্রি ৯টার সময় জন্ম হইলে ঘ ২।৪১।১ সেকেণ্ড রাত্রি গত হইলে জাতকের জন্ম হইয়াছিল, বুঝিতে হয়। ঐ ঘ ২।৪১।১ সেকেণ্ডকে দণ্ডে পরিণত করিতে হইলে, উহার পরিমাণ দং ৬।৪২।৩২।৩০ অনুপল দাঁড়ায়। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তুলা লগ্নের পরিমাণ দং ৫।৩৭।০ পল। ৬ই বৈশাখ পর্য্যন্ত ছয় দিনের রবিভুক্তি পরিমাণ—১ দণ্ড ৭ পল ২৪ বিপল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ দুই অঙ্কের বিয়োগ করিলে (৫ দণ্ড ৩৭ পল—১ দণ্ড ৭ পল ২৪ বিপল) ৪ দণ্ড ২৯ পল ৩৬ বিপল দাঁড়ায়। উহা তুলা-লগ্নের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে জন্ম হইলে জাতকের লগ্ন তুলা-লগ্ন হইত। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, জাতক দং ৬।৪২।৩২।৩০ বিপল গতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তখন তুলা-লগ্ন অতীত হইয়া বৃশ্চিক-লগ্ন পড়িয়াছে। সুতরাং বৃশ্চিক-লগ্নে জাতকের জন্ম হইয়াছে, অর্থাৎ বৃশ্চিক-লগ্ন জাতকের জন্ম-লগ্ন নির্দ্দিষ্ট হইল। যদি আরও অধিক রাত্রে জাতকের জন্ম হইত, তাহা হইলে লগ্ন আরও পিছাইয়া যাইত। মনে করুন, জাতক রাত্রি ২৭ দণ্ডের সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইলে, তাহার জন্মলগ্ন কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে? তাহা হইলে দেখিতে হইবে, তুলার অবশিষ্ট ৪ দণ্ড ২৯ পল ৩৬ বিপলের সহিত কোন্ কোন্ রাশির লগ্নমান যোগ করিলে ২৭ দণ্ড দাঁড়াইতে পারে। তাহাদের শেষোক্ত রাশিই জাতকের লগ্ন-রাশি হইবে। অর্থাৎ, ৪ দণ্ড ২৯ পল ৩৬ বিপলের সহিত বৃশ্চিকের ৫ দণ্ড ৪০ পল ২০ বিপল, ধনুর ৫ দণ্ড ১৭ পল ২০ বিপল, মকরের ৪ দণ্ড ৩৩ পল ২০ বিপল, কুম্ভের ৩ দণ্ড ৫৭ পল, মীনের ৩ দণ্ড ৪৭ পল যোগ করিলে ২৭ দণ্ড ৪৪ পল ৩৬ বিপল দাঁড়ায়। ইহাতে প্রতীত হয়, ২৭ দণ্ড মীন-রাশির দণ্ডমানের মধ্যেই অবস্থিত; সুতরাং মীন-লগ্নকেই ঐরূপ ক্ষেত্রে জাতকের জন্ম-লগ্ন স্থির করিতে হইবে। জন্ম-লগ্ন স্থির সম্বন্ধে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আরও নানা প্রকার প্রণালী নিরূপিত হইয়াছে। গৃহের অবস্থান, শিশুর ভূমিষ্ঠ হওন, তৎকালে সূতিকা-গৃহের লোক-সংখ্যা, জন্মস্থানে কোন্ কোণে কোন্ রাশির অবস্থান প্রভৃতি দেখিয়াও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জন্ম-লগ্ন স্থির করিতে পারেন। বিভিন্ন জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সেরূপ-ভাবেও লগ্ন-নিরূপণের উপদেশ আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া লগ্ন-নিরূপণ করিয়া এবং গণনাঙ্কের সাহায্যে লগ্ন-নির্দ্ধারণ করিয়া উভয় লগ্ন অভিন্ন হইয়াছে, দেখা গিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ, উভয় প্রকারেই জাতকের জন্ম-লগ্ন নির্ণয় করিয়া, তাহাদের সমতা দেখিয়া, কোষ্ঠী প্রভৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে সকল বিষয় তন্নতন্ন করিয়া আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। সুতরাং এখানে আর একটি মাত্র বিষয়ের আলোচনা করিয়াই জ্যোতিষ-সংক্রান্ত প্রসঙ্গের

উপসংহার করিতেছি। সে বিষয়টী,—জন্মলগ্ন-নির্দ্ধারণের পর কি প্রকারে জাতকের শুভাশুভ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এতদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে গ্রহগণের শত্রু-মিত্র, গ্রহগণের শুভাশুভ, রাশি-সমূহের অধিপতির বিষয়, গ্রহগণের জাত্যাধিপত্য, গ্রহগণের উচ্চ নীচ অবস্থা, গ্রহগণের তুঙ্গাবস্থিতি, গ্রহগণের দৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ বিষয় জানিবার আবশ্যক হয়। পঞ্জিকায় ঐ সকল বিষয় স্থূলভাবে লিখিত আছে। আমরাও কয়েকটী মাত্র এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

শুভাশুভ বিচার।

মেষাদি সাত রাশি সাতটী গ্রহের উচ্চ-স্থান বলিয়া কথিত হয়। রবির উচ্চ রাশি মেষ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মকর, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির কর্কট, শুক্রের মীন, শনির তুলা। ঐ সকল গ্রহ ঐ সকল রাশিতে অবস্থিতি করিলে, তাহারা তুঙ্গ বলিয়া অভিহিত। জন্ম সময়ে গ্রহগণ তুঙ্গ স্থানে থাকিলে, একরূপ ফল হয়; আবার অন্য স্থানে থাকিলে অন্যরূপ ফল হয়। তুঙ্গ-স্থান ভিন্ন অন্যান্য স্থানে গ্রহাদি থাকিলে, তাঁহাদের শক্তির তারতম্য ঘটে। দশম ও তৃতীয় স্থানে গ্রহগণের একপাদ দৃষ্টি, নবম ও পঞ্চম স্থানে দ্বিপাদ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি এবং সপ্তম স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি। তবে সকল গ্রহের পক্ষেই যে এই নিয়ম অব্যাহত, তাহা নহে। শনি তৃতীয় ও দশম স্থানে, বৃহস্পতি পঞ্চম ও নবম স্থানে, মঙ্গল চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে পূর্ণ দৃষ্টিতে পূর্ণ ফল প্রদান করেন। স্বস্থানে এবং দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে গ্রহগণের দৃষ্টি থাকে না। রাহু পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ স্থানে পূর্ণ-দৃষ্টি করেন। তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানে রাহুর অর্দ্ধ দৃষ্টি, স্বস্থানে ও একাদশ স্থানে রাহুর দৃষ্টি আদৌ থাকে না। গ্রহগণের যেমন উচ্চ-স্থান আছে, তেমনি নিম্ন স্থানও আছে। যে যে গ্রহের যে যে রাশি উচ্চ স্থান বলিয়া কথিত, সেই সেই গ্রহের সপ্তম রাশি তাহার নিম্ন-স্থান। উচ্চ-স্থানের মধ্যে আবার অত্যুচ্চ-স্থান আছে; নিম্ন-স্থানের মধ্যেও সেইরূপ অতি-নিম্ন স্থান আছে। যেমন, মেষের দশমাংশে রবি উচ্চ-স্থানে এবং অবশিষ্ট কুড়ি অংশে রবি অত্যুচ্চ স্থানে অবস্থিত; বৃষের তিন অংশে চন্দ্র উচ্চ স্থানে এবং বাকি সাতাইশ অংশে অত্যুচ্চ স্থানে অবস্থিত; ইত্যাদি। এইরূপ, নিম্ন-স্থান বুঝিতে হইলে, তুলার প্রথম দশ অংশ রবির নিম্ন-স্থান এবং শেষ দশ অংশ অতি-নিম্ন স্থান। অন্যান্য গ্রহ-সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু এখানে তত সূক্ষ্ম আলোচনার আবশ্যক নাই। উচ্চভাব বা তুঙ্গস্থান এবং নিম্নভাব বা নীচস্থান মাত্র এস্থলে মনে করিলেই কাজ চলিতে পারিবে। তার পর লগ্নাধিপতিগণের কথা। কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির অধিপতি-মধ্যে পরিগণিত, জ্যোতিষ-শাস্ত্র তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে, মঙ্গল—মেষ ও বৃশ্চিকের অধিপতি। শুক্র—বৃষ ও তুলার, বুধ—মিথুন ও কন্যার, চন্দ্র—কর্কটের, রবি—সিংহের, বৃহস্পতি—ধনু ও মীনের, শনি—মকর ও কুম্ভের অধিপতি মধ্যে গণ্য। পূর্ব্বে যে শিশুর (১৩১৯ সালের ৬ই বৈশাখ জাত) জন্মলগ্ন নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, এ হিসাবে বলিতে হয়, রবি তাহার তুঙ্গ-স্থানে আছেন এবং মঙ্গল লগ্নাধিপতি। কারণ, বৈশাখ মাসের রাশিচক্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ঐ দিন রবিকে মেষের ঘরে দেখা যাইবে। রবি তুঙ্গস্থানে থাকিলে জাতব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ, সুপণ্ডিত, ধীর-

স্বভাব, দাতা, বহুজন-প্রতিপালক, অরোগী ও মণ্ডলাধিপতি রাজা হইতে পারে। কিন্তু ঐ দিন যে বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কার্য্যকালে সে হয় তো পূর্ব্বোক্তরূপ গুণ-লক্ষণাদি প্রাপ্ত হইবে না। তাহারও অবশ্য কারণ আছে। অন্য কয়েকটী গ্রহ কি অবস্থায় অবস্থিত, তাহাও তো বিচার করিতে হইবে! রবি তুঙ্গস্থানে থাকিয়া সুফল প্রদান করিতেছেন বটে; কিন্তু অন্য গ্রহ-সকল কি ভাবে কি ফল প্রদান করেন, তাহাও দেখা বিধেয়। ঐ দিন মেষ রাশিতে রাহু, বুধ ও শনির সংযোগ আছে। এই স্থলে গ্রহদিগের শত্রু-মিত্রের বিষয় বুঝিবার আবশ্যক হয়। শুক্র ও শনি রবির শত্রু; বুধ সম বা নিরপেক্ষ এবং অবশিষ্ট গ্রহগণ মিত্র। রবি ও বুধ চন্দ্রের মিত্র; অবশিষ্ট গ্রহ চন্দ্রের সমগ্রহ। রবি ও শুক্র বুধের মিত্র, চন্দ্র শত্রু; অবশিষ্ট চন্দ্রের সমগ্রহ। বৃহস্পতির শত্রু বুধ ও শুক্র, শনি সম, অবশিষ্ট মিত্র। শুক্রের মিত্র বুধ ও শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি সম, অবশিষ্ট শত্রু। শনির মিত্র বুধ ও শুক্র, বৃহস্পতি সম, অবশিষ্ট গ্রহ শত্রু। এ ক্ষেত্রে রবির শত্রু-মিত্রের সংখ্যা প্রায়ই সমান; সুতরাং রবিই প্রবল রহিলেন। কিন্তু বৃশ্চিকের লগ্নাধিপতি যে মঙ্গল, তিনি বৃশ্চিক হইতে অষ্টম স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। লগ্নাধিপতি অষ্টম স্থানে অবস্থিতি করিলে, জাতকের নানারূপ বিপদের সম্ভাবনা থাকে। তাহাকে সর্ব্বদাই রুগ্ন, শোকার্ত্ত, ভয়ার্ত্ত থাকিতে হয়; আর জাতক অল্পায়ু হইয়া থাকে। তবেই দেখা যাইতেছে, এখানে বিপরীত ফল ফলিল। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আর একটী বিষয় বিচার করিবার আছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র বলিয়াছেন, ঐ লগ্নাধিপতি শুভ ও বলবান কিনা, দেখিতে হইবে। গ্রহ-সমূহের মধ্যে কোন্ গ্রহ কখন শুভ ফল, আর কোন্ গ্রহ কখন অশুভ ফল প্রদান করে, তদ্বিষয়ে নিম্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—"অর্দ্ধোনেন্দ্বর্কসৌরারাঃ পাপাঃ সৌম্যাস্ততঃ পরে। পাপযুক্তো বুধঃ পাপঃ কেতু রাহুশ্চ পাপকৌ।" অর্থাৎ,—'কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র, রবি, মঙ্গল, শনি; পাপযুক্ত বুধ, রাহু, কেতু, ইহা পাপগ্রহ; এতদ্ভিন্ন শুভগ্রহ।' জন্মস্থান হইতে কোন্ গ্রহ কোন্ স্থানে আছে লক্ষ্য করিলেই কোন্ গ্রহের কিরূপ শুভাশুভ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, বুঝা যাইতে পারে। মঙ্গল অষ্টম স্থানে আছেন। এদিন তিনি অশুভ-ফলপ্রদ; কারণ, শুক্লাদ্বিতীয়া তিথির জন্য তিনি পাপগ্রহ। শুভগ্রহ হইলে মঙ্গল অষ্টম স্থানে থাকিলেও জাতকের স্ত্রী-ধন বা কোনও সম্পত্তি-লাভের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ঐ দিন শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথির সংযোগ হওয়ায় তিনি অশুভফলপ্রদ পাপগ্রহ মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং রবি তুঙ্গ-স্থানে থাকিলেও তজ্জনিত সুফল লগ্নাধিপতি মঙ্গলের অষ্টম স্থানে অবস্থিতি হেতু নষ্ট হইতেছে। তবে জাতকের শুভ-সংঘটন সম্বন্ধে আর একটী লক্ষণ বিদ্যমান। সেটী লগ্নে বৃহস্পতির অবস্থিতি। লগ্নে বৃহস্পতি থাকিলে, মকর ভিন্ন অপরাপর লগ্নে জাত ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যবান্, লোকপূজ্য স্বধর্ম্মানুরত হইয়া থাকেন এবং তিনি রাজ-সম্মান লাভ করেন। এইরূপ অন্যান্য গ্রহের অবস্থানাদির বিষয় বিচার করিতে গেলে নানা শুভাশুভের বিষয় অবগত হওয়া যায়। লগ্নফল, লগ্নাধিপ ফল প্রভৃতির বিষয় সম্যক্ অবগত হইতে হইলে দীপিকা, জাতক-কৌমুদী, জাতকালঙ্কার, বৃহজ্জাতক, জ্যোতিষসার-সংগ্রহ, কোষ্ঠীপ্রদীপ প্রভৃতি জ্যোতিষ-

সংক্রান্ত গ্রন্থ-সমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন হয়। সাধারণ-ভাবে পঞ্জিকা-দৃষ্টেও এ সকল ফলাফল নির্ণয় করা যাইতে পারে। আমরা সংক্ষেপে দুই চারি পৃষ্ঠার মধ্যে যে জ্যোতিষ-তত্ত্ব বিবৃত করিলাম, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গবেষণার পরিচয়, তাহাতে অতি সামান্য-মাত্রই পরিব্যক্ত হইল। কি সাধনার ফলে, কত ভূয়োদর্শনের প্রভাবে, জ্যোতিষের এক একটী তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। ভারতবর্ষে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এখনও যাহা ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে, প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠা-গৌরবের নিশ্চয়ই তাহা প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

যুদ্ধ-বিদ্যা।

যুদ্ধ-বিদ্যা বা সমর-বিজ্ঞান সভ্যতার একটী অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। যে জাতি অধুনা যতই সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতেছে, সমর-বিজ্ঞানের উন্নতি-সাধনে সে ততই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছে। এখন আর জনে জনে যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না। এখন আর জনে জনে বল-পরীক্ষার আবশ্যক নাই। এখন লোক-বল অল্প হইলেও যন্ত্র-বলেই সমরাঙ্গণে জয়ী হওয়া যায়। সভ্য-জগতে যুদ্ধাস্ত্রের—মনুষ্যের প্রাণ-নাশের কত নূতন নূতন কৌশলই উদ্ভাবিত হইয়াছে। নৌ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে টর্পেডো যন্ত্র সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোতকে ধ্বংস করা হইতেছে! ব্যোম-পথে ব্যোমযানে (এরোপ্লেনে) উঠিয়া মেঘের ভিতর হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া নগর নগরী ধ্বংস করা হইতেছে; মৃত্তিকাভ্যন্তরে দাহ্য পদার্থ রাখিয়া, সে পথে শত্রুর পদ-সঞ্চার মাত্র তাহার ধ্বংস-সাধনের উপায় বিধান হইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমর-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতেছে; নূতন নূতন বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আবিষ্কারে সমর-নৈপুণ্য প্রকাশের—জন-নাশের আয়োজন চলিয়াছে। নৌ-বল বৃদ্ধির প্রতি অধুনা সভ্যজাতি-মাত্রেরই চেষ্টার অবধি নাই। যে জাতি যত সভ্য-সমুন্নত বলিয়া পরিচিত, সামরিক শক্তি তাহার তত অধিক।

সভ্যতা ও সমর-বিজ্ঞান।

ভারতবর্ষেরও এক সময়ে এ গৌরবের দিন ছিল। নানা গুণগ্রামে বিভূষিত থাকিয়া—জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি সাধন করিয়া, ভারতবর্ষ সমর-বিজ্ঞানেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইতিহাসে প্রাচীন-ভারতের যে রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সকল সামরিক যন্ত্রাদির উল্লেখ আছে, তৎসমুদায়ের আলোচনা করিলে, তৎসমুদায়ের তুলনায় এখনকার এই বিংশ শতাব্দীর অস্ত্রাদি বা যন্ত্রাদি কিছুরই অভিনবত্ব অনুভূত হয় না। ইহাতে কেহ কেহ হয় তো বলিতে পারেন,—'পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সংশ্রবের পূর্ব্বে এদেশে যুদ্ধাস্ত্রের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন—সামান্য তীর-ধনুক ভিন্ন আর কি ছিল? এখন যে কামান-বন্দুকের ব্যোমভেদী শব্দে ত্রিভুবন প্রকম্পিত, পুরাকালে তাহা কি কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিয়াছিল?' কাহারও কাহারও মনে এইরূপ সংশয়-প্রশ্ন জাগিয়া থাকে বটে; কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সকল সংশয়ই দূরীভূত হয়। কামান-বন্দুকের ব্যবহার যে বহু পুরাকালেই এদেশে প্রচলিত ছিল, ঋগ্বেদে, অথর্ব্ব-বেদে, কৃষ্ণ-

প্রাচীন-ভারতে সমর-বিজ্ঞান।

যজুর্ব্বেদে, শুক্রনীতি-গ্রন্থে, রামায়ণে, মহাভারতে, অগ্নি-পুরাণে তাহার প্রমাণ আছে। আগ্নেয়াস্ত্র, শতঘ্নী, নালিক প্রভৃতি নামধেয় যন্ত্রের বর্ণনা এবং ক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইতে পারে। নালিক, জ্বলন্তী, স্থূণা, সূর্ম্মী, বজ্র প্রভৃতি নামেও ঐ সকল যন্ত্র পরিচিত। নলের মধ্য দিয়া গোলা বিনির্গত হয় বলিয়াই যন্ত্রের নাম হইয়াছিল—নালিক। এই সকল যন্ত্র সম্বন্ধে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের উক্তি (১।৬।৫।৭) এবং তাহার ভাষ্য ও ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে বহু তথ্য অবগত হওয়া যাইবে। বৈদিক মন্ত্রটী,—

"এষা বৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবত্যেতয়া হ স্ম বৈ দেবা অসুরাণাং শততর্হাং স্তৃংহন্তি
যদেতয়া সমিধমাদধাতি বজ্রমেবৈতচ্ছতঘ্নীং যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি।"

"সূক্তের ভাষ্য,—'জ্বলন্তী লৌহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ। কর্ণকাবতী অন্তঃসুষিরবতী অন্তর্জ্জলন্তী চেত্যর্থঃ। সাংহিতকং দীর্ঘত্বম্। তৎসদৃশা ঋগিত্যর্থঃ। দেবা এতয়া অসুরাণাং মধ্যে শততর্হান একপ্রহারেণ শতস্য হন্তৄন্। তৃংহন্তি ঘ্নন্তি স্ম। তৃহ হিংসায়াং রৌধাদিকঃ। তস্মাদেতয়া ঋচা সমিধমাদধাতি যজমানঃ বজ্রম্ ইন্দ্রায়ুধ সদৃশমেব এতৎ শতঘ্নীং পূর্ব্বোক্তং সূর্ম্মীং ভ্রাতৃব্যায় শত্রবে তৃংহন্তি প্রহিণোতি।' এস্থলে সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা এইরূপ—'জ্বলন্তী লৌহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী। অতএব জ্বলন্তীত্যর্থঃ। তৎসমানেয়মৃক্। একেন প্রহারেণ শতসংখ্যকান্ মারয়ন্তঃ শূরাঃ শততর্হাঃ। অসুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্ (সূর্ম্মীয়োদ্ধৄন্) এতয়া ঋচা দেবা হিংসন্তি। অনয়া সমিনাধানেন শতঘ্নীমেনাং ঋচং বজ্রং কৃত্বা বৈরিণং হন্তুং প্রহরতি।" এই বর্ণনা পাঠ করিলে লৌহের নলের মধ্য হইতে অগ্নিপিণ্ড নিঃসরণ হয়, এইরূপ যন্ত্রেরই অস্তিত্বের বিষয় বুঝা যায়। বিশেষতঃ, অথর্ব্ববেদে সীসক-নির্ম্মিত গোলক দ্বারা বিপক্ষ-পক্ষকে বিধ্বস্ত করার বিষয় যাহা উল্লিখিত রহিয়াছে, তাহাতে সূর্ম্মী যন্ত্রকে কামানের অনুরূপ যন্ত্র বলিয়াই অনুভূত হয়। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রটী (১।১৬।৩।৪) এই,—

"সীসয়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি। সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রায়চ্ছৎ তদঙ্গ যাতু চাতনম্॥
যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষম্। তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোঽসো অবোরহা॥"

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র ও তাহার ভাষ্যাদি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, "লৌহ-নির্ম্মিত স্থূণা অর্থাৎ লম্বা খোঁটা, তাহার মধ্যে সুষির বা রন্ধ্র, তাহা হইতে প্রজ্বলিত পদার্থ বহিরাগত হয়, তাহা আবার কালে শত শত্রু বিনাশ করে। আবার সীসকের দ্বারা শত্রু বিনাশ হয়।" এরূপ বর্ণনা দ্বারা বন্দুক বা কামান ভিন্ন আর কি উপলব্ধি হইতে পারে? রামায়ণে, মহাভারতে ও শুক্রনীতি গ্রন্থে নালিক নামক যে যুদ্ধাস্ত্রের বিষয় লিখিত আছে, পূর্ব্বোক্ত সূর্ম্মীর সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিতে পাই। শুক্রনীতি গ্রন্থে নালিকের এইরূপ পরিচয় আছে,—

"নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ। তির্য্যগূর্দ্ধছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্॥
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি-তিলবিন্দুযুতং সদা। যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎগ্রাবচূর্ণধৃক্ কর্ণমূলকম্॥
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্। স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃশলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্॥
লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ। যথা যথা তু ত্বক্‌সারং যথা স্থূলবিলান্তরম্॥
যথাদীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদি তথা তথা। মূলকীলভ্রমাল্লক্ষ্য সমসন্ধানভাজি যৎ॥
বৃহন্নালিক সংজ্ঞন্তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতম্। প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্॥"

অর্থাৎ,—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভেদে নালিক যন্ত্র দুই প্রকার। "ক্ষুদ্র নালিকের লক্ষণ এইরূপ,—পঞ্চ বিতস্তি পরিমাণ (চারি হাত লম্বা) একটী নাল বা নল (লৌহ-নির্ম্মিত), তাহার মূলে তির্য্যক্-দিকে (আড়ভাবে) একটী ছিদ্র, মূল হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত অন্তঃসুষির (গর্ত্ত), মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক করিবার তিল বিন্দু (মাছি), যন্ত্রে আঘাত পাইবামাত্র অগ্নি নির্গত হয়, এরূপ প্রস্তর খণ্ড, সেই স্থানে অগ্নিচূর্ণের (বারুদের) আধার স্বরূপ একটী কর্ণ, উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুধ্ন অর্থাৎ ধরিবার মুঠ,—এতদ্রূপ নালাস্ত্রের মধ্যগর্ত্তের পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলি, অর্থাৎ তর্জ্জনী নামক অঙ্গুলী প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ গর্ত্ত, তাহার মধ্যে অগ্নিচূর্ণ প্রোথিত করণের দৃঢ় শলাকা;—এরূপ নালাস্ত্রের নাম লঘু-নালিক। এই লঘুনালিক পদাতিক সৈন্য এবং অশ্বারোহী সৈন্যেরাই ব্যবহার করিবে; দীর্ঘ-নালিকের লক্ষণ এই যে, উহার ত্বক যত কঠিন হইবে, উহার আয়তন তত বড় হইবে, তাহার গর্ভ যত স্থূল (মোটা) হইবে, তাহার গোলা যত বড় হইবে, সে ততই দূরভেদী হইবে। তাহার মূলদেশে কীলক এবং কাষ্ঠ-বুধ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ধরিবার মুঠ নাই। শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা তাহা বাহিত হয়। উহা উপযুক্ত-রূপে স্থাপিত হইলে, যুদ্ধে জয়প্রদ হয়। ইহার নাম বৃহন্নালিক।" * এতাদৃশ বর্ণনার উপর অন্য কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। বন্দুক ও কামানের ব্যবহার ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত বারুদ ও গোলা প্রভৃতি কি করিয়া প্রস্তুত করা যায়, তাহারও বিবরণ 'শুক্রনীতি' গ্রন্থে পরিবর্ণিত আছে। রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণের বিভিন্ন স্থানে শতঘ্নী যন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই শতঘ্নী যন্ত্রই বা কি ছিল? হনুমান্ লঙ্কার নিকটে উপনীত হইয়াই লঙ্কার সৌন্দর্য্য ও দুর্ভেদ্যত্বের বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন। হনুমান দেখিতেছেন,—

"বপ্র প্রাকার জঘণাং বিপুলাম্বুবনাম্বরাম্। শতঘ্নী শূলকেশান্তামট্টালকবতংসকাম্॥"

বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত মানসপুরী লঙ্কার বপ্র-প্রাকার নিতম্বস্বরূপ, সমুদ্র-কানন বস্ত্র-স্বরূপ, শতঘ্নী ও শূল-সমূহ তাহার কেশ-স্বরূপ এবং অট্টালিকা-সমূহ অলঙ্কার-স্বরূপ শোভা পাইতেছে। অর্থাৎ,—লঙ্কা নগরীকে কবি সুন্দরী রমণীর সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন,—শতঘ্নী ও শূল-সমূহ তাহার কেশ-স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। মৎস্যপুরাণে সপ্তদশাধিক দ্বিশততমাধ্যায়ে রাজার দুর্গ-নির্ম্মাণের ও নগর-রক্ষার প্রণালী বিবৃত আছে। 'আপন অধিকারভুক্ত রাজ্যে রাজা ষড়বিধ দুর্গের যে কোনও দুর্গ নির্ম্মাণ করাইবেন। দুর্গ ষড়বিধ—ধন্বদুর্গ মহীদুর্গ, নরদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, জলদুর্গ ও গিরিদুর্গ। এই ছয় দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গই শ্রেষ্ঠ। রাজা দুর্গের চতুর্দ্দিকে পরিখা, প্রাকার ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইবেন। চতুর্দ্দিকে শতঘ্নী ও অপরাপর যন্ত্র-সকল বহুলরূপে স্থাপন করাইবেন।' পুরোদ্বার মনোহর কবাট দ্বারা সুশোভিত করিবেন। এ সকল বর্ণনা দৃষ্টে কি মনে হয়? শতঘ্নী কিরূপ যন্ত্র? শতঘ্নীকে কি কামান বলিতে পারি না? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও শতঘ্নীকে কামান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 'হিন্দু-আইনের' আলোচনা প্রসঙ্গে হাল্‌হেড † স্পষ্টাক্ষরে

---

* ডক্টর রামদাস সেন প্রণীত "ভারতরহস্য" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† "A cannon is called '*Shataghnee* or the weapon that kills one hundred men at

এই কথাই স্বীকার করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন,—'মাসিদনাধিপতি আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়া যে এরূপ যুদ্ধাস্ত্র দেখেন নাই, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। অনুসন্ধানের অতীত সময়ে চীন-দেশে এবং হিন্দুস্থানে বারুদের প্রচলন ছিল। সংস্কৃত ভাষায় আগ্নেয়াস্ত্র নামে যে অস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে কি বলা যাইতে পারে? এই আগ্নেয়াস্ত্র এমনই অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইত যে, একটী অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্রাব নানাদিকে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নানা দিক ধ্বংস করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু সে আগ্নেয়াস্ত্র এখন একেবারে লোপ পাইয়াছে।' * আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়া যে আগ্নেয়াস্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবার কোনই কারণ নাই। আরিষ্টটলকে আলেকজাণ্ডার এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি আগ্নেয়াস্ত্রের ন্যায় এক প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—'ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্য হইতে তিনি ভয়ানক অগ্নিবর্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন।' থেমিষ্টিয়াস লিখিয়া গিয়াছেন,—'বজ্র ও বিদ্যুতের সাহায্যে ব্রাহ্মণগণ দূর হইতে যুদ্ধ করিতেন।' মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের বিষয় উল্লেখ প্রসঙ্গে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন,—'কামান, বন্দুক প্রভৃতি ভিন্ন হিন্দুগণের যুদ্ধাস্ত্র-সমূহ প্রায়ই আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সমূহের সমতুল্য ছিল।' আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ-বর্ণন প্রসঙ্গে ফিলাষ্ট্রেটাস বলিয়া গিয়াছেন,—যদিও আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কখনই ভারতবর্ষের দুর্গ-সমূহে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। যদি কোনও শত্রু ভারতের ঋষিকল্প ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করিত, তাঁহারা বজ্র ও বিষম বাত্যার প্রভাবে তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতেন; তখন বোধ হইত, যেন স্বর্গ হইতে সেই সকল অস্ত্র নিপতিত হইতেছে। বিপক্ষ সৈন্যগণ যখন বিবিধ আয়ুধ সহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, ভারতবাসি-গণ প্রথমে তৎপ্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। কিন্তু বৈদেশিকগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, তাঁহারা বজ্র ও অগ্নিময় ঘূর্ণিবায়ুর সাহায্যে আক্রমণকারীকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।' যে সকল অস্ত্র-ব্যবহারে ভারতবর্ষ এইরূপে জয়যুক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বজ্র ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতিরই বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। অধ্যাপক উইল্‌সন বলেন,—'বজ্র ভারতবর্ষের সাধারণ যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সে বজ্রের যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বারুদের ব্যবহার

---

once', and, that the Puran Shastras ascribe the invention of these destructive engine, to Viswacarma, the Volcan of the Hindoos."—*Vide*, Halhed's *Code of Gentoo Laws*, Introduction.

* "Gunpowder has been known in China, as well as in Hindustan, far beyond all periods of investigation. The word *firearm* is literally the Sanskrit *Agniaster*, a weapon of fire. Among several extraordinary properties of this weapon, one was, that often it had taken its flight it divided into several separate streams of flame, each of which took effect, and which, when once kindled could not be extinguished: but this kind of *Agniaster* is now lost."—*Halhed's Code of Gentoo Laws.*

বিশেষভাবেই প্রচলিত ছিল, উপলব্ধি হয়। বারুদ-প্রস্তুত-প্রণালী হিন্দুগণের ভৈষজ্য-গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়।' হরিবংশে আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ আছে। সগর রাজা ভার্গবের নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। সেই আগ্নেয়াস্ত্র-সাহায্যে তিনি তালজঙ্ঘ ও হৈহয়দিগের সংহার-সাধন করেন। হরিবংশে লিখিত আছে; যথা,—

"আগ্নেয়মস্ত্রং লব্ধা চ ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ। জিগায় পৃথিবীং হত্বা তালজঙ্ঘান্ সহৈহয়ান্॥"

সগর রাজার জাত-কর্ম্ম সমাপনান্তে ঔর্ব্ব ঋষি ঐ আগ্নেয়াস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বিবিধ অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যে সকল অস্ত্রের নাম লিখিত আছে, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সে সকল অস্ত্রও সামরিক বিজ্ঞানে ঔৎকর্ষের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়াই প্রতীত হয়। বিশ্বামিত্র বলিতেছেন,—'হে রঘুবংশীয় মহাবীর রাজনন্দন! আমি তোমাকে সুমহৎ দিব্য দণ্ডচক্র, কালচক্র, ধর্ম্মচক্র, অত্যুগ্র বিষ্ণুচক্র, অসহ্যবিক্রমসম্পন্ন ইন্দ্রচক্র, বজ্র অস্ত্র, সুরবাত নামক শৈব অস্ত্র, ব্রহ্মশিরা অস্ত্র, ঐষিক বাণ, অত্যুত্তম ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নাম্নী শুভদায়িনী জাজ্জল্যমানা দুই গদা, ধর্ম্মপাশ, কাকপাশ, বারুণ, পাশাস্ত্র, শুষ্ক ও আর্দ্র দুই প্রকার অশনি, পাশুপত অস্ত্র, অতি প্রিয় শিখর নামক আগ্নেয় বাণ, নারায়ণ অস্ত্র, হয়শিরা নামক প্রসিদ্ধ বাণ, উত্তম উত্তম বায়ব্যাস্ত্র, ক্রৌঞ্চ বাণ, দুইটি শক্তি, কঙ্কাল নামক ভয়ানক মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিণী অস্ত্র, নন্দন নামক বিদ্যাধর সম্বন্ধীয় মহাস্ত্র, উত্তম অসি, মোহন নামক অতি প্রিয় গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, প্রস্বাপন ও প্রশমন নামক অস্ত্র, চান্দ্রবাণ, বর্ষণ ও শোষণাস্ত্র, সন্তাপন অস্ত্র, বিলাপন অস্ত্র, কন্দর্পপ্রিয় দুরাধর্ষণীয় মদন নামক বাণ, মানব নামক দৈত্যগন্ধর্ব্ব বাণ, মোহন নামক দৈত্য-পৈশাচ অস্ত্র, তামস অস্ত্র, মহাবলসম্পন্ন সৌমন নামক বাণ, দুরাধর্ষ সম্বর্ত্তক অস্ত্র, দুরাধর্ষণীয় মৌসল অস্ত্র, সত্য অস্ত্র, মায়াময় বাণ, পরবির্য্যাপকর্ষক তেজঃপ্রভ নামক সৌর অস্ত্র, শিশির নামক চান্দ্র বাণ, সুদারুণ ত্বাষ্ট্র অস্ত্র, ভগদেব সম্বন্ধীয় সম্মানপ্রদ শীলেষু নামক দারুণ বাণ এবং যে সকল অস্ত্রে অনায়াসে রাক্ষস-দিগকে বিনাশ করা যায়, সেই সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি, শীঘ্র গ্রহণ কর; এই সকল অস্ত্র-শস্ত্রের অসীম শক্তি ও ইহারা কাম-রূপী।' এই সকল অস্ত্রের বিবরণ পাঠ করিলে উপলব্ধি হয়, সমরকুশল যোদ্ধা যাহা কিছু ইচ্ছা করিতেন, তাহাই সম্পন্ন করিতে পারিতেন। রণস্থলে বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন; বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইত। বায়ু-প্রবাহের আবশ্যক; বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইত বলিয়া বজ্রাস্ত্র নাম হইয়াছিল। উহাকে যুদ্ধের বোমা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যদি উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস না থাকে; তাহা হইলে এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায়, প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষ সমর-বিজ্ঞানে যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বতোমুখী উন্নতির দিনেও সে উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। কেরি ও মার্সম্যান রামায়ণোক্ত 'শিখর' নামক অস্ত্রকে দাহকারী আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহা গোলাগুলির ন্যায় দাহকারী অস্ত্র। কিন্তু 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' লেখক ইলিয়ট রামায়ণোক্ত ঐ সকল অস্ত্রকে কল্পনা মাত্র বলিয়া

উপেক্ষা করিয়াছেন। প্রধানতঃ বায়ব্যাস্ত্রের নাম শুনিয়াই তাঁহার অবিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে। সচরাচর যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, সেরূপ কোনও সামগ্রীর বিষয় শুনিলে স্বতঃই মানুষের মনে অবিশ্বাসের সঞ্চার হয়। গ্রামোফোন, সিনেমেটোগ্রাফ, তারহীন তাড়িতবার্ত্তা প্রভৃতির কথা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ শ্রবণ করিলে হয় তো হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু ঐ সকল ব্যাপার এখন প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট। এখনও হয় তো এমন অজ্ঞ ব্যক্তি অনেক আছে, যাহারা ঐ সকল যন্ত্র দেখে নাই বা ঐ সকল যন্ত্রের কথা শুনে নাই। সুতরাং তাহাদের নিকট ঐ সকল যন্ত্রের পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। আগ্নেয়াস্ত্রের ন্যায় যুদ্ধাস্ত্রের অর্থাৎ কামান-বারুদ ও গোলাগুলির ব্যবহারের ক্ষীণ স্মৃতি-চিহ্ন সেদিনও ভারতে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে পৃথ্বীরাজ যে দিন পাঠান সৈন্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে দিনও ভারতবর্ষে গোলাগুলির ব্যবহার দৃষ্ট হইয়াছিল। 'পৃথ্বীরাজ-রাস' নামক গ্রন্থে সেই যুদ্ধের একটী বর্ণনা আছে। গ্রন্থখানি পৃথ্বীরাজের সমসময়ে কবিতাছন্দে লিখিত হয়। সেই গ্রন্থের একটী শ্লোকের কয়েক পংক্তি,—

"নৃপ পংগ নয়র ছুটে অরাব। কোটহ কংগুর চঢ়ি চঢ়ি সিতাব॥
জংবুর তোপ ছুটহি যুনংকি। দশ কোশ জায় গোলা ভনংকি॥
সিরদার ভার বারাহ রোহ। লংগি অভংগ বর হনৈ কোহ॥"

অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্যগণ যখন গোলাগুলি বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিল, তখন দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত সেই ভীষণ শব্দে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। অযোধ্যার রাজদরবারে রাজা কুন্দন-লাল নামক একজন ঐতিহাসিক বিদ্যমান ছিলেন।* তিনি অযোধ্যার রাজার অধিকারে 'লিচনা' নামধেয় একটী বৃহৎ কামান দিয়াছিলেন। আজমীঢ়াধিপতি মহারাজ পৃথ্বী-রাজের সৈন্যদল যুদ্ধ সময়ে সেই কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই কামানের পরিচয় প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন,—'তখন বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে যুদ্ধ হইত, ডাকবিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সুপরিসর রাজপথ-সমূহ দেশের শোভা-সম্বর্দ্ধন করিতে-ছিল।' * ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে হাওয়াই-এর ন্যায় বিভিন্ন প্রকার অত্যাশ্চর্য্য যুদ্ধাস্ত্রের প্রচলন ছিল। সে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে, আকাশ সর্পে ছাইয়া পড়িত; সে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে, আকাশে ব্যাঘ্র-ভল্লূকাদি জীবজন্তুর আবির্ভাব হইত,—পুরাণেতিহাসের অনেক স্থলে যুদ্ধ-বর্ণনায় এরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—রকেট বা হাওয়াই আকাশে উত্থিত হইয়া ফাটিয়া গেলে তাহা হইতে নানা আকৃতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। অস্ত্র-মুখে সর্প বা ব্যাঘ্র-ভল্লূকাদির আবির্ভাবে হাওয়াই-জাতীয় কোনও অস্ত্রের প্রচলনের বিষয়ই মনে হইতে পারে না। অধ্যাপক উইলসন বলেন,—'রকেট বা হাওয়াই-এর উৎপত্তি-স্থান এই ভারতবর্ষ। ইউরোপীয়-গণ যে দিন হইতে ভারতের সহিত সংস্রব-সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে ভারতীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে রকেট ব্যবহার করিতে

* 'হিন্দু সুপিরিয়রিটি' গ্রন্থে এ সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। *Vide* also *Muntakhab Tafsee-ul Akhbar.*

দেখিয়াছেন।' যে সকল অস্ত্রমুখে সর্পাদি বিনির্গত হইত, যে সকল অস্ত্রের চালনায় আকাশ বিষাক্ত বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া বিপক্ষ-পক্ষের ধ্বংস-সাধন করিত, আবার যে সকল অস্ত্রের সাহায্যে তাহা প্রতিরোধ করা যাইত, তাহা হাওয়াই-জাতীয় কোনও সামগ্রী বা অন্য কোনও সামরিক যন্ত্র—তাহা কে বলিতে পারে? যে অস্ত্র-বিদ্যা-সাহায্যে ঐরূপ অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন হইত, সে অস্ত্র-বিদ্যার স্বরূপ-তত্ত্ব নির্ণয় করা এক্ষণে অসম্ভব। থিওজফিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় কর্ণেল অল্‌কট তাই বলিয়া গিয়াছেন,—'অস্ত্র-বিদ্যা বিষয়ক বিজ্ঞানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণ সামান্যরূপ প্রবেশ-লাভ করিতেও পারেন নাই। ব্যোমপথ বিষময় বাষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ভীতি-উৎপাদক ভীষণ ছায়ামূর্ত্তির সঞ্চারে এবং লোমহর্ষণ বজ্রনিনাদে বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া কি প্রকারে প্রাচীন আর্য্যগণ শত্রু-সৈন্যের ধ্বংস-সাধন করিতেন, এখন তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারা যায় না। * এইরূপ অস্ত্রযুদ্ধে যে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, কর্ণেল অলকটের উক্তিতে তাহাও প্রতিপন্ন হয়। অস্ত্র-বিদ্যারই অপর নাম—ধনুর্ব্বিদ্যা। ধনুর্ব্বিদ্যা বা ধনুর্ব্বেদ নাম দেখিয়া অনেকে ভ্রমে পতিত হন। কিন্তু ধনুর্ব্বিদ্যায় কেবল যে ধনুর্ব্বাণ শিক্ষার বিষয়ই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহা কেহ মনে করিবেন না। ধনুর্ব্বেদের মধ্যে তীর-ধনুক প্রভৃতির ব্যবহার শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র এবং নানা প্রকার যন্ত্র-ব্যবহারের প্রণালীও বিবৃত রহিয়াছে। মহাভারতে এবং অগ্নিপুরাণে ধনুর্ব্বেদের যে পরিচয় বিদ্যমান আছে এবং অন্যান্য গ্রন্থেও ধনুর্ব্বিদ্যা বলিতে যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাতে সকল প্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র-পরিচালন-প্রণালী ধনুর্ব্বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অধুনা সৈন্য-গণকে যেরূপভাবে শস্ত্র-চালনার বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, ধনুর্ব্বেদ শিক্ষাদানের বিবরণ পাঠ করিলে, সেই ভাবই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ধনুর্ব্বাণ পরিচালনার যে অপূর্ব্ব কৌশলের বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহার তো তুলনাই নাই। যোদ্ধা যে বিষয় মনে করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তাহাই সফল হইত। রাজা দশরথ নৈশ-অন্ধকারের মধ্যে শব্দ-মাত্র অনুসরণ করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; আর তাহাতে অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধু নিহত হন। একলব্যের শরসন্ধানে একটী কুকুরের স্বররোধ হইয়াছিল। একলব্য সেই উদ্দেশ্যেই বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বাণাঘাতে কুক্কুর

* The *Ashtur Vidya*, the most important scientific part (of the art of war) is not known to the soldiers of our age. It consisted in annihilating the hostile army by enveloping and suffocating it in different layers and masses of atmospheric air, charged and impregnated with different substances. The army would find itself plunged in a fiery, electric and watery element, in total thick darkness, or surrounded by a poisonous, smoky, pestilential atmosphere full sometimes of savage and terror-striking animal forms (snakes and tigers etc.) and frightful noises......*Ashtur Vidya*, science of which our modern professors have not even an inkling, enabled its proficient to completely destory an invading army, by enveloping it in its atmosphere of poisonous gases, filled with awe-striking, shadowy shapes and with awful sounds."—Col. Olcott's *Lecture*, published in the *Theosophist*, 1881.

নিহত হয় নাই; কিন্তু তাহার স্বর বন্ধ হইয়াছিল। এইরূপ অসংখ্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা পুরাণেতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে। এ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে সমর-বিজ্ঞান কতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সৈন্য-পরিচালনা, ব্যূহ-রচনা প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতির পরিচালনায় ভারতবর্ষ কি কৌশলই না প্রকাশ করিয়া গিয়াছে! আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমন-কালে ভারতীয় সৈন্য হস্তীর সাহায্যে যে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে যুদ্ধ দর্শন করিয়া আলেকজাণ্ডার বিস্মিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত আলেকজাণ্ডারের সন্ধি-সর্ত্ত ধার্য্য হইলে, সেনাপতি সেলিউকসকে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত একটী হস্তী উপহার দিয়াছিলেন। ম্যাক্সডঙ্কার তাঁহার পুরাবৃত্তের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে সেই হস্তীর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'একমাত্র সেই হস্তীর সাহায্যে সেলিউকস সিরিয়া ও এসিয়া-মাইনর প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন। যুদ্ধে হস্তীর সাহায্যে যে অত্যদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই চমকিত হইয়াছিলেন।* চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে দুর্গ-নির্ম্মাণ, দুর্গ-প্রবেশ প্রভৃতির বিবরণ এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে আয়ুধাগারাধ্যক্ষের কার্য্যাকার্য্যের প্রণালী বিবৃত আছে। তৎসমুদায় পাঠ করিলে সমর-বিজ্ঞানে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন স্থলযুদ্ধে তেমনি জলযুদ্ধেও ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। জলদুর্গের উল্লেখ বিভিন্ন পুরাণে (মৎস্য-পুরাণ, ২১৭ম অধ্যায়) দেখিতে পাই। জলদুর্গ অর্থে নৌবহর বুঝায়। জল-পথে যুদ্ধের এবং জলপথ রক্ষার জন্য উহার প্রয়োজন ছিল। কর্ণেল টড্ ভারতের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে জীবনপাত করিয়াছেন। প্রাচীন-ভারতের রণপোতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন,—'হিন্দু-গণ অতি প্রাচীন-কালে প্রবল নৌ-শক্তির অধিকারী ছিলেন।' † সগর রাজার দিগ্বিজয়, বলিরাজ কর্তৃক বলী-দ্বীপ প্রভৃতিতে রাজ্যবিস্তার প্রভৃতির ইতিহাস পাঠ করিলে, প্রাচীন-ভারতের নৌ-শক্তির বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসী নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, মন্বাদি শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। ষ্ট্রাবোও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে যে নৌ-সেনা-বিভাগ ছিল, ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে ভারতীয় নৌ-সেনা-বিভাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় পরিদৃশ্যমান্। নৌ-সেনা-বিভাগের অস্তিত্বের ক্ষীণ স্মৃতি ভারতে সেদিনও পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। পর্ত্তুগীজ-গণ যখন গুজরাট-প্রদেশে উপনীত হন, তত্রত্য নৃপতির রণপোত হইতে তাঁহাদের প্রতি গোলাবর্ষণ হইয়াছিল,—ফেরিয়া-ই-সুজা এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কালিকটের রাজা জামোরিনের রণপোত ছিল। তাঁহার সেই সকল রণপোত-সমূহে ৩৮০টী কামান সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিত। ১৫০২ খৃষ্টাব্দেও তিনি

---

* *Vide* Prof. Max Dunker, *History of Antiquity.*

† "The Hindus of remote ages possessed great naval power.—*Vide,* *Col. Tod's Rajasthan, Vol. II.*

সেই রণপোত-সমূহের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল বিবরণ এবং সূর্ম্মী, শতঘ্নী, বজ্র, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির বিষয় পাঠ করিলে, কামান-বন্দুক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্রই যে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহাতে আদৌ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। *

বিবিধ।

গণিত-জ্যোতিষ প্রভৃতির অন্যান্য কথা।

গণিত, জ্যোতিষ ও যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আরও কত কথাই বলা যাইতে পারে! শুল্ব-সূত্রই যে জ্যামিতির মূল, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শুল্ব শব্দের অর্থোৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিলেও মূল-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। "ক শুল্বয়তি বেধা পৃথিবীং পরিমাতি সৃজতি বা ইত্যর্থঃ।" জ্যামিতি শব্দেরও যে অর্থ (জ্যা = বসুধা + মিতি = মানম্ বিজ্ঞানম্ পরিমাণম্), শুল্ব শব্দেরও সেই অর্থ; পাশ্চাত্য দেশের 'জিওমেট্রি' (জি = আর্থ + মেট্রন = মেসার বা পরিমাপ) শব্দেরও সেই অর্থ। মুসলমানদিগের আধিপত্য-কালে শুল্বসূত্রের ব্যবহার লোপ পাইবার উপক্রম হইলে, জ্যামিতি-তত্ত্ব বিদেশ হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় ভারতে আসিয়া উপনীত

---

* সূর্ম্মী, শতঘ্নী, নালিক, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে গুলি-গোলা-বারুদের প্রচলন-বিষয়ে আদৌ সংশয় থাকিতে পারে না। তথাপি এতদ্বিষয় লইয়া অনেক সময় বাদানুবাদ চলিতে দেখা যায়। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রত্নতত্ত্বালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু অগ্নিপুরাণের ভূমিকায় এবং সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত গ্রন্থে (*Nctices of Sanskrit Manuscript, Vol. V.*) এতদ্বিষয় অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে ধনুর্ব্বেদ-প্রকরণে (২৪৯ম—২৫১ম অধ্যায়ে) ছাত্রকে অস্ত্রশিক্ষা-দানের বিষয় লিখিত আছে; কিন্তু সেখানে আগ্নেয়াস্ত্রের কথা লিখিত নাই। এই জন্যই মিত্র মহাশয়ের মনে আগ্নেয়াস্ত্রের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। তার পর, 'শুক্রনীতি' গ্রন্থে বারুদ-প্রস্তুত, কামান ও বন্দুক পরিষ্কার-করণ প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, তিনি তৎসমুদায়কে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে আগ্নেয়াস্ত্রের বিষয় লিখিত নাই, সেইটী হইল প্রমাণ; আর যেখানে লিখিত আছে, সেইটাই হইল প্রক্ষিপ্ত!—এ এক আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত বটে! হিন্দুগণের ব্যবহার-বিধি-বিষয়ক গ্রন্থে মিঃ হাল্‌হেড একটী শ্লোক দেখিয়াছিলেন। সেই শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"The Magistrate shall not make war with any deceitful machine or with poisoned weapons, or with cannons and guns or any kind of fire-arms." হিন্দু-দিগের রসায়ন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মিঃ হাল্‌হেডের এতদুক্তির প্রতিবাদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ডক্টর রায়ের মতও ডক্টর রাজেন্দ্রলালের মতেরই অনুসারী। ডক্টর রায় বলিয়াছেন,—'হাল্‌হেড সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না। সংস্কৃত ভাষার পার্শী অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ৯০ম শ্লোকটীকে লক্ষ্য করিয়াই হাল্‌হেড ঐরূপ কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনুর শ্লোকের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে,—যুদ্ধ-কালে রাজা কোনরূপ কূটাস্ত্র অর্থাৎ গুপ্ত বিষাক্ত বাণ বা কোনরূপ উত্তপ্ত লৌহ-খণ্ড কাহারও উপর নিক্ষেপ করিবেন না; ইত্যাদি।' মেধাতিথি এবং কুল্লুক-ভট্টের টীকা আলোচনা করিয়াই তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু মনুসংহিতার শ্লোকটী ও তাহার টীকার বিষয় আলোচনা করিলে আমরাই বা কি দেখিতে পাই? মূল শ্লোকটী,—"ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাদ্ যুদ্ধমানো রণে রিপূন্। ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥" কুল্লুক ভট্টের টীকা,—"নেত্যাদি। কূটান্যায়ুধানি বহিঃকাষ্ঠাদিময়ানি

হইয়াছিল। তখন রেখাগণিত, সিদ্ধান্ত-চূড়ামণি প্রভৃতি নামে উহা ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। ইউক্লিডের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আরবী ভাষায় 'মিজাস্তি' গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত জগন্নাথ 'রেখাগণিত' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন-কালে উপক্রমণিকায় তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায়,—পূর্ব্বে রেখাগণিত বিষয়ক গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তৎসমুদায় লোপপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে মহারাজের আদেশে ঐ রেখাগণিত গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে জগন্নাথের উক্তি,—

"অপূর্ব্ববিহিতং শাস্ত্রং যত কোণাববোধনাৎ। ক্ষেত্রেষু জায়তে সম্যক্ ব্যুৎপত্তির্গণিতে তথা॥
শিল্পশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণে। পারম্পর্য্যবশাদেতদাগতং ধরণীতলে॥
তচ্ছিন্নং মহারাজ জয়সিংহাজ্ঞয়া পুনঃ। প্রকাশিতং ময়া সম্যক্ গণকানন্দহেতবে॥"

অর্থাৎ,—ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ক এই শাস্ত্র ব্রহ্মার নিকট হইতে বিশ্বকর্ম্মা প্রাপ্ত হন। তার পর, পারম্পর্য্য-বশে ধরণীতলে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু কালবশে ভারতবর্ষ হইতে উহা উচ্ছিন্ন হওয়ায় গণকদিগের আনন্দের জন্য, মহারাজ জয়সিংহের আদেশে, আমাকে উহা প্রকাশ করিতে হইল। জগন্নাথের রেখাগণিত পনেরটী অধ্যায়ে এবং চারি শত আটাত্তরটী 'শকল' বা প্রতিজ্ঞায় নিবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থে জগন্নাথ বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও দিয়াছিলেন। জ্যামিতির প্রথম ভাগের সপ্তচত্বারিংশ প্রতিজ্ঞাকে তিনি ষোল প্রকারে সমাধান করিয়া যান। ১৬৪৯ শকে (১৭৮৪ সংবৎ, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে) জগন্নাথের রেখাগণিত গ্রন্থ লিখিত হয়। জগন্নাথের নিবাস তৈলঙ্গ-দেশে। প্রথমে তিনি দিল্লীতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। পরিশেষে জয়পুরাধিপতি তাঁহাকে আপন রাজ্যে লইয়া গিয়া আপনার সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন। জগন্নাথের রেখাগণিত গ্রন্থ গদ্যে লিখিত

অস্তগুপ্তনিশিতশস্ত্রাণি তৈঃ সমরে যুধ্যমানঃ শত্রূন্ ন হন্যাৎ নাপি কর্ণাকারফলকৈর্বাণৈঃ নাপিবিষাক্তৈঃ নাপাগ্নিদীপ্তফলকৈঃ।" মূলে আছে,—'অগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ।' কুল্লূক ভট্ট ব্যাখ্যা করিলেন,—'অগ্নিদীপ্ত ফলকৈঃ।' মেধাতিথি ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অগ্নিনা জ্বলিতমাদীপিতং তেজোময় ফলকং যেষাং।" ইহাতে উপলব্ধি হয়,—'অগ্নিময় জ্বলন্ত ফলক।' অগ্নিময় জ্বলন্ত ফলক কি হইতে পারে? তীরের মস্তকাগ্রে তৈলসিক্ত কাপড় জড়াইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া ছোঁড়া হইত কি? যে শতঘ্নী বাণে—যে আগ্নেয়াস্ত্রে শত সহস্র শত্রু-সৈন্য এক সঙ্গে ধরাশায়ী হইত, তাহা কি এই ক্রীড়ায় সামগ্রী? অধুনা বাণ বলিতে শরের বাণ এবং অস্ত্র বলিতে দা বা কাটারি মনে হয়। সেই জন্য অনেকের মনে ঐ শব্দের অর্থ-নিষ্পত্তির সময় গোল বাধিয়া থাকে। কিন্তু ধনুর্ব্বেদ, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে, কখনই ঐরূপ ভ্রম-ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। 'এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' (*Journal of the Asiatic Society*, Bengal, Vol. XLV.) মেজর-জেনারেল আর ম্যাক্‌লাগন এসিয়া মহাদেশে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকটন করেন। সেই প্রবন্ধের অনুসরণে ডক্টর রায় লিখিয়াছেন,—"বাবরের পূর্ব্বে এদেশে বারুদের প্রচলন ছিল না। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বাবর গোলাগুলির সাহায্যে কানোজে প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাই ভারতে প্রথম বারুদের ব্যবহার।' কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি,—আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমন সময়েও এদেশে গোলাবারুদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সে প্রমাণ—আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক-গণ। শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতিতেও গোলা-বারুদ ব্যবহারের প্রমাণ পাইয়াছি।

হইয়াছিল। বিন্দু, রেখা, ক্ষেত্র প্রভৃতি পরিভাষা তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ দৃষ্ট হয়; যথা,—

"যঃ পদার্থঃ দর্শনযোগ্যঃ বিভাগানর্হঃ স বিন্দুর্বাচ্যঃ। যঃ পদার্থঃ দৈর্ঘ্যঃ বিস্তাররহিতঃ বিভাগার্হঃ স রেখাশব্দবাচ্যঃ। বিস্তারদৈর্ঘ্যয়োর্যদ্ভিন্নতে তদ্ধরাতলং দেবক্ষেত্রং।" ইত্যাদি।

'সিদ্ধান্ত-চূড়ামণি' নামক জ্যামিতি-সংক্রান্ত অপর যে গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সে গ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ গ্রন্থ পদ্যে রচিত। সেই জন্য উহাকে জগন্নাথের রেখাগণিতের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। জগন্নাথের 'রেখাগণিত' হইতে এবং 'সিদ্ধান্ত-চূড়ামণি' হইতে নিম্নে একটী প্রতিজ্ঞার (প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম প্রতিজ্ঞার) সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে উভয় গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্যের বিষয় অনেকটা উপলব্ধি হইবে। দুই গ্রন্থের দুইটী সূত্র,—

রেখাগণিতে।	সিদ্ধান্ত-চূড়ামণি গ্রন্থে।
যস্য ত্রিভুজস্য ভুজত্রয়ং অন্য ত্রিভুজস্য	যস্য ত্রিকোণস্য ভুজত্রয়ঞ্চেৎ
ভুজৈঃ সমানং ভবতি তদা তস্য	ভুজৈঃ সমানং ক্রমশোঽন্যকস্য।
কোণত্রয়মপি অন্য ত্রিভুজস্য	ত্রিকোণকৌ তৌ সমানরূপৌ
কোণৈরবশ্যং সমানং ভবিষ্যতি।	স্যাতামিতি ত্বং খলু দর্শয়াশু॥

ভারতবর্ষ যাহার উৎপত্তি-স্থান সেই ভারতবর্ষকে অপরের নিকট হইতে সেই সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইল, ইহার অপেক্ষা ভারতের অবনতির দৃষ্টান্ত অধিক আর কি হইতে পারে। যেমন গণিত-বিষয়ে, তেমনি জ্যোতিষ সম্বন্ধেও ভারতবর্ষ এখন দূরে পিছাইয়া পড়িয়াছে। এদেশে এখন জ্যোতিষের ব্যবহার—পঞ্জিকা-গণনায় আর কোষ্ঠী প্রভৃতি নির্দ্ধারণে। সৌর-জগৎ সংক্রান্ত নিত্য নূতন কত তথ্য দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে! কিন্তু প্রাচীন ভারতে সে সকল বিষয় আলোচিত হইলেও এখন আর তৎসমুদায়ের আলোচনায় ভারতবর্ষে কাহারও উৎসাহ নাই। অধিক দিনের কথা নহে; সেদিনও—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগেও—ভারতের গণিত বৈদেশিকের শিক্ষার বিষয় ছিল। কিন্তু এখন বৈদেশিকের সাহায্য ভিন্ন ভারতবর্ষ এক পদও অগ্রসর হইতে অসমর্থ। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি,—'বাগদাদের কালিফ মনসুর (৭৫৩ খৃঃ—৭৭৪ খৃঃ) ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করিয়া ব্রহ্মসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ-গ্রন্থ বাগদাদে লইয়া গিয়াছিলেন; জ্যোতিষ বিষয়ে আরবীয়-গণের অভিজ্ঞতার তাহাই মূল ভিত্তি। পৃথিবীতে যে গণনাঙ্ক আজি পর্য্যন্ত প্রচলিত, সে গণনাঙ্ক ভারতের নিজস্ব সামগ্রী। পাটীগণিত ও বীজগণিত অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে আরবে যায়। আরব হইতে উহা ইউরোপে বিস্তৃত হয়। কিন্তু এখন আবার ইউরোপ হইতেই ভারতকে তাহা গ্রহণ করিতে হইতেছে! আল্‌বারুণি প্রণীত ভারতবর্ষ সংক্রান্ত গ্রন্থের অনুবাদক সাচাউ এবং সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতির উক্তিকেই এতদ্বিষয়ের সাক্ষ্যস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোলব্রুক, স্যর উইলিয়ম জোন্স, অধ্যাপক প্লেফেয়ার, মিঃ বেণ্টলি এবং মিঃ ডেভিস প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'এসিয়াটিক রিসার্চ্চ' এবং 'এডিনবার্গ রিভিউ' পত্রের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে হিন্দুদিগের গণিত-জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার

কোনও কোনও অংশ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইলেও, তদ্দ্বারা ভারতের প্রতিষ্ঠার পরিচয় বিশেষ-ভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে। * ইউরোপে জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে যাঁহারাই আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার মৌলিকত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। সূর্য্যের ও চন্দ্রের মন্দগতি বিষয়ে প্রাচীন-কালে যে দেশে যাহা-কিছু আলোচনা হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গণনাই ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের আধুনিক অবেক্ষণের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। † বেণ্টলি যদিও জ্যোতিষ-তত্ত্বের আলোচনা সম্বন্ধে হিন্দুদিগের আদিমত্ব স্বীকারের বিরোধী; কিন্তু তিনিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—'খৃষ্ট জন্মের অন্যূন ১৪৪২ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চন্দ্রের গতি অনুসারে রাশিচক্রকে সাতাইশ ভাগে বিভক্ত করিতে জানিতেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বহুকালের অবেক্ষণ ভিন্ন ঐরূপ বিভাগের প্রবর্ত্তনায় কেহই যে সমর্থ হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।' সুতরাং বেণ্টলির বিরুদ্ধ-মতের মধ্যেও জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনায় ভারতের মৌলিকত্ব ও আদিমত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যায়। বেণ্টলির সিদ্ধান্ত যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও গ্রীসদেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনার অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ জ্যোতির্ব্বিদ্যায় প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল, প্রতীত হয়। ‡ সূর্য্যসিদ্ধান্ত কত প্রাচীন গ্রন্থ, আমরা পূর্ব্বেই তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছি। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক প্লেফেয়ার হিন্দুদিগের ত্রিকোণমিতি বিষয়ক জ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'যে ভাবে এই বিজ্ঞান হিন্দুগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তাহা দেখিলে মনে হয়, যাঁহারা ঐ বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহাতে বিশেষরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন। উহা দেখিলে আরও বুঝা যায়, তাঁহারা যাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অনেক অধিক ছিল। যে সকল গ্রন্থ সূত্রাকারে বা কবিতা-ছন্দে গ্রথিত দেখিতে পাই, সে সমুদায় তত্ত্ববিষয়ক বৃহত্তর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার বলিয়া প্রতীত হয়। ব্যবহারিক কার্য্যের জন্য সাধারণতঃ ঐ সকলের প্রচলন ছিল।' § পাটীগণিত এবং বীজগণিত সম্বন্ধেও এইরূপ উক্তিই দৃষ্ট হয়।

---

* *Asiatic Researches*, Vol II. p. 239, 259. 268, 392, 399 Vol. IV. P. 152, Vol. V. p 288, Vol. VI. p. 581, Vol. VII. p. 288, Vol. VIII. p. 489, Vol. IX. p. 329, 347, 356; *Edinburgh Review*, Vol. X. p. 459, Vol, VXIII. p 211, Vol. XIX p. 152, 143, 151, 153, 157, 158; Vol, XXI p, 375-375.

† See Pond's *Laplace System of the World*, vol. II.

‡ বেণ্টলির মতের আলোচনা করিয়া এলফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন,—"This would be from one to two centuries before the Argonautic expedition and the first mention of Astronomy in Greece."—*Vide* Elphinstone, *History of India*, ট্রোজান যুদ্ধের পূর্ব্বে আরগো নামক একখানি অর্ণবপোত প্রস্তুত করিয়া গ্রীসের পঞ্চাশ জন প্রধান প্রধান বীরপুরুষ, জেসনের অধিনায়কত্বে, এটেস বা কোলচিস রাজ্য হইতে স্বর্ণময় মেষ-লোম (Golden fleece of the ram) আনয়ন করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাই 'আরগোনটিক এক্সপিডিশন।'

§ প্লেফেয়ারের উক্তি,—"It has the appearance, like many other things in the science of those Eastern nations, of being drawn up by one who was more deeply versed in the subject than may be at first imagined, and who knew more than he thought it

সংক্ষিপ্ত কবিতায় ঐ সকল গ্রথিত। উহার কোনও ব্যাখ্যা বা বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয় নাই। অথচ, মিলাইয়া দেখিলে উহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটীতেও ভ্রান্তমত প্রচারিত নহে।' আজিকালি ব্যবহারিক কার্য্যে এবং ছাত্রগণের পরীক্ষার সুবিধার্থ অনেক বড় বড় গ্রন্থের অনেক সংক্ষিপ্ত-সার প্রচারিত হয়। প্রাচীন ভারতের গণিতাদি সম্বন্ধে এখন যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সেই সংক্ষিপ্ত সার বলিয়া মনে হইতে পারে। বিপ্লবের পর বিপ্লবে বৃহত্তর মূল গ্রন্থ-সমূহ লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সে সকল গ্রন্থের যে সকল সংক্ষিপ্ত-সার মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত ছিল, পরবর্ত্তিকালে তাহারই উদ্ধার-সাধন হইয়াছে মাত্র। সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে ত্রিকোণমিতির যে পদ্ধতি বিবৃত আছে, সে সকল বিষয়ে গ্রীকগণের অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। অধিক কি, তন্মধ্যে যে সকল উপপাদ্য বিষয় দেখিতে পাই, ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে তৎসমুদায় আবিষ্কৃত হয় নাই। * ত্রিভুজের পরিমাণ ফল নির্ণয়ে ভারতবর্ষ বহুকাল পূর্ব্বে সমর্থ ছিল। ইউরোপে ক্লেভিয়াস ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ তত্ত্ব প্রচার করেন। ব্যাসার্দ্ধের সহিত বৃত্তের পরিধির অনুপাত ইউরোপ অধুনা নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষ কিন্তু এ বিষয়ে বহুকাল পূর্ব্বে অভিজ্ঞ ছিল। সূর্য্যসিদ্ধান্তে এই অনুপাতের বিষয় লিখিত আছে। ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্তেও এতদ্বিষয়ের আলোচনা দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও সূর্য্যসিদ্ধান্তকে পঞ্চম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্তের বিদ্যমানতার বিষয় প্রচার করিয়া থাকেন। † যদি সেই গণনাই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ইউরোপের ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভের বহু পূর্ব্বে ভারতের অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। ডায়ফেণ্টাস গ্রীসদেশে সর্ব্বপ্রথম বীজগণিত প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কোলব্রুকের মতে প্রতিপন্ন হয়, আর্য্যভট্ট সে সময়ে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। আর্য্যভট্টের পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষ বীজগণিতের আলোচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয় আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। এল্‌ফিনষ্টোন্ প্রভৃতিও সেই কথাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ‡ 'এডিনবার্গ রিভিউ' পত্রে বীজগণিতের একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। বীজগণিতের সেই অঙ্কটী—'খ এর পরিমাণ কত হইলে কখ২+গ একটী বর্গ-রাশি হইতে

necessary to communicate. It is probably a compendium form by some ancient adept for the use of others who were mere practical calculators."—*Vide*, Playfair, *Edinburgh Review*, Vol. XXIX.

* "In the *Surya Siddhanta* is contained a system of Trigonometry which not only goes far beyond anything known to the Greeks, but involves theorems which were not discovered in Europe till the sixteenth century."—Elphinstone, *History of India*, অধ্যাপক প্লেফেয়ার এবং ওয়ালেস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সূর্য্যসিদ্ধান্তের আলোচনায় এই মর্ম্মের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

† *Asiatic Researches*, Vol, II.

‡ "Nor is Arya Bhatta the inventor of Algebra among the Hindus; for there seems every reason to believe that the science was in his time in such a state, as it required the lapse of ages, and many repeated efforts of invention to produce. It was in his time, indeed, or in the fifth century, at latest, that Indian science appears to have attained its highest perfection."—Elphinstone, *History of India*.

পারে।' এই অঙ্কের সমাধান পক্ষে প্রথমে ডায়ফেণ্টাস্ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তি-কালে ফারমট এই অঙ্কের সমাধানে প্রয়াস পান। ইংলণ্ডের বীজগণিতবিদ্‌গণ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ অঙ্কের সমাধান করিতে পারেন নাই। পরিশেষে ইউলার কর্ত্তৃক এই অঙ্কের সমাধান হয়। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ভাস্করাচার্য্য এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, ইউলারের সিদ্ধান্ত তাহারই অনুসারী।' 'এডিনবার্গ রিভিউ' পত্রে, এইরূপ আরও একটি অঙ্কের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ কোলব্রুক দেখাইয়াছেন,—ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে যে অঙ্কটী লিখিত ছিল, ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ব্রুনকার সেই অঙ্কটীর সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইউলারও ঐ অঙ্ক-সমাধানে কৃতকার্য্য হন নাই। পরিশেষে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ডে লা-গ্র্যাং কর্ত্তৃক উহা সমাহিত হয়। ব্রহ্মগুপ্ত ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছিলেন, ইউরোপ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই সমস্যার সমাধানে সমর্থ হয়। লীলাবতীতে কুট্টক নামে একটী অধ্যায় আছে। সেই অধ্যায়ে যে সকল অঙ্কের যেরূপ সমাধান-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে প্রণালী ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে ব্যাচেট-ডি মেজেরিয়াক কর্ত্তৃক ইউরোপে প্রথম প্রচারিত হয়। ইউলারও তাহারই আলোচনা করেন। কুট্টকের একটী সূত্র এই,—"একবিংশতিযুতং শতদ্বয়ং যদ্‌গুণং গণক পঞ্চষষ্টিযুক্। পঞ্চবর্জ্জিত শতদ্বয়োদ্ধৃতং শুদ্ধিমেতি গুণকং বদাশুতং॥" জ্যোতির্ব্বিদ্যায় এবং জ্যামিতিতে বীজগণিতের ব্যবহার ভারতীয় হিন্দু-দিগেরই আবিষ্কার। যে পদ্ধতিতে তাঁহারা বীজগণিতের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আজিও ইউরোপ আশ্চর্য্যান্বিত। কোলব্রুকের বীজগণিতে তিনি এতদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে বহুদিন হইতে বিচার-বিতর্ক চলিয়াছে। নানা জন নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের এক এক জন গণিতবিদের বা জ্যোতির্ব্বিদের আবির্ভাব-কাল লইয়াই কত বিতণ্ডা চলিয়াছে! আধুনিক ঘটনার কাল-নির্ণয়ে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না; তাহাতে বড় মতান্তরও ঘটে না। কিন্তু যাহা অতি দূরের ঘটনা—যে ঘটনা স্মৃতির গণ্ডীর বাহিরে পড়িয়াছে, তাহারই কাল-নির্ণয়ে গণ্ডগোল ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য-গৌরবের দিন অনেক দূরে স্মৃতির অন্তরালে সরিয়া পড়িয়াছে; তাই তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব নির্ণয়ে যত মতান্তর—যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। ভারতের এখনকার অবস্থা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাঁহারা অতীত গৌরবের কথা বিশ্বাস করিতেই সঙ্কুচিত হন। যাঁহারা অতীত কাহিনীর মধ্যে প্রবেশলাভ করেন, বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিতে গিয়া তাঁহারাও বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া পড়েন। নচেৎ, জ্ঞান-সূর্য্য ভারতবর্ষে কত পূর্ব্বে আপনার উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ করাই দুঃসাধ্য। *

---

* জ্যোতিষ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে আর্য্যগণের উত্তর-মেরুবাস সংক্রান্ত তিলক প্রভৃতির সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্য-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, প্রতি ৬৫৮৫ দিনে অর্থাৎ ১৮ বৎসর ১০ বা ১১ দিনে সূর্য্য ও চন্দ্র একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হন। পৃথিবীর সহিতও তাঁহাদের তখন সমান সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। সুতরাং শীতগ্রীষ্মাদির যাহা কিছু পরিবর্ত্তন, ১৮ বৎসরের মধ্যেই তাহা সাধিত হইয়া থাকে। এ হিসাবে, উত্তর-মেরু এক সময়ে বাসের যোগ্য ছিল, আর এখন অযোগ্য হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। "পৃথিবীর ইতিহাস"—প্রথম খণ্ডে, এ কথাও আমরা বলিয়াছি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কলাবিদ্যা।

[কলা-বিদ্যা,—চতুঃষষ্টি কলা;—গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্য,—সঙ্গীত-প্রসঙ্গ,—নাট্যাভিনয়াদি;—বাস্তুবিদ্যা বা স্থাপত্য;—আলেখ্য বা চিত্রশিল্প;—অন্যান্য বিবিধ বিদ্যা,—আকর, ধাতু, রত্ন, বৃক্ষ, জীবজন্তু প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি;—কলা-বিদ্যা বিষয়ে বিবিধ আলোচনা।]

ভারতে কোন্ বিদ্যা না স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল! যে সকল বিদ্যার প্রভাবে মনুষ্য আজি মনুষ্যপদবাচ্য, তাহার সকল বিদ্যাই ভারতবর্ষের অধিগত ছিল। সকল বিদ্যার সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা, কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। শাস্ত্র-গ্রন্থে কলাবিদ্যার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। কলাবিদ্যার চৌষট্টি অঙ্গ। "চতুঃষষ্ট্যঙ্গমদদৎ কলাজ্ঞানং মমানুভূতং।" কলাবিদ্যা শিক্ষা করিলে রাজা অমর শক্তি লাভ করিতেন। "সকল কলা পারং গতোঽমরশক্তির্নাম রাজা।" চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার বিষয় শৈবতন্ত্রে বিশেষ-ভাবে লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী শৈবতন্ত্রোক্ত সেই চতুঃষষ্টি কলার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সেই চতুঃষষ্টি কলার নাম; যথা,—"গীতম্ ১ বাদ্যম্ ২ নৃত্যম্ ৩ নাট্যম্ ৪ আলেখ্যম্ ৫ বিশেষকচ্ছেদ্যম্ ৬ তণ্ডুলকুসুমবলিবিকারাঃ ৭ পুষ্পাস্তরণম্ ৮ দশনবসনাঙ্গরাগাঃ ৯ মণিভূমিকাকর্ম্ম ১০ শয়নরচনম্ ১১ উদকবাদ্যম্ ১২ উদকঘাতঃ ১৩ চিত্রাযোগাঃ ১৪ মাল্যগ্রথনবিকল্পাঃ ১৫ শেখরাপীড়যোজনম্ ১৬ নেপথ্যযোগাঃ ১৭ কর্ণপত্রভঙ্গাঃ ১৮ গন্ধযুক্তিঃ ১৯ ভূষণযোজনম্ ২০ ঐন্দ্রজালম্ ২১ কৌচুমারযোগাঃ ২২ হস্তলাঘবম্ ২৩ চিত্রশাকপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া ২৪ পানকরসরাগাসবযোজনম্ ২৫ সূচীবাপকর্ম্মাণি ২৬ সূত্রক্রীড়া ২৭ প্রহেলিকা ২৮ প্রতিমালা ২৯ দুর্ব্বচকযোগাঃ ৩০ পুস্তকবাচনম্ ৩১ নাটিকাখ্যায়িকাদর্শনম্ ৩২ কাব্যসমস্যাপূরণম্ ৩৩ পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্পাঃ ৩৪ তর্কুকর্ম্মাণি ৩৫ তক্ষণম্ ৩৬ বাস্তুবিদ্যা ৩৭ রূপ্যরত্নপরীক্ষা ৩৮ ধাতুবাদঃ ৩৯ মণিরাগজ্ঞানম্ ৪০ আকরজ্ঞানম্ ৪১ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগাঃ ৪২ মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধিঃ ৪৩ শুকসারিকাপ্রলাপনম্ ৪৪ উৎসাদনম্ ৪৫ কেশমার্জ্জন-কৌশলম্ ৪৬ অক্ষরমুষ্টিকাকথনম্ ৪৭ ম্লেচ্ছিতকবিকল্পাঃ ৪৮ দেশভাষাজ্ঞানম্ ৪৯ পুষ্পশকটিকানিমিত্তজ্ঞানম্ ৫০ যন্ত্রমাতৃকা ৫১ ধারণমাতৃকা ৫২ সংপাট্যম্ ৫৩ মানসীকাব্যক্রিয়া ৫৪ ক্রিয়াবিকল্পাঃ ৫৫ ছলিতকযোগাঃ ৫৬ অভিধানকোষছন্দোজ্ঞানম্ ৫৭ বস্ত্রগোপনানি ৫৮ দ্যূতবিশেষঃ ৫৯ আকর্ষক্রীড়া ৬০ বালকক্রীড়নকানি ৬১ বৈনায়িকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্ ৬২ বৈজয়িকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্ ৬৩ বৈতালিকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্ ৬৪। (কচিৎ পুস্তকে সূচীবাপকর্ম্মসূত্রক্রীড়া ইত্যেকং পদং তদুত্তরং বীণাডমরুকবাদ্যানি। বৈতালিকীনামিত্যত্র বৈয়াযিকীনামিতি চ পাঠম্।) ইতি। এই চৌষট্টি কলার স্বরূপ-তত্ত্ব আর উৎকর্ষের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে কোনও বিদ্যায় বা কোনও বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ যে হীন ছিল না, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে

চতুঃষষ্টি কলা।

পারে। চৌষট্টি কলার সকল কলার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু অনেকগুলি কলার স্বরূপ-তত্ত্ব নির্ণয় করাও এখন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং যে কয়েকটী কলা-বিদ্যার অস্তিত্ব এখনও সম্পূর্ণরূপ বিলুপ্ত হয় নাই, এতৎপ্রসঙ্গে সেই কয়েকটী কলা-বিদ্যার বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্য।

প্রথম চারিটি কলা-বিদ্যার নাম—গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্য। জাতি কতদূর সভ্য-সমুন্নত হইলে, এই চারিটি বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। সঙ্গীতের নিদর্শন—বেদ। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ স্বরসংযোগে সাম গান গীত হইত। 'সাম' শব্দেই গীত বুঝাইয়া থাকে। শবর স্বামী কৃত মীমাংসা-দর্শনের ভাষ্যে লিখিত আছে,—"সামশব্দবাচ্যস্য গানস্য স্বরূপমৃগক্ষরেষু ক্রুষ্টাদিভিঃ সপ্তভিঃ স্বরৈঃ অক্ষরবিকারাদিভিশ্চ নিষ্পদ্যতে। ক্রুষ্টঃ প্রথমঃ দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ঃ চতুর্থঃ পঞ্চমঃ ষষ্টশ্চ ইত্যেতে সপ্তস্বরাঃ।" পুরাণে দেখিতে পাই,—"ঋগ্‌ভিঃ পাঠ্যমভূদ্গীতং সামভ্যঃ সমপদ্যত। যজুর্ভ্যোঽভিনয়া যাতা রসাশ্চাথর্ব্বণঃ স্মৃতাঃ॥" বেদগানের সময় হইতেই স ঋ গ ম প্রভৃতি সপ্তস্বরের প্রবর্ত্তনা। সামবেদের একখানি উপবেদ ছিল। তাহার নাম—গান্ধর্ব্ব-বেদ। গান্ধর্ব্ববেদে গীত-বাদ্য-নৃত্য প্রভৃতির বিষয় বিবৃত ছিল। ঐ উপবেদ এখন লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। মহামুনি ভরত ঐ বেদের প্রবর্ত্তনা করেন। গান্ধর্ব্ব-বেদ লোপপ্রাপ্ত হইলেও উহার মত-পরম্পরা পরবর্ত্তি-কালের সঙ্গীতশাস্ত্র-সমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি বাল্মীকির সমসময়ে মহামুনি ভরত সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার সময়ে নাটকাভিনয়ের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। তবে গান্ধর্ব্ববেদ-প্রবর্ত্তক ভরত-মুনি এবং বাল্মীকির সমসাময়িক ভরত-মুনি অভিন্ন কিনা, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। একই নামের বা একই বংশের দুই জন ভরত মুনিরই অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। যাহা হউক, নৃত্য-গীত-বাদ্য-নাট্যাভিনয়—এতৎ-সমুদয় সঙ্গীত-শাস্ত্রেরই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। গীত-বাদ্য-নৃত্য—এ তিনের সাধারণ সংজ্ঞাই তো সঙ্গীত! "গীতবাদিত্রনৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।" গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।" তবে তিনের মধ্যে কণ্ঠ-সঙ্গীতের স্থান প্রধান বলিয়াই সঙ্গীত শব্দে প্রধানতঃ কণ্ঠ-সঙ্গীতকে বুঝাইয়া থাকে। পরন্তু সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদগণ সঙ্গীতকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। তাহার এক ভাগের নাম—কণ্ঠ-সঙ্গীত, অন্য ভাগের নাম—যন্ত্র-সঙ্গীত। শাস্ত্র-মতে নাদই সঙ্গীতের মূল। একাধিক বস্তুর সংঘর্ষে আকাশ হইতে নাদের উৎপত্তি হয়। নাদ দ্বিবিধ;—ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। দুই বস্তুর ঘাত-প্রতিঘাতে যে নাদ উপস্থিত হয়, তাহা ধ্বন্যাত্মক; আর মনুষ্যাদির কণ্ঠ-তালুর ঘাত-প্রতিঘাতে যে স্বর উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ণাত্মক। ইহাই যন্ত্র-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীত। সোমেশ্বর, ভরত, হনুমন্ত, কল্লিনাথ—এক কালে এই চারি জন সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদের প্রসিদ্ধি ছিল। সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের চারি জনের চারি প্রকার মত প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রধানতঃ সাত ভাগে বা সাত

সঙ্গীত প্রসঙ্গ।

অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। সেই সাত অধ্যায়ের নাম,—স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, নৃত্যাধ্যায়, তালাধ্যায়, ভাবাধ্যায়, কোকাধ্যায়, হস্তাধ্যায়। গ্রন্থ-সমূহ এখন লোপ প্রাপ্ত ; সুতরাং কিরূপ পদ্ধতিতে ঐ সকল গ্রন্থে সঙ্গীত-তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আর এখন বুঝিবার উপায় নাই। ঐ সকল গ্রন্থ ভিন্ন, সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এখন তাহার অধিকাংশের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। কয়েক জন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রবিদের নাম এবং তাঁহাদের গ্রন্থাদির পরিচয়,—

গ্রন্থকার।	গ্রন্থ।	গ্রন্থকার।	গ্রন্থ।
শুভঙ্কর	সঙ্গীতদামোদর	শার্ঙ্গদেব	সঙ্গীতরত্নাকর
বীরনারায়ণ	সঙ্গীতনির্ণয়	সিংহভূপাল	সঙ্গীতসুধাকর
হরিভট্ট (১)	সঙ্গীতসার সঙ্গীতার্ণব সঙ্গীতরত্নাবলী	হরিভট্ট (২)	সঙ্গীতদর্পণ রাগমালিকা
শিহ্লন	রাগসর্ব্বস্বসার	হরিনারায়ণ	সঙ্গীতসার নারদসংবাদ নারদপুরাণ রত্নমালা সঙ্গীতকৌস্তুভ
অন্ধকভট্ট	তাণ্ডবতরঙ্গেশ্বর গীতসিদ্ধান্তভাস্কর		
বিশ্বাবসু	ধ্বনিমঞ্জরী রাগার্ণব	দামোদর অবহল	সঙ্গীতদর্পণ সঙ্গীত-পারিজাত

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সঙ্গীত-দামোদর, সঙ্গীত-দর্পণ প্রভৃতির উল্লেখ অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদগণ নির্দ্দেশ করেন, সাতটী কারণে সঙ্গীতের প্রতি আনুরক্তি জন্মিয়া থাকে। "শারীরং নাদসম্ভূতিঃ স্থানানি শ্রুতয়োস্তথা। ততঃ শুদ্ধাঃ স্বরাঃ সপ্ত বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী॥ বাদ্যাদিভেদাশ্চত্বারো রাগোৎপাদনহেতবঃ॥" অর্থাৎ, শরীর-সঞ্চালন, নাদসম্ভূতি, স্থান বা তাল শ্রবণ, শুদ্ধ সপ্তস্বর, বিকৃত দ্বাদশ স্বর, বাদ্যাদি চতুর্ব্বিধ ভেদ প্রভৃতি সঙ্গীতে অনুরাগোৎপত্তির কারণ। শুদ্ধ স্বর সাতটী। সেই সাতটী স্বরের নাম—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। এই সপ্ত-স্বর হইতে রাগরাগিণীর মূল স ঋ গ ম প ধ নি সাতটী সুর গৃহীত হইয়াছে। এই সপ্ত স্বরের উৎপত্তির মূল—সপ্ত-বিধ জন্তুর কণ্ঠস্বর। তবে কোন্ জন্তুর ধ্বনি হইতে কোন্ স্বর গৃহীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে। এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ প্রকাশ,—'ময়ূর, বৃষ, অজ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, কুঞ্জর ও

রাগ ও রাগিণী।

অশ্ব,—এই সাত জন্তুর স্বর হইতে যথাক্রমে স ঋ গ ম প ধ নি সপ্ত স্বর গৃহীত হইয়াছে। এই সাত স্বরের সংযোগের তারতম্যে প্রধানতঃ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর উৎপত্তি হয়। সেই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী হইতে আবার অসংখ্য উপরাগ ও উপরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। 'সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থে * প্রকাশ,—

* সঙ্গীত-দামোদরের উক্তি,—"গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণসন্নিধৌ। তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রানি তু ষোড়শঃ॥" নারদ-সংবাদেও এই উক্তি দৃষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট সঙ্গীত আলাপন সময়ে 'গোপী-গণ' ষোড়শ সহস্র রাগের আলাপন করিয়াছিলেন।' ছয়টী প্রধান রাগের নাম—ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ ও মেঘ। এই সকল রাগের নাম সম্বন্ধেও মতান্তর আছে। রাজপুতানা প্রদেশে কৌশিক নামের পরিবর্ত্তে মালকোষ নাম প্রচলিত। আবার সোমেশ্বর ও কল্লিনাথ প্রভৃতির মতে, শ্রীরাগ, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘ ও নটনারায়ণ—রাগের এই ছয় নাম। নারদ-সংহিতায় মালব, মন্দার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট,—এই ছয়টী প্রধান রাগের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে স ঋ গ ম প ধ নি সাতটী সুরের কথা বলা হইয়াছে। সেই সপ্ত-সুরের সমাবেশ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনাদি অনুসারে এক এক রাগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা,—শ্রীরাগে, স ঋ গ ম প ধ নি স ঋ; ভৈরবে, ধ নি স গ ম ধ; পঞ্চমে, স ঋ গ ম ধ নি স; মেঘে, ধ নি স ঋ গ ম প ধ; নটনারায়ণে, স ঋ গ ম প ধ নি স, ইত্যাদি। ছয় রাগের আশ্রিত ছত্রিশটী রাগিণীর নাম,—শ্রীরাগের মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পহাড়ী; বসন্তের দেশী, দেবগিরি, বরটী, তোড়িকা, ললিতা, হিন্দোলী; ভৈরবের ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, বাঙ্গালী, সৈন্ধবী; পঞ্চমের বিভাষ, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী ও পটমঞ্জরী; মেঘের মন্দারী, সৌরঠী, সারেরী কৌশিকা, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারা; নটনারায়ণের কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, সারঙ্গী, নট্টহাম্বীরা। উল্লিখিত ছত্রিশটী রাগিণী যথাক্রমে প্রোক্ত ছয়টী রাগের পত্নী বলিয়া অভিহিত হয়। 'সঙ্গীত-দর্পণের' মত এইরূপ বটে; কিন্তু অন্য মতে রাগের ও রাগিণীর পর্য্যায় প্রভৃতি বিষয়ে অন্যরূপ লিখিত আছে। হনুমত—ষড়রাগের মধ্যে দীপক রাগকে দ্বিতীয় রাগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সে মতে দেশী, কামোদী, নাটিকা, কেদারী ও কানাড়া এই রাগের আশ্রিতা বা পত্নী বলিয়া অভিহিতা হয়। এই সকল রাগরাগিণীর আবার পুত্র পুত্রবধু-কন্যা-সখা-সহচর প্রভৃতিও আছে। দীপকের পত্নীর বিষয়ে তিন চারি মত দেখা যায়। তাঁহার পুত্র ও সখা প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ মতান্তর আছে। ভরতের মতে, দীপকের পত্নী-গণের নাম—কেদারা, গৌড়ী, গুর্জ্জরী, রুদ্রাণী, গৌরী; পুত্র-গণের নাম—টঙ্ক, কুসুম, নটনারায়ণ, বিহাগরা প্রভৃতি। অন্যমতে, তাঁহার অষ্ট পুত্রের মধ্যে, নট, কানাড়া, খাম্বাজ, মিনু, কেদার প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। ফলতঃ, স্থূলভাবে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ধরিয়া লইলেও, তাহা হইতে যে কত রাগরাগিণীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। কোন্ রস প্রকাশ করিতে হইলে কোন্ প্রকার স্বরের সাহায্য আবশ্যক, সঙ্গীত শাস্ত্রে তাহা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—"স-রী বীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে ধো বীভৎসে ভয়ানকে। কার্য্যো গ-নী তু করুণে হাস্যশৃঙ্গারয়ো মপৌ॥" মূর্চ্ছনা, তান, তাল, মান, গমক প্রভৃতি সঙ্গীতের অঙ্গ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। জ্যোতিষাদির তত্ত্ব-নির্ণয় যেমন গণনাঙ্কে নিষ্পন্ন হয়, তেমনি তাল, মান মূর্চ্ছনা প্রভৃতি দ্বারা রাগরাগিণীর স্বরূপ-তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। উপরে যে রাগ-রাগিণীর বিষয় বলা হইল, সঙ্গীত-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে সেই রাগরাগিণী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গীত হওয়াই প্রশস্ত। এদেশে এক সময়ে সঙ্গীত-বিদ্যার এতই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে, এক এক রাগের শক্তিতে প্রকৃতির

এক এক বিশেষ পরিবর্তন পর্য্যন্ত সাধিত হইত। সঙ্গীত শাস্ত্রে দেখিতে পাই, দীপক রাগ আলাপ করিলে নির্ব্বাপিত দীপ-শিখায় অনল সঞ্চার হইত; সঙ্গীত আলাপকারী সঙ্গীতোৎপন্ন অনলে দগ্ধ হইতেন। এইরূপ, মেঘমল্লার রাগ আলাপ করিলে অনাবৃষ্টির সময়ে আকাশে মেঘের সঞ্চার হইত; বারিবর্ষণে পৃথিবী স্নিগ্ধ হইতেন। ভৈরব-রাগ আলাপনে ঊষার আবির্ভাব হইত; মৃদুমন্দ-গন্ধবাহী বায়ু-সঞ্চারে, বিহঙ্গম-গণের কলরবে এবং প্রভাতের সুখস্পর্শে প্রাণ নাচিয়া উঠিত। হিন্দোল রাগ আলাপনে যেন নব-বসন্তের সমাগম হইত; নবমুকুলিত কুসুমের সৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিত। শ্রীরাগ আলাপ করিলে, প্রদোষ-কালের সমাগম অনুভূত হইত; পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম বিভা বিকাশ পাইত; দিবাবসানে নৈশনীরবতায় যেন সংসার ছাইয়া ফেলিত। মালকোষ রাগ আলাপনে প্রাণের ভিতর অভিনব উত্তেজনা আনয়ন করিত। যেমন এক এক রাগের এক এক প্রকার কার্য্যকারিতা আছে, তেমনি এক একটী রাগিণীরও অভিনব শক্তির পরিচয় পাই। বেহাগ রাগিণীর আলাপনে প্রাণে ঔদাস্যের সঞ্চার হয়, আত্মবিস্মৃতি আনয়ন করে। ঐ রাগিণী নিশীথে নিভৃতে গাহিবার ব্যবস্থা আছে। কেবল বেহাগ রাগিণী বলিয়া নহে, ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিণী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আলাপন করিবার নিয়ম সঙ্গীত-শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাতঃকাল হইতে দিবা এক প্রহরের মধ্যে ভৈরব, মেঘ, বসন্ত, পঞ্চম প্রভৃতি রাগ এবং ভৈরবী, ভূপালী, ধানশ্রী, মল্লারী প্রভৃতি রাগিণী আলাপ করা বিধেয়। দ্বিপ্রহরে গুর্জ্জরী, গুণকিরী এবং ভৈরবী আলাপন করা যায়। তৃতীয় প্রহরের মধ্যে বৈরাটি, তোড়ি, কামোদী প্রভৃতি গেয়। দিবা তৃতীয় প্রহরের পর অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত গৌরী, মালব, কেদারী প্রভৃতি আলাপন করিবার নিয়ম। এ সম্বন্ধে অবশ্য সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। একাধিক সঙ্গীত-শাস্ত্র আলোচনা করিলেই তাহা প্রতীত হইতে পারে। কেবল দিবা-রাত্রির কোন্ সময়ে কোন্ গান গেয়, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াই সঙ্গীত-শাস্ত্র নিরস্ত হন নাই। কোন্ ঋতুতে কোন্ গান বিধেয় সঙ্গীত-শাস্ত্র তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। সে মতে, হেমন্তে সভার্য্যক নটনারায়ণ, শিশিরে সস্ত্রীক শ্রীরাগ, বসন্তে সপত্নীক বসন্ত, গ্রীষ্মে সভার্য্য ভৈরব, শরতে সস্ত্রীক পঞ্চম, বর্ষায় সদার মেঘ রাগ আলাপনের নিয়ম; অর্থাৎ, ষড়্ঋতুতে যথাক্রমে ছয় রাগ ও সেই ছয় রাগের আশ্রিতা রাগিণী গীত হওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন ভিন্ন সুর ও রাগ-রাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাতৃ দেবদেবী আছেন। * সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্গণ রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট রাগ-রাগিণীর অধিষ্ঠাতৃ দেবদেবীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া ঐ সকল রাগ-রাগিণীর আলাপ করিলে, তাহার প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত হইত। সেদিনও মোগল-সম্রাট আকবর বাদসাহের সম্মুখে সঙ্গীতের এই অভিনব ক্ষমতার বিষয় ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ তানসানের নাম সকলেই অবগত আছেন। তানসানের শিক্ষাগুরুর নাম—হরিদাস স্বামী। তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। সঙ্গীত-

* সপ্ত সুরের অধিষ্ঠাতৃ দেবদেবী;—সা অগ্নি, ঋ ব্রহ্মা, গ সরস্বতী, ম মহাদেব, প লক্ষ্মী, ধ গণেশ, নি সূর্য্য।

সাধনার দ্বারা নির্ব্বাণ-লাভ করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তানসান তাঁহাকে একদিন বাদসাহের দরবারে লইয়া আসেন। সেই সময়ে বাদসাহের দরবারে হরিদাস স্বামী দুই একটী রাগ-রাগিণীর আলাপ করিয়াছিলেন; আর হরিদাস স্বামীর সঙ্গীত-আলাপনে রাগরাগিণীর মূর্ত্তি বাদসাহের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। বাদসাহ তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হরিদাস স্বামীর নিকট স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে চাহেন। হরিদাস স্বামী তাহাতে সম্রাট্‌কে বুঝাইয়া দেন, বিজ্ঞান-সম্মত-রূপে রাগ-রাগিণীর আলাপন হইলে, তাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবদেবীরা স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হন। কিংবদন্তী আছে, সঙ্গীত-আলাপনে তানসানও * আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাইতে পারিতেন। অনেক সময় দীপক রাগ আলাপনে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিত; মেঘমল্লার আলাপনের সময় মুষলধারে বৃষ্টি হইত। কিন্তু এখন আর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সঙ্গীতশাস্ত্রের নিয়ম প্রতিপালন করিয়া কোনও সঙ্গীত গীত হয় না। সুতরাং রাগ-রাগিণীর প্রভাবের সার্থকতাও দেখিতে পাই না। সকল বিষয়েই সমান অধঃপতন ঘটিয়াছে। মন্ত্রোচ্চারণে এখন অভীষ্ট ফল লাভ হয় না; সঙ্গীত-আলাপনে সঙ্গীতের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাই না।

শাস্ত্রমতে সঙ্গীত—মুক্তির একটি প্রধান সোপান। "জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটি-গুণং লয়ঃ। লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি।" বেদচতুষ্টয়ের সার সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মা সঙ্গীত-রূপ পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন,—শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই। "পূর্ণং চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ। ইমং তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥" ভগবদুক্তিতে প্রকাশ,—"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিণাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" দেবাদিদেব মহাদেব সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রথম প্রচার করেন বলিয়া প্রকাশ। সেই মহাযোগীর মহাকণ্ঠে ভগবন্মহিমা-কীর্ত্তক যে ধ্বনি প্রথম ধ্বনিত হইয়াছে, সংসারে তাহাই সার-সঙ্গীত। তৎপরে কি প্রকারে সঙ্গীত-বিদ্যা প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে নানা মত প্রচলিত। এক মতে প্রকাশ,—ব্রহ্মা মহাদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভরত, নারদ, তুম্বুরু, হুহু ও রম্ভা,—তাঁহার পাঁচ শিষ্য। তাঁহাদের হইতেই নানা লোকে সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রচারিত হয়। অন্য মতে প্রচার,—যোগীশ্বর মহাদেব, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ভরত, কশ্যপ,

সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রচার।

---

* তানসান গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ-বংশে ৯৫৬ সালে (১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—মকরন্দ পাঁড়ে। তাঁহাদের নিবাস—গোয়ালিয়র প্রদেশে। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে জনৈক মুসলমান-যুবতীর প্রণয়ে পড়িয়া তানসান ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম—রামতনু—পাঁড়ে। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণের পর তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন হয়। ৯৭০ সালে তিনি আকবর বাদসাহের দরবারে গায়ক পদে নিযুক্ত হন। তানসানের গানে সম্রাট আকবর বড়ই মোহিত হইয়াছিলেন। গান শুনিয়া মোহিত হইয়া সম্রাট তাঁহাকে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার দেন এবং তানসান উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই হইতে পূর্ব্ব নাম পূর্ব্ব পরিচয় সকলই লোপ পায়। হিন্দু রামতনু পাঁড়ে মিঞা তানসান বলিয়া পরিচিত হন। ১০০২ সালে (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে) আগরা নগরীতে তানসানের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু-সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী আছে। সাধারণতঃ প্রকাশ,—দীপক রাগ আলাপনের সময় তিনি দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কোহল এবং মতঙ্গ,—ইঁহারা সঙ্গীত-সুধাপানে প্রমত্ত ছিলেন। ইঁহাদের কৃপায় ক্রমশঃ সংসারে সঙ্গীতের সুধাস্রোত প্রবাহিত হয়। সঙ্গীত-পারিজাতের মতে সঙ্গীতের উৎপত্তি,—

"ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাঃ স্যুঃ সঙ্গীতোত্থসুখস্পৃহাঃ। ঐহিকামুষ্মিকে ত্যক্ত্বা দেবর্ষির্নারদঃ সদা॥
ব্রহ্মানন্দোঽপি বীণায়াং বাদনে নিরতোঽভবৎ। দৈত্যসংহারিণী দুর্গা সঙ্গীতাভিরতা সদা॥
মতঙ্গকশ্যপাবাস্তাং সঙ্গীতাভিরুচী মুনী। কর্ত্তা সঙ্গীতশাস্ত্রস্য হনুমাংশ্চ মহাকপিঃ॥
শার্দ্দূলকোহলাবেতৌ সংগীতগ্রন্থকারিণৌ। কম্বলাশ্বতরৌ বায়ুর্হাহা হুহুশ্চ রাবণঃ॥
রম্ভা বাণসুতা চোষা ফাল্গুণঃ ফণিনাং পতিঃ। ইত্যেতেঽন্যেঽপি সঙ্গীতশাস্ত্রব্যাখ্যান কারিণঃ॥"

অন্যমতে, প্রথমে শিবমুখে সঙ্গীতের উৎপত্তি; দেবলোকে দুর্গা ও সরস্বতী কর্ত্তৃক উহা প্রচারিত হয়; নাগলোকে বাসুকি, গন্ধর্ব্বলোকে কলানাথ, সারদল, তুম্বুরু, আশুরো, দেশা, হোহাই, কোহল, হাহা ও হুহু, ঋষিমধ্যে নারদ, ভরত ও কশ্যপ, রক্ষঃ মধ্যে রাবণ, কপি মধ্যে হনুমান এবং মানব মধ্যে অর্জ্জুন সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ, সঙ্গীত-শাস্ত্র ভারতবর্ষের যে অতি প্রাচীন-কালের সম্পৎ, এই সকল উক্তিতে তাহা বেশ প্রতিপন্ন হয়। অমরাবতীতে অমর-সদনে অপ্সরোগণের নৃত্যগীত দূর অতীতের কাহিনী। বাল্মীকির কণ্ঠে রামায়ণ গীত হইয়াছিল; আবার সেই রামায়ণ অযোধ্যার রাজ-সভায় কুশীলব সুরসংযোগে গান করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে গোপাঙ্গনা-গণের কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন,—দ্বাপরে সঙ্গীত-চর্চ্চার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহা-ভারত, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি এতদ্দেশে আধুনিক সঙ্গীতালোচনার এক একটী স্তর বলিলেও বলা যাইতে পারে। মহাবীর আলেক-জাণ্ডারের ভারতাগমনের পর, বৈদেশিক আক্রমণের ঘাত-প্রতিঘাতে সঙ্গীতের চর্চ্চা এদেশে অনেকটা কমিয়া আসে। বৈদেশিক-আক্রমণে ভারতে দেবদেবীর মন্দির যেমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সঙ্গীত-গ্রন্থাদি ও সঙ্গীতের আলোচনাও তৎসহ লোপ পাইয়া আসে। পরিশেষে, বহুদিন পরে, মুসলমান-সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, আর একবার ভারতে সঙ্গীত-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা হয়। মুসলমান বাদসাহগণ প্রথমে সঙ্গীতকে কোরাণ-সরিফের নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাহার ফলেও ভারতের বহু সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ও বহু সঙ্গীত-গ্রন্থ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের কোরাণ-সরিফের 'ডাক নমাজ' প্রকারান্তরে যে সঙ্গীতের আলাপন, বোধ হয়, তখন তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করেন নাই। যাহা হউক, পরিশেষে তাঁহাদের সে ভ্রম-ধারণা বিদূরিত হয়। ফলে, ভারতবর্ষে নূতন নূতন সঙ্গীতবেত্তার আবির্ভাব ঘটে। গিয়াস-উদ্দীন তোগলক যখন দিল্লীর-সিংহাসনে অধিরূঢ়, গোপাল নায়ক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সঙ্গীত-বিদ্যালোচনার বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। সঙ্গীত-বিদ্যায় দিগ্বিজয় করিবার জন্য তিনি দেশ-পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। গোপাল নায়কের অপূর্ব্ব গুণপনার পরিচয় পাইয়া সুলতান গিয়াসউদ্দীন তাঁহাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। প্রকাশ্যভাবে সঙ্গীতালোচনা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া, সুলতান নিভৃতে গোপাল নায়কের সঙ্গীত শ্রবণ করেন। গোপাল নায়ক সঙ্গীতালাপনে বাদসাহকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। বাদসাহের মনে তাহাতে ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল। মুসলমানগণের মধ্যে এমন

গায়ক কেহ কি নাই যে, গোপাল নায়ককে পরাজিত করে? তখন বাদসাহ সেই সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। মুসলমানগণের মধ্যে তখন আমির খসরু সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু সমাজে নিন্দার ভয়ে তিনি প্রকাশ্যে কখনই সঙ্গীতালাপন করিতেন না। গোপাল নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণের জন্য বাদসাহ খসরুকে আদেশ করেন। খসরু গোপাল নায়কের সঙ্গীত-কৌশল শ্রবণ করিয়াছিলেন। বাদসাহের আদেশ পাইয়া খসরু আপনার গুণপনা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলেন। গোপাল নায়ক যে সকল রাগ-রাগিণীর আলাপ করিয়াছিলেন, সেই সকল রাগ-রাগিণীর সামান্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া খসরু বারটী রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার কৃতিত্বে সুলতান গিয়াসউদ্দীন চমকিত হইলেন। গোপাল নায়ক পরাজয় স্বীকার করিলেন। এই হইতে বাদসাহের দরবারে সঙ্গীত-বিদ্যা-লোচনার পথ প্রস্তুত হয়। গোপাল নায়ক এবং খসরু উভয়েই বাদসাহের গায়ক মধ্যে গণ্য হন এবং নানা স্থানের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে দরবারে আনয়ন করিয়া গুণানুসারে তাঁহা-দিগকে সম্মানিত করা হয়। নায়ক, গন্ধর্ব্ব, গুণকার, কালবথ, কওয়াল, আতাই, প্রভৃতি কয়েকটী উপাধি এই সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়। * জাহাঙ্গীর বাদসাহ জগন্নাথ নামক একজন হিন্দু-গায়ককে 'গুণসমুদ্র' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। খসরু-প্রবর্ত্তিত দ্বাদশটী রাগ দ্বাদশ 'মোকামাৎ' নামে প্রসিদ্ধ। পার্শী রাগ এবং হিন্দু রাগ মিশ্রণে উহার সৃষ্টি হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কেহ কেহ বলেন, পার্শীদিগের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই বারটী রাগ এবং চব্বিশটী রাগিণী প্রচলিত ছিল। সেই বারটী রাগ বারটী 'মোকাম' এবং চব্বিশটী রাগিণী চব্বিশটী 'শোভা' নামে পরিচিত। ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের মতে ছয় রাগের প্রত্যেক রাগের আশ্রিতা ছয়টী করিয়া রাগিণী সেই সেই রাগের পত্নী বলিয়া অভিহিত হয়। পারসীক-গণের বারটী মোকামের প্রত্যেকের দুইটী করিয়া 'শোভা'। ভারতীয় রাগ-রাগিণীর যেমন পুত্র-কন্যা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, পারসিক-গণের মোকামের ও শোভার সেইরূপ পুত্র-কন্যা আছে। সেইগুলির সাধারণ নাম গুম্বা। গুম্বার সংখ্যা আটচল্লিশটী। মোকাম, শোভা ও গুম্বা যে ভারতীয় সঙ্গীতের অনুসরণ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। †

* দিল্লীর দরবারে চারি জন হিন্দু এবং পাঁচ জন মুসলমান নায়ক উপাধি পাইয়াছিলেন। মুসলমান পাঁচ জনের নাম—আমীর খসরু, ছুদি খাঁ, দানো, নোহঙ্গা, বকুস্থ। হিন্দু চারি জনের নাম—গোপাল, ভগবান, বৈজুবাওরা ও চোরুজ (চর্জ্জু)। সুরজ খাঁ হেয়াৎ "গন্ধর্ব্ব" উপাধিতে ভূষিত হন। মিঞা তানসান 'গুণাকর' উপাধি লাভ করেন। চতুর্দ্দশ জন 'কালবৎ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তানসানের দুই পুত্র (তরঙ্গ ও সুরৎসেন) এবং লাল খাঁ, নেজামৎ খাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কওয়াল (কাউয়াল) উপাধিধারি-গণের মধ্যে মহম্মদ সা, সদারং হুসেন, কুতবুদ্দিন বাদসাহ প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। 'আতাই' উপাধি-ধারীদিগের মধ্যে আমীর খসরু, মিজ'া আকেল প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। সঙ্গীত-বিদ্যার বিশেষ বিশেষ বিভাগে পারদর্শিতা অনুসারে বাদসাহ সঙ্গীতজ্ঞগণকে এইরূপ উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিতেন।

† দ্বাদশ মোকামের নাম.—রিহাবি, হোসেনী, রাষ্ট, হিজাজ, বুজুগু, কোশাক, ইরাক, ইস্ফাহান, সুবা, খাথ, অঙ্গলা, বসুলিক। সুরজি আরব, সুরজি আজম প্রভৃতি শোভা; বাহারিণ সাৎ, গুফাক, গোলেস্তান প্রভৃতি গুম্বা।

সঙ্গীত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইতে হইলে, অনেক বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয়। জানিতে হয়,—সপ্তস্বরের উচ্চারণ-স্থান, * গ্রাম মূর্চ্ছনা, শ্রুতি, কড়ি, ও কোমল, বাদী সম্বাদী, বিকৃত-স্বর প্রভৃতি। আর জানিবার প্রয়োজন হয়,—তাল, লয়, সোম, মাত্রা, তান। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সঙ্গীত দুই ভাগে বিভক্ত;—যন্ত্র-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীত। যন্ত্র-সঙ্গীতের অপর নাম—বাদ্য। বাদ্য-সংক্রান্ত যন্ত্র-সমূহকে সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সেই চারি শ্রেণীর নাম—শুষির, ঘন, আনদ্ধ ও তত। † "বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনং। ততঃ বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকং॥" যে যন্ত্রের মধ্যে ছিদ্র আছে, অর্থাৎ শিঙ্গা, শঙ্খ, মুরলী প্রভৃতি 'শুষির' সংজ্ঞাভুক্ত। মন্দিরা, করতাল, ঘণ্টা প্রভৃতি 'ঘন' পর্য্যায়ান্তর্গত। তার-সংযুক্ত যন্ত্রাদি অর্থাৎ বীণা, রবাব, সারঙ্গ, তানপুরা প্রভৃতি 'তত' নামে অভিহিত। চর্ম্ম-নির্ম্মিত যন্ত্রাদি অর্থাৎ ঢাক, ঢোল, তবলা, পাখোয়াজ, মুরজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি আনদ্ধ-পর্য্যায়-ভুক্ত। ইহার মধ্যে কোন্ যন্ত্র কখন প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের আদিমত্ব প্রতিপন্ন হয়। মৃদঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে, দেখিতে পাই; যথা—'ত্রিপুরাসুর বধ হইলে দেবগণের নৃত্য-লীলা আরম্ভ হয়। সেই সময় ব্রহ্মা মৃত্তিকা দ্বারা ঐ বাদ্য-যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ত্রিপুরাসুরের রক্তে ধরণী সিক্ত হইলে সেই সিক্ত-মৃত্তিকা দ্বারা মৃদঙ্গ প্রস্তুত হয়। অধুনা-ব্যবহৃত মৃদঙ্গের বর্ণ রক্তিম হওয়া—সেই স্মৃত-রক্তারই কারণ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কত প্রকারের মৃদঙ্গ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহারও বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে। যেমন গীত ও বাদ্যের আদি অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, নৃত্যের আদি নির্ণয় করাও সেইরূপ দুঃসাধ্য। পুরাণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে নৃত্যের বিষয় নানা স্থানে পরিবর্ণিত আছে। ত্রিপুরা-সুর-বধে দেবগণের নৃত্যের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দেবলোকে অপ্সরোদিগের নৃত্য-গীতের বিষয় সর্ব্বজনবিদিত। রামায়ণে রাবণের নৃত্যশালার নর্ত্তকীগণের নৃত্য-গীতের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে নৃত্যের বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণের রাসমঞ্চে গোপীগণ

সঙ্গীতের অঙ্গাদি।

---

* উচ্চারণ-স্থান মূল ও অন্ত্য ভেদে দ্বিবিধ। যথা,—'স' মূল 'দন্ত' অন্ত্য 'কণ্ঠ', 'ঋ'র 'মূর্দ্ধা' ও 'তালু', 'গ'-র 'কণ্ঠ', 'ম'-র ওষ্ঠ এবং 'নাসিকা' ও 'কণ্ঠ', 'প'-র 'ওষ্ঠ', ও 'কণ্ঠ', 'ধ'-র 'দন্ত' ও 'কণ্ঠ', 'নি'-র 'দন্ত' এবং 'নাসিকা' ও তালু'।

† চারি ভাগে বিভক্ত এই সকল বাদ্য-যন্ত্রের মধ্যে আবার বহু প্রকার-ভেদ আছে। 'আনদ্ধ' শব্দের অর্থ (আ+নহ=বন্ধন করা+ত—র্ম্ম অর্থাৎ যে মুখ চর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ) প্রথমতঃ মুরজ, মৃদঙ্গাদি। কিন্তু সভ্য, বাহির্দ্বারিক, সামরিক, গ্রাম্য ও মাঙ্গল্য এই পাঁচ শ্রেণীতে ইহা বিভক্ত। সভ্যযন্ত্র তিন প্রকার—মৃদঙ্গ, তবলা ও ঢোলক; বাহির্দ্বারিক চারি প্রকার—ঢক্কা, ঢোল, নৌবৎ, নাগড়া; সামরিক পাঁচ প্রকার—জগঝম্প, ঢক্কা, তাসা, কাড়া ও দামামা; গ্রাম্য আট প্রকার—ডুগডুকি, খোদক, মাদল, জোরঘাই, খঞ্জনী, ডমরু, হুড়কা ও ঘটুক; মাঙ্গল্য পাঁচ প্রকার—টিকারা, কাড়া, নাগড়া, ডক্ক ও খোল। ঘন শব্দে করতাল, মন্দিরা, ঘণ্টা, ঘুমুর প্রভৃতি ধাতুময় বাদ্য-যন্ত্র বুঝাইয়া থাকে। শুষির শব্দে সছিদ্র রন্ধ্রযুক্ত অর্থ প্রতীত হয়, অথবা যে সকল যন্ত্র ফুৎকার দ্বারা বাদিত হয়; যেমন বংশী, শঙ্খ ইত্যাদি। তত শব্দ—তন্ত্র শব্দজ; তারাদি দ্বারা যে সকল যন্ত্র বাদিত হয়, তাহাই তত। বীণা, সারঙ্গী, এস্রাজ, সেতার, তানপুরা, বেহালা ইত্যাদি।

নৃত্য করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন প্রসিদ্ধ নর্ত্তক ছিলেন। বিরাটরাজ-গৃহে বৃহন্নলা নাম গ্রহণে তিনি বিরাট-রাজকন্যাদিগকে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন। গীত, বাদ্য, নৃত্য তিনই মানুষের জন্মসহচর। প্রাচীন ঋষিগণ নৃত্যকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। দুই প্রকার নৃত্যের নাম—তাণ্ডব ও লাস্য। তাণ্ডব পুরুষের নৃত্য এবং লাস্য স্ত্রীলোকের নৃত্য। তাণ্ডব ও লাস্য আবার দুই দুই ভাগে বিভক্ত। দুই প্রকার তাণ্ডবের নাম পেবলি ও বহুরূপ। দুই প্রকার লাস্য নৃত্যের নাম—ছুরিত ও যৌবত। নৃত্যের এই কয় ভাগ হইতে আবার নানা উপবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন্ নৃত্যে কিরূপ অঙ্গভঙ্গী প্রয়োজন, কোন্ নৃত্যে কিরূপ শরীর-সঞ্চালনের আবশ্যক, সঙ্গীতশাস্ত্র সমূহে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিবৃত হইয়াছে। লাস্য নৃত্যান্তর্গত ছুরিত ও দৈবত নৃত্য সম্বন্ধে সঙ্গীত-দামোদরের উক্তি,—

"যত্রাভিনয়নৈর্ভাবরসৈরশ্লেষ চুম্বনৈঃ। নায়িকানায়কৌ রঙ্গে নৃত্যতশ্ছুরিতং হি তৎ;
মধুরং বহুলীলাভির্নটীভির্যত্র নৃত্যতে। বশীকরণবিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতম্॥"

অর্থাৎ যে নৃত্যের সময় নায়ক নায়িকা নয়নে নয়ন মিলন করিয়া চুম্বনাদি করে, সে নৃত্যের নাম ছুরিত নৃত্য। আর যে নৃত্যে নর্ত্তকী একাকিনী নৃত্য করিয়া অপরের মনোহরণের চেষ্টা পায়, তাহার নাম যৌবত নৃত্য। এতদ্ভিন্ন আর যে সকল নৃত্য-প্রণালীর বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে রজ্জুর উপর নৃত্য, শস্ত্রসঙ্কট নৃত্য প্রভৃতি—বিষম নৃত্য নামে অভিহিত। নৃত্য-কালে বেশভূষাদির পরিবর্ত্তন বিকট নৃত্য নামে এবং উত্তপ্লুত গতিবিশিষ্ট নৃত্য লঘু নৃত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গীত, বাদ্য ও নৃত্য—সঙ্গীতের এই তিন অঙ্গের মধ্যে কোথাও সুর, কোথাও তাল, আর কোথাও বা সুর ও তাল উভয়েরই প্রয়োজন। এক শ্রেণীর বাদ্যে—মৃদঙ্গ প্রভৃতিতে এবং নৃত্যে তালের বিশেষ আবশ্যক। এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে সুরের বিশেষ প্রয়োজন। অথচ, সর্ব্বত্রই তালের ও সুরের পারস্পারিক সম্বন্ধ আছে। সঙ্গীতে যেমন সুরের প্রয়োজন, তেমনি তালেরও প্রয়োজন। বাদ্যের ও তালের সঙ্গে সুরের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। সুর যেমন নানা রাগ-রাগিণীতে বিভক্ত হইয়া নানা আকারে পরিণত হইয়া থাকে, তালেরও সেইরূপ নানা প্রকার-ভেদ দৃষ্ট হয়। তাল শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কৌতুককর কাহিনী প্রচারিত আছে। হরপার্ব্বতীর নৃত্যকালে তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের আদ্যক্ষরদ্বয় লইয়া 'তালা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাই তালের আদি। এখনও একতালা, চৌতালা, তেতালা প্রভৃতি শব্দের 'তালা' শব্দে অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। তাল শব্দে স্থূলতঃ বিরাম-স্থান বুঝাইতে পারে। কবিতার মধ্যে যেমন যতি, গানের মধ্যে সেইরূপ তাল। কৃষ্ণাষ্টকের দুইটী চরণ উদ্ধৃত করিয়া, তালের সমাবেশ প্রদর্শনের চেষ্টা পাইতেছি। যথা,—

"নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং রসসাগর-নাগর ভূপবরং।
শুভবঙ্কিম চারুশিখণ্ডশিখং ভজকৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং॥"

যাঁহাদের একটু সামান্য ছন্দঃ-জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, শ্লোকের ঐ দুই পংক্তিতে দুইটী চরণে বারটী স্থানে যতি আছে। সুতরাং সুরে যদি উহা গাহিতে হয়, বারটী স্থানে বারটি তাল পড়িতে পারে। এই প্রকার ছন্দের যতি যেমন বিভিন্ন

স্থানে পড়িতে পারে, তালও সেইরূপ বিভিন্ন-রূপ হইয়া থাকে। তালের ও সুরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, কাল-পরিমাণ বুঝিতে হয়। কাল-পরিমাণ বুঝিয়া সম, বিষম, অতীত, অনাঘাত প্রভৃতি তালের অঙ্গের বিষয় অনুধাবন করা আবশ্যক। গায়কের যেখানে বিরাম-স্থান, বাদকেরও সেইখানে বিরাম-স্থান; তাহারই নাম—'সম'। এই সম রক্ষা করিতে না পারিলে, সুরে ও তালে 'বিষম' হইয়া পড়ে। তালের পূর্ব্বে বা পরে গানের আরম্ভ বা শেষ হইলে, তাহা যথাক্রমে অতীত ও অনাঘাত অর্থাৎ 'বেতালা' হয়। তাল বহুবিধ; তন্মধ্যে ষোলটী তাল প্রধান। যথা,—একতালা, ঢিমে-তেতালা, জলদ-তেতালা বা কাওয়ালী, তেওরা, ঝাঁপতাল, আড়া-চৌতাল বা ছোট চৌতাল, বড় চৌতাল, সুরফাকতাল, সোয়ারী, ফরদস্ত, ঠুংরি, পোস্তা, মধ্যমান প্রভৃতি। সঙ্গীত-শাস্ত্রে তিন শত ষাটের অধিক তালের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে যাহা সচরাচর প্রচলিত, তাহারই কয়েকটী উপরে উল্লিখিত হইল। নৃত্য-গীত-বাদ্য সুর-লয়-তাল সংযোগে যুগপৎ আলাপিত হওয়ার বহুল দৃষ্টান্ত শাস্ত্র-গ্রন্থে দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক একটী উপমায় এ পরিচয় কি সুন্দর পরিস্ফুট! যথা,—

"ধীরো ন মুহ্যতি মুকুন্দনিবিষ্টচেতা। পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়েক্ষণতৎপরোঽপি॥
সঙ্গীত-বাদ্য-লয়-তালবশম্ গতাপি। মৌলিস্থ-কুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥"

সকল দেশের সকল মনুষ্য-সমাজেই গীত-বাদ্য-নৃত্য আদি-কাল হইতে প্রচলিত। সভ্য-অসভ্য সকল সমাজের মধ্যেই গীত-বাদ্য-নৃত্যের প্রচলন দেখিতে পাই। তবে যাঁহারা যত সভ্য ও সমুন্নত, তাঁহাদের নৃত্য-গীত-বাদ্য ততদূর বিজ্ঞান-সম্মত।

সঙ্গীত-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক-ভিত্তি।

ভারতবর্ষ সঙ্গীত-বিদ্যা বিষয়ে এতই উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সঙ্গীত-বিদ্যা ভারতবর্ষে এতই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, এখনও তাহার যে শেষ-স্মৃতি আছে, অনেক সভ্যজাতি তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্‌ হিন্দু-দিগের সঙ্গীত-বিদ্যার সহিত ইউরোপের সঙ্গীত-বিদ্যার তুলনায় সমালোচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—'আমাদের অর্থাৎ ইংরেজ-দিগের সঙ্গীত-বিজ্ঞানের অপেক্ষাও ভারতবর্ষের সঙ্গীত-বিজ্ঞান অধিকতর সুশৃঙ্খলাবদ্ধ।' 'হিন্দু মাইথলজি' গ্রন্থের ভূমিকায় মিঃ কোলম্যান, স্যর উইলিয়ম জোন্সের মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। * হিন্দুদিগের আবিষ্কৃত স ঋ গ ম প ধ নি সপ্ত স্বরের আদর্শে প্রথমে পারসিক-গণের মধ্যে, তৎপরে আরবে এবং পরিশেষে ইউরোপে সুরের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। † খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইটালীর টাস্কানি-প্রদেশের গুইডো ডি-আরেজো ইউরোপে এতাদৃশ সপ্ত সুরের প্রবর্ত্তনা করেন। স্যর উইলিয়ম হাণ্টার এবং অধ্যাপক ওয়েবার অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ‡

---

* *Vide*, Coleman's *Hindu Mythology*, Preface.

† ভারতের নিকট হইতে পারসিক-গণ সঙ্গীত-বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন, তাহার নানা নিদর্শন আছে। সেদিনও পারস্যের সম্রাট বেহ্রামের দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ-গণের বিদ্যমানতার বিষয় ইতিহাসে দেখিতে পাই।

‡ "A regular system of notation was worked out before the age of Panini,

বহুকাল পূর্ব্বে ষ্ট্রাবো লিখিয়া গিয়াছিলেন,—'গ্রীস-দেশে প্রচার, সঙ্গীত-বিজ্ঞানের অধিকাংশ তত্ত্বই ভারতবর্ষ হইতে গ্রীস প্রাপ্ত হইয়াছে।' প্রাচীন জাতিদিগের সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থে মিঃ হুইটেন ভারতবর্ষে রাগরাগিণীর অপূর্ব্ব কার্য্যকারিতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ,—'গোপাল নায়ক নামক জনৈক গায়ককে সম্রাট আকবর দীপক রাগ আলাপন করিতে বলেন। দীপক রাগ আলাপনে রাগানলে দেহ ভস্মীভূত হইবে বুঝিয়া, গোপাল নায়ক যমুনা-নদীতে গমন করেন এবং আকণ্ঠ জলমগ্ন থাকিয়া দীপক রাগ আলাপনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রাণরক্ষা হয় নাই; রাগানলে তাঁহার দেহ জলমধ্যেই ভস্মীভূত হইয়াছিল।' ঐ গ্রন্থে আরও প্রকাশ,—'সম্রাট আকবরের আদেশে একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে তানসান শ্রীরাগের আলাপন করিয়াছিলেন। সেই শ্রীরাগ আলাপনের ফলে, প্রাসাদে এবং যতদূর তানসানের সঙ্গীত-স্বর শুনা গিয়াছিল—ততদূর পর্য্যন্ত, নৈশ-অন্ধকারে আবৃত হইয়াছিল।' * দীপক রাগ আলাপনে তানসানের মৃত্যু হয়, এ উপাখ্যান সর্ব্বজনবিদিত। কথিত হয়, সম্রাটের গায়কগণের মধ্যে বৈজু বাওরা তানসানের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তিনি এক দিন আকবরকে বলিয়াছিলেন,—'তানসান যদি দীপক রাগের আলাপন করেন, তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে।' এই সংবাদে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সম্রাট আকবর একদিন তানসানকে দীপক রাগ আলাপ করিতে বলেন। দীপক-রাগ-আলাপনে প্রাণনাশ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া, তানসান আপত্তি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট সে আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। সম্রাট বলিয়াছিলেন,—'যদি অগ্নির উৎপত্তি হয়, আমি জলসেচনে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিব।' তানসান তাহাতে সম্রাটকে বুঝাইয়া বলেন,—'সম্রাট! জলসেচনে সে অনল নির্ব্বাপিত হইবে না। তবে যদি বৈজু বাওরা মেঘমল্লার আলাপন করিয়া বারিবর্ষণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার জীবন রক্ষা হইলেও হইতে পারে।' অবশেষে তাহাই স্থির হয়। বৈজু বাওরাকে মেঘমল্লার আলাপনের জন্য সম্রাট আদেশ করেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সঙ্গীতালাপন আরম্ভ হইলে, তানসানের দীপক রাগ আলাপনের সঙ্গে সঙ্গে, ভীষণ বহ্নি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তানসানকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। বৈজু বাওরা যথাশক্তি মেঘমল্লার আলাপন করিলেন; ঘনঘটায় গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; বিদ্যুৎ ও বজ্রনিনাদে ধরণী কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু বারিবর্ষণ হইল না। বৈজু বাওরার মন ঈর্ষা-কলুষিত ছিল; সুতরাং তাঁহার অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি রাগের পূর্ণ-আলাপে সমর্থ হইলেন না। ফলে তানসান অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। সম্রাটের

---

and seven notes were distinguished by their initial letters. This notation passed from the Brahmins through the Persians to Arabia and was thence introduced into European music by Guido de Arizzo at the beginning of the eleventh century."—Sir W. W. Hunter, *Indian Gazetteer.* Vide, also Weber's *Indian Literature.*

* Mr. Whitten, *Music of the Ancients.*

এবং তাঁহার পারিষদবর্গের ক্ষোভের অবধি রহিল না। এ সকল বিবরণ অধুনা অতি-রঞ্জিত বলিয়া মনে হইলেও * ভারতবর্ষ এক সময়ে যে সঙ্গীতালোচনায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, এই সকল ঘটনার উল্লেখে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

প্রাচীন ভারতে নাট্যাভিনয়।

সঙ্গীতের উৎপত্তির যেমন আদি অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, নাট্যোৎপত্তির আদিনির্ণয়ও সেইরূপ দুঃসাধ্য। ইন্দ্রের প্রার্থনায় ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা নাট্যশালা রচনা করেন, শিব ও পার্ব্বতী নৃত্যকলা শিক্ষা দেন, আর মহর্ষি ভরতের উপর নাট্যশালা পরিচালনের ভার ন্যস্ত হয়। সেই ভরতই আদি ভরত; তাঁহা হইতেই নাট্যকলা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাই নাট্যোৎ-পত্তির পৌরাণিক ইতিহাস। সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থেও নাটক-প্রচারের এই মর্ম্মের ইতিহাসই প্রচারিত আছে। † ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তে উত্তর-প্রত্যুত্তর দৃষ্ট হয়। ‡ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন,—তাহাই নাট্যোৎপত্তির আদিভূত। § ঐ সকল সূক্তের ঋক্‌গুলি স্বর-সংযোগে গীত হইত; নাটক বা নাটিকা তাহারই রূপান্তর। অপিচ, ঋগ্বেদের নানা স্থানে নর্ত্তকীর ও গায়কের উপমা দৃষ্টে (প্রথম মণ্ডলের ৯২ম সূক্তে 'উষা নর্ত্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন' ইত্যাদি বাক্যে) নৃত্য-গীতাদি প্রচলনের বিষয় অনুভূত হয়। অথর্ব্ব-বেদে মর্ত্ত্যলোকে নৃত্য-গীতের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে নৃত্যগীতকারিদিগের প্রতি রমণীগণের আসক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩।৫।৩৩) ও অনুপদ-সূত্র প্রভৃতি বৈদিক-গ্রন্থে শিলালির উল্লেখ আছে। শিলালি একজন নটসূত্রকার। পাণিনির সূত্রে শিলালি, কৃশাশ্ব প্রভৃতি নট-সূত্রকারগণের নাম দৃষ্ট হয়। "পারাশর্য্য-শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ। "কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিভিঃ॥ (পাণিনি ৪।৩।১১০-১১১) শিলালি ও কৃশাশ্ব শব্দদ্বয় হইতে শৈলাল ও কার্শাশ্ব শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি। ঐ দুই শব্দে নট বুঝাইয়া থাকে। মহর্ষি কাত্যায়ন কৃত 'বার্ত্তিকে' শৈশাল শব্দ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন,—শিলালি অন্যূন চারি সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের নটসূত্রকার। বাজসনেয়

* অল্পদিন হইল মওলা বক্স নামক একজন গায়ক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার রাগ-আলাপনের প্রভাবে ফুলের কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হইত। যাঁহারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন।

† এতদ্বিষয়ে সঙ্গীত-দামোদরের উক্তি,—

"ইহানুশ্রূয়তে ব্রহ্মা শক্রেণাভ্যর্থিতঃ পুরা। চকারাকৃষ্য বেদেভ্যো নাট্যবেদন্তু পঞ্চমম্॥
উপবেদোঽথ বেদাশ্চ চত্বারঃ কথিতাঃ স্মৃতৌ। তত্রোপবেদঃ গন্ধর্ব্বশিবেনোক্তঃ স্বয়ম্ভুবে॥
তেনাপি ভরতায়োক্তস্তেন মর্ত্ত্যে প্রচারিতঃ। শিবাঞ্চ যোনি ভরতাস্তস্তাদস্ত প্রয়োজকাঃ॥

‡ ঋগ্বেদের চৌদ্দটী সূক্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরের আকারে গ্রথিত। প্রথম মণ্ডলের ১৬৫ম, ১৭০ম, ১৭৯ম; তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩শ, চতুর্থ মণ্ডলের ১৮শ, সপ্তম মণ্ডলের ৩৩শ, অষ্টম মণ্ডলের ১০০ম এবং দশম মণ্ডলের ১০ম, ২৮শ, ৫১শ, ৫০শ, ৮৬শ, ৯৫শ ও ১০৮ম সূক্ত-সমূহে এই কথোপকথন দৃষ্ট হয়।

§ প্রথম মণ্ডলের ১৬৫ম সূক্ত ইন্দ্র, অগস্ত্য ও মরুদ্গণের কথোপকথন ছলে লিখিত। এই সূক্তটী দেখিয়া ম্যাক্সমূলার অনুমান করেন, উহা দৃশ্য-কাব্যের মূলীভূত। দেবগণের সম্মানার্থ যজ্ঞারম্ভ হইলে 'কোরসের' আকারে সমবেত কণ্ঠে এই সূক্তটী উচ্চারিত হইত; অথবা, কেহ বা ইন্দ্রের অংশ, কেহ বা মরুতের অংশ গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিতেন।

সংহিতায় সূত ও শৈলূষ শব্দ দৃষ্ট হয়। যথা,—"নৃত্যায় সূতং গীতায় শৈলূষং ধর্ম্মায়সভাচরং।" শৈলূষ (সৈলূষ) শব্দে নট বুঝায়। শৈলূষিকী, শৈলূষিক প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থেই ব্যবহৃত। * নাট্যাভিনয়-প্রথার প্রাচীনত্বের আর এক নিদর্শন—মনুসংহিতায় নট জাতির উল্লেখ। † ভরত, ভারত, কুশীলব, শৈলালী প্রভৃতি শব্দে নট অর্থ সূচিত হয়। ভরত নাটকের প্রবর্ত্তক ছিলেন বলিয়া এবং রামায়ণ গানে কুশীলবের নাট্যাভিনয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া, ঐ সকল শব্দের ঐরূপ অর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রামায়ণে, মহাভারতে এবং হরিবংশে নাট্যাভিনয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বাল্মীকির রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে একোনসপ্ততিতম সর্গে লিখিত আছে,—"বাদয়ন্তি তদাশান্তিং লাসয়ন্ত্যপিচাপরে। নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ॥" শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের পর দশরথের লোকান্তর সংবাদ লইয়া অযোধ্যার দূত যে রাত্রে ভরতের মাতুলালয়ে উপনীত হয়, সেই রাত্রে নানা অশুভ স্বপ্ন-সন্দর্শনে ভরত বড়ই চিন্তিত ও পরিতপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার শান্তির জন্য কেহ মনোহর বাদ্য, কেহ নৃত্য, কেহ বা বিবিধ নাটক ও প্রহসনের অভিনয় করিয়াছিলেন। রামায়ণের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে সেই বিষয় বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রামায়ণের এই শ্লোকে গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্য সকল বিষয়েরই বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণের অন্যান্য স্থানেও এ সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। আদিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে অযোধ্যা নগরীর বর্ণন-প্রসঙ্গে নগরে সূত-মাগধ প্রভৃতি গায়ক-সম্প্রদায়ের বসবাসের বিষয় এবং দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পনঘ সকল মুহুর্মুহু ধ্বনিত হওয়ার বিষয় লিখিত আছে। গীত বাদ্যের আলোচনা প্রভৃতির জন্য অযোধ্যা-নগরী যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, ঐ সকল স্থলে তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাভারতেও এবম্বিধ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় 'তাললয়বিশারদ গীতবাদিত্রকুশল, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নিত্য সন্নিহিত থাকিতেন। লয়স্থানে ও প্রমাণে সুনিপুণ মহামনা কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ তুম্বুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দিব্যতান দ্বারা যথানিয়মে গান করত পাণ্ডুপুত্র ও ঋষিদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন।' মহাভারতের সভাপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে এতদ্বিষয় লিখিত আছে। রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্য আদর্শ লইয়া নাটকাদি রচিত হইত, হরিবংশে এতদুল্লেখ দৃষ্ট হয়। "রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দেশং নাটকীকৃতং॥" ইত্যাদি। মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—'শত্রুজিত রাজার পুত্র গীত-শ্রবণে ও নাটক-শ্রবণে অনুরাগী ছিলেন। তিনি কখনও কাব্যকলার আলোচনা করিতেন, কখনও গীত ও নাটকে দত্তমানস থাকিতেন।' "কদাচিৎ কাব্যসংলাপো গীতনাটকসম্ভবৈঃ।" অগ্নিপুরাণে 'নাটক-নিরূপণ' অধ্যায়ে নাটকের লক্ষণাদি পরিবর্ণিত রহিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ,—'নাটক, প্রকরণ, ডিম, ঈহামৃগ, সম, বকার, প্রহসন, ব্যায়োঘ, ভাণ, বীথি, অঙ্ক, নাটক এবং নাটিকা, শট্টক, শিল্পক, দুর্ম্মল্লিকা, প্রস্থান,

* "শৈলূষঃ নটঃ ইত্যমরঃ"। 'তালধারক ইতি শব্দরত্নাবলী'। শৈলূষিকঃ—"নৃত্যান্বেষী নটানান্ত স তু শৈলূষিকঃ স্মৃতঃ" ইতি ব্রহ্মপুরাণোক্তং।

† মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ১২শ শ্লোক। 'নটশ্চ করণশ্চ' ইত্যাদি।

ভাণিকা, ভাণী, গোষ্ঠী, হল্লীশক, কাব্য, নিগদিত, নাট্যবাসক, উল্লাপন, প্রেঙ্খন,—ইত্যাদি সপ্তবিংশতি প্রকার অভিনয়ের রূপ; অর্থাৎ, সপ্তবিংশতি প্রকারের দৃশ্য-নাটক অভিনীত হইত ইহাতে তাহাই বুঝা যায়। অধুনা নাটক প্রহসন, নাটিকা প্রভৃতি ভিন্ন অন্যান্য অস্তিত্ব প্রায়ই লোপ পাইয়াছে। "সাহিত্য-দর্পণ" দৃশ্যকাব্যকে (বা নাটককে) দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেই দুই ভাগের নাম রূপক ও উপরূপক। রূপক দশবিধ, উপরূপক অষ্টাদশ-বিধ। এই সকল দৃশ্য-কাব্যের লক্ষণাদির বিষয় সাহিত্য-দর্পণে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত আছে।

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্। বিলাসর্দ্ধ্যাদি গুণবদ্ যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ॥
সুখদুঃখসমুদ্ভূতি নানারসনিরন্তরম্। পঞ্চাধিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্। দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নায়কো মতঃ॥
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা। অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্ব্বে কার্য্যং নির্ব্বহণেঽদ্ভুতম্॥
চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্য্যব্যাপৃত পুরুষাঃ। গোপুচ্ছাগ্রসমগ্রন্তু বন্ধনং তস্য কীর্ত্তিতম্॥"

'প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত অবলম্বনে নাটক লিখিত হয়। নাটক পঞ্চসন্ধি-সমন্বিত, বিলাসাদি গুণযুক্ত, নানা-বিভূতিভূষিত, সুখদুঃখোৎপাদক এবং নানা-রসপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। পাঁচ অঙ্ক হইতে দশ অঙ্ক পর্য্যন্তে নাটক সমাপ্ত হইতে পারে। নাটকের নায়ক বিখ্যাতবংশজ, রাজর্ষি, ধীর, উদাত্ত, মহাপ্রতাপশালী এবং দিব্যগুণ-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। অন্যান্য নানা রসের মধ্যে শৃঙ্গার বা বীর রসই নাটকের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিবে। চারি পাঁচ জন প্রধান ব্যক্তি বা অভিনেতা নাট্যাভিনয় কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন। গোপুচ্ছের ন্যায় অর্থাৎ কোনটী ছোট কোনটী বড় ইত্যাদি ক্রমে নাটকের অঙ্কাদি সজ্জিত হইবে।' স্থূলতঃ এইভাবে নাটকের লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া আলঙ্কারিক-গণ বিবিধ দৃশ্য-কাব্যের প্রকার-ভেদের পরিচয় দিয়াছেন। গৌতম-বুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সময়ে নাট্যাভিনয় সাধারণ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত ছিল। 'এসিয়াটিক রিসার্চ্চ' পত্রে অধ্যাপক লাসেন এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। * মোদ্গল্যায়ন, কাত্যায়ন, উপতিস্য প্রভৃতি প্রমুখ বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ নাটকাভিনয় করিতেন, বৌদ্ধ-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর প্রভৃতি কালের নাট্য-সাহিত্য এখন আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। সর্ব্ববিধ্বংসী কালের বিষম আবর্ত্তনে সে সকলই এখন লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। অথবা, তৎসমুদায়ের যাহা কিছু শেষ নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির প্রতিভা-প্রভাবে তাহাও বিমলিন হইয়া পড়িয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি এখন ভারতের নাট্য-সাহিত্যের আদর্শ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। কালিদাসের শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি পৃথিবীর নাট্য-সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। ভবভূতির মালতীমাধব এবং উত্তররামচরিত,—কালিদাসের গ্রন্থের ন্যায়ই প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার, কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থও ভারতে নাট্য-সাহিত্যের উন্নতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কালিদাস প্রভৃতির পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে নাট্য-সাহিত্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন,

* *Asiatic Researches* Vol. XX.

তন্মধ্যে দণ্ডী সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। দশকুমারচরিত ও কাব্যাদর্শ নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা বলিয়া তিনি পরিচিত। কেহ কেহ মৃচ্ছকটিক নাটক তাঁহার রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তবে দণ্ডী যে একজন বিখ্যাত কবি-নাট্যকার ছিলেন, একটী উদ্ভট শ্লোকে তাহা সপ্রমাণ হয়। শ্লোকটী এই,—

"জাতে জগতি বাল্মীকে কবিরিত্যভিধীয়তে। কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়িদণ্ডিনি॥"

জগতে বাল্মীকির জন্ম-গ্রহণ (একবচনান্ত) 'কবি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহার পর বেদব্যাসের আবির্ভাবে (দ্বিবচনান্ত) 'কবী' দুই জন হন। দণ্ডীর আবির্ভাবে (বহুবচনান্ত) 'কবয়' অর্থাৎ জগতে 'কবি'-নামধেয় তিন জনের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষে এক সময়ে নাট্য-সাহিত্যের এতই শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল যে, ইউরোপ এখনও পর্য্যন্ত তাহার সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে কি না, সন্দেহ। স্যর উইলিয়ম জোন্স্ তাই বলিয়া গিয়াছেন,—'বর্ত্তমান ইউরোপের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গেলে, যে কোনও জাতির যত বড় ইতিহাসই লিখিত হউক না কেন, প্রাচীন-ভারতবর্ষের নট্য-সাহিত্যের ইতিহাস লিখিত হইলে, কথনই তদপেক্ষা ন্যূন হইবে না।'

প্রাচীন-ভারতের গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে অন্যান্য দেশে গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ঐ সকল কলা-বিদ্যা প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। সভ্য-অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই নৃত্য-গীত-বাদ্য বা নাট্য একরূপে না একরূপে অবস্থিত আছে। তবে যাঁহাদের নৃত্য-গীত-বাদ্য বৈজ্ঞানিক-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁহাদের সহিতই ভারতের তুলনা করিতেছি। গীত-বাদ্যের যন্ত্র-সমূহ প্রকারান্তরে সকল জাতির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল ও আছে। মিশরের স্তম্ভ-সমূহের গাত্রে নানারূপ বাদ্য-যন্ত্রের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন-মিশরে গীত-বাদ্যের প্রচলন বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। আর তাহাতেই পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকে মিশরকেই সঙ্গীতের আদিক্ষেত্র বলিয়া অনুমান করেন। প্রাচীন হিব্রু-দিগের মধ্যে সুর ও ছন্দঃ প্রচলিত ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইবেলে সলোমনের গান আছে। তাহাই পাশ্চাত্য-দেশে সঙ্গীতের আদি বলিয়া কথিত হয়। 'জেনিসিসে' কথোপকথনের উদাহরণ দেখিতে পাই। তাহাই পাশ্চাত্য-দেশে নাটকের আদি বলিয়া অভিহিত হয়। গ্রীসে সঙ্গীতের এবং নাট্য-সাহিত্যের যখন আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন হইতেই পাশ্চাত্য-দেশে নৃত্য-গীত-বাদ্যে সুর-তাল-লয়ের শৃঙ্খলা-রক্ষার চেষ্টা চলিতে থাকে। গ্রীকগণই প্রথমে সঙ্গীতের যতি, বিরাম প্রভৃতির প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-দেশে সপ্ত-সুরের প্রবর্ত্তক বলিয়াও তাঁহারা অভিহিত। গ্রীকদিগের নিকট হইতে রোম সঙ্গীত-শাস্ত্রের মূল-তত্ত্ব প্রাপ্ত হন। ইউরোপে এখন যে সুরের প্রচলন, তাহা গ্রেগরি-দি-গ্রেট এবং সেণ্ট আম্বোর্সের প্রবর্ত্তনা। ধর্ম্মালয়ে সঙ্গীতালাপন উপলক্ষেই তাঁহারা সঙ্গীতের সুর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আরেজো সহরের গুইডো তদ্বিষয়ে নানা উন্নতি সাধন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলোন সহরের ফ্রাঙ্কো স্বরের

পাশ্চাত্যের গীত-বাদ্য-নাট্য।

মাত্রা-পরিমাণ প্রথম নির্দ্দেশ করিয়া দেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লাণ্ডার্স সহরে জোস্কুইন ডেপ্রে কর্ত্তৃক সঙ্গীত-বিজ্ঞানের বহু উন্নতি সাধিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্যালেষ্টিনা রোম-নগরীতে সঙ্গীত-চর্চ্চার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সঙ্গীত-বিজ্ঞান বুঝাইতে আরম্ভ করেন। এই সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্য-দেশে সঙ্গীত-বিজ্ঞানের সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন পূর্ণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ভারতীয় সঙ্গীতের মূল যেমন সপ্ত-স্বর, ইউরোপীয় সঙ্গীতেরও মূল তেমনই সপ্তস্বর। তাঁহাদের সেই সপ্ত স্বরের নাম—সি, ডি, ই, এফ, জি, এ, বি। উচ্চারণ—ডো, রি, মি, ফা, সল, লা, সি। ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত পার্থক্য এই যে, ইউরোপীয়-গণ বি স্বরের পর একটা দীর্ঘ সি যোগ করিয়া লন। এইরূপে তাঁহাদের যে আটটি স্বর হয়, সেই আটটি স্বরে তাঁহাদের একটি 'অক্টেভ' হইয়া থাকে। ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রে উদারা, মুদারা, তারা—স্বরের এই তিনটি গ্রাম আছে। ইউরোপীয় সঙ্গীতে তেমনি বাস, টেনর ও ট্রিব্‌ল্ (পূর্ব্বনাম সোপ্রানো) নামে তিনটি গ্রামের নাম দৃষ্ট হয়। ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের সহিত পাশ্চাত্য-দেশের সঙ্গীত-বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে যেরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাই, প্রাচ্য চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গীতালোচনার মধ্যেও সেইরূপ নানা সাদৃশ্য আছে। আমাদের ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ প্রভৃতি চীনাদিগের মধ্যে বিভিন্ন নামে পরিচিত। চীনাদিগের মতে ষড়জ 'কুং' অর্থাৎ সম্রাট, ঋষভ 'চাং' অর্থাৎ মন্ত্রী, গান্ধার প্রজা, মধ্যম রাজকার্য্য, পঞ্চম স্বর্গের প্রতিবিম্ব ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। অধুনা পাশ্চাত্য-দেশে সঙ্গীত বিজ্ঞানের নানা উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে; আর ভারতবর্ষে সঙ্গীত চর্চ্চা লোপ পাইতে বসিয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপে নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ হয় নাই। কিন্তু ঐ সময়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নাট্য-সাহিত্যের ও সঙ্গীত-বিদ্যার চরম অবনতি সাধিত হইয়াছিল। * একের লয়ে অপরের উদ্ভব,—ইহাই জগতের নিয়ম।

স্থাপত্য বা বাস্তু-বিদ্যা।

চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যার একটি বিদ্যার নাম—বাস্তু-বিদ্যা। বাস্তু শব্দে গৃহ, ভবন, অট্টালিকা প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। বাস্তু-বিদ্যাকে আধুনিক ভাষায় স্থাপত্য বলা যাইতে পারে। স্থাপত্যে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা অবিসম্বাদিত। ঋগ্বেদে (২য় মণ্ডল ৪১শ সূক্ত ৫ম ঋক; ৫ম মণ্ডল ৬২শ সূক্ত ৬ষ্ঠ ঋক) সহস্র-স্তম্ভযুক্ত অট্টালিকার উল্লেখ আছে। ইন্দ্র দিবোদাসকে পাষাণ-নির্ম্মিত শতসংখ্যক পুরী দান করিয়াছিলেন (ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল, ৩০ সূক্ত ২০ ঋক)। ঋগ্বেদের এই উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়, পাষাণ খোদিত করিয়া তদ্দ্বারা অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত। লৌহ-নির্ম্মিত নগরীর উল্লেখে (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৩য় সূক্ত ১ম ঋক, ১৫শ

প্রাচীন-ভারতের স্থপতি-বিদ্যা।

* হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় উইলসন এই কথাই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে তাঁহার উক্তি,—"The nations of Europe possess no dramatic literature before the fourteenth or fifteenth century, at which period the Hindu drama had passed into its decline."—H. H, Wilson, *Theatre of the Hindus*, Vol. I.

সূক্ত ১৪শ ঋক, ৯৫ম সূক্ত ১ম ঋক) দৃঢ়দুর্গাদিসমন্বিত নগরাদির অস্তিত্ব অনুভূত হয়। রামায়ণে অযোধ্যার এবং লঙ্কার যে বর্ণনা আছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতের স্থপতি বিদ্যার চরমোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। অযোধ্যায় পর্ব্বততুল্য অত্যুচ্চ অট্টালিকা-সমূহ বিদ্যমান ছিল, (আদিকাণ্ড ৫ম সর্গ ১৫শ শ্লোক), লঙ্কার রাজধানীতে সপ্তখণ্ড প্রাসাদ বিচিত্র তোরণ-দ্বার, প্রকাণ্ড ভবন প্রভৃতির বর্ণনা (সুন্দরকাণ্ড, ৬ষ্ঠ সর্গ) পাঠ করিলে, এখনও পর্য্যন্ত কোনও রাজধানী সৌন্দর্য্যে তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই, উপলব্ধি হয়। মহাভারতে পাণ্ডবগণের (সভাপর্ব্ব ৩য় অধ্যায়) এবং মগধাদির (সভাপর্ব্ব, ২১শ অধ্যায়) রাজগণের রাজধানীর যে বর্ণনা আছে, সকলই স্থপতিবিদ্যার পূর্ণ পরিচয়। বিশেষতঃ, মতিমান ময় কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের যে সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, বোধ হয় কোনও দেশের কোনও ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। সেই সভার বর্ণনায় মহাভারতে লিখিতে আছে,—'কাঞ্চনময় বৃক্ষশালিনী সেই সভাটি সতুর্দ্দিকে পঞ্চ সহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ হইল। ঐ সভা সূর্য্যচন্দ্রাদির প্রভাতুল্য দীপ্তিমতী হইয়া অতিশয় মনোহর আকার ধারণ করিল; স্বকীয় প্রভা-প্রভাবে সূর্য্যের প্রভাকেও যেন অপ্রতিভ করিল। অলোকসামান্য তেজ দ্বারা দিব্যরূপা হইয়া যেন প্রজ্বলিতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং নূতন জলধরের ন্যায় নভোমণ্ডল আবৃত করিয়া রহিল। ফলতঃ, সর্ব্বকার্য্যদক্ষ মতিমান ময় যেরূপ মহাবিস্তীর্ণ সুনির্ম্মল শ্রান্তিহর রমণীয় বহুলচিত্রান্বিত রত্ন-প্রাচীর-বেষ্টিত বহুমূল্য সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিল; কৃষ্ণের, ব্রহ্মার বা আর কোনও দেবতার সভা তাদৃশ রূপশালিনী ছিল না। উক্ত সভায় ময় একটি অপ্রতিম সরোবর নির্ম্মাণ করিল। ঐ সরোবরে মণিময় মৃণাল ও বৈদূর্য্যময় পত্রযুক্ত শত শত শতপত্র ও কাঞ্চনময় কহ্লার-কদম্ব সুশোভিত ছিল এবং বহুতর বিহঙ্গগণ ইতস্ততঃ কেলি করিতেছিল। প্রফুল্লপঙ্কজ ও সুবর্ণনির্ম্মিত মৎস্য-কূর্ম্মাদি দ্বারা বিচিত্রিতা চিত্রস্ফটিকসোপান-বদ্ধা মন্দ মন্দ সমীরণ দ্বারা আন্দোলিতা মুক্তাবিন্দুনিচয়ে খচিতা মহামণি শিলাপট্ট দ্বারা চতুর্দ্দিকে বদ্ধবেদিকা মণিরত্নে বিভূষিতা ঐ নির্ম্মল সরসী দৃষ্টি করিয়াও কোনও কোনও রাজপুরুষেরা ভ্রমক্রমে উহাতে পতিত হইয়াছিলেন। ঐ সভার চতুর্দ্দিকে পুষ্পিত নীলবর্ণ শীতলছায়াযুক্ত নানাবিধ মনোহর মহাবৃক্ষসমূহ ও সুগন্ধি কানন এবং হংসকারণ্ডবচক্রবাকাদি সমাকীর্ণ পুষ্করিণী সকল ইতস্ততঃ সুশোভিত ছিল। গন্ধবহ সর্ব্বত্র হইতে স্থলজ ও জলজ কমল সকলের সুগন্ধ বহন করিয়া পাণ্ডবদিগকে সেবা করিত। মহারাজ! ময় চতুর্দ্দশ মাসে এতাদৃশ মহতী সভা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করিল।' এই বর্ণনার উপর অধিক বলিবার প্রয়োজন হয় না। স্ফটিক-নির্ম্মিত সোপান, শিলাপট্টের বদ্ধবেদিকা প্রভৃতি—স্থাপত্যের এবং শিল্পচাতুর্য্যের পূর্ণ নিদর্শন। এই সভায় প্রবেশ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের উক্তিতে ময়দানব-নির্ম্মিত সভার বর্ণনা যেরূপ বিবৃত আছে, তাহা পাঠ করিলে ঐ সভামণ্ডপ-নির্ম্মাণে স্থাপত্যের কারুকার্য্যের ও শিল্পনৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুর্য্যোধন বলিতেছেন,—'ময়দানব বিন্দুসরোবর-সন্নিহিত রত্ননিকর দ্বারা তথায় স্ফটিক-কমলাস্তীর্ণ যে একটি কৃত্রিম সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জলপরিপূর্ণ।

প্রকৃত সরসীর ন্যায় সন্দর্শন করিয়াছি। সেই জলভ্রমে যেমন বস্ত্র উৎকর্ষ করিলাম, অমনি বৃকোদর শক্রর সমৃদ্ধিবিশেষ দর্শনে-বিমূঢ় ও রত্নবিহীন মনে করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। সপত্নের সেই উপহাস আমাকে যেন দগ্ধ করিতেছে। আরও দেখুন, আমি কমলশালিনী তাদৃশ আর একটী প্রকৃত বাপীকে শিলাসমা জ্ঞান করিয়া, জলমধ্যে পতিত হইয়াছিলাম। তাহাতে অর্জ্জুন ভীমের সহিত আমাকে সুস্বরে উপহাস করিয়াছিল এবং দ্রৌপদীও স্ত্রীগণের সহিত আমায় মর্ম্মবেদনা প্রদান করতঃ হাস্য করিয়াছিল। আমার বস্ত্র জলে ক্লিন্ন হইলে, কিঙ্করেরা রাজার আদেশ-ক্রমে আমাকে অন্য বসন সকল প্রদান করিয়াছিল। তাহাও আমার একটী পরম দুঃখ। আরও একটা বঞ্চনার কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বাস্তবিক দ্বার নহে, অথচ দ্বারাকারে নির্ম্মিত এক প্রদেশ দিয়া যেমন নির্গত হইবার উপক্রম করিব, অমনি শিলায় অভিহত হইয়া ললাটদেশে বিলক্ষণ বিক্ষত হইলাম। তখন নকুল সহদেব দূর হইতে আমাকে তথায় আহত হইতে দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করতঃ উভয়ে মিলিয়া আমাকে বাহুদ্বারা গ্রহণ করিল। পরন্তু সেই অবস্থায় সহদেব যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে আমাকে বারম্বার এই কথা বলিল,—'রাজন্! এই স্থান দিয়া গমন করুন।' ভীমসেনও এই অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া আমাকে 'ওহে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়' এইরূপ সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিল,—'এই দিকে দ্বার।' পাণ্ডবদিগের সভা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দুর্য্যোধন এই সকল কথা কহিয়াছিলেন। বাস্তবিদ্যায় কতদূর পারদর্শী হইলে, শিল্পচাতুর্য্যে কতদূর নৈপুণ্য-লাভ করিলে, এবম্বিধ সভা-মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতে পারে, সহজেই অনুমান করা যায়।

গরুড়পুরাণের পূর্ব্ব-খণ্ডে বাস্তু-নির্ণয় ও প্রাসাদ-লক্ষণ সম্বন্ধে (ষট্‌চত্বারিংশ ও সপ্তচত্বারিংশ) দুইটী অধ্যায় আছে। প্রথমোক্ত অধ্যায়ে কিরূপ স্থানে কিরূপ তিথি-নক্ষত্রে কিরূপ পূজা-পদ্ধতির অনুষ্ঠান করিয়া কিরূপভাবে বাস্তু-নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহা লিখিত আছে। দ্বিতীয়োক্ত অধ্যায়ে দেবপ্রাসাদের লক্ষণ ও তন্নির্ম্মাণ-প্রণালী পরিবর্ণিত। দুইটী অধ্যায়ের একটু একটু পরিচয় প্রদান করিতেছি। ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ে বাস্তু-নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—'আবাস-গৃহ, বাসবাটী, পুর, গ্রাম, বাণিজ্য-স্থান, প্রাসাদ, উপবন, দুর্গ, দেবালয় এবং মঠের আরম্ভ-কালে বাস্তু যাগ করিবে।...বাস্তুর সম্মুখভাগে দেবালয়, অগ্নিকোণে পাকশালা, পূর্ব্বদিকে প্রবেশনির্গম পথ ও যাগমণ্ডপ, ঈশান-কোণে পট্টবস্ত্রযুক্ত গন্ধপুষ্পালয়, উত্তরদিকে ভাণ্ডা-রাগার, বায়ুকোণে গোশালা, পশ্চিমদিকে বাতায়নযুক্ত জলাগার, নৈঋত-দিকে সমিধ কুশ-কাষ্ঠাদির গৃহ, অস্ত্রশালা, আর দক্ষিণ দিকে মনোরম অতিথিশালা প্রস্তুত করিবে।...গৃহের দ্বার যে পরিমাণ দীর্ঘ হইবে, তাহার অর্দ্ধ-পরিমাণ দ্বারের বিস্তার কারবে। এইরূপ অষ্ট-দ্বারবিশিষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য।' কোন্ সময়ে কোন্ দিকে গৃহের দ্বার নির্ম্মাণ সঙ্গত, কতখানি দূরে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে কি ভাবে বৃক্ষাদি রোপণ করা বিধেয়, তত্তদ্বিষয়ও ঐ অংশে সংক্ষেপে লিখিত আছে। সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে দেবপ্রাসাদ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—'যে স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সেই স্থানকে সমচতুষ্কোণ ও সমচতুরস্র

বাস্তু-নির্ম্মাণ প্রণালী।

করিয়া তাহাকে চতুঃষষ্টি ভাগে বিভক্ত করিবে। এমনভাবে ভাগ করিবে যে, বিভক্ত ভাগগুলিও যেন সমচতুষ্কোণ হয়। ইহাতে ঐ ক্ষেত্রটী চতুঃষষ্টি পদবিশিষ্ট হইবে। দেবপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সমচতুরস্র দ্বাদশটি দ্বার করিবে। চতুঃষষ্টি-পদে বিভক্ত ক্ষেত্রের বহির্ভাগস্থ অষ্টাবিংশতি পদ ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী বিংশতি পদ, এই অষ্টচত্বারিংশ পদে মন্দিরের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ভূমি হইতে গৃহতল পর্য্যন্ত যে উচ্চতা, তাহাকে জঙ্ঘা (পোতা) কহে। প্রাসাদের উচ্চতার পরিমাণ—জঙ্ঘার উচ্চতার পরিমাণ যত, তদূর্দ্ধে তাহার দ্বিগুণ হইবে এবং প্রাসাদ হইতে গর্ভের অর্থাৎ মেঝের বিস্তার-পরিমাণ যত, তৎপরিমাণে শিখরের অর্থাৎ চূড়ার মূল বনিয়াদ করিবে। এইরূপ পরিমাণ—একচূড় মন্দির-স্থলেই জানিবে। ত্রিচূড় কিম্বা পঞ্চচূড় মন্দির-নির্ম্মাণে গর্ভবিস্তার-পরিমাণের ত্রিভাগ বা পঞ্চভাগ পরিমাণে চূড়ার বনিয়াদ করিতে হইবে। শিখর-দেশে যে দ্বার করিবে, শিখর-পরিমাণের অর্দ্ধ-পরিমাণে তাহার উচ্চতা হইবে। শিখরের উচ্চতার পরিমাণকে চারি ভাগ করিয়া তাহার তিন ভাগে শিখরের বেদী ও চতুর্থ ভাগে কণ্ঠ নির্ম্মাণ করিবে।' এতদ্ভিন্ন অন্য আর এক প্রকারেও প্রাসাদ-নির্ম্মাণের উপদেশ আছে। সে প্রণালী,—'বাস্তুক্ষেত্রকে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যগত চতুর্ভাগ মন্দিরের গর্ভ করিবে। বাহিরের দ্বাদশ ভাগে ভিত্তি কল্পনা করিবে। ক্ষেত্রের চতুর্থ ভাগের যত পরিমাণ, ভিত্তির উচ্চতার পরিমাণও তত হইবে। ভিত্তির উচ্চতা-পরিমাণের দ্বিগুণ শিখরের উচ্চতা করিবে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণার্থ শিখরের উচ্চতার চতুর্থাংশ পরিমাণ বিস্তৃত রোয়াক রাখিবে। দেবপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকেই প্রবেশ-নির্গমার্থ দ্বার করিবে। মন্দির-মধ্যে চারি ভাগ এবং সম্মুখে এক ভাগ, —এই পাঁচ ভাগকে গর্ভমান বলে। বিচক্ষণ ব্যক্তি এই ক্রমে ভাগ করিয়া পুনর্ব্বার এক ভাগ গ্রহণ করতঃ নির্গমার্থ দ্বার করিবে। এই যে প্রাসাদ-লক্ষণ কথিত হইল, ইহা সামান্য লক্ষণ বলিয়া জানিবে।' তবেই বুঝা যাইতেছে, এতদ্ভিন্ন অন্য বিশেষ লক্ষণও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে লিখিত ছিল। দেবমন্দির পঞ্চবিধ। তাহার নাম, যথা,—'বৈরাজ, পুষ্পক, মালক, কৈলাস ও ত্রিপিষ্টক। বৈরাজ দেবালয়ের মন্দির সমচতুরস্র; পুষ্পক আয়ত অর্থাৎ বিস্তার হইতে অধিক দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট। কৈলাস মন্দির বৃত্তাকৃতি; মালক মন্দির বৃত্তায়ত (ডিম্বাকার) এবং ত্রিপিষ্টক নামক দেবপ্রাসাদ অষ্টাস্র (অষ্টভুজ-বিশিষ্ট)। এই পঞ্চপ্রাসাদ সমস্ত প্রাসাদের প্রকৃতি-স্বরূপ। এই সকল প্রাসাদ হইতে চত্বারিংশ প্রকার মনোরম প্রাসাদ উৎপন্ন হয়। মেরু, মন্দর, বিমান, ভদ্রক, সর্ব্বতোভদ্র, রুচক, নন্দন, নন্দবর্দ্ধন, শ্রীবৎস এই নবসংখ্যক মন্দির চতুরস্র এবং বৈরাজ মন্দির হইতে উৎপন্ন। বড়ভী, গৃহরাজ, শালাগৃহ, মন্দির, বিমান, ব্রহ্মমন্দির, ভবন, উত্তম্ভ, শিবিকাবেশ্ম এই নবমন্দির পুষ্পমন্দির হইতে সমুৎপন্ন। বলয়, দুন্দুভি, পদ্ম, মহাপদ্ম, মুকুলী, উষ্ণীষী, শঙ্খ, কলস ও গুবারক্ষ নামক মন্দির বৃত্তাকার এবং কৈলাস মন্দির হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। গজ, বৃষভ, হংস, গরুড়, সিংহ, ভূমুখ, ভূধর, শ্রীজয় ও পৃথিবীধর এই নবমন্দির বৃত্তায়ত (ডিম্বাকার)। এই নবমন্দির মালিক নামক মন্দির হইতে উৎপন্ন হয়। বজ্র, মালচক্র, মুষ্টিক, বক্র, চক্র, স্বস্তিক, খড়্গ, গদা, শ্রীবৃক্ষ, বিজয়, শ্বেত এই

সকল মন্দির ত্রিপিষ্টক নামক আদিমন্দির হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে।' এই সকল মন্দিরের কোনটি ত্রিকোণ, কোনটি পদ্মমধ্য, কোনটি অর্দ্ধচন্দ্র, কোনটি চতুষ্কোণ, কোনটি অষ্টকোণ, কোনটি ষোড়শ কোণ ক্রমে নির্ম্মিত হইত। মন্দিরের গাত্রে কোথাও কোথাও বিবিধ বর্ণের লতা-বিতান চিত্রিত করারও পদ্ধতি ছিল। কোনও মণ্ডপ আধারযুক্ত অর্থাৎ কড়ি-বরগা-বিশিষ্ট এবং কোনও মণ্ডপ আধারহীন অর্থাৎ খিলানের দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ার বিষয়ও উক্ত স্থলে লিখিত আছে। দেবপ্রাসাদের সম্মুখে দশ হস্ত অথবা দ্বাদশ হস্ত পরিমাণ ষোড়শ স্তম্ভযুক্ত ও অষ্টধ্বজোপশোভিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে যজ্ঞবেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হইত। গরুড়পুরাণের পূর্ব্ব-খণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় হইতে অষ্টচত্বারিংশ প্রভৃতি অধ্যায়ে এই সকল বিষয়ের বর্ণনা আছে। অগ্নিপুরাণের সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে সংক্ষেপে বাস্তু-লক্ষণ পরিবর্ণিত হইয়াছে। মৎস্য-পুরাণের দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় হইতে সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে বাস্তুবিস্তার বিষয় লিখিত আছে। সেই সকল অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়,—বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থাদি প্রচলিত ছিল এবং ক্ষেত্রব্যবহার প্রভৃতির নিয়মানুসারে অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইত। ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে সূত বলেন,—

ভৃগুরত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্ম্মা ময়স্তথা। নারদো নগ্নজিচ্চৈব বিলালাক্ষঃ পুরন্দর॥

ব্রহ্মাকুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এব চ। বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্র বৃহস্পতী॥

অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকাঃ। সঙ্ক্ষেপেণোপদিষ্টস্তু মনবে মৎস্যরূপিণা॥"

ইহাতে প্রতীত হয়, মৎস্যরূপী বিষ্ণুর নিকট হইতে মহর্ষি মনু প্রথমে বাস্তু-শাস্ত্র প্রাপ্ত হন। তৎপরে ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বকর্ম্মা, ময়, নারদ, নগ্নজিৎ, বিলালাক্ষ, পুরন্দর, ব্রহ্মা, কার্ত্তিকেয়, নন্দীশ্বর, শৌনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক্র এবং বৃহস্পতি এই অষ্টাদশ জন বাস্তু-শাস্ত্রোপদেষ্টা ছিলেন। বাস্তুপ্রতিষ্ঠা-কার্য্যের বর্ণনার পর মৎস্যপুরাণ রাজ-ভবনের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ,—'উত্তমাদি ভেদে পাঁচ প্রকার রাজভবন প্রস্তুত হইত। অষ্টোত্তর শতহস্ত বিস্তৃত ভবন উত্তম বলিয়া অভিহিত ছিল। অন্য চারি প্রকার ভবনের বিস্তৃতি পর্য্যায়ক্রমে আট হাত করিয়া কম হইবে।' আর পাঁচ প্রকার ভবনেরই দৈর্ঘ্য চারি অংশের অধিক অর্থাৎ ১০৮ হাত বিস্তৃত ভবনের দৈর্ঘ্য চারি শত বত্রিশ হাতেরও অধিক হিসাব করা হইত। যুবরাজের, সেনাপতির, মন্ত্রিগণের, শিল্পী, কঞ্চুকী ও গণিকাগণের এবং দৈবজ্ঞ, গুরু, বৈদ্য, সভাস্তার ও পুরোহিতদিগের প্রত্যেকের বাসভবন কিরূপ দৈর্ঘ্য ও পরিসরবিশিষ্ট হইবে, তাহাও তন্নতন্ন করিয়া ঐ স্থানে বিবৃত আছে। ভূমির ভিত্তি পক্ক ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত করা হইত। যেরূপ প্রাচীর, যেরূপ স্তম্ভ এবং যেরূপ চিত্রাদির দ্বারা উহা শোভিত হইত, তাহাও ঐ সকল অধ্যায়ে পরিবর্ণিত আছে। যেরূপ নিয়মে স্তম্ভাদি প্রস্তুত হইত, তাহার পরিমাণ পর্য্যন্ত ঐস্থলে উক্ত হইয়াছে। ঋষি-গণের প্রশ্নের উত্তরে সূত বলেন,—'বুদ্ধিমান মানব স্বীয় ভবনের উচ্চতায় সপ্তগুণ করিয়া তাহার অশীতি অংশ পরিমাণ উক্ত স্তম্ভের স্থূলতা করিবেন।' চতুরস্র স্তম্ভকে রুচক, অষ্টাস্রকে বজ্র, ষোড়শাস্রকে দ্বিবজ্র, দ্বাত্রিংশাস্রকে প্রলীনক এবং মধ্যপ্রদেশে বৃত্তাকার

স্তম্ভকে বৃত্ত সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইত। লিঙ্গপুরাণে, দেবীপুরাণে, ছান্দোগ্য-পরিশিষ্টে, স্মৃতিসাগরে এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বাস্তুবিদ্যা-বিষয়ক বিবিধ কথা লিখিত আছে। সে সকল বিষয় আলোচনা করিলে, প্রাচীন-ভারতে বাস্তু-বিদ্যার বা স্থাপত্যের যে চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

প্রাচীন ভারতের দূর অতীতের স্থপতি-বিদ্যার (গ্রন্থাদিতে উল্লেখ ভিন্ন অন্যবিধ) বিশিষ্ট নিদর্শন এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, সর্ব্ববিধ্বংসী কালের প্রভাবে অট্টালিকাদির স্মৃতি স্বতঃই লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা। অধিকন্তু ধর্ম্মবিপ্লবের পর ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া একের উপর অন্যের প্রভাব আসিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। কালের কষাঘাত সহ্য করিয়া হিন্দুগণের প্রাচীন-কালের স্থপতি-বিদ্যার যে সকল পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, তাহার কতকগুলি বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক এবং কতকগুলি মুসলমান-গণ কর্ত্তৃক রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুদিগের অনেক স্থাপত্য—রূপান্তরে অবস্থিত হওয়ায়—এখন বৌদ্ধগণের ও মুসলমান-গণের স্থাপত্য বলিয়াও পরিচিত হইতেছে। দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই এতদ্বিষয় উপলব্ধি হইতে পারে। বোম্বাই সহরের অনতিদূরে দৌলতাবাদের নিকটে ইলোরার গুহা-মন্দির বিদ্যমান। পর্ব্বত-গাত্র খোদাই করিয়া ঐ গুহা-মন্দির নির্ম্মিত হয়। উহার মধ্যে হিন্দুদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তিও আছে, আবার জৈনদিগের ও বৌদ্ধদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তিও পরিদৃষ্ট হয়। সেই সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া নানা জনে ঐ গুহা-মন্দির প্রতিষ্ঠার নানা সময় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এক পক্ষ বলেন,—'বুধ-পত্নী ইলার প্রাদুর্ভাবের সময়ে ঐ গুহা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইলার নামানুসারেই ঐ মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। হিন্দুদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রাচীন-কালের কীর্ত্তি। বৌদ্ধগণের প্রভাবের সময় বৌদ্ধগণ তাহার উপর আপনাদের পরিচয়-চিহ্ন প্রকট করিয়া রাখিয়াছেন।' অন্যপক্ষ বলেন,—'ঐ গিরি-মন্দির বৌদ্ধ-নৃপতিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়; উহার মধ্যে হিন্দুদেবদেবীর প্রবর্ত্তনা পরবর্ত্তি-কালের ঘটনা।' এ মতবিরোধ অনেক কাল হইতেই চলিয়াছে। এ বিরোধের মীমাংসা হওয়া কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কালের ব্যবধানে বিষয়-বিশেষে এইরূপ মতান্তরই ঘটিয়া থাকে। ৺কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বতন মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। সম্রাট আওরঙ্গজেব ঐ মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন। এখন যদি হঠাৎ কেহ উহা দর্শন করেন, তিনি কখনই উহাকে মন্দির বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক মন্দিরের অবস্থান্তর-সংঘটন—তুলনায় সে দিনের ঘটনা। ইতিহাসে এ বিষয়ের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সুতরাং এখনও ঐ মন্দিরের মসজিদে পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্বন্ধে বড় একটা মতান্তর উঠিতে পারে নাই। কিন্তু যে সময়ের ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা যে সময়ে ইতিহাস ছিল না,—তখন যদি এরূপ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিত, কেহ কি এখন তাহার সাক্ষ্য দিতে পারিতেন? ইলোরা প্রভৃতি সম্বন্ধে সেই কথাই বলা যাইতে পারে। ইতিহাসে দুই চারি দশ শত বৎসরের বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বের ঘটনার কোনও সাক্ষ্য ইতিহাস দিতে পারে না। প্রাচীন-ভারতের সভ্যতা

স্থাপত্যের প্রাচীনত্ব।

আধুনিক ইতিহাসের অতীত-কালের ঘটনা। সুতরাং পদেপদেই সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। আগরায় ও দিল্লীতে মোগল-বাদসাহগণের সে সকল কীর্ত্তি-স্মৃতি বিদ্যমান আছে, সে দিনের হইলেও, সে সকলও এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে। ফতেপুর-শিকরিতে আকবর বাদসাহ যে নূতন সহর প্রস্তুত করিতেছিলেন, সে সহর এখন প্রস্তর-স্তূপে পরিণত-প্রায়। বড়লাট লর্ড কর্জ্জন ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি-স্মৃতি একটু একটু বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই এখনও দিল্লী, আগরা ও ফতেপুর-শিকরি প্রভৃতি স্থানের স্থাপত্যের ও শিল্প-নৈপুণ্যের একটু একটু আভাষ পাওয়া যাইতেছে। লর্ড কর্জ্জন যদি এদিকে একটু দৃষ্টিপাত না করিতেন, তাহা হইলে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এখনই সে সকল পরিচয়-চিহ্ন বিলুপ্ত হইত। সেদিনের স্থাপত্যেরই এই দশা! যুগযুগান্ত পূর্ব্বের স্থাপত্যের কি পরিণাম হইতে পারে, সহজেই বুঝা যায় না কি? যাহা হউক, এইরূপ অবস্থান্তরের মধ্যে পড়িয়াও প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের যে দুই চারিটী নিদর্শন আজিও বর্ত্তমান আছে, পৃথিবীর অপর কোনও দেশে তাহার আর তুলনা নাই।

প্রাচীন ভারতের দূর অতীতের স্থাপত্যের ও শিল্পনৈপুণ্যের যে সকল নিদর্শন আজিও বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে গুহা-মন্দিরগুলি সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তৎসমুদায়ের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কেহই সন্দিহান হইতে পারেন না। গুহা-মন্দিরগুলির মধ্যে ইলোরা সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দৌলতাবাদ নগরের সন্নিকটে (২০° ডিগ্রি ২′ মিনিট উত্তর দ্রাঘিমায় এবং ৭৫° ডিগ্রি ১৩′ মিনিট পূর্ব্ব-অক্ষাংশে) ইলোরার গিরি-মন্দির অবস্থিত।

ইলোরার গুহা-মন্দির।

একটি পাহাড় কাটিয়া এই অপূর্ব্ব গিরিমন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। পৃথিবীতে যে সকল প্রধান দ্রষ্টব্য-সামগ্রী আছে, ইলোরার গুহা-মন্দির তাহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারে। ইলোরায় যে কেবল একটি মন্দির আছে, তাহা নহে। উহার মধ্যে কতগুলি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখন তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে এখনও উনিশটি বৃহৎ মন্দির ঐ গিরি-গুহার শোভাবর্দ্ধন করিয়া রহিয়াছে। কতকগুলি মন্দির এবং মন্দির-সংলগ্ন গৃহ গুহার অভ্যন্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল; আর কতকগুলি পর্ব্বতের উপরিভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেগুলি কাচবৎ শুভ্র 'গ্রেণাইট' প্রস্তর খোদাই করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তৎসমুদায়ের বিশেষত্ব এই যে, একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর-স্তূপের মধ্যভাগে এবং উপরিভাগে খোদাই করিয়া তৎসমুদায় বিনির্ম্মিত; খোদাই করিয়া স্তম্ভ হইয়াছে, খোদাই করিয়া দরজা হইয়াছে, খোদাই করিয়া ছাদ হইয়াছে। ঐ সকল মন্দিরের গাত্রে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। যে পর্ব্বতে এই সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি। মন্দির, গৃহ, সিঁড়ি এবং বারান্দা প্রভৃতি ঐ পর্ব্বত-গাত্রে এতাধিক পরিমাণে খোদিত হইয়াছে যে, পর্ব্বতটিকে একটি মধুচক্রের সহিত তুলনা করা যায়। মন্দির-সমূহের মধ্যে বারটি মন্দির সমধিক দৃষ্টি-আকর্ষক। একটি মন্দিরের দৈর্ঘ্য ১১১ ফিট, অন্যান্যগুলির কোনটির দৈর্ঘ্য ৯০ ফিট, কোনটির দৈর্ঘ্য ৮০ ফিট, কোনটির ৭০ ফিট এবং কোনটির ৬০ ফিট। মন্দিরগুলি অথবা

মন্দিরের ছাদগুলি শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভের উপর অবস্থিত। স্তম্ভগুলির উচ্চতা ৮ ফিট হইতে ৫০ ফিট পর্য্যন্ত। ইলোরার গুহা-মন্দিরগুলির মধ্যে কৈলাস নামক মন্দিরে সৌন্দর্য্যের ও ও শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরে রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণিত দেবদেবী-গণের এবং বীরবৃন্দের প্রতিকৃতি খোদিত রহিয়াছে;—এই মন্দির নানা খোদিত চিত্রে সুশোভিত। কৈলাস-মন্দিরের সম্মুখে একটি বারান্দা আছে। বারান্দা অতিক্রম করিলেই একটি প্রকাণ্ড হল বা প্রকোষ্ঠ। তাহার দৈর্ঘ্য ১৪০ ফিট এবং বিস্তৃতি ৯০ ফিট। শ্রেণিবদ্ধ স্তম্ভের উপর সেই প্রকোষ্ঠের ছাদ অবস্থিত। সেই হলের পর আবার এক প্রকাণ্ড বারান্দা; বারান্দার পার্শ্বেই আবার এক বিস্তৃত হল। সেই হলের দৈর্ঘ্য ২৫০ ফিট এবং বিস্তৃতি ১৫০ ফিট। সেই হলেরই মধ্যস্থলে একখানি প্রকাণ্ড পাথরে খোদাই করা প্রধান মন্দিরটি বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই মন্দিরের উচ্চতা ১০০ ফিটের কম নহে। মন্দিরের উপরিভাগে ও বহি-র্দ্দেশে খোদাই করিয়া নানা চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরেও খোদাই-কার্য্যের পরাকাষ্ঠা! মন্দিরটী চারি সারি চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর অবস্থিত। স্তম্ভশ্রেণী-চতুষ্টয় প্রস্তর-খোদিত চারিটি হস্তীতে ধারণ করিয়া আছে। দেখিলে মনে হয়, মন্দিরটি যেন শূন্যে অবস্থান করিতেছে। মন্দিরের অভ্যন্তরের দৈর্ঘ্য ১০৩ ফিট, বিস্তৃতি ৫৬ ফিট ও উচ্চতা ১৭ ফিট। তলদেশ হইতে মন্দিরের চূড়ার উচ্চতা এক শত ১০০ ফিট। বিচিত্র কারুকার্য্যসমন্বিত বলিয়া এই কৈলাস মন্দিরটিকে কেহ কেহ 'রংমহাল' বলিয়াও অভিহিত করেন। একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর কি কৌশলে খোদাই করিয়া এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা কল্পনা করিতেও চিত্ত পরাভূত হয়। রংমহাল বা কৈলাসের সৌন্দর্য্যের পরই ইন্দ্রাদির মন্দির উল্লেখযোগ্য। ইলোরায় আর আর যে সকল গৃহ ও মন্দিরাদি আছে, তাহার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি মন্দির বৌদ্ধ-মন্দির বলিয়া পরিচিত। একটি মন্দির দোতাল বা দ্বিতল, দ্বিতীয়টি তিনতাল বা ত্রিতল এবং তৃতীয়টির নাম দশাবতার। প্রথমোক্ত দুইটির খোদাই কার্য্যে বৌদ্ধদিগের কারুকার্য্যের প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। শেষোক্ত মন্দিরে যদিও সে নিদর্শনও বিদ্যমান; কিন্তু উহার মধ্যে হিন্দুদিগের দেবদেবীর আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইলোরার গুহা-মন্দিরের সকল অংশ যে এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই, অর্থাৎ সময় সময় উহার চিত্রাদির যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। এই দেখিয়া, কেহ বলেন,—'বৌদ্ধগণের প্রাদুর্ভাবের সময় ইলোরার গুহামন্দির-সমূহ প্রথম নির্ম্মিত হয়। পরিশেষে হিন্দুগণের প্রাধান্য বিস্তৃত হইলে হিন্দুগণ তাহার উপর আপনাদের দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি খোদিত করিয়াছিল।' কিন্তু অন্যপক্ষে আবার প্রতিপন্ন হয়,—'বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে ঐ সকল মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। পরিশেষে বৌদ্ধগণ ঐ সকল মন্দির আপনাদের বিহার-ক্ষেত্ররূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছিলেন।' কেহ কেহ আবার বলেন,—'ইলোরার গিরিমন্দির-সমূহ দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়ী সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে কৈলাস-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। চৌলুক্য-রাজগণের প্রাধান্য লোপ পাইলে, চোলরাজগণ যখন দক্ষিণ-ভারত হইতে উত্তর-ভারতের দিকে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার কারন, সেই সময়ই এই গিরিমন্দির-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের আর আর যে নিদর্শন আছে,

তাহার সহিত এই সকল মন্দিরের কারুকার্য্যের অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।' যাহা হউক, এ বিতর্ক এখন অনাবশ্যক। দ্রাবিড়ী-গণেরই হউক, প্রাচীন হিন্দুগণেরই হউক, আর বৌদ্ধ-গণেরই হউক, এবম্প্রকার গুহামন্দির যে প্রাচীন-ভারতের স্থপতি-বিদ্যার উৎকর্ষের পূর্ণ নিদর্শন, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। এলিফাণ্টা বা হস্তিগুম্ফা—প্রাচীন হিন্দু-স্থাপত্যের আর এক নিদর্শন। বোম্বাই সহরের সাত মাইল পূর্ব্বভাগে এলিফাণ্টা নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপে প্রস্তর খোদাই করিয়া যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাই এলিফাণ্টা বা হস্তিগুম্ফা গুহা নামে পরিচিত। ঐ দ্বীপে অবতরণ করিবার সময় প্রথমেই প্রস্তর-খোদিত একটি হস্তিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইত। তদ্দৃষ্টে দ্বীপের এবং মন্দিরের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক এই দ্বীপ প্রথমে এলিফাণ্টা নামে অভিহিত হয়। দ্বীপের অধিবাসিগণ উহাকে ঘাড়িপুর বা গুহা-নগর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। কত কাল পূর্ব্ব হইতে ঐ দ্বীপে গুহা-মন্দির বিদ্যমান, কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে যেখানে হস্তিমূর্ত্তি ছিল, সেখানে অবতরণ করিয়া, দুইটি পর্ব্বতের মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, দ্বীপের মধ্যস্থলে উপনীত হওয়া যায়। সেখানে উপনীত হইবামাত্র এলিফাণ্টার সুদৃশ্য গুহামন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পাহাড় খোদাই করিয়া কি সুন্দরভাবেই এই গুহা-মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে! গুহা-মন্দিরের সম্মুখে দুইটি বৃহত্তর বৃত্তাকার স্তম্ভের এবং দুইটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপরে বারান্দার ছাদ অবস্থিত। সেই বারান্দা অতিক্রম করিলেই একটি প্রকাণ্ড হল বা প্রকোষ্ঠ। তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি ১৩৩ ফিট। প্রকোষ্ঠটিকে একরূপ সমচতুরস্র বলিলেও বলা যাইতে পারে। ছাদের উচ্চতা ১৫ ফিট হইতে ১৮ ফিটের মধ্যে। ছাব্বিশটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর ঐ ছাদ অবস্থিত। বৃত্তাকার ও চতুষ্কোণ উভয় প্রকার স্তম্ভই শ্রেণিবদ্ধরূপে সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্‌ভাগে চলিয়া গিয়াছে। হলের মধ্যস্থলে একটি বেদী আছে। সেই বেদীর উপরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মূর্ত্তি বিদ্যমান। এই গুহা-মন্দিরে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং ইহার প্রস্তর-গাত্রে কারুকার্য্যের ইয়ত্তা নাই। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকে অনুমান করেন, এই গুহা-মন্দির—ইলোরার গুহামন্দিরের বহু পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে নির্ম্মিত হওয়া সম্ভবপর। কারণ, ইলোরার গুহাগাত্রস্থ কারুকার্য্য অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। ইহার অনেক আদর্শ ইলোরায় পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন। কোন্ সময়ে কোন্ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মন্দির-গাত্রে প্রায়ই কোনও খোদিত-লিপি পাওয়া যায় না। মিঃ আরস্কিন এই গুহা-মন্দির দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—'এই মন্দিরাভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করা যায়, মনে ততই দূর অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠে।' * এলিফাণ্টা দ্বীপ ১৮° ডিগ্রি ৫৭´ মিনিট উত্তর-দ্রাঘিমায় এবং ৭৩° ডিগ্রি পূর্ব্ব-অক্ষাংশে অবস্থিত। এই গুহা-মন্দিরের দেবদেবীর মূর্ত্তিসমূহ পর্ত্তুগীজগণ ও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তাই এখন কোনও মূর্ত্তির মুখ বিকৃত, কোনও মূর্ত্তির হস্তপদ বিচ্ছিন্ন, কোনও মূর্ত্তি একেবারেই বিলোপপ্রাপ্ত। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই

এলিফাণ্টা গুহামন্দিরে হিন্দু-স্থাপত্য।

---

* *Vide*, Mr. Erskine, *Transactions of the Literary Society of Bombay.*

ত্রিমূর্ত্তি গুহা-মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য। মূর্ত্তিগুলিতে শিল্পনৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মূর্ত্তিত্রয়ের প্রত্যেকের মস্তকের দৈর্ঘ্য—ছয় ফিট। প্রস্তরে এমন সুন্দর-রূপে মূর্ত্তিগুলি খোদিত হইয়াছিল যে, তদ্দৃষ্টে ইউরোপীয়-গণও বিস্ময়-বিমুগ্ধ! ঐ দেব-মূর্ত্তি ত্রয়ের বেশভূষাও অপূর্ব্ব কারুকার্য্যসম্পন্ন। সংহারকর্ত্তা শিবের হস্তধৃত ফণী মস্তকের উপর ফণা-বিস্তার করিয়া আছে; জটার উপর একটী শিশু এবং মৃতের মস্তকের খুলি খোদিত থাকায় ভীষণতা ব্যক্ত হইতেছে। ত্রিমূর্ত্তির প্রত্যেক পার্শ্বে একটি করিয়া চতুষ্কোণ স্তম্ভ। তাহার সম্মুখ-ভাগে দুইটি মনুষ্য-মূর্ত্তি খোদিত। একটি মূর্ত্তি অপর একটি বামন-মূর্ত্তির প্রতি মস্তক নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণদিকে একটি প্রকোষ্ঠ। তাহার মেঝে মন্দিরের গর্ভ বা মেঝে অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্ন, সেখানে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বিরাজ-নামধেয় হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ষোল ফিট। প্রস্তর-খোদিত এইরূপ নানা মূর্ত্তি নানা ভাবে হস্তিগুম্ফায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গুহামন্দির প্রধানতঃ শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়। গুহার পশ্চিমে একটি গৃহে সেই শিবলিঙ্গ বিরাজমান। সেই প্রকোষ্ঠের বহির্দ্দিকে প্রস্তর-খোদিত নানা মূর্ত্তি আছে। এলিফাণ্টা গুহামন্দিরের নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হয়। এক মতে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাস-কালে, অন্য মতে বলিপুত্র বাণ কর্ত্তৃক, আর এক মতে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের উদ্যোগে, ঐ গুহামন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফলতঃ, কত কাল পূর্ব্বে কোন্ সময়ে এই গুহা-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সেই জন্যই নানা মতান্তর ঘটিয়াছে।

ইলোরার ও এলিফাণ্টার গুহা-মন্দিরের ন্যায়, গুহা-মন্দিরে এবং অন্যান্য রূপে প্রাচীন-ভারতের স্থপতি-বিদ্যার আরও অনেক নিদর্শন আছে। যদিও তৎসমুদায়ের প্রতিষ্ঠার কাল-নিরূপণ সম্বন্ধে নানা গণ্ডগোল ঘটিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন-ভারতের ভাস্কর্য্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে, যেরূপ ভাবেই হউক, সে সকলের উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। ডক্টর ফারগুসন, জেনারেল কানিংহাম প্রভৃতি প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্গণ এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এ সকল বিষয়ে কি বলিয়া গিয়াছেন, প্রথমে তাহারই আভাষ দিবার প্রয়াস পাইতেছি। ডক্টর ফারগুসন ভারতের স্থাপত্যকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম,—লাট অর্থাৎ খোদিতলিপি-সমন্বিত প্রস্তর-স্তম্ভ-সমূহ; দ্বিতীয়,—'স্তূপ'; কোনও বিশেষ ঘটনার বা কোনও বিশেষ স্থানের অথবা বুদ্ধ-দেবের স্মৃতির কোনও প্রকার নিদর্শন স্তূপে রক্ষিত হইত। তৃতীয়,—'রেল' বা পরিবেষ্টনী; প্রস্তরের অথবা লৌহাদি ধাতু-নির্ম্মিত কারু-কার্য্য-সমন্বিত গরাদিয়া ও রেলিং প্রভৃতি; স্তূপ পরিবেষ্টনের জন্য অনেক স্থলেই এইরূপ প্রস্তরের বা লৌহ-নির্ম্মিত গরাদের ব্যবহার ছিল। চতুর্থ—'চৈত্য' অর্থাৎ উপাসনালয়। পঞ্চম,—'বিহার' অর্থাৎ বৌদ্ধ-ভিক্ষুকদিগের আশ্রম-স্থান। এই সকলের মধ্যে পরিবেষ্টনী প্রভৃতির যে সকল ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ফারগুসন অনুমান করেন,

স্থাপত্যের বিবিধ নিদর্শন।

তৎসমুদায় খৃষ্ট-জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। 'রেল' বা পরিবেষ্টনী সম্বন্ধে ফারগুসন বলেন,—'এ সকলের নির্ম্মাণ-প্রণালী ভারতবর্ষ অন্য কাহারও নিকট শিক্ষা করেন নাই। অনেকে যে বলেন, মিশর হইতে ভারতবর্ষের ভাস্কর্য্য-বিদ্যা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, ইহাতে তাহারও কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না। বরং এ সকলের নির্ম্মাণ-প্রণালীতে মিশরীয় স্থাপত্যের বিপরীত ভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে গ্রীসকেও ভারতের শিক্ষাগুরু বলিয়া মানিতে পারা যায় না। বাবিলন বা আসিরীয়া হইতেও যে এ কলা-বিদ্যা ভারতবর্ষ শিক্ষা করে নাই, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। লৌহ-নির্ম্মিত স্তম্ভের আকৃতিগত সাদৃশ্যে এবং তাহার উপর লতাপাতা প্রভৃতি অঙ্কনে পার্সিপোলিসের শিল্প-চাতুর্য্যের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু ঐ সকল স্তম্ভে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির সমাবেশ আছে, তাহার তুলনা অন্যত্র নাই। তাহা দেখিলে মনে হয়, ভারতবর্ষে একমাত্র ভারতবাসী কর্ত্তৃকই ঐ শিল্প বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে।' * যে সকল লাট বা প্রস্তর-স্তম্ভ ফারগুসন দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার মতে, তাহার প্রাচীনতম গুলি রাজচক্রবর্ত্তী অশোক কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, খৃষ্ট-জন্মের ২৫৮ বৎসর পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ২৩২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর হয়।

লাট বা স্তম্ভ।

অশোকের প্রতিষ্ঠিত লাট বা স্তম্ভ-সমূহের মধ্যে দিল্লীর এবং এলাহাবাদের স্তম্ভ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঐ দুই স্তম্ভের খোদিত লিপিতে অশোকের পরিচয় আছে। এলাহাবাদের স্তম্ভে অশোকের লিপির উপর গুপ্ত-বংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক নূতন লিপি খোদিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার নিজের ও পিতৃপুরুষগণের গৌরব-কাহিনী তাহার মধ্যে খোদিত করিয়াছিলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মোগল-বাদসাহ জাহাঙ্গীর সেই প্রাচীন লাটের প্রাচীন পরিচয়ের বিলোপ-সাধনে পার্শী ভাষায় আপনার পরিচয় খোদিত করিয়া দেন। অধিকাংশ স্তম্ভেরই শিরোভূষণ কারুকার্য্যাদি এখন ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিহুতের একটী স্তম্ভে সিংহ-মূর্ত্তি এবং সাঙ্কাশ্যার (মথুরা ও কনোজের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত) একটী স্তম্ভে একটী গজমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে। সাঙ্কাশ্যার স্তম্ভের লুপ্তপ্রায় গজ-মূর্ত্তিটীকে হুয়েন-সাং সিংহমূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মূর্ত্তিটী

---

* "It cannot be too strongly insisted upon that the art here displayed is purely Indigenous There is absolutely no trace of Egyptian influence. It is in every detail antagonistic to that art. Nor is there any trace of Classical art, nor can it be affirmed that anything here established could have been borrowed directly from Babylonia or Assyria. The capitals of the pillars do resemble somewhat those at Persepolis and the honeysuckle ornaments point in the same direction; but barring that the art, specially the figure sculpture belonging to the rail, seems to be an art elaborated on the spot by Indians, and by Indians only."—Dr. Fergusson, *Indian and Eastern Architecture.*

তখনই বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল; তাঁহার বর্ণনায় ইহাই উপলব্ধি হয়। বোম্বাই এবং পুনার মধ্যবর্ত্তী পথে কার্লি নামক একটী পল্লী আছে। তত্রত্য গিরি-গুহা এবং সেই গিরি-গুহার সম্মুখস্থিত লাট বা স্তম্ভ প্রাচীন-ভারতের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন রূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। গিরি-গুহার সম্মুখস্থিত স্তম্ভের উপর চারিটি সিংহমূর্ত্তি শোভমান। এড়াণ নামক স্থানে ঐরূপ দুইটী স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। সেই দুইটী স্তম্ভে গুপ্তবংশীয় রাজগণের প্রবর্ত্তিত শকের উল্লেখ দেখা যায়। কুতব-মিনার সন্নিহিত স্তম্ভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। এই স্তম্ভের বিষয় পূর্ব্বেই (এই খণ্ডের ২৯৬ম—২৯৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করিয়াছি। স্তূপ-সমূহের মধ্যে (ভূপাল-রাজ্যের) ভিল্‌সা-স্তূপ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভিল্‌সা-গ্রামের নিকটে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দশ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে ছয় মাইল ব্যবধানের মধ্যে অন্যূন পাঁচটী স্থানে পঁচিশ-ত্রিশটী স্তূপ আছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম প্রথমে এই সকল স্তূপের বিষয় উল্লেখ করেন। তাঁহার পর অনেকেই ঐ সকলের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল স্তূপের মধ্যে সাচীর স্তূপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ও কারুকার্য্য-সমন্বিত। এই স্তূপের জঙ্ঘা (পোতা বা গৃহস্থান) ১৪ ফিট, গম্বুজের উচ্চতা ৪২ ফিট, জঙ্ঘার অব্যবহিত উপরে গম্বুজের ব্যাস ১০৬ ফিট, উহার রেল বা গরাদিয়া ১১ ফিট উচ্চ, এবং উহার সিংহ-দ্বার ৩৩ ফিট উচ্চ। সিংহদ্বারের কারুকার্য্য শিল্পনৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়। স্তূপের মধ্যস্থল কাদার গাঁথুনিতে ইটের স্তূপ দ্বারা পরিপূর্ণ। উপরিভাগ প্রস্তর দ্বারা সংগঠিত। সেই প্রস্তরের উপরে সিমেণ্ট এবং সিমেণ্টের সহযোগে নানা কারুকার্য্য ও মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। সাচীর সন্নিকটে, সাচী হইতে ছয় মাইল দূরে সোনারিতে, তিন মাইল অন্তরে সাতধারায় এবং সাত মাইল দূরে ভোজপুরে আরও অনেকগুলি স্তূপ আছে। ভোজ-পুরের পাঁচ মাইল দূরে ওঁধারে আরও কতকগুলি স্তূপ দৃষ্ট হয়। মোটের উপর একটি ক্ষুদ্র জেলার মধ্যে অন্যূন ষাটটি স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল স্তূপ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে স্থাপত্যের পরিচয় পরিদৃশ্যমান্। কাশীর সন্নিকটে সারনাথে যে স্তূপ আছে, অনেকেই তাহা দেখিয়া থাকিবেন। জেনারেল কানিংহাম অনুমান করেন, ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে ঐ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এইরূপ, 'জরাসন্ধকা বৈঠক' নামক স্তূপ এতৎপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে। মগধে এই স্তূপ অবস্থিত। এই স্তূপের জঙ্ঘা ১৪ ফিট, জঙ্ঘার উপর উচ্চতা ২৯ ফিট এবং ব্যাস ২৮ ফিট। হুয়েন সাং এই স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। হুয়েন-সাং এবং ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আসিয়া কতকগুলি স্তূপ দেখিয়াছিলেন। সে সকল স্তূপের বর্ণনা হুয়েন-সাঙের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু এখন আর সে সকল স্তূপের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ, অনেক স্তূপ এক্ষণে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক স্তূপের চতুর্দ্দিকে কারুকার্য্য-সমন্বিত পরিবেষ্টনী এবং তোরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বুদ্ধগয়ার এবং ভারুৎ নামক স্থানের পরিবেষ্টনীর ও তোরণের প্রাচীনত্বের বিষয় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বুদ্ধগয়ায় ২৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এবং ভারুতে ২০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ঐ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল,—ফারগুসন

স্তূপ-সমূহ।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। এলাহাবাদ ও জব্বলপুরের মধ্যস্থলে ভারুৎ অবস্থিত। ঐ স্তূপে কারুকার্য্যখচিত যে সকল প্রস্তর ও লৌহ ছিল, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তৎসমুদায় লইয়া গিয়া আপন আপন গৃহের কাজে ব্যবহার করিতেছে। নানাস্থানের স্তূপ সন্নিহিত তোরণ-দ্বার এবং স্তূপবেষ্টনকারী রেলিং ও স্তম্ভ প্রভৃতি দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া ফারগুসন লিখিয়া গিয়াছেন,—'বুদ্ধগয়ার এবং ভারুতের রেলিং-সমূহ ২০০ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২৫০ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত। উহা হিন্দু-ভাস্কর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। উহার মধ্যে কোনও বৈদেশিক প্রভাব নাই। উহাতে শিল্পীর ভাব সম্পূর্ণ পরিব্যক্ত। হস্তী, হরিণ বানর প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তি উহাতে খোদাই করা হইয়াছিল, পৃথিবীর কোনও দেশের ভাস্কর্য্যে তাহার তুলনা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। কেবল জীবজন্তুর মূর্ত্তি বলিয়া নহে; উহার মধ্যে যে সকল বৃক্ষাদি খোদিত আছে, তাহা সঠিক, সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ প্রশংসার্হ। যে সকল মনুষ্য-মূর্ত্তি উহার সহিত অঙ্কিত আছে, সেগুলি যদিও বর্ত্তমান-কালোচিত পাশ্চাত্য-দেশের রুচিসঙ্গত সৌন্দর্য্যের আধার নহে; কিন্তু তৎসমুদায় সম্পূর্ণ স্বভাবসঙ্গত, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। যে সকল স্থানে এক সঙ্গে ঐরূপ কতকগুলি মূর্ত্তি খোদিত আছে, সে সকল স্থলে মূর্ত্তিগুলির কার্য্যকারিতা পর্য্যন্ত সহজেই প্রতীত হয়। ইহার অপেক্ষা সুন্দর স্বভাবসঙ্গত শিল্প কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।* সাচীর স্তূপের সম্মুখে চারিটি তোরণ-দ্বার। সেই তোরণ-দ্বারের সম্মুখে ও পশ্চাতে নানারূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি খোদিত আছে। প্রধানতঃ বুদ্ধের জীবনের নানা-দৃশ্য তাহাতে প্রকটিত। পাঁচ শত জন্মের পর, শাক্য-মুনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। বৌদ্ধ জাতক-বর্ণিত সেই পাঁচ শত জন্মের নানা ঘটনাবলীর চিত্র উহার মধ্যে খোদিত। সিংহল-দেশীয় গ্রন্থাদিতে এতদ্বিষয়ে যে বর্ণনা আছে, উত্তরদিকের তোরণ-দ্বারে তাহার অনেক বিষয়ই চিত্রাকারে খোদিত। অন্যান্য খোদিত চিত্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্র এবং স্ত্রীপুরুষের পানাহার ও প্রেমালাপ প্রভৃতির প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে এই সকল তোরণ-দ্বার বিদ্যমান ছিল, অনেকেই তাহা স্বীকার করেন। অন্যান্য স্থলেও স্তূপ-সান্নিধ্যে যে সকল তোরণ ও বৃতি পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়েও এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি খোদিত। চৈত্যের অর্থাৎ ধর্ম্মালয় বা মিলন-মন্দির প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের শিল্প-নৈপুণ্যের অশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। বৌদ্ধদিগের চৈত্য-সমূহ প্রায়ই পাহাড়ের অভ্যন্তর খোদাই করিয়া গুহাকারে নির্ম্মিত। বৌদ্ধ-চৈত্যের ইহাই বিশেষত্ব। ভারতবর্ষে প্রায় ত্রিশটি চৈত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার একটি ভিন্ন অপর সকলগুলিই গুহার মধ্যে অবস্থিত। হিন্দুদিগের মন্দির অথবা খৃষ্টান-দিগের গির্জ্জা বাহ্য-পরিদৃশ্যমান।

চৈত্য প্রভৃতি।

* "Some animals such as elephants, deers, monkeys are better represented there than in any sculptures known in any part of the world; so, too, are some trees, and the architectural details are cut with an elegance and precision which are very admirable. The human figures, too, though very different from our standard of beauty and grace, are truthful to nature and where grouped together combined to express the action intended with singular felicity. For an honest, purpose-like-pre-Raphaelite kind of art, there is probably nothing much better to be found any-where."—Dr. Fergusson *Indian and Eastern Architecture*.

কিন্তু বৌদ্ধগণের চৈত্য গুহার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া উহার বহির্ভাগ আদৌ সুদৃশ্য নহে। তবে চৈত্যের সম্মুখভাগে যে সকল তোরণ-দ্বার আছে, তৎসমুদায়ে কারুকার্য্যের অবধি নাই। বৌদ্ধগণের যত চৈত্য বা মন্দির আছে, তাহার অধিকাংশই (দশ ভাগের নয় ভাগ চৈত্য) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তবর্ত্তী পর্ব্বত-সমূহ চৈত্য-নির্ম্মাণের উপযোগী বলিয়াই বোধ হয়, ঐ অঞ্চলে অধিক সংখ্যক চৈত্য পর্ব্বত-গাত্রে ঐ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৌতম-বুদ্ধের লোকান্তরের পর তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজগৃহে বৌদ্ধগণের প্রথম সঙ্ঘ আহূত হইয়াছিল। রাজগৃহের 'শতপর্ন্নি' গুহার মধ্যে বা গুহার সন্নিকটে ঐ সঙ্ঘের অধিবেশন হয়। মগধে অবস্থিতি-কালে হুয়েন-সাং ঐ গুহা দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত গুহা স্বভাবোৎপন্ন। শিল্প-চাতুর্য্যের সমাবেশে উহা অভিনব আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। গয়ার উত্তরে, ষোল মাইল দূরে, কতকগুলি গুহা আছে। সেই গুহাগুলির মধ্যে একটি গুহা লোমশ ঋষির গুহা নামে প্রসিদ্ধ। সেই গুহার অভ্যন্তর মন্দিরের ন্যায় খিলান-বিশিষ্ট। তাহার সম্মুখভাগ নানারূপ কারুকার্য্যে বিভূষিত। মধ্যবর্ত্তী হল বা প্রকোষ্ঠের দৈর্ঘ্য ৩৩ ফিট এবং বিস্তৃতি ১৯ ফিট। তাহার পর গোলাকার অন্যান্য প্রকোষ্ঠ সমূহ বিদ্যমান। খৃষ্ট-জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গুহা খোদিত হইয়াছিল, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। পশ্চিম-ঘাট গিরিশ্রেণীর মধ্যে পাঁচ-ছয়টি গুহা আছে। তন্মধ্যে 'ভজ' নামক গুহাটি অতি প্রাচীন বলিয়া অভিহিত হয়। এই গুহাও খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এই গুহার মধ্যে কতকগুলি কাঠের বরগার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত। সেই বরগাগুলি কত কাল পূর্ব্বে সংযোজিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। বেধসর, নাসিক এবং কার্লি প্রভৃতি স্থানের গুহাও স্থাপত্যের ও শিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কার্লির চৈত্যের সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। কার্লি-চৈত্যের স্তম্ভগুলি সম্পূর্ণরূপ লম্বভাবে অবস্থিত। প্রতি স্তম্ভেরই দীর্ঘ জঙ্ঘা এবং অষ্টকোণ-সমন্বিত শীর্ষদেশ। শিরোভাগ বহুমূল্য কারুকার্য্যে বিভূষিত। তাহার উপরে দুইটি করিয়া হস্তী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। আর প্রত্যেক হস্তীর উপর দুইটি করিয়া মনুষ্য উপবিষ্ট। কোনও স্তম্ভে এক জন পুরুষ ও এক জন স্ত্রী, আর কোনও স্তম্ভে দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এরূপ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভ কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্লির এই চৈত্য বৌদ্ধগণের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই সাধারণতঃ বিশ্বাস। কিন্তু ঐ চৈত্যের অনতিদূরে একটি শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়; তাহার সম্মুখস্থ স্তম্ভে সিংহমূর্ত্তি বিরাজমান; তাই কার্লির চৈত্য হিন্দুদিগের দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। "পিক্টোরিয়াল গ্যালারি অব আর্টস" গ্রন্থে কার্লির গিরিগুহাভ্যন্তরস্থিত শিবমন্দিরের এই ধ্বংসাবশেষের বিষয় লিখিত আছে। প্রাচীন হিন্দুগণের স্থপতি-বিদ্যার পরিচয়-প্রসঙ্গে সেখানে ঐ কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।* কিন্তু ফারগুসন শিবমন্দিরাদির

* Vide, *Pictorial Gallery of Arts*, Series II., Bk. I. Chapter I.

কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। অজন্তার গিরিগুহায় চারিটী চৈত্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। ঐ চৈত্যগুলি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণতঃ প্রকাশ। বোম্বাই বন্দরের সাত ক্রোশ দূরে সালসেটি দ্বীপের কেনারি গিরিগুহাও এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গুহা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, আজিও তাহা নির্ণীত হয় নাই। কিংবদন্তী এই যে, ঐ গুহার অভ্যন্তরে সুরঙ্গ ছিল। সেই সুরঙ্গ দিয়া লোকে বেসিনে গমনাগমন করিত। এই গুহার মধ্যে বুদ্ধদেবের এক প্রকাণ্ড প্রস্তর-মূর্ত্তি বিদ্যমান। গুহার একটী চতুষ্কোণ কক্ষের কারুকার্য্যের বিষয় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই গুহার অভ্যন্তরস্থিত বৌদ্ধমন্দির এবং তৎসন্নিহিত অষ্টকোণ স্তম্ভোপরি সিংহ-মূর্ত্তি প্রাচীন স্থপতি-বিদ্যার ও শিল্প-নৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়। বৌদ্ধগণের বিহার-সমূহের মধ্যে পাটনার দক্ষিণস্থিত নালন্দার বিহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন-সাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনও এই বিহারের সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। রাজন্যবর্গ পর্য্যায়ক্রমে এই স্থানের বিহার-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অব-শেষে একজন নৃপতি সমস্ত বিহারগুলিকে উচ্চ একটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া দেন। সেই প্রাচীরের বহির্ভাগেও কতকগুলি স্তূপ এবং দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। জেনারেল কানিংহাম তাহার কয়েকটী অনুসন্ধান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। উড়িষ্যার কটক জেলায় ভুবনেশ্বরের সন্নিকটে তিনটী প্রসিদ্ধ বিহারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী বিহারের নাম 'নাহাপান', অপরটীর নাম 'গৌতমীপুত্র' এবং তৃতীয়টির নাম 'যাদবেত্রী'। প্রথমটী প্রথম শতাব্দীতে, দ্বিতীয়টী দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে এবং তৃতীয়টী পঞ্চম শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। শেষোক্ত বিহারের মধ্যে সপার্ষদ্ বুদ্ধদেবের বৃহৎ এক প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। অজন্তার বিহার সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূ-হলোদ্দীপক। এই বিহারে চিত্র-শিল্পের উৎকর্ষের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে পরিচয় অন্যত্র বিরল। অজন্তার একটী বিহারের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি পরিমাণ ৬৫ ফিট। কুড়িটী স্তম্ভের উপর ঐ বিহার সুরক্ষিত। বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের জন্য উহার মধ্যে দুই পার্শ্বে যোলটী প্রকোষ্ঠ; মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড হল, সম্মুখে বারান্দা, তদন্তে উপাসনার স্থান। এই বিহারের প্রাচীনগাত্র-সমূহ বিচিত্র চিত্রাদিতে শোভিত। সেই সকল চিত্রে বুদ্ধ-দেবের জীবনের ঘটনাবলী চিত্রিত আছে। বিহারের ছাদে এবং স্তম্ভ-গাত্রে লতা-বিতান সম্বলিত বিবিধ কারুকার্য্য খোদিত ও চিত্রিত রহিয়াছে। এই বিহারে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তৎসমুদায় স্বাভাবিক ও সুন্দর। মনুষ্যের মুখের গঠন—সুন্দর ও ভাবপ্রকাশক। ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ অজন্তার গিরিগুহা দর্শন করিয়া তদন্তর্গত চিত্রাদির অনুকরণ করিবার প্রয়াস পান। সেই সকল চিত্রের বর্ণের ঔজ্জ্বল্য-সম্পাদন করিতে গিয়া, তাঁহারা সেই অমূল্য চিত্র-সম্পদের অনেক ধ্বংস-সাধন করিয়া গিয়াছেন। অজন্তায় একটি গুহা—রাশি-চক্রের গুহা বলিয়া অভিহিত। সেই গুহায় প্রকাণ্ড একটি রাশিচক্র অঙ্কিত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন, রাশিচক্রের ঐ গুহায় যে চক্র অঙ্কিত ছিল, তাহা বৌদ্ধদিগের ঘটিচক্র; লোকে ভ্রমক্রমে উহাকে রাশিচক্র বলিত। মান্দু হইতে ত্রিশ

মাইল পশ্চিমে আট নয়টি বিহারের বিদ্যমানতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান বিহারটির পরিমাণ প্রত্যেক দিকে ৯৬ ফিট। উহার সহিত পাঠ-গৃহ সংলগ্ন আছে এবং ২২০ ফিট দীর্ঘ একটি বারান্দা আছে। এই বিহারের একটি প্রাচীরে অজন্তার বিহারের স্থায় চিত্রাদি অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই সকল চিত্রে অশ্বারোহীদিগের শোভা-যাত্রা এবং স্ত্রীপুরুষের নৃত্যাদি প্রতিফলিত। ইলোরার গিরিগুহায় বিশ্বকর্ম্মা চৈত্যের সহিত কতকগুলি বিহার বিদ্যমান ছিল। এই সকল বিহারের একটির দৈর্ঘ্য ১১০ ফিট এবং বিস্তৃতি ৭০ ফিট। এইরূপ নানাস্থানে আরও বহু বিহার, চৈত্য ও গুহা-মন্দির বিদ্য-মান ছিল। কিন্তু কাল-প্রভাবে সে সকল এখন ধ্বংসপথে অগ্রসর। এখনও যে সকল গুহামন্দির, বিহার ও চৈত্য প্রভৃতির পরিচয় প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের, শিল্প-নৈপুণ্যের, ভাস্কর্য্যের ও চিত্র-শিল্পের পরিচয় দিতেছি, কিছুকাল পরে সে সকলও উপকথায় অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। প্রাচীন ভারতের স্থপতি-বিদ্যার পরিচয় প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের কতক-গুলি মন্দিরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির, পুরীধামে জগন্নাথ-দেবের মন্দির, যত আধুনিক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস হউক না কেন, খৃষ্ট-জন্মের অনেক পূর্ব্বে যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় হইতে পারে না। ভুবনেশ্বরে শত শত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সকলের ভগ্নাবশেষ দেখিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ভুবনেশ্বরের যেটি প্রধান মন্দির, সেই মন্দির প্রস্তর খোদাই করিয়া সংগঠিত। কত মূর্ত্তি, কত কারুকার্য্য সেই মন্দির-গাত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে! মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিয়া, বিস্ময়ান্বিত হইয়া, ডক্টর ফারগুসন বলিয়া গিয়াছেন,—'এই মন্দিরের খোদাই-কার্য্যে সৌন্দর্য্যের অবধি নাই। এমন সুশৃঙ্খলায় বিজ্ঞানসম্মত-রূপে প্রস্তরগুলি সজ্জিত করা হইয়াছে যে, ইউরোপীয় ভাস্করগণের পক্ষেও এইরূপভাবে মন্দির নির্ম্মাণ সুকঠিন। ভুবনেশ্বরের ও জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের বিমান, নাটমন্দির, ভোগমন্দির প্রভৃতিও শিল্পচাতুর্য্যের পূর্ণ পরিচায়ক। উড়িষ্যার পর উত্তর-ভারতের বুন্দেলখণ্ড-দেশে কতকগুলি প্রাচীন মন্দিরের নাম উল্লেখযোগ্য। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত খাজুরাহো নামক স্থানে প্রায় ত্রিশটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। ঐ মন্দিরগুলি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন, ৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উড়িষ্যার মন্দিরাদি যে প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, বুন্দেল-খণ্ডের মন্দির-নির্ম্মাণ-প্রণালী তাহা হইতে স্বতন্ত্ররূপ। তত্রত্য বিমান-সমূহের মধ্যে একটি বিমান পরিবেষ্টন করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিমান বিরাজিত। সেই বিমানের জঙ্ঘা কিছু উচ্চ এবং তাহার মধ্যে তিন সারি খোদিত প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। একটি মন্দিরের গাত্রে খোদিত লতা-পাতা কারুকার্য্যের মধ্যে, জেনারেল কানিংহাম ৮৭২টি মূর্ত্তি গণনা করিয়াছিলেন। সেই মন্দিরটির উচ্চতা ১১৬ ফিট। জঙ্ঘা বা পোতা হইতে সে উচ্চতার পরিমাণ ৮৮ ফিট। মন্দিরের বহিরাংশ বহুমূল্য কারুকার্য্য-সমন্বিত। ভূপাল-রাজ্যে যে প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়, সে মন্দিরও স্থাপত্যের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে। ১০৬০ খৃষ্টাব্দে

প্রাচীন মন্দিরাদি।

মালবের রাজা ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ঐ মন্দিরের খোদাই কার্য্যে সূক্ষ্মতা ও স্বাভাবিকতা পরিস্ফুট। রাজপুতনার মধ্যেও অনেকগুলি দ্রষ্টব্য মন্দির আছে। সেই সকল মন্দিরের মধ্যে চিতোরের মহারাণা কুম্ভের পত্নী মীরাবাই কর্তৃক যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা চিরস্মরণীয়। রাণী মীরাবাই (১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সে মন্দিরদ্বয় এক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাহার ধ্বংসমধ্যেও কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রাণা কুম্ভ জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি সাদ্রীতে যে জৈন-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং চিতোরে যে মার্বেল প্রস্তর-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্র-দেশেও স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি মন্দির আছে। দক্ষিণ-ভারতের প্রস্তর-গাত্রে খোদিত দেবালয়াদির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে যে সকল উচ্চচূড় গগনস্পর্শী মন্দির বিদ্যমান আছে, স্থাপত্যের ইতিহাসে তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। যদিও তুলনায় তাহার অনেকগুলি আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভবপর; কিন্তু স্থাপত্যের ইতিহাসে তৎসমুদায় যে উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়া আছে, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। উত্তর-ভারতে হিন্দুগণের স্থাপত্যের নিদর্শন-সমূহ যখন লোপ পাইতে বসিয়াছিল, দাক্ষিণাত্য তখনও পর্যান্ত আপনার শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। উত্তর-ভারতের এবং দাক্ষিণাত্যের বহু-প্রদেশে যখন মুসলমানগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, কৃষ্ণা-নদীর দক্ষিণাংশে তখনও হিন্দুগণের প্রভাব একেবারে খর্ব্ব হয় নাই। সুতরাং সে সময়েও দাক্ষিণাত্য স্থপতি-বিদ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কর্ণাট প্রদেশে যখন ইংরেজ ও ফরাসীতে বিবাদ-বিসম্বাদ চলিয়াছে, তখনও দাক্ষিণাত্য আপনার শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশের সুবিধায় বঞ্চিত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে এখনও যে সকল মন্দির দর্শকের নয়নমন হরণ করে, ঐ বিপ্লবের সময় তাহার কয়েকটি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোরের দেবমন্দির একটি প্রাচীন মন্দির বলিয়া অভিহিত। কাঞ্চীর (কঞ্জেভরমের) রাজা ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের উচ্চতা ১৯০ ফিট। এমন সুদৃশ্য কারুকার্য্য-সমন্বিত মন্দির পৃথিবীতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরের জঙ্ঘা দ্বিতল ও লম্বভাবে অবস্থিত। জঙ্ঘার উপরিভাগ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত তেষট্টি স্তর বা তল আছে। প্রতি স্তরেই (তলেই) অশেষ কারুকার্য্যের নিদর্শন বিদ্যমান। ইলোরায় পাহাড় খোদাই করিয়া যে মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহার কারুকার্য্যাদি তাহা হইতে ভিন্নরূপ হইলেও আদর্শ উভয়েরই অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। চূড়ার উপরিভাগস্থ গম্বুজটি একখানি প্রস্তর খোদিত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ঐ গম্বুজ মন্দির-শীর্ষে যেন মুকুটের ন্যায় শোভমান। চিদাম্বরমে সমুদ্র-সন্নিকটে, কাবেরী নদীর মোহানায়, যে পার্ব্বতী-মন্দির বিদ্যমান আছে, তাহার প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। ঐ মন্দির দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়া-ছিল। উহার কারুকার্য্য প্রভৃতি পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যের প্রবর্ত্তনা। ঐ মন্দির-সংলগ্ন গোপুর বা তোরণদ্বার এবং সহস্র-স্তম্ভযুক্ত হল বা প্রকোষ্ঠ বিশেষ আড়ম্বর-পরিপূর্ণ। প্রকোষ্ঠের স্তম্ভসমূহ এক একখানি গ্রেণাইট প্রস্তরে খোদিত হয়। প্রত্যেক

স্তম্ভ অশেষ কারুকার্য্য-সমন্বিত। সহস্র স্তম্ভ এমন সুশৃঙ্খলায় শ্রেণীবদ্ধ যে, তাহা দেখিলে গ্রেণাইট প্রস্তর-স্তম্ভের অরণ্য বলিয়া ভ্রম হয়। তাঞ্জোরের নিকটবর্ত্তী সেরিঙ্গামে এবং মাদুরায় যে সকল মন্দির আছে, তুলনায় আধুনিক হইলেও, তাহাও স্থাপত্যের পরিচায়ক। যে দ্বীপ-শ্রেণী ভারতবর্ষ ও লঙ্কার (সিংহলের) মধ্যস্থলে শৃঙ্খলের ন্যায় অবস্থিত, তাহার উপরে বিশ্ববিশ্রুত রামেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান। এই মন্দির দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন। এই মন্দির ৮৬৪ ফিট দীর্ঘ, ৬৭২ ফিট প্রস্থ এবং ২০ ফিট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের চারিপার্শ্বে চারিটি গোপুর বা তোরণ-দ্বার। এই মন্দিরের বারান্দায় এই মন্দিরের গৌরব যেন বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। বারান্দার দৈর্ঘ্য প্রায় চারি হাজার ফিট। বারান্দার পরিসর কোনও স্থলে ২০ ফিট, কোনও স্থলে ৩০ ফিট এবং উচ্চতা ৩০ ফিট। রামেশ্বরের মন্দিরের বর্ণনায় ডক্টর ফারগুসন বলিয়াছেন,—'চিত্রাঙ্কনে এ মন্দিরের কারুকার্য্য বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। ৭০০ ফিট বিস্তৃত স্থানের অবচ্ছিন্ন কারুকার্য্য চিত্রে প্রকটন করা কথনই সম্ভবপর নহে। খ্রীষ্টানদিগের কোনও গীর্জ্জাই ৫০০ ফিটের অধিক দীর্ঘ নহে। পৃথিবী-বিখ্যাত সেণ্টপিটার্স গির্জ্জার বারান্দার দৈর্ঘ্য ৭০০ ফিট। কিন্তু রামেশ্বরের মন্দিরের বারান্দার দৈর্ঘ্য-পরিমাণ ৪০০০ চারি সহস্র ফিট। দৃঢ় গ্রেণাইট প্রস্তরে উহা নির্ম্মিত।' * বিজয়নগর—দক্ষিণ-ভারতে হিন্দুরাজ্যের শেষ স্মৃতি। ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দীকাল বিজয়নগর স্বাধীনরাজ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। বিজয়নগরে সেই সময়ে যেমন বেদাদি শাস্ত্র-পাঠের ও লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল; স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের চর্চ্চায়ও বিজয়নগর সেইরূপ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। বিজয়নগরে হিন্দুগণের স্থাপত্যের এতই ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় যে, ভারতের অন্য কোনও নগরে তাহার তুলনা নাই। বিজয়নগরের প্রায় এক শত ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে, তারপুত্রী নামক স্থানে, স্থাপত্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তত্রত্য পরিত্যক্ত মন্দিরস-সান্নিধ্যে দুইটি গোপুর বা তোরণ-দ্বার দৃষ্ট হয়। সেই গোপুর বা তোরণ-দ্বারে সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যের ও শিল্প-চাতুর্য্যের প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান। পাথর খোদাই করিয়া এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আর আর যে সকল স্থাপত্যের নিদর্শন আছে, তন্মধ্যে জৈনগণের এবং চৌলুক্য রাজগণের কীর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে সারি সারি কয়েকটি জৈনমন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরের মধ্যস্থলে আঙ্গিনা; আঙ্গিনার চতুষ্পার্শ্বে প্রকোষ্ঠ; পশ্চাদ্ভাগে বিমান বিদ্যমান। মন্দিরের মধ্যে তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি। দাক্ষিণাত্যের জৈনগণের

---

* "No engraving...can convey the impression produced by such a display of labour when extended to an uninterrupted length of 700 feet. None of our cathedrals are more than 500 feet, and even the nave of St, Peter's is only 600 feet from door to the apse......It is the immensity of the labour here displayed that impresses us much more than its quality, and that, combined with a certain picturesqueness and mystery produce an effect which is not surpassed by any other temples in India and by very few elsewhere."—Dr. Fergusson's *Indian and Eastern Architecture.*

প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর-মূর্ত্তিসমূহ তাঁহাদের বিশেষ গৌরবের পরিচায়ক। ডিউক-অব-ওয়েলিংটন (ওয়েলেসলি), শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণের সময়, বেলগুলায় সেই সকল মূর্ত্তির একটী মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। সেই প্রস্তর-মূর্ত্তির উচ্চতা ৭০ ফিট ৩ ইঞ্চি। নিরেট পাহাড়ের গাত্র খোদাই করিয়া সেই মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। পাহাড়টী এখন লোপ-প্রাপ্ত; কিন্তু মূর্ত্তিটী আজিও লোকের বিস্ময় আনয়ন করে। ফারগুসন বলেন,—'এরূপ জাঁকজমকপূর্ণ মূর্ত্তি মিশর ভিন্ন অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সেই মিশরেও এত উচ্চ কোনও মূর্ত্তি আছে বলিয়া জানা যায় নাই।' * ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে জৈনদিগের আর আর যে সকল কীর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে গুজরাটের অন্তর্গত পালিতানা পল্লীতে বহু মন্দির বিদ্যমান। দুইটী পর্ব্বতের উপরে এবং তাহাদের অধিত্যকা-প্রদেশে যে শতাধিক মন্দির অবস্থিত, তাহার সৌন্দর্য্য-সম্পদের অবধি নাই। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পালিতানায় কতকগুলি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রচার। গির্ণারের জৈনমন্দির-সমূহও বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। দশম শতাব্দীতে সেই সকল মন্দির নির্ম্মিত হয়। গির্ণার-পর্ব্বতের অনতিদূরে সোমনাথের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মন্দির। গজনীর মামুদ এই মন্দিরের ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন। মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আজিও দর্শকের নয়নে অশ্রুসঞ্চার করিতেছে। আবু পর্ব্বতের জৈনমন্দির-সমূহ অতুলনীয়। ভারতবর্ষে যে সকল প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে আবু-পর্ব্বতের জৈনমন্দির-সমূহই শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তর বিনির্ম্মিত। তিন শত মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী পর্ব্বত-গাত্র হইতে শ্বেতপ্রস্তর কাটিয়া আনিয়া এই সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দির-সমূহের মধ্যে একটী মন্দির বিমলসাহ কর্ত্তৃক ১০৩২ খৃষ্টাব্দে এবং অপর একটী মন্দির তেজপাল ও বাস্তুপাল নামক ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মন্দিরের চাঁদনি অতি সুন্দর ও সুদৃশ্য-কারুকার্য্য-সমন্বিত খোদিত স্তম্ভের উপর অবস্থিত। গম্বুজের অভ্যন্তর বিচিত্র কারু-খচিত চিত্রাদিতে বিভূষিত। প্রস্তর-গাত্র খোদিত করিয়া এরূপ সুন্দর চিত্র নির্ম্মাণ—অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। চৌলুক্য-বংশীয় রাজগণের কীর্ত্তি-স্মৃতি রূপ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন—বিন্ধ্যপর্ব্বত ও কৃষ্ণা-নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রধানতঃ পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণা-নদীর দক্ষিণে মহীশূর প্রদেশে এবম্বিধ স্থাপত্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বল্লাল (বেল্লাল বা বেলাল) রাজগণ মহীশূর এবং কর্ণাট প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই বংশের রাজত্বকালে ঐ প্রদেশে যে সকল মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল, স্থাপত্যের ইতিহাসে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বীণাদিত্য বল্লাল ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি সোমনাথপুরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই মন্দিরের উচ্চতা মাত্র ত্রিশ ফিট হইলেও তাহার কারুকার্য্য সুপ্রসিদ্ধ। ঐ বংশের বিষ্ণুবর্দ্ধন ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে বৈলারে যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, সেই মন্দির এবং তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া যে সকল মন্দির ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, তৎসমুদায় ভারতের

* "Nothing grander or more imposing exists anywhere out of Egypt and even there no known statue surpasses it in height."—Fergusson's *Indian and Eastern Architecture.*

শিল্প-চাতুর্য্যের ও স্থপতি-বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। বল্লাল-বংশীয় রাজগণের আর একটী কীর্ত্তি—হলাবিদের মন্দির-সমূহ। ঐ স্থানে ক্ষিতীশ্বরের মন্দির নামক যে একটী মন্দির আছে, সে মন্দিরের কারুকার্য্যের তুলনা হয় না। বল্লাল-বংশীয় পঞ্চম নৃপতি বিজয় কর্ত্তৃক ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। জঙ্ঘা বা পোতা হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়া পর্য্যন্ত এই মন্দিরের সর্ব্বত্রই খোদিত কারুকার্য্যে খচিত। সে কারুকার্য্য ভারতীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন। এই ক্ষিতীশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে একটী বৃহৎ যুগ্মমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সে দুই মন্দিরের কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই, ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে, মুসলমানগণের আক্রমণে মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ হয়। কথিত হয়, ছিয়াশী বৎসর ধরিয়া ঐ যুগ্মমন্দিরের কার্য্য চলিতেছিল। কার্য্য শেষ হইবার সমসময়ে শিল্পিগণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফারগুসন বলিয়াছেন,—'এই যুগ্ম-মন্দিরে এত বিভিন্ন প্রকারের এবং জটিল কারুকার্য্য আছে যে, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। পাঁচ ছয় ফিট উচ্চ জঙ্ঘার উপর এই মন্দির নির্ম্মিত। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডে সেই জঙ্ঘা আবৃত। এই মন্দিরের কারুকার্য্য নানা স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরের বিস্তৃতি ৭১০ ফিট। এই স্তরে অনূন দুই সহস্র হস্তী খোদিত রহিয়াছে। তাহার অনেকগুলির উপরই হাওদা এবং আরোহী বিদ্যমান। দ্বিতীয় স্তরে শ্রেণিবদ্ধরূপে শার্দ্দূল-মূর্ত্তি খোদিত। বল্লাল-বংশীয় হয়শাল কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল,—শার্দ্দূল-শ্রেণী দৃষ্টে তাহাই প্রতীত হয়। কারণ, তিনি রাজচিহ্নরূপে শার্দ্দূল-মূর্ত্তি ব্যবহার করিতেন। তৃতীয় স্তরে অশেষ সৌন্দর্য্যের এবং বিবিধ কারুকৌশলের পরিচয় প্রকটিত। এই স্তরের প্রথমেই কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য, অবশেষে রামায়ণ-বর্ণিত লঙ্কাবিজয়ের ও অন্যান্য দৃশ্য সমূহ। এই সকল চিত্রে সাত শত ফিট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার পর স্বর্গস্থ পশুপক্ষীর প্রতিচিত্র, পূর্ব্বদিকের পুরোভাগে মনুষ্য-জীবনের নানা দৃশ্য। ইহার পর আরও কত ব্যাপার আছে। কোনও অংশে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে; কোনও অংশে নানা দেবদেবী বিরাজমান আছেন; * অনূন চতুর্দ্দশ স্থানে শিবক্রোড়ে পার্ব্বতী বিরাজমানা। বিষ্ণুর নয় অবতার নানা স্থানে পরিদৃশ্যমান; তিন চারি স্থানে ব্রহ্মা অবস্থিত। এই সকল চিত্র এমনই সূক্ষ্মভাবে খোদিত যে, ফটোগ্রাফ ভিন্ন অন্যরূপে এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। † মনুষ্যের পরিশ্রমের ইহা এক অপূর্ব্ব নিদর্শন।'

* ভারতবর্ষে মন্দিরাদির প্রাচীর-গাত্রে ও স্তম্ভ-সমূহে যেরূপ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এবং বৃক্ষ-লতা-ফল-পুষ্প প্রভৃতির প্রতিকৃতি খোদিত ও চিত্রিত আছে, প্রাচীন গ্রীসের মন্দিরাদিতে এবং ইউরোপের আধুনিক ও 'মধ্যযুগের' ধর্ম্মালয়-সমূহে সেইরূপ নানা প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তিতে প্রধানতঃ যীশুখৃষ্টের জীবনের দৃশ্যাবলী অঙ্কিত আছে। প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের গির্জ্জার বাতায়ন প্রভৃতিতে যীশুখৃষ্টের জীবনের ঘটনাবলী সংক্রান্ত এবং অন্যান্য পবিত্র ভাবমূলক ঘটনাসংক্রান্ত চিত্র থাকায় গির্জ্জার শোভা বৃদ্ধি পায়। রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের গির্জ্জার মধ্যে যীশুখৃষ্টের ও তাঁহার মাতা ভার্জ্জিন মেরির এবং পবিত্রাত্ম প্রসিদ্ধ পুরুষগণের মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি-সমূহ বিদ্যমান থাকায় তৎসমুদায়েরও শোভা বৃদ্ধি হয়। বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি অঙ্কনের প্রথাও কোনও কোনও স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের দেবালয় মন্দির-সমূহে কত ভাবে কত প্রকারের প্রতিচিত্র অঙ্কিত ও খোদিত, তাহার তুলনায় ইউরোপের সে সকল চিত্র অতি সামান্য বলিয়াই মনে হয়

† এতৎসম্বন্ধে ডক্টর ফারগুসন বলিয়াছেন,—"Some of these (figures) are curved with

প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণের স্থপতি-বিদ্যার যে সকল ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহার কতকগুলির পরিচয় এতৎপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইল। যে প্রণালীতে প্রাচীন ভারতের মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই প্রণালীকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক ভাগের নাম—দ্রাবিড়ী বা দাক্ষিণাত্য-দেশীয়; দ্বিতীয় বিভাগের নাম—উড়িয়া বা উত্তর ভারতীয়; এবং তৃতীয় বিভাগের নাম—চৌলুক্য-জাতীয়। কৃষ্ণা-নদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশে প্রধানতঃ দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রামেশ্বরের মন্দিরে দ্রাবিড়ী স্থাপত্য পূর্ণ-পরিস্ফুট। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের এবং পুরীধামে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে যে স্থাপত্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহারই অনুসরণে উত্তর-ভারতের স্থাপত্যের উদ্ভব। চৌলুক্য স্থাপত্যের উদ্ভব-স্থান—কৃষ্ণা-নদীর উত্তরস্থিত বিন্ধ্য-পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণবর্ত্তী প্রদেশ। এই ত্রিবিধ ভাস্কর্য্য-প্রণালীর অনুসরণ-ক্রমেই ভারতবর্ষের স্থাপত্য বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে,—ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধগণের এবং হিন্দুগণের স্থাপত্যের পার্থক্যের বিষয় পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। বৌদ্ধ-গণ প্রায়ই গুহার অভ্যন্তরে এবং হিন্দুগণ বহির্ভাগে মন্দির খোদিত করিতেন। বৌদ্ধ-গণের সহিত এতদ্বিষয়ে প্রাচীন দ্রাবিড়ী-স্থাপত্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পর্ব্বতাভ্যন্তরে তাঁহারা (দ্রাবিড়ী-গণ) দেবালয় নির্ম্মাণ করিতেন। ইলোরার গুহামন্দিরকে সেই জন্য কেহ কেহ দ্রাবিড়ী-স্থাপত্যের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। দ্রাবিড়ী-স্থাপত্য অতি প্রাচীন-কালে গুহাভ্যন্তরে বিকাশপ্রাপ্ত হইলেও অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণেও উহার অল্প প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে যে সকল জৈন-মন্দিরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার (প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যের মন্দির-সমূহের) কতকগুলিতে দ্রাবিড়ী প্রণালীর এবং অপর কতকগুলিতে (প্রধানতঃ উত্তর-ভারতের মন্দিরাদিতে) উড়িয়া-প্রণালীর অনুসরণ দেদীপ্যমান্। চৌলুক্য স্থাপত্যের প্রধান পরিচয়-চিহ্ন এই যে, ঐ প্রণালীতে নির্ম্মিত মন্দিরগুলির জঙ্ঘা প্রধানতঃ বহুকোণ-বিশিষ্ট অথবা তারাকৃতি। প্রাচীরগুলি কিয়দ্দূর লম্বভাবে উত্থিত; তাহার উপর হইতে মন্দির চূড়া রথের চূড়ার ন্যায় ক্ষীণ হইয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষের এই সকল স্থাপত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে মনোমধ্যে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয়, —'উড়িষ্যায়- বুন্দেলখণ্ডে, মালবে, মহারাষ্ট্র-দেশে, রাজপুতানায় এবং দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের বিবিধ নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু আর্য্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল আর্য্যাবর্ত্তে—পূতসলিলা গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্ত্তী পুণ্যক্ষেত্র-সমূহে—সে নিদর্শন দেখিতে পাই না কেন?' উত্তরের অনুসন্ধান করিতে গেলে বিষাদে ও ক্ষোভে হৃদয় মুহ্যমান হয়। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানগণ ভারতবর্ষ-লুণ্ঠনে প্রথম প্রবৃত্ত হন। সেই হইতে লুণ্ঠনের পর লুণ্ঠন চলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর কীর্ত্তি-স্মৃতির নিদর্শন দেবালয়-সমূহ বিধ্বস্ত হইতে আরম্ভ হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানগণ গঙ্গা ও যমুনার

স্থাপত্যের প্রণালী-বিভাগ।

a minute elaboration of detail which can only be reproduced by photography, and may probably be considered as one of the most marvellous exhibitions of human labour, to be found even in the patient East."

পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহ অধিকার করেন। সেই সময় হইতে তাঁহারা হিন্দুর দেবালয়-সমূহের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হন। কেবল প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসসাধন করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু সেই সকল মন্দিরের প্রস্তরাদি লইয়া তাঁহারা মসজিদ এবং মিনার-সমূহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, যাহাতে হিন্দুদিগের নূতন মন্দিরাদি আর নির্ম্মিত হইতে না পারে, 'গোঁড়া' মুসলমানগণ তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। আকবর-প্রমুখ দুই-এক জন বাদসাহ সমদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে দুই একটী নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল বটে। কিন্তু পরবর্ত্তি-কালে আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক তৎসমুদায় বিধ্বস্ত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বৃন্দাবনের গোপীনাথের মন্দিরের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। আকবরের রাজত্ব-কালে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক সেই মন্দির নির্ম্মিত হয়। কিন্তু আওরঙ্গজেব ঐ মন্দির ভাঙ্গিয়া দেন। বৃন্দাবনে এখনও মন্দিরের শেষ-স্মৃতি দর্শকের নয়নে অশ্রু আনয়ন করে। রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র, মালব, বুন্দেলখণ্ড, উড়িষ্যা এবং সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রভৃতিতে মুসলমান-গণের প্রভাব তাদৃশ বিস্তৃত হয় নাই; তাই ঐ সকল প্রদেশে স্থাপত্য আজিও অনেকাংশে অব্যাহত আছে। উত্তর-ভারতে পরিবর্ত্তনের প্রবল বন্যায় সকল পরিচয়-চিহ্ন ভাসাইয়া দিয়াছিল। আক্রমণকারী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের স্থাপত্যের এবং শাস্ত্র-গ্রন্থাদির যে বিলোপ-সাধন হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। তবে মোগল-সম্রাটগণ দিল্লী ও আগরা প্রভৃতি স্থানে যে স্থাপত্য রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভারতের গৌরব অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারা যায়। বিশেষতঃ, সেই সকল স্থাপত্য রক্ষা করিবার জন্য সমদর্শী বৃটিশ-গবরমেণ্ট যেরূপ উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে হৃদয়ে কত আশারই উদয় হয়। মোগল বাদসাহগণের সেই সকল স্থাপত্য-শিল্পও ভারতীয় শিল্পেরই গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

ভারতের আদর্শ।

স্থাপত্যের ও শিল্পের নিদর্শন ভারতবর্ষে কত ভাবে কত রূপে অবস্থিত, বর্ণনায় তাহা বুঝান যায় না। যাঁহারাই তৎসমুদায় দেখিবার বা তৎসমুদায় বিষয় আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া ঐ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। বৈদেশিক-গণের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত জোর করিয়া আপনাদের দেশের গৌরব-বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারাও ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব-দর্শনে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছেন। লর্ড ভেলেন্সিয়া দেশ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া রামেশ্বরের মন্দির দর্শন করেন। সেই মন্দির দেখিয়া, চমকিত হইয়া, আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'এ মন্দিরের ঐশ্বর্য্যের বিষয় বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।' * হিন্দুদিগের ভাস্কর্য্যের সহিত গ্রীসের ও মিশরের স্থাপত্যের তুলনা করিয়া অধ্যাপক হীরেণ † বলিয়াছেন,—'স্তম্ভ সমূহের অলঙ্কারাদির জাঁকজমকে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ খোদিত

* "The whole building (Rameswaram) presents a magnificent appearance, which we might in vain seek adequate language to describe."—Valentia, *Travels*, Vol. I.

† "In the richness of decoration bestowed on their pilasters, and among other things in the execution of statues resembling caryatides they (the Hindus) far surpass both those nations (Greeks and Egyptians).—"Heeren's *Historical Researches*.

প্রস্তর মূর্ত্তিতে, হিন্দুগণ গ্রীসকে এবং মিশরকে সম্পূর্ণরূপ পরাভূত করিয়াছে।' ভারতবর্ষের স্থাপত্যের মধ্যে যে সকল কারুকার্য্য আছে, যে সকল প্রতিমূর্ত্তি ও ফল-পুষ্প-পত্র প্রভৃতি খোদিত রহিয়াছে, তৎসমুদায় বর্ণন করিয়া এলফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন,—'এবম্বিধ মূর্ত্তি প্রভৃতির খোদাই কার্য্যে, বিশেষতঃ তন্মধ্যস্থিত বৃক্ষ-লতাদির সমাবেশ-পারিপাট্যে যে উচ্চ-সৌন্দর্য্যের বিকাশ পাইয়াছে, কোনও দেশে তাহার তুলনা নাই।' * বৌদ্ধগণের স্তূপ-সমূহের আদর্শে পাশ্চাত্য-দেশের গির্জ্জার চূড়া-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে, অধ্যাপক ওয়েবার এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। † সারাসেনগণের প্রবর্ত্তিত খিলান বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। মসজিদের গম্বুজে সাধারণতঃ সেই খিলান ব্যবহৃত হয়। কর্ণেল টড দেখাইয়াছেন,—'সারাসেন-দিগের খিলানের মূল—হিন্দুদিগের আদর্শ।' ‡ ত্রিকোণাত্মক খিলানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত গুজরাটের অন্তর্গত বড়নগরের মন্দিরে পরিদৃষ্ট হয়। স্যর উইলিয়ম হাণ্টার বলিয়াছেন,—'আজি পর্য্যন্ত ইংরেজ-জাতির মধ্যে যে সকল আলঙ্কারিক শিল্প-স্থাপত্য বিদ্যমান, ভারতবর্ষের আদর্শ হইতেই তাহার অধিকাংশ পরিগৃহীত। কার্লির এবং অজন্তার গুহা-মন্দির-সমূহে যে সকল সুন্দর কারুকার্য্য আছে, পশ্চিম-ভারতে মার্বেল প্রস্তরের উপরে এবং কাষ্ঠ-ফলকে যে সকল খোদিত অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়, কাশ্মীর-দেশের কারুকার্য্যে আকৃতি ও বর্ণের সে অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ, তৎসমুদায় হইতেই ইংলণ্ডের শিল্পকলায় নূতন আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে।' § মিঃ কোলম্যান বলেন,—'হিন্দুগণ স্থাপত্য-বিষয়ে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে, তাহার ঐশ্বর্য্য ও স্বভাব-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। লতাপাতা-পত্রপুষ্প-সমন্বিত শিল্পভূষণের সৌন্দর্য্যে স্বতঃই বিস্ময় আনয়ন করে। হিন্দু-দিগের ভাস্কর্য্যের এখনও যে সকল ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, তদৃষ্টে ইউরোপীয় স্থপতিগণ সৌন্দর্য্যাদি বিষয়ে অনেক অভিনব ভাব অনুকরণ করিতে পারেন।' ¶

---

* The posts and lintels of the door, the panels and other spaces, are enclosed and almost covered by deep borders of mouldings and a profusion of arabesques of plants, flowers, fruits, men, animals and imaginary beings; in short, of every species of embellishment that the most fertile fancy could devise. These arabesques the running patterns of plants and creepers in particular, are often of an elegance scarcely equalled in any other part of the world."—*Vide*, Elphinstone's *History of India*, Bk III. Chapter VII.

† "It is, indeed, not improbable that our Western steeples owe their origin to the imitation of the Buddhist *topes*."—Weber's *Indian Literature*.

‡ "The Saracen arches are of Hindu origin."—Col Tod's *Rajasthan*, Vol. I.

§ "The English decorative art in our day has borrowed largely from Indian forms and patterns. The exquisite scrolls of the rock-temples at Carli and Ajanta, the delicate marble tracery and flatwood carving of Western India, the harmonious blending of forms and colours in the fabrics of Kashmere, have contributed to the *restoration of taste in England*."—Vide, *Imperial Indian Gazetteer*, Art, "India."

¶ "The remains of their (Hindus') architectural art might furnish the architects of Europe with new ideals of beauty and sublimity."—Coleman, *Hindu Mythology*.

হিন্দুর স্থাপত্যের ও শিল্পনৈপুণ্যের সৌন্দর্য্যের বিষয় ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কর্ণেল টড তাই বলিয়াছেন,—'ভারতবর্ষে যে রাশি রাশি বিভিন্ন প্রকারের স্থাপত্য বিদ্যমান আছে, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। লেখনী লিখিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার বর্ণনায় পরিশ্রমের অন্ত নাই।' * কেবল মন্দির এবং অট্টালিকা বলিয়া নহে; জলাশয়, কূপ এবং সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণেও প্রাচীন-ভারতের স্থপতি-বিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রস্তরের দ্বারা তাঁহারা যে সকল সেতু, পুষ্করিণীর তলদেশ এবং কূপ বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন, অতি প্রাচীন-কালের হইলেও, আজিও তৎসমুদায় তাঁহাদের কৃতিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। †

কলাবিদ্যার অন্তর্গত আলেখ্য বা চিত্রশিল্প প্রাচীন-ভারতে কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এখন তাহা অনুসন্ধান করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়াস-স্বীকারের আবশ্যক হয়। কারণ, চিত্রশিল্প তুলনায় অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হয়; আর দেখাইবার পক্ষে যে নিদর্শন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া সম্ভবপর নহে। যাঁহারা প্রস্তরাদির খোদাই কার্য্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে চিত্রশিল্পে অশেষ পারদর্শী ছিলেন, সহজ-বুদ্ধিতেই তাহা উপলব্ধি হয়। খোদাই-কার্য্যের আদি—চিত্রাঙ্কন। মূর্ত্তি বা ফল-পুষ্প-পত্রাদি অগ্রে অঙ্কিত করিয়া না লইলে কখনই তাহা খোদিত করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং খোদাই-কার্য্যের পূর্ব্বে চিত্রাঙ্কনের আবশ্যক অবিসম্বাদিত। এ হিসাবে, যতদিন ভারতবর্ষে স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা, ততদিন হইতেই চিত্র-শিল্পের সমুন্নতি। সংহিতা-শাস্ত্রে চিত্রব্যবসায়ী জাতির উল্লেখ আছে। বৈশ্যগণের কেহ কেহ চিত্রকার্য্য করিতেন, এবম্বিধ উল্লেখও নানা স্থানে দেখিতে পাই। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ত্রিংশ অধ্যায়ে বৈশ্যদিগের নানা উপবিভাগের মধ্যে চিত্রকরের এবং খোদাইকরের উল্লেখ আছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে চিত্রশিল্পের উন্নতির প্রকৃষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। চিত্রপট-শোভিত গৃহের বর্ণনা রামায়ণের বহু স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। রাবণের গৃহ চিত্রপট-শোভিত ছিল (চিত্রাণি চিত্রশালা গৃহাণি চ। সুন্দর-কাণ্ড, ষষ্ঠ সর্গ, ৩৬শ শ্লোক); শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের সময় যে সকল জাতি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, সেই সকল জাতির মধ্যে চিত্রকর জাতির নামোল্লেখ আছে (মূলবাপা কাংস্যকারাশ্চিত্রকারাশ্চ শোভনাঃ। ‡); ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি পুরবধূগণের কৌতূহল-নিবারণোদ্দেশ্যে সীতাদেবী রাবণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। § মহাভারতে

প্রাচীন ভারতের চিত্র-শিল্প।

---

* "To describe its stupendous and diversified architecture is impossible; it is the office of the pen alone, but the labour would be endless."—*Vide*, Col. Tod's *Rajasthan*, Vol. II.

† এলফিন্‌ষ্টোন তৎপ্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাচীন-ভারতের কূপ, তড়াগ এবং সেতু প্রভৃতির বিষয় বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

‡ বঙ্গদেশে প্রচলিত রামায়ণে এই পংক্তি নাই। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশ-প্রচলিত রামায়ণে ইহা দৃষ্ট হয়। (পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

§ অস্মদ্দেশ-প্রচলিত বাল্মীকির রামায়ণে এতদ্বিবরণের উল্লেখ নাই। কিন্তু এ বর্ণনা কৃত্তিবাসের কল্পিত নহে। অন্য রামায়ণে এতদ্বিষয় লিখিত আছে।

পাণ্ডবগণের সভায় চিত্রপট বিলম্বিত ছিল। মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে চিত্রপটের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয় (পটে চিত্রমিবার্পিতং)। শকুন্তলা এবং চিত্রলেখা চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এবং হরিবংশে চিত্রলেখার অঙ্কিত চিত্রাদির পরিচয় আছে। (হরিবংশ, পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে)। হরিবংশের অন্য আর এক স্থলে (১৩৮ অধ্যায়ে) চিত্র-প্রতিকৃতি, শিলা-প্রতিকৃতি এবং কাষ্ঠ-প্রতিমার উল্লেখ দেখিতে পাই ("চিত্র প্রকৃতিশ্চৈব কাষ্ঠস্য প্রতিমাস্তথা। শিলাপ্রতিকৃতিশ্চৈব দদৃশেঽথ পরন্তপঃ।") মৎস্য-পুরাণের পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে স্তম্ভ-সমূহে পদ্ম, লতা, বল্লী, কুম্ভ, পত্র ও দর্পণ প্রভৃতি চিত্রিত হইবার বিষয় লিখিত আছে। বিশ্বকর্ম্মা-প্রবর্ত্তিত শিল্পশাস্ত্রে চিত্রবিদ্যার পরিচয় দৃষ্ট হয়। ভবভূতির উত্তররামচরিতে লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতাকে চিত্রপট প্রদর্শনের বিষয়ে এবং কালিদাসের শকুন্তলায় "রূপমালেখ্যস্য" বাক্যে ভারতবর্ষে বরাবর চিত্রশিল্পের প্রচলন ছিল, বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পের শেষ স্মৃতি-চিহ্ন—অজন্তার গিরিমন্দিরে অঙ্কিত চিত্র-সমূহ। কত কাল হইল সেই সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না; কিন্তু এখনও সেই সকল চিত্র মানুষের বিস্ময় আনয়ন করিতে সমর্থ। ফারগুসন এ চিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই চিত্র দেখিয়া 'ইণ্ডিয়ান য়্যাণ্টিকোয়ারি' পত্রে মিঃ গ্রিফিথ্‌স্ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এইবার সেই বিষয় উল্লেখ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—'যে সকল চিত্রশিল্পী অজন্তার মন্দির-গাত্রে চিত্র-সকল অঙ্কিত করিয়াছে, তাহারা অমানুষিক ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিল। প্রাচীরের শীর্ষ-প্রদেশে এক টানে তাহারা যে সকল রেখা অঙ্কিত করিয়াছে, তাহা দেখিয়াই প্রথমে আমি স্তম্ভিত হই। কিন্তু তার পর যখন আমি মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত ছাদের ভিতরদিকের প্রতি লক্ষ্য করিলাম, দেখিতে পাইলাম,—যে সকল বক্র রেখা চিত্রাদির মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই যথাযথ ন্যস্ত, একটীও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। ছাদের নিম্নদিকে ঐরূপ চিত্রাদির অঙ্কন যে সহস্রগুণ কষ্টসাধ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। সে চিত্রাঙ্কন দেখিয়া আমার মনে হইল,—দৈবশক্তি ভিন্ন এ অঙ্কন মানব-শক্তিতে সম্ভবপর নহে। ভারতের কোনও ছাত্রকে চিত্রশিল্প শিক্ষা দিতে হইলে, অজন্তার গিরিমন্দিরে তাহারা যে আদর্শ প্রাপ্ত হইবে, তাহার তুলনা নাই। চিত্রগুলিতে কি সুন্দর ভাবের অভিব্যক্তি! প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন স্ব স্ব কার্য্যে বিনিযুক্ত! পুষ্প যেন প্রস্ফুটিত হইতেছে; পক্ষিকুল যেন উড়িয়া যাইতেছে; শ্বাপদ কুলের কেহ যেন ক্রীড়াশীল, কেহ যেন দ্বন্দ্ব-পরায়ণ, কেহ যেন শান্তভাবে ভারবহন করিয়া চলিয়াছে! সকলই যেন সাক্ষাৎ প্রকৃতির অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; সকলই যেন প্রকৃতির আদর্শে সমুৎপন্ন! মুসলমানগণের চিত্রশিল্প হইতে স্বভাবসৌন্দর্য্যে ইহার সম্পূর্ণ পার্থক্য অনুভূত হয়। মুসলমানগণের শিল্প এ তুলনায় যেন অস্বাভাবিক! সুতরাং তাহার পরিপুষ্টিও অসম্ভব।' *

* "The artists who painted them were giants in execution. Even on the vertical side of the walls some of the lines which were drawn with one sweep of the brush

সঙ্গীত-বিদ্যা, স্থপতি-বিদ্যা অথবা চিত্র-বিদ্যা—কোন্ দেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; কেহই তাহা বলিতে পারে না। দার্শনিকগণ বলেন,—'কি শিল্প, কি বিজ্ঞান, কি কোনও অভিনব আবিষ্ক্রিয়া সকলেরই স্ফূর্ত্তিলাভ ঐশ্বরিক শক্তিসাপেক্ষ। চিত্র দেখিলেই মানুষ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না; সঙ্গীত শ্রবণ মাত্রই কেহ গীত-বিদ্যা-বিশারদ হইতে সমর্থ হয় না। যিনি যে বিষয়েই পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন,—মূলে তাঁহাদের সকলের মধ্যেই একটা প্রকৃতি-দত্ত শক্তি ছিল। সেই শক্তির স্ফূর্ত্তিলাভেই তত্তৎকার্য্যে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা। বিহঙ্গমের কলকণ্ঠে সুধালহরী বিনির্গত হইতেছে; সকলেই সে স্বর শ্রবণ করিতেছেন। কিন্তু কয় জন সে স্বরে স্বর মিলাইয়া সঙ্গীতালাপন করিতে পারিতেছেন? প্রিয়জন-বিরহে সকলেরই প্রাণ ব্যাকুল হয়; প্রিয়জনের মূর্ত্তি সকলেই আঁকিয়া রাখিবার কামনা করে। কিন্তু সংসারের কয়টী লোক সে চিত্র অঙ্কনে সমর্থ হয়? প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও সামর্থ্যের অভাবে মানুষ অনেক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারে না। সে এক বিশেষ ক্ষমতা—যদ্দ্বারা মানুষ বিশেষ বিশেষ কলাবিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে পারে।' সুতরাং যে কোনও জাতির মধ্যে শিল্প-বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে কোনও ক্ষমতাই বিকাশ প্রাপ্ত হউক না কেন, অন্যের অনুকরণ মাত্র তাহার মূল নহে; প্রতিভাই তাহার মূল। অন্যের আদর্শ তাহার সেই প্রতিভা-মূলে জলসেচন করে মাত্র; আর তদ্দ্বারা সে মূল অঙ্কুরিত, মুকুলিত ও ফলপুষ্প-সমন্বিত হয়। অনেক স্থলে প্রকৃতিই তাহার প্রতিভা-মূলে জলসেচন করেন; অপরের আদর্শের সাহায্য-গ্রহণ হয় তো তাহার আবশ্যকই হয় না। আমেরিকা আবিষ্কারের আধুনিক ইতিহাসে এ বিষয়ে দুই একটী বেশ বিশদ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে অন্য কোনও দেশের নিকট হইতে কোনরূপ কলা-বিদ্যা শিক্ষা করিবার সুযোগ আমেরিকার অধিবাসীদিগের উপস্থিত হয় নাই,—পাশ্চাত্য ইতিহাসের ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু স্পেনীয়গণ যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় অবতরণ করিলেন, স্পেনীয় সেনাপতি কোর্টেজ যখন সম্রাট মণ্টেজুমার রাজত্বে উপনীত হইলেন, তখন মেক্সিকোর অধিবাসিগণ তাহাদের দেশে বৈদেশিকগণের আগমনের সংবাদ মণ্টেজুমার নিকট যে ভাবে জ্ঞাপন করিয়াছিল, ইতিহাস-পাঠক বোধ হয় অনেকেই তাহা অবগত আছেন।

আদি-নির্ণয় অসম্ভব।

struck me as being very wonderful; but when I saw long delicate curves drawn without faltering with equal precision upon the horizontal surfrce of a ceiling where the difficulty of execution is increased by a thousandfold—it appeared to me nothing less than miraculous...For the the purpose of art education no better examples could be placed before an Indian art-student than those to be found in the caves of Ajanta, full of expression—limbs drawn with grace and action, flowers which bloom, birds which soar, and beasts that spring or fight, or patiently carry burdens; all are taken from Nature's book—growing after her pattern and in this respect differing entirely from Muhammadan arts which is unreal, unnatural, and therefore incapable of development."—*Vide, Indian Antiquary*, Vol. III.

মেক্সিকোর অধিবাসীরা স্পেনদেশ দেখে নাই, স্পেন-রাজ্যের অস্তিত্বের বিষয় পর্য্যন্ত তাহারা অবগত ছিল না। সেই স্বতন্ত্র-ভাষাভাষী, স্বতন্ত্র-বেশভূষাধারী, স্বতন্ত্র-আকৃতিপ্রকৃতিসম্পন্ন মনুষ্যগণ যখন তাহাদের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন মেক্সিকোবাসিগণ আপনাদিগের সম্রাটের নিকট কিরূপভাবে সে পরিচয় প্রদান করিয়াছিল? স্পেনীয়-গণের লিখিত ইতিহাসেই প্রকাশ,—'মেক্সিকোর অধিবাসিগণ বৈদেশিক-গণকে দেখিবা-মাত্র বৈদেশিক-গণের চিত্র আঁকিয়া লইয়াছিল। আগন্তুকগণের কেমন আকার, কেমন বেশভূষা, কিরূপ যানবাহনে তাঁহারা আগমন করিয়াছেন;—দেখিবামাত্র সকলই তাহারা আঁকিয়া লয় এবং সম্রাট মণ্টেজুমার নিকটে গিয়া সেই চিত্র প্রদর্শন করে। মণ্টেজুমা এবং তাঁহার মন্ত্রিবর্গ সেই চিত্র দেখিয়াই সকল বিষয় বুঝিতে পারেন।' মৌক্তিক অক্ষর প্রভৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি (দ্বিতীয় খণ্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা প্রভৃতি), আদি কাল হইতেই চিত্রের দ্বারা মানুষ আপনার মনোভাব জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা পাইত। মেক্সিকোবাসিদিগের এই চিত্রাঙ্কনে এইরূপে বৈদেশিকগণের আগমন-ব্যাপার বুঝাইবার প্রয়াসকেও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সেই আদিম প্রথার অনুসরণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহা বলিয়াই মনকে প্রবোধ দেওয়া যাউক, চিত্রাঙ্কন যে মেক্সিকো-দেশে স্বতঃস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, এতদ্দৃষ্টান্তে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কেবল চিত্রাঙ্কনাদি বলিয়া নহে; স্পেনীয়-গণ যখন মেক্সিকো-দেশে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পান,—মেক্সিকোয় বহুসংখ্যক দেবমন্দির, বহুসংখ্যক অট্টালিকা এবং বহুসংখ্যক বেদী বিদ্যমান রহিয়াছে। 'মেক্সিকো-বিজয়ের ইতিহাস' গ্রন্থে * মিঃ প্রেস্কট এ সকল বিষয় তন্নতন্ন করিয়া লাখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ,—'মেক্সিকো-দেশের দেবমন্দির সমূহের নাম—টেওকালি। সেই সকল দেবমন্দিরের সংখ্যা করা যায় না। মৃত্তিকা, ইষ্টক এবং প্রস্তুর দ্বারা তৎসমুদায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সকল দেবালয়ের জঙ্ঘার পরিমাণ শত শত বর্গফিট এবং মন্দির-সমূহের চূড়ার উচ্চতা ১০০ এক শত ফিটেরও উপর। জঙ্ঘা হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মন্দিরে প্রশস্ত সোপান-শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। মন্দিরের শীর্ষ-দেশে বেদীর উপরে অহর্নিশ অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। রোম-নগরে ভেষ্টার মন্দিরে † যেরূপ অবিরত অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল, সেখানেও সেইরূপ অবিরত অগ্নি

* "The Mexican temples were called *Teocali or Houses of God*, and were very numerous......The bases of many of them are several hundred feet squares and they towered to a height of more than a hundred feet."—Vide. Mr. Prescott, *History of the Conquest of Mexico.* মিঃ প্রেস্কট বলিয়াছেন,—মেক্সিকোর মন্দিরের উপরিভাগস্থ বেদী-সমূহে নরবলি হইত। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া "পিক্টোরিয়াল গ্যালারি অব আর্টস" (*Pictorial Gallery of Arts*) গ্রন্থে গ্রন্থ-সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"Mr. Prescott then speaks of human sacrifices that took place on the summit of the temple; which though not so revolting as those connected with the worship of Siva in India, cannot be contemplated without a shudder." ইহাঁরাই আবার নিরপেক্ষ ইতিহাস-লেখক!

† *Vesta*—"One of the great divinities of the ancient Romans, the virgin Goddess of the hearth, in honour of whom a sacred fire was kept constantly burning under the charges of six stainless virgins."

জ্বলিত। মেক্সিকো-সহরের প্রধান দেবালয়ের চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে অনূ্ন ছয় শত বেদীতে প্রতিনিয়ত অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। দেশের অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ বেদী-সমন্বিত বহুসংখ্যক মন্দির ছিল। গভীর অন্ধকার রজনীতে ঐ সকল বেদীর প্রজ্বলিত অগ্নিতে নগর আলোকিত হইত।' মেক্সিকো-রাজ্যের পালেঙ্কিউ-সহরে আর যে একটী মন্দির ছিল, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেই মন্দিরে খোদিত প্রস্তর-মূর্ত্তির এবং বহু কারু-কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপের কোনও ভাস্করের বা চিত্রকরের নিকট হইতে মেক্সিকো যে স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ, যে দেশের ইতিবৃত্তই আলোচনা করি না কেন; কিবা স্থপতি-বিদ্যা, কিবা সঙ্গীত-বিদ্যা, কিবা চিত্রবিদ্যা সকলই সকল দেশে কোন-না-কোনরূপে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদ্যমান ছিল। আর তৎসমুদায়ের শিক্ষা-বিষয়ে কে কাহার অনুসরণ করিয়াছিন, কেহই তাহা বলিতে পারেন না। তবে সভ্যতার পৌর্ব্বাপর্য্য ও প্রাচীনত্ব দেখিয়া এক জনকে অন্য জনের অনুকরণকারী বলা হয় মাত্র। সে হিসাবে ভারতবর্ষের সভ্যতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; সুতরাং ভারতবর্ষের আদর্শেই সকলে অনুপ্রাণিত, নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। সাদৃশ্য দেখিয়া যদি অনুকরণ বলা হয়, তাহা হইলে মেক্সিকোয় ভারতবর্ষের অনুকরণ অব্যাহত ছিল, বলা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুসরণে পারসিক-গণের মধ্যে অগ্নিপূজার প্রবর্ত্তনা হয়। মেক্সিকোবাসিগণের অহর্নিশ অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা এবং তাহাতে বলি ও আহুতি প্রদান, সেই আদর্শেরই রূপান্তর নহে কি? এ হিসাবে, রোম-নগরে ভেষ্টার মন্দিরে অগ্নিরক্ষাও অগ্নির উপাসনারই রূপান্তর এবং তাহাও ভারতবর্ষেরই অনুস্মৃতি। যাহা হউক পাশ্চাত্য-দেশে কোথায় কিরূপ প্রাচীন স্থাপত্যের ও চিত্রশিল্পের নিদর্শন আছে, তাহারও একটু আভাষ প্রদান করিতেছি! বাবিলনের অনেক প্রাচীন অট্টালিকার প্রাচীর-গাত্রে নানা শ্রেণীর জীবজন্তুর, শিকার-প্রণালীর এবং দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত আছে। অনেকে সেইগুলিকেই স্থাপত্যের ও চিত্রশিল্পের আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই সকল চিত্রের মধ্যে একটী চিত্রে—আসিরীয়া-রাজ্যের রাণী বাবিলন-নগরের প্রতিষ্ঠাত্রী সেমিরেমিস * অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া। তিনি বজ্র দ্বারা একটি

* সেমিরেমিস (Semiramis)—অসিরীয়া-দেশের রাণী। তিনি বাবিলন-নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকর্ত্তৃক ঐ নগর প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ও বহু অট্টালিকাদিতে সুশোভিত হইয়াছিল। বেলাস দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরের চূড়ায় তিনি তিনটী সুবর্ণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; আর সেই মন্দিরের মধ্যস্থল হইতে এমত একটী উচ্চ চূড়া নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, মিশরের অত্যুচ্চ পীরামিডের চূড়া হইতেও সে চূড়া উচ্চ হইয়াছিল। পতির মৃত্যুর পর সেমিরেমিস স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং মিডিয়া, পারস্য, লিবিয়া ও ইথিওপীয়া প্রভৃতি দেশ অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি বহু পর্ব্বত কাটিয়া সমভূম করিয়াছিলেন এবং বহু প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ও খালখনন করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের পরিচয় পাইয়া ভারতবর্ষ অধিকারে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু পথ হইতেই তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। তাঁহার সৈন্যদল প্রায় সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রত্যাগমন-কালে তাঁহার পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং সেই ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৬২ বৎসর বয়সে সেমিরেমিস ইহলীলা সম্বরণ করেন।

ব্যাঘ্রকে হনন করিতেছেন এবং অন্য দিকে তাঁহার স্বামী নাইনস কর্তৃক একটী সিংহ আহত হইতেছে। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত অট্টালিকাদির উল্লেখ আছে। ইজিকেল অংশের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—'ইসরেল-দিগের গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম, সকল শ্রেণীর ঘৃণিত জন্তু এবং প্রতিমূর্ত্তি সমূহ প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে চিত্রিত রহিয়াছে।' * অপর আর একটী অধ্যায়ে (ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে) লিখিত আছে,—'সে দেখিল, প্রাচীরে মনুষ্য-মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে; সিন্দুর দ্বারা কালডীয়-গণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছে; বর্ম্মের দ্বারা তাহাদের শরীর আচ্ছাদিত; তাহাদের মস্তকের বেশভূষা নানারূপ চিত্রবিচিত্র; তাহাদিগের সকলকেই রাজপুত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; বাবিলোনীয় এবং কালডীয়-গণের বেশভূষার সহিত তৎসমুদায় সাদৃশ্যসম্পন্ন।' † মিশরের স্থাপত্য এবং চিত্রশিল্পও অতি প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত হয়। কেহ কেহ আবার বলেন, ইথিওপীয়া সকলের আদি। ইথিওপীয়া হইতে মিশর স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প শিক্ষা করিয়াছিল। য়িহুদী ও গ্রীক ঐতিহাসিক-গণের বর্ণনায় প্রকাশ,—'ইথিওপীয়ার এবং ইজিপ্টের (মিশরের) প্রাচীন নৃপতি নানা দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং সেই সকল দেশে দেবালয়, কবর এবং প্রাসাদ-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে সকলের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান-কালেও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।' মিশরের বহু স্থাপত্যের প্রাচীনত্ব মৌর্ত্তিক অক্ষর সমূহের পাঠোদ্ধারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ডং-গোলার আশী মাইল উত্তরে লর্ড প্রুডো একটি সমৃদ্ধিশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। সেই নগর—বাইবেল-কথিত টিরহাকার রাজধানী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেই নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে দুইটি প্রস্তর-খোদিত সিংহ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। সে মূর্ত্তি দুইটি ইথিওপীয়-গণের শিল্পের আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হয়। একটি সিংহ-মূর্ত্তির স্কন্ধ-দেশে 'তৃতীয় আমেনক' এইরূপ একটি নাম খোদিত ছিল। গ্রীক-গণ তাঁহাকে 'মেমনন' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত সিংহ-মূর্ত্তি প্রভৃতির গঠন-সৌন্দর্য্যে ও শিল্প-চাতুর্য্যে উহাদের নির্ম্মাতাদিগের বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। থিবস্ সহরের মন্দির এবং মন্দির-প্রাচীর খৃষ্ট-জন্মের উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল,—পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। সেই মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে চিত্র-শিল্পের এবং খোদাই-কার্য্যের উৎকৃষ্ট সমাবেশ আছে। তন্মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিগত চিত্র প্রকটিত। সেই সকল চিত্র ও কারুকার্য্য দৃষ্টে ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণ সিদ্ধান্ত করেন, সে চিত্রাবলীর নিকট মিশরের চিত্রশিল্প পরাভূত হইয়াছে।‡

---

* "And I went in and saw; and beheld every form of creeping things, and abominable beasts and all the idols of the house of Israel pourtrayed on the wall round about."—Ezekiel, Ch. VIII. 10.

† "She saw men pourtrayed upon the wall, the images of Chaldeans pourtrayed in vermilion, girded with girdles upon their loins, exceeding in dyed attire upon their heads, all of them princes to look upon, after the manner of the Babylonians and Chaldeans.'—Ezekiel, Ch. XXIII. 14—15.

চতুঃষষ্টি-কলাবিদ্যার অন্তর্গত কতকগুলি কলাবিদ্যার স্বরূপ-তত্ত্ব এখন নির্ণয় করাই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সেই সকল কলাবিদ্যা ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই সকল কলার নামের অর্থই উপলব্ধি হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদক-বাদ্য এবং উদকঘাত নামক কলাবিদ্যাদ্বয়ের নামোল্লেখ করিতে পারি। উদক-বাদ্য বলিতে কেহ কেহ 'জলতরঙ্গ বাদ্যের' নাম করিতে পারেন। কিন্তু উদকঘাত বলিতে কি বুঝাইবে? তার পর যখন একটি কলা-বিদ্যার নাম 'বাদ্য' বলা হইয়াছে, তখন আবার উদক-বাদ্যই বা নূতন করিয়া বলা হইল কেন? সুতরাং উদক-বাদ্য বলিতেও অন্য কোনও অভিনব কলা-বিদ্যার বিষয় মনে আসিতে পারে। এইরূপ সংপাট্য, প্রতিমার, কৌচুমার প্রভৃতি কলা-বিদ্যারও স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। পরন্তু কষ্টকল্পনা করিয়া কোনও অর্থনিষ্পন্ন করাও অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি। তবে ঐ সকল ভিন্ন অন্যান্য যে সকল কলা-বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাই, সেগুলি যে উচ্চ-সভ্যতার পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য। গীত বাদ্য, নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য, বাস্তু বিদ্যা প্রভৃতির বিষয় এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগজ্ঞান, আকরজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির প্রসঙ্গও পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে খনির কার্য্য প্রচলিত ছিল, ধাতুর ব্যবহারে প্রাচীন-ভারতবর্ষ অভিজ্ঞ ছিল, স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি-মুক্তাদির পরীক্ষা বিষয়ে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা ছিল, উদ্ভিদ-বিদ্যায় বৃক্ষাদি-রোপণে ও প্রতিপালনে তাঁহারা অভিজ্ঞ ছিলেন,—পূর্ব্বোক্ত কলা-বিদ্যা-সমূহ তাহারই নিদর্শন। ঐ সকল ভিন্ন আর আর যে কয়েকটি কলা-বিদ্যার নামোল্লেখ আছে, তাহার একটির নাম,—তর্কু কর্ম্ম। 'তর্কু' শব্দের অর্থ—সূত্র-নির্ম্মাণ-যন্ত্র। সুতরাং তর্কু-কর্ম্ম বলিতে তুলা প্রভৃতি হইতে সূত্রপ্রস্তুতকরণ এবং বস্ত্রবয়নাদি বুঝাইয়া থাকে। সূত্র-নির্ম্মাণ এবং বস্ত্রবয়ন কার্য্যে ভারতবর্ষ কতকাল হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে সূত্র-নির্ম্মাণের ও বস্ত্র-বয়নের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে "পরস্পরকে আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তন্তু বয়ন করিতেছেন" এবং অষ্টত্রিংশ সূক্তের চতুর্থ ঋকে "বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর ন্যায়" প্রভৃতি উক্তিতে সূত্র-নির্ম্মাণের ও বস্ত্রবয়ন-প্রথার বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অপিচ, ষষ্ঠ মণ্ডলের নবম সূক্তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋককে এতদ্বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। প্রথমোক্ত ঋকটি এই,—"নাহং তন্তুং নবিজানাম্যোতুং ন যং বয়ন্তি সমরে হতমানাঃ। কস্যচিৎ পুত্র ইহবক্ত্বানি পরো বদাত্যবরেণ পিত্রা॥" এই ঋকের অর্থ,—'আমি তন্তু (টানা সূত্র) অথবা ওতু (পড়েন-সূত্র) জানি না কিংবা সতত চেষ্টা দ্বারা যে (বস্ত্র) বয়ন করে, তাহার কিছুই অবগত নহি।' ইত্যাদি। তৃতীয় ঋকের প্রথমাংশের মর্ম্ম,—'একমাত্র বৈশ্বানর অগ্নি তন্তু অবগত আছেন।' বস্ত্রের এবং বসনের উল্লেখ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। সূত্রবস্ত্র, রেশমী-বস্ত্র এবং লোমজাত বস্ত্র—সর্ব্ববিধ বস্ত্রই বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। বস্ত্র কি প্রকারে পরিষ্কৃত হইত, তৎসম্বন্ধে মহর্ষি মনুর উক্তি,—"কৌষেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ। শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমানাং

অন্যান্য কলা-বিদ্যা।

গৌরসর্ষপৈঃ॥" 'কৌষেয় অর্থাৎ রেশমী বস্ত্র, অবিক অর্থাৎ মেষলোমজাত কম্বলাদি—ক্ষার ও মৃত্তিকা দ্বারা পরিষ্কার করিবে। কুতপ অর্থাৎ নেপাল-দেশীয় কম্বল—নিম্বফল চূর্ণ দ্বারা, অংশুপট অর্থাৎ বল্কলবিশেষের বস্ত্র—বিল্বফলের নির্য্যাস দ্বারা এবং ক্ষৌমবস্ত্র—শ্বেত সর্ষপ চূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ হয়।' দ্রব্যশুদ্ধি-প্রকরণে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও লিখিয়া গিয়াছেন,—

"সোষৈরুদকগোমূত্রৈঃ শুধ্যত্যাবিককৌষিকম্। সশ্রীফলৈরংশুপট্টং সারিষ্টৈঃ কুতপন্তথা॥
সগৌরসর্ষপৈঃ ক্ষৌমং পুনঃপাকান্মহীময়ম্। কারুহস্তঃ শুচিঃ পণ্যং ভৈক্ষং যোষিন্মুখন্তথা॥"

মেষলোমজাত এবং কৌষিক বস্ত্র—ক্ষার, মৃত্তিকা, গোমূত্র ও জল দ্বারা, বল্কলতন্তু-নির্ম্মিত অংশুপট্ট—বিল্বফল, গোমূত্র ও জল দ্বারা, পার্ব্বতীয় ছাগরোম-নির্ম্মিত কম্বল—অরিষ্ট, গোমূত্র এবং জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। ক্ষৌমবস্ত্র—গৌরসর্ষপ, গোমূত্র এবং জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ইত্যাদি। এখানে মেষলোমজাত বস্ত্র, কৌষিক-বস্ত্র, বল্কল-তন্তু-নির্ম্মিত বস্ত্র, ছাগরোম-নির্ম্মিত কম্বল এবং ক্ষৌমবস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। তবেই বুঝা যাইতেছে,—কত প্রকার বস্ত্র কত কাল পূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। পট্টবস্ত্র-নির্ম্মিত আবাসাদির উল্লেখ অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হয় (গরুড়-পুরাণের ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। তর্কু-কর্ম্ম বা বস্ত্রশিল্প কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহার শেষ-স্মৃতি—ঢাকাই মসলিন, কাশ্মীরের শাল প্রভৃতি। * তর্কু-কর্ম্মের পর তক্ষণ নামক কলাবিদ্যার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তক্ষণ শব্দে কাষ্ঠকে মসৃণ করা বুঝাইয়া থাকে। ইহা হইতে কাঠের উপর কারুকার্য্য অর্থাৎ সূত্রধরের কার্য্য সূচিত হয়। কাষ্ঠের উপর খোদাই কার্য্য কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সোম-নাথের মন্দির প্রভৃতির তোরণ-দ্বার তাহার স্মৃতিচিহ্ন আজিও লোক-লোচনের সমক্ষে প্রকাশ করিতেছে। রথনির্ম্মাতা শিল্পীদিগের ও সূত্রধরের উল্লেখ ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের দ্বিতীয় ও ষোড়শ সূক্তে দেখিতে পাই। দ্বিতীয় সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋকে শিল্পীগণ যেরূপে রথনির্ম্মাণ করে, ষোড়শ সূক্তের বিংশ ঋকে 'ভৃগব' বা সূত্রধরগণ যেরূপে রথ-নির্ম্মাণ করে, তদ্বিষয় লিখিত আছে। সুতরাং সূত্রধরের কার্য্য—কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য খোদাই কতদিন হইতে প্রচলিত, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। আর একটী কলাবিদ্যার নাম—নাটিকা-খ্যায়িকাদর্শন। সঙ্গীতে ও নাট্যাভিনয়ে কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে হইলে, দর্শকের বা শ্রোতার তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা আবশ্যক। সমাজ সমুন্নত হইলে, গায়ক ও শ্রোতা, অভিনেতা ও দর্শক, উভয়েই জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাহা না হইলে, বধিরের নিকট বাক্যব্যয়ও যাহা, অসঙ্গীতজ্ঞের নিকট রাগরাগিণীর আলাপনও তাহাই। সেই জন্যই নাটিকাখ্যায়িকাদর্শন কলাবিদ্যার একটী অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত। দেশভাষাজ্ঞান আর একটী কলাবিদ্যা। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষাদানের প্রণালী এবং সেই সকল ভাষা অধিগত করিবার প্রথা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল,—দেশভাষাজ্ঞান নামক কলাবিদ্যার উল্লেখে তাহা উপলব্ধি হয়। ভারতের ভাষা-প্রসঙ্গে পৃথিবীর বহু ভাষায় প্রাচীন ভারতের অভিজ্ঞতার আভাষ আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। (পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয়

* মসলিন প্রভৃতি সূক্ষ্ম-শিল্প সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ পরবর্ত্তী অংশে বিবৃত হইল।

খণ্ড, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ)। যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভাষা বুঝাইবার জন্য বহুভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিদ্যমান ছিলেন। পারসিক-গণের, যবন-গণের এবং চীনাদিগের সহিত প্রাচীন ভারতের নানারূপ সম্বন্ধ-সংস্রব ছিল, এ সকল বিষয় পূর্ব্বেই আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং ঐ সকল জাতির ভাষায় ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা ছিল, সহজেই বুঝা যাইতে পারে। পুস্তকবাচন, কাব্যসমস্যাপূরণ, মানসীকাব্যক্রিয়া, অভিধানকোষছন্দোজ্ঞান প্রভৃতি কলাবিদ্যায় বিদ্যালোচনার ঔৎকর্ষের বিষয় বুঝিতে পারা যায়। সূচিবাপকর্ম্ম প্রসঙ্গে সূচিকার্য্যে উৎকর্ষ-লাভের এবং ঐন্দ্রজাল প্রসঙ্গে নানারূপ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-প্রদর্শনে পটুতার বিষয় উপলব্ধি হয়। দশনবসনাঙ্গরাগ, শয়নরচন, মাল্যগ্রথন, ভূষণযোজন, কেশমার্জ্জনকৌশল, গন্ধযুক্তি, পানকরসরাগাসবযোজন প্রভৃতি এক একটী বিদ্যার উল্লেখেও সমৃদ্ধির পরিচয়ই জ্ঞাপন করিতেছে। শুকশারিকা-প্রপালন, মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধি প্রভৃতিতে পশুপক্ষী প্রভৃতির প্রতিপালন বিষয়ক বিদ্যায় অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হই। এইরূপ দেখিতে গেলে,—দেখিতে পাই,—সভ্য ও সমুন্নত সমাজের যে কিছু লক্ষণ—যে কিছু ঐশ্বর্য্য-বিভব, তাহার সকলই ভারতে বিদ্যমান ছিল।

বিবিধ আলোচনা।

এই চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা ভিন্ন বিদ্যার আরও নানা বিভাগ ছিল। আয়ুর্ব্বিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি এই কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। কিন্তু পণ্ডিতগণের কেহ কেহ এতৎপ্রসঙ্গে তন্ত্রবিদ্যারও উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে কলাবিদ্যার সংখ্যা আরও অনেক বাড়িয়া যায়। বিমান-বিদ্যা, সর্পবিদ্যা, বিষবিদ্যা প্রভৃতি আরও নানা বিদ্যার নাম এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যে বিদ্যার বা যে বিজ্ঞানের বলে হিন্দুগণ অন্তরীক্ষে বা বিমান-পথে গতিবিধি করিতে পারিতেন, তাহারই নাম—বিমানবিদ্যা। বিমান-বিদ্যা কখনও কখনও বায়ুবিদ্যা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। "সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা অন্তরীক্ষং গচ্ছ স্বাহা দেবম্ সবিতারং গচ্ছ স্বাহা,"—যজুর্ব্বেদের এবম্বিধ উক্তিতে ব্যোমযান এবং অর্ণবযান প্রভৃতির বিদ্যমানতার ভাব উপলব্ধি হয়। শতপথব্রাহ্মণে বায়ুবিদ্যার উল্লেখ আছে। আশ্বলায়ন-সূত্রে বিষবিদ্যার এবং শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্যত্র সর্পবিদ্যার বিষয় অবগত হওয়া যায়। এক এক সময়ে এক এক বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সুতরাং তত্তৎকালে সেই সেই বিদ্যার প্রাধান্যের পরিচয় পাই। সাধারণ-ভাবে যাহাকে শিল্পবিদ্যা বলা যায়, অর্থাৎ নিত্য-ব্যবহার্য্য যে সকল উল্লেখ-যোগ্য দ্রব্য আজিকালি প্রচলিত, প্রাচীন ভারতে তাহার সকলেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের নানা স্থানে কারুখচিত সুবর্ণালঙ্কারাদির উল্লেখের বিষয় পুনঃপুনঃ উত্থাপন করিয়াছি। মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে পাষাণময় পাত্র, রৌপ্যপাত্র, সুবর্ণপাত্র, তাম্রপাত্র, লৌহপাত্র, কাংসপাত্র, পিত্তলপাত্র, রঙ্গপাত্র, সীসকপাত্র (পঞ্চম অধ্যায় ১১১ম শ্লোক, ১১২ম শ্লোক ও ১১৪ম শ্লোক) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যথা,—

"তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ। ভস্মনাদ্ভির্মৃদা চৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ ॥
নির্লেপং কাঞ্চনং ভাণ্ডমদ্ভিরেব বিশুধ্যতি। অজমশ্মময়ঞ্চৈব রাজতঞ্চানুপস্কৃতম্ ॥
তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ। শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ ॥"

রজত ও সুবর্ণাদি ধাতু-সকল, মরকতাদি মণি-সকল ও সমুদায় পাষাণময় দ্রব্য যথাসম্ভব ভস্ম, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়, পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থির করেন। উচ্ছিষ্টাদির প্রলেপ-রহিত সুবর্ণপাত্র জল দ্বারা শুদ্ধ হয়; শঙ্খমুক্তাদি জলজ পাষাণময় পাত্র ও রৌপ্যপাত্র যদি রেখাদি দাগযুক্ত না হয়, তাহা হইলে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিত্তল, রঙ্গ এবং সীসক পাত্র সকল—ভস্ম, অম্ল ও জল দ্বারা যথাযোগ্য শুদ্ধ হইয়া থাকে।' যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়ও সুবর্ণময় ও রজতময় পাত্রাদি ব্যবহারের উল্লেখ আছে। দারুময়, শৃঙ্গময়, ও অস্থিময় পাত্রের বিষয় এবং বিল্ব, অলাবু ও নারিকেলাদি ফলসম্ভূত পাত্রের বিষয় তথায় উল্লিখিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে দ্রব্যশুদ্ধি-প্রকরণে—"সৌবর্ণরাজতাব্জানামূর্দ্ধপাত্রগ্রহাশ্মনাম্," "পাত্রাণাং চমসানাঞ্চ", "তক্ষণং দারুশৃঙ্গাস্থ্নাং গোবালৈঃ ফলসম্ভুবাম্", প্রভৃতি উক্তিতে এতদ্বিষয় উপলব্ধি হয়। সুবর্ণ-রৌপ্যাদি নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহারের উল্লেখ অনেক স্থলেই দেখিতে পাই। দেশ কতদূর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, উহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। খনিজ-বিদ্যায় এবং ধাতু-ব্যবহারে বা ধাতু বিদ্যায় অভিজ্ঞতার ইহা পূর্ণ নিদর্শন। শঙ্খ-নির্ম্মিত, পশুশৃঙ্গনির্ম্মিত, পশ্বাস্থিনির্ম্মিত এবং গজদন্তনির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিশুদ্ধি-করণের বিষয়ও মনুসংহিতার পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ে (১২১ম শ্লোকে) পরিদৃষ্ট হয়। গজদন্ত-নির্ম্মিত সূক্ষ্ম-কারুখচিত দ্রব্যাদি প্রচলনের বিষয় এতদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায়। গজদন্তের সূক্ষ্ম-শিল্পে ভারতবর্ষ অশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অধ্যাপক হীরেণ এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তৎসম্বন্ধে ভারতের প্রসিদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।* কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী, এবং চর্ম্ম-নির্ম্মিত মৃগের উপমা (যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ) দৃষ্টে কারুকার্য্যের ঔৎকর্ষের অর্থাৎ কাষ্ঠ বা চর্ম্মাদির দ্বারা জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি প্রস্তুত-করণ প্রভৃতির বিষয় উপলব্ধি হয়। সূক্ষ্ম শিল্প-বিষয়ে ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। তন্তু-শিল্পের প্রসঙ্গে পূর্ব্বে মসলিন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছি। সৌন্দর্য্যে এবং মাধুর্য্যে এদেশের তন্তু-শিল্প যে অতুলনীয় ছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে মিঃ থরণটন মসলিনের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'সৌন্দর্য্যে এবং মাধুর্য্যে কোনও দেশে ইহার তুলনা নাই।' † মসলিন যে কত কাল পূর্ব্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীগণকে বুদ্ধদেব মসলিন ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। কলিঙ্গনের রাজার প্রদত্ত একখানি মসলিন কোনও স্ত্রীলোক পরিধান করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে উলঙ্গের ন্যায় দেখাইতেছিল। সেইজন্য বুদ্ধদেব মসলিন-ব্যবহার সম্বন্ধে নিষেধাদেশ প্রচার করেন। তন্তু-শিল্পের সূক্ষ্মতার বিষয় অনুভব করিয়া মিঃ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন এবং মিঃ মারে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন,—'ভারতবর্ষের তন্তু-শিল্পের সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য বহুদিন হইতে প্রশংসিত। বয়নের সূক্ষ্মতা বিষয়ে

* Thornton's *History of India.*
† "The art of working in ivory must have attained a high degree of perfection."
—Prof. Heeren's *Historical Researches.*

কোনও দেশ আজি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই।' মিঃ মারের ইতিহাসে প্রকাশ,—'মানবজাতির শিল্পনৈপুণ্যের যেখানে যে কোনও নিদর্শন আছে, ভারতবর্ষের তন্তুশিল্প সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন। অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া এবং অশেষ সঙ্কট-সমাকুল পথ অতিক্রম করিয়া বৈদেশিক বণিকগণ বহু ব্যয়ে ঐ সকল তন্তুশিল্প সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন।' † অতি-সূক্ষ্ম সূত্র-নির্ম্মাণোপযোগী তুলা প্রাচীন-কালে একমাত্র ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইত। ভারতবর্ষ হইতেই তাহার বীজ আমেরিকায় ও মিশরে পরিগৃহীত হইয়াছিল। ‡ ইউরোপ যখন ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, সেই সময় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারতের সূক্ষ্ম তুলা ইউরোপে নীত হয়। মিসেস ম্যানিং তাঁহার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এই সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের মৃত্তিকাই যে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম তুলা উৎপাদনের উপযোগী, অন্য দেশে যে সে মৃত্তিকার অভাব,—এ কথাও অনেককে স্বীকার করিতে হইয়াছে। মিঃ জেম্‌স্‌ মিল বলিয়াছেন,—'ভারতের জলবায়ু এবং মৃত্তিকা ভারতে অত্যুৎকৃষ্ট তুলা-উৎপাদনের প্রধান সহায়। এ তুলার সূক্ষ্মতার তুলনা অন্যত্র বিরল।' § ভারতীয় শিল্পিগণের হস্তের কোমলতাও সূক্ষ্ম-শিল্পের পরিপুষ্টির পক্ষে সহায়তা করে। সে পক্ষেও ভারতবর্ষের অভিনবত্বের বিষয় ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় তন্তু-শিল্পের সূক্ষ্মতার এবং মূল্যাধিক্যের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। পৃথিবীতে আজি পর্য্যন্ত মস্‌লিনের ন্যায় সূক্ষ্ম ও মূল্যবান বস্ত্র নির্ম্মিত হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন-সহরের প্রদর্শনীতে একখানি ঢাকাই মস্‌লিন প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেই মসলিনের দৈর্ঘ্য ৩১ ফিট এবং বিস্তৃতি ৩ ফিট। তাহার টানা ও পড়েন সূত্র যথাক্রমে ১০৪ ও ১০০ ফিট। বস্ত্রের ওজন সাড়ে তিন আউন্স বা পৌনে দুই ছটাক। ডক্টর ওয়াট লিখিয়া গিয়াছেন,—১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে (এখনকার হিসাবে) ৮৪০৲ টাকায় (৫৬ পাউণ্ডে) একখানি মসলিন বিক্রীত হইয়াছিল। ¶ মুসলিনের সূক্ষ্মতার এবং মূল্যাধিক্যের বিষয়ে নানারূপ কিংবদন্তী আছে। কিন্তু যে সকল উক্তি অধুনা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহাই এতৎপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইল। ঢাকা-সহরের তন্তুশিল্প সংক্রান্ত গ্রন্থে মিঃ বোথ একটি অভিনব ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।** বস্ত্রের অভ্যন্তর হইতে দেহ পরিদৃষ্ট হওয়ায় বাদসাহ আওরঙ্গজেব তাঁহার এক কন্যাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু

* তন্তুশিল্পের প্রসঙ্গে মিঃ এলফিন্‌ষ্টোনের উক্তি,—"Of the Indian manufactures, the most remarkable is that of cotton cloth, the beauty and delicacy of which was so long admired, and which in fineness of texture has never yet been approached in any other country."—Elphinstone, *History of India*, Bk. III. Ch. VIII.

† "Its fabrics, the most beautiful that human art has anywhere produced, were sought by merchants at the expense of greatest toils and dangers"—*Vide*, Murray's *History of India*.

‡ *Vide* Mrs. Manning's *Ancient and Mediaeval India*, Vol II.

§ "His climate and soil conspired to furnish him with the most axquisite material for his art the finest cotton which the earth produces."—*Vide* James Mill's *History of India*, Vol. II. *Vide*, also Orme's *People and Government of Hindusthan*.

¶ *Vide* Dr. Watt's *Textile Manufactures*.

** *Vide* Dr. Both's *Cotton Manufacture of Dacca*.

কণ্ঠা তাহাতে উত্তর দেন,—'তাঁহার দেহ উপর্য্যুপরি সাতটী জামায় আবৃত আছে!' কীদৃশ সূক্ষ্মবস্ত্রে সেই সকল জামা প্রস্তুত হইয়াছিল ও কীদৃশ সূক্ষ্মবস্ত্র ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইত, এতদ্দ্বারা তাহা বোধগম্য হয়। ডক্টর ওয়াটসন ইংলণ্ডের এবং ভারতবর্ষের তন্তুশিল্পের সূক্ষ্মতার তুলনা করেন। তুলনায় তিনি দেখিতে পান,—ইউরোপে আজি অর্থ্যন্ত ভারতের ন্যায় সূক্ষ্ম সূত্রাদি উৎপন্ন হয় নাই। আরও, হস্তদ্বারা হিন্দুগণ যেরূপ স্থায়ী ও সূক্ষ্মবস্ত্র বয়ন করিতে পারেন, কল হইতে এখনও সেরূপ সূক্ষ্ম ও স্থায়ী বস্ত্র নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হয় নাই। * সূক্ষ্মতন্তুশিল্পের পর কারুখচিত কাশ্মীরী শাল প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। কাশ্মীরে যে শাল প্রস্তুত হয়, পৃথিবীর কোথাও তাহার কারুকার্য্যের তুলনা নাই। † ম্যানিং এবং জেমস্ মিল উভয়েই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন,—'কিবা প্রাচীন, কিবা আধুনিক, কোনও জাতিই বয়ন-কার্য্যের সৌন্দর্য্যে ভারতের বয়ন-কার্য্যের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই।' পাশ্চাত্য-দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত হইলেও আজি পর্য্যন্ত যে তন্তুশিল্পের সূক্ষ্মতা-বিষয়ে ভারতের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই, এখনও যে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে, যিনিই তাহা আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কোন্ দিকের কোন্ কথা বলিব? সুবর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কারের কারুকার্য্যে, বস্ত্রের এবং অন্যান্য পদার্থের উপর স্থায়ী-মনোহর রং সমাবেশে, ভারতবর্ষের অশেষ কৃতিত্বের বিষয় কথিত হইয়া থাকে। এ সকল বিষয়ে ওয়েবার, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্, মিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলিয়াছেন,—অনেক রঙের ঔজ্জ্বল্যে ও স্থায়িত্বে ইউরোপ আজিও ভারতের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। ‡ লৌহ গালাই ও ঢালাই কার্য্যে ইউরোপ আজিকালি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু ভারতবর্ষ বহুদিন হইতে এতদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল। § এইরূপ যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, সকল বিদ্যায়—সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

---

* ডক্টর ওয়াটসন বলিয়াছেন,—'ভারতের হস্তশিল্পের বিষয় যেরূপেই আলোচনা করা যাউক, তৎসম্বন্ধে ইউরোপের শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে।' এতদ্বিষয়ে তাঁহার উক্তি,—"However viewed, therefore, our manufactures have something still to do. With all our machinery and wonderous appliances we have hitherto been unable to produce a fabric which, for fineness or utility, can equal the woven air of Dacca "&c.—Dr. Forbes Watson's *The Textile Manufactures of India*. এ বিষয়ে মিসেস ম্যানিংও বলিয়াছেন,—"Some centuries before our era they produced Muslins of that exquisite texture which even our nineteenth century machinery cannot surpass."—Mrs. Manning's *Ancient aud Mediaeval India*, Vol I.

† "Shawls made in Kàshmere are stlll unrivalled."—Mrs. Manning, *Ancient and Mediaeval India*.

‡ "The brilliancy and permanence of many of the dyes have not yet been equalled in Europe"—Elphinstone, *History of India*. *Vide* also Mill's *India*, Vol. II.

§ "Casting of iron Is an art that Is practised in this manufacturing country (Europe) only within a few years. The Hindus have the art of smelting iron of welding it and of making steel, and have had these arts from times immemorial."—James Mill, *History of India*, Vol. II.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সমাজ।

[ভারতের সমাজ—শ্রেষ্ঠ সমাজ;—শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়;—শাস্ত্রবর্ণিত বিষয়ের কালনির্দ্দেশে বৃথা প্রয়াস;—স্বধর্ম্মপালনে সমাজ-বন্ধন;—সমাজ-বিধি,—পিতা-মাতা প্রভৃতির প্রতি ব্যবহার;—সামাজিক আচার-ব্যবহার—ব্যভিচারে দণ্ড;—সুরাপানে দণ্ড;—কৃত্রিমতায় দণ্ড;—প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের প্রতি ব্যবহার,—স্ত্রীগণের ধর্ম্ম;—ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ প্রসঙ্গ,—সমাজ-হিতকর বিবিধ বিধান;—রাজনীতি ও অন্যান্য বিবিধ নীতি;—সমাজ-বন্ধনাদি বিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গ।]

শ্রেষ্ঠ সমাজ।

যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, সমাজকে—আদর্শ সমাজ—শ্রেষ্ঠ সমাজ বলিয়া অভিহিত করা যায়, ভারতবর্ষের সমাজে তাহার সকল লক্ষণই বিদ্যমান ছিল। যদিও অনন্তকালের অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে সময় সময় সমাজের অঙ্গে নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু সমাজ কখনই আপনার উচ্চ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নাই। অধিক বলিব কি, সর্ব্ববিধ্বংসী কালের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও এখনও ভারতবর্ষের সমাজ জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সচ্চরিত্রতা যদি শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ হয়, ভারতবাসীর সচ্চরিত্রতা অবিসম্বাদিত। সত্যবাদিতায় যদি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়, ভারতবাসীর সত্যপরায়ণতা সর্ব্বজনবিদিত।* পরোপকার, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি প্রভৃতি যদি শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক হয়, ভারতবাসীর সে সকল গুণের অবধি নাই। আচার-ব্যবহারের বিশুদ্ধতায় ও সত্যপরায়ণতায় ভারতবর্ষের তুলনা হয় না। ধর্ম্মপ্রাণতায় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত।

শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—সমাজের সকল অঙ্গই কি সমান পবিত্রতা-সম্পন্ন? সমাজের সকল ব্যক্তিই কি সমরূপ বিশুদ্ধ-চরিত্র? সকলের আচার-ব্যবহার, সকলের সকল রীতি-নীতিই কি আদর্শস্থানীয়? এ কথা আমরা অবশ্যই বলি না। পুণ্যের পার্শ্বে পাপ আছে; আলোকের পার্শ্বে অন্ধকার আছে। অন্ধকার না থাকিলে আলোক প্রস্ফুট হয় না; পাপ-চরিত্রের সহিত উপমিত না হইলে, পুণ্য-চরিত্রের উজ্জ্বলতা বিকশিত হয় না। তাই এ সংসারে পাপ-পুণ্যের আলোক-আঁধার উভয়ই আছে। বোধ হয়, একের পার্শ্বে না দাঁড়াইলে অন্যের প্রভা প্রস্ফুট হইবে

---

* ভারতবাসীর সত্যপরায়ণতা ও সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে বৈদেশিকগণই যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহারই দুই একটী দৃষ্টান্ত এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। গ্রীক-ঐতিহাসিক এরিয়ান বলিয়া গিয়াছেন,—'ভারতবাসীকে কখনও মিথ্যা কথা কহিতে শুনা যায় নাই। (Eg. "No Indian was ever known to tell an untruth."—*Indica*, Ch. XII as quoted in *Indian Antiquary*, 1876). চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং বলিয়া গিয়াছেন,—'ভারতবাসীরা যেমন সরলতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য বিখ্যাত, তেমনি তাঁহারা তাঁহাদের চরিত্রের সততার জন্যও প্রসিদ্ধ।' ("The Indians are distinguished by the straightforwardness and honesty of their character.") ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়ের উপসংহারে পরিদৃষ্ট হইবে।

না বলিয়াই বিধাতা পাশাপাশি দুইয়েরই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। সংসারে তাই ধার্ম্মিক আছেন, অধার্ম্মিক আছে; সাধু আছেন, অসাধু আছে; সত্যবাদী আছেন, মিথ্যাবাদী আছে; সচ্চরিত্র আছেন, অসচ্চরিত্র আছে; চোর আছে, প্রহরী আছে; দণ্ড আছে, পুরস্কার আছে। আবহমান-কাল হইতেই পাপ-পুণ্যের—দেবাসুরের সংঘর্ষ চলিয়াছে। সকল দেশে সর্ব্বত্রই এই দৃশ্য দেখিতে পাই। এখানেও সমস্যার কথা! এখানেও আর এক নূতন প্রশ্ন উঠিতে পারে। যদি আলোক-আঁধার দুই-ই ছিল—দুই-ই আছে, যদি পাপ-পুণ্য দুই-ই ছিল—দুই-ই আছে, তবে সে সমাজকে কি করিয়া আদর্শ সমাজ বলিতে পারি? এখানে দেখিতে হইবে, সমাজ কি আকাঙ্ক্ষা করিত? পাপ-পুণ্যের মধ্যে সমাজে কাহার সমাদর ছিল? সমাজ চোরের প্রাধান্য স্বীকার করিত, কি সাধুর চরণে অবনত হইত? সমাজ কি পাপীর দণ্ড-বিধানে উন্মুখ ছিল না? সমাজ কি পুণ্যাত্মার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত? এই সকল বিষয় বিচার করিয়াই সমাজের অবস্থা প্রতিপাদন করিতে হয়। বর্ত্তমানের আলোক-চিত্র সম্মুখে ধারণ করিলেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বর্ত্তমান সমাজেও চোর আছে, নরহন্তা আছে, অসাধু আছে; আবার সাধু আছেন, সত্যবাদী আছেন, সদাচারী আছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্তের দণ্ড-বিধান এবং শেষোক্তের সমাদরের ব্যবস্থা বিহিত রহিয়াছে। সভ্য-সমুন্নত সমাজের ইহাই লক্ষণ। অসদাচারীর দণ্ডবিধান এবং সদাচারীর সম্বর্দ্ধনা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় উপলব্ধি হয়। এই পদ্ধতিক্রমে বিচার করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষের সমাজকে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ সমাজ বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই এতদ্বিষয় বিশেষরূপে বোধগম্য হইতে পারিবে।

শাস্ত্রালোচনায় প্রতীত হয়, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারি যুগে পাপ-পুণ্যের তারতম্য ঘটিয়াছে। সত্যাদি যুগে মানুষ অধিকতর সত্যপরায়ণ হয়, অধিকতর ধর্ম্মপরায়ণ থাকে। আর কলিযুগে সংসারে পুণ্যের পরিমাণ হ্রাস হইয়া পাপের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনন্ত-কালের বক্ষে এত সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি লীন হইয়াছে, আর অনন্ত শাস্ত্র-গ্রন্থে সেই সকল সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির এত বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়া আছে যে, তাহা হইতে কোন্ কর্ম্ম-প্রণালী কোন্ যুগে প্রবর্ত্তিত ছিল, নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। 'বৈদিক যুগ,' 'স্মৃতির যুগ,' 'পৌরাণিক যুগ,' প্রভৃতি যুগ-বিভাগ করিয়া কল্পনার সাহায্যে যাঁহারা বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদের সহিত কখনই একমত হইতে পারি না। কেন এরূপ মতান্তর উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ মনুসংহিতা রচনার একটি কাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, খৃষ্ট-জন্মের চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে মনুসংহিতা বিরচিত হইয়াছিল। যদি তাহাই তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লই; মনুসংহিতা এখন যে ভাবে প্রচারিত, খৃষ্টজন্মের চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে তাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহাই যদি স্বীকার করি; তাহাতেই কি মনু-কথিত বিধি-বিধানের বিদ্যমানতার কাল-নির্দ্দেশ হইয়া যায়? তাহা কখনই হইতে

কালনির্দ্দেশে বৃথা প্রয়াস।

পারে না। বর্ত্তমানে যে আকারে যে ভাষায় মনুসংহিতা প্রচলিত, মনুরচিত তাহাই আদি-গ্রন্থ নহে। কারণ, মনুসংহিতার বিভিন্ন স্থানে লিখিত আছে,—'মনু যাহা বলিয়াছিলেন অথবা মনুর যাহা মত, তাহাই এই গ্রন্থে উক্ত হইল।' মনু-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভাংশ পাঠ করিলেই এতদ্বিষয় বুঝিতে পারা যায়। বুঝিতে পারা যায়,—পুরাকালে মনু যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে তাহাই লিখিত হইয়া আসিয়াছে। মনে করুন, আমরা এখন বঙ্গ-ভাষায় মনুসংহিতার অনুবাদ করিলাম। গ্রন্থের নাম হইল—মনুসংহিতা; অনুবাদে লিখিত হইল,—'মনু কহিলেন' ইত্যাদি। ইহার পর বহুকাল চলিয়া গেল; বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-ভাষা মধ্যে পরিগণিত হইল; সংস্কৃত-ভাষা একেবারে লোপ পাইল। এমন কি, এখন যে সংস্কৃত-মনুসংহিতা প্রচলিত, তখন তাহার অস্তিত্বের বিষয় পর্য্যন্ত সকলে ভুলিয়া গেল। সে অবস্থায়, একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রাচীন ভারতের সমাজ-তত্ত্ব আলোচনা করিতে বসিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত মনুসংহিতা মাত্র তখন তাঁহার অবলম্বন হইল। তিনি অশেষ গবেষণা প্রকাশে সেই মনুসংহিতার কাল-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—'ভারতবর্ষে সন ১৩১৯ সালে মহর্ষি মনু এই মত প্রচার করিয়াছিলেন; ভারতবর্ষের সমাজের তখন এইরূপ অবস্থা ছিল।' আমাদের বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের কাল-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেক পণ্ডিত প্রায় এইরূপ ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন। আর তাহাতে এক সময়ের ঘটনার কথা অন্য সময়ে আসিয়া পড়িয়াছে। এই সকল কারণে আমরা শাস্ত্রগ্রন্থ বর্ণিত সমাজের অবস্থা বিশেষের পরিচয় মাত্র দিয়াই নিরস্ত হইব; কাল-নির্দ্দেশের প্রয়াস পাইব না। যাহা সত্য, তাহা চিরদিনই সত্য। তাহা কখনই একবার সত্য, একবার মিথ্যা হয় না। সত্যের সমাদরও চিরদিনই আছে। সত্য কখনও অসমাদৃত হয় নাই। সত্য কত দিন হইতে সত্য, সত্য কত দিন হইতে সমাদৃত,—এ তত্ত্বের অনুসন্ধানে মস্তিষ্কের আলোড়ন করা যেমন ধৃষ্টতার পরিচায়ক; ভারতবর্ষের সমাজে সদ্‌গুণ-সমূহের বিকাশ-প্রাপ্তির কাল-নির্দ্দেশ করিতে যাওয়াও সেইরূপ ধৃষ্টতা মাত্র। সুতরাং, এখনও যাহা সৎ, এখনও যাহা প্রতিপাল্য; অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাহা সৎ ও প্রতিপাল্য ছিল।

স্বধর্ম্ম-পালনে সমাজ-বন্ধন।

ধর্ম্মপরায়ণতাই সমাজের প্রধান লক্ষণ ছিল। শাস্ত্রানুসারী কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইত। শাস্ত্র প্রতি বর্ণের জন্য বিভিন্ন কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই কর্ম্ম পালনই প্রতি বর্ণের ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য ছিল। অধুনা ঘোর জীবন-সংগ্রামে সমাজ-শরীর বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণগত কর্ম্মানুষ্ঠান-প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকায় তখন সমাজ এরূপ বিক্ষুব্ধ হয় নাই। এক বর্ণের কর্ম্ম অন্য বর্ণ গ্রহণ না করেন, গ্রহণ করিলে সমাজে বিক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে, এই জন্য শাস্ত্র পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন,—"পরধর্ম্মো ভবেত্ত্যাজ্যঃ সুরূপপরদারবৎ," "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ!" যাঁহারা শাস্ত্রানুশাসন মান্য করেন, তাঁহারা তাই বলিয়া থাকেন,—'সংসারে এখন যে দুঃখ-দারিদ্র্যের দারুণ বিভীষিকা উপস্থিত, সে কেবল স্বধর্ম্ম ত্যাগের ফল। ব্রাহ্মণ-সন্তান আবার যদি ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে

পারেন, অপরাপর বর্ণও যদি যথাশক্তি স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারেন; হয় তো আবার সুখের দিন আসিতে পারে।' এখানে কেহ হয় তো বিদ্রূপ করিয়া বলিতে পারেন,—'ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—যুদ্ধ; এখনকার দিনে সে কর্ম্মের অনুসারী হইলে কি ফল লাভ হয়, সহজেই বুঝা যায়।' কিন্তু যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের বিষয় অবগত নহেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—'ব্রাহ্মণের ছয়টী কার্য্য। তাহার মধ্যে যজন, দান ও অধ্যয়ন,—এই তিনটী তপস্যা; আর প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন,—এই তিনটী জীবিকা। ক্ষত্রিয়ের পাঁচটী কার্য্য। তাহার মধ্যে যজন, দান ও অধ্যয়ন,—এই তিনটী তপস্যা; আর অস্ত্র-ব্যবহারে ও প্রাণিরক্ষা,—এই দুইটী জীবিকা। বৈশ্যেরও যজন, দান ও অধ্যয়ন,—এই তিনটী তপস্যা; আর বার্ত্তা অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা ও কুসীদ,—এই চারিটী জীবিকা। শূদ্রের দ্বিজ-সেবাই তপস্যা; আর শিল্প-কার্য্য জীবিকা।' তবেই দেখা গেল, একমাত্র যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। অস্ত্র-ব্যবহার ও প্রাণিরক্ষা ক্ষত্রিয়ের জীবিকা। মতান্তরে অন্যরূপ জীবিকারও ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠান না করিলেই যে ক্ষত্রিয়ের জীবিকার্জ্জনে ধর্ম্মসাধনে বিঘ্ন ঘটে, তাহা নহে। যাহা হউক, যে কারণেই হউক, মানুষ এখন শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ অন্যের বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন; সুতরাং ব্রাহ্মণের অবনতিতে অন্যান্য জাতিরও কর্ম্মান্তর-গ্রহণ আবশ্যক হইয়াছে। এই বিপর্য্যয় এখনই যে নূতন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেও বহু বহু যুগে এরূপ বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং এখনকার দিনে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াও কেহ কেহ সে উচ্ছৃঙ্খলার উদাহরণ শাস্ত্র হইতেই প্রদর্শন করিতে পারেন; দেখাইতে পারেন,—এক বর্ণ অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে; দেখাইতে পারেন,—এক জাতির নিষিদ্ধ কর্ম্ম, অন্য জাতি সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল না হইলেও, প্রধানতঃ প্রাচীন-ভারতের সমাজ যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুসারী ছিল, তাহা সর্ব্বরূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও কখনও যে কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার ব্যভিচার ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন, তাঁহারাই প্রশংসনীয় ছিলেন। বিবাহ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেও এই ভাবই উপলব্ধি হয়। সবর্ণ বিবাহই প্রশস্ত ও শ্লাঘনীয় ছিল। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, তাহা প্রশংসনীয় ছিল না। এখন যাঁহারা অসবর্ণ-বিবাহের পক্ষপাতী, তাঁহারা শাস্ত্র হইতে অসবর্ণ বিবাহের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু সে বিবাহ কখনও যে শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ নাই। মহর্ষি মনু অষ্টবিধ বিবাহের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই অষ্টবিধ বিবাহের নাম—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ছয় প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত থাকিলেও ব্রাহ্ম-বিবাহই শ্রেষ্ঠ-বিবাহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিবাহে ব্রাহ্মণের কন্যা ব্রাহ্মণকে দান করা হয় এবং যথাবিধি যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সহিত সে দান সম্পন্ন হইয়া

থাকে। এই বিবাহে যে সন্তানোৎপন্ন হইবে, তদ্দ্বারা পিতৃ-পিতামহাদি দশ পূর্ব্ব-পুরুষ, পুত্র-পৌত্রাদি দশ পর-পুরুষ এবং আত্মা—এই একবিংশতি পুরুষ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। অন্যান্য বিবাহের ফল ইহা অপেক্ষা যে হীন, তাহা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে মন্বাদি শাস্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে,—'দ্বিজাতি-গণ যদি মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রী-গণকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পুত্রপৌত্রাদি সহ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।' ইত্যাদি। যাহা হউক, অষ্টবিধ বিবাহের বিষয় উক্ত হওয়ায় ঐ সকল প্রকার বিবাহ সমাজে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় বটে; কিন্তু তাহার মধ্যে কোন্ বিবাহকে শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ, সামাজিক আচার-ব্যবহার সংক্রান্ত অনেক বিষয়ের পরিচয় শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। তবে তাহার মধ্যে কোন্‌টী প্রশস্ত ও কোন্‌টী অপ্রশস্ত, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। পুরাণেতিহাসে ঘটনা-বিশেষ বিবৃত আছে বলিয়াই তাহা যে সর্ব্বথা অনুসরণীয়, তাহা কোনক্রমেই বলিতে পারা যায় না। সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, পুরাণেতিহাসে তাহারই উল্লেখ আছে মাত্র। তবে, তাহা হইলেও, তাহার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়ঃ কোন্‌টী প্রেয়, তাহা দেখিতে হইবে। মন্বাদি স্মৃতি-শাস্ত্র সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয় পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—'কু-বিবাহে অর্থাৎ আসুরাদি বিবাহে, জাতকর্ম্ম ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ালোপে, বেদ-শাস্ত্রের অনধ্যয়নে এবং ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশে অতি শ্রেষ্ঠ-কুলও নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হয়। চিত্র-কর্ম্মাদি শিল্প-কলা, কুসীদ-লোভে ধনপ্রয়োগ, শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন, গো, অশ্বযান প্রভৃতির ব্যবসা, কৃষি, পরসেবা, অযাজ্যের যাজন, শ্রৌত, স্মার্ত্ত প্রভৃতি কর্ম্মের প্রতি নাস্তিক্য বুদ্ধি এবং মন্ত্রহীনতা প্রভৃতি হেতু কুল নীচত্ব প্রাপ্ত হয়। আবার যাঁহারা বেদাদি অধ্যয়ন এবং বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কুল উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া থাকে।' এখনঃ অসবর্ণ বিবাহাদি প্রচলনের আভাষ আছে। ঐ প্রকার বিবাহের প্রচলন ছিল বলিয়া প্রমাণ-স্বরূপ মনু-বচন উদ্ধৃত করাও যাইতে পারে। কিন্তু কুলের মর্য্যাদা-হ্রাস ও মর্য্যাদা-বৃদ্ধি প্রভৃতি উক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উক্তরূপ বিবাহ সমাজানু-মোদিত বিবাহ ছিল বলিয়া কখনই প্রতিপন্ন হয় না। পরশুরাম পিতৃ-আদেশে মাতৃবধ করিয়াছিলেন,—শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃবধ যে শ্রেয়ঃ, শাস্ত্র কখনই যে উপদেশ প্রদান করেন নাই। পরন্তু মাতৃসেবায় অক্ষয় স্বর্গ বা মোক্ষ লাভ হয়, ইহাই শাস্ত্র পুনঃপুঃ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

উন্নত সমাজ কতকগুলি সুনিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই নিয়মগুলি নীতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সে সমাজ যত সুনিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে সমাজ যত সন্নীতি-পরায়ণ—সেই সমাজ তত উন্নত—সেই সমাজ তত শ্রেষ্ঠ পদবীতে অধিষ্ঠিত। পিতামাতা গুরুজনের প্রতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি, ভৃত্যাদির প্রতি, এমন কি—পশু পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির প্রতি, ব্যবহারের বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রানুশাসন দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় সমাজের চরম উন্নতির

সমাজ-বিধি।

পরিচারক। আবার অপকর্ম্মকারীর প্রতি, ব্যভিচারীর প্রতি, মদ্যপায়ীর প্রতি, চৌরের প্রতি, প্রবঞ্চকের প্রতি, নরহন্তার প্রতি, সমাজের যেরূপ ব্যবহারের বিষয় শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারাও সমাজকে উন্নত-স্থানাভিষিক্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক সভ্যতার পরিমাপ-দণ্ডেই যদি প্রাচীন ভারতের আচার-ব্যবহারের তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলেও তাহার পার্শ্বে এখনকার সমাজ দাঁড়াইতেই পারে না। এখনকার সমাজ পিতামাতা গুরু-জনের প্রতি সাধারণতঃ কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এতদ্বিষয়ে মন্বাদি শাস্ত্রের উক্তি,—(মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২২৫ম-২২৯ম শ্লোক।)

"আচার্য্যো ব্রহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তি প্রজাপতেঃ। মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বোমূর্ত্তিরাত্মনঃ॥
আচার্য্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ। নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ॥
যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা। তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে। ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ,—'আচার্য্য ব্রহ্মের মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার মূর্ত্তি, মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি, ভ্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি-স্বরূপ। সুতরাং পিতা, মাতা, আচার্য্য বা ভ্রাতা কর্তৃক কোনরূপে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইলেও কোনমতে তাঁহাদের অবমাননা করা কর্ত্তব্য নয়। পুত্র-প্রতিপালনে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শত শত বর্ষেও পুত্র সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। সুতরাং পুত্র নিয়ত পিতামাতার প্রিয়-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। আচার্য্যেরও প্রিয়-কার্য্য বিধান করা কর্ত্তব্য। পিতা, মাতা এবং আচার্য্য সন্তুষ্ট থাকিলে সকল তপস্যা সিদ্ধ হয়। ইঁহাদের শুশ্রূষাই পরম তপস্যা; ইঁহাদের অনুমোদিত না হইলে কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানই বিধেয় নহে। মনু আরও বলিয়াছেন,—'ইঁহারাই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। যতদিন পিতা, মাতা ও আচার্য্য জীবিত থাকিবেন; তত দিন তাঁহাদের সেবা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম নাই; তাঁহাদের অনুমোদন ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম-কর্ম্মও কিছু থাকিতে পারে না। পিতামাতা গুরুজন যে উপদেশ দেন, তাহা অপেক্ষা সন্তানের পক্ষে হিতকারী উপদেশ অন্য কিছু হইতে পারে না—হওয়া সম্ভবপরও নহে।' শাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ পিতামাতার প্রতি ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন এবং সন্তানকে পিতা-মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে আদেশ করিয়াছেন। উশনঃ-সংহিতার প্রথম অধ্যায়েও পিতৃমাতৃ ভক্তির এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহারের বিষয়ে এইরূপ উপদেশ আছে।

"যাবৎ পিতা চ মাতা চ দ্বাবতৌ নির্ব্বিকারণম্। তাবৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পুত্রঃ স্যাত্তৎপরায়ণঃ॥
পিতা মাতা চ সুপ্রীতৌ স্যাতাং পুত্রগুণৈর্যদি। স পুত্রঃ সকলং কর্ম্ম প্রাপ্নুয়াৎ তেন কর্ম্মণা॥
নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি পিতৃসমো গুরুঃ। তয়োঃ প্রত্যুপকারোঽপি নহি কশ্চন বিদ্যতে॥
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণা মনসা গিরা। ন তাভ্যামননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমেকং সমাচরেৎ॥
বর্জয়িত্বা মুক্তিফলং নিত্যনৈমিত্তিকং তথা। ধর্ম্মসারঃ সমুদ্দিষ্টঃ প্রেত্যানন্দফলপ্রদঃ॥"

অর্থাৎ,—'পিতা ও মাতা এই দুই জন যতদিন বর্ত্তমান থাকিবেন, ততদিন নির্ব্বিকার-ভাবে অন্য সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। পিতা এবং মাতা যদি পুত্রগণের প্রতি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন, তাহা হইলে পুত্র সেই পিতামাতার

প্রীতি উৎপাদনরূপ সৎকর্ম্ম দ্বারা সকল সৎকর্ম্ম ফল প্রাপ্ত হন। মাতার স্থায় দৈব নাই, পিতার মত গুরু নাই এবং তৎকৃত উপকারের প্রত্যুপকারও কিছু নাই। কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রিয়-কার্য্য করিবে। তাঁহাদিগের বিনা অনুমতিতে মুক্তিজনক কার্য্য এবং নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য ভিন্ন কোনও ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবে না। পিতৃমাতৃ পরায়ণতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; অতএব পরকালে নিরতিশয় আনন্দজনক।' মহর্ষি মনু অন্যান্য গুরুজনের প্রতি যেমন ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন, মহর্ষি উশনার উপদেশও তদনুরূপ। 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' অধুনা প্রবাদ-বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু মন্বাদি শাস্ত্রের উপদেশ—'সহোদর-কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও তাঁহার অবমাননা করিবে না; পরন্তু তাঁহার হিতসাধনে চেষ্টা পাইবে।' জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের পরস্পর ব্যবহার বিষয়ে মনুর উক্তি,—

"জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো ভ্রাতা মৃতে পিতরি শৌনক। সর্ব্বেষাং স পিতা হি স্যাৎ সর্ব্বেষামনুপালকঃ॥
কনিষ্ঠাস্তত্র সর্ব্বেঽপি সমত্বেনানুবর্ত্ততে। সমোপভোগজীবেষু যথৈব তনয়স্তথা॥"

'পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই পিতা সম জ্ঞান করিবে। তিনিই সকলের প্রতিপালন করিবেন। সুতরাং তিনিই সকলের পিতৃতুল্য। কনিষ্ঠ-গণ সর্ব্বতোভাবে জ্যেষ্ঠের আদেশানুবর্ত্তী থাকিবেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ-গণকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবেন।' উশনঃ বলিয়াছেন—'যে মূঢ় পিতৃতুল্য মাননীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অমান্য করে, সে মৃত্যুর পর সেই পাপে নরকে গমন করে' (উশনঃ সংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ৩৯শ শ্লোক)। এইরূপ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহারের উপদেশ শাস্ত্রগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। সকলের প্রতি সদাচরণ করাই শাস্ত্রের প্রধান উপদেশ। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—সংসারে কেহ কাহারও শত্রু বা মিত্র নাই। আচরণ দ্বারাই শত্রু মিত্রের সৃষ্টি হয়। "ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ। কারণাদেব যায়ন্তে মিত্রানি রিপবস্তথা॥" অতএব সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করাই মঙ্গলজনক। এতৎসম্বন্ধে মহর্ষি মনুর উপদেশ,—সত্যধর্ম্মে সদাচারে এবং শৌচে সতত রত থাকিবে। ধর্ম্মানুসারে শিষ্যজনকে শাসন করিবে এবং বাক্য, বাহু ও উদর বিষয়ে সতত সংযত থাকিবে। ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কামনা ত্যাগ করিবে। যে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরিণামে কষ্ট হয়, অথবা যে প্রকার ধর্ম্মাচরণে লোকের আক্রোশভাজন হইতে হয়, এরূপ ধর্ম্মাচরণ করিবে না। হস্ত, পদ ও নেত্রের চাঞ্চল্য ও বাক্পটুতা পরিহার করিবে। অর্থাৎ, যে বস্তু গ্রহণে, যেরূপ ভ্রমণে, যেরূপ দর্শনে এবং যেরূপ বাক্য-কথনে বৃথা চপলতা মাত্র প্রকাশ পায়, তাহা করিবে না। সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করিবে এবং পরের অনিষ্টসাধনে বুদ্ধিকে নিয়োগ করিবে না। পরস্পর-বিরুদ্ধ উভয় ধর্ম্মে সন্দেহ উপস্থিত হইলে এরূপ মীমাংসা করিবে যে, যে সৎপথ অবলম্বন করিয়া পিতৃলোকেরা গমন করিয়াছেন,—পিতামহগণ যে পথাবলম্বী, সেই পথই বিচরণীয়—সেই পথই সাধু—সেই পথে গমন করিলে কাহারও আক্রোশভাজন হইতে হয় না। (যজ্ঞ-কর্ম্মে) হোতা, ঋত্বিক, (শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্ত্তা) পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও কুটুম্ব,—ইঁহাদের সহিত এবং পিতা, মাতা, ভগিনী ও পুত্রবধূ, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা, ভ্রাতৃবর্গ প্রভৃতির সহিত কথনও কলহ ও বিবাদ

করিবে না। গৃহী ইঁহাদের সহিত বিবাদ না করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের সহিত বিবাদ পরিত্যাগ করিলেই অথবা ইঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে, তিনি সকল লোকেই জয়যুক্ত হন। ইঁহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও অক্ষুণ্ণ মনে সদা তাহা সহ্য করিবে, কোনক্রমেই ইঁহাদের সহিত বিবাদ করিবে না।' এ সকলের অধিক সুশিক্ষা আর কি হইতে পারে? যে সমাজ এইরূপ সরল, অচঞ্চল লোক-সমূহ দ্বারা সুগঠিত হয়, সে সমাজের কি কখনও তুলনা আছে? সৎপথে থাকিয়া, পরের প্রতি হিংসা না করিয়া, যিনি ধনোপার্জ্জন করেন এবং তদ্দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তিনিই সুখী হন; অধার্ম্মিক কখনই সুখলাভের অধিকারী নহে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন—

"অধার্ম্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্। হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে॥
ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ। অধার্ম্মিকানাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্॥
নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব। শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি॥"

অর্থাৎ,—'যে জন অধার্ম্মিক, অসত্য পথে যাহার ধনোপায় হয় এবং যে সতত পরহিংসায় তৃপ্ত থাকে, সে জন এই সংসারে কখনও সুখলাভের অধিকারী হয় না! পাপী অধার্ম্মিক-দিগের আশু বিপর্য্যয় ঘটে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধনাভাবে অবসন্ন হইলেও কখনও অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। ভূমিতে বীজ বপন করিলে, তাহা যেমন তৎ-ক্ষণাৎ ফল প্রসব করিতে পারে না; তদ্রূপ ইহ-সংসারে অধর্ম্মাচরণের ফল সদ্যঃ পাওয়া না যাইলেও, অধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে এরূপ ঘটে যে, অধর্ম্ম-কর্ত্তা সমূলে বিনষ্ট হয়।'

দুষ্কর্ম্ম দমনের জন্য শাস্ত্র কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ব্যভি-চারের জন্য, অপরাধের তারতম্যানুসারে, কি কঠোর দণ্ডই বিহিত হইত! সংসারে ব্যভিচার চিরদিনই আছে। ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যভিচারিণী রমণীর দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন,—ব্যভিচারিণী রমণীরা ঘোর নরকে নিপতিত হয়। চতুর্থ মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তে এবং দশম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ সূক্তের চতুর্থ ও পঞ্চম ঋকে এবং দ্বিতীয় মণ্ডলের উনত্রিংশ সূক্তের প্রথম ঋকে ব্যভিচারিণী রমণীর উল্লেখ ও তাহাদের নরক-প্রাপ্তির বিষয় লিখিত আছে।

ব্যভিচারে দণ্ড।

আপস্তম্ব সূত্রে ব্যভিচারের কঠোর দণ্ডের বিষয় দৃষ্ট হয়। আপস্তম্ব বলিয়াছেন,—'ব্যভি-চার দোষদুষ্ট দ্বিজাতিগণ নির্ব্বাসন-দণ্ডে এবং শূদ্রগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।' মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—'চারি বর্ণের ভার্য্যাই সর্ব্বদা সর্ব্বথা রক্ষণীয়া। 'চতুর্ণামপি বর্ণানাং দারা রক্ষতমাঃ সদা।' এই বলিয়া মহর্ষি মনু ব্যভিচারের জন্য প্রাণদণ্ডের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'ব্যভিচারী পুরুষ উত্তপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করিয়া জ্বলন্ত লৌহময় স্ত্রীর আকৃতিকে প্রাণ-বিয়োগ পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে। প্রাণ-বিয়োগ হইলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে।' মনু-সংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে (৩৬৪ম শ্লোকে এবং ৩৭১ম-৩৭২ম শ্লোক প্রভৃতিতে) এবং একাদশ অধ্যায়ে (১০৪ম প্রভৃতি শ্লোকে) ব্যভিচারের দণ্ডাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ব্যভিচারী পুরুষ এবং ব্যভিচারিণী স্ত্রী উভয়ের প্রতিই দণ্ডের কঠোরতা পরিলক্ষিত হয়। দণ্ডের

একটী প্রণালী,—'আমি ধনী লোকের কন্যা, এই দর্পে অথবা আপনার সৌন্দর্য্য-দর্পে যে স্ত্রীলোক নিজ পতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ গমন করে, তাহাকে বহু-লোক-সমাজে লইয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইবে। আর সেই পাপকারী জার-পুরুষকে তপ্ত-লোহময় শয়নে শয়ান করাইয়া দাহ করিবে। যাবৎ না পাপিষ্ঠ ভস্মসাৎ হয়, তাবৎ অগ্নিতে কাষ্ঠ-নিক্ষেপ করিবে।' বিষ্ণু-সংহিতায়ও এইরূপ কঠোর শাসন দৃষ্ট হয়। যে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য নহে এবং যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, রাজা তাহাকে বধ করিবেন,—বিষ্ণু-সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে এতদুক্তি দেখিতে পাই। অন্যান্য সংহিতায়ও এইরূপ কঠোর শাসন লিপিবদ্ধ আছে। তবেই বুঝা যায়, সমাজ কোনরূপে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, ভারতের সমাজের ইহাই লক্ষ্য ছিল। শাস্ত্র সেইরূপ উপদেশই দিয়া গিয়াছেন।

সুরাপান-নিবারণের উদ্দেশ্যে এখন 'মাদক-নিবারিণী' সভার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। কিন্তু সুরাপায়ীর সংখ্যা তাহাতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সুরাপানে দণ্ড।

ভারতবর্ষে সুরাপায়ীর জন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মনু বলিয়াছেন,—'সুরা যক্ষ-রক্ষ-পিশাচদিগের খাদ্য। উহা দেবান্নভোজী ব্রাহ্মণাদির ভক্ষণীয় নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যদি জ্ঞান-পূর্ব্বক সুরা পান করে, তাহা হইলে ঐ পাপক্ষয়ের জন্য তাহাদিগকে অগ্নিবর্ণ জ্বলন্ত সুরা পান করিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের শরীর দগ্ধীভূত হইলে তবে তাহারা পাপে নিষ্কৃতি পাইবে। অথবা অগ্নিবর্ণ জ্বলন্ত গোমূত্র বা জল, দুগ্ধ, ঘৃত বা গোময় জল, যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পান করিবে। এইরূপে মৃত্যু হইলেই পাপের নিষ্কৃতি।' সুরাপায়ীর এইরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত। যথা,—

"সুরাং পীত্বা দ্বিজো মহদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ। তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা। পয়ো ঘৃতং বা মরণাদ্গোশকৃদ্রসমেব বা॥"

সুরাপায়ীর সহিত বসবাস করিলে মহাপাতক হয় (মনু, একাদশ অধ্যায়, ৫৫শ শ্লোক)। এইরূপ কঠোর দণ্ডাদির ব্যবস্থা দ্বারা মনু সুরাপান নিবৃত্তি পক্ষে প্রয়াস পাইয়াছেন। অত্রি-সংহিতা সুরাপান ও সুরাস্পর্শ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—'দ্বিজ মদ্য বা সুরাস্পৃষ্ট কুম্ভের জল পান করিলে কৃচ্ছ্রপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃসংস্কৃত (পুনরুপনীত) হইবে।...মদ্য কর্ত্তৃক দূষিত কূপের জল পান করিলে ব্রাহ্মণকে তিন দিন, ক্ষত্রিয়কে দুই দিন এবং বৈশ্যকে এক দিন উপবাসী থাকিতে হইবে। মস্তক সুরালিপ্ত হইলে দশ দিন, কণ্ঠ সুরালিপ্ত হইলে ছয় দিন, উরু সুরালিপ্ত হইলে তিন দিন ও পাদ সুরালিপ্ত হইলে এক দিন উপবাস করিবে। যদি প্রমাদ-বশে কোনও ব্রাহ্মণ সুরা ভিন্ন অন্য কোনরূপ মাদক পান করেন, তাহা হইলে দশ দিন গোমূত্র-সিদ্ধ জাবক আহার করিয়া শুদ্ধ হইবেন। যে ব্রাহ্মণ মদ্যপের বা নিষাদের অন্ন ভোজন করে, দেবগণ তাহার প্রদত্ত হব্য ভোজন বা জলপান করেন না।' (অত্রি-সংহিতায় ২০০ ম, ২০৩ম—২০৪ ম, ২০৬ ম—২০৮ ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)। উশনঃ সংহিতার প্রকাশ,—'সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ সুরা পান করিবে। যখন তপ্তকাঞ্চন দেহ হইবে, তখন সে পাপ হইতে মুক্তি পাইবে। কিংবা অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত গোমূত্র, অগ্নিবর্ণ দ্রবীভূত গোময়, অগ্নিবর্ণ দুগ্ধ, অগ্নিবর্ণ ঘৃত বা

অগ্নিবর্ণ জল পান করিয়া গতপ্রাণ হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।' জ্ঞানকৃত সুরাপানে এইরূপে মৃত্যু হইলে পাপ দূর হইবে। অজ্ঞান-কৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত জন্য উশনঃ-সংহিতা কিঞ্চিৎ লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদনুসারে, আর্দ্রবস্ত্র ও পবিত্র হইয়া নারায়ণরূপী শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া সেই অর্থাৎ সুরাপান-জনিত পাপ-শান্তির জন্য ব্রহ্মহত্যা (দ্বাদশ বার্ষিক) ব্রত আচরণ করিবে।' (উশনঃ-সংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ১২শ—১৪শ শ্লোক)। সুরাপান-জনিত অপরাধে রাজারও নিষ্কৃতি নাই। মনু-সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে (৫০শ ও ৫২শ শ্লোকে) সুরাপান সম্বন্ধে রাজাকে সতর্ক করা হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন,—'সুরাপান, পাশক্রীড়া, স্ত্রীলোকে আসক্তি, মৃগয়া, নিষ্ঠুর প্রহার, বাক্-পারুষ্য এবং পরস্বাপহরণ,—কামক্রোধজ এই সাতটী দোষ দ্বারা প্রায় সমস্ত রাজমণ্ডলী পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্বটী গুরুতর বলিয়া পরিজ্ঞেয়। মহর্ষি বশিষ্ঠ সুরাপানে পাতিত্যের বিষয় এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন,—'যদি কোনও শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজ মদ্যভাণ্ডস্থ জল পান করে, তাহা হইলে সে পদ্মপত্র, উডুম্বর পত্র ও বিল্বপত্রের কাথ-জল পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। পুনঃপুনঃ মদ্য পান করিলে দ্বিজ অগ্নিবৎ জ্বলন্ত মদ্য পান করিবে অর্থাৎ তদ্দ্বারা দগ্ধকণ্ঠ হইয়া মৃত্যু-লাভে শুদ্ধ হইবে (বসিষ্ঠ-সংহিতা, বিংশ অধ্যায়)।' যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় সুরাপান-প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে সুরাপান সম্বন্ধে এইরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত-বিধি লিখিত আছে; (৩য় অ, ২৫২ম—২৫৫ম শ্লোক)।

"সুরাম্বুঘৃতগোমূত্রপয়সামগ্নিসন্নিভম্। সুরাপোঽন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি॥
বালবাসা জটী বাপি ব্রহ্মহত্যা ব্রতঞ্চরেৎ। পিণ্যাকং বা কণাং বাপি ভক্ষয়েত্রিসমা নিশি॥
অজ্ঞানাত্তু সুরাং পীত্বা রেতোবিণ্মূত্রমেব বা। পুনঃসংস্কারমর্হন্তি ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥
পতিলোকং ন সা যাতি ব্রাহ্মণী যা সুরা পিবেৎ। ইহৈব তু শুনী গৃধ্রী শূকরী চাভিজায়তে॥"

অর্থাৎ,—'সুরাপায়ী দ্বিজাতি, সুরা, জল, ঘৃত, গোমূত্র এবং দুগ্ধ—ইহাদিগের মধ্যে যে কোনও একটী বস্তু অগ্নি-সদৃশ উত্তপ্ত করিয়া তাহা পান করিবে। তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলেই শুদ্ধ হইবে। ইহা জ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত। ছাগাদি রোম-নির্ম্মিত বস্ত্র বা বল্কল পরিধান ও জটাধারণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা ব্রত (অর্থাৎ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত) করিবে। (ইহা অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত)। তিন বৎসর রাত্রিকালে পিণ্যাক-পিণ্ডই হউক আর তণ্ডুল-কণাই হউক, ভোজন করিবে (অজ্ঞান-পূর্ব্বক সুরা পান করিয়া পশ্চাৎ উহা বমন করিয়া ফেলিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত-এই)। দ্বিজপদবাচ্য তিন বর্ণ অজ্ঞানবশতঃ মদ্য, শুক্র বা মূত্র পান কিংবা বিষ্ঠা ভোজন করিলে (তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া) পুনঃ-সংস্কারার্হ হইবে। যে দ্বিজপত্নী সুরাপান করিবে, সে পতিলোক-গমনে বঞ্চিতা হইবে এবং সে ইহলোকে কুক্কুরী, গৃধ্রী এবং শূকরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।' প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, যম-সংহিতার একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে বচনটী এই,—"সুরাপো ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ সুবর্ণাস্তেয়কৃন্নরঃ। পতিতৈঃ সম্প্রযুক্তশ্চ কৃতঘ্নো গুরুতল্পগঃ। এতে পতন্তি সর্ব্বেষু নরকেষ্বনুপূর্ব্বশঃ॥" অর্থাৎ,—'মদ্যপায়ী, ব্রাহ্মণঘাতী, গোহত্যাকারী, স্বর্ণস্তেয়কারী, পতিত ব্যক্তিদিগের সহিত সংসৃষ্ট, কৃতঘ্ন ও গুরুপত্নীহরণকারী,—ইহারা ক্রমে ক্রমে

সর্ব্বপ্রকার নরকে পতিত হয়।' * মদ্যপান-জনিত পাপের নিবৃত্তি বিষয়ে যে দেশের শাস্ত্র এতই কঠোর, সে দেশের সমাজ কিরূপ সুশৃঙ্খলা-সম্পন্ন ছিল,—কিরূপ সন্নীতি-পরায়ণ ছিল, সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় না কি?

চৌর, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী প্রভৃতি অসদাচারীর এবং সর্ব্ববিধ অপকর্ম্মকারীর যথা-যোগ্য দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিয়া সংসারে শৃঙ্খলা-সাধনে শাস্ত্রকারগণের পূর্ণ দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। এক দ্রব্যের সহিত অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ব্যবসায়ীরা প্রতারণা করিতে না পারে, তৎপ্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল। আজ কাল প্রায় সকল জিনিষেই কৃত্রিমতা বা ভেজাল চলিয়াছে। আইনে কৃত্রিমতা বা ভেজাল সম্বন্ধে দণ্ডের বিধি আছে। কৃত্রিমতা বা ভেজাল চালাইয়া কেহ কেহ দণ্ডও প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু তথাপি সে কৃত্রিমতার বা ভেজালের অবধি নাই। এ কৃত্রি-মতা বা ভেজাল যে পূর্ব্বেও ছিল এবং আর্য্য মহর্ষিগণ এ কৃত্রিমতা দূর করিবার জন্য যে বদ্ধ-পরিকর ছিলেন, শাস্ত্রে তাহার ভূয়সী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। এতৎসম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিয়া-ছেন,—"ধান্যচৌরোঽঙ্গহীনস্ত্বমাতিরৈকাস্তু মিশ্রকং।" (মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায়, ৫০শ শ্লোক) অর্থাৎ,—'ধান্যচোর অঙ্গহীন হয়; মিশ্রক অর্থাৎ লাভের জন্য যে ব্যক্তি এক দ্রব্যের সহিত আর এক দ্রব্য মিশাইয়া বিক্রয় করে, সে অধিকাঙ্গ (বিকৃতাঙ্গ) হয়' এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। মনু তাই এতৎসম্বন্ধে পুনরায় বলিয়াছেন,—'চরিতব্যমতো নিত্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। নিন্দ্যৈর্হি লক্ষণৈর্যুক্তা জায়ন্তেঽনিষ্কৃতৈনসঃ॥" (মনু, ৫৪ম শ্লোক) অর্থাৎ,—'এই কারণ কৃত্রিমতা প্রভৃতির পাপক্ষালন জন্য প্রায়শ্চিত্তের আচরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পাপের নিষ্কৃতি না হইলে নিন্দনীয় লক্ষণযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।' বলা বাহুল্য, এবম্বিধ পাপেই মানুষ কুষ্ঠাদি ব্যাধিযুক্ত হইয়া ও অঙ্গবিকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কৃত্রিমতা বিষয়ে বা ভেজাল বিক্রয়ে বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৪৮ম—২৫১ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—

কৃত্রিমতার দণ্ড।

"ভেষজ-স্নেহ-লবণ-গন্ধ-ধান্য-গুড়াদিষু। পণ্যেষু প্রক্ষিপন্ হীনং পণান্ দাপ্যস্তু ষোড়শ॥
মৃচ্চর্ম্মমণিসূত্রায়সকাষ্ঠবল্কলবাসসাম্। অজাতৌ জাতিকরণে বিক্রেয়াষ্টগুণো দমঃ॥
সমুদ্গপরিবর্ত্তঞ্চ সারভাণ্ডঞ্চ কৃত্রিমম্। আধানং বিক্রয়ং বাপি নয়তো দণ্ডকল্পনা॥
ভিন্নে পণে তু পঞ্চাশৎ পণে তু শতমুচ্যতে। দ্বিপণে দ্বিশতো দণ্ডো মূল্যবৃদ্ধৌ চ বৃদ্ধিমান॥"

অর্থাৎ,—'ঔষধ, ঘৃত, তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য, কুঙ্কুমাদি গন্ধ, ধান্য, গুড় প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিলে, ষোড়শ পণ দণ্ড দিতে হইবে। অপকৃষ্ট সুতরাং হীনমূল্য মৃত্তিকা, চর্ম্ম, স্ফটি-কাদি মণি, সূত্র, লৌহ, বল্কল এবং বস্ত্রের বহুমূল্যতার জন্য কৃত্রিম উৎকর্ষাদি সম্পাদন করিলে বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আট গুণ অধিক অর্থ-দণ্ড হইবে। পরিবর্ত্তিত মুদ্রিত পেটিকা

* রঘুনন্দন প্রণীত 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত' যমসংহিতার এই শ্লোকটী অধুনা-প্রচলিত যম-সংহিতায় দেখিতে পাইলাম না। এতৎপরিবর্ত্তে যম-সংহিতায় অন্য একটী শ্লোক দৃষ্ট হইল। সে শ্লোকটী,—

"সুরাম্বুমদ্যপানেন গোমাংসভক্ষণে কৃত। তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্বিপ্রস্তৎপ্রাপস্ত প্রনগুতি।"

আমাদের মনে হয়, এস্থলে 'সুরাম্বু' পাঠ না হইয়া 'সুরান্ত' পাঠ হওয়া সঙ্গত ছিল।

(মনে কর—একটী মুক্তাপূর্ণ পেটিকা আছে, আর একটী কাচপূর্ণ পেটিকা আছে; তন্মধ্যে মুক্তাপূর্ণ পেটিকা দেখাইয়া মূল্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার সময় কৌশলে প্রদত্ত কাচপূর্ণ পেটিকা দিয়া) কিংবা কৃত্রিম প্রস্তুত কস্তুরীকাদি সারভাণ্ড বন্ধক রাখিলে বা বিক্রয় করিলে নিম্নলিখিত রীতিক্রমে দণ্ড নির্ণয় জানিবে। যথা,—এক পণের কম মূল্যে বিক্রয়াদি করিলে পঞ্চাশৎ পণ, এক পণ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিলে শত পণ, দুই পণ মূল্যে বিক্রয় করিলে দ্বিশত পণ দণ্ড। ইহার অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করিলে উক্ত রীতি অনুসারে দণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার অন্য আর এক স্থলে (তৃতীয় অধ্যায়ের ২২১ম শ্লোকার্দ্ধে) "ধান্যমিশ্রোঽতিরিক্তাঙ্গঃ" ইত্যাদি উক্তিতে ধান্যমিশ্রক অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধান্য-রাশি হইতে কিয়দংশ অপহরণ করিয়া তৎপূরণার্থ উক্ত রাশিতে অপর কোনও দ্রব্য বা অপকৃষ্ট ধান্যাদি মিশ্রিত করে,—সে অধিকাঙ্গ (বিকৃতাঙ্গ) হইয়া জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ উল্লেখ আছে। বিষ্ণুসংহিতাও ভেজালের দণ্ডের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণু-সংহিতার পঞ্চম অধ্যায় (৯৭ম, ৯৮ম, ৯৯ম ও ১২৩ম সূত্রে) এতদ্বিষয়ে দণ্ডের কথা লিখিত আছে। সে মতে কৃত্রিমতা সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ বিশেষ কার্য্যের দণ্ডবিধি এইরূপ,—

"দ্রব্যাণাং প্রতিরূপবিক্রয়িকস্য চ।"—১২৩ম।

"অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণ দূষয়িতা, ষোড়শ সুবর্ণান্।"—৯৭ম।

"জাত্যপহারিণা শতম্॥" ৯৮ম॥ "সুরয়া বধ্য।"—৯৯ম।

অর্থাৎ,—'যে নকল জিনিষ বিক্রয় করে, তাহার দণ্ড হয়। যে ব্রাহ্মণকে কুভক্ষ্য অর্থাৎ মিশ্র সামগ্রী ভক্ষণ করায়, তাহার দণ্ড হয়। ভক্ষ্য পদার্থ অভক্ষ্য পদার্থাদি দ্বারা দূষিত করিলে দণ্ড হয়। সুরা দ্বারা কোনও সামগ্রী দূষিত করিলে তাহার বধ দণ্ড।' বলা বাহুল্য, এই সকল দণ্ডের তারতম্য আছে। এমন কি, ঐ সকল অপরাধে শাস্ত্র বধ দণ্ড পর্য্যন্ত বিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। কৃত্রিম দ্রব্য বা ভেজাল-বিক্রয়ে যে গুরুতর পাপ হয়, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক! জানিয়া শুনিয়া এই পাপের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান করিলে প্রায়শ্চিত্তের বা দণ্ডের গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়। কৃত্রিমতা পরিহার পক্ষে যে সমাজে এত কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত ছিল, সে সমাজের রুচি কতদূর পরিমার্জ্জিত এবং সে সমাজ সততা-রক্ষার পক্ষে কতদূর প্রযত্নপর ছিল, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়।

প্রাচীন ভারতে নারীগণ সমাজে কিরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন, তদ্বিষয় আলোচনা করিলেও সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। আধুনিক সভ্য-সমাজে স্ত্রীগণকে শিক্ষিত ও সম্মানিত করিবার পক্ষে চেষ্টা চলিয়াছে। আধুনিক সমাজ-তত্ত্বজ্ঞগণের মতে স্ত্রী-জাতির উন্নত অবস্থাই সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। বর্ত্তমানের উন্নত-সমাজে স্ত্রীগণের উন্নত অবস্থার লক্ষণ প্রভৃতির সহিত আমরা সর্ব্বতোভাবে অবশ্য একমত নহি। তবে, ভারতবর্ষের সমাজে স্ত্রী-গণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের এবং তাঁহাদের সুশিক্ষা-বিধানের যে ব্যবস্থা ছিল, বোধ হয় আধুনিক অন্য কোনও সমাজে তাহার তুলনা নাই। প্রাচীন ভারতের নারীগণের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিহিত হইয়াছিল। পুরুষগণ আমাদের কীর্ত্তি-স্মৃতির যে নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, মহিলা-

স্ত্রীজাতির অবস্থা।

গণের সেইরূপ কীর্ত্তি-স্মৃতির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজে স্ত্রীলোকের সম্মানের অবধি ছিল না। স্ত্রীগণের প্রতি ভারতবর্ষের সমাজ কিরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন, মহর্ষি মনুর উক্তিতে (মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, ৫৫ম—৫৯ম শ্লোক) তাহা প্রতিপন্ন হয়। যথা,—

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা। পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্। ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ। তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ। ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥"

অর্থাৎ,—'পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর প্রভৃতি সকলেই স্ত্রীগণকে বস্ত্রালঙ্কারাদি বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত ও উত্তম আহারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিবেন। যে গৃহে নারীগণ সম্বর্দ্ধিতা হন, সে গৃহে দেবগণ প্রসন্নভাবে বিরাজ করেন। যে গৃহে স্ত্রীলোকের সম্মান নাই, সে গৃহের ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্ত পণ্ড হইয়া থাকে। যে গৃহে স্ত্রীলোকগণ অনুশোচনা প্রাপ্ত হন, সে কুল শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আর যে গৃহে স্ত্রীলোকের কোনও দুঃখের কারণ নাই, সে সংসার দিনদিনই শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকগণ কষ্টপ্রাপ্ত হইয়া যে গৃহে অশ্রুপাত করেন, সে কুল সর্ব্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা সংসারের শ্রী-বৃদ্ধি কামনা করেন, স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা বসন-ভূষণাদি দ্বারা পরিতুষ্ট রাখা ও সম্মান করা, তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।' যে দেশের শাস্ত্রগ্রন্থ এমন উপদেশ দেন, যে দেশের শাস্ত্রগ্রন্থ বলেন,—'স্ত্রীলোকের সন্তুষ্টিতে সংসারের প্রতি দেবতা সন্তুষ্ট থাকেন'; সে দেশের স্ত্রীলোকের কিরূপ উন্নত অবস্থা ছিল এবং তাঁহারা কিরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সাধারণতঃ পরস্ত্রী-মাত্রকেই অথবা যাঁহাদের সহিত কোনরূপ রক্তের সম্বন্ধ নাই, সেই সকল স্ত্রীলোককে শাস্ত্রে ভগিনী বলিয়া 'সম্বোধন করার আদেশ আছে (মনু, ২য় অ, ১২৯ম শ্লোক)। মাতৃভগ্নী, মাতুলানী, পিতৃভগিনী ও শ্বশ্রূ প্রভৃতির প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিতে হয়। (মনু, ১৩১ম শ্লোক)। বয়ঃজ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নী, পিতৃব্য-পত্নী, জ্যেষ্ঠা ভগ্নিনী প্রভৃতির প্রতিও ঐরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য (মনু, ১৩২ম ও ১৩৩ম শ্লোক)। স্ত্রীগণের প্রতি সাধারণতঃ কিরূপ সদ্ব্যবহার করা হইত, এই সকল উক্তিই তাহার প্রমাণ। স্ত্রী-গণ যদি কোনও শ্রেয়ঃ-কার্য্যের অনুষ্ঠানে উপদেশ দেন, শাস্ত্রের উপদেশ, ব্রহ্মচারিগণও তাহা পালন করিবেন; (মনু, ২য় অধ্যায়, ২২৩ম শ্লোক)। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থেও নারীজাতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের বহুল উপদেশ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে,—"পদে পদে শুভং তস্য যস্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি। অবমস্তস্ত্রীয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ। পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী॥" এইরূপ উক্তি প্রায় সকল শাস্ত্রেই পরিদৃষ্ট হয়। স্ত্রী-জাতির শিক্ষার ব্যবস্থা, পুরুষদিগের ন্যায়ই বিহিত ছিল; (কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ")। স্ত্রীগণ বহু যজ্ঞকার্য্যে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী বলিয়া পরিগণিত; সংসারে তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপ কর্তৃত্ব। প্রাচীন ভারতের স্ত্রী-গণ যে নানাবিধ সুশিক্ষায় সুশিক্ষিতা ছিলেন, শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণের সর্ব্বত্রই তাহার নিদর্শন

আছে। কতকগুলি বৈদিক-মন্ত্রে কয়েক জন মহিলার নাম দৃষ্ট হয়। তাঁহারা ঐ সকল মন্ত্র রচনা করিয়াছেন বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঘোষণা করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ীর জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় আছে। তাঁহার প্রশ্ন এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর, হিন্দু-মহিলার জ্ঞানস্ফূর্ত্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। রাজর্ষি জনকের সভায় ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে গার্গীর প্রশ্ন, তাঁহার অশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচয়। গৌতম-বুদ্ধের জীবনচরিত আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই, মহিলাগণ তাঁহার সদুপদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেক জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দিয়াছিলেন। মহাভারতে বিদুলার চরিত্র আলোচনা করিলে হিন্দু-মহিলার রাজনীতি আলোচনার বিষয় অবগত হওয়া যায়। ফলতঃ, নানা দিকেই নানা ভাবে প্রাচীন ভারতের মহিলাগণের প্রতিভা-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। 'ভারতের মহিলাগণ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন;—ভারতবাসী পুরমহিলাগণের সম্মান রাখিতে জানে না;—এ সকল কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ করেন। অন্ততঃ, প্রাচীন ভারতবর্ষে মহিলাগণের যে সম্মান-সমাদর ছিল, পৃথিবীর কোনও দেশে তাহার তুলনা নাই। কেবল আমাদের মুখের কথা নহে; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যাঁহারাই এ সকল বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই ভারতের মহিলাদিগের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। * পতিভক্তির এবং সতীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভারতবর্ষে। পতির জীবনান্তে ব্রহ্মচর্য্যে ও সহমরণে সে আদর্শ উজ্জ্বলতর হইয়া আছে। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে উপদেশ আছে, সে উপদেশ সকল কালে সকল সমাজে শিক্ষণীয়। যোষিদ্ধর্ম্ম-কথন প্রসঙ্গে মহর্ষি মনু যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রতিদিন গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হওয়া কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন,—

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা। ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥
পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ। এষাং হি বিরহেন স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে॥
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া। সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া॥
যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ। তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥
মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ। প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্॥
অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎপতিঃ। সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ॥
বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জ্জিতঃ। উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যপোষিতম্। পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা। পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।"

অর্থাৎ,—'কিবা বালিকা, কিবা যুবতী, কিবা বৃদ্ধা, গৃহস্থ স্ত্রীগণের স্বতন্ত্র কোনও কার্য্য নাই। বাল্যে পিতার বশে, যৌবনে পতির বশে, পতির মৃত্যুর পর পুত্রের বশে স্ত্রীগণের অবস্থান করা কর্ত্তব্য। কখনও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা তাঁহাদের উচিত নহে। পিতা,

* And it may be confidently asserted that in no nation of antiquity were women held in so much esteem as amongst the Hindus."—Prof. H. H. Wilson.

পতি এবং পুত্রের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীগণ কখনও বিভিন্ন থাকিতে চেষ্টা করিবেন না। তাহাতে পিতৃকুল ও পতিকুল উভয় কুলই কলঙ্কিত হয়। স্ত্রীগণ সর্ব্বদা হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রকাশ করিবেন। স্ত্রীগণ গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন, পরিমিতব্যয়ী হইবেন। পিতা যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, অথবা পিতৃ অনুমতি ক্রমে ভ্রাতা যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই পতির সেবা সারাজীবন স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। স্বামীর মৃত্যুর পরও স্ত্রীগণ কদাচ ব্যভিচার অবলম্বন করিবেন না। প্রজাপতির পূজা ও যজ্ঞাদি মাঙ্গল্যানুষ্ঠানে যে বাগ্‌দান হয়, সেই বাগ্‌দানে স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। ইহকালে এবং পরকালে পতি সকল সময়ই স্ত্রীলোকের সুখদাতা। পতি যদি সদাচারশূন্য, কামরত, বিদ্যাদি গুণহীন হন, তথাপি সাধ্বী স্ত্রী পতিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করিবেন। পতিসেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের যজ্ঞ নাই, পতিসেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের ব্রত বা উপবাস নাই। পতিসেবা দ্বারাই স্ত্রীগণ স্বর্গলাভের অধিকারী হন। পতির জীবিত-কালে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে,—কোনও কালেই স্ত্রীগণ পতির অপ্রিয় কার্য্য করিবেন না।' পুরুষগণকে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের যেমন উপদেশ, সংযতভাবে অবস্থানের জন্য স্ত্রীগণের প্রতিও তদনুরূপ উপদেশ। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও এইরূপ উপদেশই প্রদান করিয়া গিয়াছেন। (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রথম অধ্যায়, ৮২শ হইতে ৮৭শ শ্লোক)। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি; যথা,—

"ভর্ত্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ। বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥
সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী। কুর্য্যাচ্ছ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্ত্তৃতৎপরা॥
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্। হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥
রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিপুত্রাস্তু বার্দ্ধকে। অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন কচিৎ স্ত্রিয়াং॥
পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃশ্বশ্রূশ্বশুরমাতুলৈঃ। হীনা ন স্যাদ্বিনা ভর্ত্রা গর্হণীয়ান্যথা ভবেৎ॥
পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া। ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্॥"

অর্থাৎ,—'ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর এবং বন্ধুবান্ধবগণ ধন, অলঙ্কার এবং আহার্য্যাদি প্রদান করিয়া স্ত্রীগণকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন। স্ত্রীগণ কার্য্যদক্ষতায়, সংসারের শৃঙ্খলা-রক্ষায় এবং পরিমিত-ব্যয়িতায় সর্ব্বদা আনন্দময়ী থাকিবেন। স্ত্রীগণ শ্বশুরের পাদবন্দন করিবেন এবং স্বামীর সর্ব্বদা বশানুবর্ত্তী থাকিবেন। পতি স্থানান্তরে থাকিলে স্ত্রী বেশ-বিন্যাস, ক্রীড়া-কৌতুক, উৎসব-দর্শন, হাস্য-পরিহাস, পরগৃহ-গমন প্রভৃতি কার্য্যে বিরত হইবেন। কন্যাকালে পিতার নিকট, বিবাহের পর পতির নিকট, বার্দ্ধক্যে পুত্রের নিকট, তদভাবে জ্ঞাতির নিকট, স্ত্রীগণ অবস্থান করিবেন। তাঁহারা কদাচ স্বাধীনতা অবলম্বন করিবেন না। ভর্ত্তার অবিদ্যমানে স্ত্রীগণ—পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী, মাতুল প্রভৃতির আশ্রয়ে বাস করিবেন। তাঁহারা কদাচ অন্য পথ গ্রহণ করিবেন না। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, সদাচারে অবস্থিতি করিয়া, যে স্ত্রী পতির প্রিয়কার্য্যে রত থাকেন, ইহকালে তিনি অশেষ যশোলাভ করেন এবং পরকালে অনুপম সুখ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।' সকল শাস্ত্রেই এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাই, সকল শাস্ত্রই স্ত্রীগণকে পতির অনুগামিনী হইবার জন্য এইরূপ উপদেশই দিয়াছেন। স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে,—

"পতিসেবা ব্রতং স্ত্রীণাং পতিসেবা পরং তপঃ। পতিসেবা পরো ধর্ম্মঃ পতিসেবা সুরার্চ্চনম্॥
পতিসেবা পরং সত্যং দানোতীর্থানুতীর্থকম্। সর্ব্বদেবময়ঃ স্বামী সর্ব্বদেবময়ঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্বরূপশ্চ পতিরূপী জনার্দ্দনঃ। যা সতী ভর্ত্তুরুচ্ছিষ্টং ভুংক্তে পাদোদকং সদা।
তস্যা দর্শমুপস্পর্শং নিত্যং বাঞ্ছন্তি দেবতাঃ॥"—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৫৭ম অধ্যায়।
বিষ্ণুপুরাণে, ষষ্ঠাংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২৮শ, ২৯শ ও ৩৫শ শ্লোকে) পতিসেবা দ্বারা স্ত্রীলোকের মোক্ষ লাভ হয়,—এইরূপ উক্তিতে দেখিতে পাই। তন্ত্রশাস্ত্রে স্ত্রীগণ মন্ত্রদানে অধিকারী ছিলেন, এরূপ উক্তিও দৃষ্ট হয়। যে দেশের স্ত্রীগণের নাম বৈদিক মন্ত্রের সহিত সংগ্রথিত, যে দেশের স্ত্রীগণ উপনিষদাদির ব্রহ্মতত্ত্বালোচনায় সমর্থা ছিলেন, যে দেশের স্ত্রীগণ মন্ত্রদাত্রী গুরুরূপে সম্পূজিতা হইতেন, আর যে দেশের স্ত্রীগণ সতীত্বের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ছিলেন, সমাজে তাঁহাদিগের স্থান কত উচ্চে নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক হয়? যাঁহারা এদেশের স্ত্রীজাতির প্রতি কঠোর-ব্যবহারের বিষয় প্রচার করেন, তাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত নহেন,—তাঁহারা সমাজ-তত্ত্বেও অনভিজ্ঞ। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই যে সমাজে এই সকল শাস্ত্রোপদেশ মান্য করিয়া চলেন, সে সমাজে কখনও কি বিশৃঙ্খলা ঘটে? আদর্শ-সমাজ এই সকল শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিয়া চলিতেন বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সমাজে কি ব্যভিচার ছিল না? সে কথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। সমাজে সৎও ছিলেন, অসৎও ছিল; সমাজে দেবতাও ছিলেন, সমাজে অসুরও ছিল; সমাজে ব্যভিচারও ছিল, সমাজে শৃঙ্খলাও ছিল। তবে এখানে আমরা কেবল সন্নীতি-পরায়ণ আদর্শ-সমাজের কথাই বলিতেছি।

প্রাচীন-ভারতের মহিলা-দিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, তাঁহাদের গৃহকর্ম্ম, জীবনযাপন, পতিসেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ব্রতাচরণ প্রভৃতির বিবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষের নারী-জীবনের শেষ-অনুষ্ঠানের বিষয় স্বতঃই মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে। সতীর জীবন—পতির জীবনের সহিত যে সম্পূর্ণরূপ সম্বন্ধযুক্ত, মহিলাগণের জীবনের শেষ-অনুষ্ঠানে তাহাই উপলব্ধি হয়। সে অনুষ্ঠান—সহমরণ বা ব্রহ্মচর্য্য। সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কাল-মাহাত্ম্যে অধুনা অনেক তর্কবিতর্ক উঠিয়া থাকে। বিশেষতঃ, সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য প্রথা প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজে প্রচলিত ছিল না, অধুনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,—ইহাই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের ধারণা। তাঁহারা বলেন,—'বৈদিক যুগে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল না, মনুর সময়েও সহমরণের উল্লেখ নাই; সহমরণ—মধ্যযুগের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের চাতুর্য্যের ফল।' কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যায়,—সহমরণ-প্রথা আবহমান-কাল বেদ-পুরাণ-তন্ত্র সর্ব্বসম্মত-রূপে প্রচলিত ছিল; উহা সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচলিত হয় নাই। ঋগ্বেদে সহমরণ সম্বন্ধে দুইটী ঋক আছে। সে দুইটী ঋকের অর্থ লইয়াই যত কিছু বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সহমরণ-প্রথার বিপক্ষবাদিগণ বলেন,—'ঐ ঋক-দুইটী সহমরণের প্রতিকূল'; আবার সহমরণ-প্রথার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ বলেন,—'ঋক দুইটী সহমরণ প্রথার সম্পূর্ণ অনুকূল।'

সহমরণ প্রসঙ্গ বেদে।

(ষষ্ঠ প্রপাঠক, দশম অনুবাকে) এই দুই ঋকই প্রচারিত আছে। স্মৃতি-শাস্ত্র অনুসারে সমাজ আবহমান কাল পরিচালিত হইত। স্মৃতিশাস্ত্রের নানা স্থানেই সহমরণ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত। "অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ" এই বলিয়া বিষ্ণু-সংহিতা (পঞ্চবিংশ অধ্যায়, চতুর্দ্দশ সূত্র) বলিতেছেন,— "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা;" অর্থাৎ,—ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা ভর্ত্তার সহগমন বা অনুগমন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। অত্রিসংহিতা সহমরণ-গমনে অসমর্থা রমণীর প্রায়শ্চিত্তের বিষয় লিখিয়াছেন,—"চিতিভ্রষ্টা তু যা নারী ঋতুভ্রষ্টা চ ব্যাধিতঃ। প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দশঃ॥" অর্থাৎ,—'স্ত্রীলোক সহমরণ বা অনুমরণ করিতে গিয়া চিতা হইতে পতিতা হইলে বা রোগ দ্বারা রজোহীন হইলে প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া এবং দশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে।' এ সকল উক্তিতে সহমরণের প্রচলন প্রতিপন্ন হয়; অপিচ, ইচ্ছাপূর্ব্বক সহমরণে গিয়া যদি কেহ চিতাভ্রষ্ট হন অর্থাৎ মরিতে না পারেন, ব্রাহ্মণভোজনাদি সামান্য প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা তাঁহার পাপস্খলন হইতে পারে। যাঁহারা বলেন—জোর করিয়া

সহমরণ-প্রসঙ্গ। স্মৃতিশাস্ত্রে।

ঐ ঋকের একটী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেই ইংরাজী অনুবাদ এই,—"Om! Let those women, not to be widowed good wives, adorned with collyrium, holding clarified butter, consign themselves to the fire. Immortal, not childless, not husbandless, excellent, let them pass into the fire whose original element is water." কোন্ কথার পরিবর্ত্তন কখন ঘটিয়াছে কোলব্রুকের অনুবাদ দৃষ্টেই তাহা বুঝা যায় না কি? কোলব্রুকের এই অনুবাদের প্রায় ষোল বৎসর পরে অধ্যাপক উইলসনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমুলার, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কাওয়েল এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রমেশ চন্দ্র দত্ত এতদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। (Cf. Transactions of Royal Asiatic Society, Vol. I, p. 458; Asiatic Researches, Vol IV, p. 211; Journal of the Royal Asiatic Society. Vol. XVI, p. 203; *and* E. B. Cowell's note in Elphinstone's History of India.) সুতরাং পরিবর্ত্তন কখন হইয়াছিল, বুঝা যাইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ-নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়েও এ পরিবর্ত্তনের কথা উত্থাপিত হয় নাই। তিনি যদি 'অগ্রে' শব্দের পরিবর্ত্তে 'অগ্নে' শব্দের ব্যবহারের বিষয় জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি সে কথার উপর জোর দিতে ত্রুটি করিতেন না। অধিকন্তু তাঁহার গ্রন্থে যে পাঠ দেখিতে পাই, এবং তিনি তাহার যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 'অগ্নে' শব্দই তৎকাল-প্রচলিত পাঠ বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহার গ্রন্থে ঋকটী যে ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং তিনি সেই ঋকের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; তাঁহার প্রকাশিত ঋকটী এবং তৎকৃত অনুবাদ এই,— "ইমা নারীরবিধবা সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সম্বিশন্ত্বনশ্রবা অনমীবা সুরত্না আরোহন্তু যাময়ো যোনিমগ্নেঃ॥" অনুবাদ,—"O fire, let these women with clarified butter, eyes coloured with collyrium and void of tears enter thee, the parent of water, that they may not be separated from their husbands, themselves sinless and jewels amongst women." (পূর্ব্বে ঋগ্বেদের যে ঋক আমরা প্রকাশ করিয়াছি, সেই ঋকের সহিত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের প্রকাশিত ঋকে দুই একটী শব্দের পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত ঋকের 'সংপৃশন্তাম্' শব্দ 'সম্বিশন্তু', 'অনশ্রবঃ' শব্দ 'অনশ্রবা' এবং 'সুশেবা' শব্দ 'সুরত্না' রূপে পরিবর্ত্তিত। বলা বাহুল্য, এ পরিবর্ত্ত অর্থ বিষয়ে কোনও অসঙ্গতি ঘটে নাই।) ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিলাত-যাত্রা করেন। বলা বাহুল্য, তাহার পূর্ব্বে ঐ পাঠ ও ঐ অনুবাদ প্রচারিত ছিল। এ সকল প্রমাণ সত্ত্বেও 'অগ্রে' স্থলে 'অগ্নে' পাঠ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, কি করিয়া বলিতে পারি? বরং এই কথাই বলিতে পারি না কি,—পাঠ-পরিবর্ত্তন আধুনিক-কালেই সংসাধিত হইয়াছে! উইলসন যদি প্রথমে পাঠ-পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, আর তাঁহার অনুসরণে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমুলার যদি পাঠ-পরিবর্ত্তনের বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকেন, তৎপরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাওয়েল এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় যদি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন; তাহা হইলে কি প্রতিপন্ন হয়? প্রতিপন্ন হয় না কি—পরিবর্ত্তন অতি অল্প দিন মাত্র সাধিত হইয়াছে, আর ঋগ্বেদে সহমরণের প্রসঙ্গ আছে?"

স্ত্রীগণকে সহমরণে মারিয়া ফেলা হইত, তাঁহাদের উক্তির অসারত্ব ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। পরাশর-সংহিতা কলিকালে প্রামাণ্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। পরাশর-সংহিতার (৪র্থ অধ্যায়, ২৭শ—২৯শ শ্লোক) সহমরণ সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা,—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যৰ্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে। তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ। এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে॥"

অর্থাৎ,—'স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করেন। আর স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, সেই স্ত্রী মানব-দেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী সংখ্যক রোম আছে, তাবৎ পরিমিত কাল স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্ত মধ্য হইতে সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমনি সহমৃতা নারী মৃত পতিকে উদ্ধার করিয়া তৎসহ স্বর্গসুখ ভোগ করেন।' দক্ষ-সংহিতার উক্তি—পরাশর-সংহিতার উক্তিরই অনুসারিণী। (দক্ষ-সংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়, ১৯শ—২০শ শ্লোক) যথা,—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্। সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। তথা সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহমোদতে॥"

ব্যাস-সংহিতায় (ব্যাস-সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫৩শ শ্লোক) সহমরণের বিষয় লিখিত আছে।

"মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ। জীবন্তী চেত্ত্যক্ত কেশা তপসা শোধয়েদ্বপুঃ॥"

অর্থাৎ—'পতিব্রতা স্ত্রী মৃত ভর্ত্তার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিবে।' অঙ্গিরঃ-সংহিতা, আপস্তম্ব সংহিতা এবং হারীত সংহিতা প্রভৃতিতেও সহমরণ সংক্রান্ত শ্লোক বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে এতদ্বিষয় উল্লিখিত আছে। কিন্তু অধুনা-প্রচলিত অঙ্গিরঃ, আপস্তম্ব ও হারীত প্রভৃতি সংহিতা-শাস্ত্রে ঐ বিষয়ের কিছুই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ লিপিকার-প্রমাদে এখন সেই সেই অংশ বাদ পড়িয়া গিয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম-মতে অঙ্গিরঃ-সংহিতার উক্তি,—"অঙ্গিরাঃ। মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্। সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" ইহার পর পরাশর-সংহিতার উক্তি,—'তিস্রঃকোট্যৰ্দ্ধকোটী' প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। আপস্তম্ব-সংহিতায়, যথা,—"আপস্তম্বঃ। চিতিভ্রষ্টা তু যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত্তু তস্মাদ্ধিপাপকর্ম্মণঃ॥" যমসংহিতায়ও এতাদৃশ উক্তি ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। সতীধর্ম্ম-প্রসঙ্গে হারীত-সংহিতার উক্তি বলিয়া একটি শ্লোক প্রচলিত আছে। সে শ্লোকটী এই,—"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥" এ শ্লোকটীও হারীত-সংহিতায় এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দকল্পদ্রুমে ইহার শেষে 'ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টায়মিতি কল্পতরু' এইরূপ লিখিত আছে। যাহা হউক, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে সহমরণ-প্রথার বিষয় যে স্মৃতিশাস্ত্রের নানা স্থানে উল্লিখিত ছিল এবং আছে, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। মনুসংহিতায় সহমরণের কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; মনু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনেরই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে মনুর (পঞ্চম অধ্যায়, ১৬০ম শ্লোক) উক্তি,—

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥"
অর্থাৎ,—'সাধ্বী স্ত্রীগণ অপুত্রা হইলেও স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য-বলে ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন করেন।' মনুসংহিতায় সহমরণের বিষয় উল্লেখ নাই বলিয়া মানব-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা-কালে সহমরণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল না, এ কথা মনে করা যায় না। অনুল্লেখ প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয় না। সেই ত্রিকালদর্শী মহর্ষি ভবিষ্যতের—এই বর্ত্তমান কালের উপযোগী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, ইহাই মনে করিতে পারি। সকল শাস্ত্রোক্তি তুলনায় আলোচনা করিয়া দেখিলেও ব্রহ্মচর্য্যের শ্রেষ্ঠত্বই অনুভূত হয়। রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সহমরণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে, পূর্ব্বেই (প্রথম খণ্ড, পৃথিবীর ইতিহাসে) আমরা তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছি। মহারাজ দশরথের লোকান্তরের পর রাণী কৌশল্যা সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং পতির মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। মহর্ষি বসিষ্ঠের আদেশ অনুসারে পুরমহিলাগণ কর্ত্তৃক রাজ্ঞী স্থানান্তরিতা হন। এতৎসম্বন্ধে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (ষট্‌ষষ্টিতম সর্গে) মহর্ষি বাল্মীকি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—

সহমরণ-প্রসঙ্গ। পুরাণাদিতে।

"কৌশল্যা বাষ্পপূর্ণাক্ষী বিবিধং শোককর্ষিতা। উপগৃহ্য শিরো রাজ্ঞঃ কৈকেয়ীং প্রত্যভাষত॥
সাহমদ্যৈব দৃষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা। ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥"

শোককৃষা কৌশল্যা দেবী রাজা দশরথের মস্তক ক্রোড়-দেশে রাখিয়া বাষ্পপূর্ণ-লোচনে (অন্যান্য কথার পর) বলিলেন,—'পাতিব্রত্য পালনার্থ আমি এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিব,—এই স্বামীর শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব।' রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (সপ্তদশ সর্গে) রাবণের নিকট ব্রাহ্মণ-কন্যা বেদবতী আপনার পিতার মৃত্যুকাহিনী ও জননীর সহমরণ-গমনের বিষয় বর্ণন করেন। বেদবতী বলেন,—'আমার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, ত্রিভুবনপতি সুরেশ্বর বিষ্ণু তাঁহার জামাতা হন। সেই হেতু পিতা আমাকে অন্য কাহাকেও দান করেন নাই। পিতা বিষ্ণুকে দান করিতে ইচ্ছা করিলে, বরগর্ব্বিত দৈত্যপতি শম্ভু তাহা শুনিয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন। অবশেষে নিশাকালে শুইয়া আছেন, এমন সময় সেই দৈত্য আমার পিতাকে বধ করিল। সেই সময় আমার মহাভাগা মাতা শোকার্ত্তা হইয়া আমার পিতার সেই দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। যথা,—

"ততো মে জননী দীনা তচ্ছরীরং পিতুর্মম। পরিষ্বজ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্॥"

দশরথের পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেও, তাঁহাদের সময়ে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল,—দেখিতে পাই। ঐ বংশের বাহুক, হৈহয় ও তালজঙ্ঘগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বনে গমন করেন। সেই স্থানেই তাঁহার আয়ুঃ শেষ হয়। বাহুকের মৃত্যু হইলে তাঁহার মহিষী সহমরণে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন। কিন্তু মহিষীকে গর্ভবতী জানিয়া মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে সহমরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। বাহুকের সেই মহিষীর গর্ভে দিগ্বিজয়ী সগর রাজা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এতৎসম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ভরুকস্তৎসুতস্তস্মাদ্‌বৃকস্তস্যাপি বাহুকঃ। সোঽরিভির্হৃতভূ রাজা সভার্য্যো বনমাবিশৎ॥
বৃদ্ধং তং পঞ্চতাং প্রাপ্তং মহিষ্যনুমরিষ্যতী। ঔর্ব্বেণ জানতাত্মানং প্রজাবন্তং নিবারিতা।"

বিষ্ণুপুরাণেও এতদ্বিষয় পরিবর্ণিত আছে। তদনুসারে জানা যায়,—'রাজা বাহুক বার্দ্ধক্য অবস্থায় নীত হইয়া অবশেষে ঔর্ব্ব নামক ঋষির আশ্রম-সমীপে কালগ্রাসে পতিত হন। রাজমহিষীও চিতা রচনা করিয়া, তাহাতে মৃত মহারাজকে আরোপণ পূর্ব্বক, সহমরণে কৃত-নিশ্চয়া হইলেন। অনন্তর, অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান-কাল বৃত্তান্ত-বেত্তা ভগবান ঔর্ব্ব স্বকীয় আশ্রম হইতে নির্গমন করিয়া কহিলেন,—'হে সাধ্বি! আপনি এই অসদারম্ভ কেন করিতেছেন? আপনার উদরে অখিল-ভূমণ্ডল-পতি রাজচক্রবর্ত্তী, অতিপরাক্রমশালী, অনেক-যজ্ঞকর্ত্তা, শক্রপক্ষ-ক্ষয়কারী বালক অবস্থিতি করিতেছেন। আপনি এ প্রকার সাহস ও অধ্যবসায় করিবেন না—করিবেন না।' ঋষি এই কথা বলিলে রাজমহিষী সেই সহমরণ-ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এতদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণের উক্তি,—"স চ বাহুর্বৃদ্ধভাবাদৌর্ব্বাশ্রম সমীপে মমার। সা তস্য ভার্য্যা চিতাং কৃত্বা তমারোপ্যানুমরণ কৃতনিশ্চয়াভূৎ।" স্বায়ম্ভুব মনুর বংশীয় রাজচক্রবর্ত্তী পৃথুর নামানুসারে পৃথিবী নামের উৎপত্তি। তিনি দশরথাদির কত পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সেই পৃথুর পত্নী সাধ্বী অর্চ্চি সহমৃতা হইয়াছিলেন। তদ্বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"দেহং বিপন্নাখিলচেতনাদিকং পত্যুঃ পৃথিব্যাদয়িতস্য চাত্মনঃ।
আলক্ষ্য কিঞ্চিচ্চ বিলপ্য সা সতী চিতামথারোপয়দদ্রিসানুনি॥
বিধায় কৃত্যং হ্রদিনী জলাপ্লুতা দত্ত্বোদকং ভর্ত্তুরুদারকর্ম্মণঃ।
নত্বা দিবিস্থাং স্ত্রিদশাংস্ত্রিঃ পরীত্য বিবেশ বহ্নিং ধ্যায়তী ভর্ত্তৃপাদম্॥"

'পতিপরায়ণা অর্চ্চি যখন দেখিলেন, স্বামীর দেহে চেতনাদি সমুদায় বিনষ্ট হইল, তখন কিয়ৎকাল বিলাপ করিয়া পরে গিরিসানুতে চিতারচনা পূর্ব্বক তদুপরি স্বামীর কলেবর স্থাপন করিলেন; এবং তৎকালোচিত অন্যান্য ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া নদীর জলে অবগাহন-পূর্ব্বক উদারকর্ম্মা ভর্ত্তার তর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণকে প্রণাম করিয়া তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বামীর পদযুগল চিন্তা করিতে করিতে চিতানলে প্রবিষ্টা হইলেন। সতী সাধ্বী অর্চ্চিকে পতি পৃথুর সহিত সহমৃতা হইতে দেখিয়া আকাশস্থ দেবপত্নীগণ দেবগণের সহিত সহস্র বার স্তব করিতে লাগিলেন।' মহাভারতে (আদি-পর্ব্বের পঞ্চবিংশত্যধিক শততম, ষড়বিংশত্যধিক শততম ও সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ত্রয়ে) পাণ্ডু রাজার সহিত তৎপত্নী মাদ্রীর সহমরণ-গমনের বিবরণ বর্ণিত আছে। পতিব্রতা মাদ্রী পাণ্ডুকে চিতাস্থিত বৈশ্বানর মুখে আহুত হইতে দেখিয়া সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আপনার জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতির সহিত পতিলোকে গমন করিলেন। কিরূপ আড়ম্বরের সহিত এবং কি প্রকার সুগন্ধি-দ্রব্যাদির সহযোগে পাণ্ডুর ও মাদ্রীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, শেষোক্ত অধ্যায়ে তাহার বিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাই। মথুরাধিপতি মহারাজ কংসের পত্নী সহমরণে গমন করিয়াছিলেন। মথুরায় যমুনাতীরে তাহার স্মৃতি-স্তম্ভ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের পত্নীগণ সহমরণে গমন করিয়া-ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (একাদশ স্কন্ধের ৬১শ অধ্যায়ে) লিখিত আছে,—'স্ত্রীসকল স্বামীদিগকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন। রামের পত্নীগণ তাঁহার দেহ

আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবিষ্টা হইলেন, বসুদেবের পত্নী-সকল তাঁহার শরীরকে এবং হরির পুত্রবধূ সকল প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণাত্মিকা কৃষ্ণপত্নীগণ অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।' মহাভারতে এবং হরিবংশেও এতদ্বিবরণ পরিবর্ণিত আছে। বসুদেবের পত্নী-চতুষ্টয়—দেবকী, ভদ্রা, মদিরা ও রোহিণী—পতির সহিত সহমরণে গমন করেন। পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন তাঁহাদের দাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে মহাভারতের উক্তি,—'পাণ্ডুনন্দন চন্দনাদি বহুবিধ গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা স্ত্রীচতুষ্টয়-সমন্বিত সেই শবকে দাহ করিতে থাকিলে সমিদ্ধ হুতাশন, সামগ ব্রাহ্মণ ও রোরুদ্যমান জনগণের শব্দ যুগপৎ উত্থিত হইতে লাগিল।' পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে এইরূপ অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ আছে। সে সকল গ্রন্থকে যতই আধুনিক বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, খৃষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে যে তৎসমুদায় প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, অতি প্রাচীন-কাল হইতেই ভারতবর্ষে সহমরণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। তবে সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যের প্রাধান্যই যে সর্ব্বতোভাবে মান্য হইত, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবে বিধবা নারী ব্রহ্মচারীর পদ অর্থাৎ অক্ষয়-স্বর্গ প্রাপ্ত হন, শাস্ত্রে ইহাই পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের জন্য উত্তম স্থান নির্দ্দিষ্ট;—সে স্থানে গমন করিলে আর জন্মজরামৃত্যুর অধীন হইতে হয় না। সে স্থান কেমন, তৎসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—"স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ।" অর্থাৎ,—'ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিলে তাঁহারা যে উত্তম স্থান প্রাপ্ত হন, সে স্থান হইতে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।' ফলতঃ, শাস্ত্রমতে হিন্দু-বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; হিন্দু-বিধবার সেই ধর্ম্মই প্রতিপাল্য।

হিতকর সমাজ-বিধি।

যে প্রকারে সমাজের হিতসাধন হইতে পারে, যে প্রকারে সমাজে শান্তি-সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, তাহার কোনরূপ বিধি-বিধানের প্রবর্ত্তনা করিতেই সমাজ ত্রুটি করেন নাই। রাজার কিরূপ কর্ত্তব্য, প্রজার কিরূপ কর্ত্তব্য, গৃহীর কিরূপ কর্ত্তব্য,—সমাজ প্রতিজনের কর্ত্তব্য বিধান করিয়া দিয়াছিলেন। মানুষ জীবনের কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিবে এবং কোন্ কর্ম্ম কোন্ সময়ে সম্পন্ন করিলে মানুষের কর্ত্তব্য-পালন ও সুখসাধন অবশ্যম্ভাবী,—জীবনের দৈনন্দিন কর্ম্মবিভাগ পর্য্যন্ত সমাজ শাস্ত্রানুসারে নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন্ আশ্রমে কোন্ বয়সে কোন্ ব্যক্তি কি কর্ম্ম আচরণ করিবেন, আশ্রম-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিলে, তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। ব্রাহ্মণসন্তান-মাত্রকেই নিয়মানুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। এমন কি, আবশ্যক হইলে ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান বেদপাঠ করিবেন, ব্যবস্থা ছিল। বেদপাঠ সাঙ্গ হইলে, সংসারাশ্রম-গ্রহণে তাঁহার অধিকার জন্মিবে। যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান বিদ্যা উপার্জ্জনে সমর্থ নহেন, তাঁহারা শূদ্র হইতেও নিকৃষ্ট,—ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। মনু বলিয়াছেন,—'কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী যেমন, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন, বেদহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। ইহারা তিন জনে কেবল নামমাত্র ধারণ করে।' (মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৫৭ম শ্লোক)। শাস্ত্রাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণ যদি কোনরূপ বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাহা

হইলে তাঁহাকে পতিত হইতে হয়। (মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৮শ শ্লোক)। কোনও প্রাণীর কিছুমাত্র অনিষ্ট না হয়;—আপনার জীবনের দ্বারা সংসারের উপকার সাধিত হয়;—ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা এইরূপ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। নিস্পৃহতাই ব্রাহ্মণের প্রধান সুখ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। "সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥" পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। সেই পঞ্চযজ্ঞ—ঋষিযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোমাদি ক্রিয়া, ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ ভূতবলি, নৃযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সৎকার এবং পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয়। যেমন ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে, তেমনই অন্যান্য বর্ণের সম্বন্ধেও কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল। কালের পরিবর্ত্তনে সমাজের এখন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং এখন আশ্রম-ধর্ম্ম পালনের প্রযত্নও লোপ পাইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষাদানের প্রতি সমাজের এতই যত্ন ছিল যে, শাস্ত্র পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন,—সকল দানের সার দান—বিদ্যাশিক্ষা দান। মনু বলিয়াছেন,—'নিত্য নিরলস হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম করা উচিত। ন্যায়ার্জ্জিত ধন দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই উভয়বিধ কর্ম্ম করিলে, তাহা অক্ষয় ফলের কারণ হয়।...অসূয়াপরবশ না হইয়া যে কোনও যাচ্ঞাকারীকে যথাশক্তি দান করিবে। এইরূপ করিতে করিতে সেই পুণ্যবলে এমন দানপাত্র উপস্থিত হয়, যিনি দাতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ।' এই বলিয়া, কোন্ কোন্ বস্তু দানে কিরূপ ফল লাভ হইতে পারে, মনু তাহার পরিচয় দিয়াছেন। শেষ বলিয়াছেন,—'সকল দানের সার দান—বিদ্যাদান; (মনুসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়, ২২৫ম—২৩৩ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)। বিদ্যার গৌরব সমাজে চিরদিনই ছিল। সমাজ-হিতকর বিবিধ বিধি-বিধানের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষাদানকে শাস্ত্রকারগণ সমাজের প্রধান হিতকর কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট নিবারণের জন্য উপদেশ—সে তো সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ইষ্ট-পূর্ত্ত কার্য্য যে অশেষ ফলপ্রদ, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অতিথি-সৎকার শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্রই পরিকীর্ত্তিত আছে। মনু বলিয়াছেন,—'প্রতিদিন গৃহস্থকে পঞ্চ মহা-যজ্ঞের বিধান করিতে হয়।' সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত ভূতযজ্ঞ এবং মনুষ্যযজ্ঞ—যথাক্রমে পশুপক্ষীদিগকে অন্ন-প্রদান এবং অতিথি-সৎকার—গৃহস্থের পক্ষে নিত্য এই দুই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।' মনু বলিয়াছেন,—গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ; কেন-না, এই আশ্রম ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু প্রভৃতিকে বিদ্যাদান ও অন্নদান প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপালন করেন। যিনি পরকালে অক্ষয়-স্বর্গ কামনা এবং ইহকালে সুখসম্ভোগ বাসনা করেন, এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্মই তাঁহার প্রতিপাল্য। (মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, ৭০ম ও ৭৮ম শ্লোক)। বিদ্যাদান, অন্নদান এবং জলদান—যে সমাজের ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল, সেই ধর্ম্ম পালন করিয়া যে সমাজের জনগণ অক্ষয় মোক্ষ লাভ করিতেন, সে সমাজের ন্যায় উচ্চ-আদর্শসম্পন্ন সমাজ কোথায় আছে—কোথায় থাকিতে পারে? জীবজন্তুর প্রতি সদয়-ব্যবহার—সমাজের একটী প্রধান ধর্ম্ম ছিল। পঞ্চ-যজ্ঞের অন্তর্গত ভূতযজ্ঞে পশু-পক্ষীদিগকে আহার-দানের বিষয় অবগত হওয়া যায়। সেরূপ অনুষ্ঠান না করিলে গৃহস্থকে পঞ্চসূনা পাপে লিপ্ত হইতে হয় এবং সেই পাপের ফলে গৃহস্থ নরকে গমন করে। সকল

প্রাণীর প্রতিই তাঁহাদের এইরূপ সদয়-ব্যবহার ছিল। বিশেষতঃ, গোজাতির প্রতি হিন্দু-সমাজের সদ্ব্যবহারের অবধি ছিল না। গোদুগ্ধ পান করিয়া মানুষ পরিপুষ্ট পরিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং গো-মাতা নামে গো-গণ সম্পূজিতা হইতেন। গো-জাতি প্রতিপালনের জন্য ভারত-বর্ষে তখনকার দিনে কি সুচারু ব্যবস্থাই বিহিত ছিল। গোচারণের জন্য নগর-প্রান্তে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সকল রক্ষিত হইত,—বেদে, পুরাণে, সংহিতায় এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে।

বাণিজ্য-ব্যবসায় লইয়া এখন পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই সমুন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ে তাঁহাদের উন্নতি-লাভের মূল ভিত্তি—সমবায়। সমবায় অর্থাৎ যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া, পাঁচ জনের অর্থ মূলধন-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, আধুনিক পাশ্চাত্য-জাতিরা শনৈঃশনৈঃ উন্নতির পথে সমারূঢ় হইয়াছেন। অনেকে মনে করেন, সমবায় বা যৌথ-কারবার—আধুনিক সভ্যতার উদ্ভাবনা; প্রাচীন ভারতবর্ষ এ তত্ত্ব অবগত ছিল না। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস যে ভ্রান্ত-বিশ্বাস, সংহিতা-শাস্ত্রেই তৎপ্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৬২ম—২৬৩ম শ্লোক) বলিয়া গিয়াছেন,—

সমবায় বা যৌথ-কারবার।

"সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্মকুর্ব্বতাম্। লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বা সংবিদাকৃতৌ॥
প্রতিষিদ্ধমনাদৃষ্টং প্রমাদাদ্ যচ্চ নাশিতম্। স তদ্দদ্যাদ্বিপ্লবাচ্চ রক্ষিতাদ্দশমাংশভাক্॥"

অর্থাৎ,—'যে সকল বণিক একত্র মিলিত হইয়া লাভের জন্য ব্যবসা করে (অর্থাৎ কোম্পানী গঠন করে), তাহাদিগের যে যেমন অংশ প্রদান করিয়াছে, তদনুসারে কিংবা পরস্পরের যেরূপ স্বীকার করা থাকে, তদনুসারে লাভালাভ জানিবে। এই কোম্পানীর অন্তর্গত যে ব্যক্তি সাধারণের নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া দ্রব্য ক্ষতি করে, অথবা নিজের অসাবধানতায় ক্ষতি করে, সে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবে। আর যে বিপৎকালে পরিত্রাণ করে, সে সাধারণ লভ্যাংশের দশ ভাগের এক ভাগ অধিক লাভ পাইবে।' এইরূপে যে বণিক-সমিতি বা সমবায় গঠিত হয়, সেই সমবায়ের অংশক্রয়কারীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার অংশ কিরূপে বণ্টন হইবে, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় তদ্বিষয়ও লিখিত আছে। আয়-ব্যয়ের কিরূপ বণ্টন-ব্যবস্থা থাকিবে, তাহারও উল্লেখ যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় দৃষ্ট হয়। যথা,—'সম্ভূয় বণিকের (অর্থাৎ কোম্পানীর) অন্তর্গত কোনও ব্যক্তি দেশান্তরে দেহত্যাগ করিলে, সেই সমবেত বাণিজ্যে তাহার যে ধন থাকিবে, তাহা, তৎপুত্রাদি, মাতুলাদি, বন্ধু, জ্ঞাতি, প্রত্যাগত অপর বণিকগণ (অর্থাৎ কোম্পানীর অন্যান্য অংশীদারগণ) অথবা রাজা গ্রহণ করিবেন। ইহার মধ্যে যে বঞ্চক হইবে, তাহাকে লাভ-রহিত করিয়া বহিস্কৃত করিবে। এই কোম্পানীর মধ্যে ভারপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি স্বয়ং কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, আয়ব্যয় পরিদর্শন করিতে অশক্ত হইবে; সে অপরের দ্বারা করাইবে। কোম্পানীর পক্ষে যে নিয়ম, ঋত্বিক, কর্ষক, এবং শিল্পকর্ম্মোপজীবী-দিগেরও তদ্রূপ নিয়মই কীর্ত্তন করা হইল।' এইরূপে যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবাসীরা দেশবিদেশে বাণিজ্য করিতেন। সমুদ্র-পথে অর্ণবপোত পরি-চালনা দ্বারাও তাঁহাদের বাণিজ্য-কার্য্য প্রসারিত হইয়াছিল। সমুদ্রযাত্রী বণিকগণের উল্লেখ বেদে, সংহিতায় এবং পুরাণের নানা স্থানেই দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে

ষট্‌চত্বারিংশ এবং অষ্টচত্বারিংশ সূক্তের (যথাক্রমে) অষ্টম ও তৃতীয় ঋকে সমুদ্রযাত্রা ও ধনাভিলাষী বণিকগণের বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রা অর্থ বিজ্ঞাপিত করে। সেই ঋক দুইটী এই,—

"অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথঃ। ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ॥"—১ ৪৬ ৮॥

"উবাসোষা উচ্ছাচ্চনু দেবী জীরা রথানাং;

যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে নো শ্রবস্যবঃ॥" ১।৪৮।৩॥

অর্থ,—'হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! স্বর্গ হইতেও আপনাদিগের প্রকাণ্ড যান সমুদ্রাবতরণ দেশে বিদ্যমান আছে, এবং ভূমিতে গমন নিমিত্ত রথও আছে। সোমচয় আপনাদিগের কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়াছে।* ভূমিতে গমন করিবার নিমিত্ত রথে অশ্ব-যোজন করুন। উষা দেবতা পূর্ব্বেও প্রভাত করিয়াছিলেন; অদ্যাপিও প্রভাত করুন। এই উষা-দেবতার আগমনার্থ যে রথ সজ্জীকৃত হয়, তাহা তিনি প্রেরণ করেন। যেমন, ধনাভিলাষীরা নৌকা সজ্জিত করিয়া সমুদ্রে প্রেরণ করেন।' ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলে (পঞ্চান্ন সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে) 'যেমন ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা সমুদ্র-মধ্যে গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে'—এইরূপ উপমা দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে, ষোড়শাধিক শততম সূক্তে (তৃতীয় ঋকে) তুগ্রের পুত্র ভুজ্যের সমুদ্র গমনের উল্লেখ আছে। টীকাকারগণের মধ্যে কেহ বলেন,—ভুজ্য দেশ-জয়ের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন।' কেহ বলেন,—'তিনি বাণিজ্য-ব্যপদেশে সমুদ্রে গমন করেন।' মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে (৩৯৯ম ও ৪০৬ম শ্লোক প্রভৃতিতে) বণিকগণের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ দেখিতে পাই; যথা,—'যে সকল বিক্রেয় দ্রব্য রাজার নিজের বলিয়া প্রখ্যাত, অথবা যে সকল দ্রব্য দেশান্তরে লইয়া যাইতে রাজা নিষেধ করিয়াছেন, যে বাণিজ্যকারী লোভবশতঃ ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করে বা দেশান্তরে লইয়া যায়, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবেন।... নদীমার্গে দূরাদূর যাতায়াত করিতে হইলে, নদীর প্রবলতা বা স্থিরতা, তথা গ্রীষ্ম বর্ষাদি কাল বিবেচনায়, তর মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে। সমুদ্রে সে সব বিবেচনা চলে না। তাহার মূল্য সম্ভবমত গ্রহণ করিবে।' বাণিজ্যাদির দ্বারা জীবিকার্জ্জন প্রভৃতির জন্য ব্রাহ্মণগণ সমুদ্র-যাত্রা করিবেন না; করিলে, তিনি সমাজচ্যুত হইবেন, (মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, ১৫৮ম শ্লোক)—মনুসংহিতায় এবম্বিধ উক্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয় প্রতিপন্ন হয়। বিষ্ণু-সংহিতায় স্বদেশজাত দ্রব্যের এবং পরদেশ-জাত দ্রব্যের মাশুলের তারতম্যের উল্লেখ দেখিতে পাই; যথা,—"স্বদেশ-পণ্যাচ্চ শুল্কাংশং দশমমাদদ্যাৎ পরদেশপণ্যাচ্চ বিংশতিতমম্॥" অর্থাৎ,—'স্বদেশজাত পণ্য দ্রব্য হইতে তাহার যেরূপ মূল্য হইতে পারে,

* ঋকে-সমূহের অর্থ-নিষ্পন্ন সম্বন্ধে প্রায়ই মতান্তর দেখিতে পাই। এই দুইটী ঋকের অর্থ বিষয়েও সেই মতান্তর আছে। কেহ কেহ বলেন,—'প্রথম ঋকের সিন্ধু শব্দের অর্থ সিন্ধু বা সাগর নহে; উহার অর্থ—অন্তরীক্ষ। তাঁহারা আরও বলেন.—'তীর্থে সিন্ধূনাং রথ' পাঠ না হইয়া 'তীর্থে সিন্ধূন আং রথঃ' পাঠ হওয়া উচিত। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম ঋকদ্বয়ের সমতা রক্ষা করিতে গেলে, 'সিন্ধু' অর্থে 'সমুদ্রই' বুঝাইয়া থাকে। 'অরিত্র' শব্দে নৌকা, সোমপাত্র, শকটের অংশ, ক্ষেপনি প্রভৃতি বুঝাইতে পারে। কিন্তু এখানে 'বৃহৎ অর্ণবযান' হওয়াই সঙ্গত। সায়ণাচার্য্যের অনুসরণে শেষোক্ত ঋকের অর্থ নির্দ্দেশ হয়—'ধনাভিলাষীরা সমুদ্রে যেমন নৌকা সজ্জিত করিয়া প্রেরণ করেন।' কিন্তু অপরাপর পণ্ডিত-দিগের কেহ কেহ ঐ অংশের অর্থ নির্দ্ধারণ করেন,—'পরস্পর অগ্রে গমন করিবার নিমিত্ত ঈর্ষাযুক্ত হইয়া নৌকা-সকল যেমন অবস্থান করে, তদ্রূপ যে রথ অবস্থান করে।' ইত্যাদি।

তদনুসারে দশ ভাগের এক ভাগ মাশুল গ্রহণ করিবেন (ইহা রপ্তানির মাশুল), পরদেশ-জাত পণ্য দ্রব্য হইতে তন্মূল্যের বিংশতি ভাগের এক ভাগ লইবেন, (ইহা আমদানির মাশুল)।' বণিকগণ অযথা মূল্য বৃদ্ধি করিবে আশঙ্কায়, রাজা প্রায়ই আবশ্যক-দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। কিরূপ দ্রব্যে বণিকগণ কিরূপ লাভ প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়েও রাজার দৃষ্টি ছিল। যে সকল বণিক সেই রাজ-নিয়মের ব্যত্যয় করিত, তাহাদের জন্য রাজা দণ্ডবিধান করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় সে বিবরণ দেখিতে পাই; যথা,—'যে সকল বণিকবৃন্দ, রাজ-নিরূপিত মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি জানিয়াও জোট বাঁধিয়া কারু এবং শিল্পীদিগের কষ্টকর মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহাদিগের উত্তমসাহস অর্থদণ্ড (দণ্ড বিশেষ) হইবে। যে সকল বণিক জোট বাঁধিয়া দেশান্তরাগত পণ্য হীন মূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য এক মূল্যে গ্রহণ করিয়া তদপেক্ষা বহু মূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রত্যেকের উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। রাজা বিশেষ পরিদর্শন-পূর্ব্বক যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, প্রত্যহ তদনুসারে ক্রয়-বিক্রয় হইবে। সেই মূল্য হইতে অবশিষ্ট ভাগই লভ্যাংশ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। আর যে বণিক ক্রয় করিয়া সদ্যই বিক্রয় করে, সে স্বদেশজাত পণ্য দ্রব্য হইতে প্রতি শত পণে পাঁচ পণ লাভ করিবে, আর পরদেশীয় পণ্যে দশ পণ গ্রহণ করিবে। রাজা পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং আনয়নাদি ব্যয় হিসাব করিয়া এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি না হয়।' (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৫৩ম—২৫৬ম শ্লোক।) এখন অনেক সময়ে বণিকগণ পণ্য-বিশেষের একচেটিয়া ব্যবসায় করিবার চেষ্টা পাওয়ায় সাধারণকে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু এই কষ্টের বিষয় প্রাচীন ভারতবর্ষ কত কাল পূর্ব্বে অনুধাবন করিয়াছিলেন, এবং অনুধাবন করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন,—এ সকল বিবরণে তাহাই উপলব্ধি হয়। বাসভবন প্রস্তুত-প্রণালী, গ্রাম-নগরের শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রণালী এবং পথ-ঘাট-পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার প্রণালী প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব প্রভৃতির বিষয়ে ভারতবর্ষের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, বুঝিতে পারা যায়। কি প্রকার স্থানে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়, স্মৃতিশাস্ত্রের নানা স্থানে তাহার উল্লেখ আছে। পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় কিরূপভাবে পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য, তাহারও উপদেশ নানা স্থানেই দৃষ্ট হয়। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে, লিখিত আছে,—'যে ব্যক্তি সাধারণের জন্য কৃত তড়াগের উদক একেবারে নষ্ট করে অথবা সেতু দ্বারা জলপথ বন্ধ করে, রাজা তাহাকে প্রথমসাহস দণ্ড করিবেন। যে ব্যক্তি রাজ-মার্গে বিষ্ঠোৎসর্গ করে, তাহাকে কার্ষাপণদ্বয় দণ্ড করিবেন, ইত্যাদি।' বসিষ্ঠসংহিতায়ও (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) এবম্বিধ বিবরণ দৃষ্ট হয়। মল-মূত্র ত্যাগ যে যে স্থানে নিষিদ্ধ, সে স্থলে তাহা লিখিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে (১৩৪ম-১৩৮ম শ্লোকে) নদী, ছায়া, পথ, গোষ্ঠ, জল ও ভস্মাদিতে মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিবে না, প্রভৃতি উক্তি দৃষ্ট হয়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে সম্পূর্ণরূপ প্রতীত হয়, সমাজের হিতসাধনোদ্দেশ্যে যে যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, তাহার সকল অনুষ্ঠানই ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের রাজনীতি-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, রাজা প্রজার সম্বন্ধের বিষয় অবগত হওয়া যায়। সে সম্বন্ধ সকলেরই স্পৃহনীয়—সকলেরই হিতসাধক। প্রকৃতিপুঞ্জ আপনাদের রাজাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত; রাজাও প্রজাগণকে সন্তানের ন্যায় পালন করিতেন। রাজা-প্রজার সম্বন্ধের সে উচ্চ আদর্শ সংসার দিন দিন বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। তাই পদেপদেই বিপ্লব বিভীষিকা লক্ষিত হইয়া থাকে।' রাজা ও প্রজা প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি (প্রথম খণ্ড, একোনত্রিংশ পরিচ্ছেদ),—'হিন্দুর চক্ষে রাজা নররূপী দেবতা। রাজা কোনরূপ অন্যায় কর্ম্ম করিলেও প্রজা কদাচ উত্তেজিত হইবে না। পিতামাতা সন্তানের প্রতি পীড়ন করিলে সন্তান কি কখনও উত্তেজিত হইতে পারে? 'এই নীতির অনুসরণ করিয়াই ভারতবর্ষ রাজানুগত ছিল। সুতরাং রাজাও প্রজার প্রতি কখনও দুর্ব্যবহার করিতে পারিতেন না। শাস্ত্র প্রজারও যেরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন রাজারও সেইরূপ শাস্ত্রানুগত কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। মহর্ষি মনু আদর্শ-রাজার যে লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর সকল সভ্য-সমাজের সকল রাজার সে উপদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন,—'সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—সকলই রাজার চেষ্টিত। এ কারণ রাজাকেই যুগ বলা যায়। রাজা যখন প্রকৃতি-পুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধির প্রতি চক্ষুনিমিলিত করিয়া প্রসুপ্ত থাকেন, তখন কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হয়; যখন তিনি রাজ্যের প্রতি জাগ্রত দৃষ্টিতে দেখেন, তখন দ্বাপর যুগ; যখন তিনি রাজকর্ম্মানুষ্ঠানে অবস্থিত থাকেন, তখন ত্রেতা; আবার যখন রাজা যথাশাস্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকেন, তখন সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। রাজা,—ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, যম, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি ও পৃথিবীর বীর্য্যানুরূপ চরিত অবলম্বন করিবেন। ইন্দ্রদেব যেমন বর্ষাকালে অপর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ করেন, রাজা সেইরূপ ইন্দ্রব্রতধারী হইয়া প্রজাপুঞ্জের প্রার্থিত বিষয়-সকল বর্ষণ করিতে থাকিবেন। সূর্য্যদেব যেমন অল্পে অল্পে আট মাস কাল স্বীয় রশ্মি দ্বারা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর রসাকর্ষণ করিতে থাকেন, রাজা সেইরূপ অর্কব্রত হইয়া অল্পে অল্পে রাজ্য হইতে কর গ্রহণ করিবেন। বায়ুদেব যেমন সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে-ছেন, রাজাও তদ্রূপ বায়ুব্রত হইয়া চার-পুরুষ দ্বারা সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট থাকিয়া, রাজকার্য্য পর্য্য-বেক্ষণ করিবেন। কালপ্রাপ্ত হইলে যম যেমন প্রিয় ও দ্বেষ্য বিচার করেন না, রাজাও দণ্ড-বিধান সময়ে প্রিয় ও দ্বেষ্য বিবেচনা না করিয়া ন্যায়দণ্ড বিধান করিবেন—এই তাঁহার যম-ব্রত। বরুণের পাশ যেমন দৃঢ়বন্ধন, রাজাও পাপীদিগকে সেইরূপ নিগ্রহ করিবেন,—ইহাই তাঁহার বারুণ ব্রত। পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে লোকে যেমন আনন্দ প্রকাশ করে, সেইরূপ যে রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিবর্গ আনন্দিত থাকে, তাঁহাকে চন্দ্রব্রতধারী রাজা বলা হয়। যে রাজা পাপকারীর পক্ষে প্রতাপ-যুক্ত নিত্য-তেজস্বী এবং দুষ্ট সামন্ত সম্বন্ধে হিংসাশীল হন, তাঁহাকে আগ্নেয় ব্রতধারী বলা যায়। পৃথিবী যেমন সর্ব্বভূতকে সমভাবে ধারণ করিয়া আছেন, তদ্রূপ যে রাজা সমুদায় প্রজাকে সমভাবে পালন করেন, তাঁহাকে পার্থিব ব্রতধারী বলা যায়।' এইরূপ গুণ-সম্পন্ন রাজা যে সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিবেন, তাহাতে কি আর সংশয় আছে? রাজার কি কি গুণ থাকা উচিত এবং রাজা কিরূপভাবে কর্ত্তব্য-পালন করিবেন,

রাজনীতি ও বিবিধ নীতি।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় প্রায়শঃ রাজনীতি আলোচনায়ই পূর্ণ। রাজার দৈনন্দিন কর্ম্ম পর্যান্ত উক্ত অধ্যায়-দ্বয়ে নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজা কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইবেন, তৎসম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি,—

"মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্যঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ। বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥
অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমানক্ষুদ্রোঽপুরুষস্তথা। ধার্ম্মিকোঽব্যসনশ্চৈব প্রাজ্ঞঃ শূরো রহস্যবিৎ॥
স্বরন্ধ্রগোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ। বিনীতস্তথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ॥"

রাজা সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইবেন; সকল গুণের অধিকারী হইবেন; এবং উপযুক্ত কর্ম্ম-চারিসমূহ নিযুক্ত করিবেন। তাঁহার বিচার-প্রণালী কিরূপ হইবে; কিরূপ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, গুণবান অমাত্যগণে পরিবৃত থাকিয়া তিনি বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন,—যাজ্ঞবল্ক্য তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য সংহিতাতেও এ সকল প্রসঙ্গের অল্প-বিস্তর আলোচনা আছে। ফলতঃ, কেমন রাজা, কেমন প্রজা, কেমন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকিলে সমাজ শান্তিসুখে সুখী থাকে—দেশ আনন্দে মুখরিত হয়, শাস্ত্রগ্রন্থে তাহা প্রকটিত রহিয়াছে! নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার বিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ। নীতিশাস্ত্রের প্রধান উপদেশ—সজ্জনের সঙ্গে বাস করিবে। যিনি সজ্জনের সহিত বাস করেন, তাঁহাকে কখনই কষ্ট পাইতে হয় না। সার উপদেশ—ইহ-সংসারেই শান্তি, ইহসংসারেই আনন্দ, ইহসংসারেই মোক্ষ; শাস্ত্রানুগত কর্ম্ম করিয়া জিতে-ন্দ্রিয় ও অতিথিপ্রিয় থাকিয়া মনুষ্য এই সংসারেই শ্রেষ্ঠত্ব ও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"উত্তমৈঃ সহ সাঙ্গত্যং পণ্ডিতৈঃ সহ সৎকথাম্। অলুব্ধৈঃ সহ মিত্রত্বং কুর্ব্বাণো নাবসীদতি॥
সদ্ভিঃ সঙ্গং প্রকুর্ব্বীত সিদ্ধিকামঃ সদা নরঃ। নাসদ্ভিরিহলোকায় পরলোকায় বাহিতাম্॥
বর্জ্জয়েৎ ক্ষুদ্র সংবাদমদুষ্টস্য তু দর্শনম্। বিরোধং সহ মিত্রেণ সম্প্রীতিং শত্রুসেবিনা॥
পরোঽপি হিতবান্ বন্ধুর্ব্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ। অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধম্॥
স বন্ধুর্যো হিতে যুক্তঃ স পিতা যস্তু পোষকঃ। তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ স দেশো যত্র জীব্যতে॥
স ভৃত্যো যো বিধেয়স্তু তদ্বীজং যৎপ্ররোহতি। সা ভার্য্যা যা প্রিয়ং ব্রূতে স পুত্রো যস্তু জীবতি॥
স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য স জীবতি। গুণধর্ম্মবিহিনো যো নিষ্ফলং তস্য জীবনং॥
বরং হি নরকে বাসো ন তু দুশ্চরিতে গৃহে। নরকাৎ ক্ষীয়তে পাপং কুগৃহান্ন নিবর্ত্ততে॥
ত্যজেদ্দেশমসদ্বৃত্তং বাসং সোপদ্রবং ত্যজেৎ। ত্যজেৎ কৃপণরাজানং মিত্রং মায়াময়ং ত্যজেৎ॥
অর্থেন কিং কৃপণহস্তগতেন পুংসাং জ্ঞানেন কিং বহুশঠাকুলসঙ্কুলেন।
রূপেণ কিং গুণপরাক্রমবর্জ্জিতেন মিত্রেণ কিং ব্যসনকালপরাঙ্মুখেন॥
আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ রণে শূরং রহঃ শুচিম্। ভার্য্যাঞ্চ বিভবে ক্ষীণে দুর্ভিক্ষে চ প্রিয়াতিথিম্॥
ধীরাঃ কষ্টমনুপ্রাপ্তা ন ভবন্তি বিষাদিনঃ। প্রবিশ্য বদনং রাহোঃ কিং নোদেতি পুনঃ শশী॥
ধনস্য যস্য রাজভ্যো ভয়ং নাস্তি ন চৌরতঃ। মৃতঞ্চ যন্ন মুচ্যতে সমর্জ্জয়স্ব তদ্ধনম্॥
বিপ্রাণাং ভূষণং বিদ্যা পৃথিব্যা ভূষণং নৃপঃ। নভসো ভূষণং চন্দ্র শীলং সর্ব্বস্য ভূষণং॥
সৎকর্ম্মধর্ম্মার্জ্জিতজীবিতানাং শাস্ত্রেষু দারেষু সদা রতানাম্।
জিতেন্দ্রিয়াণামতিথিপ্রিয়াণাং গৃহেঽপি মোক্ষঃ পুরুষোত্তমানাম্॥"

চরিত্র বলই প্রধান বল। শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিয়া চলিলে সেই বলের সঞ্চার হয়। সমাজ যত দিন শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিয়া চলিয়াছিল, ততদিনই ভারতবাসী চরিত্রবলে বলীয়ান ছিল। এখনও যাঁহারা শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিয়া চলেন, তাঁহারাই চরিত্রবলে বলীয়ান হইতে পারেন। ভারতবর্ষের সকল গৌরব-বিভবের পার্শ্বে—তাঁহাদের সচ্চরিত্রতা, তাঁহাদের সত্যবাদিতা, তাঁহাদের ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি তাঁহাদের স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ যেমন রত্নপ্রসূ বলিয়া দেশে-বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়া আছে, ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি পৃথিবীর সকল জাতি যেমন সোৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন; ভারতবর্ষের সাহিত্যের, শিক্ষার ও জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি যেমন আকৃষ্ট রহিয়াছে; ভারতবাসীর সচ্চরিত্রতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণাবলী তদ্রূপ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিক্ষিত জনগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সকল গৌরবের মধ্যে ভারতবর্ষের সেই গৌরবই প্রধান গৌরব বলিয়া মনে করি। যে সকল বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষের সমাজ-বন্ধনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের উক্তি-পরম্পরাই এতদ্বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচ্যের হুয়েন-সাং এবং প্রতীচ্যের এরিয়ান ভারতবাসীর সত্যপ্রাণতা ও সচ্চরিত্রতা বিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ২৩১ খৃষ্টাব্দে চীন-দেশ হইতে সু-উই নামক জনৈক রাজদূত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। চীন-সম্রাটের নিকট গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—'ভারতবাসীরা সরল ও সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন।' * খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পরিব্রাজক ফ্রায়ার জোর্ডানাস ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—'তাঁহারা যেমন সত্যবাদী, তেমনই ন্যায়পর।' † কিবা খৃষ্টান, কিবা মুসলমান, যিনিই ভারতবর্ষের উন্নত-সমাজের জনগণের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে এবম্বিধ উক্তি ব্যক্ত হইয়াছে। স্যর জন ম্যাল্‌কম বলিয়াছেন,—'ভারতবাসীরা যেমন সাহসী, তেমনই সত্যপরায়ণ।' ‡ ঐতিহাসিক আবুল ফজেল লিখিয়া গিয়াছেন,—'প্রতিকার্য্যে হিন্দুদিগের বিশ্বস্ততা ও সত্যপরায়ণতা অতুলনীয়।' § খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইদ্রিসি তাঁহার ভূগোল-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'ভারতবাসীরা স্বভাবতঃই ন্যায়পর। তাঁহাদের কোনও কার্য্যেই তাঁহারা কখনও ন্যায়পথ ভ্রষ্ট হন না।' ¶ মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পৃথিবী-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রকাশ,—'ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা সত্যপরায়ণ। পৃথিবীতে এমন কোনও প্রলোভন নাই, যাহাতে তাঁহাদিগকে মিথ্যা কথা বলাইতে পারে।' কর্ণেল শ্লিমান বিচারাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভারতবাসীর সত্যপরায়ণতার যে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার

বিবিধ।

---

* *Vide*, Max Muller's *India*; *What can it teach us.*
† *Vide*, Marco Polo's *Travels*, Vol. II.
‡ "Their truth is remarkable as their courage."—Mill's *History of India*, Vol. I.
§ "The Hindus are admirers of truth and of unbounded fidelity in all their dealings."—Tod's *Rajasthan*, Vol I.
¶ *Vide* Elliot's *History of India*, Vol. I,

উপযুক্ত। বিচার-কালে বাদী-প্রতিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণ সময়ে তিনি দেখিয়াছিলেন, গ্রামবাসীরা কেহই মিথ্যা কথা বলিতে সম্মত হয় নাই। তাই কর্ণেল শ্লিমান লিখিয়া গিয়াছেন,—'আমি শত শত মামলার বিচার করিয়া দেখিয়াছি; যেখানে একটী মাত্র মিথ্যা কথা বলিলে সম্পত্তি, স্বাধীনতা এবং জীবন রক্ষা হয়, তাঁহারা সে ক্ষেত্রেও মিথ্যা কথা কহিতে অস্বীকার করিয়াছেন।' * অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ভারতবাসিগণের সহিত অশেষ প্রকারে মিলিবার-মিশিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'ভারতবর্ষের সহিত যিনিই কোনরূপ সংশ্রবে আসিয়াছেন, তিনিই ভারতবাসীর সত্যপ্রিয়তা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। সত্যবাদিতাই ভারতবাসীর চরিত্রের একটী প্রধান লক্ষণ। আজি পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে কেহ মিথ্যাবাদী বলিয়া নিন্দাবাদ করিতে পারে নাই।' ম্যাক্সমূলার আরও লিখিয়া গিয়াছেন,—'বিগত কুড়ি বৎসর কাল ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীর সহিত আমার মিলিবার-মিশিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। সেই সময় তাঁহাদের প্রকৃত-চরিত্র অনুসন্ধান করিবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়। সেই সময় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা সত্যপরায়ণতার, মনুষ্যত্বের ও সহৃদয়তার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, ইউরোপে এবং আমেরিকায় সে পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়।' † যেমন সত্যপরায়ণ, তেমনই অন্যান্য সদ্‌গুণের আধার। অধ্যাপক মণিয়ার উইলিয়মস্ তাই বলিয়া গিয়াছেন,—'ভারতবাসীর ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণতা ইউরোপে নাই। তাঁহাদের ন্যায় কর্ত্তব্য-জ্ঞানও অন্যত্র দেখিতে পাই না!' ‡ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন ভারতবর্ষে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। বোম্বাই-প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃরূপে ভারতবাসীর চরিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের তাঁহার বহু সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'ইংরেজ-দিগের সহিত যদি হিন্দুগণের তুলনা করি, ব্যভিচার এবং মদ্যপানাদি পাপে নিস্পৃহতা বিষয়ে হিন্দুগণ ইংরেজদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। হিন্দুদিগের মধ্যে যতই অসচ্চরিত্র ব্যক্তি থাকুক না কেন, ইংলণ্ডের নগর-সমূহের নিকৃষ্টচেতা অসচ্চরিত্র সম্প্রদায়ের ন্যায় তাহাদের চরিত্র কলুষিত নহে।' § ভারতবাসীর ন্যায় কৃতজ্ঞ জাতি পৃথিবীর অন্যত্র বিরল,—এলফিনষ্টোনের উক্তিতে তাহাও প্রতিপন্ন হয়।

---

* I have had before me hundreds of cases in which a man's property, liberty and life has depended upon his telling a lie and he has refused to tell it"—*Vide* Colonel Sleeman, as quoted in Max Muller's *India ; What can it teach us.*

† "It was love of truth that struck all the people who came in contact with India, as the prominent feature in the national character of its inhabitants. No one ever accused them of falsehood...I feel bound to say that, with hardly one exception, they (Indian scholars) have displayed a far greater respect for truth, and a far more manly and generous spirit than we are accustomed to even in Europe and in America "—*Ibid.*

‡ "I have found no people in Europe more religious, none more patiently persevering in common duties."—Prof. Monier Williams, *Modern India and the Indians.*

§ "If we compare them (Hindus) with our own (English) people, the absence of drunkenness and of immodesty in their other vices we leave the superiority in purity of manners on the side least flattering to our self-esteem."—Elphinstone's *History of India.*

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মই মূল।

[ধর্ম্মই সকলের মূল ;—হিন্দুর প্রতি কার্য্যেই ধর্ম্মের প্রেরণা ;—ধর্ম্ম ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য ;—সকলেরই লক্ষ্য—সুখান্বেষণ ;—ধর্ম্ম-সাধনের ত্রিবিধ পন্থা ;—ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান ;—ভক্তি-মাহাত্ম্য ;—সৎসঙ্গ প্রসঙ্গ ;—নববিধা ভক্তি ;—ভক্তির স্বরূপ ;—কর্ম্মের স্বরূপ ;—জ্ঞান ও জ্ঞানের স্বরূপ-তত্ত্ব ;—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম।]

ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার মূল—ধর্ম্মের প্রভাব। ভারতবর্ষে যখনই যে বিজ্ঞান উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছে; ভারতবর্ষে যখনই যে বিদ্যা চরম স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে; আবার যখনই ভারতবর্ষের যে জ্ঞানের আলোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; আমরা তখনই দেখিতে পাইয়াছি, মূলে ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

ধর্ম্মই সকলের মূল।

ধর্ম্ম ভিন্ন ভারতবর্ষে কোনও বিদ্যাই স্ফূর্ত্তি-লাভ করে নাই; ধর্ম্ম ভিন্ন ভারতবর্ষের কোনও প্রতিভাই বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ইহাই বিশেষত্ব। প্রাচীন ভারতের অতীত গৌরবের যে কোনও আদর্শের প্রতিই লক্ষ্য করিবেন, তাহাতেই এতদুক্তির সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইবে। প্রাচীন ভারতের সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সমাজ-সৌধ—ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কর্ম্ম, জীবন-মরণ,—কোথায় ধর্ম্মের সংস্রব নাই? প্রাচীন ভারতের প্রতি কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। উচ্চ-চূড় অট্টালিকা-সমূহ অথবা গিরিগুহাভ্যন্তরাবস্থিত অপূর্ব্ব কারুকৌশল, পুরাণেতিহাস-বর্ণিত প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের নিদর্শন—কি সাক্ষ্য প্রদর্শন করিতেছে? ধর্ম্মপরায়ণ ভারতবাসীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্মেষণাই কি ঐ সকলের মধ্যে প্রকটিত নহে? তাঁহারা পর্ব্বত-গাত্র খোদিত করিয়া অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, গিরি-গুহাভ্যন্তরে স্থাপত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন; কেন—কি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য? আপন আপন আরাধ্য দেবতার উপাসনার উদ্দেশ্যে—ভগবৎপ্রীতি-কামনায়, ভক্তি-প্রণোদিত হইয়াই কি তাঁহারা অশেষ পরিশ্রমে, অজস্র অর্থব্যয়ে, ঐ সকল দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন নাই? আধুনিক কালে মানুষ বাস-ভবনের সৌন্দর্য্য-সম্পাদনে সৌষ্ঠববিধানে অশেষ আয়াস স্বীকার করিতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষের যে দিনের স্থাপত্যের ভগ্নস্তূপ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমরা গর্ব্বোন্নত মস্তকে অপরের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি, সে সকল স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠার মূল—বিলাস-লালসার পরিতৃপ্তি-সাধন নহে; তাহার মূল লক্ষ্য—দেবতার সেবা—ধর্ম্মের সেবা। এইরূপ ভারতবর্ষের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করুন; সেখানেও এই একই উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করিবেন। শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র—ভারতবর্ষের সাহিত্য-সৌধের ঐ যে সকল গগনস্পর্শী উচ্চ চূড়া—কি সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে? সকলেরই মূল—ধর্ম্ম; সকলেরই উদ্দেশ্য—ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা; সকলই ভগবন্মহিমায় মহিমান্বিত। ভগবত্তত্ত্বা-লোচনা ভিন্ন প্রাচীন ভারতে কোনও গ্রন্থই বিরচিত হয় নাই! ধর্ম্মপথ-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে—ভগবন্মহিমা-খ্যাপন ব্যপদেশে—তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই, যে কিছু শাস্ত্র-

গ্রন্থের উদ্ভব। শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে—প্রতি কার্য্যেই ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব-প্রকটিত। মানুষ জীবন-ধারণ করিবে—কেন? অন্য দেশ বোধ হয় এক কথায় কদাচ তাহার উত্তর দিতে সমর্থ নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে সে উত্তর উজ্জ্বল অক্ষরে সর্ব্বসমক্ষে প্রকটিত রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি হইল কেন? সে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। জরাব্যাধিবশতঃ এবং অকালমৃত্যু-হেতু মানুষ ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না; দেবগণ মানুষের প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শনে তাই আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনধারণ ধর্ম্মের জন্য, তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য ধর্ম্মের সহিত সংশ্রব-যুক্ত। ধর্ম্ম ভিন্ন ভারতবর্ষে কোনও জ্ঞান-বিজ্ঞানই প্রতিষ্ঠান্বিত হয় নাই।

বুঝিলাম—জ্ঞান-বিজ্ঞান সকলই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম ভিন্ন তাহার আর অন্য অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে! কিন্তু ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ কি ভাব উপলব্ধি হয়? ধর্ম্ম শব্দ বহুভাবদ্যোতক। ধর্ম্ম চাই বা ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে চাই বলিলে, নানা জনে নানা ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তবে একটী ভাব সর্ব্বত্র সকলের মধ্যেই বিদ্যমান দেখিতে পাই। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কি জন্য? মানুষ ধর্ম্মের অনুসরণকারী কেন হয়? সংসার কেন প্রতিনিয়ত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছে? ধর্ম্মে কি লাভ হয়? ধর্ম্মে মানুষ কি পাইবার আশা করিতে পারে? সে বিষয়ে সকলেরই এক উত্তর উপলব্ধি হয়। সংসারে দেখিতে পাই,—সকল কার্য্যের মধ্য দিয়াই মানুষের প্রাণ প্রতিনিয়ত একটী সামগ্রীর অনুসন্ধান করিতেছে। সে সামগ্রী পাইবার জন্য, আসন্নমৃত্যুশয্যাশায়ী অশীতিপর বৃদ্ধ—তিনিও ব্যাকুল হইয়া আছেন; আবার দুগ্ধপোষ্য শিশু—সেও সে সামগ্রী খুঁজিতেছে। কেবল মনুষ্যই বা বলি কেন, সৃষ্ট প্রাণিমাত্রেই প্রতিনিয়ত সেই সামগ্রীর সন্ধান করিয়া ছুটিতেছে। স্রষ্টার সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে; ঈশ্বরের অস্তিত্বেও—কেহ বা বিশ্বাসবান, কেহ বা অবিশ্বাসী। কিন্তু সে সামগ্রীর জন্য কাহারও আকাঙ্ক্ষার ইতরবিশেষ নাই। যখন আর কোনও উপায়ে সে সামগ্রী লাভের সম্ভাবনা থাকে না, মানুষ তখন—অন্ততঃ তখনও, অনন্যোপায় হইয়া ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন তাহার মনে হয়, ধর্ম্মেই—একমাত্র ধর্ম্মের সাহায্যেই—সেই সামগ্রী অধিগত হইতে পারে। সেই সামগ্রীকে সুখ, আনন্দ বা শান্তি বলিতে পারি। সংসারে দুঃখের অন্ত নাই। সংসার তাই প্রতিনিয়ত দুঃখনিবৃত্তির—সুখসাধনের উপায় অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। যখন আর কোনও প্রকারেই দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখসাধন হয় না, তখনই সংসার 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করিয়া ব্যাকুল হয়,—তখনই সংসার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। মানুষ তখন বুঝিতে পারে,—ধর্ম্মই দুঃখনিবৃত্তির ও সুখ-সাধনের অদ্বিতীয় উপায়। তাই মানুষ যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার মূল লক্ষ্য—দুঃখনিবৃত্তি ও সুখসাধন। শাস্ত্রমতে দুঃখ ত্রিবিধ;—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। শরীর ও অন্তঃকরণ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি, অর্থাৎ আধিব্যাধিশোকতাপজনিত যে দুঃখ, তাহাই আধ্যাত্মিক দুঃখ; দেবরোষাদিতে অর্থাৎ বাত-বৃষ্টি-বজ্র-পাতাদিজনিত যে দুঃখ, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ; আর জীবজন্তুসরীসৃপাদি হইতে যে দুঃখ, তাহাই আধিভৌতিক

ধর্ম্ম দুঃখনিবৃত্তির জন্য।

দুঃখ। ত্রিবিধ দুঃখের তাড়নায় কাতর হইয়া মানুষ দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় জানিবার জন্য ব্যাকুল হয়। ব্যাকুল হইয়া, শাস্ত্রের আশ্রয় করে। দুঃখ-নিবৃত্তির পক্ষে শাস্ত্র-সম্মত উপায়ই প্রকৃষ্ট উপায়। দৃশ্যমান অন্য উপায় ফলপ্রদ নহে। দর্শন-শাস্ত্র তাই বলিতেছেন,—
"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ। দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্তোঽভাবাৎ॥"
শাস্ত্র দুঃখনিবৃত্তির ও সুখসাধনের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই মানুষ সুখের জন্য—শান্তির কামনায়, শাস্ত্রানুসারী হইতে প্রয়াস পায়। দুঃখনিবৃত্তির জন্যই ধর্ম্মের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। ধর্ম্মের স্বরূপ শাস্ত্রে বিবৃত আছে বলিয়াই মানুষ শাস্ত্রের অনুসন্ধান করে।

মানুষের কর্ম্মমাত্রই সুখসাধনে নিয়োজিত। সৎকার্য্য, অসৎকার্য্য—সকল কার্য্যেরই মূল লক্ষ্য—সুখসাধন। যে আত্মহত্যা করে, তাহার বিশ্বাস—মরণেই তাহার দুঃখনিবৃত্তি—মরণেই তাহার সুখশান্তি। যোগপরায়ণ যোগী এক মনে এক ধ্যানে যোগাসনে বসিয়া আছেন; দেহের উপর বল্মীক-স্তূপ জন্মিয়া গেল; তাহার উপরে বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন হইল; তথাপি তাঁহার যোগভঙ্গ হইল না! তাঁহার এ যোগসাধনা কিসের জন্য! সুখের জন্য—আনন্দের জন্য—শান্তির জন্যই নহে কি? যদি আত্মায় আত্মসম্মিলন তাঁহার লক্ষ্য হয়, তাহাকে সুখের—আনন্দের—শান্তির চরম পরিণতি ভিন্ন কি বলিতে পারি! সুখের বা আনন্দের নানা স্তর বা পর্য্যায় থাকিতে পারে; কিন্তু মূল সুখান্বেষণ ভিন্ন কর্ম্মের লক্ষ্য অন্য কিছুই হইতে পারে না। দাতার দানধর্ম্মে যে আত্মপ্রসাদ-লাভ,—তাহা সুখেরই একটী অঙ্গবিশেষ। হিন্দু দোল-দুর্গোৎসব পূজা-পার্ব্বণ করেন;—সেও আনন্দের জন্য। দুষ্কর্ম্মকারীর দুষ্কর্ম্মকেই বা কি বলিয়া মনে করিতে পারি? সেও কি সুখের জন্যই দুষ্কর্ম্মাচরণ করিতেছে না? দস্যু দস্যুবৃত্তি করে, নরহন্তা নরহত্যা করে, প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনা করে, বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতকতা করে;—তাহাদেরও মূল লক্ষ্য সুখসাধন নহে কি? সুখের জন্যই সংসার পাগল হইয়া আছে। যাহার যেরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি, যাহার যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা,—সে সেইরূপভাবেই সুখের অনুসন্ধানে ফিরিতেছে। সকলের সকল কার্য্যে সুখসমাগম হইতেছে কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু সুখান্বেষণেই যে সকলে ফিরিতেছে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। নানা জনে নানা পথে সুখান্বেষণে প্রধাবিত। কিন্তু পথ বড়ই কুটিল; সুতরাং সে পথে অগ্রসর হইতে গিয়া, কেহ বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া বিপাকে পড়িতেছেন, কেহ বা অগ্রসর হইবার সময় পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইয়া বিড়ম্বিত হইতেছেন। অধিকাংশেরই এই অবস্থা। তবে কি কেহ সে পথ অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না? পারিতেছেন,—যাঁহারা ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন; পারিতেছেন—যাঁহারা শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিয়া চলিতেছেন; পারিতেছেন—যাঁহারা মহাজনগণের অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন; পারিতেছেন—যাঁহারা বিবেক-বুদ্ধির অনুসারী হইয়াছেন। শাস্ত্র সেই পথ দেখাইবার জন্যই আলোক-বর্ত্তিকা ধরিয়া আছেন; মহাজনগণ—সেই পথ দেখাইবার জন্যই হস্ত-প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন; বিবেকবাণী—সেই পথের দিকে অগ্রসর করাইবার জন্যই প্রতিনিয়ত উপদেশ দিতেছেন। হিন্দুর শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি—কি বিশদভাবেই সেই পথ দেখাইয়া

সকলেরই লক্ষ্য সুখান্বেষণ।

দিয়াছেন! দর্শন-শাস্ত্রাদির মূল লক্ষ্যই তো সেই পথ-প্রদর্শন! আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে উপদেশ, তাহার উদ্দেশ্যই সুখলাভ—চরম সুখলাভ!

ধর্ম্মসাধনই দুঃখনিবৃত্তির—সুখসাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু ধর্ম্মসাধন কি প্রকারে হইতে পারে? সংসার যেমন বৈচিত্র্যময়, ধর্ম্মসাধনের পন্থা-সম্বন্ধেও সেইরূপ মত-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তবে স্থূলভাবে ধরা যাউক, ধর্ম্মসাধনের পথ—তিনটী। প্রথম—জ্ঞান, দ্বিতীয়—ভক্তি, তৃতীয়—কর্ম্ম। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়—তিনেই এক, আবার একেই তিন। ভক্তির ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বা ভক্তি দেখাইতে হইলে, কর্ম্মের সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে জ্ঞানের মধ্যেও কর্ম্মের সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। এ বিষয়ে অবশ্য মতান্তর আছে। যেখানে জ্ঞানের প্রাধান্য খ্যাপন করা হইয়াছে, সেখানে বলা হইয়াছে—যাঁহার অন্তর-বাহ্য সমান, যাঁহার শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, তাঁহার আবার কর্ম্ম কিরূপে সম্ভবপর? জগতে এবং আপনাতে যাঁহার অভিন্নত্ব ভাব; বিষ্ঠা-চন্দনে অথবা অনলে-সলিলে যাঁহারা সমজ্ঞান; তাঁহার আবার কর্ম্ম কোথায়? মুক্ত অবস্থার কর্ম্ম না থাকিতে পারে; কিন্তু সে অবস্থায় উপনীত হইবার পক্ষে কর্ম্মই প্রধান সোপান। ভক্তি-প্রাধান্যমূলক শাস্ত্রে ভক্তিরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেখানে জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির সাহায্য ভিন্ন ফলোপধায়ক নহে। আবার কর্ম্মবাদিগণ কর্ম্মেরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্ম ভিন্ন দুঃখনিবৃত্তি বা সুখলাভের অন্য উপায় নাই,—কর্ম্ম-প্রাধান্যমূলক শাস্ত্রে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে, তিনের মধ্যে কোনও পার্থক্যই উপলব্ধি হয় না। পরন্তু, দেখিতে পাই,—তিনই পরস্পর একসূত্রে আবদ্ধ। কর্ম্মের দ্বারাও দুঃখনিবৃত্তি বা সুখসাধন সম্ভবপর, ভক্তির সাহায্যেও দুঃখনিবৃত্তি বা সুখসাধন হইতে পারে, আবার জ্ঞানের সাহায্যেও দুঃখনিবৃত্তি হইয়া সুখ অধিগত হয়। শাস্ত্রে এ সকল বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার উক্তি দৃষ্ট হয়। শাস্ত্র কোথাও কর্ম্মকে মুক্তির কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; আবার কোথাও বা শাস্ত্রমতে কর্ম্ম সংসার-বন্ধনের হেতুভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ মতান্তর আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক অশেষ প্রকার উত্থাপিত হইলেও, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তিনেই এক এবং একেই তিন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। মানুষের প্রকৃতি যেরূপ বিভিন্ন প্রকার, দুঃখনিবৃত্তির উপায় এবং সুখলাভের পথও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—এই তিনটী পথই প্রধান পথ। অন্যান্য পথ এই তিন পথে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পরিশেষে তিন পথই এক হইয়া গিয়াছে। পথ যে জটিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইলে, কোন্ কর্ম্ম—কর্ম্ম, আর কোন্ কর্ম্ম—অকর্ম্ম, এই বিষয় নির্ণয় করিতে হয়। কিন্তু ইহা নির্ণয় করিতে অতি-বড় পণ্ডিতের চিত্তই বিভ্রান্ত হইয়া থাকে। তখন জ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক। এইরূপ ভক্তি-পথেও নানা অন্তরায়। বস্তু-তত্ত্বে সম্যক জ্ঞান লাভ না হইলে, ভক্তি কাহারি প্রতি প্রযুক্ত হইবে? সুতরাং এখানেও জ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক। আবার, ভক্তি তো কর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ। অতএব ভক্তিপথে কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েরই আবশ্যক। তার পর, কর্ম্ম

ধর্ম্মসাধনের ত্রিবিধ পন্থা।

ও ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। ভক্তিমান্ হইয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে কর্ম্মের সাহায্যে অগ্রসর হইলে, পূর্ণজ্ঞান লাভ হইতে পারে। জন্মমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ, কোথাও সম্ভবপর হইলেও, সাধারণতঃ স্বীকার করা যায় না। অতএব দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে, সুখসাধন বা মোক্ষলাভ বিষয়ে—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম তিনেরই প্রয়োজন।

ভক্তি-তত্ত্ব।

মুক্তির পক্ষে ভক্তি একটী প্রশস্ত সরল পথ। সকল শাস্ত্রেই এই পথের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই পথের পথিক হইবার জন্য প্রকৃতিও প্রথম হইতেই মনুষ্যকে উদ্বোধিত করিয়া থাকেন। সংসারে বোধ হয় এমন মনুষ্য কেহই নাই, জীবনে যিনি একবারও কখনও ভক্তি-পথের পথিক না হইয়াছেন। অতি-বড় পাষণ্ডের প্রাণেও, সচরাচর দেখিতে পাই, মুমূর্ষু-কালেও ভক্তির উদয় হয়। জীবনে একদিন-না-একদিন ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে, কাতরস্বরে মানুষকে ডাকিতে শুনা যায়,—'ভগবান রক্ষা কর।' অনেক বড় বড় নাস্তিকের জীবনেও এইরূপ পরি-বর্ত্তন ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিয়াছে! ফলতঃ, জীবনে কোন-না-কোনও সময়ে মানুষের প্রাণে ভক্তির উদয় অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন,—"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" অর্থাৎ,—'নিষ্কামই হউন অথবা সর্ব্বপ্রকার কামনা-যুক্তই হউন, মুক্তিপ্রার্থী উদারবুদ্ধি ব্যক্তি একান্ত ভক্তি-সহযোগে পরম পুরুষের উপাসনা করিবেন।' দুঃখনিবৃত্তিরই নামান্তর—মুক্তি, কৈবল্য-প্রাপ্তি বা নিঃশ্রেয়স-লাভ। সেই অবস্থাই চরম সুখের অবস্থা। শাস্ত্র উপদেশ দিলেন,—সকাম বা নিষ্কাম যেরূপভাবেই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক, ভগবানের প্রতি ভক্তি রাখিয়া কর্ম্ম করিলে মুক্তি অবশ্যই অধিগত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ভক্তি-তত্ত্ব বিশদরূপে পরিবর্ণিত আছে। ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে সূত এই ভক্তির মাহাত্ম্য-তত্ত্ব কীর্ত্তন করেন। যথা,—

ভক্তি-মাহাত্ম্য।

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

অর্থাৎ,—'স্বর্গাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অপেক্ষা স্বার্থশূন্য ভগবদ্ভক্তিই পুরুষের পরম ধর্ম্ম। নারায়ণে ভক্তি হইলে শীঘ্রই বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়।' কপিল-দেব জননীর নিকট ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পুত্র ধ্রুবকে সুনীতি ভক্তিভরে শ্রীহরির শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছিলেন। রাজা পৃথু ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া ভগব-ভক্তিতে মুক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজা প্রাচীনবর্হি কর্ম্ম ও বিদ্যার সাফল্য বিষয়ে ভক্তির মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'যাহাতে ভগবান হরির পরিতোষ হয়, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম এবং যাহা দ্বারা ভগবানে মতিমান হওয়া যায়, সেই বিদ্যাই বিদ্যা।' "তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

অর্থাৎ,—'হরির প্রতি যাঁহার নিষ্কাম ভক্তি জন্মে, তাঁহার শরীরে দেবতারা সর্ব্বগুণের সহিত

নিত্য বাস করেন! কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়াদিতে আসক্ত, তাহার শরীরে মহতের গুণ কি প্রকারে অবস্থিতি করিবে? এইরূপ ভক্তি-শাস্ত্রের নানা স্থানে ভক্তগণের মুখে নানারূপে ভক্তি-মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এমন কি, ভক্তিশাস্ত্র অনেক সময় ভক্তির নিকট কর্ম্মের ও জ্ঞানের গৌরব খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছেন। শাস্ত্রমতে যে জ্ঞান ভক্তিবিহীন, সে জ্ঞান কোনই ফলোপধায়ক নহে। শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণন প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

"শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌॥"

অর্থাৎ,—'যাহারা ক্ষুদ্র-প্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল-প্রমাণ তুষসকল তাড়ন করে, তাহাদিগের যেরূপ কোনও ফল হয় না; সেইরূপ যাঁহারা তোমার মঙ্গলময় ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভেই যত্ন করেন, তাঁহাদিগের ক্লেশ-স্বীকারই সার।' এতৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মা আরও বলিয়াছেন,—'জীবিত না থাকিলে যেমন দায়ে (পৈতৃক ধনে) অধিকার থাকে না; সেইরূপ ভক্তের জীবন ভিন্ন মুক্তিরও অন্য অধিকারোপায় নাই।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট ভক্তি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—ভক্তিই সকল সুখের আধার।

"যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্‌। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥
ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানাং ন সম্যক্‌ প্রপুনাতি হি॥
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥
বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং হসত্যভীক্ষ্ণং রুদতি কচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥
যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্‌।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধুন্বন্‌ মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্‌॥"

অর্থাৎ,—'হে উদ্ধব! যেমন অত্যন্ত সমৃদ্ধশিখ অগ্নি কাষ্ঠসমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি যাবতীয় পাপ দগ্ধ করিয়া থাকে। হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ব্যতীত যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং দান দ্বারা আমাকে লাভ করা যায় না। সাধুদিগের প্রিয় আত্মা আমাকে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভক্তি দ্বারা লাভ করিতে পারে। আমার প্রতি ভক্তি চণ্ডালাদিকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। সত্য-দয়া-সমন্বিত ধর্ম্ম বা তপোযুক্ত বিদ্যা মদীয় ভক্তিশূন্য আত্মাকে নিশ্চয়ই সম্যক্‌রূপে পবিত্র করিতে অসমর্থ। রোমাঞ্চ, মনের আর্দ্র ভাব ও আনন্দাশ্রুকণা ভিন্ন কিরূপে ভক্তি জানা যায়? ভক্তি বিনা চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হইবে? যাঁহার বাক্য গদগদ ও হৃদয় দ্রবীভূত হয়, যিনি পুনঃপুনঃ ক্রন্দন করেন, কখনও হাস্য করেন, লজ্জাহীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন—নৃত্য করেন, এতাদৃশ মদীয় ভক্ত ত্রিলোকপাবন। যেমন স্বর্ণ অনল-তাপিত হইয়া মলত্যাগ এবং পুনর্ব্বার নিজরূপ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মা মদ্ভক্তিযোগে কর্ম্মবাসনা ত্যাগ করিয়া মৎস্বরূপতা লাভ করে।' এই ভক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষুচাপ্যহম্॥"
'আমি সকল ভূতেই সমভাবে বিরাজিত। আমার কিছুই দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তি-সহকারে আমার ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতেই অবস্থান করেন এবং সেই সকল ব্যক্তিতে আমিও অবস্থান করিয়া থাকি।' এই বলিয়া ভগবান পার্থকে উপদেশ দিতেছেন,—
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥"
অর্থাৎ,—'তুমি একান্তভাবে মদ্গতচিত্ত মদেকসেবক মদুপাসক হও এবং আমাকেই নমস্কার কর। মন্নিষ্ঠ হইয়া এই সকল উপায়ের অনুসরণ করিলে, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।' পূর্ব্বে কতিপয় শ্লোকে ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য ও তজ্জনিত পরমপদ-প্রাপ্তির উপায় পরিকীর্ত্তন করিয়া, এই শ্লোকে শ্রীভগবান ভক্তির প্রণালী বিবৃত করিতেছেন; বলিতেছেন,—'যখন তোমার আহার ও নিদ্রা, হাস্য ও আলাপ, ভোগ ও চিন্তা, সকল কার্য্য সকল সময়ে মদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে, যখন আমাতেই তোমার ভোগের পরিসমাপ্তি এবং আমাতেই তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পর্য্যবসিত হইবে; তখন তুমি মৎপরায়ণরূপে পরিগণিত হইবে। এইরূপে মৎপরায়ণ হওয়ার পর, যখন তুমি একান্তরূপে মন্ময়তা প্রাপ্ত হইবে, তখনই তোমার সাধনার শেষ হইবে। যখন তুমি অন্তরে ও বাহ্যে, নিকটে ও দূরে, কল্পনায় ও প্রত্যক্ষ-গোচরে, কেবল আমাকেই উপলব্ধি করিবে; যখন তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমাতেই সমাহিত হইবে; তখনই হে ভক্তোত্তম সুহৃৎ! তোমাকে মদ্‌যুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। তার পর সকল ফলের সারস্বরূপ, সকল কামনার সিদ্ধিস্বরূপ, সকল বাসনার পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ, সকল আকাঙ্ক্ষার শেষ-স্বরূপ, সকল আয়াসের চরম ফল-স্বরূপ, পরমপদ তুমি প্রাপ্ত হইবে। হে ভ্রাতঃ! তখন আমি ও তুমি বিভিন্ন থাকিব না, তখন ভগবানকে তোমার আর দূরের বস্তু বলিয়া বোধ হইবে না, তখন আমাকে পৃথক পদার্থ বলিয়া তোমার উপলব্ধি থাকিবে না। তখন মুক্তিরূপ পরম সম্পৎ লাভ করিয়া তুমি ধন্য হইবে এবং যে সৌভাগ্য লাভ করিলে দেবতারা আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই পরম পদার্থ তোমার করতলগত হইবে।' এতদ্বিষয়ে বহু স্থলে বহু উক্তি আছে। ভগবানে ভক্তিমান্ হইলেই মুক্তি করতলগত হয়,—সকল উক্তিরই সেই মর্ম্ম।

কিন্তু এখানেও সংশয় আসিতে পারে। ভক্তিও কি বিভ্রান্ত হইতে পারে না! মানুষ সৎকর্ম্ম করিবার সময়ও ভক্তিমান্ হইতে পারে, আবার অসৎকর্ম্ম করিবার সময়ও ভক্তিমান্ হইতে পারে। দস্যু দস্যুবৃত্তি করিতে চলিয়াছে; ভক্তিভরে নৃমুণ্ডমালিনীর নিকট সাফল্য-কামনা করিতেছে। সেখানে সে ভক্তিতে কি ফললাভ হইবে,—সহজবুদ্ধিতেই উপলব্ধি হয় না কি? আবার আর এক দিকে ধার্ম্মিক আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সতী-স্ত্রীর সতীধর্ম্ম রক্ষার জন্য দুর্দ্ধর্ষ কামুক নরপিশাচের সম্মুখীন হইতেছেন; আর সেই সময় কাতরকণ্ঠে ভগবানের করুণা-প্রার্থী হইয়া ডাকিতেছেন—'ভগবান! তুমি রক্ষা কর।' এখানে ভক্তির মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই অপরিসীম। মানুষ অনেক সময় এই কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয় করিতে পারে না; তাই বিভ্রমভ্রান্ত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে তাই বলিয়াছিলেন,—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র

সৎসঙ্গ।

মোহিতাঃ।" কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করিতে পণ্ডিত-গণই মুহ্যমান্ হন, তা অন্য পরে কা কথা।' এক্ষেত্রে কি করা প্রয়োজন? শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন,—'সৎসঙ্গ কর।' সৎসঙ্গে সুফল-লাভের দৃষ্টান্তের অবধি নাই। ভগীরথ যখন মর্ত্ত্যে সুরধুনীকে আনয়ন করেন, গঙ্গাদেবী বলিয়াছিলেন,—'আমি পৃথিবীতে যাইতে ইচ্ছা করি না। কারণ, মনুষ্যেরা আমার অঙ্গে পাপ প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু আমি সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব?' সে উপায় স্থির না করিলে দেবী মর্ত্ত্যে আগমনে সম্মতা হন নাই। কিন্তু তাহাতে ভগীরথ সাধু-সঙ্গের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; দেবীকে বলিয়াছিলেন,—

"সাধবো ন্যাসীনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ। হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥"

'মাতর্গঙ্গে! সে ভাবনা কি জন্য? আপনি অবহেলায় অপবিত্রতা দূর করিয়া পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবেন। কারণ, সন্ন্যাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণ লোকপাবন। তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গ-সঙ্গদ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। সাধু-গণের শরীরে পাপহারী হরি বর্ত্তমান আছেন।' সাধু-সঙ্গ লাভে পাপের প্রক্ষালন হইয়া পবিত্রতা সঞ্চার হইবে, ভগীরথ তাহাই বুঝাইয়া দেন। আর তাহা বুঝিতে পারিয়াই গঙ্গাদেবী মর্ত্ত্যে আগমন করেন। সাধু-সঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্। শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্। সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥
অন্নং হি প্রাণীনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ। দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥"

'যেমন ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না; তেমনি সাধু-গণের সেবা করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যেমন, যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের নৌকা পরমাশ্রয়; সেইরূপ ভবসাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকল পরম অবলম্বন। যেমন অন্ন প্রাণি গণের প্রাণ, যেমন আমি (ভগবান) কাতর জনগণের শরণ, যেমন ধর্ম্ম পরকালে মানব-গণের ধন; সেইরূপ সাধুগণ সংসারপতন-ভীত পুরুষের পরিত্রাতা। সূর্য্যদেব উদিত হইয়া বাহ্য চক্ষু প্রদান করেন, কিন্তু সাধুগণ অশেষ চক্ষু প্রদান করেন। সাধুগণ-দেবতা ও বান্ধব; সাধুগণ—আত্মা—আমি।' শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন,—'হে উদ্ধব। সর্ব্ব-সঙ্গ-নিবর্ত্তক সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে; যোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, ইষ্ট, পূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রত, দেবার্চ্চনা, গোপনীয় মন্ত্র, তীর্থ-পর্য্যটন, নিয়ম এবং যম সকল আমাকে তাদৃশ বশ করিতে পারে না।' এতদ্বিষয়ে ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই,—

"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥"

ফলতঃ, মানুষ যে পথেই অগ্রসর হউন, প্রথমে সৎসঙ্গ প্রয়োজন। সৎসঙ্গ লাভ হইলে তিনি প্রকৃত পথ দেখিতে পান। তখন আর তাঁহাকে বিপথে বিভ্রান্ত হইতে হয় না।

পথ নির্দ্দিষ্ট হইলে কি ভাবে সেই পথে অগ্রসর হইতে হইবে, শাস্ত্রে তাহার উপদেশ আছে। ভক্তি-পথের প্রসঙ্গই প্রথমে উত্থাপন করিয়াছি; সুতরাং সে পথে অগ্রসর হইতে হইলে কি ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাই প্রথমে বলিতেছি। ভক্তির স্বরূপ-তত্ত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে শাস্ত্র ভক্তিকে নববিধ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেই নববিধা ভক্তি—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।" এই নববিধা ভক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুতে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার অপেক্ষা শিক্ষা আর নাই। গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'আয়ুষ্মন্ প্রহ্লাদ! এতকাল গুরুগৃহে থাকিয়া যাহা শিক্ষা করিলে, তন্মধ্যে সুশিক্ষিত বিষয় বল—কিঞ্চিৎ বল।' প্রহ্লাদ তাহাতে এই উত্তরই দিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—'পিতঃ! শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন—এই নব-লক্ষণাক্রান্ত ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুকে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধ হয়, তাহাই উত্তম শিক্ষা।' রাজা অম্বরীষ এই নবধা ভক্তি প্রপালন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; পরীক্ষিৎকে শুকদেব এই নবধা ভক্তি প্রপালনের উপদেশ দিয়াছেন, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এই উপদেশ প্রদান করিয়াই ভক্ত নারদ বলিয়াছিলেন—'শ্রীহরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার সেবা, পূজা, প্রণাম ও দাস্য, তাঁহার সহিত সখ্য ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি পরম ধর্ম্ম।' শাস্ত্রমতে,—'সে বাক্য বাক্যই নয়, যাহাতে ভগবন্মহিমা কীর্ত্তিত হয় নাই; সে হস্ত হস্তই নয়, যে হস্ত ভগবৎকার্য্য সম্পন্ন না করে; সে মন মনই নয়, যে মন তাহার মধুময় কথা স্মরণ না করে; সে শ্রবণ শ্রবণই নয়, যে শ্রবণে তাঁহার নামসুধা পুণ্যকথা নিয়ত প্রবেশ না করে। যে মস্তক তাঁহার উভয় রূপকে নমস্কার করে, তাহাই মস্তক; যে চক্ষু তাঁহার উভয় রূপই দর্শন করে, তাহাই প্রকৃত চক্ষু; আর যে সকল অঙ্গ সেই বিষ্ণুর এবং তদীয় জন-গণের পাদোদক নিয়ত ভজনা করে, সেই সকল অঙ্গই অঙ্গ।' পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব,—

নববিধা ভক্তি।

"সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ
স্মরেদ্ বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥
শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥"

ভগবন্মহিমা শ্রবণ করিতে করিতে কর্ণ তন্ময় হইয়া যায়, ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে কণ্ঠ তন্ময়ত্ব লাভ করে, ভগবৎ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে হস্ত তাঁহারই স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, ভগবৎ-কথা স্মরণ করিতে করিতে মন তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যখন এই ভাব উপস্থিত হয়, তখন আনন্দের অবধি থাকে না,—তখনই সকল দুঃখের অবসান হইয়া যায়। তখন, জলবিন্দুর মহাসাগরে মিলন ঘটে; কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়া বন্ধুর পথে বক্র-গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া যে স্রোতস্বিনী মরুপথে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল, শ্রাবণের প্লাবনে সে তখন আপন গন্তব্য-পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে পারে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—'যদি আনন্দ পাইতে চাও, ভগবানে ভক্তিমান্ হও; যদি ভগবানে ভক্তিমান্

হইতে চাও; তাঁহার মহিমা শ্রবণ কর—তাঁহার গুণ কীর্ত্তন কর,—তাঁহার ধ্যান-ধারণায় তন্ময় হইয়া যাও।'

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—তিনের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। এক ভিন্ন অন্যের গত্যন্তর নাই। শাস্ত্র যখন বলিলেন—'ভক্তি নববিধা'; শাস্ত্র যখন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকটিত করিলেন; তখন ভক্তির সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিতে আদৌ সংশয় রহিল না। শ্রবণ,কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন,—ইহার কোনটী কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ফলতঃ, নয়টি কর্ম্মরূপ ভক্তি দ্বারা মুক্তি অধিগত হয়, ভক্তি-প্রধান শাস্ত্রের ইহাই মত। ইহা ভিন্ন অন্য মত থাকিতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কর্ম্মে কি কি শুভফল লাভ হয়, অতঃপর তাহারই অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে সূত বলিয়াছেন,—'যাঁহারা হরি-কথা শ্রবণ করেন, সাধু ব্যক্তিদিগের সখা হরি তাঁহাদের হৃদয়স্থ হইয়া, তাঁহাদের কামাদি বাসনারূপ বাহ্যান্তরিক সমস্ত অমঙ্গল দূর করেন।...যাঁহারা সাধুদিগের আত্মস্বরূপে প্রকাশমান ভগবানের কথামৃত শ্রবণপুট দ্বারা পান করেন, অতি দূষিত হইলেও তাঁহাদিগের অভিপ্রায় পবিত্র হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম প্রাপ্ত হন।'

ভক্তির স্বরূপ।

"শৃন্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥"

রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেবও এইরূপ উপদেশই প্রদান করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—'যে ব্যক্তি ভগবানের চরিত্র শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, ভগবান অবিলম্বেই তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন শরৎকাল সমাগত হইলে সলিলের মালিন্য দূর হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ কর্ণবিবর দ্বারা সাধুদিগের হৃদয়-কমলে প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত মলিনত্বই পরিষ্কার করিয়া দেন।' এইরূপে বুঝিতে পারা যায়, শ্রবণের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইলেই চিত্ত সুখের আলয়ে পরিণত হয়। অসৎ-কথা শ্রবণ না করিয়া ভক্ত ভগবৎ-কথা শ্রবণে নিবিষ্ট হউন,—তাঁহার দুঃখনিবৃত্তি হইবে। দুঃখ-নিবৃত্তি হইলেই তিনি অশেষ সুখের অধিকারী হইবেন। কীর্ত্তনেও এইরূপ আত্মতৃপ্তি আছে। অধিক কি, ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতেই ভক্তি মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। "আপন্ন সংসৃতিং ঘোরং যন্নাম বিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥" অর্থাৎ—'মোহবশে বিবশ মানব বিঘোর সংসারারণ্যে পতিত হইয়া যদি তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে পারে, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মোক্ষলাভ হয়।' আরও, 'অতি মনোরম পদ-বিন্যাস থাকিলেও যে বাক্যের কোনও স্থান শ্রীহরির যশোকীর্ত্তন নাই, সে কেবল কাক-তীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য সকাম ও নীচাশয় ব্যক্তিরই অনুরাগ আকর্ষণ করে। যেরূপ রাজহংসগণ বায়সসেবিত অপরিস্কৃত গর্ত্তাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছোদক মানস-সরোবরেই বিহার করে, সেইরূপ সত্ত্বগুণাবলম্বী পরমহংস-সকল ঐ কুৎসিৎ বাক্যে অনাদর করিয়া নির্ম্মল ব্রহ্মেই পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন। যে গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকেই অনন্ত-কীর্ত্তি

ভগবানের নাম কীর্ত্তন থাকে, সেইরূপ গ্রন্থই লোক-সমূহের সর্ব্ব পাপ নাশ করিতে সমর্থ। কারণ সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ঐ নাম শ্রবণ, উচ্চারণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।' যথা,—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥"

শ্রবণের ও কীর্ত্তনের যেরূপ মাহাত্ম্য, স্মরণের মাহাত্ম্যও তদনুরূপ। ভগবৎ-স্মরণে যে পরম আনন্দ লাভ হয়, শুকদেব পরীক্ষিৎকে সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন,—

"যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নিদুর্ব্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্। এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভক্ষয়ম্॥"

'যেমন অগ্নি ধাতুজ সুবর্ণের দুর্ব্বর্ণ দূর করে, তেমনি চিত্তস্থিত বিষ্ণু যোগীদিগের অশুভ ক্ষয় করিয়া থাকেন।' অর্থাৎ,—যাঁহারা একমনে শ্রীহরির শরণ লইয়াছেন, তাঁহাদের অশুভ বিদূরিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তিতেও এতদ্বিষয় পরিস্ফুট। শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

"অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ। ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥"

'যে অকিঞ্চন শান্ত দান্ত সমদর্শী ব্যক্তি আমার স্মরণে সন্তুষ্ট-চিত্ত আছেন, তাঁহার সকল দিকই সুখময়। ভগবচ্চরণ স্মরণকে শাস্ত্র প্রধান সাধনা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

"তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্। হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনোমত্তাবভাবিতম্॥"

এইরূপ পাদ সেবন, অর্চ্চন, সখ্য, আত্মনিবেদন প্রভৃতির মাহাত্ম্য-তত্ত্ব শাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকীর্ত্তিত। ভক্তির এই নববিধ কর্ম্মের যেটীরই অনুসারীই হউন না কেন, দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহাই ভক্তি-শাস্ত্রের অভিমত।

কর্ম্ম-তত্ত্ব।

ভক্তিশাস্ত্র যে নববিধ কর্ম্মকে ভক্তির সোপান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, কর্ম্ম মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক শাস্ত্রে সে কর্ম্মের প্রণালী কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে সে বিভিন্নতা প্রতীত হইলেও, সে বিভিন্নতা কিন্তু বিভিন্নতা নহে। ভক্তির অন্তর্গত ঐ নববিধ কর্ম্মের মধ্যে যে মূল-তত্ত্ব নিহিত আছে, কর্ম্মপ্রাধান্য-জ্ঞাপক শাস্ত্রে অন্যরূপ কর্ম্মের প্রাধান্য খ্যাপন দৃষ্ট হইলেও সে কর্ম্মেরও মূল-লক্ষ্য প্রোক্ত কর্ম্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বেদে যজ্ঞের প্রাধান্য কীর্ত্তিত আছে; যজ্ঞকার্য্যই মোক্ষের হেতুভূত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতিতে এবং ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধকার্য্য প্রভৃতিতেও দুঃখনিবৃত্তির বা মোক্ষলাভের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। দেখিতে গেলে, অসংখ্য কর্ম্মে অসংখ্য প্রকারে সুখ-সমাগম বা মোক্ষলাভ সংঘটিত হইতে পারে—দেখিতে পাই। পুত্র পিতৃমাতৃ-সেবায় মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন; সতী-স্ত্রী পতিসেবাকে পরম ধর্ম্ম মনে করিয়া, তৎকর্ম্মে মোক্ষলাভ করিয়াছেন; দাতা দানধর্ম্মের প্রভাবে, পরোপকারী পরোপকারের মাহাত্ম্যে অনুপম সুখলাভ করিয়াছেন। শাস্ত্রগ্রন্থে এরূপ অশেষ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই কর্ম্মতত্ত্ব সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। সে কর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিলে, কোথায় কোন্ কর্ম্মানুষ্ঠানে অভীষ্ট-

কর্ম্মের স্বরূপ।

লাভ হইবে, আর কোথায় কোন্ কর্ম্মানুষ্ঠানে অভীষ্ট-লাভে বিঘ্ন ঘটিবে,—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছে, এতৎ-প্রসঙ্গে তাহা আলোচনা করিলেই কর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। কর্ম্ম-তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য বলিয়া ভগবান প্রথমেই বলিয়াছেন,—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥" তার পর বলিয়াছেন,—

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মনঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহণা কর্ম্মণোঃ গতি॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম য পশ্যেদকর্ম্মনি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

কোন্‌টী কর্ম্ম এবং কোন্‌টী অকর্ম্ম, এতদ্বিষয়ে অর্জ্জুনের মনে দারুণ সংশয় উপস্থিত হয়। সেই সংশয়-ভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—'কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম,—এই বিষয়ে বিবেকী জনও মোহাচ্ছন্ন হন। তজ্জন্য আমি তোমাকে কর্ম্ম বলিব; যাহা জানিয়া তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইবে।' শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্ম, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং তূষ্ণীম্ভাবরূপ অকর্ম্ম এই তিনের সম্যক্ তত্ত্ব অবশ্য জ্ঞাতব্য। কারণ, তৎসমস্তের নিগূঢ় ভাব নিরতিশয় দুর্জ্ঞেয়। যিনি দেহাদি চেষ্টারূপ কর্ম্ম মধ্যেও কর্ম্মহীনতা এবং কর্ম্মাভাবেও কর্ম্মের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, মানব-জাতির মধ্যে তিনিই পণ্ডিত; তাদৃশ ব্যক্তি আহার-বিহারাদি যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও বস্তুতঃ যোগী পুরুষের ন্যায় সর্ব্বব্যাপারে নির্লিপ্ত।' এই ভগবদুক্তির মধ্যে কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান যে বলিয়াছেন,—কোন্‌টী কর্ম্ম এবং কোন্‌টী অকর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করিতে পণ্ডিতগণও মুহ্যমান হন, তাহা স্বতঃ-সিদ্ধ; দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। স্রোতাভিমুখে তরণী প্রধাবিতা; তীরস্থিত তরুরাজি নিশ্চল; অথচ, আরোহীর মনে হয়,—যেন তরণী স্থির রহিয়াছে, আর তীরস্থিত তরুরাজিই বিপরীত দিকে চলিয়াছে। এইরূপ, অতি দূরে একটি মানুষ চলিয়া যাইতেছে; অথচ, দূর হইতে দর্শকের মনে হইতেছে, পথিক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এতদুভয় ক্ষেত্রেই কর্ম্ম-বিষয়ে মানুষ বিভ্রমগ্রস্ত। যে গতিশক্তিবিশিষ্ট, মানুষ তাহাকে গতিহীন মনে করিতেছে; আর যে গতিহীন, মনুষ্যের দৃষ্টিতে সে গতি-শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এরূপ ভ্রান্তি প্রতি পদেই উপস্থিত হয়। সুতরাং ভগবান যে বলিয়াছেন,—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ", এ বিষয়ে কোনই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। তার পর, ভগবান বলিতেছেন,—'কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম, এই তিন তত্ত্ব অধিগত হওয়া আবশ্যক। এস্থলে কর্ম্মকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। কর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রানুমোদিত বৈধ কর্ম্ম, বিকর্ম্ম অর্থে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ অবৈধ কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম অর্থে নিষ্কর্ম্ম বা কর্ম্মহীনতা। এইরূপ বিভাগেও মনে সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে। কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মের সত্ত্বা উপলব্ধি হয় বটে; কিন্তু অকর্ম্মের বা নিষ্কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মের সত্ত্বা কোথায়? নিষ্কর্ম্ম শব্দে কর্ম্মরাহিত্য বা তূষ্ণীম্ভাব বুঝাইলে, কর্ম্মের সত্ত্বা কোথায় রহিল? কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, সেখানেও কর্ম্মের সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। আমরা যখন মনে করি,—আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, আমরা কোনও কর্ম্ম করিব না, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনে আমরা দিন কাটাইব;—তখনও কি কর্ম্মাভাব

উপস্থিত হয়? চুপ করিয়া থাকা—তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা,—সেও কি এক প্রকার কর্ম্ম নহে? কর্ম্মের প্রকার-ভেদ হইতে পারে; কিন্তু সে অবস্থাও যে কর্ম্মের অবস্থা, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। যখন আমরা মনে করি,—আমি কিছু করিতেছি না; তখনও আমাতে অহঙ্কার আছে অহঙ্কার থাকিলেই কর্ম্ম থাকিবেই। অহঙ্কারাভিভূত মনুষ্যই মনে করে,—'আমি', 'আমার কাজ আমি করিতেছি।' আবার অহঙ্কারাভিভূত ব্যক্তিরই মনে হয়,—'আমি নিষ্ক্রিয় বসিয়া আছি। কর্ম্ম আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।' যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা নিষ্কর্ম্মভাবের মধ্যেও তাই কর্ম্ম দেখিতে পান। সুতরাং কোন্‌টী কর্ম্ম কোন্‌টী বিকর্ম্ম, কোন্‌টী অকর্ম্ম,—তাহা তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'যাঁহারা কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই তিনেরই স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান; তাঁহারাই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ অর্থাৎ তাঁহাদের কোনও কর্ম্ম অবশিষ্ট নাই; তাঁহারা মুক্তিলাভের অধিকারী।' এই কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকাকারগণ বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে বুঝা যায়,—'কর্ম্ম শব্দের অর্থ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার। সেই কর্ম্ম ত্রিবিধ,—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। শাস্ত্রবিহিত দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম—কর্ম্ম; শাস্ত্রনিষিদ্ধ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম—বিকর্ম্ম; এবং যাহা কর্ম্মও নহে, বিকর্ম্মও নহে, তাহারই নাম—অকর্ম্ম।' ভগবান বলিয়াছেন,—যিনি কর্ম্মমধ্যে অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মহীনতা এবং কর্ম্মাভাবেও কর্ম্মের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তিনিই পণ্ডিত। অর্থাৎ,—কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, এই তিনের স্বরূপ-তত্ত্ব অধিগত হওয়াই জ্ঞানের লক্ষণ। এখন দেখা যাউক, কর্ম্মেই বা কিরূপে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মেই বা কিরূপে বিকর্ম্ম উপস্থিত হইতে পারে! শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম নামে অভিহিত। সে হিসাবে, যজ্ঞ একটী কর্ম্ম বা শাস্ত্রবিহিত দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার-বিশেষ। কিন্তু সেই যজ্ঞ যদি বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মরূপ যজ্ঞ কৃত অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইয়াও অকৃত হইয়া পড়ে অর্থাৎ সেই যজ্ঞ করা-না-করা—তুল্য হইয়া থাকে।' সুতরাং তাহা বিকর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ ঠিক বিপরীত হইয়া যায়। আরও দেখ, দাম্ভিক কর্তৃক অনুষ্ঠিত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই আবার বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। কারণ, দাম্ভিক যাহা কিছু করে, তাহা কেবল বাহিরে লোক দেখাইবার নিমিত্ত। ঠিক প্রমাণানুযায়ী কোনও কর্ম্মই দাম্ভিক কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় না। সুতরাং তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়।' যিনি নিষ্কর্ম্ম বা উদাসীন; তাঁহার সেই নিষ্কর্ম্ম বা ঔদাসীন্যের মধ্যেও এইরূপে বিকর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হয়। 'উদাসীন, সুতরাং তিনি বিধি-নিষেধের বা কর্ম্ম-বিকর্ম্মের অতীত। তাঁহার ঔদাসীন্যই অকর্ম্ম। সেই উদাসীন নিষ্কর্ম্মভাবে বসিয়া আছেন; এমন সময় হয় তো এক ব্যক্তি দস্যু-হস্ত হইতে মুক্তিলাভার্থ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ও কাতরভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইল। এখন সেই উদাসীন যদি সমর্থ হইয়াও তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই অকর্ম্ম-রূপ ঔদাসীন্য বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। 'আর্ত্তকে ত্রাণ করিবে'—ইহাই শাস্ত্রের বিধি। উদাসীন বিধি-নিষেধের অতীত বলিয়াই অক্লেশে এই শাস্ত্রের মর্য্যাদা

উল্লঙ্ঘন করেন। সুতরাং শাস্ত্রতঃ প্রতিপাদিত হইতেছে, যে উদাসীনের ঔদাসীন্যরূপ অকর্ম্ম আর্ত্তত্রাণরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকে অতিক্রম করে বলিয়া আশুদৃষ্টিতে বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। আবার কোনরূপ ব্রতে দীক্ষিত অথবা ভগবানের ধ্যানাদিতে আসক্ত কোনও ব্যক্তি যদি উপযুক্ত সময়ে নিত্যানুষ্ঠেয় পঞ্চযজ্ঞাদি দানের অনুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে সেই দীক্ষিত বা ভগবদ্ধ্যানাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে পঞ্চযজ্ঞাদির অকরণ-রূপ যে অকর্ম্ম, তাহা বিকর্ম্ম-শ্রেণীভুক্ত না হইয়া বরং কর্ম্মশ্রেণীভুক্তই হইয়া থাকে। এইরূপে আবার হিংসা, অস্মদ্দৃষ্টিতে বিকর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইলেও, 'অগ্নীষোমিয়ং পশুমালভেত' এই শাস্ত্রানুশাসন-বলে যজ্ঞে কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই হিংসাই আবার স্থলবিশেষে কর্ম্মে ও বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত না হইয়া অকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। বৃথা নষ্ট পশু ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। বৃথা-নষ্ট পশুতে বিধ্যর্থের নিষ্পত্তি হয় না; কারণ, তাহা অবিহিত। সুতরাং তাহা কর্ম্ম নহে। অবৈধ-নষ্টও বৃথা নষ্ট, আর হঠাৎ নষ্টও বৃথা নষ্ট। সুতরাং এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না যে, যদি বৃথা-নাশ অবৈধই হইল, তবে তাহা কর্ম্ম না হউক বিকর্ম্ম হইতে আপত্তি কি? কারণ, যাহা অবৈধ, তাহাই বিকর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। হঠাৎ-নাশ ও বৃথা-নাশ বলিয়া, তাহা (অর্থাৎ উক্ত হিংসা) বিকর্ম্ম শ্রেণীতেও পরিণত হইতে পারে না। অতএব যখন এবম্বিধ হিংসা কর্ম্মও হইল না বা বিকর্ম্মও হইল না, তখন সুতরাং তাহা অকর্ম্ম শ্রেণীভুক্ত হইল। কারণ, তাহা কৃত হইয়াও অকৃত-স্বরূপ। এইরূপ আবার হিংসাফলক সত্য, কর্ম্ম হইয়াও বিকর্ম্মত্বে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ, সাধারণতঃ সত্য—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম। কিন্তু সেই সত্যের ফল যদি হিংসা হয়, তাহা হইলে তাহা বিকর্ম্মত্বে পর্য্যবসিত হয়। হিংসা-ফলক সত্য; যথা;—আমি গৃহদ্বারে বসিয়া আছি। এমন সময়ে দস্যু-বিতাড়িত এক ব্যক্তি আসিয়া আমার গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক লুক্কায়িত রহিল। সেই সময়ে সেই দস্যু আসিয়া যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, 'মহাশয়! এই পথ দিয়া এইরূপ একজন মনুষ্য গিয়াছে বা কোথায় আছে, জানেন কি?' এখন আমি যদি সত্যের অনুরোধে বলি যে,—'হাঁ, এইরূপ একব্যক্তি অল্পক্ষণ হইল আসিয়াছে এবং আমার ঘরে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি করিতেছে।' দস্যু আমার এই কথা শুনিয়াই তাহাকে গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে লইয়া আসিল ও কিঞ্চিৎ দূরে গমন পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। এইরূপ স্থলে, আমি দস্যুকে সত্য কথা বলিলাম বটে; কিন্তু আমার এবম্বিধ সত্যের ফল হইল—হিংসা। সুতরাং এবম্বিধ হিংসাফলক সত্য বিকর্ম্ম।' যাঁহার এই কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম তত্ত্ব বিশেষ বোধগম্য হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত বিজ্ঞ—তিনিই প্রকৃতরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ, আর কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে তাঁহারই মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। 'শাস্ত্র-বিচক্ষণ জনসমূহ অকর্ম্ম অর্থাৎ স্পন্দশূন্য (নিষ্ক্রিয়) কূটস্থ বস্তুতে কর্ম্ম অর্থাৎ সম্পন্দ (সক্রিয়) বাহ্য আকাশাদি এবং আভ্যন্তর অন্তঃকরণাদিকে নানারূপ দেখিয়া থাকেন। কেহ দেখেন আধার-আধেয় ভাবে, কেহ দেখেন উপাদান-উপাদেয়ভাবে, আবার কেহ দেখেন অধিষ্ঠানাধ্যস্ত ভাবে। শাস্ত্রবেত্তৃগণ এইরূপ দেখিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি প্রথম অর্থাৎ আধার-আধেয় ভাবে দেখেন, তাঁহার কথা বলিতেছি। এই প্রথম শাস্ত্রবেত্তা সাঙ্খ্য নামে সুপরিচিত। তিনি মনে করেন যে, আমি অর্থাৎ পুরুষ অসঙ্গ

অর্থাৎ কমলদলস্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্ত। দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাত ধর্ম্ম আধার-রূপ আমার উপর আহিত হইয়াছে। পুরুষ উদাসীন; সুতরাং তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই; কর্ত্তৃত্ব সঙ্ঘাতেরই। এই নিমিত্ত আমার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও সঙ্ঘাতকর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বাদি অবিবেক-বশতঃ আমাতে অবঘাত হইতেছে। অর্থাৎ, যেরূপ একটী স্ফটিক-নির্ম্মিত বস্তুর সন্নিকটে কেহ যদি জবা-কুসুম রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই জবাকুসুমের লৌহিত্যে স্ফাটিক পদার্থটিও অনুরঞ্জিত হয়; স্ফটিক লৌহিত্যগুণবিশিষ্ট না হইলেও, লোকে অজ্ঞানতঃ দেখে যে, স্ফাটিক পদার্থটী লোহিত; এইরূপ আমাতে (পুরুষে) কোনরূপ ক্রিয়া না থাকিলেও লোকে অবিবেক-বশতঃ আমার উপর প্রকৃতি-সম্ভূত ধর্ম্মনিচয় দেখিয়া থাকে। এক্ষণে যিনি দ্বিতীয় অর্থাৎ যিনি উপাদান-উপাদেয় ভাবে দেখেন, তাঁহার কথা বলিতেছি। এই দ্বিতীয় শাস্ত্রবেত্তা বেদান্তী; কিন্তু তিনি বেদান্তের একদেশ মতাবলম্বী; সুতরাং একদেশী বেদান্তী বলিয়াই পরিচিত। তিনি মনে করেন যে, যেরূপ বলয়-কুণ্ডলাদি সুবর্ণ হইতে রূপান্তরিত হইয়া বিরচিত হইলেও উপাদান স্বরূপ সুবর্ণ হইতে ব্যতিরিক্ত নহে; সেইরূপ উপাদান-কারণীভূত যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন যে সমস্ত প্রপঞ্চ, তাহা কখনও ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত নহে। সুতরাং কর্ম্মও ব্রহ্ম, কর্ম্মের সাধনাদিও ব্রহ্ম এবং আমিও ব্রহ্ম। তিনি এইরূপ ভাবিয়াই সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এখন তৃতীয় শাস্ত্রবেত্তা বা যিনি অধিষ্ঠানাধ্যস্ত-ভাবে কর্ম্ম দেখেন, তাঁহার বিষয় বলিতেছি। তিনি মনে করেন যে, যেরূপ রজ্জু অধিষ্ঠানে ভ্রমপূর্ব্বক সর্প অধ্যস্থ হয় এবং ভ্রম বিদূরিত হইলে সর্পের অধ্যাস বিনষ্ট হয় ও রজ্জু প্রকৃত রজ্জুত্ব সম্প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাহ্যাভ্যন্তর প্রপঞ্চ-সমূহই অজ্ঞানতঃ সেই কূটস্থ বস্তুরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্থ হইয়াছে। সেই একমাত্র অকর্ম্ম (নিষ্ক্রিয়) ব্রহ্মবস্তুই সত্য, তদ্ব্যতীত কর্ম্ম (ক্রিয়া) দ্বৈতজাত ও রজ্জুতে ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাতে অজ্ঞানতঃ অধ্যস্ত, সুতরাং মিথ্যা।...শাস্ত্রে অভিহিত আছে যে, যদি কেহ অতিশয় বুদ্ধিমান হইয়াও অযুক্ত-ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত কর্ম্ম অসৎ (অর্থাৎ করা-না-করার সমান) হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মের দ্বারা অশুভ মোচন হইতে পারে না। শাস্ত্রে আরও কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি ইহলোকেই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) না জানিয়া বহু বর্ষ পর্য্যন্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই নাশপ্রাপ্ত হয়। আরও অভিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি যোগানুষ্ঠানকারী হইয়াও বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত অকার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি প্রত্যবায়ভাগী হইয়া থাকেন। কারণ, পাপ-সম্বন্ধ-হেতু তিনি অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন না। প্রথম ও দ্বিতীয় শাস্ত্রবাক্যে দেখা গেল, যিনি বুদ্ধিমান অথচ যোগী নহেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই নাশপ্রাপ্ত হয় বা তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই করা আর না করা দুইই সমান হইয়া পড়ে; সুতরাং তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হইতে পারেন না। তৃতীয় শাস্ত্রবাক্যেও ইহা প্রদর্শিত হইল যে, যে ব্যক্তি যোগী অথচ বুদ্ধিমান নহেন, তিনি বুদ্ধি-দোষে অকার্য্যানুষ্ঠান করিলেও করিতে পারেন; সুতরাং তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হইতে পারেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥' (ঈশোপনিষৎ, একাদশ মন্ত্র)। অর্থাৎ যিনি

বিদ্যা অর্থাৎ দেবতাজ্ঞান এবং অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম এতদুভয়কে একব্যক্তিরই অনুষ্ঠেয় রূপে অবগত হন, তিনিই কর্ম্মদ্বারা মৃত্যুই, অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া, দেবতা-জ্ঞানদ্বারা অমৃত অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করেন।" ভাষ্যকারগণের এবং টীকাকারগণের অনুসরণে কর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম এবং কর্ম্ম উভয়কেই জানিতে হইবে। উভয়কে জানিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে কর্ম্মকে নিযুক্ত করিতে হইবে। ভগবদুক্তিতে সেই কথাই বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম॥"

অর্থাৎ,—যিনি যাবতীয় কর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান বিবর্জ্জিত-ভাবে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার জ্ঞানানলে শুভাশুভ লক্ষণ সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাদৃশ ব্যক্তিকেই পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করেন। সেই পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক, আকাঙ্ক্ষাবিহীনতা-হেতু পরিতুষ্ট, এবং দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান-বিহীনতা-হেতু নিরবলম্ব; তিনি তাদৃশভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্প্রবৃত্ত হইলেও বাস্তবিক কোনও কর্ম্মই করেন না। ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হৃদয়ে অন্তঃকরণ ও আত্মাকে সংযত এবং সর্ব্ব-প্রকার ভোগ-সাধন সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ভববন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হওয়া যায়।

জ্ঞান-তত্ত্ব।

অন্যপক্ষে জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" আত্মজ্ঞানই একমাত্র মুক্তির উপায়। আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। সাঙ্খ্য বৈশেষিক-দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ সেই আত্মজ্ঞান-লাভের তত্ত্বই বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। সাঙ্খ্য বলিয়াছেন,—প্রকৃতি-পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান উপলব্ধি হইলেই নিঃশ্রেয়স-রূপ মোক্ষ লাভ হয়। বৈশেষিক-মতে ভাব ও অভাব পদার্থ সমূহের জ্ঞানলাভই নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের মূল। ন্যায়দর্শন বলিয়াছেন,—'যদি নিঃশ্রেয়স-লাভরূপ পরম মঙ্গল লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান,—এই ষোড়শ পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান লাভ কর।' বেদান্ত প্রকারান্তরে সেই মীমাংসাই করিয়াছেন। মীমাংসা-দর্শনেও সেই মীমাংসাই দেখিতে পাই। পতঞ্জলিও প্রকারান্তরে সেই কথাই কহিয়া গিয়াছেন। বেদান্তে—জীব ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের পার্থক্য-তত্ত্ব পরিকীর্ত্তিত। বেদান্ত-মতে—যাহা অবিদ্যা বা মায়া, তাহাই অজ্ঞান; আর যাহা ব্রহ্ম, তাহাই জ্ঞান। জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ-তত্ত্ব লইয়াই বেদান্ত পরিপুষ্ট। পাতঞ্জল-দর্শন অনেকাংশেই সাঙ্খ্যের মতানুসারী। পার্থক্য এই যে, পতঞ্জলি বলেন,—প্রকৃতি-পুরুষের ভেদতত্ত্ব বুঝিতে হইলেই যোগ অত্যাবশ্যক;—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"; চিত্ত-বৃত্তিনিরোধের নামই যোগ। মীমাংসা-দর্শনে যজ্ঞের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। যজ্ঞাদি কর্ম্ম কি

জ্ঞান ও জ্ঞানের স্বরূপ।

কারণে মোক্ষ ফলপ্রদ, মীমাংসা-দর্শনে সেই জ্ঞান লাভ হয়। দর্শনশাস্ত্র-সমূহ এইরূপে জ্ঞানের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া, জ্ঞানকেই মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ঐ সকল আলোচনায় কর্ম্মের প্রসঙ্গ নানারূপেই উত্থাপিত হইয়াছে! কিন্তু সে সকল স্থলে, কর্ম্ম প্রায়শঃই হীন বলিয়া গণ্য। যজ্ঞাদি কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে। ফলাকাঙ্ক্ষা-হেতু স্বর্গাদি লাভ হয় বটে; কিন্তু তাহা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য। সুতরাং কর্ম্ম-ফলে মানুষ স্বর্গসুখ লাভ করিলেও, কর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইলে মানুষকে পুনরায় জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয়—জরা-মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। বেদাদি শাস্ত্রেও কর্ম্মের দুই প্রকার ফল লিখিত আছে। এক ফলে স্বর্গ বা নরক। সুতরাং জন্মান্তর-প্রাপ্তি। অন্য ফলে মুক্তিলাভ। কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা চিরমুক্তি বা চিরমোক্ষ লাভ হয় কি না, সে বিষয়ে মতান্তর আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কর্ম্মফলের দ্বারা স্বর্গসুখ লাভ হইলেও, সে স্বর্গসুখ কখনই অবিনশ্বর স্বর্গসুখ হইতে পারে না। সোমযাগ দ্বারা স্বর্গলাভ করিয়া ভগবদ্ভক্তগণ পুনরায় মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন,—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এবং শ্রুতির নানা স্থানে এই উক্তি দৃষ্ট হয়। সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা অক্ষয় স্বর্গলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। যাঁহারা জ্ঞানের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন,—"একমাত্র জ্ঞানলাভ হইলেই অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের ফলেই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ হয়; তখন আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না; জন্ম জরা-মৃত্যুর অধীন হইবার আশঙ্কাও দূর হইয়া যায়। ধর্ম্মাধর্ম্মই পুনর্জ্জন্ম; অনুরাগ-দ্বেষই ধর্ম্মাধর্ম্মের মূল। অনুরাগ-বিদ্বেষ আবার ভ্রম-সাপেক্ষ। তত্ত্বজ্ঞানে সেই ভ্রম দূর হয়। ভ্রম দূর হইলেই মুক্তি।" সাঙ্খ্যবাদিগণ যাহাকে প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, বেদান্তবাদি-গণ তাহাকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করেন। সাঙ্খ্য ও বেদান্ত প্রভৃতির সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনা করিলেই এতদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক, জ্ঞান বলিতে আমরা কি বুঝিতে পারি? ভক্তির যেমন লক্ষণ দেখিয়াছি, কর্ম্মের যেমন বিভাগ দেখিয়াছি, শাস্ত্র জ্ঞানেরও সেইরূপ স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তিতেই, জ্ঞান কাহাকে বলে,—এ তত্ত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে; যথা—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্। আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্। এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥"

অর্থাৎ,—'শ্লাঘাশূন্যতা, দম্ভপরিহার, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, সদ্গুরুসেবা, বাহ্য ও অভ্যন্তরের শৌচ, চিত্ত-স্থিরতা, দেহ এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের সংযম, শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ভোগে বিরতি, অহঙ্কার ত্যাগ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের দোষদর্শন, পুত্র-কলত্র-ভবনাদির মায়া পরিবর্জ্জন এবং তাহাতে অহংজ্ঞানের পরিত্যাগ, শুভাশুভ উভয়েই সতত সমবুদ্ধি, অনন্যা নিষ্ঠা দ্বারা আমাতে (অর্থাৎ ভগবানে) ঐকান্তিকী ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে বাস,

সাধারণ জনসমাজে যাতায়াত না করা, পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ মুক্তির আলোচনা,—এই সকল জ্ঞানের লক্ষণ; ইহার বিপরীত লক্ষণই অজ্ঞান।' এই ভগবদুক্তিতেও প্রতিপন্ন হইতেছে, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং অননুষ্ঠানের উপরই জ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই জ্ঞানের দ্বারা কি ভাবে মোক্ষলাভ হয়, কিরূপে পরম তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় এবং পরিশেষে কিরূপে মানুষ মোক্ষলাভের যোগ্য হয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তিতে তাহাও প্রকটিত হইয়াছে। জ্ঞানের লক্ষণাদি কীর্ত্তন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়) বলিতেছেন,—

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বামাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ। মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥"

অর্থাৎ,—'এক্ষণে যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহাই তোমাকে বলিব। এই বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয়। অনাদি পরম পুরুষ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ন্যায়, সৎও নহেন, অসৎও নহেন। সেই পরব্রহ্মের হস্তপদ সর্ব্বত্র প্রসারিত; সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক বিদ্যমান; তাঁহার শ্রবণ সকল স্থানে শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন; এবং তিনি বিশ্বের সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পরমাত্মা ইন্দ্রিয়-সমূহে গুণের অবভাসক, অথচ তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিহীন; তিনি নির্লিপ্ত, অথচ সকলের আধারস্বরূপ; তিনি নির্গুণ, অথচ জীবরূপে গুণভোক্তা। তিনি ভূতগণের বাহিরে এবং অন্তরে অবস্থিত; তিনিই আবার স্থাবর-জঙ্গমরূপ ভূতপুঞ্জ। তিনি অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ রূপাদিবিহীন-হেতু জ্ঞানের অগোচর; অপিচ, তিনি দূরবর্ত্তী, অথচ নিকটেই অবস্থিত। তিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত-পুঞ্জে অবিভক্ত হইয়াও ভিন্নরূপে প্রতীয়মান; তিনি স্থিতিকালে ভূতবর্গের পালক, প্রলয়-কালে সংহারক এবং সৃষ্টিকালে উৎপাদক বলিয়া জানিবে। সেই ব্রহ্ম সূর্য্যাদিরও প্রকাশক এবং অজ্ঞান দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। তিনি জ্ঞানরূপী, জ্ঞেয়বস্তু, জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য এবং সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তারূপে অবস্থিত। এইরূপে ক্ষেত্ররূপ শরীর, অমানিত্যাদি জ্ঞান এবং জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ সংক্ষেপে তোমার নিকট বিবৃত করিলাম! আমার ভক্ত এই গূঢ় তত্ত্ব বিশেষরূপে অবধারণ করিয়া মদ্ভাবপ্রাপ্ত অর্থাৎ মোক্ষ-লাভের যোগ্য হইয়া থাকেন!' শরীর-রূপ ক্ষেত্র কি উপাদানে সংগঠিত, তাহার পরিচয় ভগবান পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলেন। অহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতির পরিণামেই শরীরের উৎপত্তি। তাহাই আবার ক্ষেত্র নামে অভিহিত। যিনি সমুদায় ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্রের ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই মোক্ষপথে অগ্রসর হইয়াছেন। ভগবদুক্তিতে, গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, প্রথম কয়েকটী শ্লোকে, এই তত্ত্ব

বিশদীকৃত আছে। সেখানে প্রকাশ—সাঙ্খ্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রভৃতি সম্যক অনুধাবন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তদ্দ্বারাই মোক্ষলাভ ঘটিয়া থকে। কিন্তু সে জ্ঞানেও কর্ম্মের আভাষ আছে। ফলতঃ, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—মোক্ষলাভে তিনই প্রয়োজন।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—মোক্ষলাভে এই তিনের উপযোগিতা সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। মানুষের মনেও এ বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়, শাস্ত্রেও এ বিষয়ে নানা বিতর্ক দেখিতে পাই।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম।

শাস্ত্রে আছে,—কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়; শাস্ত্রে আছে,—কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। অপিচ, স্বর্গলাভ এবং মোক্ষপ্রাপ্তি, দুই স্বতন্ত্র অবস্থা বলিয়াও পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কাজেই মানুষের মনে সমস্যা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে আছে,—বিশেষ বিশেষ যাগযজ্ঞরূপ কর্ম্ম করিলে বিশেষ বিশেষ কাল-পরিমাণ স্বর্গলাভ হয়। আবার অন্যত্র দৃষ্ট হয়,—সেই সেই যাগযজ্ঞে মোক্ষ-লাভ ঘটে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট-কাল স্বর্গভোগ, আর মোক্ষ বা মুক্তিলাভ, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একই কর্ম্ম বিষয়ে এরূপ বিভিন্ন ফলের সম্ভাবনা কেন? আবার, যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশ নিশ্চয়ই হইবে। সুতরাং কর্ম্ম দ্বারা যে স্বর্গসুখ-প্রাপ্তি; অথবা কর্ম্মের দ্বারা যে কিছু সুখলাভের সম্ভাবনা, তাহার সকলেরই বিনাশ আছে। অতএব কর্ম্মানুসারে কেহ স্বর্গাপবর্গ লাভ করিলে, তাঁহার পুনরায় সংসারে আগমন অবশ্যম্ভাবী। সংসারে আসিয়া পুনরায় তাঁহাকে কর্ম্মাকর্ম্মের অধীন হইতে হইবে। আর কর্ম্মাকর্ম্মের ফলে পুনরায় তিনি স্বর্গ-নরক ভোগ করিতে বাধ্য হইবেন। তাহা হইলে, কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভ ঘটিবার সম্ভাবনা কখনই দেখা যায় না। অথচ, আমরা দেখিতেছি, শাস্ত্র বলিতেছেন,—কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। সুতরাং একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক, এরূপ মতভেদের কারণ কি? শাস্ত্র কেনই বা বলিয়াছেন,—কর্ম্মে মোক্ষলাভ হয়; আর কেনই বা বলিয়াছেন,—কর্ম্মে সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয় না। সে কর্ম্ম, কি কর্ম্ম—যে কর্ম্মে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, যে কর্ম্মের ফলে সংসারে পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে হয় না? এ বিষয়ে গীতায় ভগবান যাহা বলিয়াছেন, তাহার আভাষ আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। মহর্ষি মনু এই কর্ম্ম-তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা। কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ॥
সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ। ব্রতা নিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥
অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ। যদ্‌যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥
তেষু সম্যগ্‌বর্ত্তমানো গচ্ছত্যমরলোকতাম্। যথাসঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥"

অর্থাৎ,—'কামাত্ম হওয়া প্রশংসার বিষয় নহে; কিন্তু কামনার অতীত হওয়াও এ সংসারে লক্ষিত হয় না। কেন না, বেদ-স্বীকরণ বা বেদাধ্যয়ন এবং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড কামনার বিষয়ীভূত। 'এই কর্ম্মে আমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে'—এইরূপ বুদ্ধির সঙ্কল্প, ইহাই কামনার মূল; এই ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞানবশতঃই লোকে যজ্ঞ-কার্য্য সম্পন্ন করে; ব্রত বল, নিয়ম বল, ধর্ম্ম বল—সকলই সঙ্কল্পজনিত। ইহসংসারে অকামী জনের কোনও কর্ম্মই দেখা যায় না। লোকে যে কিছু কর্ম্ম করে, সকলই কামনা-প্রেরিত। পরন্তু, বন্ধহেতু ফলাভিলাষ ব্যতীত

যদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তবে মুক্তি লাভ হয়; এমন কি, ইহলোকেই সমুদায় কাম্য বিষয় উপভোগ করিতে পারা যায়।' ইহাতেও বুঝা গেল, ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিলেই মোক্ষলাভ হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম কি,—শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, তাহা অবগত হওয়া যায় না! জন্মিবার পূর্ব্বে গর্ভাধান হইতে মরণের পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত, কোন্ সময়ে কিরূপ কর্ম্ম প্রয়োজন,—শাস্ত্র তাহা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে মোক্ষের পথ প্রশস্ত করে, ইন্দ্রিয়-সংযম তাহার অন্যতম। মনু বলিয়াছেন,—'সারথি যেমন অশ্বগণকে সংযত রাখে, বিদ্বানজন তদ্রূপ আকর্ষণশীল বিষয়-সমূহে স্বতঃধাবমান ইন্দ্রিয়গণকে সুসংযত করিবার চেষ্টা করিবেন। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-প্রসক্তি হইতেই মনুষ্য দূষিত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহা-দিগকে সংযম করিতে পারিলে, সমুদায় সিদ্ধিই নিশ্চয় লাভ করা যায়। কাম্য-বিষয়-উপভোগে কামনার শান্তি হয় না; পরন্তু ঘৃতাহুতিযোগে অগ্নি যেমন আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, বিষয়োপভোগে কামনারও তদ্রূপ বৃদ্ধি হয়। শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, ভোজন বা আঘ্রাণ অনুকূল হউক বা প্রতিকূলই হউক, কিছুতেই যাঁহার বিষাদ বা হর্ষ উৎপন্ন করিতে না পারে, তাঁহাকেই জিতেন্দ্রিয় বলা যায়। চর্ম্মপাত্র বহু ছিদ্রময় না হইলেও একটী ছিদ্রের দোষে যেমন জলপূর্ণ হইয়া মগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয়ও স্খলিত হয়, তাহা হইলে সেই একটী ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যেই পরম জ্ঞান নষ্ট হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সমূহকে আত্মাধীন রাখিয়া, মনকে সংযত করিয়া, উপায় বলে দেহকে পীড়া না দিয়া, লোকে সমুদায় পুরুষার্থই সাধন করিবে। কেবল ইন্দ্রিয়-সংযম বলিয়া নহে; নিত্যনৈমিত্তিক প্রতি কর্ম্ম সম্বন্ধেই শাস্ত্রের বিধিনিষেধ দেখিতে পাই। কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, জীবনের কোন্ অবস্থায় কিরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, মন্বাদি শাস্ত্রগ্রন্থে সে সকল উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সকল উপদেশ মান্য করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিয়া চলিলে, সেই কর্ম্মের ফলে মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। এখানে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সংযোগের বিষয় প্রতিপন্ন হয়। কারণ, শাস্ত্রীয় উপদেশ রূপ জ্ঞান—কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া শুভদায়ক হইতেছে। যাঁহারা বলেন,—কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ নাই; যাঁহারা বলেন,—জ্ঞানের নিকট জগৎ নাই—কর্ম্ম নাই; কর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিলে, তাঁহারা জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রের অনুসরণকেই—শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিয়া চলাকেই—ভক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি। ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ হয়, কর্ম্ম-তত্ত্বালোচনায় তাহাই বুঝিতে পারি।

"ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকং। ন নাম গ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥"

কতক বৃক্ষের ফল অর্থাৎ নির্ম্মলি জলে দিলেই জল পরিষ্কার হয়; কিন্তু তাহার নাম গ্রহণ করিলেই জল স্বচ্ছ হয় না। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্ম করা হয়; বিহিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্যরূপে করা হয় না।

নির্ঘণ্ট

আ।

ই।

ঐ।

ও।

ক।

খ।

গ।

ঘ।

চ।

ছ।

জ।

ন।

প।

ফ।

ব।

ভ।

ম।

য।

র।

ল।

শ।

সম্পূর্ণ।